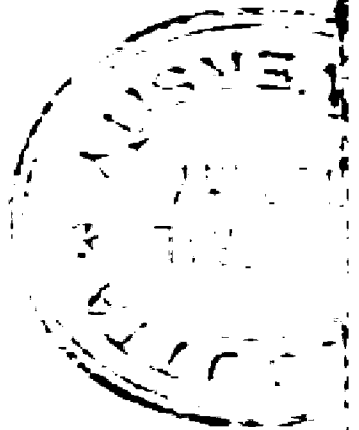




॥ दशम वर्ष ॥

श्री



॥ वैशाख १९५४ ॥

756.3
001/9

॥ দশম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৬৪ ॥

সম্পাদক : প্রফুল্ল রায়

॥ গল্প ॥

অব্রত যন্ত্রণা	... উদয়ন ঘোষ	১
আলোর উজ্জান	... অশোক নৈত্র	৫১

॥ উপন্যাস ॥

গাঙ্ধর্ব	... সত্যপ্রিয় ঘোষ	১৩
খাল-বিল-পারের কাহিনী	... কণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	২৮

॥ প্রবন্ধ ॥

সিপাহী বিদ্রোহ	... পি. শাসতিংকো	২
মাস্ত্র জাকব	... সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	২২
বোড়ো প্রেমের লুপ্ত কাহিনী	... সত্যেন রায়	৩৭

॥ কবিতা ॥

রুদ্র বসন্ত	... রামেন্দ্র দেশমুখ্য	৪১
পাঁচটি প্রেমের কবিতা	... সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	৪২
প্রাণ প্রেম প্রত্যাষ ও সন্ধ্যা	... জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়	৪৭
নাগরিক	... অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়	৪৮
স্বাক্ষর	... গৌরীপদ দত্ত	৪৯
কান্দীয়ে সায়াহ	... উৎপলকুমার বসু	৫০

॥ সংস্কৃতি-প্রসঙ্গ ॥

ভারতের স্বাধীনতায়ুদ্ধের শতবার্ষিকী	... অধ্যাপক ইগর রেগনার	৫৭
মানব পরিবার	... রবি ঘোষ	৬০

॥ চলচ্চিত্র ॥

যাত্রা হোল শুরু	... চিত্রালাপী	৬৩
আদর্শ হিন্দু হোটেল	...	৬৫
পৃথিবী আমারে চায়	...	৬৬

॥ বিয়োগ-গজ্ঞী ॥

অগদীশ গুপ্ত	... নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৮
-------------	----------------------------	----

প্রফুল্ল রায় কর্তৃক অগ্রণী প্রেস ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

ইহাতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অগ্রণীর নিয়মাবলী

বৈশাখ থেকে চৈত্র হচ্ছে অগ্রণীর বছর। বছরের যে কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বছরের সড়াক টাঙ্গা ছ টাঙ্গা, ছমাসের ছত্র তিন টাঙ্গা, প্রতি সংখ্যা আট আনা বা পঞ্চাশ নম্বা পয়সা। মনিঅর্ডার কুপনে নাম ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখবেন।

বাংলা মাসের শেষ-তারিখে অগ্রণী প্রকাশিত হয়। কোনো মাসের পত্রিকা নিয়মিত সময়ে না পেলেন, ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে পরবর্তী মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে জানাবেন—যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। ঠিকানার যে কোন পরিবর্তন বাংলা মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে আমাদের জানাবেন।

চিঠিপত্রে সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন।

ভালো গল্প ও কবিতা সাদরে গৃহীত হবে। অমনোনীত রচনা যদি ফেরৎ চান তবে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দেবেন। অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। পাকিস্তানের ডাকটিকিট পাঠিয়ে লাভ নেই, কারণ সেগুলি এখানে অচল। পাকিস্তানের লেখক-লেখিকারা নকল রেখে রচনা পাঠাবেন।

এজেন্সীর নিয়মাবলী

বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা এজেন্সি-গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এজেন্সির নিয়ম সংক্ষেপে হচ্ছে এই : কমপক্ষে পাঁচকপি নিতে হবে এবং কপিপিছু একটাকা হিসাবে জমা রাখতে হবে আমাদের কাছে। বিক্রয়ান্তে দাম পাঠাতে হবে। বিশদ বিবরণের জন্যে পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য পত্রালাপ করুন।

চিঠিপত্র, রচনাদি ও টাকাকড়ি পাঠাবার একমাত্র ঠিকানা :

P 24, 055

কার্যাব্যয় : অগ্রণী

১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

দ্রব্য-সংশোধন

এই মাসের অগ্রণীর 'মাস জাকব' প্রবন্ধে : ২৩ পৃষ্ঠা ১৫ লাইনে : "১৯২২ সালে নিষিদ্ধ" স্থলে "১৯২২ সালে প্রকাশিত" পড়তে হবে ; এবং ১৭ লাইনের গোড়ায় "সালে দেখা"র স্থলে "সালে প্রকাশিত হয়" পড়ুন।

বিজ্ঞপ্তি

১৩৬৬ সালের বার্ষিক সূচী এইমাসে দেওয়া গেলনা, জ্যেষ্ঠের অগ্রণীর সঙ্গে দেওয়া হবে। গ্রাহক, অগ্রগ্রাহক ও পাঠকগণ ক্রটি মার্জনা করিবেন। ইতি—

সম্পাদক, অগ্রণী

॥ দশম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪ ॥
সম্পাদক : প্রফুল্ল রায়

॥ গল্প ॥

কুণ	— বীরেন্দ্র নিয়োগী	৬৯
-----	---------------------	----

॥ উপন্যাস ॥

গাঙ্গুর্ষ	— সত্যপ্রিয় ঘোষ	৮৭
খাল-বিল-পারের কাহিনী	— ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	১০৯

॥ প্রবন্ধ ॥

উপেক্ষিত কবি অম্বিত দত্ত	— কাতিক লাহিড়ী	৯৬
হে বিদেশী ফুল প্রসঙ্গে	— জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়	১১৯

॥ কবিতা ॥

বিকেল	— সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০২
জীবন এখান থেকে	— শিশিরকুমার দাশ	১০৩
হারিয়ে যাবার পথ	— উৎপলকুমার বসু	১০৫
জন্ম	— শিবশঙ্কু পাল	১০৬
প্রাণ প্রেম প্রত্যুষ ও সন্ধ্যা	— জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়	১০৭
তিমিরান্ত	— জ্যোত্স্না ভট্ট	১০৮

॥ গ্রন্থ-পরিচয় ॥

ইণ্ডিয়ান ফোক লোর	— গৌতম গুপ্ত	১২৪
ভাই ভাই	— নীলরতন মুখোপাধ্যায়	১২৫
সহস্ররণ	— শকুন্তলা সেন	১২৫

॥ সংস্কৃতি-প্রসঙ্গ ॥

আধুনিক বাংলা কবিতার গতি ও প্রকৃতি	— গুরুদাস ভট্টাচার্য	১২৭
-----------------------------------	----------------------	-----

॥ চলচ্চিত্র ॥

খেলা ভাঙার খেলা	— চিত্রাঙ্গাপী	১৩১
নতুন প্রভাত	— ঐ	১৩৩
মুসাফির	— ঐ	১৩৭

অগ্রণীর নিয়মাবলী

বৈশাখ থেকে চৈত্র হচ্ছে অগ্রণীর বছর। বছরের যে কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বছরের সড়াক টাঁদা ছ টাকা, ছমাসের জন্ত তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা বা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। মনিঅর্ডার কুপনে নাম ঠিকানা পরিকারভাবে লিখবেন।

বাংলা মাসের শেষ-তারিখে অগ্রণী প্রকাশিত হয়। কোনো মাসের পত্রিকা নিয়মিত সময়ে না পেলেন, ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে পরবর্তী মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে জানাবেন—যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। ঠিকানার যে কোন পরিবর্তন বাংলা মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে আমাদের জানাবেন।

চিঠিপত্রে সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন।

ভালো গল্প ও কবিতা সদরে গৃহীত হবে। অমনোনীত রচনা যদি ফেরৎ চান তবে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দেবেন। অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। পাকিস্তানের ডাক টিকিট পাঠিয়ে লাভ নেই, কারণ সেগুলি এখানে অচল। পাকিস্তানের লেখক-লেখিকারা নকল রেখে রচনা পাঠাবেন।

এজেন্সীর নিয়মাবলী

বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা এজেন্সি-গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এজেন্সির নিয়ম সংক্ষেপে হচ্ছে এই : কমপক্ষে পাঁচকপি নিতে হবে এবং কপিপিছু একটাকা হিসাবে ভাণ্ড রাখতে হবে আমাদের কাছে। বিক্রয়ান্তে দাম পাঠাতে হবে। বিশদ বিবরণের জন্যে পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপনের জন্যে পত্রালাপ করুন।

চিঠিপত্র, রচনাদি ও টাকাকড়ি পাঠাবার একমাত্র ঠিকানা :

কার্যাব্যবসায় : অগ্রণী

১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

সূতীকাপড় কাচার

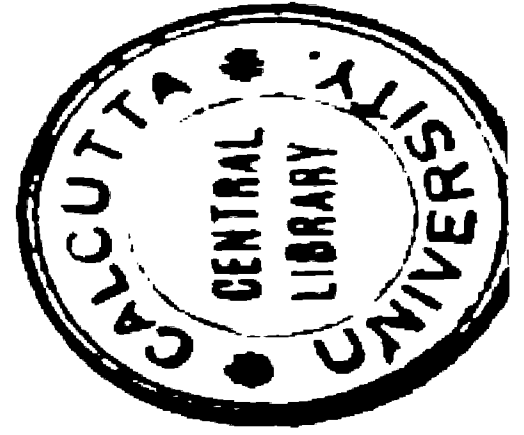
আমাদের পিওর ঢাকাই অদ্বিতীয়



॥ বসু সোপ ওয়ার্কস ॥

॥ কারখানা : চাকু মার্কেট, নাকতলা, কলিকাতা-৪০ ॥

॥ দৃষ্টি ॥



॥ দশম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৬৪ ॥

সম্পাদক : প্রফুল্ল রায়

॥ গল্প ॥

তোমার গল্প ... দেবকুমার নৈত্র ১৩৭

॥ উপন্যাস ॥

খাল-বিল-পারের কাহিনী ... ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৭৭
গান্ধর্ব ... সত্যপ্রিয় ঘোষ ১৬৩

॥ কবিতা ॥

আত্মতা বাসনা ... মানস রায় চৌধুরী ১৭৬
প্রাণ প্রেম প্রত্যাষ ও সন্ধ্যা ... জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৭

॥ প্রবন্ধ ॥

ভূদান যজ্ঞ—প্রতিক্রিয়া না বিপ্লব ... শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৮

॥ ব্যঙ্গরচনা ॥

বিশ্বাসনের ভ্রমোদর্শন ... বিশ্বাসন ঘোষ ১৭১

॥ রম্যরচনা ॥

রূপময় দেশ ... রামেন্দ্র দেশমুখ্য ১২০

॥ চলচ্চিত্র ॥

ভাস্কর ঘর ... চিত্রালাপী ২০৩
রাস্তার ছেলে ... চিত্রালাপী ২০৫

অগ্রণীর বই

- সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'ষ্টালিন' তৃতীয় সংস্করণ চলছে।
 ষ্টালিনের জীবনকাহিনী এত সুন্দর করে বাংলা ভাষায়
 আর লেখা হয়নি। চমৎকার ছাপা বাঁধাই। তিনখানি
 ছরঙা ছবি। ৬৮
- অনুবাদগ্রন্থ : ম্যাকসিম গর্কীর লেখা ছোট ও বড় গল্প, ডায়েরীর
 বাছাইকরা কয়েকটি অংশ, ভবানবন্দী, একটি সম্পূর্ণ নাটক
 ও কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন 'শিল্প ও সংগ্রাম' ৩১০
- রম্যা রিলার। আই উইল নট রেস্ট-এর বাংলা 'শিল্পীর
 নবজন্ম' ৫৮
- বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভেরকর ও ইউরোপের অন্যান্য বিখ্যাত
 কয়েকজন লেখকের গল্পসংগ্রহ 'বিদেশী গল্প' ২১০
- লিও টলস্টয়ের অশ্রুতন শ্রেষ্ঠ কাহিনী ক্রুয়েটকার সোনাটার
 বাংলা অনুবাদ 'রাহ' ২৮
- আধুনিক জার্মানীর শক্তিশালী লেখিকা আন্না সেঘেরসের
 'সাবোতিয়ারস' ২৮
- আইডান ভুর্গেনিভের 'অশ্রুতী' ২১০
- ছোট গল্প : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিস্থিতি' ; ২১০
 রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বেদিয়া-ছন্দ' ২৮
- শান্তি দেবীর 'শাস্তী' ১১০ ; স্ববোধমোহন ঘোষের
 'উৎস' ২৮
- নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের 'অপরিচিতার চিঠি' ২৮
- উপন্যাস : শুণ্ময় মাস্তার 'লখীন্দর দিগার' ৪১০ ; মিহির
 আচার্যের 'দিনবদল' ২৮ ; বৈষ্ণনাথ ঘোষের 'কল্যাণ' ৫৮
- ব্রহ্মকথা : ডাঃ গৌরমোহন দাসের 'মহাযুদ্ধের পরে
 মালয়' ২১০ ; রাহুলের 'জনপদের ছন্দ' ৩১০
- কবিতা : মায়াকভ স্কির কবিতা অনুবাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ
 মৈত্র ২১০ ; এঁরই স্বরচিত 'আকাশের মুখ' ১১০ । চিত্ত
 ঘোষের 'অস্তুরা' ১১০ ; রামেন্দ্র দেশমুখের 'জনসমুদ্র' ১১০
- বিবিধ : সরোজ আচার্যের 'মার্কসীয় সুজীবিজ্ঞান' ২৮

অগ্রণী বুক ক্লাব

১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬।



॥ দৃষ্ট ॥

॥ দশম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৬৪ ॥

সম্পাদক : প্রফুল্ল রায়

॥ গল্প ॥

জলভিহি	... সুরঞ্জন ভাট্টা	২০৭
অসত্য পৃথিবী	... শিশিরকুমার দাশ	২২৯

॥ উপন্যাস ॥

গান্ধী	... সত্যপ্রিয় ঘোষ	২৪০
--------	--------------------	-----

॥ কবিতা ॥

কয়েকটি কবিতা ও একটি রাতের কাহিনী	... সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	২৫৮
-----------------------------------	---------------------------	-----

॥ প্রবন্ধ ॥

ভূদান যজ্ঞ—প্রতিক্রিয়া না বিপ্লব	... শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৪
-----------------------------------	--------------------------------	-----

॥ রম্যরচনা ॥

অবিস্মৃত	... রামেন্দ্র দেশমুখ্য	২২০
----------	------------------------	-----

॥ ব্যঙ্গরচনা ॥

বিবস্বানের ভূয়োদর্শন : স্বর্গারোহন	... বিবস্বান ঘোষ	২৪৯
-------------------------------------	------------------	-----

॥ চলচ্চিত্র ॥

কাচামিঠে	... চিত্রালাপী	২৬৫
ঈতা	...	২৬৬
পুনর্মিলন	...	২৬৯

॥ গ্রন্থপরিচয় ॥

ভিল্পন নবীন কবি	... রইস্ মনসুর চৌধুরী	২৭১
-----------------	-----------------------	-----

অগ্রণীর নিয়মাবলী

বৈশাখ থেকে চৈত্র হচ্ছে অগ্রণীর বছর। বছরের যে কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বছরের সড়াক চাঁদা ছ' টাকা, ছমাসের জন্য তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা বা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। মনিঅর্ডার কুপনে নাম ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখবেন।

বাংলা মাসের শেষ-তারিখে অগ্রণী প্রকাশিত হয়। কোনো মাসের পত্রিকা নিয়মিত সময়ে না পেলো, ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে পরবর্তী মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে জানাবেন—যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। ঠিকানার যে কোন পরিবর্তন বাংলা মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে আমাদের জানাবেন।

চিঠিপত্রে সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন।

ভালো গল্প ও কবিতা সদরে গৃহীত হবে। অনন্যোনীত রচনা যদি ফেরৎ চান তবে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দেবেন। অনন্যোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। পাকিস্তানের ডাক টিকিট পাঠিয়ে লাভ নেই, কারণ সেগুলি এখানে অচল। পাকিস্তানের লেখক-লেখিকারা নকল রেখে রচনা পাঠাবেন।

এজেন্সীর নিয়মাবলী

বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা এজেন্সি-গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এজেন্সির নিয়ম সংক্ষেপে হচ্ছে এই : কমপক্ষে পাঁচকপি নিতে হবে এবং কপিপিছু একটাকা হিসাবে জমা রাখতে হবে আমাদের কাছে। বিক্রয়ান্তে দাম পাঠাতে হবে। বিশদ বিবরণের জন্যে পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য পত্রালাপ করুন।

চিঠিপত্র, রচনাদি ও টাকাকড়ি পাঠাবার একমাত্র ঠিকানা :

কার্যাব্যক্ষ : অগ্রণী

১৩, শিবনারায়ণ দাস সেন, কলিকাতা-৬

সূতীকাপড় কাচার

আমাদের পিওর ঢাকাই অধিতীয়



॥ বসু সোপ ওয়ার্কস ॥

॥ কারখানা : চারু মার্কেট, নাকতলা, কলিকাতা-৪০ ॥

॥ *দুর্গা* ॥

॥ দশম বর্ষ, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬৪ ॥

সম্পাদক : প্রফুল্ল রায়

॥ প্রবন্ধ ॥

গান্ধী মানসে পাশ্চাত্য প্রভাব	... বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	৩০২
ধলভূম	... প্রবুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়	৩১৯
অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও সরকারী		
উৎপাদননীতি	 নণি গুহ	৩৫১
ছোটগল্পের ভূমিকা	... গুরুদাস ভট্টাচার্য	৩৬৪

॥ গল্প ॥

গণেশ ঠাকুর	... সত্যপ্রিয় ঘোষ	২৭৫
ব্যাণ্ড বাঁটার	... মিহির মুখোপাধ্যায়	২৮৫
একাঙ্কিকা	... দেবকুমার মৈত্র	৩৩৯
সজ্জাট সাজাহান	... শিশিরকুমার দাশ	৩৫৮
খানাসখানা	... সুবোধমোহন ঘোষ	৩৬৯

॥ কবিতা ॥

জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সরোজিনী নাইডু : অনুবাদ অঙ্কিত দত্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী, সত্যব্রত ঘোষ, সুজিয় মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাশ, বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, লি পো—অঃ ফখরুজ্জামান চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, মানস রায়চৌধুরী, উৎপলকুমার বসু, গৌর পাল ।

॥ ব্যঙ্গরচনা ॥

ক্রি স্টাইল ফুটবল প্রতিযোগিতা	... বিবস্বান ঘোষ	৩১১
-------------------------------	------------------	-----

টেলিগ্রাম : ভারাসিকেল

টেলিফোন : ৫৫-৫০১৫

ভাৰা সাইকেল ষ্টোৰস

(স্থাপিত ১৯৩২)

আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও কমিশন এজেন্টস্

১৭-১৯ আর, জি, কর রোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪

পূর্বভারতের একমাত্র পরিবেশক :

ভারতের সোল এজেন্টস :

‘সরদার ১ নং’ সামগ্রী

‘ইউনিক ব্রেক’ ও অন্যান্য সরঞ্জাম

হেয়ার বেপ্টিং

কটন বেপ্টিং

ক্যানভাস হোসপাইপ

শ্রীরামপুর মিল ষ্টোরস্

৬৬ স্ট্রাও রোড

কলিকাতা—১





দশম বর্ষ, কার্তিক, ১৩৬৪

সম্পাদক : প্রফুল্ল রায়

॥ গল্প ॥

অংশন	... বীরেন্দ্র নিওগী	৩২৫
বেতার-বিব্রহ	... শৈলেশ বসু	৪১৫

॥ উপন্যাস ॥

গান্ধী	... সত্যপ্রিয় ঘোষ	৪৩৭
--------	--------------------	-----

॥ প্রবন্ধ ॥

বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেম-নিরীক্ষা	... সুশীল মুখোপাধ্যায়	৪২৪
আচার্য যোগেন্দ্রচন্দ্র বিজ্ঞানিধি	... বাসন্তিকা ঘোষ	৪৪৫
ভেলে	... সমীর রায়চৌধুরী	৪৪৮

॥ কবিতা ॥

আমি আর প্রত্যেকটি সকাল	... মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৪২২
ছটি কবিতা	... অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়	৪৩০
এক নারী	... অমলকান্তি ঘোষ	৪৩১
বুড়ি ঠাকুমা	... জ্যোৎস্না ভড়	৪৩১
শুষ্ক প্রান্তরে	... শিবশঙ্কু পাল	৪৩২
সীমান্ত	... বাসুদেব গুপ্ত	৪৩২
বাধা তবু আমাকেই দাও	... গৌরীপদ দত্ত	৪৩৩
তিনটি কবিতা	... সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	৪৩৪

॥ গ্রন্থ-পরিচয় ॥

দ্বিতীয় ভ্রম : অসীম রায়	... সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	৪৫০
চ্যাম কুড় কুড়	... রামেন্দ্র দেশমুখ্য	৪৫২

॥ চলচ্চিত্র ॥

ওগো শুনছো	... চিত্রাঙ্গাণী	৪৫৩
হারানো সুর	...	৪৫৪
কিতনা বদল গ্যায়া ইনসান	...	৪৫৫

প্রফুল্ল রায় কর্তৃক অগ্রণী প্রেস ১৩, শিবনারায়ণ দাঙ্গা লেন, কলিকাতা-৬

হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অগ্রণীর নিয়মাবলী

বৈশাখ থেকে চৈত্র হচ্ছে অগ্রণীর বছর। বছরের যে কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বছরের সডাক চাঁদা ছ টাকা, ছমাসের জন্য তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা বা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। মনিঅর্ডার কুপনে নাম ঠিকানা পরিকারভাবে লিখবেন।

বাংলা মাসের শেষ-তারিখে অগ্রণী প্রকাশিত হয়। কোনো মাসের পত্রিকা নিয়মিত সময়ে না পেলো, ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে পরবর্তী মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে জানাবেন—যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। ঠিকানার যে কোন পরিবর্তন বাংলা মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে আমাদের জানাবেন।

চিঠিপত্রে সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন।

ভালো গল্প ও কবিতা সাদরে গৃহীত হবে। অমনোনীত রচনা যদি ফেরৎ চান তবে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দেবেন। অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। পাকিস্তানের ডাক টিকিট পাঠিয়ে লাভ নেই, কারণ সেগুলি এখানে অচল। পাকিস্তানের লেখক-লেখিকারা নকল রেখে রচনা পাঠাবেন।

এজেন্সীর নিয়মাবলী

বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা এজেন্সি-গ্রহণের আনন্ড জানাচ্ছি। এজেন্সির নিয়ম সংক্ষেপে হচ্ছে এই : কমপক্ষে পাঁচকপি নিতে হবে এবং কপিপিছু একটাকা হিসাবে জমা রাখতে হবে আমাদের কাছে। বিক্রয়ান্তে দাম পাঠাতে হবে। বিশদ বিবরণের জন্যে পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য পত্রালাপ করুন।

চিঠিপত্র, রচনাদি ও টাকাকড়ি পাঠাবার একমাত্র ঠিকানা :

কার্যধ্যক্ষ : অগ্রণী

১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

সুতীকাপড় কাচার

আমাদের পিওর ঢাকাই অধিতীয়



॥ বসু সোপ ওয়ার্কস ॥

॥ কারখানা : চারু মার্কেট, নাকতলা, কলিকাতা-৪০ ॥



॥ দ্বিতীয় ॥

দশম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪

সম্পাদক : প্রফুল্ল রায়

॥ গল্প ॥

নব্ব্বের জন্ম	... অশোক মৈত্র	৪৫৭
---------------	----------------	-----

॥ উপন্যাস ॥

ছায়ানাটক	... দেবকুমার মৈত্র	৪৬৭
বাসু	... সতীন্দ্রনাথ মৈত্র	৫০৬

॥ প্রবন্ধ ॥

গান্ধী পথ কি অবৈজ্ঞানিক	... ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৪৭৯
আজকে	... প্রণয় গোস্বামী	৪৮৫
ধলভূম	... প্রবুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়	৪৮৮

॥ কবিতা ॥

চই আশ্বিনের বর্ষারজনী	... দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯৪
দশমী	... গৌর পাল	৪৯৬
নন্দনের উষ্ম অমরাগে	... সুরজিৎকুমার দাশগুপ্ত	৪৯৮
একদিন	... অজিত মুখোপাধ্যায়	৪৯৮
শীত পাহাড়ের চূড়া ও অন্যান্য কবিতা	... সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	৫০০

॥ সংস্কৃতি-প্রসঙ্গ ॥

সরকারী ভাষাকমিশনের রিপোর্ট		৫১২
----------------------------	--	-----

॥ চলচ্চিত্র ॥

অন্তরীক্ষ	... চিত্রালাপী	৫১৬
চন্দ্রনাথ	... ঐ	৫১৭

॥ গ্রন্থ-পরিচয় ॥

কৃষ্ণকলি	... গৌতম গুপ্ত	৫১৯
কবি নৃসিংহ	... পবিত্র পাল	৫২০
ক্রান্তিকাল	... পবিত্র পাল	৫২২

অগ্রণীর নিয়মাবলী

বৈশাখ থেকে চৈত্র হচ্ছে অগ্রণীর বছর। বছরের যে কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বছরের সড়াক চাঁদা ছ টাকা, ছমাসের জন্ম তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা বা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। মনিঅর্ডার কুপনে নাম ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখবেন।

বাংলা মাসের শেষ-তারিখে অগ্রণী প্রকাশিত হয়। কোনো মাসের পত্রিকা নিয়মিত সময়ে না পেলেন, ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে পরবর্তী মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে জানাবেন—যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। ঠিকানার যে কোন পরিবর্তন বাংলা মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে আমাদের জানাবেন।

চিঠিপত্রে সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন।

ভালো গল্প ও কবিতা সাপরে গৃহীত হবে। অনন্যোনীত রচনা যদি ফেরৎ চান তবে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দেবেন। অনন্যোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। পাকিস্তানের ডাক টিকিট পাঠিয়ে লাভ নেই, কারণ সেগুলি এখানে অচল। পাকিস্তানের লেখক-লেখিকারা নকল রেখে রচনা পাঠাবেন।

এজেন্সীর নিয়মাবলী

বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা এজেন্সি-গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এজেন্সির নিয়ম সংক্ষেপে হচ্ছে এই : কমপক্ষে পাঁচকপি নিতে হবে এবং কপিপিছু একটাকা হিসাবে জমা রাখতে হবে আমাদের কাছে। বিক্রয়ান্তে দাম পাঠাতে হবে। বিশদ বিবরণের জন্যে পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপনের জন্যে পত্রালাপ করুন।

চিঠিপত্র, রচনাদি ও টাকাকড়ি পাঠাবার একমাত্র ঠিকানা :

কার্যধ্যক্ষ : অগ্রণী

১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

সূতীকাপড় কাচার

আমাদের পিওর ঢাকাই অদ্বিতীয়



॥ বসু সোপ ওয়ার্কস ॥

॥ কারখানা : চারু মার্কেট, নাকতলা, কলিকাতা-৪০ ॥

॥ দৃষ্টি ॥

দশম বর্ষ, পৌষ, ১৩৬৪

সম্পাদক : প্রফুল্ল রায়

॥ প্রেম-কথা ॥

আউনিং-এর প্রেম ... অমলেন্দু বসু ৫২৫

॥ উপন্যাস ॥

ছায়ানাটক ... দেবকুমার মৈত্র ৫৪২

বাসু ... সত্যেন্দ্রনাথ মৈত্র ৫৬৯

॥ প্রবন্ধ ॥

ইউরোপের ব্যালে নাচের ইতিহাস ... অতীন্দ্র মজুমদার ৫৩৬

ব্যক্তিস্বরূপ ও রাগ সংগীত ... প্রণবকুমার রায় ৫৪০

বিদেশী মুদ্রা-সংকট ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা ... সলিলকুমার সিদ্ধান্ত ৫৬২

॥ কবিতা ॥

ছোটো ছোট মেয়ে ... শিশিরকুমার দাস ৫৫১

তাসের ঘর ... নটিকেতা ভরদ্বাজ ৫৫২

উৎসমুখ ... বাসুদেব গুপ্ত ৫৫৩

দুঃখ-প্রতিমা ... শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫৫৪

শুধু দেখেই ... অমলকান্তি ঘোষ ৫৫৫

বন্ধু আকাশের ... অমিত্র মুখোপাধ্যায় ৫৫৬

সার্থক জনম বাগো ... সত্যজিত ঘোষ ৫৫৭

মা-কে ... অরুণাংশু দেব ৫৫৮

কবরের পাশে ... গোপাল ভট্টাচার্য ৫৫৯

কবিতাবলী ... উৎপলকুমার বসু ৫৬০

॥ চলচ্চিত্র ॥

পরশ পাথর ... জ্যোতিভূষণ ৫৭৬

লৌহকপাট ... চিত্রাঙ্গণী ৫৭৮

পথে হ'লো দেবী ... ঐ ৫৭৯

॥ গ্রন্থ-পরিচয় ॥

একালের চোখে ... কল্যাণ কর ৫৮১

“অন্তঃশীলা” ও “বৃত্ত” ... শবিত্র পাল ৫৮৩

প্রফুল্ল রায় কর্তৃক অগ্রণী প্রেস ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অগ্রণীর নিয়মাবলী

বৈশাখ থেকে চৈত্র হচ্ছে অগ্রণীর বছর। বছরের যে কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বছরের সড়াক টাঙ্গা ছ টাকার, চমাসের জন্য তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা বা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। মনিঅর্ডার কুপনে নাম টিকানা পরিষ্কারভাবে লিখবেন।

বাংলা মাসের শেষ-তারিখে অগ্রণী প্রকাশিত হয়। কোনো মাসের পত্রিকা নিয়মিত সময়ে না পেলেন, ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে পরবর্তী মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে জানাবেন—যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। টিকানার যে কোন পরিবর্তন বাংলা মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে আমাদের জানাবেন।

চিঠিপত্রে সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন।

ভালো গল্প ও কবিতা সাপরে গৃহীত হবে। অমনোনীত রচনা যদি ফেরৎ চান তবে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দেবেন। অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। পাকিস্তানের ডাক টিকিট পাঠিয়ে লাভ নেই, কারণ সেগুলি এখানে অচল। পাকিস্তানের লেখক-লেখিকারা নকল রেখে রচনা পাঠাবেন।

এজেন্সীর নিয়মাবলী

বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা এজেন্সি-গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এজেন্সির নিয়ম সংক্ষেপে হচ্ছে এই : কমপক্ষে পাঁচকপি নিতে হবে এবং কপিপিছু একটাকার হিসাবে জমা রাখতে হবে আমাদের কাছে। বিক্রয়ান্তে দান পাঠাতে হবে। বিশদ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

বিস্তারিতের জন্য পত্রালাপ করুন।

চিঠিপত্র, রচনাদি ও টাকাকড়ি পাঠাবার একমাত্র ঠিকানা :

কার্যাব্যয় : অগ্রণী

১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

মুতীকাপড় কাচায়

আমাদের পিওর ঢাকাই অদ্বিতীয়



॥ বসু সোপ ওয়ার্কস ॥

॥ কারখানা : চারু মার্কেট, নাকতলা, কলিকাতা-৪০ ॥

1364 Mugh.
Not Received
॥ ५८८ ॥



দশম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৬৪

সম্পাদক : প্রফুল্ল রায়

॥ প্রেম-কথা ॥

আউনিং-এর-প্রেম ... অমলেন্দু বসু ৬০৭

॥ উপন্যাস ॥

ছায়ানাটক ... দেবকুমার মৈত্র ৫৮৯

বাসু ... সত্যেন্দ্রনাথ মৈত্র ৬৩০

॥ প্রবন্ধ ॥

ইউরোপে ব্যালে নাচের ইতিহাস ... অতীন্দ্র মজুমদার ৬০০

রূপভারত সংস্কৃতি মৈত্রীর

একটি স্মরণীয় অধ্যায় ... এন, আনিকাইয়েফ ৬১৬

সংগীত ও সম্বাদার ... প্রণবকুমার রায় ৬৪০

১৯০৫ সালের ভারতীয় আন্দোলন

প্রসংগে লেনিন ... ই, কোমারক ৬৪৩

॥ কবিতা ॥

অজয়, আমার আবাল্যের নদীর তীরে ... মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৬১৮

শিয়ালদায় ... চিত্তরঞ্জন পাল ৬২০

কবিতাবলী ... শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৬২১

লীলাবতীদের উৎসর্গ ... মানস রায় চৌধুরী ৬২৩

সে এলো ... সোমনাথ মৈত্র ৬২৪

পাঁচটি কবিতা ... সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ৬২৫

॥ চলচ্চিত্র ॥

প্রিয়া ... জ্যোতিভূষণ ৬৪৬

রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত ... ঐ ৬৪৭

• : •

॥ গ্রন্থ-পরিচয় ॥

জুলা মাঠের ফসল ... কৃষ্ণ চক্রবর্তী ৬৪৮

প্রফুল্ল রায় কর্তৃক অগ্রণী প্রেস ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অগ্রণীর নিয়মাবলী

বৈশাখ থেকে চৈত্র হচ্ছে অগ্রণীর বছর। বছরের যে কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বছরের সড়ক চাঁদা ছ' টাকা, চমাসের জন্ম তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা বা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। মনিঅর্ডার কুপনে নাম ঠিকানা পরিকারভাবে লিখবেন।

বাংলা মাসের শেষ-তারিখে অগ্রণী প্রকাশিত হয়। কোনো মাসের পত্রিকা নিয়মিত সময়ে না পেলেন, ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে পরবর্তী মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে জানাবেন—যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। ঠিকানার যে কোন পরিবর্তন বাংলা মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে আমাদের জানাবেন।

চিঠিপত্রে সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন।

ভালো গল্প ও কবিতা সাদরে গৃহীত হবে। অনন্যোনীত রচনা যদি ফেরৎ চান তবে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দেবেন। অনন্যোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। পাকিস্তানের ডাক টিকিট পাঠিয়ে লাভ নেই, কারণ সেগুলি এখানে অচল। পাকিস্তানের লেখক-লেখিকারা নকল রেখে রচনা পাঠাবেন।

এজেন্সীর নিয়মাবলী

বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা এজেন্সি-গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এজেন্সির নিয়ম সংক্ষেপে হচ্ছে এই : কমপক্ষে পাঁচকপি নিতে হবে এবং কপিপিছু একটাকী হিসাবে জমা রাখতে হবে আমাদের কাছে। বিক্রয়ান্তে দাম পাঠাতে হবে। বিশদ বিবরণের জন্যে পত্র লিখুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য পত্রালাপ করুন।

চিঠিপত্র, রচনাদি ও টাকাকড়ি পাঠাবার একমাত্র ঠিকানা :

কার্যাব্যক্ষ : অগ্রণী

১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

মুতাকাপড় কাচার

আমাদের পিওর ঢাকাই অদ্বিতীয়



॥ বসু সোপ ওয়ার্কস ॥

॥ কারখানা : চারু মার্কেট, নাকতলা, কলিকাতা-৪০ ॥



‘চা’-শিল্পে অগ্রণী

ফোন :—২২১২০৪২-৪৩ (অফিস)

আলিপুর ৪০৩৩ (ফ্যাক্টরী)

এরিয়ান প্র্যাণ্টার্স এজেন্সী

(স্থাপিত ১৯২৫ সাল)

উঃ ভারতের বাছাই চায়ের রপ্তানিকারক
ভারত ও পাকিস্তানে অবস্থিত কয়েকটি চা-বাগিচার পরিচালক
চা উৎপাদক, নীলাম্রে ক্রেতা-বিক্রেতা, আস্থাদানকারী,
মিশ্রণকারী, এবং দেশবিদেশের ব্যাপারী

সভা : দি টি এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ; দি ক্যালকাটা টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশন ;
ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন ; ইণ্ডিয়ান টি প্র্যাণ্টার্স এসোসিয়েশন ;
ত্রিপুরা টি এসোসিয়েশন ; পাকিস্তান টি এসোসিয়েশন ; প্রভৃতি

কলিকাতায় আমাদের আড়তে প্রচুর পরিমাণে বিবিধ প্রকারের
চা মজুত থাকে (খুচরা চা বিক্রয় হয় না)

কোড :
একমি, বেটলি ও
প্রাইভেট

১, এজরা স্ট্রীট, কলিকাতা-১

কেবল :
‘এরিওপ্র্যাণ্টস্’,

সুতীকাপড় কাচায়

আমাদের পিওর ঢাকাই অধ্বিতীয়



॥ বসু সোপ ওয়ার্কস ॥

॥ কারখানা : চাকু মার্কেট, নাকডলা, কলিকাতা-৪০ ॥

অগ্রণীর বই

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'ষ্টালিন' তৃতীয় সংস্করণ চলছে।
ষ্টালিনের জীবনকাহিনী এত সুন্দর করে বাংলা ভাষায়
আর লেখা হয়নি। চমৎকার ছাপা বাঁধাই। তিনখানি
ছুরঙা ছবি। ৬।

অনুবাদগ্রন্থ : ম্যাকসিম গর্কীর লেখা ছোট ও বড় গল্প, ডায়েরীর
বাছাইকরা কয়েকটি অংশ, জবানবন্দী, একটি সম্পূর্ণ নাটক
ও কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন 'শিল্প ও সংগ্রাম' ৩।০

রমা'র বলা'র। আই উইল নাট রেস্ট-এর বাংলা 'শিল্পীর
নবজন্ম' ৫।

বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভেরকর ও ইউরোপের অদ্বাদ্য বিখ্যাত
কয়েকজন লেখকের গল্পসংগ্রহ 'বিদেশী গল্প' ২।০

লিও টলস্টয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনী ক্রুয়েটজার সোনাটার
বাংলা অনুবাদ 'রাহ' ২।

আধুনিক জার্মানীর শক্তিশালী লেখিকা আন্না সেঘেরসের
'সাবোতিয়ারস' ২।

আইডান ভুর্গেনিভের 'অশ্রমভী' ২।০।

ছোট গল্প : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিস্থিতি' ; ২।০

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বেদিয়া-ছন্দ' ২।

শান্তি দেবীর 'শাস্ত্রী' ১।০ ; সুবোধমোহন ঘোষের
'উৎস' ২।

নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের 'অপরিচিতার চিঠি' ২।

উপন্যাস : গুণময় মাল্লার 'লবীন্দ্র দিগার' ৪।০ ; মিহির
আচার্যের 'দিনবদল' ২। ; বৈষ্ণনাথ ঘোষের 'কল্লান্ত' ৫।

বরণকথা : ডঃ গৌরমোহন দাসের 'বহাযুদ্ধের পরে
মালয়' ২।০ ; রাহলের 'জনপদের ছন্দ' ৩।০

কবিতা : মায়াকভ স্কির কবিতা অনুবাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ
মৈত্র ২।০ ; এ'রই স্বরচিত 'আকাশের মুখ' ১।০ ; চিত্ত
ঘোষের 'অস্তরা' ১।০ ; রামেন্দ্র দেশমুখের 'জনসমুদ্র' ১।০

বিব্রিধ : সরোজ আচার্যের 'মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞান' ২।

অগ্রণী বুক ক্লাব

। ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬।

অগ্রণী

॥ দশম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৬৪ ॥

অমৃত-যন্ত্রণা

উদয়ন ঘোষ

অসুবিধে হচ্ছে ?

না।

মশারীটা তুলে দোবো ?

না, থাক।

কেমন লাগছে এখন ?

ভালো।

মাথার যন্ত্রণা নেই নিশ্চয় ?

না।

ঘুম আসছে না আর ?

আমি কি ঘুনোচ্ছিলাম এতক্ষণ ?

একটু ঘুমিয়েছিলে বোধহয়।

জানালাটা খুলে দেবে ? কেমন গুনোট হয়ে আছে ঘরটা !

ঠাণ্ডা লাগবে না ?

না, খুলে দাও। আমার পায়ের কাছে জানালাটা খুলে দাও।

আজান মাস এখন। ঠাণ্ডা হাওয়া। বরং বাতাস করি।

না, খুলে দাও। বলছি তো ঠাণ্ডা লাগবে না। কৈ উঠলে না ? —কথা

শোনো, নলিনী !

নলিনী ! এতদিনু পর স্রীর নাম ধরে ডাকল ! হ্যাঁ, স্রীর নাম ধরে ডাকল আদিনাথ। কেমন একটা ঝোঁক এসেছিল—শাসন করার ঝোঁক—যেমন ক্লাসে আসে। হুজুর লাষ্ট বেঞ্চে বসে অমনোযোগী হলে যেমন ক্লাসে ও নাম ধরে সামান্য চীৎকার করে—কিন্তু এতো ঠিক তা নয়। এতদিন পর নামধরে ডাকা। ভালো লাগে তো চাকতে। নলিনী। নলিনী উঠে পড়ল। স্বামীর মুখে নিজের নাম বহুদিন পর শুনে চমকে গেল। কী জানি অসুখ শরীর। এমনিতেই তো মেজাজ ভালো থাকে না। আধকাল নলিনী ভয় করে স্বামীকে। ভয়—তার মানে ঠিক ভয় নয়, তবে ঐ রকমের কিছু একটা। জানালা খুলে দিল নলিনী। এক ঝলক বাতাস এলো। আলো এলো।



এমনি করেই এলো যেন কোনোখানে তাড়া খেয়ে অপেক্ষা করছিল জানালা খুলে চুকে পড়ার জন্যে ।

খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল আদিনাথ । আলোটা নেতিয়ে পড়ে আছে । নরন সুতোর মত । সস্তা আরোগ্যলাভের ক্রান্তির মত চোখ মুখ বুজে নিথর হয়ে আছে । মনে হয় নিওলিথ প্রাণীর কঙ্কালের মত ব্যথির অন্ধ নির্জন ।

ভোর হয়েছে তাহলে ?

না, জ্যোৎস্না ।

জ্যোৎস্না ? এমন হয় ? ভাবল আদিনাথ ।

নলিনী এসে শুয়ে পড়ল । কিছুক্ষণ নড়েচড়ে স্থির হল ।

আদিনাথের ঘুম এলো না ।

ও জানালার দিকে তাকিয়ে রইল । তাকাবার জন্যে নয় । ও যেভাবে শুয়ে আছে তাতে জানালার দিকে তাকাতেই সুবিধে । আদিনাথ দেখল যে-গাছটা দূরে ছিল সেটা যেন সরে এসেছে । প্রত্যেকটি পাতা দেখতে পাচ্ছে । পাতার মধ্য দিয়ে কালো ডাল আরো কালো পাতা দেখছে । শব্দ শুনতে পাচ্ছে । অল্প অল্প নড়াচড়ার শব্দ শুনছে । দেখছে জ্যোৎস্নার আলোয় চকচক করছে পাতাগুলো । চকচক করছে কুয়াশার । অদ্ভান মাসে কুয়াশা পড়ে বুঝি !

কি জানি ! আজকাল ওর সব যেন ভুল হয়ে যায় । এই তো সৈদিন ক্রাসে কিছুতেই বলতে পারল না লিবিয়ার নতুন রাজধানীর নাম । আরেকদিন ভারতবর্ষের জলবায়ু পড়াতে গিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর কথা বলে বসল কিছু কিছু । ক্রাস নাইনে ইংরেজি ট্রাটরিয়ল ক্রাস নিতে গিয়েও কোনকথার থেকে জানি সক্রেকটিশের সাংসারিক জীবন টেনে আনল অথচ তাঁর স্ত্রীর নাম মনেই পড়ল না—কি যেন নামটা ? জ্যানথিপি ? তাই তো ? না প্রোসারপাইন ? প্রুটোর স্ত্রী না ?...না থাক বেশি মনে করতে গেলে যদি আবার মাথা ধরে ! এককালে কিন্তু ও চমৎকার এক তালিকা মুখস্ত করেছিল । খ্রিওপ্রাকী ট্রেইনিং নেয়ার সময় সেই বন্ধুটির কল্যাণে—যে বাংলা পড়ত—এখন কোথায় সে ? প্রফেসরি করেছে ? আশ্চর্য, কতকাল তার খবর রাখে না । তালিকা কী যেন ।—অস্মৃত কিন্তু ! দেবস্থানীয় ব্যক্তি বা বস্তুর পত্নীদের নাম—এখনও বুঝি কিছু কিছু মনে আছে—নিদ্রা কালাগ্নিরুদ্ধদেবের, যত্ন ও জরা প্রথরের, ঐতি ও তন্ত্রা স্বথের, শ্রদ্ধা ও ভক্তি বৈরাগ্যের, ক্ষমা যোমের—ক্ষমা যোমের—তাইতো ? তার পর ? তার পর উক্তি সত্যের, দক্ষিণা যজ্ঞের, স্বাহা বহির—স্বাহা—না থাক, আবার মাথা ধরতে পারে ।

বিপদে পড়েছিল সেইদিন যেদিন কন্সট্যান্টিনোপল্ উচ্চারণই করতে পারল না—একজন ছাত্র শুদ্ধ করে না দেয়া পূর্বস্তু—কী সব বলছিল : কন্সট্যান্টিনোপল্-কন্সট্যান্টিনোপল্—কী যেন ঠিক শব্দটা ।

কন্স-কন্স-কন্স-...যাক, আবার যদি মাথা ধরে !

আদিনাথ একবার দেহটাকে নড়াবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না । পারল না

বুঝতে ওর মাথা ধরা আছে কিনা ! মনে হয় ও যেন মাথার উপর নির্ভর করে আছে । দেহের সব জোরটুকুন মাথায় এসে জমেছে যেন ! বাকী শরীরটা হালকা—ভেজা ঝাকড়ার মত স্থির—তুলোর মত স্থবির—ওজন নেই সামান্যতম ওজন নেই শরীরে । ওকি তুলো হয়ে গেল ?

কেনই-বা হবে না, বয়স তো কম হল না, পঁচিশ বছর ধরে সংসার করছে সে কি রকম সংসার, যেন হানেডুড মিটব্‌স্‌ রেশের মত ছুটেতে হয়, কানের ছ'পাশে নীলরগহুটো আহত কৈনাছের মত মিনিটে মিনিটে লাফিয়ে ওঠে, কি করছি কোথায় ছুটছি, কেনই-বা ছুটছি, বোধের মধ্যে আসে না এসব । ছোট্ট বন্ধ করা হলে মনে হয় সব কিছু মুখে রক্ত জমে ওঠে । কমলালেবুর আশ্বাদ ভালো লাগে, পাতুটো আলাদা হয়ে যায়, ওর কী এখন তাই মনে হচ্ছে ?

তবে তো সংসারের কাজ শেষ হয়ে এলো । বিশ্রাম, বিশ্রাম চাইছিল এক সময়, এই তো বিশ্রাম, শুয়ে শুয়ে একমাস ধরে নানান অস্বস্তির মধ্যে কখনো কখনো ঘুনিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে বেশ বুঝতে পারে, এটা ওর বিশ্রাম হচ্ছে ।

উদয়াস্ত খেটেছে এতদিন । স্কুলে পরপর ছটি পিরিয়ড, একটানা আবেল তাবোল বলে গেছে । সকালে ট্রাশনি, বিকেলে-সন্ধ্যায় ছ'জায়গায় ট্রাশনি ; মনেই হয়নি কী করে কাটছে দিনগুলো । এমন দিন ভালো লাগে কিনা । লোকে বলত, আপনি বেশ খাটতে পারেন আদিবাবু । নলিনী বলত, এবারে একটু বিশ্রাম নাও । ইদানিং বড় ছেলেটা বলতে শুরু করেছিল, এ-বয়সে আপনার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন, সকালের ট্রাশনিটা ছেড়ে দিন । এখন আমিও তো ছুটো করছি । আত্মীয়েরা বলতেন, এবারে ছেলেরা বড় হল, আর ভাবনা কী খেটে খেটে তো শরীর পাত করেছ ধরে বসে একটু বিশ্রাম নাও এখন ।

কিন্তু কেমন বিশ্রাম ওরা চাইত, ঠিক বুঝে উঠতে পারত না আদিনাথ । সকলেই জানে জমানো টাকা কিছু নেই ওর । পোস্টঅফিসে শ'দুয়েক ছিল বুঝি । এখন হয়ত তাও নেই । বলার মধ্যে আছে পঁচহাজার টাকার লাইফ-ইনসিওর—সেটাও ওর বর্তমানে আসছে না—সুতরাং কিরকম বিশ্রাম নেবে ? বড় ছেলেটা এবার বি এ দেবে, পাশ করে স্কুলে ছাড়া আর কোথায় চাকরী পাবে ? তাও আম্রকাল ট্রেইন্ড্‌ প্র্যাক্‌জুয়েট চায় সবাই, নেজটাকে এল, সি, পড়ানোর ইচ্ছে, এত অমনোযোগী পাশ করলে হয় এল, সি । আদিনাথের কী এখন বিশ্রাম নেবার সময় ?

তবু তো বিশ্রাম ওকে নিতেই হল । শরু অসুখ ওর কোনোদিনই হয়নি । ছেলেবেলায় হয়েছিল বুঝি, ভালো করে মনে নেই, কিছুই মনে নেই মাঝে মাঝে মনে হয় । ও যেন জন্মিয়েই চাকরী করছে, নলিনীকে দেখছে, ছেলেদের মানুষ করতে হচ্ছে, এতবড় একটা সংসারকে সামলাতে হচ্ছে—এদিক ওদিক দিয়ে কিছু টাকা বেরিয়ে গেলে মাসের শেষে ধার করতে হচ্ছে, একটা বিজী•উৎকর্ষার মধ্যে ক্রান্তির মধ্যে থেকে তো তবু স্বাস্থ্য ওর ভালো । অস্ত্রত পোশাকপরিচ্ছদ একটু চকচকে হলে স্কুলটিচার বলে মনেই হয় না ।

বয়স তো কম হল না । তেল না মাখলে শীতকালে আম্রকাল গাঁ ফাটে । ঘন

ঘন মাথা ধরে। চোখের কোনছটো জ্বালা করে। শক্ত কিছু চিবোতে ইচ্ছে হয় না। রাত্রে ফিরবার সময় ভিডটা ভেজাগামছার মতো লাগে। সকালে বিছানা থেকে উঠবার সময় কোমরটা জমে আছে বলে মনে হয়। মেরুদণ্ডটাও লোহার মত শক্ত লাগে। ওদিকে মাথার চুল অর্ধেকের বেশি শাদা। দাড়িগুলোও আর গোটা কয়েকমাত্র কালো আছে। খুতনিতে ভাঁজ পড়েছে। চোয়ালে মাংস কয়ে এসেছে। তবু সকাল থেকে সন্ধ্যা এমন করে ছুটতে হয়েছে অসুবিধে কোথায় ঠিকমত বোঝেনি। ইদানিং শুধু স্কুলে টিফিনপিরিয়ডের আগে চোখ জুড়ে ঘুম এসেছে। পড়াতে পড়াতে ভুলে গেছে কী পড়াচ্ছে। অথবা বকাবকি করতে হয়েছে ছেলেদের। এসব সম্বন্ধে কোনোদিন ভাবেনিতো, এত ভাড়াভাড়া নাসখানেকের জন্মে ওকে বিশ্রাম নিতে হবে।

ওতো অসুস্থ তবে বারবার বিশ্রামের কথা তুলছে কেন? ওকি অসুস্থ সত্যি সত্যি? মনে হচ্ছে যেন, ও এতদিন সুমোচ্ছিল, এইমাত্র জেগে উঠল—হালকা হালকা, তুলোর মত হালকা, নড়তে পারছে না, চেঁচা করেও নড়তে পারছে না। চেঁচা করেছে কি? চেঁচা করলে নড়তে পারবে না কেন? ওতো সত্যি সত্যি আর তুলো হয়ে যায়নি!...এই ভালো, এই যে নিখর হয়ে আছে, একটু নড়লে যদি আবার মাথা ধরে, আচ্ছা নড়ুক একটু ও, এইতো নড়লো।

কিন্তু সত্যি সত্যি নড়লো না আদিনাথ।

ঘরের ভিতর জ্যোৎস্নার গাদা ছায়া ফিকে হয়ে গেল ততক্ষণে! আর আদিনাথ ভাবতে লাগল চুপি চুপি, কেঁপেওঠা কাকে বলে। ওকি কোনোদিন আর কেঁপে উঠবে না। এই আজ নড়তে পারছে না, চেঁচা করেও নড়তে পারছে না, এটা কোনো নতুন রোগ নয়ত। ও যে শুনেছিল এককালে, বুড়ো বয়সে বহুদিন একভাবে বিছানার স্তরে থাকলে স্নায়ুগুলো মরে যায়। মনে পড়ল, ওর সহকর্মীও বলেছিল, হঠাৎ বিশ্রাম নেবেন না যেন, আমার স্বপ্নরমণাই হঠাৎ বিশ্রাম নিতে গিয়েই তো প্যারালিসিস্ বাধিয়ে বসলেন।

প্যারালিসিস্। কাকে বলে প্যারালিসিস্?

এখন শরীরটা ভালো লাগছে, হালকা হয়ে গেছে, বহুদিন পর সোয়াস্তি এসেছে বলে ক্লান্ত লাগছে, অলস হয়েছে তাই পারছে না, নইলে ইচ্ছে করলে কি ও নড়তে পারে না? একটা কথার মতো কথা হল?—বেশতো নড়ুক একটু ও, এইতো নড়ল।

তবু নড়ল না আদিনাথ।

মনে মনে ঘামতে লাগল। চোখের পাতা ঠাণ্ডা লাগল। নাকের ডকা শীত শীত করে উঠল। কপালটা হিম হয়ে গেল। কোমরটাও ভেজা।

আদিনাথ জানালা দিয়ে গাছটার দিকে চাইল একবার। বেশ তো গাছটা। যেন স্নান সেরে এইমাত্র সুখে একটু কেঁপে উঠল। সুখেই আছে। মরবার সাধ হয় না। চিন্তা করতে হয় না। সমাজ নেই। সংসারের দায়িত্ব নেই। ও যে স্নান থেকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, নড়তে পারছে না, তার জন্মে হতাশা নেই, ও যে কিছু জানে না পৃথিবীর তার জন্মে আপসোস নেই, নিশ্চিন্তে বিজ্ঞের মত মাথা

নাড়ছে, কাঁপছে, নিঃশ্বাস নিচ্ছে, ও যে ঝড়ে যে-কোনো সময় পড়ে যেতে পারে দৌড়ে অন্ত্র আশ্রয় নিতে পারবে না তার ভয়েও অক্ষিপ নেই.....

ও যেন পরের জন্মে গাছ হয়ে জন্মায় ।

মানুষ যতো জন্মায় না । হয়ে যায় । ভাবল আদিনাথ, এই যে ওর সন্তানেরা আসছে এরা তো জন্মায়নি । এদেরকে তো চায়নি ও । ওরা রূপ পেল কোথায় ? পেল কোথায় চিন্তা ভাবনা দেহ ? ওরা তো এসব দেয়নি, ওরা এসব পাবে কোথেকে ।

অথচ বেশ তো মনে নিয়েছে সন্তানদের দেহগুলো । মিলিয়ে দেখেনি । ভাবতে বসেনি । নিতান্ত চেনা বলেই মনে হয়েছে ওদের । ওদের কাছে কি আশা করতে পারে আদিনাথ । কেনই-বা ওকে সাহায্য করতে যাবে যদি ও সত্যি সত্যি নড়তে না পারে ? ওদেরকে পৃথিবীতে এনেছে বলে, মিথ্যেকথা, আনেনিতো, এমনি এসেছে ওরা—না এসে উপায় নেই বলেই এসেছে—মাথা ভার হয়ে এলো আবার । আদিনাথ তবু মাথা তুলে একবার পরখ করতে পারল না ।

ও তবে সত্যি সত্যি নড়তে পারবে না ? চেষ্টা করলেও । ঐ গাছটার মতো হয়ে যাবে ? এই যে এতদিন স্কুলে গেছে, ট্রান্সনি করেছে, সংসার সামলিয়েছে, সামাজিকতা করেছে, সব বন্ধ হয়ে যাবে ? এমনিতেই তো একমাস পড়ে আছে বলে ছোটো ট্রান্সনি চলে গেছে, স্কুল থেকে জানিয়েছে পরের মাসে লিভ নিতে গেলে উইদাউট পে-তে নিতে হবে ; আর কেন সবই তো শেষ হয়ে গেল । এই তো ভালো । শুয়ে থাকবে । নড়বে না । বিশ্রাম নেবে । এতদিন খাটল এবার চুপচাপ অবসর নেবে । শুয়ে শুয়ে থাকবে । ভালো ভালো জিনিস থাকবে । যতদিন বেঁচে থাকে খেয়েই যাবে । খাওয়াটাই ভালো লাগে । দাঁতের কাঁক দিয়ে রস ঝরবে, ছিভের ওপর দিয়ে আশ্বাদ বয়ে যাবে, গলা দিয়ে নামবে, কাভিকমাসে কেটো থাকবে, অম্রানে ফুলকপি দিয়ে কুইমাছ, মাষে শৈল মূলো, আষাঢ়ে খিচুড়ি ইলিশভাজা ; নলিনী রান্না করে ভালো ।

কিন্তু চট করে একদিন যদি মরে যায় । মরে যাবে ? মরতে তো হবেই একদিন । কী আশ্চর্য, ও মরে যাবে একদিন । আস্তে আস্তে বোধ থাকবে না । ঠাণ্ডা হয়ে যাবে । মরাই ভালো । ভালো লাগে কী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রাসে বকতে । ভুল হয়ে যায়, মনে থাকে না, ইচ্ছে করে না কথা বলতে—মরাই ভালো । কাঁটার মত উৎকর্ষকে গলায় চেপে আর হাঁটতে হবে না, ছেলেরা মানুষ হচ্ছে কী হচ্ছে না তার জন্তোও ভাবতে হবে না । ওর কী যায় আসবে ? এই এখনি যদি আস্তে আস্তে মরে যায়, শীতের পাখির মত যদি হিম হয়ে যায়, তবে কার কী যায় আসবে ; সব ঠিক চলবে, স্কুল বসবে ঠিক সময়, কোনোকিছুর অগ্রাধা হবে না । সুতরাং মরাই ভালো ।

পঞ্চাশ সালের কথা মনে পড়ল । তেরশ পঞ্চাশ সাল । কলকাতায় পথে ঘাটে যখন চোখের সামনে মানুষ মরত, এই আদিনাথ কত মানুষকে মরতে দেখেছে, একদিনের কথা মনে আছে ; অন্ধকার গলি, কীসের জন্তে যেন অন্ধকার ব্র্যাকআউটের রাত বোধ হয়, তখন ব্র্যাকআউট ছিল নাকি ? কি জানি, যাহোক গলিটা বেশ অন্ধকার, আদিনাথের পায়ে কী যেন ঠেকল, ভারীমতন একটা বস্তু মনে হল, ঠাণ্ডা একটা বস্তু,

পরে নজর করে দেখল একটা কালো যুতদেহ। আশ্চর্য কিছুই মনে হয়নি, যেন একটা সহজ ঘটনা, বিচিত্র নয় ঘটনা, সত্যি তো বিচিত্রের কী আছে, সবাইকেই মরতে হয় একদিন।

পঞ্চাশ সালেও একথা ভাবত আদিনাথ। হাতে তখন ট্যাশনি নেই। স্কুল থেকে ঠিক মত মাইনে পাচ্ছে না, জিনিসপত্র দামের জন্তে ছোঁয়া যায় না কিন্তু তখন তো ভেঙে পড়েনি আদিনাথ, ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারত, কত কে কতরকম ভাবে পয়সা করে খাছিল কিন্তু আদিনাথ মেনে নিয়েছিল দুর্ভোগকে। কেন মেনে নিয়েছিল? সংগতি ছিল না বলে? বুদ্ধি ছিল না তাই?

কিন্তু খোঁজ করেছিল আদিনাথ। তাইতো চুনিলালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে সময় হিসেব দেখত চুনিলালের দোকানের। চিঠিপত্র লিখে দিত। এখন ওরই মেয়েকে পড়ায়। বিকেলে। পায় ষাটটাকা। সেটা এখনো যায়নি। বহুদিনের চেনা বাড়ি। যুদ্ধের সময় অনেকবার সামলিয়েছে চুনিলালকে। আচ্ছা, ওরা তখন কি ভাববে? আদিনাথ রায় বি, এ, বি, টি; জিওগ্রাফী ট্রেইন্ড, প্যারালাইজড।

ফাদার এক্সপার্মার্ড—কাকে তার করবে খোকন? ওর মামাকে? সেই ভালো।

ও কি সত্যি সত্যি মরে যাবে! এত সব ভাবছে কেন! অসুখ হলেই তো আর মরে না, তবে তো নলিনীও মরত, ওর চেয়েও খারাপ অবস্থা হয়েছিল, তিনমাস বিছানায় ছিল। একগোছা চুলের মত পাতলা কালো হয়ে গিয়েছিল নলিনী। বিজী লাগত। ভয় করত দেখতে। ওকি তখন ভাবেনি নলিনী মরে যাক।

তবু নলিনীর জন্তেই তো উদয়াস্ত খাটতে লাগল, সেই থেকেই তো খাটছে আরো টাকা কী করে হয়, নলিনীর চিকিৎসার খরচ কী করে ওঠে, তার জন্তেই চার-চারটে ট্যাশনি আরম্ভ করল, স্কুলে ওভারটাইম খাটতে লাগল লাইব্রেরীতে, সেসব কী দিন গেছে।

আজ এতসব ভাবছে কেন ও।

আচ্ছা, এবার একটু নড়বার চেষ্টা করুক তো, এই তো নড়ল—না, না, ওটা ডুল, কৈ নড়ল? এত ক্লান্ত হয়ে পড়ল কেন। নিজের দেহটাকেও নড়াতে পারছে না। ও কি একটু সুমাবে? সুমিয়ে পড়ুক। যাতে আর জাগতে না হয়। জাগলেও যেন অন্তরকম করে জাগে। এই বিছানায় নয়। নলিনীর পাশে নয়। নলিনীর স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। নলিনীর পাশে নয়। ও আর তবে জাগবে না। অনেক কষ্ট পেয়েছে জীবনে.....

ছমিনিটের জন্তে নিশ্চয় হয়ে আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

শোকসভা হবে। স্কুল ছুটি হবে একদিন। কালোকালো পিঁপড়ের মত ছেলেরা বেরিয়ে পড়বে গেট থেকে। জিওগ্রাফী রুমে একটা ছবি টানানো থাকবে। সেই ভালো.....

আদিনাথ দেখল ঝড় উঠেছে মাঠে। ঝাঁড়িয়ে আছে ও। মেঘগুলো ঘন হয়ে ধেয়ে আসছে ওর দিকে। ও পালাতে পারছে না। পালাতে পারছে না।

কেন ? ওর চোখের সামনে দিয়ে পুরোনো বইয়ের একরাশ পাতা উড়ে গেল, ধরতে পারল না, চেপ্টা করেও পারল না। ভালোই হল উড়ে গেছে, উড়ে যাক, পুরোনো বইয়ের গন্ধে নিঃশ্বাস বিরক্ত হয়, কিন্তু ওকি কোনোদিন আর লাইব্রেরীতে বসতে পারবে ?... ওর দেহের ওপর দিয়ে আরেকবার একমাঠ মেঘ উড়ে গেল, ঝড় পাকিয়ে উঠেছে, ভারি ধাক্কা দিচ্ছে। আদিনাথ নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, নড়তে পারছে না, একমুঠো ধুলো কে যেন ছড়িয়ে দিল ওর নাকের কাছে, ওকে এভাবে সবাই মারতে চায় কেন ? ও পালিয়ে বাঁচুক কিন্তু নড়তে পারছে না যে। কে যেন ওকে টেনে রেখেছে, পা ছুটো ছোড়া লেগে গেছে, কে যেন শুধে নিচ্ছে ওর দেহের থেকে বোধ সোয়াস্তি স্মৈর্ষ। আদিনাথ একবার চারপাশ তাকালো। তখনি বুঝল শীরর দিয়ে বুঝল, ও একটা গাছ হয়ে গেছে, নিরশির করে উঠল, ভারি মনে হল মাথাটা, ছড়িয়ে পড়ল এত পাতা ? এত অস্বস্তি। শুধে নিচ্ছে ওকে ?

গাছ ? প্রচণ্ডভাবে দোলা অনুভব করল আদিনাথ : যেন এখনি ফেটে যাবে ও, চীৎকার করল, কে শুনবে এই নাঠে, এ-মাঠে, সূর্য নেই, এ-মাঠে আলো নেই, এ মাঠে ঘাস নেই কোথাও, বাড়ি নেই মানুষ নেই ; সেই মানুষ, ছুটি সুন্দর পা, ছড়ানো বুক পুতনি, নাক, চোখ, অমন একটা মাথা : চিন্তা করে, ভাবে—কেমন তার দেহের তাপ কী অপরূপ তার শরীরের গন্ধ।

পাখির বাসার ওনোট গন্ধ পাচ্ছে আদিনাথ। ও তবে এখন কী করবে ? ঝড় উঠছে—দৈত্যের মতো ঝড় উঠছে, আবার এক প্রকাণ্ড দোলা অনুভব করল আদিনাথ, কোমর ভেঙে পড়বার উপক্রম হল...

এমন কি কেউ নেই যে ওকে সাহায্য করবে ? কে যেন আসছে তুলে তুলে, হাওয়ার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না, মানুষ না ? আশুক, আরেকটু কাছে আশুক।

শোনো, কে তুমি ? আমাকে একটু সাহায্য কর, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাও, শোনো, শুনছ ?

শুনলো নাতো ! খোকন না ?

উত্তেজনায়ে কেঁপে উঠল আদিনাথ।

খোকন, আমি তোমার বাবা, এই যে, এদিকে তাকাও, আর পারছি না খোকন, দম বন্ধ হয়ে আসছে, এখনি ভেঙে পড়ে যেতে পারি, আমাকে তুলে নিয়ে যাও, বাড়িতে নিয়ে চলো। তবু শুনল না ! কিন্তু ঐ আবার আসছে।

এসো, এসো, এদিকে এসো। হ্যা, হ্যা, এই গাছটির নিচে। চিনতে পারছে না ?

কৈ চিনলো তো ঠিকই, ঠাঁড়ালো, তবু কিছু করছে না কেন ?

খোকন, আমি তোমার বাবা, ধরে নিয়ে চলো, দোহাই ধরে নিয়ে চলো আমাকে, তবু শুনছে না—তবে দাঁড়িয়ে আছে কেন ?

হঠাৎ আদিনাথ বুঝল ঝড়ি পড়ছে। ঠাণ্ডা ঝড়ি। চোখের পাতায় অস্বস্তি লাগে। তবু ও ভিজছে না। নাঠ ডুবে যাচ্ছে। খোকনের পায়ের পাতা ডুবে

গেল, ডুবুক এত ডাকছি তবু শুনছে না, আমাকে নিয়ে যাচ্ছে না, ডুবুক, রান্টি পড়ছে বলেই তো আমার নিচে আশ্রয় নিতে হল, ডুবুক, সেকি কোমরও যে ডুবে যায়।

আদিনাথ দুর্বল হয়ে পড়ছে। ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। ডুবুক, ডুবে যাক, চওড়াকাঁধ, দুটো পা নিয়ে বড়াই করে খোকন...

আদিনাথ চোখ বেলল মাঠে। নিশ্চিন্ত বিপর্যয়ের মধ্যে মানুষ যে-ভাবে হাত-পা ছেড়ে দেয়। ওর চোখদুটো ঝাপসা কেন?...অতো বড় একটা পাখি গাছের ডালে বসে কী করছে? ভালো করে তাকালো আদিনাথ। ঈগল পাখি। সে তার বিরাট ডানা মেলে দিয়েছে। ডানার নিচে ব্যাঙের ছাতার মতো ছাই-রঙা শাবক। যুঁয়ে বুদ্ধি ওরা। ঈগল পাখির ডানা যুঁয়েছে। তার নিচে পরিপাটি ঘূমের মধ্যে ঈগলছানা এইমাত্র বুদ্ধি গোলাপজামের গন্ধ পেল।...

এ তবে কোন ঈগল? যে ছিনিয়ে আনে লাখ লাখ ইঁদুরের ছানা, পাখির ডিম, বাসা, খরকুটো? না, না, ও তবে ঈগল হোক।

মোচড় দিয়ে উঠল নতুন জন্ম। মাঠ তখন ডুবে গেছে। আদিনাথ চীৎকার করে তার দুটো হাত ডুবিয়ে দিল জলে।

পেল না কাউকে।

ওর খোকন তবে ডুবে গেল। এ মাঠ তবে ভেসে যাবে। ও যে ঈগল হতে চেয়েছিল?

কেমন অসহায় হয়ে গেল আদিনাথ। তবু খুঁজে পেল না! ওর হাত অবশ হল, পা অবশ হল। চীৎকার অবশ হল।

ও যখন ভাবল ও ঠিক মরে গেছে। ও গাছ হল না। ঈগল হল না। মরে গেল শুধু। সে সময় ওর ঘূম ভাঙল আন্তে আন্তে।

ঘূম ভাঙল অম্বানের রোদের মধ্যে। বিছানায়। নলিনীর পাশে।

ওর মনে হল ও যেন একটা ছোট শিশু। কচি চোখদুটোর তাই রোদ স্পষ্ট হল না।

আদিনাথ আবার ঘুমালো। নলিনীর দেহ থেকে গরদশাড়ির গন্ধ নিয়ে। নতুন সোয়াস্তিতে কয়েকবার পায়ের পাতা বিছানায় ঘসে নিয়ে।

খোকনের স্বর উঠল বারান্দায়।

তাহলে এইবার সঠিক ঘুমাবে আদিনাথ।

সিপাহী বিদ্রোহ

পি. শাস্তিৎকো

। ১৮৫৭-৫৯ সালের ভারতীয় বিদ্রোহ সম্পর্কে রুশ জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া ।

ভারতে এক গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছে—এই বর্ষে প্রথম সংবাদটি রুশদেশে এসে পৌঁছায় ২৭শে জুন, ১৮৫৭ তারিখে। লণ্ডনস্থ রুশ রাষ্ট্রদূত সেন্ট পিটার্সবুর্গে টেলিগ্রাফযোগে মীরাটে বিদ্রোহের সূত্রপাত ও বিদ্রোহিগণ কর্তৃক দিল্লী দখলের সংবাদ প্রেরণ করেন। সেই একই দিনে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স গোরচাকফকে একটি স্মারকলিপি লিখে পাঠান এবং সেই সঙ্গে লণ্ডনের সংবাদপত্র-পত্রিকাগুলির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে পাঠান। লণ্ডনস্থ রুশ সামরিক প্রতিনিধি কর্নেল ইগনাতিয়েফও ঘটনাবলীর এক বিস্তৃত বিবরণ পাঠান।

ইগনাতিয়েফ লেখেন : ‘ভারতের এই অভ্যুত্থানটি কোম্পানীর বিরুদ্ধে কয়েকটি দেশী সেনাবাহিনীর একটি আকস্মিক বিদ্রোহ নয়। এ হল এক ঘৃণ্য বিদেশী জোয়াল থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেবার কামনার প্রকাশ।’ ইগনাতিয়েফের ধারণা অনুযায়ী, এই বিদ্রোহের কারণগুলি নিহিত ছিল ‘কার্যপরিচালক কর্মচারীদের দুর্নীতি ও কোম্পানির সর্বপ্রাসী লোভের’ মধ্যে। ইগনাতিয়েফের অভিমতে, আল অফ ডালহৌসির অসুস্থত ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্পর্কে কোম্পানির নীতি থেকে এমন কি ‘ভারতের সামন্ততান্ত্রিক নেতারাও’ একথা উপলব্ধি না-করে পারেননি যে ‘ইংরেজ বণিকদের নাগালের মধ্যে যতো সুবিধাজনক জমি রয়েছে সে-সমস্তই তারা আত্মসাৎ করে নেবে হুদিন আগে অথবা পরে।’

লণ্ডন থেকে পাওয়া এই রোমাঞ্চকর সংবাদ রুশ সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশের ফলে রুশদেশের জনমত জ্বলন্ত হয়ে উঠল। উদার মতাবলম্বী পত্রিকা ‘পিভুভুনি সমাচার’ (‘ওভেচেস্‌ভেনিয়ে জাপিস্কি’) ঘোষণা করল—‘আজকের রাজনৈতিক জগতে ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বা আগ্রহজনক কোনো প্রশ্ন নেই বললেই চলে। ভারতবর্ষের খবরাখবরের জন্তে পাঠকসাধারণ অর্ধেক হয়ে অপেক্ষা করে থাকে। সংবাদপত্রগুলির শিরোনামায় সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা সৃষ্টি করে।’ পাঠকদের উদ্দেশ্য করে ‘রুস্কি ভেস্‌নিক’ পত্রিকাটি লেখে—‘ভারতের ঘটনাবলী বর্তমানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত পাঁচ মাস ধরে সমস্ত ইউরোপের দৃষ্টি ভারতের উপরে নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে।’

এই বিদ্রোহ সম্পর্কে রুশদেশের মনোভাব-দৃষ্টিভঙ্গী কি, সে সবকিছু সংবাদপত্র ও পত্রিকাগুলিতে রীতিমত বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। রুশ সংবাদপত্রগুলি এ-সম্পর্কে অধিকাংশ খবরই ইংরেজি সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করত বলে রুশ জনসাধারণের পক্ষে বিদ্রোহের কারণগুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করে ওঠা সহজ ছিল না। শুধু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলিরই নয়, এমন কি বিভিন্ন লেখকেরও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে-স্ববিরোধিতা ও অস্বচ্ছতা ছিল, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই অবস্থা থেকেই।

এই বিদ্রোহ সম্পর্কে একমাত্র রুশ বিপ্লবী-গণতন্ত্রবাদীদের মধ্যেই স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট স্বচ্ছ অভিমত ছিল বলে দেখা যায়। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীটি অভিব্যক্তি পায় এন, এ. দোব্রোলিউবফের লেখা ‘ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইতিহাস ও সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি অভিমত’ প্রবন্ধে। রুশ গণতন্ত্রীদের মুখপত্র ‘সমসাময়িক’ (‘সোব্রেনেমেনিক’) পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। রুশ বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা, লেখক ও দার্শনিক এন, জি, চের্নিশেভস্কি আনন্দের সঙ্গে মন্তব্য করেন যে ‘প্রবন্ধটি সত্যি সুলিখিত।’

দোব্রোলিউবফের নিবন্ধটি একটি কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুপরিণত একটি ধারণা। এই প্রবন্ধে বিদ্রোহকে বিচার করা হয় একটি আকস্মিক অসন্তোষ-বিস্ফোভের প্রকাশ হিসেবে নয়, ‘ইতিহাসের দিক দিয়ে একটি প্রয়োজনীয় ঘটনা’ হিসেবে। বিদ্রোহের কারণগুলি সম্পর্কে দোব্রোলিউবফ তাঁর অমুশীলনের কাজ শুরু করেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরাট শোষণ-যন্ত্রের প্রত্যেকটি নাটকীয় অমুসন্ধানের দ্বারা ; যে শোষণযন্ত্রের নারফতে দস্যুর ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রমনা, দোকানদারের লোভের সমন্বয় ঘটেছিল।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও উদ্ভোগী বণিকদের একটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান কিভাবে একদল বণিক-দুর্বৃত্তের গোপনিত একাধিপত্যে পরিণত হল—তার ইতিহাস দোব্রোলিউবফ সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠভাবে চিহ্নিত করেন। যে-সমস্ত ঐতিহাসিক ও সাংবাদিক সরল নির্বুদ্ধিতা বশে অথবা ভণ্ডামী করে ইংরেজদের ‘সভ্য করে তোলা’র ভ্রাতের কথা বলছিলেন, তাঁদের বক্তব্যগুলিকে তিনি সরাসরি খণ্ডন করেন। দোব্রোলিউবফ লেখন, ‘ইংলণ্ডের চরম লক্ষ্যটি হল রাষ্ট্রীয় ও বক্তিগত মুনাফা—সভ্যতা নয়।’

যাঁরা এই বিদ্রোহকে ‘ধর্মাত্ম হিন্দুদের’ এক ধর্মীয় বিদ্রোহ হিসাবে, অথবা স্বৈচ্ছাচারী সৈনিকদের বিদ্রোহ’ হিসেবে না-দেখে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আবৃত্যাপী জনগণের মুক্তিযুদ্ধ হিসেবেই দেখেছিলেন, দোব্রোলিউবফ এই বিদ্রোহের বিচার-বিবেচনা করবার সময় তাঁদের পক্ষ গ্রহণ করেন। তিনি এ-কথা বুঝতে পারেন যে ‘...জনগণ বিদ্রোহ করে, কারণ তারা শেষ শরশস্ত্র ব্রিটিশ শাসনের সংগঠন-ব্যবস্থার মধ্যেই শয়তানির স্বরূপটিকে ধরে ফেলে।’

সেই সময়ে ‘রুস্কি ইন্বালিদ্’ সংবাদপত্রে রুশদেশের সরকারী মনোভাবটি প্রকাশ পেত। এই পত্রিকায় ভারতের ঘটনাবলীর নিয়মিত ও সর্বাদীন বিবরণ প্রকাশিত হয়। ১৩ই অক্টোবর ১৮৫৭, তারিখে এই সংবাদপত্রে সের্গেবের্গ লিখিত ‘পূর্ব ভারতীয় ঘটনাবলী’ নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ-লেখকের সহানুভূতি ছিল সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় বিদ্রোহীদের পক্ষে : ব্রিটিশসিংহ অশ্রাব্য রাষ্ট্রের রান্ননৈতিক দেহটিকে খানচিয়ে ধরতেই অভ্যস্ত। এখন ভারতবর্ষ সম্পর্কে হয়তো তার এই দুর্দান্ত অভ্যাসটিকে সংবরণ করতে হবে।

“ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের বর্বর ব্যবহার (বিশেষত কর আদায় করবার সময়ে) এবং মানবিক অধিকারগুলি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলা”র মধ্যেই সের্গেবের্গ এই বিদ্রোহের কারণগুলি বুঝে পান।

‘পাশ্চাত্যযুগ’ বা ‘ওয়েস্টার্নার’ বলে পরিচিত রাজনৈতিক গোষ্ঠীটির অন্যতম সদস্য এ এ ক্রেভস্কি সম্পাদিত ‘পিটার্সবুর্গস্কিয়ে ভেদোমোস্তি’ সংবাদপত্রটিও তার পাঠকদের জন্যে এ-সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন করত। ৩০শে জুলাই তারিখ থেকে এই পত্রিকায় ‘পূর্ব-ভারতের বিক্ষোভ সম্পর্কিত পত্রাবলী’ শিরোনামায় ধারাবাহিক রচনা প্রকাশ শুরু হয়। পত্রলেখক তাঁর পাঠকদের উদ্দেশ্য করে লেখেন যে, তাঁরা যেন লগুনের সংবাদপত্রগুলির খবর সম্বন্ধে বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন—যেহেতু ‘ব্যর্থতাকে গোপন করা অথবা অস্বীকার করার ব্যাপারে রোমানদের কলাকুশলতা ইংরেজদেরও আরবে আছে।’ ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস থেকে লেখক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে ইন্দো-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল কাঠামোর মধ্যেই এক স্বভাবের ভ্রম নিহিত আছে। ব্রিটিশ অফিসারগণ কর্তৃক হিন্দুদের ধর্মভাব উপেক্ষিত হওয়ার মধ্যেই এই বিদ্রোহের কারণ নিহিত—ব্রিটিশ সাংবাদিকদের এই উদ্ভিক্ত লেখক সম্পূর্ণ বাজে কথা বলে বাতিল করে দেন। (নূতন রাইফেলের জন্যে সেই ছুরদৃষ্ট কার্তুজের প্রবর্তন।)

যাঁরা বলছেন যে ‘বন্ধবায়ু, বর্ষর এশিয়া’তে ‘আলোকপ্রাপ্ত ইউরোপ’-এর এক সাংস্কৃতিক ভ্রত পালনের দায়িত্ব রয়েছে, তাঁদের এই তথ্যটিকে ‘পিটার্সবুর্গস্কিয়ে ভেদোমোস্তি’ পত্রিকাটি অসৎ ভণ্ডামী বলে অভিহিত করে এবং এই সুযুক্তি উপস্থিত করে যে, ‘ইংলও এক বিরাট সাম্রাজ্য অধিকার করে বসে তাকে সভ্য করে তুলবার জন্যে নয়, তাকে গ্রাস করবার জন্যে।’

এশিয়ায় ইউরোপের ‘সভ্যতার ধারক-বাহকের ভূমিকা’ সম্পর্কে রুশ লেখকদের এতোখানি মনোযোগী হবার কারণ হল এই-যে, উপনিবেশবাদীদের প্রকাশ্য ও নগ্ন দুষ্টক্রিয়াকলাপের পক্ষ সমর্থনের জন্যে এই যুক্তিটিকেই প্রয়োগ করা হত। রুশদেশের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলিও এই ভ্রত পালনের হাতিয়ারকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করত। ‘রুস্কি ভেস্‌নিক’ পত্রিকাটি এই মহলেরই অভিমতকে প্রতিফলিত করে যখন লেখে : ‘আমরা ইংলওর পররাষ্ট্রনীতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নই ; তার সঙ্গে আমাদের অনেক বিষয়ে মতবিরোধের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু আমাদের কর্তব্যের অভিন্নতার কথাটি স্বীকার করবার মতো উদারতা ও বিবেকবুদ্ধিটুকু সর্বদাই থাকবে। ইংলও ও রাশিয়া উভয়ের উপরেই দায়িত্ব বতিয়েছে বন্ধবায়ু এশিয়ার নৈতিকঅন্ধকারের মধ্যে ইউরোপীয় জীবনযাত্রার আলোক বিস্তার করা। এ-ক্ষেত্রে আমরা পরস্পরের সহযোগী ; এখানে তাদের সঙ্গে আমাদের দৃঢ় ঐক্য বর্তমান।’

কিন্তু জাতির খাতিরে আমাদের এ-কথা উল্লেখ করতে হবে যে, ‘রুস্কি ভেস্‌নিক’-এর এই অভিমত রুশ জনসাধারণের কোনো সমর্থন পায়নি। ব্যাপারটি সহজবোধ্য। মুক্তি ও স্বাধিকার অর্জনের জন্যে ভারতের জনগণের সংগ্রামের প্রতি তাদের সহানুভূতি ছিল এ-কথা সত্য, তাহা ছাড়াও, ১৮৫৪ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ব্রিটিশ ও ফরাসী সামরিকবাহিনী তাদের জাতীয় আত্মাভিমানের উপরে যে-ভাবে অপমানের আঘাত হেনেছিল রুশ জনসাধারণ তখনও তার জ্বালা ভোলেনি। সুতরাং, উপনিবেশিক

জোয়াল থেকে ভারতকে মুক্ত করবার জন্যে যারা সংগ্রাম করছিল তাদের প্রতি রুশজনসাধারণ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল।

হিন্দুস্থানের এই ঋতুর সংঘাত-গভীর প্রতিধ্বনি হিমালয়ের তুষারচ্ছন্ন চূড়ার উপর দিয়ে রুশদেশের প্রান্তর অতিক্রম করে সেন্টপিটার্সবুর্গে এসে পৌঁছায়। রুশজনসাধারণের অগতিশীল অংশ সেই ঋতুর মধ্যেই প্রথম প্রাক্‌বসন্তের আভাস পান—যে-ঋতু মুক্তির আসন্ন কালবৈশাখের অগ্রদূত।

*

*

*

সোবিয়েৎ পণ্ডিতগণ ১৮৫৭-৫৯এর ভারতীয় বিদ্রোহের ইতিহাস বিরাট আগ্রহের সঙ্গে অনুশীলন করে থাকেন। এই আগ্রহের ভিত্তিটি হল এমন এক ইতিহাসবোধ যা আন্তর্গত দৃষ্টিভঙ্গীগুলির সমষ্টি হিসাবে নয়, বস্তুগত নিয়মগুলির এক অনুসিদ্ধান্ত হিসাবেই গড়ে উঠেছে—যে-নিয়মগুলির অনুশীলনের ফলে সমাজ কোন দিকে এগিয়ে চলছে তা উপলব্ধি সম্ভব হয়। অতীতে ভারতের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, বর্তমানে ভারতের এক স্বহৃৎশক্তিতে রূপান্তর এবং ভবিষ্যতে তার উন্নয়নের সম্ভাবনাগুলি ভারতইতিহাসঅনুশীলনকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং দায়িত্বশীল কাজে রূপান্তরিত করে তুলেছে।

সোবিয়েৎ পণ্ডিতদের অভিমতে, ভারতের এই বিদ্রোহ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ভারতে বিদ্রোহ, চীনে তাইপিং বিদ্রোহ, ইরানে ‘বাবাইজ্‌ম্’ এবং ইন্দোনেশিয়ায় মুক্তি-আন্দোলনের অভ্যুত্থান—এ-সবই হল তাদের দেশকে উপনিবেশে পরিণত করবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ।

ভারতবর্ষে এই বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনেরই বিরুদ্ধে। কৃষাণ, কারুশিল্পী ও সিপাহীরা ছিল এই বিদ্রোহের প্রধান পরিচালকশক্তি। কিন্তু এই শক্তি ছাড়াও অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে এক সামন্ততন্ত্রী শক্তিও ছিল, যে-অভিজাত সম্প্রদায়কে ব্রিটিশরা উৎখাত করে দেয় এবং যারা তাদের হৃত অধিকার ও সুবিধাভোগের প্রথাগুলিকে পুনরুদ্ধারের এক সুযোগ দেখতে পায়। এই বিদ্রোহের প্রধান দুর্বলতাটি অবশ্য নিহিত ছিল এর সংগঠনহীনতার মধ্যে।

এই বিদ্রোহ সাফল্যের গোরব পায়নি সত্য কিন্তু, তা সত্ত্বেও, ভারতের জাতীয় চেতনাকে বিকশিত করে তোলার কাজে এই বিদ্রোহই এক অননুসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে; ধর্ম বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে ভারতের উপনিবেশ-বিরোধী শক্তির এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে !

তাসের সৌজন্যে

• • • • •

১৩

॥ ১২ ॥

ঘরে পা দিয়েই অবনী বুঝলো, আজ আবার কোন দল নিশ্চয়ই দেখতে আসছে দোপাটিকে। কেননা মাসিমা, পিসিমা, ফুলকাকু যিনি অবনীর ধারণা মেয়ে-দেখানো ব্যাপারে পাত্রপক্ষের সামনে সম্পূর্ণ অকারণে এবং একনাগাড়ে হাসতে-খাকার জন্মেই জন্মগ্রহণ করেছেন—এঁরা সকলেই এসে গেছেন। ভবানী চেয়ারের ওপর টুল তুলে খোপের দিকের বালবটা বদলে দিচ্ছে, অবনী জানে ব্যাপারটা কী হচ্ছে—বাট পাওয়ারের বালবটা খুলে নিয়ে একশো পাওয়ারেরটা লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাতে-ক'রে দোপাটির ক্যাকাশে মধ্যম-শ্রামবর্ণ গায়ের রঙ উজ্জল-শ্রামবর্ণ হয়ে উঠবে। ছুটি আলনাটার কাপড়চোপড় মেঝেয় ফেলে পাট-পাট করে সব গুছিয়ে তুলছে। নড়তে চড়তে যার ছ'মাস সেই বিষ্টিও ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছে। জোনাকি বকুনি খাচ্ছে মা'র কাছে।

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ফণী, অবনী লক্ষ্য করলো, বয়স তার মাত্র নয় হলেও তার নেজদির বিয়ের জন্মে সেও কিছু কম ভাবিত নয়, তার অভিজ্ঞতা হয়তো-বা এই যে যে-মহার্য্য সৃজনীটা পাতা হয়েছে পাত্রপক্ষের বসবার জন্মে সেইটে কোথাও চুলমাত্র কুঁচকে থাকলেও পাত্রপক্ষের মেজাজ বিগড়ে যাবে, সুতরাং সে তার চোখছুটো তীক্ষ্ণ আর বড়ো-বড়ো ক'রে সৃজনীটা সর্বত্র ঠিকঠাক আছে কিনা সেইটে তার অন্তরায়ার সমগ্র অভিনিবেশে পরখ করছে।

কিন্তু যার জন্মে এই-সব সে কোথায়? অবনী জানে দোপাটি নিশ্চয়ই ওপাশের বারান্দার এক ঘুপচিতে হাঁটুর মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে ব'সে আছে।

এ-সম্বন্ধটা কোথাকার সেইটে অবনী মনে করবার চেষ্টা করতে করতে কাপড় চোপড় ছাড়লো, হাতযুখ ধুলো, ছুটি একটা রেকাবিতে ক'রে পরোটা এনে দিতে ঘরের মধ্যে জটলাটার মাঝখানে ব'সে খেতে লাগলো।

‘কী রে অবনী, একেবারে চুপচাপ যে? এত গম্ভীর কেন?’—অবনীর মাসিমা শেষ পর্যন্ত আর না-ব'লে পারলেন না।

অবনী তখন হাসলো। কথা বললো। মেলা কথা বললো মাসিমার সঙ্গে, পিসিমার সঙ্গে, আরো কার-কার সঙ্গে সেইটে অবনী সম্ভবত নিজেই খেয়াল করতে পারলো না। তারপর যখন তার মনে হ'লো মনটাকে এমন-ক'রে পিষতে-পিষতে এই ঘরের মধ্যে, এই ভিড়ের মধ্যে, এই আলোয় মধ্যে আর এক মুহূর্তও থাকা সম্ভব না, আধভাঙা বেতের চেয়ারটা তুলে নিয়ে বারান্দার অন্ধকারে গিয়ে সে লুকলো।

পিসিমা ততক্ষণে দোপাটিকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে মুখ ধোয়াতে বসেছেন অন্তরিকের বারান্দায়।

এর আগে দোপাটিকে এগনি আর কতবার মুখ ধুতে হয়েছে সেইটে অবনী মনে-মনে হিসেব করতে লাগলো। এই যে গ্রানি মেয়েদের ভোগ করতে হয় এর জন্তে গতিসতিই কি আমাদের মনখারাপ করবার কিছু আছে?—অবনী অনেক-হিসেবের শেষে অবশেষে নিজেকে এই-প্রশ্ন করলো। কৃত্তিকাকে তো এই অমানুষিক অত্যাচার ভোগ করতে হয় না, অসহায়ের মতো নিজেকে বাজারের পণ্যের মতো বাচাই হতে দেবার কুৎসিত নিগ্রহ থেকে তো সে মুক্ত, কিন্তু সামাজিক পদ্ধতিতে কোন-একটি পুরুষের স্ত্রী হবার অধিকার লাভের জন্তে এই-যে অভিশাপ দোপাটিকে ভোগ করতে হচ্ছে সে-অভিশাপ থেকে কৃত্তিকাই কি মুক্ত? এই চিরন্তন মামুলী পচা-প্রশ্ন নিয়ে, অবনী নিজেকে স্তব্ধ করলো, আমি আবার মাথা ঘামাচ্ছি কেন? কে না জানে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় জলে ডুবতে থাকার চাইতে হাত-পা-খোলা অবস্থায় হাওর-কুমীরের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মৃত্যুকে, এমনকি বিশিষ্ট গ্রানিকর অনিবার্য মৃত্যুকেও মুখের সামনে এগিয়ে আসতে দেখা অনেক বেশি সুখের, মর্যাদার, পরিতৃপ্তির।

কিন্তু তবুও এই সংক্ষিপ্ত সত্যটা থেকেই যাচ্ছে যে, দোপাটির মতো কৃত্তিকাও এখনো পর্যন্ত বিবাহিত হতে পারেনি। যে-শূন্যতা, যে-অর্থহীনতা, যে-নির্বোধ বিবর্ণতা দোপাটির সমস্ত মুখে-চোখে কঠিন প্রলেপে স্তরে-স্তরে জমাট হয়ে উঠেছে, সেই একই চেহারাই কি কিছুদিন আগে শেয়ালদা স্টেশনের সেই রিফ্রেশমেন্ট রুমের মধ্যে কৃত্তিকার মুখেচোখেও স্পষ্টই দেখতে পাইনি? এবং বিভার? মাধব নামক একটি পুরুষ তো মনের সমস্ত মাধুরী নিশিয়ে তাকে নতুন-নামে অভিষেক করেছে, মনের নিভৃততম সিংহাসনে বসিয়েছে, কিন্তু কেন তবুও নারীত্বের শ্রেষ্ঠ গৌরব-পাওয়া সেই মেয়ের মুখে এখনো সেই একই-চেহারাই দেখতে পাই?

তাহ'লে বিয়ে নিয়ে এত সংস্কার কেন আর তবে এখনো আমরা পুষে রাখি। কেন তাহ'লে বিয়ে ব্যাপারটাকে আমরা জীবনের আর-পাঁচটা কখনো-মূল্যহীন কখনো-মূল্যবান বিষয়ের সঙ্গে এক ক'রে ফেলি না? বিয়ের ধারণাটাকে কেন তাহ'লে এখনোও সর্বদাই মূল্যবান, সর্বদাই এক রঙে, সর্বদাই এক অর্থে পেতে চাই?

এই নিরুদ্ভিতা আর সংস্কার থেকে মুক্তি পাওয়াই কি তাহ'লে আমাদের মুক্তি? অবনী অনেক যুদ্ধের শেষে নিজেকে এই শেষ প্রশ্ন করলো।

আমাদের সংস্কার এই যে, ছাঁদনাতলায় সাত পাক ঘোরানোর পরে শুভদৃষ্টি করিয়ে দিয়ে নবদম্পতীকে বলা হয় : ণ্ডাখো ঐ উত্তর-আকাশে তাকিয়ে, ণ্ডাখো বশিষ্ঠদেব জলজ্বল করছেন, আর তাঁর গায়েই ণ্ডাখো তাঁর কল্যাণময়ী স্ত্রী অরুন্ধতীকে, উঁদের তোমরা একত্রে প্রণাম করো, উঁদের শাস্ত প্রেমের আশিস লাগুক তোমাদের চিরদিনের একত্র জীবনে, তোমরা কৃতার্থ হও। কিন্তু হুঃখ এই যে বিজ্ঞানের রটনা অগ্ররকম। 'বিজ্ঞান চুপি-চুপি ব'লে দিয়েছে, অরুন্ধতীকে বশিষ্ঠের জীবনসঙ্গিনী ভাবতে হয় ভাবো, কিন্তু 'এইটে খেয়াল রাখলে ভালো করবে যে অরুন্ধতীর সঙ্গে বশিষ্ঠের তিলমাত্র আকর্ষণের খেলা নেই, কোনোদিন বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর চারপাশে একবারও ঘুরে ণ্ডাখেনি সে দেখতে কেমন, কেমন তার স্বভাব জানতে বশিষ্ঠ একদিনও বিনিদ্র হয়নি ; অরুন্ধতীও না, বশিষ্ঠকে কাছে পাবার জন্তে নিজের কক্ষপথ ছেড়ে কোনোদিন

সে এক-পাও এগোয়নি ; আসলে ওদিকে জ্ঞাঝো বশিষ্ঠের কোলের কাছেই আছে আর একটি তারা, বিজ্ঞানের অনেক কারসাজি করা দূরবীক্ষণযন্ত্রে না-তাকালে সরল সাদা চোখে অবিস্মি সে তোমার চোখেই পড়বে না—মহর্ষি বশিষ্ঠদেব তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে হয়রান, আর সেই ভীকু অদৃশ্যপ্রায় তারাটিও বশিষ্ঠের নাগাল পাবার জন্যে তার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে কোনোদিন ঘুমিয়ে পড়েনি !

চিত্তার এই পর্যায়ে অবনী মনের মধ্যে কেমন তীব্র এক ঘৃণা আর হতাশা আর বীতস্পৃহায় মাখামাখি হয়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রেলিঙের বাইরে ঝুঁকে পড়ে সে উত্তর আকাশের দিকে তাকালো, অরুন্ধতী আর বশিষ্ঠ আর সেই ব্রষ্টা তারাকে আকাশের গায়ে প্রাণপণে খুঁজতে লাগলো। রাগের মাথায় এইটে তার কিছুতেই খেয়াল হ'লো না যে এই কাণ্ডিকের সঙ্ঘাত্য যাদের সে খুঁজছে তারা কিছুতেই মানুষের চোখের সামনে তাদের লীলাখেলা দেখাতে আসবে না।

আবার চেয়ারে আশ্রয় নিলো অবনী। ঘরের মধ্যে পাত্রপক্ষের আগমনী তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না? কন্যাপক্ষের উৎকর্ষা, আকর্ষণ, পাত্রপক্ষের উদ্দেশ্যে নরম গরম নানাবিধ মন্তব্য আর বারে-বারে এর-ওর বারান্দায় এসে রেলিঙে ঝুঁকে প'রে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকা—এই পর্ব আর কতক্ষণ চলবে?—অবনী ভাবলো।

শেষ পর্যন্ত গোটা সাড়ে আটের সময় অবনী টের পেল তার ঘরের লোকেরা অবশেষে আঙ্গকের মতো হতাশাই মার হলো এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মাসি-পিসিরা সবাই বিদায় নিলেন একে-একে। আর তারপর অবনী যে-ভয় করছিলো তাইই হ'লো। স্পষ্টই লক্ষ্য করলো, বারান্দার অন্তকোণে যেখানে রাজ্যের ডাঙাচোরা বাজ্রে জিনিসপত্র জমা ক'রে রাখার দরুন বিশি নোংরা দুর্গন্ধময় হয়ে রয়েছে জায়গাটা—তারই পাশে গিয়ে দোপাটি রূপ ক'রে ব'সে পড়লো। বারান্দার প্রায় সবটাই অন্ধকার। দোপাটি যেখানে আশ্রয় নিলো সে-জায়গাটা তো বটেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও অবনীর অনুমান করা অসম্ভব হলো না, এখন দোপাটি কঁাদবে। আর সে এমন কান্না যা থামানো যাবে না। থামানোর চেষ্টা করাটাও ভুল। অপরাধ। অবনী নিজের মধ্যে আরও কুণ্ডলী পাকিয়ে গিয়ে ভাবতে লাগলো এর শেষ কোথায়, এর মীমাংসা কী।

'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে দাদা।'

ভয়ানকভাবে অবনী চমকে উঠলো কথাটা শুনে। চোখ মেলে সিঁধে হয়ে ব'সে দেখলো দোপাটি এসে দাঁড়িয়েছে তার কাছে। উঠে দাঁড়াতে কিনা ভাবলো। কিন্তু বললো ব'সে-ব'সেই, 'কী?...কী ব্যাপার, কী বলবি বল না। কী হয়েছে?'

• 'অত্যন্ত দরকারী কথা। অত্যন্ত—'

ভাষা খুঁজে না পেয়ে দোপাটি হাঁপাতে লাগলো। অস্বাভাবিক আর কান্না-বিকৃত গলায় অনেক চেষ্টার পর বলতে পারলো, 'আমি কি মানুষ? কেন এত ঝামেলা করা হচ্ছে তো বুঝি না। চারতলার বসাকদের ঘরে একটা লোক আসে...সেই যে ইনশিওরের দালাল, তোমাকে সেদিন পলিসি করানোর জন্যে ধরেছিলো, সেই লোকটা...তাকে একবার ব'লে দেখলে হয়—'

অবনী লক্ষ্য করলো দোপাটির পেছনে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের প্রায় সবাই, সর্বাঙ্গে না।

দোপাটির কথা শুনে অবনী স্তম্ভিত হয়ে রইলো। এ-ধরনের কথা দোপাটির মুখ থেকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আর তাছাড়া, অবনী ভাবলো, যে-লোকটার কথা ও বললো তাকে পছন্দ হবার মতো কুচি তো ওর নয়। তাহ'লে ব্যাপারটা কী। লোকটার সঙ্গে দোপাটির কখনো আলাপ হয়েছে? কখন? কবে? এ কী অদ্ভুত অবস্থা। অবনী অসহায়ের মতো না'র দিকে তাকালো। দোপাটি তখন ফের ঐধেনেই ব'সে পড়ে মুখ লুকিয়েছে কোলের মধ্যে। ফুলে-ফুলে উঠছে কান্নায়।

অবনী উঠে গেল ঘরের ভেতরে। একান্তে মাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা জিগ্যেস করলো। কিন্তু বীণাপানিও দেখা গেল এ-বিষয়ে কিছুই জানেন না। তিনি বললেন, বসাকদের ঘরে দোপাটি যায় বটে, কিন্তু ঐ 'বাজে-লোকটার' সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে ব'লে তো তিনি জানেন না। তাহ'লে? 'নিমাই বসাকের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেখবো?'—অবনী জিগ্যেস করলো। 'না না এখন আলাপ-টালাপের দরকার নেই। আমি আগে বুঝি ব্যাপারটা কী। কপালের ফের! এ হচ্ছে কপালের ফের!'—বীণাপানি অস্থির হয়ে পড়লেন।

আপাতত ব্যাপারটা চাপা দেয়া হ'লো। দোপাটিকে অবিশ্রি রাত্রে খাওয়ানো গেল না। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে কেউ সাহসও করলো না।

অবনী খাওয়াদাওয়ার পর শুয়ে পড়তে যাচ্ছিলো, বীণাপানি ডেকে বললেন, 'ওরে অবনী, তোর তো একখানা চিঠি আছে। ছপুরের ডাকে এসেছে। নানান অশান্তিতে মনে কি আর থাকে কিছু। ঐ আয়নার কাছে কাগজের তলায় রেখেছিলাম, স্তাখ তো।'।

খামের চিঠি। ঠিকানায় ইংরেজীতে মেয়েলী হাতের লেখা। খুলে দেখলো বকুল লিখেছে। প্রথমেই অবনীর অবাক লাগলো দেখে যে চিঠিতে সম্বোধনের জায়গাটা শূন্য। এরকম কেন। কী লিখবে ভেবে পায়নি? বাকুগীর মাসির আবার আমার কাছে চিঠি লিখতে এ-বিষয়ে ভাববারই বা কী দরকার ছিলো, ভেবে কিছু না পাবারই বা কী দরকার ছিলো! চিঠিটা এই—অবনী পড়লো:

'আজ দুই মাসের উপর হয়ে গেল আপনার দেখা নেই। বাপ্পি সেদিন অভিমানের বশে বা বলেছিল আপনি তাই অত করে ধরতে গেলেন কেন। বিদ্বান বুদ্ধিমান লোক হয়ে এখনো বুঝতে শিখলেন না মানুষের "মন" এইটাই আশ্চর্য! বাই হোক আর মান করে থাকবেন না, পত্রপাঠ এসে দর্শন দিন দয়া করে। আপনার আসা-দরকার আরো বিশেষ করে এই কারণে যে বাবা আজ ষোল দিন যাবৎ শয্যাগত। অনাথের দৈব সখা বরাত দিয়ে প্রথমটায় ডাক্তার-বুড়ি কিছুই করা যায়নি, শেষে ক্রমাগতই জটিল হয়ে উঠতে আমাদের ভেতলার হাতুড়ে ডাক্তার বাহাহুরের হতে হয়েছিল শরণাপন্ন। তারপর এখন অবস্থা আরো ভালো ব্যবস্থা চলছে! কপালে কি আছে বলতে পারি না। বাপ্পির হয়ে বলছি আপনার পায়ে পড়ি, আর গোসা করে না থেকে দেখা দিন।

বান্ধির অবস্থা বান্ধি লিখতে মানা করেছে তাই লিখলান না কিছু । মার শরীরও ভাল না । আর আমার তো থাকা না থাকা সমান । যমের অরুচি ।

মাই হোক শেষ এবং ভবর সমাচার এই যে, আজ আঠারোটি বৎসর গতে বান্ধির বাবার হঠাৎ পিতৃস্নেহ উঠেছে উপলে । ইতিমধ্যেই সেই “ভদ্রলোক” তিন-তিনবার অধমদের কুটিরে দিয়েছেন পদধূলি ও বান্ধিকে নিছের কাছে নেবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছেন । না বলছেন সব দিক বিবেচনা করে নাকি যাওয়াই ভাল । কেননা তাঁরা আর কদিন, এরপর আমি আর বান্ধি এই চেকি ছটোর গতি হবে কী । কেননা আপনিও বিমুখ । কিন্তু না এও বলছেন আপনার “অমুমতি” না নিয়ে এ বিষয়ে কিছু করা চলবে না । অতএব মহাশয় আমি এই নাক মলছি কান মলছি (নিছের) আর কখনও আপনাকে ঠাট্টা মস্করা ও দুর্বাক্য বলিব না, না কেবল গালাগাল দিচ্ছে যে আমার দুর্বাক্যেই নাকি আপনি হয়েছেন দেশছাড়া । হবেও বা । অভাগী যত্তুপি চায় সাগর শুকায়ে যায় । কবে আসবেন ? বান্ধির মুখ চেয়ে আসুন তাড়াতাড়ি । ইতি মাসী ।’

চিঠিটা বার-বার পড়তে পড়তে, বকুলের সম্বন্ধে অবনীরা নানা কথা মনে পড়তে লাগলো । প্রথম যখন রাজসাহীতে এদের সঙ্গে অবনীরা আলাপ হয় তখন তো বাকুণী নিতান্ত বাচ্চা, ক্রক পরে, এবং অবনী বেশ বুঝতে পারত যে সেই সময় বাকুণীর দিদিমা খুব প্রবলভাবেই চাইতেন সে বকুলের সঙ্গে প্রেমে পড়ুক । আর সেইটে সম্ভব ক’রে তুলবার জন্যে তাঁর নানাবিধ প্রচেষ্টা নানান কারণেই অবনীরা মোটেই ভালো লাগত না, বিরক্তিকরই লাগত, কিন্তু এও ঠিক যে সেই সঙ্গে কেমন একটা সহানুভূতি বা টানও সে বোধ করত সমস্ত পরিবারটার ওপর । বকুল আর বাকুণীকে সে গান শেখাত, সে মাধব আর প্রসাদ পালা ক’রে ওদের পড়াত, কিন্তু বকুলের সেই-সময়কার ডরা যৌবনের চেউ তার গায়েই লাগত বেশি । এই নিয়ে প্রসাদ আর মাধব তাকে কত ঠাট্টা করত, কিন্তু অবনী কোনদিনই বিষয়টাকে আমল দেয়নি, কোনদিন কোন লম্বু শিখিল মুহূর্তের তাড়নায় কোনরকম স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখায়নি । কিন্তু এই যে চিঠিটা, এই যে হাতের লেখা যার মধ্যে আমার হাতের লেখা-কে নকল ক’রে লিখবার প্রচেষ্টা স্পষ্টই ফুটে উঠেছে এর অর্থ কী ? হতে পারে বকুলের ভালো লেগেছিলো আমাকে, কিন্তু তাই ব’লে আমার কাছে এমনি সম্বোধনহীন চিঠি লিখতে তার সঙ্কোচ লাগলো না একটু ।

পরের দিন আপিস-ফেরতা অবনী চললো বাকুণীদের ওখানে ।

• মাস-দুই আগে বাকুণী যেদিন তাকে একরকম তাড়িয়েই দিলে বলতে গেলে, তারপরে দিন-কয়েক পর্যন্ত সে তার মনের প্রকৃত অবস্থা নিজেই বুঝতে পারেনি । বুঝতে পারেনি যে সে বেঁচে গেল, না কি এখার সত্যিসত্যিই তার মনের ওপর তার অন্তঃসারশুদ্ধতার একটি চরম ছাপ মেরে দেয়া হলো । বুঝতে পারেনি এই ঘটনার পরে আর বড়োলা ক’রে কোন কথা বলবার অধিকার তার রইলো কিনা, সমাজ সংসারের আর পাঁচটা মানুষের মতো চ’লে-ফিরে বেড়াবার যুখ তার থাকলো কি না ।

একথা অবিশিষ্ট তার মনে হয়েছিলো, বারুণীর কাছ থেকে আবার ডাক আসবে। বারুণী নিজে হয়তো আর ডাকবে না, কিন্তু তার দিদিমা কিংবা মাসি বেশি দিন পর্যন্ত বারুণীর অভিমানকে আমল দিতে পারবেন না। তা-সত্ত্বেও সে মনের মধ্যে স্বস্তি পাচ্ছিলো না, কেননা এই-চিন্তার হাত থেকে সে কিছুতেই রেহাই পাচ্ছিলো না যে বারুণীর চোখে সে বড়ো-বেশি ছোট হয়ে গেছে, হীন হয়ে গেছে। তাই, এর পরে আর ডাক যদি-বা আসে, সে-ডাকে মন খুলে সাড়া দেবার পথ তার আর রইলো কি।

সন্কে গড়িয়ে গেছে। ট্রামবাসের ভিড় এড়ানোর জন্তেই হোক বা এতদিন পরে আবার বারুণীর মুখোমুখি হবার আগে মনটাকে একটু তৈরী ক'রে নেবার জন্তেই হোক অবনী হেঁটেই পাড়ি দিচ্ছিলো গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে লম্বা রাস্তাটা।

দশ দিকে প্রসারিত প্রকৃতি। তার বিশাল ব্যাপ্তি অবনী প্রাণভরে বুকের মধ্যে মনের মধ্যে টেনে নেবার চেষ্টা করলো। জ্যোৎস্না ফুটেছে। চাঁদ পশ্চিমে। তার আকৃতি দেখে অবনীর মনে হলো চতুর্থী কি পঞ্চমীর হবে। হেমন্তের আকাশ কী প্রসন্ন, সুন্দর, নীল। আর সমস্ত আকাশে এত তারা। ছায়াপথ এখনও খুব স্পষ্ট হয়নি। ছায়াপথের নিচে পূর্ব আকাশে ঐ যে স্ফটিক-পাকানো ছ-টি তারা, ঐ না কৃত্তিকা নক্ষত্রমণ্ডল? চোখে পড়তেই অবনীর মনে পড়লো কৃত্তিকা আর প্রসাদকে। ওরা দু-জনে দিন-তিনেক হলো বেড়াতে বেরিয়েছে, যাবে নালন্দা আর রাজগীর। যাবার আগে দুজনের সঙ্গেই দেখা হয়েছিলো তার। সে শুভেচ্ছা জানিয়েছে এই মাষেই যেন তাদের শীত যায়।

আকাশের কৃত্তিকা মণ্ডলের দিকে অবনী বার-বার ক'রে তাকাতে লাগলো। আশ্চর্য, ঐ ছ-টি তারা নাকি সপ্তর্ষিমণ্ডলের বশিষ্ঠদেব বাদে অন্য ছ'জন ঋষির বউ, ব্যভিচারের অভিযোগে ওঁরা সবাই নাকি স্বামী-পরিত্যক্তা। যদিও অভিযোগটা ছিলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কিন্তু ঋষিরা কর্ণপাত করেননি। দিব্য দৃষ্টির আলোকেও তাঁরা বুঝে নিতে পারেননি তাঁদের স্ত্রীরা নিকলঙ্ক, সাধবী, কল্যাণময়ী—যৌন ঈর্ষা এতই ভয়ঙ্কর এতই নির্মম এতই অন্ধ।

ভাবতে ভাবতে অবনী পৌঁছে গেল।

এত ভিড় কেন বারুণীদের বাড়িটার সামনে? কী হয়েছে? অ্যান্ডুলেসের পাড়ি না? পুলিশও দেখা যাচ্ছে। একটু দূরে থেকে সে বকুল বারুণী আর ওর দিদিমাকেও রাস্তার ওপরই ভিড়ের একপাশে দাঁড়ানো লক্ষ্য করলো। বুকের মধ্যে তার ধক ক'রে উঠলো। ব্যাপারটা কিছুটা না বুঝে আর এগুতে কেমন যেন তার সাহসে কুললো না।

কাছেই গোড়ের পান-বিড়ির দোকানটায় সে সিগারেট কেনবার অঙ্কিলার ব্যাপারটার হদিস পাবার চেষ্টা করলো। খবর যা মিললো তা অত্যন্ত ভয়াবহ।

সোনাই অর্থাৎ বারুণীদের বাড়ির ভেতলার সেই খোঁড়া মা-মরা মেয়েটা, সেই যার বাবা তিনটে বিয়ে করেছেন গণ্ডা-দুই ছেলে-মেয়ের পিতা হয়েছেন অথচ একটিকেও পেট-পুরে বেঁতে দেবার দৌলত নেই, সেই-যে বছর-বারোর মেয়েটা যে নাকি ইতিমধ্যেই এমনি ডামপিটে তার বন্ধাত হয়েছে যে বাড়ির থেকে বার দু-তিন পালিয়ে গিয়ে

কোথায়-কোথায় কাটিয়ে এসেছে তা কেউ বলতে পারে না, সেই যে অকালপক ফাঙ্জিল মেয়েটা যার ফিচলেমি খুচিয়ে দেবার ভয়েই নাকি তার বাপ আর তাঁর তৃতীয় পক্ষ ছদ্মনে-মিলে তার হাড়-মাস আলাদা করে দেবার প্রচেষ্টায় কোন ক্রটি রাখেন না, সেই যে হরিণচোখ মিষ্টি মেয়েটা হঠাৎ একদিন কেমন অস্বাভাবিক মুখচোখ ক'রে তাকে এসে বললো : 'আপনের লগে আমার খুব গোপন এটা কথা আছে অবনীদা, কেউরে বলবেন না তো ?'—কী কথা অবনী জানতে চাইলে যে তাকে টানতে টানতে বাইরের ভ্যাপসা দম-আটকানো অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বলেছিলো : 'আমারে না জগজ্জের কেউ একটুও ভালোবাসে না, সঝাই আমারে খারাপ-খারাপ করে, আপনে আমার এটা বিহিত করবেন ?'—অবনী যার উত্তরে মেয়েটাকে কী-বলে সাব্বনা দেবে ভেবে পায়নি, সেই মেয়েটাই আজ এক সাংঘাতিক কাণ্ড ক'রে বসেছে ।

ছাদের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়েছে রাস্তায় ।

তাই ঐ অ্যান্ডুলেন্স, পুলিশ, জটলা ।

পাড়ার লোকেরা নাকি পুলিশের কাছে নালিশ করেছে মেয়েটার বাপ খুব খারাপ লোক, বাপটার তৃতীয় পক্ষের গিন্নী খুব দজ্জাল আর মেয়েটাকে দিনের পর দিন না-খাইয়ে শুকিয়ে রাখে—মেয়েটার বাপ এই কেলঙ্কারিটা ঘটে যাবার পরে যদিও রাস্তার ওপর এসে পাগলের মতো মাথা চাপড়াচ্ছিলো, কিন্তু সে শুধু পুলিশ আর পাড়ার লোকের ভয়ে—জানিয়েছে দোকানী ।

উত্তেজনাটা কাটিয়ে উঠতে অবনী ঐ দোকানীর কথা শুনতে-শুনতেই ছোটো সিগারেট শেষ করলো । ততক্ষণে অ্যান্ডুলেন্সের গাড়িটা চ'লে গেছে, ভিড় স'রে গেছে এবং অবনী লক্ষ্য করেছে বাকুণী তাকে দেখতে পাবার একটু পরেই ওরা তিনজনেই ভেতরে চ'লে গেছে ।

অবনীকে আজকে কেউ অভ্যর্থনা করলো না ।

ভূভূড়ে ওমোট ঘরটার মধ্যে এককোণে মাটির পিদিম জ্বলছে । খাটটার ওপর কান্ডাচ্ছেন বৃদ্ধ রামগোপাল । তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বাকুণী । বকুল ব'সে আছে জানালায়, বাইরের ছমছমে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে । আর ব্রজবালা মেঝেয় আঁচল বিছিয়ে শুয়েছিলেন, অবনী ঘরে ঢুকতেই উঠে ব'সে পাথরের মূর্তির মতো স্থব, স্থির হয়ে রইলেন ।

অনেকক্ষণ পর্তু কেউ কারো সঙ্গে কথা বললো না, কেউ কারো দিকে তাকালোও কিনা সন্দেহ ।

শেষ পর্তু ব্রজবালাই, অন্য-দিকে-তাকিয়েই, অবনীকে খিগোস করলেন, 'শুনলে নাকি সব ?'

গলা পরিষ্কার ক'রে অবনী বললো, 'হ্যাঁ শুনলাম ।'

অনেকক্ষণ পর্তু আবার চুপচাপ ।

শেষে অবনী বললো, 'কীরকম আছে ও ? সোনাই ? বাঁচবার আশা আছে তো ?'

কেউ উত্তর দিলো না এ-কথার।

‘উনি এখন কেমন আছেন’—অবনী বেশ কিছুক্ষণ পরে এবার প্রশ্নটা করলো সরাসরি বাকুণীকেই।

কিন্তু বাকুণী কথাটা শুনতে পেলো কিনা তাইই বোঝা গেল না।

অবনীর অবিশিষ্ট তাতে ক’রে রাগ হ’লো না, অসহ লাগলো না। সোনাই আজ তার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত অল্পভুতির স্রষ্টি করেছে, মনের রিপুগুলি যেন ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে দূরে, এখন যেন সংসারের আর কোথাও কোন দ্বন্দ্ব নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, প্রত্যাশা নেই।

বকুলের দিকে তাকিয়ে অবনী বললো, ‘আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন যাই। কাল সকলের পরে আসব’খন।’

বকুল তার পিছু-পিছু বাইরের দরজা পর্যন্ত এলো। বললো, ‘কালকে আসবেন? না ফের ডুব দেবেন?’

‘না, আসব। আজ তাহ’লে চলি?’

‘সবুড় সবুড়। সোনাইর বাবার তো তৃতীয় পক্ষ, বাম্নির বাবার চতুর্থ! তু আপনার মত কী? কালকে তো ওর পিতৃদেবের আবার আগমনের কথা আছে। মতটা ব’লে যান—আপনার সাথে যদি তাঁর শুভ মোলাকাৎ না-ই ঘটে, পাকাপাকি জবাবটা আমরাই দিয়ে দেব।’

‘বাকুণীর নিজের মত কী? যেতে চায়? না চায় না?’

‘বাম্নির আবার মত কী! হাঁ-না কিছুই বলে না। বলবার কী আছে। মুরগি কি বলে কখনো আমার জবাই করো! আমাদের আবার মতামত।’

‘হঠাৎ নিতে চাচ্ছে কেন অ্যাডিন পরে?’

‘কাঁড়িখানেক ছানাপোনা হয়েছে অথচ বউটা নাকি বারোমেসে রুগী। কাজেই নিতে চাইবার উদ্দেশ্য জলবৎ তরলং। তবে সে-কথা কি আর নিজেই কঁাস করেছেন ভদ্রলোক, আমরাই একথা-সেকথায় ঠারেঠোরে বুঝে নিয়েছি। বিটলে বলে কি আবার, তাকে কি আর আমার বাড়িতে ঝিগিরি করাতে নে যাচ্ছি রে, মেয়ের আদরেই থাকবি তুই—বড়ো ছোর আমার ম্যানেজার হবি, আমার ক্যাশবাস্কোর চাবি আঁচলে ঝুলিয়ে ঝনাৎ-ঝনাৎ ক’রে সকলের ওপর খব্দারী করবি। তাছাড়া আমার এক ভাড়াটের ছেলে আছে খুব তুখোড়, বাড়িতেই এক কোচিং ইন্সকুল খুলে নিজেও যেমন দু-হাতে পয়সা কামাচ্ছে তেমনি গাধা-ঘোড়া সব ইন্সকুল-ফাইনাল তরিয়ে দিচ্ছে। তা আমার কাছ থেকে তো সে-ছেলে আর পয়সা নেবে না, তাকে ইন্সকুল-ফাইনাল তো নশ্টি, বি, এ-এম, এ পর্যন্ত যদি ঠেলে না তুলি তো আমার কান কেটে কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দিস। বুঝলেন অবস্থাটা। আবার কত বড়ো পাজির পা-ঝাঁকি বুড়ো শয়তানটা, বলে কিনা হাত দেখতে জানি। ব’লে যেদিনই আসে সেদিনই বাম্নির হাত ণ্ঠাখে আমার হাত ণ্ঠাখে। আমাকে বলে কি, এখন তো তোমার বেষ্পতির দশা চলছে শনি তুঙ্গী, বছর না ঘুরতে বিবাহের যোগ প্রবল। বুড়ো মড়ার কথা শুনলে ইচ্ছে করে মারি ঝাঁটার বাড়ি মুখে। কেমন ক’রে তাকিয়ে থাকে সব সময়

সে-যদি স্মাথেন না। যেমনি তাঁর চোখের ভাষা তেমনি যুগের! আমার দিদিকে খেয়েছে, আরো ছোটোকে খেয়েছে, এটাও হয়ে এনেছে, তবু বুড়োর রস নরে না। আমাকে আবার কত যেন ইয়াকির পাত্রের আমি তাই গিল্লী-গিল্লী ক'রে ডাকা হয়! পাজি! না তো দামড়া বুড়োর সাথে কথা বলে না, আমাকেও বেশি-কিছু বলতে দেয় না সামনাসামনি, বলে ছোটো দিন সয়ে থাক, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। এখন ব'লে যান কী ব্যবস্থা করা হবে।'

'আমার তো মনে হয় এর'ম লোককে বাড়িতে আর ঢুকতে না দেয়াই ভালো।'

'খুব বললেন! যেন পায়ে ধ'রে সেধে আমরা তাকে বাড়িতে ঢোকাই। তাড়িয়ে যে দেব, কোন্ ভেঙ্গে দেব শুনি! বিষ নেই ঢোঁড়া, তার কুলোপানা চক্কর দেখলে লোকে হাসবে না? আর তাছাড়া বাবাকে ওষুধও তো ঐ লোকটাই দিচ্ছে এখন। হোমিওপ্যাথিক। নিজে নিজেই শিখেছে শুনলাম অথচ ভাবভঙ্গী দেখলে মনে হয় বিলেতফেরত ডাক্তার এলেন! সবই সইতে হচ্ছে, কী আর করা যাবে বলুন, সত্যিকারের ডাক্তার বাড়িতে আনার নামদোত আনাদের কোথায় বলুন।'

'তাহলে যা ভালো বোঝেন করুন। আমি ভাবছিলাম বাকুগীকে আমিই চেষ্টা ক'রে দেখি স্কুল-ফাইনালটা পাশ করাতে পারি কিনা। বিয়েটাতে এখন যখন এতই বাধা, বছরের পর বছর অনর্থক নষ্ট না ক'রে কিছু পাশ-টাশ—'

'খামলেন কেন! বলুন না।'

'ঐ তো বললাম। আমার ওপর নির্ভর করলে আমিই ওকে পড়াব। দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমারই থাকবে, তাহ'লেই তো হ'লো? এই বুঝেই ওর বাবাকে যা-হোক কিছু জবাব দিয়ে দেবেন।'

'আপনার সব কথা শুনে ওর বাবা তো আপনাকে—বলব কথাটা?'

'হ্যাঁ—বলুন।'

'না থাক বাবা, আপনি তো হাজার হোক সেই পুরুষ মানুষই! কী বলতে কা বুঝে ব'সে থাকবেন! থাক ও-সব কথা। বাজে-কথায় আমাদের কী দরকার। যাকগে, কালকে আসবেন তো?'

'না, কালকে না, পরশু আসব'—ব'লেই অবনী বকুলকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়েই পেছন ফিরলো, মনের মধ্যে অতক্ৰিত একটা উত্তেজনার ধাক্কায় স'রে গেল সেখান থেকে।

পরের দিন সোনাইর খবর অবনী খবর-কাগজেই পেলো। জানতে পারলো হাসপাতালে ওর মৃত্যু হয়েছে।

তার পরের দুদিন সন্দের পরে অবনী যখন এসে পৌঁছলো বাকুগীদের ঘরের দরজায়, তখন সেখানে অনেক লোক জমাট বেঁধেছে, এ-বাড়িরই ভাড়াটে সব, এত লোক এইটুকু জায়গায়, এই ঘিনঘিনে ইঁহরপটা অন্ধকারে, অথচ এতটুকু শব্দ নেই কোলাহল নেই ঠেলাঠেলি নেই,—অবনী জানতে পারলো বুদ্ধ রামগোপাল হঠাৎ কিছুক্ষণ আগে শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা গেছেন।

[ক্রমশ]

p 24, 055

মাস্ত্র জাকব

সুপ্রিয় সুখোপাধ্যায়

ফরাসী সাহিত্যে প্রাক-স্বরিয়ালিষ্ট যুগ থেকেই একজন উল্লেখযোগ্য কবি হিসেবে মাস্ত্র জাকব পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত গল্প-কবিতার সংকলন *Le Cornet à Des* ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথমজীবনে কিউবিকস্কুলের শিল্পআন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। কবি আপলিনের ও শিল্পী পিকাসো তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কবিবন্ধু আপলিনের-এর সঙ্গে তাঁর যত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়, 'তা' *Le Cabinet Noir*-এ প্রথিত করা হয়েছে। সেইসময়ে কিউবিকস্কুলের মূল-আড্ডা মঁত মার্তর-এ রু-রাভিনাঞ-এ তিনি তাঁদের সঙ্গে একই জায়গায় থাকতেন।

তাঁর ছেলেবেলা ভয়ানক সংকটময় অবস্থার মধ্যে কাটে। কারণ শোনা যায়, তিনি নাকি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তিনবার আত্মহত্যা করতে যান। কিন্তু শিল্প-চর্চায়, সাহিত্যে বা ছবি আঁকায় তিনি অক্লান্ত রকমের মানসিক উদ্গাদনা খুঁজে পেতেন। কিন্তু, এ-সব ঘটনা তাঁর শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে থাকত না, পারিবারিক বিনিষ্ট সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। পরবর্তীকালে তাঁর জীবন-ধারণের বৃত্তি হয়েছিল বিভিন্ন—সংগীত-সমালোচক, শিল্পী, সাহিত্যিক থেকে একেবারে পারিবারিক শিক্ষক পর্যন্ত। এর কিছু পরে ১৯১৫ সালে তিনি ক্যাথলিক মতবাদে তাঁর আস্থা দেখান। এবং আরো কয়েকবছর পরে তিনি জমজমাট হৈ-চৈ আর উত্তেজনাপূর্ণ পারি ছেড়ে প্রায় নিঃশব্দ জীবন-যাপন করবার জন্যে স্যা-বনোয়া-সুর-লোয়ার-এ বাসা বাঁধেন। এরি মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও কবি স্যা-পল-কুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে ক্যাপের-এ উদয় হতেন। কিন্তু এইসময় তিনি কবি হিসেবে যথেষ্ট বিখ্যাত হয়ে পড়েছেন।

কবি হিসেবে মাস্ত্র জাকব-কে অনেক সমালোচক “রহস্যবাদী” বলে মন্তব্য করেছেন। এবং সেই সঙ্গে তাঁরা বলেছেন যে এইরকম পরিহাস-শ্লেষ করার অধিতীয় মেজাজ ফরাসী কাব্যসাহিত্যে সম্পূর্ণ এক নতুন মিনিস, এবং সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের বহু কবিকে তিনি প্রভাবান্বিত করেছেন—একথা তাঁরা প্রায়ই বলেন। অবিশিষ্ট তাঁর এই রহস্য-পরিহাসের অন্তস্তলে যে-বস্তুটি বাইরেও প্রকাশমান হত, সেটি হল তাঁর শ্লেষ এবং সবশেষেও এই শ্লেষ। এই শ্লেষের জন্ম যে সমাজ-জীবনের গভীর ব্যর্থতা থেকে তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। এদিক থেকে তিনি বোদলের র্যাঁবোর উত্তরসূরী। তিনি ছন্দে লিখেছেন, কিন্তু বেশির ভাগই গল্পে-লেখা। এবং এ-সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে তাঁর গল্প-কবিতার সংকলন “ল্য-কর্ণে এ্যা দে”র জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করতে হয়। তাঁর কাব্য-জিজ্ঞাসায় সাহিত্য-সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। সবকিছুতেই শ্লেষ বা পরিহাস এসঙ্গে সমালোচকেরা যখন যথেষ্ট বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন, তখন তিনি তাঁর কাব্য-জিজ্ঞাসায় এই রহস্যের অনেকখানি সীমাংসা করে দেন। এই রহস্য-পরিহাস-শ্লেষকে তাঁর কাব্য-জিজ্ঞাসায় ডিসটাকশন

বলেছেন। কারণ তাঁর মতে যেহেতু এ-সমাজে কোনো সত্যিকারের মৌলমূল্য নেই, কাজেই এখানে সমুদয় বস্তুই সমানমূল্য দাবী করতে পারে। বা হয়ত কিছুই দাবী করতে পারে না। তাঁর এই ডিসট্রাকশন-এর মূলভূমি হল শ্লেষ; তাঁর কবিতার দেহগঠনে যা দরকার তা'হল *le accord des mots, des images et de leur appel mutuel et constant* (Art Poétique).

মাক্স জাকবের কাব্যসমালোচক বিলি তাঁর সম্পর্কে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে “মাক্স জাকবের মহৎ কবি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাঁর কাব্যে ধামধেয়ালিপনা, রহস্যময়তা, কথার খেলা এবং পরস্পর-বিপরীত চিত্রকল্পের ব্যবহার করা সত্ত্বেও, তিনি যদি তাঁর কলমে আরো একটু সুর চালতেন। তিনি কথার সঙ্গীতময়তার গুণ সৌন্দর্যকে অস্বীকার করেছেন, যেখানে আপলিনের আরো বেশি সুর মেশাতে পেরেছেন। নইলে এই দুই কবির মেজাজের এতবেশি পার্থক্য দেখা যেত না.....।”

• ঔপন্যাসিক হিসাবে মাক্স জাকব একসময় যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তিনি বেশ কিছু উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর উপন্যাস *Le Terrain Bouchaballe, Filibuth ou la Montre En or*, ১৯২২ সালে লিখিত। এবং তাঁর *Le Roi de Beotie, Le Cabinet Noir* (চিঠিপত্র) যথাক্রমে ১৯২১ ও ১৯২২ সালে লেখা। তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে নানা মন্তব্য শোনা যায়। বোধ হয়, তাঁর মৌলিকত্বই তাঁর কারণ। তাঁর রচনা তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে যথেষ্ট চাকল্য সৃষ্টি করেছিল—তা' তাঁর সমসাময়িককালে ও পরবর্তীকালে বহুকলাবিৎ, ঔপন্যাসিক ও সাহিত্য-সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সমালোচক আঁদ্রে বিলির একটুকরো মন্তব্য তুলে দিলেই বেশ বোঝা যাবে। “কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন মাক্স জাকব কী ঔপন্যাসিক? তাহলে বলতে হয়, নাট্যকলার মতো উপন্যাসের শিল্পরীতি যদি স্বল্পমূলক ও দৃষ্টমালায় সজ্জিত হয়, জাকব নিশ্চয়ই তা' নন। আর যদি ঔপন্যাসিকের অর্থ এই হয়, যে তিনি তাঁর আশপাশের পৃথিবীকে কেবল গভীর নিরীক্ষণ করে চলেছেন—তাহলে নিশ্চয়ই একথা বলতে হবে—তিনি তাঁর যুগের একজন বিশ্বয়কর ঔপন্যাসিক।.....মাক্স জাকব গল্প বলেছেন বা উপন্যাসও সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি কখনও কারো অনুকরণ করেননি।”

আধুনিক ফরাসী সাহিত্যিক ফ্রঁসোয়া মোরিয়াক জাকব সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি তাঁর সৃষ্টিতে মানুষের চরম দুর্গতির চিত্র এঁকেছেন এবং প্রতিরোধে উপায় বিহীন হয়ে তিনি সেখানে অবস্থান করেছেন। এবং জাকবও তাঁর উপন্যাস *Le Terrain Bouchaballe*-এ বলেছেন—“A writer does not like pessimism—is rare! Generally, he does not like that; he believes to be true to be a seer in the dark” প্রগতিশীল সাহিত্যসমালোচক জঁ। কাস্ত্র এ-ব্যাপারে অনেকখানি আলো ফেলেছেন। তিনি একজায়গায় লিখেছেন যে, তিনি জাকবের মধ্যে বুর্জোয়া, সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি অশঙ্কল্যমান সুখীম রিভোল্ট দেখতে পেয়েছেন। এদিক থেকে তিনি লেখক জর্জ

রুয়োল-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে a Catholic genius, too, and who hit upon the much dark satire of the bourgeois aspect a consolation to the ingenuousness of his faith.

এবারে তাঁর কাব্য আলোচনায় ফিরে আসা যাক। তিনি বলতে চেয়েছেন, কবিতার মালমশলা বলতে তিনি বোঝেন—কথার ঐক্য, চিত্রকল্পের ঐক্য আর সকল সময় তাদের পারস্পরিক আবেদন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এইটুকুমাত্র নয়। একটা কবিতার কিছুঅংশ তুলে দিলে, বেশ কিছুটা বোঝা যাবে।

The blond child who takes the crabs
The crabs in the hand
Speaks not even a syllable.
This is an adult son.

Three mothers for that bald child
Only one suffered much.
The father is a nabob, but poor
He treats him like a dog
(Signature)

Heart of Muses, you blind me
It is I whom they saw to play the bugle
To the bridge of Iena on Sunday
A notice upon the sleeve.

(Le Laboratoire Central)

কবিতাটির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ঐক্য যে আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর এটি তাঁর মিলের কবিতা, চমকপূর্ণ মিলগুলি অল্পবাদে পাওয়া না-গেলে যথেষ্টই যে রসসম্পূর্ণ হয় তা মানতেই হবে। কিন্তু কবিতাটির সম্পূর্ণ অংশ পড়লে মনে হয় জ্বাকব যেন পরিহাস করছেন। যারা যত তাঁর কবিতা শুনছে, তারা তত তাঁর অর্থের কুহেলি ভেদ করতে না-পেরে বোকা বনছে। জায়গায় জায়গায় তাঁর পরিহাস অবিশ্রি বোঝা যায়, কিন্তু সমগ্রতায় একটা কিরকম রহস্য-শ্রেষ-পরিহাস মেশানো ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব। এটা সাধারণভাবে সত্যি হলেও—অল্প আর একটা অর্থময়তার দিকে আঙুল দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে বলে মনে হয়। রেন'র মতে—“মানুষ ও তার সামগ্রীর এইরকম অদ্ভুতত্ব—একটা সাধারণীকৃত অদ্ভুত অবস্থা তাঁর সমগ্র কবিতায় ছেয়ে আছে, যেটি তাঁর সহানুভূতির কালি দিয়ে আঁকা।” এবং তাঁর এই Sens de mystere যাঁ ককতোর কবিতা Dos d'ange-এর সঙ্গে তুলনীয়। যেসব চিত্রকল্প তাতে

ব্যবহার করা হয়েছে তা সত্যিই বিশ্বয়করভাবে রহস্যময়। বোধ হয় পিয়ের মাক্স অরুলঁকেও এই দলে ফেলা যায়।

পরিশেষে আরাগঁর একটি মন্তব্য তুললে তাঁর কবিতার মূল্যায়ন সম্পর্কে— বিশেষ করে ফরাসী সাহিত্যে গদ্য-কবিতার সম্পর্কে—অনেকখানি বোঝা যাবে। *Chronique De Bel Canto* গ্রন্থে ফরাসী কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করার প্রসঙ্গে তিনি মাক্স জাকবের স্থান নির্দেশ করেছেন। একজায়গায় তিনি বলেছেন, “.....আলোয়্যাসিযু বরত্রা, বোদলের, র্যাঁবো, মাক্স জাকব— গদ্য-কবিতার ইতিহাস আমাদের চোখের ওপরেই লেখা। আর বোধহয় এইখানেই ভালোভাবে আমাদের সমালোচনায় সতর্কদৃষ্টির নিখিলতার দিকে আঙুল দেবিয়ে দেয়।.....” আরাগঁ তাঁর বইয়ে ফরাসী গদ্য-কবিতার ইতিহাস-পরিবর্তনের গতিশীল দিকটি নিয়ে মাক্স জাকব-এর কবিতা-আলোচনা প্রসঙ্গে বারবার একাধিক জায়গায় আলোচনা করেছেন। এবং তাঁর শেষ কবিতাগুলির বিশিষ্টতা “এতখানি সরলতার তীক্ষ্ণতম শ্লেষ” যেভাবে অর্জন করেছেন, তা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।

বলাবাহুল্য এ-ঘটনা সকলেরি জানা, অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক লেখকের মতো নাৎসীদের দ্বারা তিনি যথেষ্ট অত্যাচারিত হন এবং নাৎসী নিবিরে তারা তাঁকে নির্ধম ভাবে হত্যা করে। এ-ব্যাপারে তাঁর শেষ-লেখা “প্রতিবেশীর ভালোবাসা” নামক কবিতাতে ইহুদি বন্দীদের ওপর নাৎসীদের ব্যবহার সম্পর্কে তীক্ষ্ণ পরিহাস করেছেন।

মাস্ত্র জাকবের কবিতা

। যদি সে..... ।

অজানা কোনো স্বপ্ন এসে যদি
ছড়িয়ে যায় তোমারি সন্ধ্যায়,
তুমি ভাবো দেখছ স্বর্গ-দূত
সামনে-মেলা তোমারি আয়নায় ।

সুখুই ছোটে, পালায় এলেঅনোর
বাতাসে খুলে দিয়েছে দীর্ঘ চুল,
ভোরেই যদি লুকিয়ে পড়া যায়
লক্ষ্য দুটি—আমারি আকাঙ্ক্ষায় ।

অনুগত কোনো স্বামীটিকে যদি স্মাখো
ভাবতে যিনি কিছুই জানেন না,
প্রেমিক আমিও, আছে আমারো ডানা
আকাশে ওড়া আমিও শেখাতে পারি ।

মিথ্যা-মোহের নীরবতা থেকে কী-কী
আড়ুল-ডগায় নিয়ে আসে, যদি স্মাখো
হৃয়ের ভিতর স্বপ্ন কোনই নেই,
রাজার চেয়ে মেঘপালকেই মেনো ।

। সংহত রাজ্যের শত্রু ।

কল্পনা পাবার ক্ষণে একটা সংহত রাজ্য গঠন করাই উচ্চিস্থ শান্তি
নিজা যখন আসে, সেই শত্রু তখন কালো ঘোড়ায় চড়ে মাথায়
অন্ধকারের টুপি পরে প্রবেশ করে । কৃষকরা তখন তাকে
অনুসরণ করে । হাতে ভুদেহ কাস্তে আর শাবল । আর এখানে
একজন বিবর্ণ লোক, যাকে দেখলে অনুসকলের চেয়ে বেশি
বিতর্কিত জাগে । হে ঈশ্বর, আমাকে বাঁচাও ; কিন্তু
সময় তো আর নেই ।

। দৃশ্য ।

কাঠ-কয়লার মতো কালো রাত । মুখের কাছ পর্যন্ত নামানো
কালো আধ-ঘোমটা-দেওয়া কোনো মেয়েকে দেখতে আমার বেশ
লাগে । ওয়ের ঠোঁট নিঃশব্দ, আর শহর এই রাতের পিছনে ।
খলি হাতে একজন ওয়াল্‌স মার্কা পিয়ন । এসো না আমরা
সেই নদীর রাজ্য-জোড়া হিংচেকচুরিপানার কাছাকাছি বাসা বাঁধি ।
কেউ যেন জলের নিচে থাকবে, নদীর জলের স্বচ্ছতায় শাদা প্রবালের
মত শিকড়কে দেখতে যেন ঠিক ঘষা কাচ । এই সময় আবাসস্থলগুলিকে
ধোয়ার
মতো দেখায় । কাঠ-কয়লার মতো এই কালো রাত ।

। একটি ছোট কবিতা ।

শৈশবের সেই ঘরখানায় আমাকে স্মরণ করি । জানালার
কাচে আবরিত মসলিনের পর্দাখানা শাদা-সুতোয় অসুন্দর করে
লাগানো । আমি ভাবতে চেষ্টা করি সেই বর্ণমালাসমূহকে । যাদের
আমার মনে ধরাতে হত । আমি যেন কল্পনায় তাদের একএকটাকে
নক্সায় পরিণত করতাম । H যেন একটি লোক বসে, B যেন
নদীর ওপর বেকে-পড়া একটা সেতু । আমার ঘরে অনেকগুলি
বাক্স ছিল আর তার কুটম্ব ফুলগুলি যেন কাঠ থেকে বৃহৎ ভরে
কুঁদে-তোলা । কিন্তু যে জিনিসটা আমি বেশি পছন্দ করতাম
তা' হোল চুতুকোণ স্তম্ভের দুটি শীর্ষ, যারা পর্দার পিছন থেকে চোখে
পড়তে পারত । তাদেরকে আমার মনে হত ঠিক যেন দুটি পুতুল এবং
যাদের সঙ্গে কোনোরকমের খেলা-করা নিষেধ ।

মূল থেকে অনুবাদ : সুপ্রিয় যুবোপাধ্যায়

মান-বিন-দারের কাহিনী
শ্রীশ্রীশ্রী দানন্দ

// ২৬ //

নাককাটির খালের হরষিত ইলশামারী গিয়েছিল কাজে। নিজের ডিম্বিতে সে ফিরছিল। বেগোনে বৈঠা বেয়ে বেয়ে হাতের কড়াগুলি জ্বালা করতে আরম্ভ করেছে। ভৈরবে পড়তেই গোন পেয়ে গেল। মনটা প্রসন্ন হওয়াতে গান ধরে দিল হরষিত। দিনটা পরিশ্রমের ভেতর দিয়ে কেটেছে। নদীর ভেতরকার ঝিরঝিরে বাতাস যেন মায়ের হাতের পাখার বাতাস। চাদরটা লগিতে ঝুলিয়ে পাল খাটিয়ে নিল। নৌকা তরতর করে ছুটল। এক হাতে বৈঠা ধরে অন্য হাতে তামাক সেজে ছাঁকা নিয়ে বসল।

সামনে এক প্রকাণ্ড ধাপের দঙ্গল। ডিম্বি নিয়ে পাশকাটাতে গিয়ে দেখল কাল পেড়ে শাড়ী জড়িয়ে আছে। নদীর মধ্যে আসেপাশে মুচির চোখ বড় সতর্ক থাকে। হরষিত ডিম্বি নিয়ে একটু এগোবার চেষ্টা করল। শাড়ি নয় শুধু চুলের গোছা এলোমেলো হয়ে ধাপে জড়িয়ে আছে। লগি খুলে এবার ধাপের ভেতর ডিম্বি লগি-ঠেলে এগোলো।

ডিম্বির খালের ভেতর নেমে কিনারা ধরে উরু হয়ে বসে মুখ নিচু করে ডাল করে দেখল। যা ভেবেছিল ঠিক তাই—একটা মেয়েমানুষ ধাপের ভেতর যেন দিব্যি শুয়ে আছে। জল ভোটা শরীর নয়। হরষিত এবার হাত বাড়িয়ে পায়ের দিকটা ধরল। না, মরেনি। হলপ করে বলতে পারে এখনো মরেনি মেয়েটা। এমন কত দেখল, কত ধরল জীবনে। স্পর্শ মাত্র তাই তার মালুম হয়। মরা গরুর মত মেয়েটার দেহ হুহাতে জড়িয়ে ধরে টেনে তুলল ডিম্বির ওপর।

ডিম্বি এনে পারে বাঁধল। একেবারে নির্জন বিস্তীর্ণ বুনো জঙ্গল সামনে। অল্প নরম সর মাটি পড়েছে সারা ঢালু সমতল কিনারায়। উপরে প্রকাণ্ড জগড়মুরের ঢাল এসে ছায়ায় আঁরো নিবিড় করেছে।

এখন লজ্জা শরম কি! মেয়েটা বাঁচলে হয়। আহা, কোন হুঃখে না আশ্রয়শ্রী হয়েছিল। হরষিত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। তারপর ভিজে কাপড়খানা একরকম চোখকানবুজে টেনে ছিঁড়ে দেহ থেকে আলাদা করে এনে তার নিজের চাদরটা মেয়েটার শরীরে জড়িয়ে দিল। জল পেটে খুব বেশি ঢোকেনি। হুঁচারবার জোড়ে ঝাঁকুনি দিতে বেরিয়ে এসেছে। আগুন ছেলে সেকতাপও দিল কিছুক্ষণ। কিন্তু জ্ঞানত ফেরে না।

মেয়েটা সুন্দরী বটে। কি হুঃখে মরতে এসেছিল কে জানে। হরষিত আড়চোখে একবার মেয়েটার মুখের দিকে তাকালো। আবারও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল একটা। টেনে তুলে এখন ভাবনা হল। শেষ পর্যন্ত বাঁচবে ত। ডাক্তার কবিরাজের ত আর ছড়াছড়ি নেই। তাকে নিজেই চেষ্টা করে দেখতে হবে। এইবয়সে কত

জলে-ডোবা মেয়ে-মদ দেখল। দেখে দেখে অনেক শিখেছে। সবরকম চেষ্টা করবে। না-বাঁচে জলের মড়া জলে ঠেলে ফেলে দেবে। অত তার কি কুটন এসেছে। বলল বটে মনে মনে কিন্তু কেন কে-জ্ঞানে মন মানল না। সুন্দরী তায় অল্পবয়সী মেয়েমানুষ। হরষিত উঠে পড়ে লেগে গেল।

ভিজি ছেঁড়ে দিল হরষিত। খোলা হাওয়া লাগুক শরীরে। হরষিত ভিজি বায় কিন্তু চোখ দুটো রয়েছে মেয়েটার মুখ আর বুকের উপর। চোখ খোলেনি কিন্তু মনে হল বুকটা ওঠানামা করছে ক্ষীণভাবে। বৈঠা-ছেঁড়ে কাছে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখল। নিশ্বাস পড়ছে, তবে ধীরে ধীরে। হরষিত আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

একটু বাদেই মেয়েটা চোখ মেলে চাইল। সে দৃষ্টি যেমন ক্ষীণ তেমনি দুর্বল। কোনো কথা না-বলে মেয়েটা আবার চোখ বুজল।

হরষিত ক্ষিপ্ৰহাতে বৈঠা চালালো। এবার কিছু বলকারী ঝাণ্ড পেটে যাওয়া দরকার। সামনে পড়বে চাখলার হাট। সেখানে দুধ পাওয়া যাবে।

একটা ক্ষীণ আর্তনাদ শুনতে পেয়ে হরষিত বৈঠা ছেঁড়ে এগিয়ে এল।

মেয়েটা চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।

হরষিত গিয়ে ধরতেই চোঁচিয়ে উঠে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, ওরে বাবারে ধরল আমারে।

হরষিত আস্তে আস্তে মেয়েটিকে পাশ ফিরিয়ে দিয়ে বলল, ভয় নেই, তোমারে ধরবে কেডা! এই ত আমি আছি।

তারপর মাটির হাঁড়ি থেকে একটু গুড় বের করে জল দিয়ে গুলে তার মুখের সামনে ধরে বলল, এই নেও, খাও।

মেয়েটা খেল।

হরষিত বলল, ধরা পড়ার ভয়ে বুঝি তাই ভৈরবে বাঁপ দিইলে!

মেয়েটির উত্তর দেবার মত তখনো শক্তি হয়নি।

তা লোকোয় যখন তুলিছি তখন যা বলবা তাই করব। কোনো ভয় নাই। কনে যাতি চাও কও!

চাখনার হাটে এসে হরষিত নৌকা রেখে দুধ নিয়ে এল। জাল দেওয়া দুধ ময়রার দোকান থেকে অনেক কাকুতিমিনতি করে বেশি পয়সা দিয়ে নিয়ে এসেছে।

দুধ খেয়ে মেয়েটা দিব্যি সুমিয়ে পড়ল। ভাব দেখালো যেন তার আর ভয় ভাবনা নেই!

নাককাটির খালের মুখে ভিজি আসতেই চাঁপা ধড়মড় করে উঠে বসল। গায়ের কাপড় ঠিক মত জড়িয়ে হরষিতের দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল।

হরষিত বলল, ভয় নাই কোনো। শুয়ে পড় এখন।

ক্ষীণকণ্ঠে চাঁপা বলল, কনে নিয়ে যাচ্ছ আমারে?

বলো যাযা কনে। সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে হলিও হরষিত রিশি নিয়ে যাবে তোমারে।

শেষের কথাগুলি চাঁপার কানে গেলেও মাথায় ঢুকল না ! কেমন যেন দারুণ একটা অবসাদ জড়িয়ে আছে । কোনো কিছু ভাবনা চিন্তা করতে গেলে দম আটকে আসে । চাঁপা আবারও চোখ বুজে শুয়ে পড়ল ।

চোখ খুলে চাঁপা দেখল এবার ডিঙ্গি নয়, ঘরের ভেতর নরম বিছানায় সে শুয়ে রয়েছে । তার কোলের কাছে বছর দুয়েকের একটা মেয়ে ।

হরষিত খাবার নিয়ে পাশেই ছিল । চাঁপা চোখ খুলতেই খাবার হাতে করে এসে বলল, এই যে উঠিছ ! এই নেও, এইটে খাও । তারপর কবিরাজ অশুধ দেছে, তাই খালি সব ঠিক হয়ে যাবেনে !

এ লোকটা কে ? কোথায় এসে পড়ল আবার, কার খপ্পরে ! গায়ে অসহ্য বেদনা তবু অনেকটা যেন স্তম্ভ বোধ করল চাঁপা । সেই লোকটাকে ছুরি মারা থেকে নদীতে ঝাঁপ দেওয়া পর পর অনেক কথা মনে পড়ল । তারপরের ঘটনা বিস্মৃতির অভলে ! জলে ডুবে মরবার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা সে করেছিল তবুও কি-করে সে বাঁচল কে জানে ! তবে বোধ হয় ভাসতে ভাসতে সে এসেছিল আর এই লোকটা টেনে তুলেছিল তাকে ! কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে এর লাভ কি ! চাঁপা আবারও চেয়ে দেখল লোকটাকে ।

হরষিত মেয়েকে কোলে তুলে আদর করছে !

না-না, কাদে না ! ঐ দেখ কারে আনিছি, ও কেডারে মণি ?

মেয়েটা তাকিয়ে দেখে বলল, মা !

চাঁপা লজ্জা পেয়ে মুখ ঘোরালো ।

ওকি লজ্জা কিসির ! তোমরাত মার জাত ! ঠিকই কইছে আমার মণি সোনা ! চুমায় চুমায় মেয়েটাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল হরষিত !

আশ্চর্য হরষিতের সেবায় । দু'দিন চাঁপাকে বিছানা থেকে উঠতে দেয়নি । ওষুধ এনে খাইয়েছে, মালিশ করেছে, নিজে খাবার দিয়েছে । কলের মত কাজ করে গেছে মুখে তার কথাটি নেই ।

চাঁপা ভাল হয়ে উঠল । ভাল হয়ে উঠে অবধি তার চিন্তা বেড়েছে । এ লোকটা তাকে নিয়ে করবে কি ! বাইরে ত খুব ভাল লোক মনে হয়, মনে কি আছে কে জানে ! বাইরের পুরুষদের সে যে পরিচয় পেয়েছে তাতে কাউকে আর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না । অবশ্য হরষিতকে সবার মধ্যে ফেলতে তার মন সায় দেয় না । লোকটা সবার মত নয় । এটুকু সে বুঝতে পেরেছে একদিনে । কিন্তু এভাবে কতদিন ! তার পর সে যাবে কোথায় ?

চাঁপা হরষিতের মেয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল ।

হরষিত কাজ থেকে ফিরে এসে চাঁপাকে দেখে বলল, এই ত বেশ সারে উঠিছ !

চাঁপা হাসল ।

কি হাস.যে !

আমার ত কিছুই জ্ঞান না । সারে উঠে আমার হবে কি ।

হরষিত বলল, এতদিন অসুখ ছিল তাই চুপ ছিলাম। এবার কও দেখি সমাচার খুলে !

ও শুনে হবে কি !

হরষিত চাঁপার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল, বুঝতি পারিছি। অনেক দুঃখি ঝাপ দিইলে ! থাক, কবাব না যখন তখন চুপ দেলাম। তবে তুমি নিশ্চিন্দ থাক। যখন যেখানে যাতি চাবা নিয়ে যাব। বেইমানী পাবানা আমার কাছে।

চাঁপা নিশ্চিন্দেই আছে। নেহাৎ দয়াপরবশ হয়ে লোকটা তার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে। সেবাস্ত্রবশ করে বাঁচিয়ে রেখেছে। আর যাই হোক এ-লোক কুলোক নয়। কিন্তু সে কেন আর বেঁচে থাকবে, এ জীবনে কি প্রয়োজন আছে !

হরষিত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করল, কোথায় বাড়ি ঘর, কে আছে তোমার কিছুই ত জানি না।

চাঁপা আবারও হাসল। বলল, সব খোয়ায়ে আইছি। তোমার আর খুঁজে বেড়াতি হবে না !

চাঁপা চোখের জল আঁচল চাঁপা দিয়ে পালিয়ে গেল।

// ২৭ //

হরষিত মুচি। তার ব্যবসা চামড়া নিয়ে। নটবরের মত সচ্ছল অবস্থা তার নয় তবে সংসারে অভাব নাই। হরষিত পরিশ্রমী, সংসার সাজিয়েওছিয়ে রাখতে জানে। তবে ইদানিং বউ মারা যাবার পর থেকে মনে সুখ নাই। সংসারের শ্রী নষ্ট হতে চলেছে। দু'বছর আগে এই মেয়ে হতে গিয়েই বউ মারা যায়। সংসারে এখন মেয়ে আর এক ভাই। ভাই এখানে না। কোন এক যাত্রার দলে ঢোল বাজায়। বিয়ে করেনি। কুণ্ডিলাজ বাউণ্ডলে। যখন এখানে আসে হরষিতকে যা পারে টাকাপয়সা দিয়ে যায়। ভাইয়ে ভাইয়ে ভালবাসা আছে। বউ মারা যাবার পর এক শালী নিয়ে রেখেছিল মেয়েকে। সেই অতটুকু মেয়েকে বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এখন বছর বছরে তার হতে আরম্ভ করেছে, কটা দেখবে সে। তাই হরষিতের মেয়ে ফেরৎ দিয়ে গেছে। এক কোঁটা মেয়ে নিয়ে মহা বিপদে পড়েছে হরষিত। এই ক'মাসে স্নেহ অস্থির হয়ে উঠেছে। ভেবেছিল আর বিয়ে করবে না। এখন দেখছে না-করে আর উপায় নাই। শুধু মেয়ের জন্তে নয়, তার নিজের জন্তেও বিয়ে করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। হরষিতের বয়স পায় দু'কুড়ি হবে। যোগ্য মেয়ের সন্ধান ঠিক পাচ্ছে না। যারা খোঁজ নিয়ে আসছে তারা হরষিতের মনের মত পাত্রীর খবর আনতে পারছে না !

চাঁপা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। হরষিতের সংসারে কাজকর্ম করে, মেয়ে রাখে। তার ত আর কোনো নিরাপদ আশ্রয় নাই তাই এখানেই অযাচিত ভাবে রয়ে গেছে। কতদিন এভাবে থাকবে সে নিজেও বুঝে উঠতে পারছে না। হরষিতের মন সে বুঝতে

পারে না। তার ডাব মুখ ফুটে বললেই সে তাকে যে-কোন জায়গাতে নিজে গিয়ে রেখে আসবে। বিরুদ্ধি করবে না। কিন্তু যাবে কোথায় চাঁপা? পুকের বিলে তার আর ফিরে যাওয়া চলে না। সেখানে হয় তাকে অব্যাহিত জীবন যাপন করতে হবে নয়ত-বা অপমানে অনাহারে মরতে হবে। তার মরণই ছিল একমাত্র পরিত্রাণের উপায়। হরষিতের এই পরোপকারটুকু কি না-করলেই চলছিল না। হরষিতের উপর রাগ হয় চাঁপার। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্তে। নিবিরোধ ঐ লোকটির উপর রাগ বেশিক্ষণ থাকে না। এমন সরল, এমন ছেলেমানুষ সে আর ছুটি দেখেনি। মাঝে মাঝে এমন ডাব দেখায়-যে চাঁপা বলে যে বাইরের একটি নেয়েমানুষ সংসারে আছে তা তার মনেও হয় না। যেন কতকালের আপনজন, যার হাতে নিজেকে পরিস্কার গঁপে নেওয়া যায়। অঞ্চ মুখ ফুটে একবার প্রশ্নও করে না, কোথায় যাবে তুমি, কে আছে তোমার। এখানে থাকতে চাও, থাক। কোনো অসুবিধা হবে না। এ তোমার নিজের বাড়ির মত। চাঁপাদের গাঁয়ে মোক্ষদা পিসি ও এমন এক পাতানো ডাই-এর সংসারে সারাজীবন কাটিয়ে গেল।

আসেপাশের স্বজাতির। এরই মধ্যে মুখ টেপাটেপি করে হাসাহাসি করছে। হরষিত নিবিকার। ছুনিয়াকে সে এত সহজ সরল মনে করে-যে তাতেই আত্মীয় স্বজনেরা তার বিরুদ্ধে আক্রমণ পায়। ধীরে ধীরে হরষিত সংসারের যাবতীয় ভার তুলে দিয়েছে চাঁপার হাতে। ভাবখানা যেন চাঁপা চিরকালেই এখানে থাকবে আপনলোকের মত। চাঁপা শুনেছে হরষিত শীগগির বিয়ে করবে। তখন সে যাবে কোথায়? হরষিত তখন নিশ্চয় এত খাতির করে বাড়িতে রাখবে না। তার ভবিষ্যত নাই, তার আশ্রয় নাই। বাইরে বুনোপশুর মত রাঘবরা ওৎ পেতে বসে আছে। তার বয়সই তাকে বাঁচার মত বাঁচতে দেবে না। হরষিত তাকে বাঁচিয়ে মরার পরে খাঁড়ার ঘা মেয়েছে। সে তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

নিজের সম্বন্ধে এই অন্তঃসন্দেহ কদিন ধরে চাঁপা অস্থির হয়ে উঠেছে। হরষিত ছেলেমানুষের মত কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে সেও ত আর চুপ করে থাকতে পারে না।

হরষিত খেতে বসেছে। চাঁপা তাকে ডাত দিয়ে সামনে বসেছে।

অনেক ভেবে চিন্তে চাঁপা আস্তে আস্তে বলল, এতদিন রয়েছি এখানে, পাঁচজনে পাঁচ কথা কতেছে।

হরষিত মুখ না-তুলে বলল, কখি দেও, আনাগো গায়েত আর ফোকা পড়েনি তাতে। ভগমান আছেন, তিনি দেখতিছেন সব।

চাঁপা কি ভেবে বলল, আজ সব কথা কবো তোমারে।

কবো কেন, এখনি কও। খাতি খাতি সব শুনি সমাচার।

চাঁপা তার জীবনের সব ঘটনা বলে গেল। কিছুই বাদ দিল না। তার সৌভাগ্য, তার দুর্ভাগ্য, তার নদীতে ঝাঁপ দেবার কথা, সব সবিস্তারে বলল।

শুনতে শুনতে হরষিতের চোখ ছল ছল করে উঠল। আ হা হা, ভগমান দেখ আমারে ঠিক সময়ে পেঠায়ে দিলেন।

চাঁপা সব কথা শেষ করে প্রশ্ন করল, এখন কনে আনি যাই কও।

হরষিত বলল, এখানে যদি থাকতি চাও মাথায় করে রাখব !

আর দু'দিন বাদে বউ আসে যদি খেদায়ে দেয় !

কার বউ ?

কেন তোমার !

সেত মরে ভুত হইছে ।

আবার যে বিয়ে করবা শোনলান ।

তুনি থাকলি দরকারডা কি !

বলে কি লোকটা । চাঁপার কান দুটো লজ্জার লাল হয়ে উঠল ।

কথাটি বলে ফেলে আর চাঁপার মুখ দেখে হরষিত বুঝল এ-কথা বলা ঠিক হয়নি তার । তাই সংশোধন করে বলল, মানে তুনি নিজির লোকের মত গনসারডা দেখবা, রাখবা, মায়েডারে পালবা । বুঝলে না, কোয়ান খে চিনি-না তুনি-না এটা মায়েলোক আনে ঘরে ঢুকাবে ।

চাঁপাকে যেন সে একেবারে ভেনেতুনে ফেলেছে । তার ছেলেমানুষের মত কথা শুনে এবার চাঁপা হেসে ফেলল ।

চাঁপা কথাটি প্রকাশ করতে চায়নি । অসন্তক ভাবে কথাটি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল । ও আমারে যি রাখতি চাও ।

যি ! কও যদি তোমারে—

চাঁপার বুকের ভেতর চিপচিপ করতে লাগল । হঠাৎ বলে ফেলেছে কথাটা কিন্তু উত্তরে হরষিত যদি আরও এগিয়ে যায় । হরষিত তার কথা এখনও শেষ করেনি । মুখ নিচু করলেও কান খাড়া করে রাখল চাঁপা ।

হরষিত কিন্তু কথা শেষ করল না সেদিন ।

চাঁপার মনের ভেতর তুমুল ঝড় বইছে । মুখে কিছু না-বললেও হরষিতের চোখ দেখে মনে হয় তারও মনে অনাস্তি, কি-যেন সে বলতে চায় । অথচ কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না । কলের মত যে বার কাজ করে যায় ।

চাঁপা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিল ।

হরষিত বাইরে থেকে এসে কাছে দাঁড়াল ।

চাঁপা মুখ ফিরিয়ে নিতেই হরষিত হঠাৎ তার দু'হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল ।

কি, কও কি !

চাঁপা আর না বলে পারল না ।

তুনি দুগ্গির মা হবা ? আমারে কেলেশ আর দিও না ।

হরষিত জবাব চায় এখনি । ভেমন করে হাত ধরে সে চাঁপার মুখের দিকে উত্তরের প্রত্যাশায় তাকিয়ে রইল ।

জীবনের পরে বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল । বাঁচতে এতটুকু সাধ ছিল না চাঁপার । মুখে বলতে নাই হরষিতের সংসারে আশ্রয় পেয়ে তার বাঁচতে ইচ্ছা হয়েছে । অনিশ্চিত হোক, অসম্ভব হোক, একটা স্বপ্ন তাকে আনন্দ দিত মাঝে

যাবে। যে আশাতরু পুড়ে কাঠ হয়েছিল তাতে যেন ফাগুনের হাওয়ায় কচি পাতা ধরছে।

কও, মা হবা ছুগু গির ? আনার গনসারে নক্ষী হবা।

সেদিনকার অসমাপ্ত বাক্য আজ শেষ করল হরষিত। আবেগের বশে একাধিক বার পুনরাবৃত্তি করল।

চাঁপা উত্তর দেবে কি তার কঠ রোধ হয়েছে। সমস্ত শরীর কাঁপছে। মনে হল যেন এখুনি সে জ্ঞান হারাবে। মাথার ভেতর ঝিমঝিম করছে, চোখের সামনে অন্ধকার। এ দৈহিক উত্তেজনায় কষ্ট নাই, অবসাদে আনন্দ আছে, ভাবনা চিন্তা হীন আত্মসমর্পণের একাগ্রতা আছে। পা টলে যেন পড়ল। কিন্তু আশ্রয় আছে তাই আঘাত পেল না।

হরষিতের উষ্ণ রোমশ বুকে স্নেহের উত্তাপের স্পর্শ পেল চাঁপা। ছ'হাত দিয়ে সে পুরুষকে জড়িয়ে ধরল। এইত চাঁপার চরম উত্তর।

// ২৮ //

মজুতখালি আর পুকের বিল সে যেন দুঃস্বপ্নের দীপ। মা মরে গেছে। বাপও কি বেঁচে আছে? নটবর, অক্ষয়, শংকরী আরও কত যেন গতজন্মের পরিচিত আত্মীয়। চাঁপার সত্যিই নবজন্ম হয়েছে। ভৈরবের জলে ঝাঁপ দিয়ে সে মরেছে আবার জন্ম নিয়েছে। নতুন করে ঘর বেঁধেছে অনেক আশা নিয়ে। কিন্তু পরজন্মের মত সে বিস্মৃতি কই। সবাইকে মনে পড়ে। অক্ষয়কে মনে হয় খেলার সাথী। মারামারি হয়েছে, আবার ভাবও হয়েছে। নাবালিকার বিবাহিতজীবনে অক্ষয়ের এর বেশি পরিচয় নাই। যখন সবে সে নারীত্বের মর্যাদায় আসন নিয়েছে তখন অক্ষয় পালিয়ে গিয়ে বিদেশে প্রাণ দিয়েছে। নটবরের সংসারে অনেক আদর সে পেয়েছে কিন্তু শেষের চার পাঁচ বছর ধরে যে অমানুষিক নির্ধাতন আর কষ্ট সে পেয়েছে তাতে সব আনন্দের স্মৃতি অতলে ডুবেছে। থাক, সে জীবনের অসুখবর্তনে আর প্রয়োজন নাই। সব সে ভুলবে।

বিবাহিত জীবন এই যেন তার শুরু হল। এ কদিনেই হরষিতের সংসারে সে গৃহিণীর পূর্ণ মর্যাদা পেয়েছে। হরষিত যেন তার অনেকদিনের আপন জন। মেয়ে যেন সেই পেটে ধরেছে। স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবনের মহিমাময়ী রূপ দেখা দিয়েছে চাঁপার দেহে। নতুন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে সে সহজ সরল হয়ে হরষিতের সংসারে আনন্দের বান ডেকে এনেছে।

ও কেডারে?

ও ছুগুঁর মারে।

হরষিতের বো?

হ।

স্বভাতি স্বগ্রামবাসীদের সহজ স্বীকৃতি! চাঁপা এখন তাদেরই একজন।

হরষিত যা রোজগার করে নিবিবাদে তাই এনে নতুন বৌএর হাতে ভুলে দেয় । তার কোনো বদ খেয়াল নাই । সংসারী মানুষ । কিসে ছ'পয়সা হবে তার সেদিকে দৃষ্টি । সবাই ভালবাসে তাকে !

বাড়িতে চুকেই হরষিত চিৎকার আরম্ভ করল ।

কই, কনে গেলে ? ও নতুন বৌ—

চাঁপা রান্না করতে করতে মুখ টিপে হাসে । কোনো জবাব দেয় না ।

হরষিত রান্না ঘরে চুকে বলে, কথা কত্টিছ না যে !

চাঁপা গম্ভীর হবার ভান করে বলে, কি কব কও !

হরষিত এবার ঘনিষ্ট হয়ে বসে চাঁপার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, হুতো টেকা দেও নক্ষী ।

কেন, করবা কি টেকা দিয়ে ?

উমেশ চাতেছে । বড় মুস্তিলি পড়িছে বেটা !

চাঁপা ঝংকার দিয়ে উঠল, কি মাসে ওরে টেকা দিতি হবে কেন ! একবার নিলি দেবার ত নাম করে না ।

হরষিত কি যেন বলবার চেষ্টা করল কিন্তু চাঁপার গলার আওয়াজে তা ডুবে গেল ।

আর কেউ নেই বেটার যে তোমার পাছে পাছে ঘোরে ! এ-কি জমিদারের ঝাঞ্জন দেও তুমি !

হরষিত হাসবার চেষ্টা করে বলল, ঝাঞ্জন ! কি যে কও তুমি, হেঁ হেঁ হেঁ !

ও হাসলি হবে কি ! টেকা বের হবে না । দান খয়রাৎ করে বার অনেক আছে । ছুগ্গি বড় হতিছে । ওরে মানুষ করতি হবে না ?

চাঁপা একবার না-করলে তাকে হাঁ-করানো হরষিতের সাধ্যের বাইরে । বউকে অগ্রাহ্য করবার সাহস নাই হরষিতের অথচ উমেশ-কে কথা দিয়েছে টাকা দেবে । সে বাইরে রাস্তায় অপেক্ষা করছে ! এখন করে কি সে ? বিষম মুখে মাথায় হাত দিয়ে হরষিত এসে দাওয়ার উপর বসল ।

তার ভাব দেখে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল । তারপর চালের হাড়ি থেকে একটা টাকা বের করে হরষিতের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, এই নেও, হুডে নয় এটা ! উমেশেরে বলো এবার ফেপা জাল একটা না-বানিয়ে দিলি সুদ সমেত টেকা উত্তল করব, তা বলে দিচ্ছি !

টাকা পেয়ে যেন কৃতার্থ হয়ে গেছে এমন ভাব দেখিয়ে হরষিত বলল, না সে তুমি নিশ্চিলি থাক, জাল সে এবার এটা দেবেনে !

সংসার দিব্যি গুছিয়ে নিয়েছে চাঁপা । জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে সে, স্বামী সন্তান নিয়ে ঘর সংসার করবার সব আশা নির্মূল হয়েছিল । এখন স্বেয়োগ হয়েছে আশ মিটিয়ে সংসার করছে সে । হরষিতের পরিবারে কোনো অশান্তি নাই । এখন কোন ছুঃখ নাই চাঁপার । হরষিত রোজগার করে । চাঁপাও বসে থাকে না । ডালা কুলো বানাবার অভ্যাস সে ছাড়ে নাই । মাঝে মাঝে নিজেই হাটে গিয়ে বিক্রি করে খুশি মত গুদা করে নিয়ে আসে । এখন তার আবার ভয় কিসের ।

হরষিতের সংসারে এমন শ্রী আগে কখনও আসেনি। চাঁপার মত বউ পাওয়া হরষিতের কল্পনার বাইরে ছিল। সুন্দরী বউ পেয়ে নাককাটি খালের একটা মাতব্বর হয়ে গেছে হরষিত ! তারপর চাঁপার কোল ছোড়া ছেলে এসেছে। হরষিতের বংশ লোপ পাবে বলে যারা ঠাট্টা করে হেসেছিল তারা এবার লজ্জা পেয়েছে। এমন ছেলেও আসে যুটির ঘরে। যেন কুটকুটে কাতিক !

চাঁপা ছেলে ঘরের দিকে তাকায় আর তাকায় হরষিতের বলিষ্ট বাহুর দিকে ! ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখে দিন দিন লক্ষ্মীর রূপা বাড়ছে ! দিনের পর দিন নির্ভাবনায় কেটে যায়। বছর আসে, বছর যায়। চাঁপা স্বামী সন্তান নিয়ে আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় স্বপ্নে দিন কাটায় !

[ক্রমশ]

বোড়ো গ্রামের লুপ্ত কাহিনী

সত্যেন রায়

গত পূজা সংখ্যার 'পরিচয়ে' শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের লেখা "বোড়োর বলরাম বিগ্রহ"-এর কথা পড়েছিলাম। বিগ্রহ পূজা ও উৎসবের আচারে কিছু বিশেষত্ব আছে এটা আমার মনে কিছু ঔৎসুক্য ও নেশা জাগিয়েছিল। তাই হঠাৎ আমিও উদ্ভোগী হলাম বোড়ো গ্রামে একবার ঘুরে আসার জন্যে।

পথ জানা ছিল না। তবে আমার ঐতিভাঙ্গন শ্রীমান জহর সেনগুপ্ত ওখানকার উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন—তার কাছে মন্দির ও গ্রামের কথা কিছু কিছু শুনেছি। বর্ধমান জেলার রায়না থানায় বোড়ো গ্রাম—শক্তিগড় স্টেশন থেকে সাত মাইল দক্ষিণে দামোদর পারিয়ে যেতে হয়। বর্তমানে সি-ডি-পি 'উন্নয়নী' বলে বড়গুল গ্রামে একটি কলোনী গড়েছেন। বড়গুল পর্যন্ত সরকারী রূপায় রাস্তা পাকা হয়েছে, বাগ বা সাইকেল-রিক্সায় যাওয়া চলে। তারপর 'শম্ভুপুরের' নিচে দামোদর পারিয়ে ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে প্রায় পাঁচ মাইল রাস্তা আলপথে হেঁটে যেতে হয়। পথ বড় দুর্গম। শুনলাম ধান ওঠার পর গরুর গাড়ীর পথ পড়ে।

রাস্তার কষ্ট কাটিয়ে গাঁয়ে পৌঁছানো গেল। গ্রামের প্রাচীনব্যক্তি বলতে শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বলরামের জ্যৈষ্ঠ সেবাইত। প্রাচীন তথ্যসম্বন্ধানী বলে আমাকে অত্যন্ত স্নেহে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসায় জানলাম, বলরাম বিগ্রহ নাকি বহু প্রাচীন, ঠিক কত দিনের পুরোনো তার নির্দিষ্ট কিছু নেই, কেউ বলতে পারে না।

গ্রামের মাটিতে প্রত্নতত্ত্বের মালমসলা কিছু পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করায় জানলাম, পাথরের ফলকের উপর খোদাই করা কতকগুলি কুর্ম, বিষ্ণু রথচক্র ও অজানা মূর্তি স্থানীয় প্রাচীন খেলি-দীঘির মধ্যে-যাওয়া অংশবিশেষে পক্ষোদ্ধারকালে প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে পাওয়া গিয়েছিল। এই দীর্ঘকালে আর কোনো পুঙ্করিণী খনন হয়নি বস্তুর ভয়ে। বালি পলি জমার ফলে সাবেককালের আসল মাটি চাপা পড়েছে। পলিজমা বাঙলার মাটিতে এমনি ধারা পরিবর্তন বিরল নয়। এগুলিকে গোপন প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চল বলা চলে। অবশ্য জনশ্রুতি শক্তিগড়, বড়গুল ও বোড়া এ-অঞ্চলের প্রাচীনতম জনপদ। মূর্তিগুলি জিজ্ঞাসু মনের অভাবে অবহেলিত হয়েছে। উপেক্ষায় নিকটস্থ এক অশ্বখ গাছের তলায় ফেলে রাখা হয়েছিল। তারপর কত বস্তা এসেছে, কত পলি বালি জমেছে স্তরে স্তরে তার কোনো হদিস নেই—তবে, একটা বিষ্ণুমূর্তির অতি ক্ষীণ অবশিষ্ট দেখতে পেলাম। মস্তকহীন চটনা ওঠা মূর্তি, পালরাজাদের আমলের বিষ্ণুমূর্তির অমূরুপ গড়নের। গাঁয়ের মেয়েরা সিঁহুর ও দিয়ে থাকেন। আর কয়েকটি ধর্মের প্রতীকচিহ্ন পাথরও পড়ে আছে। কুপ খনন কালে অনেকখানি মাটির নিচে থেকে পুরোনো আমলের ইঁটের গাঁথনি ও রাবিস নাকি পাওয়া গিয়েছিলো। তবে তমলুক, বানগড়, চক্রকেতুগড়, হরিনারায়ণপুর ও আটঘরা

প্রভৃতি অঞ্চলে যেমন গটারী ও পুতুল প্রভৃতি প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে, এখানে বস্তুর পলিঙ্কনার ফলে তেমন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা চের কম। বোড়ো গ্রামের পূর্বদক্ষিণ গ্রামের নাম দেয়িয়াপুর বা দরিয়াপুর—নদীপ্রান্তিক গ্রাম বলে মনে করা যায়। দেয়িয়াপুরের পশ্চিমে ‘দক্ষিণকুল’ হয়তো প্রাচীন কোনো নদীর উত্তর সীমানায় বা বৃহৎ ভূখণ্ডের সংলগ্ন সামুদ্রিক খাড়ীর উপকূলে অবস্থিত ছিল। বোড়ো গাঁয়ের পূর্বে বালাগড়, হয়তো কোনো রাজার রাজধানী বা দুর্গের অবস্থান ছিল, অধুনা তেমন কোনও নিদর্শনের কিছু পাওয়া যায় না।

হয়তো বোড়ো গ্রামের যথেষ্ট প্রাচীনত্ব ছিল, কিন্তু প্রচুর প্রামাণিক বস্তুর অভাবে তা এখন প্রমাণ সাপেক্ষ। তবে গ্রামের প্রাচীন দেবমন্দির দেখলে কিছুটা অনুমান করা চলে। মন্দিরটি, অবশ্য তার ইঁটের ভদ্রী দেখলে, তিন-চারশত বছরের বেশি বলে মনে হয় না যদিও স্থাপত্য অনেকটা বৌদ্ধ-বিহারের অনুরূপ। অবশ্য রাতের দেবালয়গুলির অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে, সে-হিসেবে এরও ব্যত্যয় নেই। বর্তমান মন্দির গ্রামের সব থেকে উচ্চতম অংশে অবস্থিত। শুনলাম, বস্তুর মূল খুব বেশি বাকুলেও বলরাম মন্দিরের চত্বরে ওঠার প্রথম ধাপের উপরে ওঠে না।

দেখলে মনে হয়, বর্তমান মন্দির সম্ভবত কোনও প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়া হয়েছিল। এখনও মন্দির প্রাঙ্গণের বেষ্টনীর বাইরে এমনি ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন আছে। মূল মন্দিরের দক্ষিণে বিগ্ৰহহীন একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ও ভিন্নচণ্ডের স্থাপত্যপূর্ণ মন্দির দেখা যায়। স্থানীয় প্রবাদ যে বিশ্বকর্মা মন্দির নির্মাণ করছিলেন নিশাযোগে, কিন্তু বিগ্ৰহ স্থাপনের আগেই প্রভাত হওয়ায় আর বিগ্ৰহ স্থাপন করা হয়ে ওঠেনি।

সম্ভবত ঔরঙ্গজেব-কালাপাহাড়ী আমলে হিন্দুর মন্দির স্থাপত্য ও বিগ্ৰহ ধ্বংসের যে প্রাবল্য লেগেছিল, সেই আমলে এখানকার প্রাচীন বিগ্ৰহাদি ও মন্দির ধ্বংস হয়েছিল ও পরবর্তীকালে কোনও ভক্তমানসের দান হোলো এই বর্তমান মন্দির। প্রাচীনকালের খেন্নি-দীঘির পঙ্কোদ্ধারকালে হয়তো সেই সকল নিষাভীত ও অপসারিত বিগ্ৰহের দেখা পাওয়া গিয়েছিল, এমন অনুমান করা বিচিত্র নয়। এসবই অবশ্য অনুমান-গ্রাহ্য ব্যাপার।

বর্তমান বিগ্ৰহ ‘বলরাম’ বা স্থানীয় লোকেরা বলেন বলাইচাঁদ। প্রতি গ্রামবাসী প্রাণের ভক্তি দিয়ে উচ্চারণ করেন গ্রাম-দেবতার নাম আর সবাই তাঁর প্রত্যক্ষ জাগ্রত স্বরূপে সন্দেহভীতভাবে বিশ্বাসী। বিগ্ৰহ বলরামের চৌদ্দখানি হাত—শখ, চক্র, গদা, পদ্ম, হল ও মূল এই কয়টি আয়ুধ বাকি হাত ক’টি খালি। মূর্তি দারুণময়। নিমকাঠের খোদাই করা। মাথায় মুকুট, তার উপর তেরটি সর্প ফণা। প্রবাদ আছে চৌদ্দটি সাপ ছিল, কিন্তু একবার কাকে নাকি সাপে কামড়ায় তার কলে একটা সাপ কমে গিয়েছে। হিংস্রটে সাপকে বলরাম আর গ্রহণ করেননি।

বিগ্ৰহ নিমকাঠের উপর গজামটির প্রলেপ দিয়ে সাদা রঙ করা। বাঘছালের মতো করে শাড়ী পরানো। চোখ দুটি বৃহৎ ও একটু গোলালো ধরনের—অনেকটা পুরীর জগন্নাথ বিগ্ৰহের মতো। কণ্ঠের কাছে বর্ণ নীল। অন্ত্রাঙ্গ সারা দেহ সাদা, পায়ে কেউর হুপুয় আর গোঁপও আছে।

চৌদ্দ হস্তযুক্ত বিগ্রহের কথা কোথাও শোনা যায় না। তবে বিগ্রহের সংগঠনের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বিগ্রহের মধ্যে বিষ্ণু, বলরাম, স্তম্ভদ্রা (নারীস্বরের প্রতীক) মহাদেব, ধর্ম এমনি ধরনের মিত্র-দেবতার পরিকল্পনা হয়েছে একটি মূর্তির মধ্যে।

বিষ্ণু (কৃষ্ণ)-বলরাম পুরুষ বিগ্রহ হোলেও গোঁপ নেই। একমাত্র মহাদেব ছাড়া অন্য বিগ্রহের শ্মশ্রু-গুম্ফহীন, চাঁচা-ছোলা মুখাবয়ব দেখা যায়। স্তম্ভদ্রা গোঁপ ও নীলকণ্ঠ শিবের মূর্তির প্রতীক-চিহ্ন স্বরূপ মনে করা যেতে পারে। মস্তকের তেরটি ফণাযুক্ত সর্প স্বভাবতই বাসুকী বা মনসা এননি কোনো সর্পদেবতার পরিকল্পনা বলে ধরে নিলে বোধহয় ভ্রমাত্মক হবে না।—মহাদেবও নাগশীর্ষ বটে। বিগ্রহের মস্তকে মুকুট, বিষ্ণুর রাজ-রাজেশ্বর মূর্তি বলে ধরে নেওয়া যায় আর সর্পকে কৃষ্ণ বিগ্রহে যোগ করলে মূর্তিটি দাঁড়ায় অনন্ত-বাসুদেবের, তবে অহিচ্ছত্র সাধারণতা বলরামেই প্রত্যাক। চন্ডি নাম স্থানীয় কেউ কেউ বললেন মূর্তিটি অনন্ত বাসুদেবও বলা হয়। হল ও মূল বলরামের আয়ুধ। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিষ্ণুর আয়ুধ। শাড়ী পরিধান থাকায় পুরীর জগন্নাথ বিগ্রহের ত্রিমূর্তির যুক্ত পরিকল্পনার ব্যতায় হয় না। উপরন্তু আমরা পাই নীলকণ্ঠ, গুম্ফ ও দেহের গঠনভাবে ও পরিধানের বস্ত্র-বিন্যাসে দেবাদিদেব মহাদেবের পরিকল্পনা। বিগ্রহের পিছনে একখানি ধর্ম-প্রতীক পাথর রাখা আছে।

এসব থেকে হয়তো এমন সন্দেহ করা অমূলক হয় না যে, কোনও সার্বজনীন ও ধর্মের সর্বদলীয় মতবাদের মধ্যে এক সামঞ্জস্য বজায় রেখে বিগ্রহের মূর্তি কল্পনা করা হয়েছিল। শৈব, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকধর্ম সমন্বয়ে এক নবকল্পনার দেব-বিগ্রহ স্থাপন করা হয়েছিল, এ-কথাও অনুমান করা যেতে পারে।

এই বিগ্রহ যে কবে কোন মহাপুরুষ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার ঠিক ইতিহাস জানা যায় না, তবে উৎসবের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, পুরীর জগন্নাথ বিগ্রহের চন্দনযাত্রা আরম্ভ হয় অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে। এখানেও দেখা যাচ্ছে ঐ দিন বিগ্রহের স্নান করানোর প্রথা বর্তমান। স্থানীয় লোকেরা বলেন, গা-ধোয়ানো। গা-ধোয়ানোর ফলে বর্ণ-সমৃদ্ধ গঙ্গার পলিমাটি ধুয়ে যায়, তারপর তিন দিন বাদে স্তম্ভদ্রা আসেন ও পুনরায় নুতন করে যুক্তিকার প্রলেপ দিয়ে নব-কলেবর দান করেন। ইহা জগন্নাথ বিগ্রহের অনুকল্প ক্রিয়াচার বৈকি। অক্ষয় তৃতীয়ার পর চতুর্দশীতে (নৃসিংহ চতুর্দশী) দেবতার চক্ষুদান করা হয়। ইহাও বৈষ্ণব ধর্মের অনুকল্প ক্রিয়াচার। তারপর আরম্ভ হয় গাজন। শিবের গাজন সাধারণত চৈত্র সংক্রান্তির সময় হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে গাজন হয় নৃসিংহ চতুর্দশীর পর। সম্যাসীরা গৈরিক বাস পরেন না—নতুন সাদা বস্ত্র ও সাদা গামছা পরেন, গলার স্তম্ভ হনুদ-ছোপানো উত্তরীয়, তবে পূজার সময় উপবীতের আকারে নেওয়ার প্রথা আছে। গাজনের পূজায় যে মন্ত্রপাঠ হয় তা শিবের গাজনের অনুকূল। স্তম্ভদ্রা বৈষ্ণব বিগ্রহে শৈব সমন্বয় যে আছে এ বিষয়ে নিশ্চিত্তে সায় দেওয়া যায়। অনুন্নতশ্রেণীর লোকেরাই এই গাজনের সম্যাসী হন। কেবলমাত্র মূল-সম্যাসী হন কায়স্থ। গাজনের সম্যাসীদের মাথার উপর দিয়ে একজন উপবীতধারী ব্রাহ্মণ কুমারকে চড়িয়ে নেওয়া হয়। শিবের গাজনে ও ধর্মের গাজনেও এ-প্রথা বর্তমান। গাজন হয় তিন দিন ধরে, প্রথম দু'দিন

সন্ন্যাসীরা নানা অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে নৃত্য করেন। তিনদিনের দিন বা শেষ দিন হুটো বস্তায় খড়-কুটো ভরে মাটিতে রাখা হয় ও একতলা উঁচু থেকে সন্ন্যাসীরা তার উপর ঝাঁপ খান। একে বলে পাট ভাঙা। আগের দু'দিন গভীর রাত্রে বাস্তু সহকারে সন্ন্যাসীরা যে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করেন তাকে “পিঁপড়ে সার” ও “মাথা চালা” বলা হয়।

বিগ্রহের রূপ পরিকল্পনায় শিবের মূর্তি সমন্বয় আগেই লক্ষ্য করা গেছে, তারপর এই গাঙ্গন উৎসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ শৈব ও ধর্মীয় ধারা সংযোজিত থাকায়, উপরোক্ত মিশ্র দেবতার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হয়।

নিত্যপূজায় সাতসের আতপচালের ভাত, ডাল, ভাজা ও পরমায় দেওয়ার প্রথা আছে। পরমায় বলরামের অতি প্রিয় ভোজ্য ও তাঁর ভোগের অপরিহার্য অংগ। সন্ধ্যায় ‘শীতুলী’ হয় হুধ মিষ্টি দিয়ে। আরত্রিক হয় খোল করতাল বাস্তু যোগে আর কীর্তন হয় বৈষ্ণব কীর্তনের পদাবলী যোগে। এ ছাড়া বলরামের বিশেষ সংস্কৃত আছে—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম হল ও মুঘলধারী ইত্যাদি। বলরামের ধ্যানমন্ত্রও বিশেষ ধরনের, বিশেষ করে স্তবের মধ্যে, আমরা লক্ষ্য করছি,—

“রক্তান্তোদিশ্ব পেতোন্নস দরুন সরোজাদিরুচা করাট্রৈঃ পাশঃ কোদন্তমিকুন্তব মণ্ডপাশ্চক্ষুশঃ পঞ্চবানান্ বিভাণা স্কপাল ত্রিনয়ন ললিতাপীন বক্ষোরুহা দেবীবার্লার্ক বর্ণা ভবতু ভূতকরী প্রাণশক্তিঃ পরাণঃ।” এখানেও নারী-পুরুষ ও মিত্রবিগ্রহের বর্ণনা পাচ্ছি।

এ থেকে মনে হয় কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সংসাধন মানসেই এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকবে।

গাঙ্গনোপলক্ষে তিন-চার দিন ব্যাপী মেলা বসে। নানান্ গ্রামের যাত্রী ও পসারীরা মেলায় কেনা-বেচা করতে সন্মিলিত হন। এ ছাড়া মকর-সংক্রান্তিতে বাহায়-ভোগ ও শ্রীপঞ্চমীতে মেলা বসে থাকে। আমরা জগন্নাথের নিত্যপূজায় এমনি বাহায়-ভোগের প্রথা দেখি। বর্ধমান মহারাজার ৩৬০ বিঘা জমি উক্ত দেবসেবার ক্ষত্ব নিকর দেওয়া আছে।

বাংলাদেশে বলরাম বিগ্রহ আরও কয়েকটি দেখা গেছে বটে কিন্তু এমনি ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ চৌদ্দহাতযুক্ত বিগ্রহ বিরল। অস্ফাঙ্ক মূর্তিগুলি প্রস্তরনির্মিত। ছয়, আট বা বারো হাত যুক্ত, কিন্তু এটি কাঠের তৈরী। এ থেকে অনুমান করা যায় পূর্ব দৃষ্ট বলরাম বিগ্রহগুলি আনুমানিক একাদশশতাব্দির হলেও এটির শিল্পলক্ষণায় তার সমসাময়িক বলা চলে না।

পূর্ব বর্ণনানুযায়ী যদি মিশ্র বিগ্রহের পরিকল্পনার কথা ধরে নেওয়া যায়, তা’হলে আমরা মনে করতে পারি চৈতন্যের ধর্মপ্রচারকালে শৈব তান্ত্রিক প্রভৃতি ধর্মমতের সমন্বয়ে হয়তো বৈষ্ণব ধর্মের কোনও প্রচারক এমনি এক বিগ্রহ পরিকল্পনায় বলরাম-বিষ্ণু-শিব ধর্মাদিকে একীভূত করে ‘বিষ্ণু-বলরাম প্রাধাত্য দ্বারা শৈবতন্ত্রাদি ধর্মমতকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধাত্যের ছায়ায় আনার সুকৌশল চেষ্টা করেছিলেন। এসব দিকে লক্ষ্য রাখলে, বলা চলে, বর্তমান বিগ্রহের স্থাপনাকাল দাক্ষিণ্যের শেষ যুগ সপ্তদশ শতাব্দির ওধারে যায় না।

রুদ্র বসন্ত

রামেন্দ্র দেশমুখা

এপারে

শেওলা-জড়ানো একটি প্রাচীন মন্দিরের
সমস্ত শরীরে চাপ চাপ রক্ত ।
আর, নিচে মুছিত হয়ে আছে
বসন্তের লতা-মাধবী ।

চালু পাড়ের নিচেই নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে
ঝাঁকড়া চুল, রাঙা কাপড়ে এক কাপালিক
পাহাড়ে ও জলে মেশানো তন্ময় গোধূলিতে
বিশাল নদীর মাঝখানে সেই বিখ্যাত
ভৈরবের মন্দিরের দিকে তাকিয়ে ।

বিশ্বয়ে সেদিকে চেয়ে চেয়ে
হঠাৎ

আনন্দে আনি শিউরে উঠলান ।
অহো, ভুলেই গিয়েছিলেন,
সে আমাদের পাহাড়তলীর মায়াবী ।
তার দেশে এখন উৎসবের শুরু
যখন আকাশে রক্তের প্রবল বিকীরণ ।
এবং জলে ফুল ভাসাবার কাল
টকটকে লাল করবী
আর গঙ্গনে লাল শিমুলের ।

পোড়ামাটির দেশ কলকাতা
রূপকথার পাখরময় পুরী,
কিন্তু এখানে সমস্ত শহরটাই মাটির ।
গোহাটির চাতালে বিশাল নদী,
মন্দিরের গায়ে ফুলেরই রক্ত,
কাপালিক এক রক্ত-করবীর গাছ ।
আকাশে জ্যোৎস্নার আঁচ দেবার আগে
সবটাই বসন্তের জাহ্নু যেখানে ।

পাঁচটি প্রেমের কবিতা

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

। ১ ।

। যারা পরস্পরকে ।

যারা পরস্পরকে খুঁজছিল, তারা এবার তাদের স্মৃতি পেল ।
পরস্পরের চোখের দিকে তারা তাকিয়ে দেখল । মনে হল, প্রথমে
বুঝি স্মৃতি যাবে না, হয়তো সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে স্মৃতি দেবে ।
চোখের দিকে তারা তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ, জলাশয়ের দিকে
ভ্রমার্ত মানুষ যেভাবে তাকিয়ে থাকে । তারা তাকিয়ে দেখল :
তারা পরস্পরকে খুঁজছে ।

তারা পরস্পরের দিকে চায়নি, তারা এড়িয়ে চলেছে । অনেকটা
মাতালের মতো রাস্তায় টলেটলে চলে গিয়েছে । রাস্তার লোকে
অবাক হয়ে তাকিয়েছে তাদের দিকে, হয়তো হেসেছে, হয়তো বা
কী ভেবেছে ; আবার একসময় ভুলে গিয়েছে । যারা পরস্পরের
দিকে তাকাল, তারা হাসল না ; তারা টলল, কখনও ভুলল না ।

দিন এল, দিন গেল । বছর এল, বছর একদিন চলে গেল । তারা ভুলল
রাস্তা, তারা ভুলল হাসি, তারা ভুলল অশ্রু কিছুর ভাব । কী ভাববে তারা ।
তারা ভাবে, কে যেন খুঁজছিল আর পেলনা । তারা হারিয়ে গিয়েছে
নাকি । বর্তমানের অন্বেষণ অতীতে নির্ভর হয়ে যাবে, আর ভবিষ্যৎ
অপরিচিত বর্তমানে এসে দাঁড়াবে । তাদের সেদিনকার নবীন অন্বেষণ
কীরকম জীর্ণপ্রাচীনতায় মুখ ঢাকবে । তারা সেদিন মুখ ঢাকবে, কারণ
তারা তাদেরকে পাবে না । পরস্পরের প্রাচীনতায় তারা হারিয়ে
গিয়েছে । এখন কী হবে ।

তারা একজায়গায় বসে বসে আঁক কাটে । যৌবন বসে নেই, কালের
আঁক তাদের চোখ-মুখে কী সুস্পষ্ট হয়েই না কুটে বেরুচ্ছে ।
এটি তারা খুঁজছে না ; যত্ন এসে গেলে সব অন্বেষণ শুরু হয়ে যাবে,
হারিয়ে যাবে তারা অচৈতন্যের স্তূপে । তা'হলে কী হবে । তারা জিগ্‌গেস
করে নীরবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে, পরস্পরের দিকে না-তাকিয়ে ।
মনে হল প্রথমে বুঝি বলা যাবে না, হয়তো সম্পূর্ণ অকণ্ঠিত হয়ে যাবে ।
শব্দহীন মুহূর্তের অস্থির মিছিল । চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল তারা
অনেকক্ষণ এককোঁটা উত্তরের অপেক্ষায় । তারা তাকিয়ে দেখল : পরস্পরের
চোখে জল ।

। ২ ।

। সে ।

হাজার মশাল আলিয়ে তার কাছে গেলাম । সে হাসল,
আর মশাল আলানো চেষ্টা তার দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল ।
হাজার মশালকে ছাপিয়ে একটি দৃষ্টি দিন হয়ে গেল ।

হাজার কথার ঝরনা তার নগ্ন গায়ে চাললান । সে হাসল,
তার একটিমাত্র অক্ষুটধ্বনির সিক্ততায় সমগ্র অঞ্চল
সমুদ্রে পরিণত হল । ঠেঁধে ঠেঁধ শব্দের সমুদ্র ।

হাজার চাহনি দিয়ে তাকে আঁকলাম । সে হাসল,
আর তার সমগ্রচোখে ছেয়ে গেল লাখোলাখো আকাশ ।
আমার সাধ্য কী আমি তার দিকে তাকাতে পারি ।

হাজার জীবনে নয়, শুধু এই জীবনে একটিমাত্র চাহনিতে
মাত্র-একটি কথায় এই একমোড়া চোখ নিরবধিকাল
স্নাতিক্রম করে চলেছে ।

। দিনরাত্রির স্রোত ।

পাহাড় থেকে পাহাড়ে ঝলকে ওঠে সূর্য । ঝরনার ধারার মতো
তিরতিরিয়ে এগিয়ে চলল সে । সে আজ তার অরণ্য ছেড়ে বেরিয়ে
এসেছে । পাথরের বুকে সে আর তার মুখ রাখেনি ।

পাহাড় থেকে পাহাড় সে পেরিয়ে যায় ।

পৃথিবীর আদিম ভদ্রার মতো সে একদিন গভীর গহিনে ছিল ;
কবে আলোকের অগ্র্যুৎপাতে তার চোখের দৃষ্টি ঠিকরে গেল,
কোথায় ছড়িয়ে গেল—আমি তা' বলতে পারব না । বোধহয়,
সেই দৃষ্টি ছড়িয়ে গেল আকাশে—সকাল হ'ল, সেই দৃষ্টি আছাড়
খেল মাটিতে—নদী হ'ল, সেই দৃষ্টি ছড়িয়ে গেল চোখে—উথলে
উঠল প্রেম ।

পৃথিবীর মতোই সে নিজেকে ধীরে ধীরে জানল । অরণ্যের লতায় পাতায়,
নদীর হুকুলভাঙা বন্যায়, আবেগের বিক্ষোভে । সে এখন বলতে পারে—
আমি চিনেছি । আমি কি বলব । আমি বলতে পারি, আমি তাকে
দেখেছি : পাহাড় থেকে পাহাড়ে সূর্যোদয়ের মতো, তার পিছনে
ছুটেছি, সে ঝরনার মতো জলতরঙ্গে একদিকে ছুটে গিয়েছে । আমি
এত অবাক হয়ে গেছি—আমার মুখ দিয়ে কথা ফোটে না ।
সেও কথা বলে না, পৃথিবীর আদিম আচ্ছন্নতার মতো তার
আশ্চর্য্যকর ভাবগভীরতা ।

এদিকে পাহাড় থেকে পাহাড় আলাদা করা যায় না । পৃথিবীর
অভ্যন্তরে গভীর ছলছল স্রোত । তার চোখে তা' স্থাখা যায় ।
সবি যেন উথলে ওঠে । উথলে ওঠে আরো অনেকে—অরণ্য,
আকাশ আর নদী । সে এখন বলতে পারে, আমি পেয়েছি ।
আমি কী বলব । আমি বলি, পাহাড় থেকে পাহাড়ে
ঝলকে ওঠে সূর্য, ঝরনার জলতরঙ্গে গান ; আর পাথরের
বুকে গভীর ভালোবাসা থাকে এই দিনরাত্রির স্রোত ।

। গ্রহণ ।

সারাটা পৃথিবী হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল । মনে হল, তাকে আর দেখা যাবে না । কিন্তু কী আশ্চর্য ! এরিমাঝে তাকেই ঝাঝা যায় বেশি । সবদিক জ্যোৎস্নার আলোকে তন্দ্রাময় হয়ে উঠেছে । ভাবতে অবাক লাগে—এখন জীবনের মতো দিন নেই, এখন মৃত্যুর মতো অঁধার নেই—এখন শুধু তন্দ্রার মতো জ্যোৎস্না ।

পৃথিবী আর ঝাঁড়াতে পারছে না । সবথেন ঘুরপাক খাচ্ছে—নাটি, নদী, অরণ্য, পাহাড়, মানুষের আদল লাটিমের মত ঘুরছে । কখনোই তারা থামছে না । লোকে ভাবে—ভূমিকম্প হচ্ছে । আমি বুকে হাত দিই । দেখি, সত্যিই আদিম পৃথিবীর সেই উত্তপ্ত আলোড়ন—সেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হবার ঐতিহাসিক স্তর ! কেউ বলে, গ্রহণ লেগেছে । আকাশের দিকে তাকায় তারা—তারপর যেন দলবেঁধে নারী-পুরুষ-শিশু নদীর ধারে জমা হয় । আমি তখন তার মুখের দিকে তাকাই—সত্যিই কিছু দেখতে পাই না । চারপাশে অন্ধকার-সাগর । বাতাসের দাপাপাপি, অরণ্যের তোলপাড় করা ভীক্ৰ গোড়ানি আর নাম-না-জানা প্রাণীদেহের অন্ধকার-গন্ধ—আমার সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেয় ।

সারাটা পৃথিবী ছলছে, সারাটা আকাশে গ্রহণ লেগেছে । সকলে লাটিমের মতো ঘুরছে, আর ছুটছে পদ্মপাল ঝড় । আমি ভাবি, কার এমন দুঃসাহস ! কে এমনকরে পৃথিবী-জল-বায়ু-সূর্যের কাছ থেকে জীবনের মদ কেড়ে নিতে পারে । আমি ভাবি, কে সেই পুরুষ ! যার ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিতে সারাটা বিশ্বে গ্রহণ লেগেছে ।

সারাটা পৃথিবী অন্ধকার । কিছুই ঝাঝা যায় না ।—আর ঝাঁড়ানও যায় না । সারাটা পৃথিবী নোকার মতো টলছে । কিন্তু কী আশ্চর্য ! এরি মাঝে তাকেই ঝাঝা যায় বেশি । সবদিক জ্যোৎস্নার তন্দ্রাময় আলোকে ভরে গেছে । ভাবতে অবাক লাগে, এখন জীবন নেই—দিনও নেই । এখন মৃত্যু নেই—অঁধারও নেই ! এখন শুধু তন্দ্রার মতো জ্যোৎস্নায় তাকে দেখছি—দেখছি শুধু ।

। যখন, নেই ।

যখন পাহাড় থাকে না
পথ গুলি চাঁদের আলোয় ভেসে যায়
নদীর জলে অসংখ্য রূপালি ঢেউয়ের মতো
অসংখ্য লোক ঘুরে বেড়ায়

পথে পথে ঘুরে বেড়ায় বালি-তাতা দিন
যখন সমুদ্র নেই
বালিরাশি সূর্যের আলোকে জলে ওঠে
আকাশের দিকে অসংখ্য চোখের মতো
রাশি রাশি বালিকণা চেয়ে থাকে

চেয়ে থাকে পাহাড়
যখন কেউ থাকে না
চেয়ে থাকে বালিরাশি
যখন সমুদ্র নেই
চেয়ে থাকে নদীর তীরের মতো তার চোখ
যখন আমাকে পাওয়া যায় না

চাঁদের আলোয় সবই ভেসে যায়
পাহাড়, অরণ্য, বালিরাশি আর থাকে না
সবই যেন উথলে-ওঠা জলরাশি
তখন রূপালি ঢেউয়ের মতো অসংখ্য চোখ
ঘুরে ঘুরে স্তাখে
যখন কিছুই স্তাখা যায় না ।

প্রাণ প্রেম প্রত্যুষ ও সন্ধ্যা

জ্যোতির্ময় গদোপাধ্যায়

। ৪ ।

যে-আলোয় তার মুখ দেখা যাবে
মনে হবে আরো
প্রেম তাকে দেবে ত্রিনয়ন

যে-আলোয় তার চোখের দুপাশে
শেতাজ্ঞ এনে
অভিমান অপস্রয়মান

যে-আলোয় ঠিক মনে হবে আরো
আকাশের খুব নিচে
আলোর পৃথিবী কণিক তমিষ্রায়

সেই সব আলো ভোরবেলা হয়ে আসে
চারিপাশ থেকে
আর এই অবকাশে
নবজন্মের মুখ দেখা যাবে তার ।

অন্ধকার ও অন্ধকারের যতোভয়
আছে আর থাকে যিরে বহুবিধ সংশয়
উৎকর্ষ ও উৎকর্ষের শতভয়
সন্ধ্যার নীড়ে পাবে সাময়িক আশ্রয়

অন্ধকার ও উৎকর্ষের অভিনয়,
শেবাবধি তবু বেঁচে থাকবার ছবি নয়

সে তো জানে মনে পাপ নেই
তাই তার অমৃত্যু নেই,
আলোর পৃথিবী খুব নিচে আকাশের
শ্রেণিক বলেছে, আমাদের আমাদের

স্নেতাশ্রু এলে তিমির তামসী শোকে
কতো ভোরবেলা আলো হয়ে আসে ফের

নায়িকার মতো মুক্কা নারীর প্রেমাক্ত হৃদি চোখে ।

নাগরিক

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

রাস্তায় পাগলের চোখে
হাতড়ানো বসন্তের বেলা ।

ফাস্তন এসে গেল, বন্ধু বলে ।
মন্দারের রক্তমাখা ডাল ;
ভাবনা নেই
মেঘ আর কুলের রঙে রুচি চলে গেছে ।

হৃপ্তির জ্বালায় কোকিল খুঁজে আসি
বিশাল জলের হাওয়া কাকের পালকে
আহা, স্বপ্ন বেঁচে থাক
আবছা, সুমের স্বপ্তেই ।

নিয়মিত তীর্থের ভিড় ট্রামে ।
কালিমারা ক্রান্তির আড়লে
সমস্তদিনের দাগ শেলেটের রাত্রে মুছে দিয়ে
ফিরে এলে
নিবিড় ছাতের শান্তি
ভার্য ভপোবনে এক-একা ঘোরা ।
ভাবনা করিনা ।

অনেক রাত্রে
পাগলের চোখ আকাশের গানে ভেঙ্গে ।

সাক্ষর গৌরীপদ দত্ত

এখানে সাক্ষর নাই
 মাটি আর মানুষের মন !
 অনেক বিস্মৃত যুগে শপথের সূর্যের আলোক
 ক্রমহীন শাসনের
 ভুলেছিলো যে অমরগণ
 বিস্ময়-বিনুত ছোট শিশিরের বুকে ;
 যে বিস্ময়ে মাটি কুঁড়ে শিশুধানগাছ
 বাতাসের ডাকে চনকিয়ে
 সূদূর দিগন্ত আর আকাশকে দেখে !
 সেই অমুভূতি আজ কে করে স্মরণ ?
 ধরে নাও আমি সে বিস্ময় ;
 সেখানে আমার পরিচয় !

যদি বল ইতিহাস ?
 সে সমুদ্রে শোণিত অনেক !
 বিনার আকাশ ছোঁয় ;—তার কোন ইঁটের কাহিনী
 শুনে শুক্ক মহাকাল হয়নি কণেক !

—অথবা জনৈক দিয়ে আরম্ভ যাহার,
 সে অথও উপাখ্যানে কুশিলব সবাই সমান ।
 এমুদ্রে অনেক রথী ! মূল্য যা'র মুহুর্তে মহান ।

তাই পরিচয় নাই !
 প্রতিদিন পরিচয় লিখে রেখে যাই
 দিনান্তের ক্রান্ত পথে ।
 যবে মেঘ আকাশে ঘনায়,
 আমার নিশান ওড়ে ।
 লক্ষ লক্ষ ধূলিকণা সূর্য হয় রক্তিম আভায়
 শুল্ল স্পর্শে ছেঁড়া পাতা, হয়তো যা উচ্ছিষ্টাবশেষ !
 তারপর যখন প্রাচীন, অভাবের মন্ত গ্রাম ক'রে ফেলে আমার পৃথিবী,
 তখন বিবাস্ত দৃষ্টি চকিতে ঝলকে ।
 মুহুর্তে একাধ হয় মেঘ আর যুতিকাবশেষ ।
 সে নিমেষই চিরসত্য ।

হয়ত আবার
 অক্ষতলে বারবার
 ভেঙে পড়ে,—চ'লে যায় ভেসে
 অবজ্ঞা ও বিলুপ্তির
 আকুল বন্যায়,
 তাই স্বাক্ষর নাই।
 পরিচয় খুঁজিবে স্বধাই।

কাম্বীরে সায়াকু

উৎপলকুমার বসু

ডাল লেকে নৌকা আছে বাঁধা। দুর্গম শিখরে
 এখনি ভুসারপাত শুরু হবে। তীক্ষ্ণ হিম হাওয়া
 দক্ষিণের উপত্যকা ঝড়ে এলোমেলো।
 কুড়ায় হলুদপাতা একদল কাম্বীরী বালক।

অরণ্যে যখন হলুদপাতার কাল শেষ হবে
 তোমার অনন্ত রক্তে দেখা দেবে ফাস্তনের অম্লভব

আমার বিকীর্ণ ছায়া নৌকার মতন বেঁধে রেখেছে জলে।

একাকী মেঘের পুঞ্জ ফিরে গেছে—পাখি নেই
 পতঙ্গের স্থির ডানা—আরো শুরু সন্ধ্যার জল
 সহস্র ঘাসের মাথা নিচু হয়ে স্পর্শ করে তাকে

আমার বিকীর্ণ ছায়া এখানে বেঁধে রেখেছে।

জ্বালোর উজান

অশোক মৈত্র

পশ্চিম পঞ্চাবের একটি নিম্নমধ্যবিত্ত সংসার। কোনোদিন কখনোও করেনি এই মাটি থেকে শিকড় তুলে বর্ষর বেদিয়াদের মত মাঠে ঘাটে জীবন কাটাতে হবে। সে দিনগুলোর কথা ভাবতে গেলে বিশাল বুকের মধ্যেও মোচড় দিয়ে ওঠে। স্ত্রী আর ছুই শিশুসন্তান নিয়ে পথে বার হল। আত্মীয় পরিচিত পরিবেশ, রুক্ষ মাটির দিগন্তে বাড়িঘরদোর যখন মিলিয়ে গেল তখন, হ্যাঁ তখন, চোখ দিয়ে কয়েক কঁোটা জল গড়িয়ে পড়েছিল বৈকী। ওর স্ত্রী হাপুসনয়নে কাঁদছিল। লড়কালড়কী ছটোর চোখও ছলছলিয়ে উঠেছিল। তারপর কেবল বেঁচে থাকটা যে কি ভয়ানক শক্ত সেটা সেই প্রথম উপলব্ধি করা গেল। কেউ মরল না বটে কিন্তু সে-বাঁচা কুত্তা-বিদ্রীর বাঁচা। দেবাহন, মুসৌরী, টিমলী গাড়োয়ালের বন তারপর লাক্ষার এমনি কত জায়গায় লকড়ীর আঙনে হাঁড়ি পুড়িয়ে শেষে এই হরিদ্বার। এখন অবিশিষ্ট অবস্থাটার সামান্য একটু উন্নতি হয়েছে। ট্যাক্সি পেয়েছে চালাবার জন্যে। কিন্তু মরণের মত ইমান বজায় রেখে এই হরদোয়ার শহরে বাঁচতে পারল কৈ! আমি অবিশিষ্ট জিজ্ঞেস করতে পারলাম না ইমানটা খোয়াই-বা এখন যাচ্ছে কোথায়। ট্যাক্সি চালানো তোমার জাতির লোকদের কাছে এমন কিছু কাপুরুষের কাজ নয়। কিন্তু, পরে বুঝেছিলাম, ইমান খোয়া যাবার পেছনে অন্য ইতিহাস আছে।

তাকিয়ে দেখলাম নানক বাহাদুরের চোয়াল ছটো দৃঢ় হয়ে বসেছে। স্টিয়ারিংএ হাত ছটো ঘামছে। আর চোখের কোণ-ছটো চক্ চক্ করছে।

গাড়ী চলছিল হরিদ্বার থেকে লছমন-ঝোলা। নানক বাহাদুর তার ড্রাইভার। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম বাবা চুলছেন। মা পান চিবোচ্ছেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মা হাসলেন।

বললাম, ওর সুখদুঃখের গল্প বলছিল আমার। রিফিউজী হয়ে এসেছে। এই সব। মা বললেন, হ্যাঁ, যেখানেই ঘুরলাম এ ছাড়া তো অন্য কথা নেই। দেখা হলেই সুখদুঃখের কথা শুনিতে দেবে। জানা ছিল, ভ্যানা ছিল। গাঁয়ে জমি ছেরাত ছিল। আমার বাপু অত বিবেক হয় না।

মা যে ভাষায় কথা বলছিলেন ফরিদপুরের বাতাসে সে ভাষা ভেসে বেড়ায়। ওঁর বাপের বাড়ি আবার ফরিদপুরে তো। আমি চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। ভাড়াভাড়ি নানক বাহাদুরকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মেয়ে স্কুলে পড়ে? প্রশ্ন করেই একটু সংকুচিত হয়ে গেলুম। মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করাটা হয়ত ঠিক হয়নি। নানক বাহাদুর আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভাবে হাসল। আজও কখনও কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে সেই হাসিটা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আসলে নানক বাহাদুর সেদিন আমার প্রশ্নের কোনো উত্তরই দেয়নি। শুধু হাসিতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম প্রশ্নটা কত হাস্যকর। রোজগার নেই একপয়সাও। দেনা শুধতে শুধতে

জীবনটা বরবাদ হ'য়ে গেল। ছেলে মেয়েকে স্কুলে পড়ানো একটা আশ্চর্য বিলাসিতা ছাড়া তো আর কিছু নয়।

তারপর আমি খানিকক্ষণ কোনো কথা ভিজ্জেস করতে পারিনি। কেমন অপমানিত বোধ করছিলাম। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখছি তীর্থযাত্রীদের ভিড়। একটু এগিয়ে গেলেই অন্ধকুণ্ড পড়বে। হঠাৎ নানক বাহাদুর ত্রেক কবল। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, এখুনি আমি আসছি। একটু বসুন।

বাবার চুলুনি ভেঙে গিয়েছিল। ভিজ্জেস করলেন, কি ব্যাপার?

বিনীতকণ্ঠে নানক বাহাদুর জানালো, লড়কীকে ওর জন্মে কুটি পাকাতে বারণ ক'রে আসবে।

না বললেন, যত সব অনাছিটি। যাব দেবতাস্থানে না.....

একটু পরেই ওর বাড়ির গলিটা থেকে সাঁ ক'রে বেরিয়ে এল নানক বাহাদুর। সঙ্গে দেখলাম বছর তের চোদ্দ বয়েসের একটি মেয়ে। চুলগুলো কক্ষ। গারে একটা ময়লা ওড়না জড়ানো।

নানক বাহাদুর আমাদের দিকে ফিরেও তাকালো না। কাছেই একটা মুদীর দোকানে গেল। খানিকক্ষণ বাদেই দেখলাম তুমুল বচসা শুরু হয়েছে। আমাদের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বার বার কি সে মুদীটাকে বোঝাতে চাইছে। কিন্তু মুদীটা চোখে মুখে বেশ গভীর নিলিখি এনে ফেলেছে। কপাল থেকে যাম মুছে নানক বাহাদুর আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালো। চোখ দুটো কক্ষ। ওপরের ঠোঁট দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেপে লাগালাম। কেউ কোনো কথা বলছি না।

নানক বাহাদুর হাত পাতল। দুটো টাকা যদি দেন। মুদী বেটা ধারে মাল ছাড়তে চাইছে না।

আমরা তো অবাক। লছমন-ঝোলা যাবার এখনও কতখানি পথ বাকী। তারপর সেখান থেকে ফিরব, তবে তো ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দেব।

এই টাকা দুটো কেটে নেবেন তখন। ব'লে আকর্ণ বিস্মৃত হাসি হাসল নানক বাহাদুর।

মুক্তিটা সহজ সরল মনে হলেও না কিন্তু ভয়ানক রেগে গিয়েছিলেন। কারণ টাকা ওকেই বার ক'রে দিতে হচ্ছিল। তীর্থস্থানে গেলে বাবা আবার কাক্ষন স্পর্শ করেন না। একে দেবী হয়ে গেছে বেক্রতে। ভায় আবার আপদ। পেছনে নানক বাহাদুরের মেয়ে স্থান চোখে তাকিয়ে ছিল আমাদের গাড়িখানার দিকে। হঠাৎ চোখ দুটো তার উজ্জল হয়ে উঠল। না টাকা দুটো বার ক'রে দিলেন।

গাড়ি চলছিল, নানক বাহাদুর গুন গুন ক'রে গল্প করছিল। বলছিল ঐ মুদীটা ওর দেশেরই লোক। আসবার সময় চালাকী ক'রে কিছু পয়সা কড়ি আনতে পেরেছিল। তাই এখন দোকান খুলে বড় দিমাগ হয়েছে।

ভিজ্জেস করলাম, অত তর্ক চলছিল কেন?

কি আর হবে। আগে দু'এক পরসা ধার নিয়েছিলাম। সেই প্রথম যখন আসি, সৌহিনীর মার তখন খুব অসুখ। তাই আর কি মেজাজ দেখাচ্ছিল। কেন

জানি না। নানক বাহাহুরের বুকের অন্তস্থল থেকে একটা বিলম্বিত নিশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে গেল, ভারী গল। তার।

মেয়েটা ভাল রঁধতে পারে না। কুটি পাকাতো গেলে হাত পুড়ে যায়। নানক বাহাহুরের লক্ষ্মীহীন সংসারের ছবিটা মুহূর্তের ভেত্রে আমার কল্পনায় ভেসে উঠল। মোহিনীর মা নেই। নানক বাহাহুরের বুকের মধ্যেটা শুক মরুভূমি। মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল।

যাক ছুঁপাশে কত কি দৃশ্য দেখতে দেখতে যাব। পাহাড়। ব্রহ্মকুণ্ডের নীল ঘল। ছুঁপাশে শালবীথি। বসন্তে খেত পুষ্পের গুচ্ছে সাদা মেঘের মত মনে হয়। এ সব দেখলেই মন ভাল হয়ে যাবে।

বাবা বললেন, এটা মনসা পাহাড়।

একেবারে পাহাড়ের গা ঘেঁষে গাড়িখানা আমাদের এগোচ্ছে।

আরো দূরে দেখলান নীলপাহাড়ের শ্রেণী। মাঝ দিয়ে ব্রহ্মকুণ্ডের নীল স্রোত দুরন্ত বেগে বয়ে চলেছে। আমরা তন্ময় হয়ে সেই সব দেখছিলাম। হঠাৎ মনে হল গাড়িখানা চলছে না। পাশে দেখি নানক বাহাহুর নেই। খানিক পরে ছুটতে ছুটতে এল। মা তড়াতাড়ি ওকে দেখেই ব্যাগটা খুললেন।

বললেন, কি চায়, তড়াতাড়ি দিয়ে দে।

নানক বাহাহুর খুব আন্তরিকভাবে হাসল।

বলল, আট আনা মাইখী। এই লকড়ী কিনে পাঠিয়ে দেব। চুলা ধরাবে তো।

মা বললেন, থাক আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না বাবা। যা খুশি তাই কর।

তারপর হাত ছোড় করে ব্রহ্মকুণ্ডের উদ্দেশে নমস্কার করলেন।

কিন্তু সমস্ত রাস্তাটা সত্যিই যা খুশি তাই করতে লাগল নানক বাহাহুর। বাবা কোনো কথা বলছেন না, চুপ করে আছেন। কারণ তীর্থস্থান। কারণ কাকে কি বলবেন, আর সে তাতেই আঘাত পাবে। বাও খুব শান্ত হয়ে গেছেন। বলে বা ধমকে যখন কিছু করতে পারবেন না। আমার হাতেই নানক বাহাহুরের বাদ বাকী টাকাটা ডুলে দিয়েছেন। নানক বাহাহুরকে কেন জানি না, আমার খুব ইণ্টারেস্ট মনে হচ্ছিল। মুখের রং তামাটে হয়ে গেছে। কালো চাপ দাড়ি। বছর চল্লিশ বয়েস হবে। টাকাটা যখন দেখল মার হাত থেকে আমার হাতে এল তখন ও জমিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করল। একতরফা গায়ে পড়ে যে আলাপ তাও ঠিক নয়। আমি নিজে বাংলাদেশের কথা বলছিলাম। সেখানে উদ্বাস্তুদের জীবন এমন ভাবে নানক বাহাহুরকে বলতে লাগলাম যেন তাদের মধ্যে থেকে তাদের দুঃখকষ্টের এই সব অভিজ্ঞতা আমি নিজেও সঞ্চয় করেছি। নানক বাহাহুর বাংলাদেশে কখনও যায়নি। একবার স্থির করেছিল সেখানে জাত ভাইয়ের সঙ্গে বাসের কাজে ভিড়ে যাবে। কিন্তু ভেদন সুযোগ পেল না।

সেই রাস্তাটায় আমরা তখন এসে পড়েছি। ছুঁপাশে শাল বন, কুলে কুলে ছেয়ে গেছে। এই রাত্র একটা সেতু পেরিয়ে এলাম। তার তলা দিয়ে ঝিরঝির করে জলস্রোত বইছে।

একটু চুপ ক'রে থেকে নানক বাহাদুর হঠাৎ বলে উঠল, কলকাতায় গেলেই হয়ত ভাল করতাম।

আমি কিন্তু কলকাতার বর্তমান জনসংখ্যার কথা ভেবে নানক বাহাদুরের যাওয়ার কথা সমর্থন করতে পারলাম না।

যে কথাটা বলবার ইচ্ছে প্রথম থেকেই ছিল সেই কথাটাই জানলাম। সেখানেও হয়ত এই কাজই করতে হত তোমায়। ইমান তো তাহলে থাকত না।

নানক বাহাদুর ভীষণ চমকে উঠল। আমি পরিষ্কার দেখলাম ওর মুখের রং পাশ্চ গেছে। মুখ ফিরিয়ে যখন আমার দিকে চাইল তখন চোখ দুটো দেখলাম কেমন খোলাটে।

কাঁপা গলায় বলল, বাবু কোন ট্যাক্সিওয়াল আপনাকে বলল। সে শয়তানটার একবার নাম করুন।

আমার মনে হল পা পিছলে আমি যেন একটা অতল খাদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি। কিছু আঁকড়ে ধরবার জিনিস পাচ্ছি না।

নানক বাহাদুর ষাড় ফিরিয়ে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গাড়িটা আপন মনে এগিয়ে চলেছে।

আমি ততক্ষণে কিছুটা বুঝতে পেরেছি। ভুল একটা কিছু রয়ে গেছে। সেটা আমার বলার মধ্যে কিংবা নানক বাহাদুরের বোঝার মধ্যে। আসলে আমি কথাটা বলতে চেয়েছিলাম ট্যাক্সি চালালেই যদি তোমার ইমান খোয়া যায় তাহলে কলকাতায় গেলেও তো সে ইমান খোয়াতে হবে। কিন্তু নানক বাহাদুর কথাটা নিয়েছে অন্য অর্থে। সেটা আমি পরে জানলাম।

নানক বাহাদুরের মনের মধ্যোচায় তখন অহরহ অনিশ্চয় দহনে কেবল জ্বালা, কেবল হ হ ক'রে জ্বালিয়ে মারছে তাকে। আজ মনে হয় নানক বাহাদুরের সঙ্গে আমার কতটুকুর জন্মেই বা পরিচয়। প্রথম থেকেই ওর প্রতি একটা কোতূহল মনকে আমার আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। কিন্তু সে-কোতূহল যেখানে গিয়ে ঠেকবে সেখানে যে চর ফেগেছে—তৃণশূন্য একটা চর সন্ধ্যার বিষম আলোয় ব্লান অস্পষ্ট, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমি যেমন ক'রে জানলাম তেমনি হয়ত আরও অনেক মুসাফির কেবল একটু সহানুভূতি দেখিয়ে নানক বাহাদুরের ইমান খোয়াবার কাহিনী জেনে গেছে। আমিও সংখ্যায় একজন বাড়লাম। বাঁধের গায়ে জলের প্রবল স্রোত যখন আছড়ে পড়ে তখন কোথাও যদি এতটুকু ফাটল থাকে তাহলে তাই দিয়ে জলের একটা ক্ষুদ্র স্রোত বেরিয়ে আসে। নানক বাহাদুরের বিশাল বুক হলেও ঐ দুর্বলতাটা ছিল।

মোহিনীর মা ছিলো একটু সৌখীন। দেশ গাঁয়ে থাকতে পাড়া প্রতিবেশী বলাবলিও করত। কিন্তু নানক বাহাদুরের সে সব কেমন ভাল লাগত। বেশ বাস শুছিয়ে পরা। ভাল তেল দিয়ে একটু চুল বাঁধা। আর সেই নেশা মোহিনীর মার অনেকদিন পর্যন্ত ছিল। হরিয়ারে এসে সে সব চলত না। কোথা থেকে আসবে। মোহিনীর মা ক্লক চলে আর ময়লা কাপড়ে কেমন বদমেজাজী হয়ে গেল। ঐটেই সহ্য হত না নানক বাহাদুরের। সারাদিন কুটির জন্মে জন্মে হয়ে বেড়ানো।

তারপর বোটার ঐ বকন অসহ্য বিরক্তি। নানক বাহাদুর একদিন রেগে গিয়ে বোটাকে আচ্ছা ক'রে মার দিল। অবশ্য একথাও ঠিক, তার আগে কোনোদিন বউএর গায়ে ভুলেও হাত তোলেনি সে। ক'দিন সমস্ত বাড়িটা শান্ত। কেউ কোনো কথা বলে না। বোটার যে মনে খুব গভীর একটা আঘাত লেগেছিল সে-কথা তো আগে বুঝতেই পারেনি নানক বাহাদুর। আর বুঝতে পারলেই বা। একদিন মার খেলেই, স্নেহ ভালবাসা নেই, স্বামী পুত্র ছেড়ে ছট ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। তারপর কতবার মেয়েটাকে পাঠাল, ছেলেটাও গেল। কিন্তু মোহিনীর মা ফিরল না। উঠেছিল গিয়ে তার এক দূর সম্পর্কের ভায়ের বাড়িতে। তারপর একদিন নিজে যখন ঘোর ক'রে বোকে আনতে যাবে ঠিক ক'রেছে, ইয়ার দোসরা বলল, যে জেনান' ঘর ছেড়ে চলে যায় তুই মরদ হয়ে তার মান ভাঙতে যাচ্ছিস। এই আর কোথায় যাবে। কত শক ছুনদের রক্ত শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে। রূপানে হাত পড়ল নানক বাহাদুরের। এ কথাটা তো ওর এতদিন মনে হয়নি। ঘর ছেড়ে যে জেনানা বেরিয়ে যায় তাকে কোন পুরুষ হাতে পায়ে ধরে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আবার অবিশ্রি মনে হয়েছিল নানক বাহাদুর যদি গিয়ে মান ভাঙাত মোহিনীর মা হাসি মুখে বাড়ি ফিরত। সে যে বড় সৌখীনা। স্বামী তার সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করবে এটা যে তাকে বড় আঘাত দেয়।

মাই হোক নানক বাহাদুর আর যায়নি। ইতিমধ্যে তার সেই দূর সম্পর্কের ভাইকে জড়িয়ে অনেকে অনেক কিছু বলে। নানক বাহাদুর কিন্তু চুপ। হয়ত নানক বাহাদুর ভুলে যেতে চাইছে। ইমান যখন গেল তখন আর কি।

লছমন খোলার সেই নির্জন পাখী পাখালীর ডাক আমার কেমন স্বান বিপন্ন ক'রে তুলল। জলধারার ওপারে গাড়ি নিয়ে নানক বাহাদুর অপেক্ষা ক'রে আছে। আমি খুশি। আমার সঙ্গে মা বাবা আছেন। নানক বাহাদুরের নির্জন মুখখানা কেবল মনে পড়ে। তার সঙ্গে মোহিনীর মার একটা কাল্পনিক মুখ। বৌ তো অনেকেরই পালিয়ে যায়। মানুষের জীবনে দেখেছি। গল্প উপন্যাসে পড়েছি। কিন্তু নানক বাহাদুরের ঐ বলার মধ্যে কি ছিল, তার গলার স্বর, চোখের ভাষা। বলতে গিয়ে নিস্পৃহ হবার চেষ্টা করছে। কেবল ইমান নিয়ে কথা তাই। তা না হলে মরদের এসব তো ভুলে যাবার কথা। কিন্তু এসবের ভেতর দিয়ে আর এ সমস্ত ছাড়িয়ে যা কুটে উঠেছে সে যেন আর এক জগতের জিনিস।

মোহিনীর মার নাম আর সে মুখে আনতে চায় না। তার মুখ সে ভুলতে চায়। ছেলেটা মা'র জন্তে মাঝে মাঝে বারনা ধরলে তাকে সে মারে। পারত যদি ছেলে মেরে ছুট্টোকে অস্ত্র যায়গায় রেখে আসত।

ফিরবার পথে যে গেটো কয়েক টাকা বাকী ছিল নানক বাহাদুরের হাতে দিয়ে দিয়েছিলাম। আসবার সময় সেই দীর্ঘ শালবিন নিঃশব্দে পার হলাম। আমি বা নানক বাহাদুর কেউ-ই কোনো কথা বলিনি। মা কেবল মাঝে মাঝে সাংসারিক ছ'একটা কথা বাবাকে শোনাচ্ছিলেন। আন্তে আন্তে সঙ্কো হ'য়ে আসছে।

ছবিকেশের মুখে নানক বাহাদুর হঠাৎ গাড়িখানায় ব্রেক কবল।

গলা বাড়িয়ে ঢাকল, ডাক্তার সাব !

ডাক্তার সাহেব একেবারে গাড়ির পাশেই। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় পশার তেমন নয়। নানক বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হ'য়ে জ্র কুঁচকোলেন। বললেন, কি ব্যাপার! তোর আর পাত্তাই নেই। সেই কবের টাকা ফেলে রেখেছিস। এখনও দিলি না।

নানক বাহাদুর একগাল হেসে পাঁচটাকার একখানা নোট ডাক্তারবাবুর হাতে দিল। ঐ পাঁচটা টাকাই শেষ পাওনা নানক বাহাদুরের মিটিয়ে দিয়েছি খানিক আগে।

টাকা পেয়ে ডাক্তারবাবু ভীষণ খুশি। স্টার্ট দিতে যাচ্ছিল গাড়ি নানক বাহাদুর। ডাক্তারবাবু উচ্চৈঃস্বরে জানালেন, বুঝেছিস, এবারও তোর বোয়ের সেই অসুখই করেছে। তা ইচ্ছে ক'রে না-খেয়ে খেয়ে যা শরীরের অবস্থা করেছে তাকে আর বাঁচাতে পারব বলে তো মনে হয় না। একেই বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

স্টার্ট দিতে গিয়ে পাটা যেন অচল হয়ে গেল। তারপরই এক সেকেন্ডের মধ্যে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে হুস্ত বেগে ছুটিয়ে দিল নানক বাহাদুর, যেন ওসব কোনো কিছুই ও তোয়াক্কা করে না। কে কোথায় মরল পচল তাতে ওর কি আসে যায়।

গাড়ি ভীষণ বেগে ছুটছিল। আমি শুধু কান পেতে শুনছিলাম গাড়ির মেশিনারীগুলো কি প্রচণ্ড ভাবে আর্তনাদ করছে।

গাড়ি যখন ব্রহ্মকুণ্ডের পাশে এল সে-আর্তনাদ তখন থামল। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল নানক বাহাদুর। সমস্ত মুখখানা ঘর্মাক্ত। আমাদের সঙ্গে গাড়ি রেখে ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে নেমে এল।

সেখানে ঝিরঝিরে হাওয়া দিয়েছে। আমরা যোধ কিনলাম। কলার পাতার নৌকায় নানা রকমের ফুল ভরা, একটি প্রদীপ জ্বালানো, ভাসিয়ে দিতে হয় জলের বুকে। প্রিয়জনের মঙ্গল কামনা ক'রে, দেবতাকে সাক্ষী রেখে : দেখো, যেন ভাল হয় তার। তাকে ভাল রেখ।

জলে যোধ ভাসিয়ে তাকালাম নানক বাহাদুরের দিকে। তার ম্লান চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে অসংখ্য আলোর নৌকার ওপর। আমি একটু চুপ ক'রে রইলাম।

ডাক্তার সাহেবের শেষ কথাটা মনে পড়ল। কি বুঝলান, কি জানি। ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে একটা ভাল দেখে যোধ কিনে এনে নানক বাহাদুরের হাতে দিলাম।

নানক বাহাদুর অবাক হ'য়ে আমার দিকে তাকালো। সে চোখের দৃষ্টি জীবনে আমি কোনোদিন ভুলব না।

আমরা গাড়ির কাছে চলে এসেছি।

মা বললেন, ড্রাইভারটা আসছে না কেন।

পেছন ফিরে তাকালাম। নানক বাহাদুরের ভাসিয়ে দেয়া যোধটা মনে হল জলের ওপর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে যাচ্ছে। আর সেই দিকে তাকিয়ে নানক বাহাদুর স্থির হ'য়ে বসে আছে।

কেন জানি না, কয়নাম মোহিনীর মার রোগশীর্ণ বিষয় মুখখানা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের শতবার্ষিকী

অধ্যাপক, ইগর রেসনার

ভারতইতিহাসের অশ্রুতন গৌরবময় অধ্যায় ১৮৫৭-১৮৫৯ সালের জাতীয় অভ্যুত্থান সম্পর্কে সোবিয়েৎ ঐতিহাসিক ও ভারততত্ত্ববিদগণ পুথানুপুথভাবে অধ্যয়ন করছেন।

এই সহজ বোধ্য প্রবন্ধে এ-অভ্যুত্থানের প্রধান সমস্যাগুলি সম্পর্কে আমাদের বর্তমান ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করব। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসে এই অভ্যুত্থানের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

সোবিয়েৎ ঐতিহাসিকরা জানেন, ১৮৫৭-১৮৫৯ সালের ঘটনাবলীর বিচারে তাদের ভারতীয় সহকর্মীরা সকলে একমত নন। এই কিছুকাল আগেও বেশির ভাগ ভারতীয় লেখকই, ১৮৫৭-১৮৫৯ সালের ঘটনাবলীকে সিপাহীদের বিদ্রোহের সঙ্গে ভারতের সামন্তপ্রভুদের একঅংশের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই মনে করতেন না। ভি, সাভারকর প্রমুখ আর একদল ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের সাপেক্ষেই অবশ্য, অভ্যুত্থানের প্রকৃতি সম্বন্ধে সোবিয়েৎ বৈজ্ঞানিকরা অনেকটা একমত। অভ্যুত্থানের গণচরিত্র ও জনতার ব্যাপকঅংশের সক্রিয় যোগদানে সংগ্রামের দীর্ঘস্থায়ী রূপের কথাই এরা ব্যাখ্যা করেন।

যেহেতু বিদ্রোহীরা মোগলসাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার দাবি করেছিল এবং অভ্যুত্থানের অনেক নেতা ছিলেন সামন্তপ্রভু, শুধু সেই ক্ষেত্রেই যারা এই বিদ্রোহকে সামন্ত-বিদ্রোহ আখ্যা দেন, কেউ তাদের সঙ্গে একমত হতে পারে না।

সত্যি, ১৮৫৭-৫৯ সালের আন্দোলন এক চরিত্রের ছিল না। ১৮৪৯ সালে, শেষ স্বাধীন ভারতীয় রাজ্য পঞ্জাব দখলের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্বে চলে যায়। সে সময় থেকেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্রিটিশ শাসক বোলাখুলি ভাবে ভারতের কোটি কোটি মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। গোটা দেশকে উপনিবেশিক শাসনের কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের অধীনে আনা হয়। সমস্ত ভারতবাসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে একই ঘৃণার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। কিছুকালের মধ্যে ভারতীয় সমাজের পাঁচমিশালী স্তর একই শিবিরে এসে মিলিত হয়। এর ভিতর থাকে নিম্ন অধিকারবঞ্চিত সামন্তপ্রভুরদল, ভাড়াটিয়া সৈনিক, ব্রিটিশ কারিখানাশিল্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত কুটিরশিল্পী কৃষক। সোবিয়েৎ ঐতিহাসিকদের মতে, প্রধান পরিচালক শক্তি ছিল ব্রিটিশ ট্যাক্সে ধ্বংসোন্মুখ ও নিজেদের কুটিরশিল্প হতে বঞ্চিত ভারতের কৃষককূল। •

বাক্যল। সেনাবাহিনীর সিপাহীদের বেলায় অভ্যুত্থানের চালকশক্তির ক্ষেত্রে যদিও বেশির ভাগই ছিল উচ্চবর্ণের ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ ও রাজপুত, তথাপি শ্রেণীর দিক দিয়ে এরা ছিল কৃষকসমাজের উচ্চস্তর। সামন্তপ্রভু কৃষক কুটিরশিল্পী ও সিপাহী—আন্দোলনের এই তিনটি শক্তি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ফটি করে। অভ্যুত্থানের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে এই ছিল বৈশিষ্ট্য।

আর, এই ক্ষেত্রেই ১৮৫৭-১৮৫৯ সালের ঘটনাবলীকে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় অভ্যুত্থান হিসাবে গণ্য করা যায়।

একথা সত্য, একমাত্র উত্তরভারতে এবং মধ্য-ভারত ও বিহারের কয়েকটি অঞ্চলে ১৮৫৭ সালের ভিতর জনতার বিক্ষোভ, সিপাহীদের অসন্তোষ এবং সামন্ত প্রভুদের ষড়যন্ত্র অভ্যুত্থানকে এক ব্যাপক জাতীয় রূপ দেয়। অভ্যুত্থান দমনের পর বাংলার কৃষকরা বিদ্রোহ করে। স্থানীয় জমিদাররা ব্রিটিশের প্রতি অঙ্গুগত থাকে। রায়তওয়ারী ভূনিব্যবস্থায় কৃষকরা সক্রিয়ভাবে উপনিবেশ-বাদীদের বিরুদ্ধে যেনন যোগ দেয়নি, ঠিক তেমনি একই কারণে মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে সিপাহীরা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়নি। সম্মিলিত বাধ্যতামূলকভাবে রায়তদের আবদ্ধ রাখা ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে জমি চাষ করতে বাধ্য থাকার ব্যবস্থা রদ করে ডালহৌসি ১৮৩৩ সালে যে আইন করেন, হতে পারে, তা এই-ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করেছে।

তা ছাড়া এই উপ-মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অসন্তুষ্ট সামন্তপ্রভুরা হিন্দুস্তানের অন্তর্ভুক্ত অংশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল। পণ্ডাবে শিখ সিপাহী ছিল না (পরে অবশ্য ব্রিটিশরা শিখদের সৈন্যদলে ভর্তি করতে থাকে, তখন অভ্যুত্থান দমন হয়ে গেছে), শিখ সামন্তপ্রভুরা ব্রিটিশের প্রতি অঙ্গুগত থাকে। কৃষকরা বিদ্রোহ করবার আগেই বাংলার ফৌজের বিদ্রোহী সিপাহীরা পরাজিত হয়।

এই ব্যাপক ও পঁচিশশতাব্দী শক্তির সাময়িক ঐক্য বিদ্রোহীদের প্রাথমিক সাফল্য আনে, কিন্তু পরে সেটিই তাদের দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কয়েকজন বাদে (তান্তিয়া তোপি, লক্ষ্মীবাই ও আরও কয়েকজন), সামন্ত প্রভুরা অভ্যুত্থানে বিশ্বাসঘাতকতা করে, অথচ কৃষক ও কুটিরশিল্পীরা নিজেদের ভিতর থেকে যোগ্য নেতা দিতে পারেনি। অভ্যুত্থান শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার অন্ততম কারণ ছিল অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও দেশের ভিতর যোগাযোগের অভাব। তবুও, এই অভ্যুত্থানই ভারত ইতিহাসের এক বিরাট প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে।

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে কোনো একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সঠিক বিচার হতে পারে বলে সোবিয়ৎ ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

জনগণের শ্রেণীচেতনা যাই থাকুক না কেন, এমন কি তারা সামন্তপ্রভুদের স্বপক্ষনির অধীনে এসে থাকলেও, অভ্যুত্থানে এই জনগণের যোগদান সামন্তব্যবস্থায় প্রবল আঘাত করে। এ-কথাও মনে রাখা দরকার, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ভারত মোগল আমলের ভারত ছিল না। তখন ভারত হুনিয়ার বাজারের আওতায় এসে পড়েছে এবং একদল ইয়োরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি হয়েছে, যদিও তারা সংখ্যায় কম। প্রথম বাষ্পচালিত কারখানা, টেলিগ্রাফ ও রেলপথ চালু হয়েছে। এই সময় যদি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহীরা জয়লাভ করত, তা হলে ভারতের বিকাশ ঔপনিবেশিক দেশের মত নয়, স্বাধীন দেশের মতই ধনতান্ত্রিক পথে দ্রুত অগ্রসর হত।

১৮৫৭-৫৯ সালের ঘটনাবলীর বিরাট ঐতিহাসিক তাৎপর্যই এই যে, স্বাধীনতার

যুদ্ধ ঝুটিশের দৈব ক্ষমতান মোহ ভেঙ্গে দিয়েছে, দেখিয়ে দিয়েছে যুদ্ধে তাদেরও পরাজিত করা যায়। ভারতে ঝুটিশ শাসন যে নিরাপদ নয়, ও চিরস্থায়ী নয়, তাও দেখিয়েছে। এমনকি, এই অভ্যুত্থান এটাও জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছে, স্বাধীনতার যুদ্ধে সামন্তপ্রভুদের বিশ্বাস করা চলে না।

উপসংহারে আমি আমার ভারতীয় পাঠকবর্গকে বলতে চাই, সোবিয়েতের মানুষ শুধু বর্তমান ভারত সম্বন্ধেই নয়, ভারতের গৌরবময় অতীত সম্বন্ধেও যথেষ্ট কৌতূহলী। আমরা সোবিয়েতের ভারত-তত্ত্ববিদরা এ-কথা মনে করে গর্ববোধ করি যে, আমাদের মিত্র ভারতের বিচিত্র ও সম্পদময় ইতিহাসের সঙ্গে সোবিয়েৎ জনসাধারণের পরিচয় ঘটানোই আমাদের ত্রুটি।

এ বছর মহান অভ্যুত্থানের শতবার্ষিকী। এই বছরের স্বরণে আমরা এই ঘটনাবলীর উপর কতকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশ করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

বিজ্ঞানপরিষদের প্রাচ্য বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই অভ্যুত্থানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ, ইহার গতি ও তাৎপর্যের বিবরণ দিয়ে সুধীর চন্দ্রের লেখা একটি বড় বই প্রকাশ করবে। এতে যেমন আমাদের ভারত-তত্ত্ববিদরা (এঁদের কেউ কেউ মূল দলিলগুলির সাথে পরিচিত হবার জন্যে গত বছর ভারতে গিয়েছিলেন) লিখবেন, তেমন লিখবেন আমাদের ভারতের সহকর্মীরা।

শীঘ্রই অভ্যুত্থান সম্পর্কে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক আলেকজান্ডার অলিপক কর্তৃক জনসাধারণের উদ্দেশে লিখিত একটি পুস্তক প্রচুর পরিমাণে ছাপানো হবে। গণপলিতিজ্ঞদাত (রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক পুস্তক প্রকাশালয়) এই বিষয়ে আমার একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করবে। রাষ্ট্রীয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশালয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে অভ্যুত্থানের নায়ক নানা সাহেব ও লক্ষ্মী বাইর জীবনী প্রকাশ করবে।

১৮৫৭-১৮৫৯ সালের ভারতের জাতীয় অভ্যুত্থানের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভারত-সোবিয়েৎ, এই দু দেশের ভেতর মৈত্রী ও সংহতি আরো সুদৃঢ় করার জন্যে সোবিয়েৎ ভারততত্ত্ববিদরা প্রচেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করবেন না।

মানব পরিবার

রবি ঘোষ

মানুষ স্বস্থদেহে আর কতদিন বেঁচে থাকতে পাবে—এই প্রশ্নই যখন আজ প্রতিটি স্বস্থবুদ্ধিমানকে চিন্তিত করে তুলছে, যখন শান্তিরক্ষার জন্তে অপরিহার্যতার স্তোক দিয়ে পৃথিবীর বুকে দিনের পর দিন আণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে, ঠিক সেই সময় কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে খোদ মার্কিন সরকারী প্রচার দপ্তরের আয়োজনায ভূমিষ্ট আলোকচিত্র প্রদর্শনী ‘মানব পরিবার’ দেখতে যাবার আগে মনে সন্দেহ ছিল যথেষ্ট।

সন্দেহটা অমূলক নয়। পৃথিবীর সমস্ত খাপ্ত সমস্ত বাতাস আগামী হাজার হাজার বছরের জন্তে বিষয়ে তোলার প্রচণ্ড মূর্খ উদ্ভ্রমের মুখেও আজ সরকারী কৈফিয়তের মুখোশ এঁটে দেওয়া হচ্ছে। পৃথিবীর বর্তমান আর ভবিষ্যৎ বাসিন্দাদের জীবনকে দুরারোগ্য পঙ্খের দিকে ঠেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দোহাই দেওয়া হচ্ছে বিরুদ্ধবাদী দেশের কল্পিত আক্রমণের। এই সব সরকারী মুখোশায়িত বক্তব্য যে-সব সরকারী প্রচার দপ্তর পরিবেশন করে থাকেন তাঁদের কাউকে কোনো প্রদর্শনীর উদ্ভোক্তার ভূমিকায় দেখলে সে-ভূমিকা সম্পর্কে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। তাই প্রদর্শনীতে যাবার আগে মনে প্রচুর সন্দেহ ছিল। কিন্তু অনস্বীকার্য ‘মানব পরিবার’ সম্পূর্ণভাবে প্রচার দোষমুক্ত। আশ্চর্য্য কণ্ঠে তাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি মার্কিন প্রচারদপ্তরকে—ধন্যবাদ দিচ্ছি প্রদর্শনীর সৃষ্টিকর্তা এডওয়ার্ড টাইকেনকে।

প্রদর্শনীর পরিচিতিতে টাইকেন বলেছেন—“মানুষের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা আর বিশ্বাসের আবেগময় মনোভাব নিয়েই ‘মানব পরিবারের’ সৃষ্টি হয়েছে।” আফ্রিকার কোনো নগর উপজাতীয় বা যন্ত্রসভ্যতার সুদক্ষ মর্ষাদায় অধিষ্ঠিত শহরের সভ্য কোনো নাগরিক, এরা দুজনই তাই প্রদর্শনীতে সমমর্ষাদা পেয়েছে। মমতাময়ী পৃথিবীর নানা হাটে নানা ধরনের মানুষের মেলা—কারো বর্ণ গোর, কেউ-বা কৃষ্ণকায়, কেউ শিকায় সংস্কৃতিতে সুসভ্য কেউ-বা আদিম মানুষের শিকারীজীবন থেকে উন্নততর জীবনে প্রবেশ করার সুযোগই পায়নি এখনও। কিন্তু পৃথিবীর প্রতিটি অংশের প্রতিটি মানুষ তাদের জীবনযাত্রার প্রচুর পার্থক্য নিয়েও-যে মূল মানব পরিবারের শরিক—প্রদর্শনীর যে-কোনো দর্শকের মনে এ-ছাপ পড়া অনিবার্য। জন্ম, মৃত্যু, প্রণয়, শোক, ক্ষুধা, ভয়—এইসব মূল অশুভুতি আর তার প্রত্যশুভুতি সব মানুষের মধ্যেই এক—এই বক্তব্য প্রচারবর্জিত স্বাভাবিকতায় প্রদর্শনীতে কুটে উঠেছে। প্রদর্শিত সমস্ত আলোকচিত্রকে জন্ম, প্রণয়, পারিবারিক কাম্বর্ষ, হৃদয়, করুণা শোক, বিচার প্রভৃতি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত শিল্পীদের ছবিগুলির প্রত্যেকটিই সুনির্বাচিত আর এই ধরনের সর্বোচ্চ মানের বাছাই করা ছবিগুলির মধ্যে বাছাই করে প্রসংসা করা শক্ত। তবু কয়েকটি সংগ্রহ শুরু বিশ্বয়ে দেখবার মত। যেমন ধরা যায়, বব জ্যাক্সনের ছবি (১১৩নং), ছেলের কাছে সৈনিকের বিদায়। সৈনিকের ইউনিফর্মের বাবাকে হুঁহাতে জড়িয়ে ধরে তিন চার

বহুরের ছোট ছেলেটি অঝোরে কাঁদছে। তার শিশুবুদ্ধি দিয়েও সে বুঝতে পেরেছে তার বাবা তাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাবে এখুনি। আর শিশুপুত্রকে বুকের মধ্যে নিয়ে ধ্বংসযজ্ঞের সম্ভাব্য বলি ছেলের বাবাও কাঁদছে আকুল হয়ে। এমনই মর্মস্পর্শী ছবি যে তা থেকে চোখ ফেরানো কষ্টকর। ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে বহু শাস্তির-সংসারের-দীর্ঘশ্বাসে-অভিশপ্ত যুদ্ধদানবের উদ্দেশ্যে দর্শক অভিলাষ না-জানিয়ে পারবে না। এখানেই বহুলাংশে ছবিটির সার্থকতা।

‘শ্রম’—এই পর্যায়ের সার্থক ছবিগুলির মধ্যে সব থেকে চোখে পড়ে আর্থার লেভিনের যম্বের-হাতল-ধরা বিরাট চারটি হাত (নং ১৬৭)। বলিষ্ঠ বাহুচতুষ্টয়ের এই ছবিটির দিকে তাকিয়ে মনে হয় ঐ-হাতগুলির দৃষ্ট পৌরুষের সামনে হিমালয়ের চূড়াও বুদ্ধি সম্মানে মাথা নত করে দেবে। সংগীতের ছন্দ পর্যায়ের জন মিলি গৃহীত ২২৬ নং ছবিটিতে ধরা পরেছে ব্যালে নৃত্যশিল্পীর লীলায়িত নৃত্যের ৬৮টি ভঙ্গিমা। একই স্থিরচিত্রে এতগুলি ভঙ্গিমার পৃথক ও সুসংবদ্ধ প্রতিলিপি যে-ছন্দের সৃষ্টি করেছে তা দেখলে মনে হয় সার্থক নৃত্যশিল্পীর স্বচ্ছন্দ দোলা এমন করে ধরে রাখতে বুদ্ধি আর কেউ কোনোদিনই পারবে না। ব্যালে নৃত্যের স্বপ্নময় রোমাটিক ভাষা আশ্চর্য ভাবে ধরা পড়েছে এই ছবিতে। এই রকম স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টিকারী এইসব ছবির পাশাপাশি রয়েছে ছুভিক্ষ নিঃসঙ্গতা, বিপদের দিন, যত্ন প্রভৃতি পর্যায়ের বিষাদ করুণ ছবিগুলি। এই অতিবাস্তব দুঃখময় জীবনের প্রতিচ্ছবিগুলি পৃথিবীর সুখা মানুষের পাশাপাশি বাসকরা বঞ্চিতদের জীবনকথা তুলে ধরেছে। ‘মাটি আমাদের এমন যা যে মায়ের কোনদিন যত্ন হবে না’—শম্ভুশ্যামল ক্ষেত্রের ছবির নিচে উল্লেখ করা এই অপূর্ব উদ্ধৃতির পাশাপাশি রয়েছে কষ্টেআহরিত একথালি ভাতের সামনে ছুভিক্ষপীড়িত একটি উপোষী ছেলের করুণ ছবি—আর তার নিচে আর একটি অপূর্ব মর্মস্পর্শী উদ্ধৃতি ‘আমাদের কাছে ক্ষুধার থেকে মৃত্যু আর কিছু নাই।’ ছেলেটির প্রাণে যেন সমস্ত বুভুক্ষুর ক্ষুধা প্রতিবিম্বিত। একই মানব পরিবারের এরকম বৈষম্যের পাশাপাশি অবস্থায় চোখের সামনে দেখে দর্শকরা অভিভূত না-হয়ে পারেন না। যে-মহাজিজ্ঞাসা সাম্যবাদকে সৃষ্টি করেছে সে-মহাজিজ্ঞাসা দর্শকদের মনকে অনায়াসে ছুঁয়ে যায় : ছুনিয়ায় এত সম্পদ থাকতে মানুষ ক্ষুধিত থাকে কেন? হুরেমবার্গ বিচারের প্রামাণিক চিত্রতে (নং ৪০৪) যখন নাৎসী সৈনিকের উদ্ধত উদ্ধত আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে মাথার-উপর-হাত-তুলে-হেঁটে-মাওয়া বন্দীদের সমুখের সারিতে ছোট একটি শিশুকেও মাথার উপর হুহাত তুলে বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায়, তখন আবার দর্শকদের থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে হয়-যে যে-যুদ্ধের উন্মত্ততায় ঐরকম শতশত নিপাপ শিশুকে ভাল করে জাগবার আগেই যত্নের কোলে তুলে দিয়েছে অবহেলে সে-যুদ্ধ কি আবার ফিরে আসবে তার বন্ধিত নৃশংসতা নিয়ে। শত শত বক্তৃতার চেয়েও এইরকম একটি ছবি দর্শকসাধারণকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে। প্রচার থেকেও শিল্প অনেক বেশি শক্তিশালী—এর প্রমাণ প্রদর্শনীর দেওয়ালে দেওয়ালে।

অবস্থার শত পার্থক্য সত্ত্বেও মূল হৃদয়াবেগ ও অমুভূতিগুলির ঐক্য যে পৃথিবীর

প্রতিটি মানুষকে একই পরিবারের শরিক করেছে এই বলিষ্ট অশ্রুভূতি নিয়ে দর্শকরা প্রদর্শনী থেকে বেরিয়ে আসেন। প্রদর্শনীতে রাষ্ট্রসভ্যের অধিবেশনের দেওয়ালজোড়া বিরাট ছবিটিতে যেমন বিভিন্ন দেশের নানা প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের মহামিলনের সার্থক চিত্রায়ণ ঘটেছে তেমনি প্রদর্শনীর সমস্ত ছবিগুলি বক্তব্যের বিভিন্নতা নিয়েই ভবিষ্যৎ 'এক ছনিয়ার' পটভূমিকা উপস্থিত করেছে। মহামানবের সাগরতীর তার বিরাটত্ব, তার পার্শ্বক্য, তার ঐক্য নিয়ে হাজির হয়েছে; আর ভবিষ্যৎ বিশ্বকর্ষাদের স্বার্থহীন শ্রমশীল প্রচেষ্টার যুগের জন্য অপেক্ষা করেছে। এই সুরেই প্রদর্শনীর সমাপ্তি হয়েছে।

প্রদর্শনীর শেষে বাইরে পা-দেওয়ার আগে চোখ আটকে যায় একটি ছবির উপর। দিগন্তের দিকে একটি ছোট ছেলে ও একটি ছোট মেয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে, তার তলায় উদ্ধৃতি—'তোমার পদক্ষেপে নূতন পৃথিবী জন্মলাভ করবে।'

সত্যি মুগ্ধ হবার মত একটি প্রদর্শনী দেখে এলাম।

॥ চন্দ্র ৭

যাত্রা হোল শুরু। কাহিনী : অনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পরিচালনা ও সম্পাদনা : সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : নিতাই ভট্টাচার্য, সংগীত : রবীন চট্টোপাধ্যায়, শব্দগ্রহণ : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, আলোকচিত্র : বজ্র বোস, প্রযোজনা : এম, পি, প্রোডাকশন্স, ভূমিকায় : পাহাড়ী, উত্তম, কমল, নীতিশ, দীপক, গোপাল মজুমদার, সবিতা, শোভা, ঝরনা চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

কলকাতার এক হৃদয়বান ধনী ব্যবসায়ী বিপ্লবীক প্রিয়নাথ মুখার্জীর একমাত্র পুত্র সুপ্রিয় এবং তার বন্ধু কোলিয়ারীর ম্যানেজার ভবতারণ চৌধুরীর একমাত্র কন্যা, প্রমীলার মধ্যে প্রণয়-অমুরাগের উন্মোচন দিয়েই, বলতে গেলে, গল্পের শুরু। প্রিয়নাথ ভবতারণ সমন্বিত সুপ্রিয়-প্রমীলার সেই প্রেম যখন পরিণতির (অন্তত তাই দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে ন্যাকামী মাধ্যমে) দিকে এগিয়ে চলেছে ঠিক সেইসময় এক দুর্ঘটনার দিনে কালীনাথের আবির্ভাব।

কালীনাথ প্রিয়নাথের বাল্যবন্ধু। বাল্যে কালীনাথের পিতার সংগে প্রিয়নাথের পিতার এক বিরোধের ফলে কালীনাথের পিতা সর্বস্বান্ত হন এবং দেশত্যাগ করে স্বী পুত্র নিয়ে কাশীবাসী হন। এবং কালীনাথের পিতা-মাতা সেখানে শোক-দুঃখ এবং দুর্দশার মাঝে অকালে প্রাণত্যাগ করেন। সে দুঃখ কালীনাথ ভুলতে পারে না। সেই দুঃখের প্রতিশোধ নেবার জন্তে কালীনাথ প্রিয়নাথের বাড়িতে এসে হাজির হয় অকস্মাৎ। বাল্যবন্ধুকে প্রিয়নাথ সাদরে গ্রহণ করে। অকৃত্রিম বন্ধু হিসাবেই।

কালীনাথের আগমনের সাথে সাথেই গল্পের গতি পরিবর্তিত হয়। অকৃত্রিম বন্ধুকে কালীনাথ মস্তাসক্ত করে তোলে, বাড়িছাড়ি কাছে নিয়ে যায়। সুপ্রিয়-প্রমীলার বিবাহের সিদ্ধান্ত নাকচ করে দিয়ে প্রিয়নাথের সংসার তছনছ করে। তারই পরিণতিতে গল্পের হয় পটপরিবর্তন। সুপ্রিয়ের গৃহত্যাগ এবং প্রিয়নাথের ব্যবসায় ভরাডুবি; এবং তছনছিত ঋণদায়ে বাড়ি বিক্রী হয়ে যাবার পর প্রিয়নাথের হুঁস হয় যে, এ-সবই তার বিশ্বস্ত বন্ধু কালীনাথের কারসাজী। প্রিয়নাথ তখন চাবুক নিয়ে তাড়া করে কালীনাথকে। পালাতে গিয়ে উপর থেকে পড়ে গিয়ে কালীনাথের মৃত্যু। তারপর উদ্ভাস্ত প্রিয়নাথের হত্যাজনিত আতঙ্কে দেশত্যাগ!

ইতিমধ্যে গৃহবিভাঙিত সুপ্রিয়র দিল্লীতে গিয়ে চাকুরী গ্রহণ এবং সমস্রানে প্রতিষ্ঠালাভ। এখানেই সুপ্রিয় ভবতারণবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর সুবাদ পায়। ভবতারণবাবুর সহকারী দেবীপুর কোলিয়ারীর বর্তমান ম্যানেজার যোগেশের উপর তহবিল তছরূপের সন্দেহের কিনারা করতে দৈবক্রমে সুপ্রিয়কেই আসতে হয়। সেখানে সুপ্রিয়-প্রমীলার সাক্ষাৎ হয় এবং তহবিল তছরূপের কিনারা করতে গিয়ে ধুরন্ধর যোগেশের হাতে পড়ে সুপ্রিয়কে মৃত্যুর মুখোমুখী হতে হয়। ঠিক সেই সময় দৈবক্রমে যোগাযোগবশত পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্তে স্বরিত আগমনে, শেষ দৃষ্টে, প্রিয়নাথকে

যোগেশের পিস্তলেরগুলিতে মুহূমান দেখা যায় এবং যুদ্ধের পূর্বে সুপ্রিয়-প্রমীলার হৃ'হাত এক করে দেয় প্রিয়নাথ । এই হোল-যাত্রা হোল শুরু' সংক্ষিপ্তসার ।

এক কথায়, প্রেম-প্রণয়, শঠতা-বিশ্বাসঘাতকতা, নাচ-গান, খুন-খারাবি, উদারতা মানবতা সব কিছুর এক জগাখিচুড়ী হচ্ছে এই উদ্ভট কাহিনীটি । সস্তা রোমাঞ্চ প্রয়োগে ঘোলা প্রেমের খেলা টেকনিকে গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গল্পের শুরু । বাস্তবতা বোধের বাদ-বিচার নেই, চরিত্র বিকাশ এবং ঘটনা সংস্থাপনের যুক্তি নেই, ব্যক্তি স্বরূপের স্বাভাবিক পরিণতির-দিকে বিশুমাত্র লক্ষ নেই । আছে কেবল নাটকীয়তার দিকে প্রবল ঝোক এবং দর্শকমনে উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ সৃষ্টির একচোখো যান্ত্রিক দৃষ্টি— তাই এই কাহিনীর প্রতিটি চরিত্রই হয়ে উঠেছে কাহিনীকারের হাতে খেলার পুতুল । তিনি যা বলাচ্ছেন চরিত্রগুলি তাই বলে যাচ্ছে, যা করাচ্ছেন তাই করছে বঙ্গের মত ।

সুপ্রিয়-প্রমীলার প্রেমের কথাটাই ধরা যাক । দেখানো হয়েছে এদের প্রেম গাঢ় হয়ে উঠেছে, বিয়ের কথাবার্তাও পাকা । কিন্তু সেই গাঢ় প্রেমের বিয়ে ভেঙ্গে দিল কালীনাথ প্রিয়নাথকে ভুল বুঝিয়ে । তারপর হাশ্বকর লাগে প্রিয়নাথ যখন তাঁর ছেলেকে ভিকা চান প্রমীলার কাছে, প্রমীলাও তাকে ফিরিয়ে দিতে রাজী হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে । যুক্তি হোল সুপ্রিয়কে ভালবাসে বলেই সুপ্রিয়কে সে দাবী করবে না প্রিয়নাথের অনুরোধে । তাই সুপ্রিয় গৃহত্যাগ করে চলে যাবার আগে যখন প্রমীলার সংগে বোঝাপড়া করতে আসে তখনও সুপ্রিয়কে সে আমল দেয় না । এবং সুপ্রিয়ও, অবাক লাগে দেখতে, বিশেষ কোনো ভাবাবেগ প্রকাশ না-করেই সহসা অভিমানভরে প্রমীলাকে ছেড়ে চলে যায় । প্রেমিক-প্রেমিকার প্রগাঢ় প্রেমের এমন নিষ্কণ্টক বিচ্ছেদ কারো জীবনে হতে পারে কিনা সেটা দর্শকের ভাববার বিষয় হতে পারে কিন্তু পরিচালক বা কাহিনীকার তা নিয়ে মাথা ঘামাননি । এমনি বাস্তবতা বোধহীন অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারে এ ছবিতে । কিন্তু তুতা উল্লেখ করে লাভ কি ? পরিচালক-কাহিনীকার দর্শকদের একটা কাহিনী শোনাতে চেয়েছেন—তা সে কাহিনী বাস্তব ঘেঁষা হোক বা না হোক নাট্যকৌতুহল সৃষ্টি করে দর্শককে আকৃষ্ট যে কেছুটা করেছে—সেকথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না । নাটকীয়তার পর নাটকীয়তা সৃষ্টি করে ঘটনাগুলিকে চিত্রনাট্যকার এমনভাবে সাজিয়েছেন, তা যুক্তিপূর্ণ না-হয়েও একটা একটানা কৌতুহল সৃষ্টি করে গল্পের গতিবেগ বজায় রেখেছে । যার জন্যে প্রায় তের হাজার কুট এই ছবিটি আকর্ষকতার চমক লাগিয়ে লাগিয়ে দর্শকমনকে টেনে রেখেছে । এবং এই নাট্যকৌতুহল বজায় রাখতে অবশ্য অনেকখানি সহায়তা করেছে পাত্র-পাত্রীর অভিনয়ংশ ।

প্রিয়নাথ চরিত্র পাহাড়ী সান্ত্বালের অভিনয়গুণে দর্শককে আকৃষ্ট করেছে । কালীনাথের ভূমিকায় নীতিশ উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন । কমল মিত্র এ ছবিতে যথেষ্ট সংযত ও স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করেছেন । উত্তমও গতানুগতিকতার উদ্বেগ ওঠার জন্যে প্রশংসা পাবেন । পার্শ্বচরিত্র পরিমলের ভূমিকাটি কিছু আড়ষ্টতাহুটে । সংলাপের সংগে অভিব্যক্তির যথাযথ প্রকাশ না-হওয়ায় দৃশ্যগুলি কোথাও কোথাও তাৎপর্যহীন মনে হয়েছে । যেন কলের পুতুলের মত মুখস্ত বলে গেছে পরিমল চরিত্রটি । নবাগত

শিল্পী গোপাল বজ্রমদারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখলে পরিচালক সুবিচার করতেন, পার্শ্বচরিত্রের প্রয়োজনও তাৎপর্যপূর্ণ মনে হতো। প্রমীলা চরিত্রে সবিতার অভিনয় বেশ সাবলীল। শোভা সেনও চরিত্রাভূগ। যোগেশের ভূমিকায় দীপক মুখার্জীর অভিনয় প্রতিশ্রুতিপূর্ণ।

সবচেয়ে যা খারাপ লেগেছে তা হচ্ছে সংলাপ। বহুক্ষেপে সংলাপ—মনে হয়েছে যেন থিয়েটার দেখছি। থিয়েটার এবং সিনেমা ছবির সংলাপ সম্বন্ধে অধিকাংশ পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকারই বোধশক্তিহীন। এ ছবিতে তা আর একবার প্রমাণিত হোল!

সংগীতাংশ মন্দ নয়। আলোকচিত্রগ্রহণ সাধারণ স্তরের।

আদর্শ হিন্দু হোটেল। প্রযোজনা : শ্রীলেখা পিকচার্স, কাহিনী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রনাট্য : জ্যোতির্ষ্ময় রায়, পরিচালনা : অর্ধেন্দু সেন, আলোকচিত্র গৌর দাস, সংগীত : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিল্পনির্দেশনা : সুনীল সরকার, সম্পাদনা : শিব ভট্টাচার্য, ভূমিকায় : সন্ধ্যা, সবিতা, শোভা, শিখা, পদ্মা, ছবি. জহর, সম্ভাব, অম্বুপকুমার, তুলসী লাহিড়ী, তুলসী চক্রবর্তী, অম্বিত চট্টোপাধ্যায়, জহর রায় এবং আরো অনেকে।

বিভূতিভূষণের বহুপঠিত উপন্যাসের চিত্ররূপ এটি। কাহিনীর মূল চরিত্র হাজারী ঠাকুর। হাজারী ঠাকুর একটি সরল সং এবং অতি নিবিরোধী লোক। সত্যতার পথেই তার জীবনের সহজ গতি। দুঃখী মানুষ। জীবনের সুখ-সাম্রাজ্যে বঞ্চিত। কিন্তু বঞ্চনাময় জীবনের জন্তে কারো বিরুদ্ধে তার কোনো নালিশ নেই। নিজ দুঃখ দুর্দশা সে তার সহজাত ঔদার্যের মহিমায় ধৈর্যের সংগে অতিক্রম করতে চায় এবং আপন ভবিষ্যত সুখ-স্বপ্নের মাঝে সে মগ্ন থাকে। তার সে স্বপ্ন একদিন বাস্তবে রূপায়িত হয়। কিন্তু তার সুখের দিনেও তার হৃদয়ের ঔদার্য অন্তর্হিত হয় না। হৃদয়ের পাপড়ি মেলে সে ভালবাসতে জানে সবাইকে, আপন করে নিতে পারে প্রতিটি মানুষকে। নেয়ও সে—যারা তাকে বঞ্চনা করে এসেছে তাদেরও। এই নিষ্কলুষ ভালবাসার বাধুর্বেষভিত্তি এই হাজারী ঠাকুর চরিত্রটির দুঃখ-বেদনা এবং স্বপ্নকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের আখ্যানভাগ রচিত।

চলচ্চিত্র উপযোগী প্রচুর উপাদান ছিল গল্পটির মধ্যে কিন্তু আমরা দেখে অত্যন্ত হতাশ হয়েছি যে ছবিতে গল্পের সুরটি যথাযথভাবে পরিচালক হাজির করতে পারেননি প্রয়োগ-কৌশলের ব্যর্থতার জন্তেই। দুর্বল চিত্রনাট্য এবং কল্পনাহীন পরিচালনাই তার প্রধান কারণ। তাই চিত্রটি আগাগোড়া প্রাণহীন মনে হয়েছে।

কোনরকমে গল্পটিই বলে গেছেন পরিচালক। কিন্তু গল্প বলা এক, আর দর্শকমনে গল্পের আবেদন সঞ্চার করা যে ভিন্ন—এই প্রাথমিক জ্ঞানটুকু পরিচালকের কাছে বলে মনে হোল না। এমন কি, এমন একটি দৃশ্যও চোখে পড়লো না সবত্র ছবিটির মাঝে, যা চিত্রনাট্যকার বা পরিচালকের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারে, বলা যায় উল্লেখযোগ্য। সমস্ত ছবিটির প্রতিটি শট অতি মামুলী চিন্তাপ্রসূত। ফলে ঘটনাপ্রবাহ রাল, অসংবদ্ধ।

আসল কথা হচ্ছে, কোনো বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাব ফুটিছে তুলতে হলে শিল্পসৌন্দর্য বোধ সম্পর্কে চিন্তায় সংহতি আনার প্রয়োজন। আপন শিল্প-অঙ্গিকে দর্শকের চোখের সামনে সম্ভাব্য বাস্তবতাসম্মত পরিমিত বোধের সঙ্গে বিষয়বস্তুকে তুলে ধরতে হবে। সেটা সম্ভব হয় তখনই, পরিচালকের যখন সর্বদিকে তাক পৰ্যবেক্ষণ শক্তি থাকে, থাকে সজাগ সচেতন শিল্পজ্ঞান,—কোনো একটি বিশেষ দৃষ্টের প্রতি নয় শুধু, প্রতিটি দৃষ্টের সঙ্গে প্রতিটি মিলিয়ে এক অখণ্ড ও তাৎপর্যমণ্ডিত ভাব পরিপূরণে। তবেই একটি বিষয়বস্তুর সামগ্রিক আবেদন অর্থবহ হয়। এই জ্ঞানটি নেই আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিচালকের, এ ক্ষেত্রেও সেই একই অজ্ঞানতার কারণ ঘটেছে।

সম্ভবত সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'র সাফল্যে উল্লসিত হয়েছিলেন পরিচালক ব্যবসাগত দিক চিন্তা করে। হয়তো ভেবেছিলেন বিভূতিভূষণের বই ধরলেই তিনি বাজীমাত করতে পারবেন। কিন্তু তা পারেননি : কারণ, 'পথের পাঁচালী'র সাফল্যের মূল কারণগুলির দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিপাত করেননি। তা করতে পারলে অর্থাৎ চিত্রশৃঙ্খলে উন্নত শিল্পদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারলে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-ও একখানি ভাল ছবি হতে পারতো।

হাঙ্গারী ঠাকুরের ভূমিকাটিতে অভিনয় করেছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য। তাঁর অভিনয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েছে নিঃসন্দেহে কিন্তু মনোপ্রাণী হয়নি। পদ্মখি-র ভূমিকায় সন্ধ্যার অভিনয়ও খারাপ নয় কিন্তু সাজসজ্জা ও অভিব্যক্তিতে পদ্মখি প্রাণবন্ত নয়। কুমুদের ভূমিকায় শোভা সেন বরং স্বাভাবিক। টেপী ও টেপীর মার ভূমিকায় শিখা বাগ ও পদ্মা দেবীকে চলনে-বলনে শহরে-শহরে মনে হয়েছে—রূপসজ্জা, অভিনয় এবং এমন কি অভিব্যক্তিতেও। জ্বর মোটামুটি সহজ সংগত বেচু চক্রবর্তীরূপে। সবিতা অতসী চরিত্রে মানানসই, অভিনয়ও চরিত্রাভূগ বলা যায়। আলোকচিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, দৃশ্যপটপরিকল্পনা ইত্যাদি অমূল্য। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর আবহসংগীত উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবী আমাদের চায়। প্রযোজনা : এইচ, এন, সি, প্রোডাকশন্স ; পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী, কাহিনী ও চিত্রনাট্য : বিধায়ক ভট্টাচার্য, সংগীত পরিচালনা : নটিকেতা ঘোষ, সম্পাদনা : বৈষ্ণবনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকায় : বালা সিংহ, সন্ধ্যারানী, চন্দ্রাবতী, রেণুকা রায়, উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্দ্রাল, গজাপদ বসু এবং আরো অনেকে।

মাছুষের চিন্তা যখন বিকারপ্রসূ হয়, তখন মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতা লোপ পায়। অস্বাভাবিক কল্পনায় তখন মন ঘোরাফেরা করে। সেই অবস্থায় যদি কেউ লিখতে বসে তাহলে সে রচনার গতি ও পরিণতি যা হতে পারে পৃথিবী আমাদের চায় গম্ভীরকৈ যদি তেমনি এক ধামখেয়ালী উদ্ভাসতার পর্যায়ে ফেলা যায় তাহলে আশা করি ভুল বলা হবে না। কারণ, এ গল্পের গতিই বা কোনদিকে, প্রকৃতিই বা কী—এর হৃদিস করতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একথা বলতে বাধ্য যে আকস্মিক নাটকীয়তার প্যাঁচে প্যাঁচে ঘড়ানো যে গল্প কাহিনীকার দর্শকদের উপহার

দিয়েছেন তার অভিনব স্বীকার করার উপায় নেই ! গল্পটি সংক্ষেপে জানাতে হলেও অনেকখানি স্থানের প্রয়োজন । স্থান সংকুলান যদিবা হয় মানসিক স্বৈর্ঘ্যের উপর অথবা ট্যাক্স বসাতে অপারগ হওয়ায় গল্পটি বিবৃত করতে পারলাম না সেদিকে সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমাপাখী ।

আশা করি, আমার উপরোক্ত বক্তব্য থেকে ছবিটি সম্পর্কে আপনারা ধারণা করবেন না । ছবিটির গল্পাংশ বাস্তবায়িত না-হলেও এর একটা উদ্দেশ্য বোঝা যায় । সেটি হচ্ছে দর্শকদের তাক লাগিয়ে প্রমোদ পরিবেশন করা—অবশ্য আমার মতে । কাঁধেই গল্পের বাস্তবতা ও শিল্পজ্ঞান সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন না তুলে যদি অবসর ব্যাপনের ক্ষেত্রে সিনেমার মাধ্যমে নিছক খানিকটা কৌতুক ও আনন্দ আহরণের অভ্যাস আপনার থাকে, তাহ'লে ছোৱের সংগেই বলতে পারি যে, এ ছবি দেখে আপনি আনন্দ পাবেন । প্রায় সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফিট এ ছবিটি দেখে আপনি ক্লান্ত হবেন না । 'যা হচ্ছে তা হতে পারে' একথা যদি আপনি মনে নিতে পারেন তাহ'লে হালকা হাসির সাথে হালকা রসের মিশেল দেওয়া কৌতুককর প্রেমের যে গল্পটি আপনি পাবেন তা হাল আমলের এ জাতীয় অনেক ছবির তুলনায় আপনার ভালই লাগবে । কাহিনী ও পরিচালনার নিন্দা যারা করবেন তারাও একথা স্বীকার করবেন যে নাট্যবেগে অমম্বর এই ছবিটির বাক্যে বাক্যে ছড়ানো যে অল্পশ্র রোমাঞ্চ তা চিত্রনাট্যকারের ঘটনা সংস্থাপনের কৌশলতা কোথাও একঘেয়েমির দোষে ছুটে হয়নি । চিত্রনাট্যকার ও পরিচালকের একমাত্র কৃতিত্ব এখানেই । পাত্র-পাত্রীর অভিনয়ের দিকটা যথাসম্ভব ভাল হওয়ায় ছবিটি সরাসরি ছোঁয়াচে দর্শকের মন বেশ খানিকটা আকর্ষণীয়ভাবে ভুলিয়ে রেখেছে । সুতরাং, আমি বলি, মুখ বুজে আনন্দ উপভোগ করার অভ্যাস যাদের আছে তারা এ ছবি দেখতে পারেন । ছবিটিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন মঞ্জু দে, ছবি বিশ্বাস ও অগিতবরণ—এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব চরিত্রে স্বাভাবিক । উত্তমকুমার ছবির সুর অল্পঘায়ী অভিনয়ে উজ্জ্বল । মালা সিংহও সেই ভালে ভালে দিয়েছেন, কোথাও কোথাও সুর অবশ্য কেটে গেছে । সন্ধ্যারানী ও চন্দ্রাবতী চরিত্রাঙ্গ । পাহাড়ী ও গঙ্গাপদ বসু কৌতুককর চরিত্রে রসাপ্লুত ।

ছবির সম্পাদনায় কিছু ছাঁটকাটের অবকাশ ছিল । যেমন স্টিট সিঙ্গার দম্পতীর মাত্রাতিরিক্ত অশোভন অঙ্গভঙ্গী, এ্যাপ্রেন্টিস চোরের ভূমিকায় অল্পকুমার এর দৃশ্যটি, গণৎকার এবং এমনি আরো ছোটখাটো কয়েকটি তাৎপর্যহীন দৃশ্য ।

সংগীতাংশ, আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ নিন্দনীয় নয় ।

। চিত্রাঙ্গাদী ।

বিল্লোগপঞ্জী : জগদীশ গুপ্ত

অবীণ কথা-সাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত একান্তর বছর বয়সে রোগশীর্ণ শরীরে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন। এ সংবাদে সাহিত্যানুরাগী নাট্রেই ব্যথিত হয়েছেন।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কাছাকাছি সাহিত্যের আসরে তাঁর আবির্ভাব। বঙ্গবাণী, কল্লোল, কালাকলম প্রভৃতি তখনকার দিনের নামকরা পত্র-পত্রিকাতেই তিনি প্রথম লিখতে শুরু করেন। এবং আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তখনকার শক্তিশালী সাহিত্যিকদের পাশে তাঁর লেখনী আপন বৈশিষ্ট্যে নিজের আসন করে নেয়।

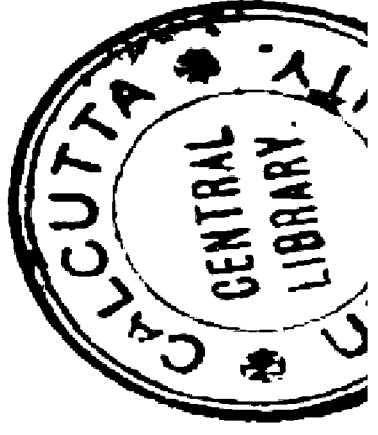
তিনি জীবনের বাখা-বেদনা-বন্ধনা ও ক্রটি-বিচ্যুতিকে আপন বীর্ষবহ্নির প্রেরণায় অকপটে ব্যক্ত করতে প্রয়াসী হন বাস্তবপন্থী বিষয়বস্তুর মাধ্যমে। জীবনের জটিলতার মাঝে ডুব দিয়ে তিনি জীবন-রহস্যের অনেক রুদ্ধতার উদ্ঘাটিত করেন—সমাজে নরনারীর সম্পর্কের বিচার-বিশ্লেষণে নিযুক্ত হয়ে। মানুষের মহৎ স্বস্তির বিভিন্ন দিকে যেমন ছিল তাঁর প্রখর পর্যবেক্ষণ, তেমনি জৈবস্বস্তি ও জীবনকামনার দিকটায়ও তাঁর গভীরতা ছিল নিষ্ঠাময়। তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ জীবনবোধে প্রদীপ্ত মানুষ। তাঁর দৃষ্টিতে যেখানেই তিনি লক্ষ্য করেছেন অনাচার অবিচার, সেখানেই তাঁর আধুনিক নবীন মনের তাক্রণ্য ফেটে পড়েছে। লেখনী ব্যঙ্গের কবাসাও চালিয়েছে বিবাস্ত শরের মত। সেখানে তিনি নির্মম নিরাসক্ত নিরাবেগ। কঠোর সত্যদ্রষ্টার ভূমিকায় ক্রম প্রত্যয়ী প্রাক্কজন।

জগদীশ গুপ্তর রচনারীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্য সবার থেকে পৃথক। তাঁর ভাষাও স্বচ্ছ। তিনি ছিলেন স্বাভাবিক নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক। কিন্তু এতগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর জনপ্রিয়তা খুব ব্যাপ্ত ছিল না। কিন্তু তা না-থাকলেও তিনি যে একজন অলেখক সুসাহিত্যিক ছিলেন সে-বিষয়ে সূধীজনের দ্বিমত নেই।

তিনি বোধ হয় ত্রিশখানারও অধিক বই লিখে গেছেন। তাঁর মধ্যে ‘স্মৃতিনী’, ‘বিনোদিনী’, ‘গতিহারা জাহ্নবী’, ‘ভবিষ্যৎ স্বপ্ন’, ‘অসাধু সিদ্ধার্থ’ প্রভৃতি পুস্তক বাংলা সাহিত্যের প্রাণরশ্মি, নতুন যুগ ও জীবন-চেতনায় উদ্দীপ্ত করে গেছে।

জগদীশবাবুর স্বভূতে আমরা ব্যথিত। তাঁর শোকার্চ সহধর্মিনীকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাই।

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়



অগ্রণী

॥ দশম বর্ষ, ষষ্ঠ, ১৩৬৪ ॥

ক্রুশ

বিরেন্দ্র নিয়োগী

ভোবড়ানো গাল, তীক্ষ্ণ নাক আর কোটরাগত চোখ। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে মুখ বাড়িয়ে মিস স্মিথ প্রায় ফিস ফিস গলায় বলে উঠলেন, রিয়্যালি ?

বাঁধানো দাঁতের ভেতর থেকে একটা লালচে জিভের টুকরো বেরিয়ে এসেই আবার ঢুকে গেল সাপের জিভের মত। কথাগুলো যেন হিসহিস করে উঠল। একটু সরে ঠিক হয়ে বসল লিজা। স্কাটটা টেনে নামিয়ে দিল পায়ের প্রান্তে। ভ্যানিটি ব্যাগটা বাঁ-হাত দিয়ে চেপে ধরল শক্ত মুঠোয়। যেন ওটার মধ্যে সাহস লুকিয়ে আছে।

মিস ডোরা স্মিথ। ইলিয়ট রোড অঞ্চলের নাম-করা মহিলা চিকিৎসক। ঝকঝকে প্রকাণ্ড একখানা দোকান। শোফা, কোচ আর টেবিল দিয়ে সাজানো। এক গাদা দেশীবিদেশী জর্নাল ছড়ানো থাকে তাতে সব সময়েই। ভেতরে প্রশস্ত চেয়ার। দেয়াল-আলমারিতে বেশ কিছু ওষুধও সাজানো রয়েছে দেখা যায়। যদিও লিজা তাঁকে খুব বেশি কলে বাইরে যেতে দেখেনি, তাহলেও মিস স্মিথের পসার নিশ্চয়ই কিছু কম নয়। কারণ বিকেলের দিকে তাঁর দোকানের সামনে লিজা নিজের চোখেই দেখেছে, কত গাড়ীকে ভিড় করে দাঁড়াতে। কত স্ত্রীশিশু তরুণতরুণীকে বা প্রৌঢ় ব্যক্তিকে নামতে। হাঁটা আর পোশাক দেখে তাদের আয়ের বহর সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

মিস স্মিথ নাকি এককালে মায়ের বহুলোক ছিলেন। পরে অবিম্ভি হৃদয়ের লাইনের আকাশপাতাল তফাৎ ঘটে গেছে। কাদাম শুয়োরের মত অভাবের সংসারে গড়াগড়ি খেতে খেতে বিবর্ণ, বিকৃত হয়ে গেছেন যা, আর মিস স্মিথ আজ এ-তলাটের টাকাপয়গীওলা মহিলা। তবু না এখানে এসেছেন মাঝে মাঝে, এমন কিছু ছেলেবেলায় ছু একবার লিজাকেও নিয়ে এসেছেন সাথে করে। সেই স্মৃতিতেই লিজার সঙ্গে পরিচয়। এমন কি 'আর্টি' বলেও ডেকেছে লিজা মিস স্মিথকে।

তবু আর্টির সামনে একলা বসে কথা বলতে বলতে আর তাঁর কথা শুনতে শুনতে এই নির্জন হৃদয়ে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল লিজা। এর আগে সে কখনো মিস স্মিথের কাছে একলা আসেনি। ভোবড়ানো গাল, তীক্ষ্ণ নাক আর কোটরাগত

উজ্জল চকুর দিকে তাকিয়ে লিঙ্গার মনে হয়েছিল যেন স্টাটানের কুর চোখ তার দিকে সম্মোহকের মত তাকিয়ে রয়েছে। অথচ ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। সে তার হৃৎকের কথা বলে মিস স্মিথের কাছে একটা পথ বাতলে নিতে এসেছে, এই মাত্র।

ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। লিঙ্গার বাবা ওর বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু লিঙ্গার রাজী নয়। বয়েস ওর আঠারো হয়েছে, যৌবনও যথেষ্ট এসেছে দেহে। আপত্তি বিয়েতে নয়। আপত্তি বাবার মনোমত লোকটাকে বিয়ে করাতে। সেই কথাই লিঙ্গার সবিস্তারে বলছিল।

বাবা শুধু গরীব হলে কথা ছিল না। কিন্তু বাহুবটা পাঁড় মাতাল। বুদ্ধিভ্রমি ঘটে একদম নেই। সংসারের জন্তে দরদ নেই এক কোঁটা। যেখান-সেখান থেকে ধারধোর করবে, তারপর বাড়িসুদ্ধ উপোস করে মরতে হয়। মা প্রথম প্রথম বলত, ঋগড়া করত। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন তো পোয়া বারো বাবার। ইতিমধ্যে এক কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছে। অনেকদিন থেকে টাকা ধার করছিল একটা লোকের কাছ থেকে। টাকা ফেরৎ চাইলেই লিঙ্গার কথা তুলে খামিয়েছে তাকে। বলেছে, লিঙ্গার সাথে ওর বিয়ে দেবে। লোকটা এতদিন অপেক্ষা করে এবারে মাথা চাড়া দিয়েছে। উপায় না দেখে বাবা নিয়ে এসেছিল তাকে বাড়িতে। লিঙ্গার সাথে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে আরও দু'চারদিন এসে চা খেয়ে গেছে লোকটা। বাবা এখন বলছে, লোকটা প্রোপোজ করলে না বলিস না। বিয়ে কর ওকে। পয়সাওলা লোক। সুখে থাকবি। বাট আই কান্ট ম্যারি এ ডার্ট নেটিভ; এ্যাও হি ইজ এ্যান ওল্ড ম্যান, ইউ নো। ও হেল ইট, বিতৃষ্ণায় ঠোঁট বাঁকালো লিঙ্গার। কাঁপানো কালো চুলের ওচ্ছ ঝাঁকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল সজোরে।

একটা ইণ্ডিয়ান ক্রিস্টিয়ান। তাও আবার এক পুরুষ ক্রিস্টিয়ান। কণ্ট্রিটারি করে। বৌ মারা গেছে কিছুকাল হল। বয়েস হয়েছে। তবু আর একটা বিয়ে করার সখ খুব। আজ সকালে লোকটা আবার এসেছিল। চায়ের টেবিলে মাঝে মাঝে অসভ্য চোখে লিঙ্গার দিকে তাকাচ্ছিল। মা বাবা দেখেও দেখছিল না। লোকটার কি ধৃষ্টতা। টেবিলের তলা দিয়ে ওর পায়ের উপর পা দিয়ে চাপ দেয়। লিঙ্গারও কম পাঞ্জী নয়। দিয়েছে সোজা লাথি মেরে। ক্রট! রিভলবার হাতে থাকলে ঠিক গুলি করতাম আমি লোকটাকে। থিংক, এ ব্র্যাকম্যান ডেয়ারস কিং মি।

মিস স্মিথ লিঙ্গার দিকে নিশ্চলক চোখে তাকিয়ে ছিলেন। এতক্ষণে একটু নড়ে চড়ে বসলেন। চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কোর্টরের ভেতর থেকে। একটু বুকে পড়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, রিয়্যালি।

একজাটলি সো, এর আমি একবর্ণও বাড়িয়ে বলিনি। লোকটা আজ স্পষ্টে বুঝে গেছে, আমি ওর কাঁদে পা দিচ্ছি না। কিন্তু এর পর তো আমার পক্ষে বাড়িতে থাকা মুশ্কিল হয়ে উঠবে। থিংক হোয়েন ড্যাডি উইল নো দি এপিসোড, মদের টাকা লোকটার কাছ থেকে না-পেলে আমাকে কি আর আস্ত রাখবে বাবা।

মাই পুওর গার্ল, সখেদে বললেন মিস স্মিথ। চোখ দুটো লিঙ্গার সুউন্নত

বন্ধদেশের উপর গিয়ে পড়ল। না, নেয়েটার তেজ আছে। বাধুনিও আছে চেহারার। শুধু নোংরার মধ্যে থাকে বলে একটু অপরিচ্ছন্ন এই যা।

আমি এখন কি করব, আন্টি? ব্যাকুল প্রশ্ন ধ্বনিত হল লিঙ্কার কণ্ঠে। বাবা লেখাপড়া পর্যন্ত শেখাল না। টাইপ শিখছিলেন, মাঝপথে তাও ছাড়তে হল। চাকরী-বাকরী যে একটা খুঁজব, তারও পর্যন্ত উপায় নেই। টেলিফোনে ধর্না দিলান। দিস নোটভ গভর্নমেন্ট আফ্রিকাল দেশি লোকদের চোকাচ্ছে শুধু। হু'একটা দোকান ঘুড়েছি সেলস গার্লের পোষ্টের জন্তে। মুখ ফিরিয়ে নেয়। কি করি বলুন তো! একটা কিছু না-করলেও তো চলবে না। বাবাটা তো দিন দিন সংসার পা দিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে। শেষটা কি একটা বুড়ো ইণ্ডিয়ানের সাথেই সংসার পাততে হবে নাকি? তাহলে কঁাসির দড়িই-বা কি এমন বন্দ?

আই এ্যাম রিয়্যালি সরি ফর ইউ লিঙ্কা। মিস স্মিথ ধীরে ধীরে বললেন। তারপর কিসের যেন চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

বাইরে ছপূরের আলোয় অলস রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল লিঙ্কা। বিয়েই যদি করতে হয়, তাহলে একটা সুপুরুষ উপার্জনশীল স্বামী জোগাড় করে নেব। সত্যিকারের সুখী নীড় বাঁধব। বেড়াব, পার্টি দেব, বন্ধুবান্ধবীদের সাথে ঘুরে সপিং করব। কোনোদিন-বা হৈহল্লা করে সিনেমায় যাব। তা নয় ওই বুড়োটাকে বিয়ে করো। না, স্ট্রাট ক্রট নেটিভ এ্যাও মাই ড্যাডি উইল মেক এ হেল অব মাই লাইফ। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল লিঙ্কার বুক কাঁপিয়ে।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন মিস স্মিথ। শোনো, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই হবে তোমাকে। নতুবা এরকম হুঁয়োগ ঠেকাতে পারবে না শেষ পর্যন্ত।

বাট হাউ, আমার কি সেরকম বিচ্ছেদ আছে?

সিলি গার্ল। শুধু বিচ্ছেদ দিয়ে হয় না। আরো অনেক কিছুই লাগে। যা বলছি শোনো। এরকম স্মারি হয়ে থাকলে কোনোদিনই কিছু করে উঠতে পারবে না। বি স্মার্ট। একি, তোমার চুল এলোমেলো, ঠোঁট ফ্যাকাসে, গালে যেন এককোঁটা রক্ত নেই। আর ড্রেসই-বা কি! যেন ভিক্টোরিয়ান এম্ব-এর মেয়ে! বি এ মডার্ন, ঠোঁটে একটু কড়া করে লিপস্টিক মাখো। গালে ঘন রক্ত দাও। হুঁদিন চটপটে হয়ে যোয়ো। দেখবে, আপসে আপ কাজ জুটে যাবে তোমার। কাজ জোটা একটা সমস্যা! বেশ, আমার কাছেই এসো। আমিই হিলে করে দেব তোমার। অনেক লোকইতো জানা আছে আমার। তবে হুঁচারদিন ওদের সাথে একটু ঘুরতে হতে পারে হয়তো তোমার। এই যা! আচ্ছা, ঋনিকক্ষণ ভাবলেন মিস স্মিথ, তারপর বললেন,—পরন্তু সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে আমার এখানে এসো একবার। দেখি কি হয়।

অনেক, অনেক ধন্যবাদ মিস স্মিথ। আপনি আমায় বাঁচালেন। আপনার উপদেশ স্মরণে থাকবে আমার।

ভ্যানিটি ব্যাগটা বুকের কাছে চেপে বেরিয়ে পড়ল লিঙ্কা দোকান থেকে।

আর মিস স্মিথ ওর গুরু নিত্যের ছন্দিত ওঠানামার দিকে তাকিয়ে শুধু বিড়বিড় করে বললেন, এ রিয়েল বিউটি নো ডাউট ।

ডিহি শ্রীরামপুর রোডের আধভাঙ্গা বাসায় যখন লিঙ্গা এসে পৌঁছল, তখন মন তার লম্বু হয়ে গেছে । শিস দিয়ে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে নাইটিঙ্গেলের মত । সত্যি, মিস স্মিথের মত ভালো মানুষ হয় না । প্রথম প্রথম একটু ভয় করছিল অবিষ্টি, কিন্তু তারপর উনি যখন সহানুভূতি দেখালেন, কিছু করে দেবার আশা দিলেন, তখন থেকে তার ভয় নিঃশেষে উড়ে গেছে । শুধু আপসোস হচ্ছিল, আরো আগে আসেনি কেন সে মিস স্মিথের কাছে । সামনের রবিবারে চার্চে মিস স্মিথের নামে ক্যাণ্ডল দিতে হবে, লিঙ্গা ভাবল । আহা মানুষটা বিয়ে থা করেনি, দেখবারও বোধ হয় কেউ নেই ! আই উইল প্রে ফর হার, আই মাস্ট ।

দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো লিঙ্গা । কি জরাজীর্ণ বিবর্ণ বাড়ি ! ছোট একতলা । বোধ হয় আগে কোনো ধোপা থাকত এখানে । বাইরের দরজার উপর সাদা রংএ বাংলায় লেখা—‘আড়ং ধোলাই হয়’ । কথাগুলো এখন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে । দুখানা মাস্তুর ঘর । ছোট একটা উঠান । এককোণে একটা পেয়ারা গাছ । গা ঘেঁষে কিচেন । কিচেন তো নয় গোড়াউন বলাই ভাল । একটা শুধু শুলশুলি আর ছোট একটা দরজা ।

যাক আর কদিনই-বা এখানে আছি । এরপর উপার্জন শুরু করলে উঠে যাব এখান থেকে । ক্ল্যাট নেব চৌরঙ্গী এলাকায় । যত সব নেটিবদের আড্ডা এখানে । অসহিষ্ণুভাবে করাঘাত করল লিঙ্গা দরজায় ।

খুলে দিল খিল দশবছরের ভাইটা । হাতে একটা কড়ির মগ । বাইরে বেরুবে বলেই বোধ হয় আসছিল । চুকতে চুকতে মুখ খুলিয়ে লিঙ্গা জিজ্ঞেস করল, যাচ্ছিস কোথায় ?

চা আনতে একটু । মা'র জন্মে । শিস দিতে দিতে চলে গেল বিল ।

হয়তো এও শেষ পর্যন্ত বাবার মতই হবে । এখনই তো একটা গুণ্ডার মত চেহারা হয়ে উঠেছে । লিঙ্গা ভাবল । আর একটু বড় হলেই হয়তো চুকবে কোনো কারখানায়, বিন্ধী হয়ে । বিয়ে করবে একটা মূর্খ মেয়েকে । তারপর তাকে মারধোর করা আর মদগেলা, এই হবে জীবন ।

ঘরে চুকে টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলল ভ্যানিটি ব্যাগটা । জুতো খুলে সাজিয়ে রাখল আলনার নিচে । তারপর রংচংএ খড়ম পায়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো । টিকি-চেয়ারে শুয়ে একটা পেনী খিলার পড়ছে মা । জীবনের সব মিল শেষ হয়ে গেছে, এখন বইয়ের পাতা থেকে তাস্তই ছোলো স্বাদ খুঁজে বেড়ায় মা । কি করুণ দুঃখের একটা মূর্তি । চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে । একযুগে হয়তো চুলে কিছুটা সোনালী আভাও ছিল । কিন্তু একী চল্লিশ বছর বয়েসেই সেগুলো কেমন খসখসে সাদাটে হয়ে এসেছে ।

মামী ! আদরভরা কণ্ঠে ডাকল লিঙ্গা । এগিয়ে এসে পিছন থেকে মা'র গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল । আমি মাকে ভালোভাবে রাখব । স্বখের মুখ দেখাব । উত্তেজনার সাথে ভাবল লিঙ্গা ।

শীর্ণ রংগুঠা ডান হাতটা তুলে লিঙ্গার মাথার উপর রাখলেন মিসেস সিম্পসন। নিঃশব্দে ওর চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাতে লাগলেন, বাঁ হাতের একটা আঙ্গুল বইটার মধ্যে ঢুকিয়ে বন্ধ করে রেখে। মেয়ে নায়ে নায়ে এমন করে। মিসেস সিম্পসন সবই বোঝেন। মেয়েটা এত বড় হল। একটু সোসাইটিতে মিশতে পায় না। একটা পার্টিতে পর্যন্ত এ্যাটেণ্ড করতে পারে না। বাবার মধ্যে শুধু রোববারে একবার করে চার্চ। এই ব্যেঙ্গের ছুঃখ মিসেস সিম্পসনও তো একদিন ভোগ করেছেন। আজ না হয় নিজের জীবন থেকে সব আশা, অনিশ্চিত আর সব ফুটো পাত্রে তলা দিয়ে চুইয়ে বাবার মতাবে রিয়ে গিয়ে রিক্ত করে দিয়েছে তাঁকে। কিন্তু তাই বলে লিঙ্গার এই ব্যেঙ্গের ছুঃখটা তো আর মিথো নয়। তবু, মেয়েকে তাঁর ভালোই বলতে হবে। পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে এখনো বদমায়েসী শুরু করেনি কোনো। বরং এড়িয়েই এসেছে এতদিন।

বুঝলে মা, লিঙ্গা হঠাৎ বলে উঠল, আমি যখন অনেক টাকা উপার্জন করব, তখন তোমাকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে চৌরঙ্গীতে ফ্ল্যাটে থাকব। বাবা থাকবে বিলকে নিয়ে এখানে। যা পারবে করবে। আমাদের কি।

মা নিঃশব্দে হাসলেন। মনেনকনে শুধু বললেন, পাগলী!

কিরে, চা খাবি একটু? মা লিঙ্গার দিকে তাকালেন। বিল ফিরে এসেছে চা নিয়ে। লিঙ্গা হঠাৎ ফুঁসে উঠল, এই সব রেস্টোরাঁর চাগুলো গেলো কেন বলে তো? এ ব্যাড টেস্ট, এই করতে করতেই অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে সবার।

এ্যাণ্ড দোজ ক্রট, দোকানের আড্ডাবাজ চ্যাংড়াগুলো এই সবার জন্যেই তো লাই পেয়ে যায়। ওদের শীসের চোটে রাস্তা দিয়ে চলা মুক্তি হলে পড়ে।

আজ যেন সবকিছুই খারাপ লাগছে। এই ছোট ঘর। এই কালো রংচটা টেবিল। শেলাই করা ইক্সিচেঞ্জায়, এবড়োখেবড়ো রাস্তা, ছোট রেস্টোরাঁ, চারপাশের মানুষগুলো—সবই যেন অসভ্য আর নোংরা।

মা আর কিছু না-বলে একটু চা চেলে এগিয়ে দিলেন ওর দিকে। ক্রাস্ট হ্যাভ এ সিপ, মাই ডিয়ার।

আমি এখন আয়নার নামনে দাঁড়িয়ে পুরু করে লিপস্টিক দেব ঠোঁটে, ঘন করে গালে রুজ লাগাব। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভাবল লিঙ্গা।

ঘন করে রুজ আর পুরু করে লিপস্টিক দিয়েই গিয়েছিল লিঙ্গা। কিন্তু গিয়েই যাবড়ে যেতে হল।

সাদা প্র্যাটিকের ড্যানিটি ব্যাগটা হুলিয়ে স্বরিতগতিতে হেঁটে আসছিল। সন্ধ্যা কেবল উৎরেছে। শীত ছুঁই ছুঁই, হেমন্তের দিন। গ্যাসের আলোগুলো কিছুদূর পর পর নীলাভ আলো বিকীর্ণ করছে। মাথাটা একটু নিচু করে তাড়াতাড়িই হাঁটছিল লিঙ্গা, সাতটা বেজে গেছে। ঠিক সময়ের মধ্যে মিস স্মিথের কাছে পৌঁছতেই হবে।

নিঃশব্দে বোধহয় একটু দ্রুততালে পড়ছিল। বুক ওঠানামা করছিল ঘন ঘন। মাথা নিচু করে পা দিয়েছিল মিস স্মিথের দোকানের মধ্যে। মুখ তুলে তাকিয়েই কিন্তু

ধরকে গেল। জানদিকের শোফায় পায়ের উপর পা দিয়ে একজন সুবেশ ভদ্রলোক বসে আছেন। পরনে দামী পোশাক। রীতিমত অভিজাত বলে মনে হয়। একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল লিঙ্গা। সংকুচিত দৃষ্টিতে একবার তাকালো মিস স্মিথের দিকে।

মিস স্মিথ ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

ওড ইভনিং, আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল লিঙ্গা।

সুসহ্যা। এসো, তোমার জন্মেই এতক্ষণ আমরা অপেক্ষা করছিলাম।

লিঙ্গা বাঁ-দিকের শোফায় বসে পড়ল। চোখ তুলে দেখল, ভদ্রলোক ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন। চেয়ার ছেড়ে মিস স্মিথ উঠে এলেন। হুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন পরিচয় করিয়ে দিই। মিস এলিজাবেথ সিম্পসন, এন্ডেস্ট ডক্টর অব মিঃ স্টুয়ার্ট সিম্পসন অব ব্রাউন এণ্ড ব্রাউন কোং; রবার্ট স্টিভেনসন, এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার অব ডেভিড মারশাল এণ্ড কোং।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বিনীতহাস্তে একটু নিচু হয়ে অতিনিপুণভাবে বাউ করলেন। সো প্রিন্স্‌ টু বি ইনট্রোডিউস্‌ড্‌ উইথ ইউ। আরক্ত মুখে লিঙ্গাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। বিড় বিড় করে সেও কোনরকমে ভদ্রতার বুলি আউড়ালো। একজন গণ্যমান্য লোকের সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্য বেশ একটু নার্ভাসই বোধ করছিল। কিন্তু সাথে সাথে আর একটা কথাও খেলে গেল মনে বিদ্যুৎচমকের মত। মিস স্মিথ তার বাবার পরিচয়টা মিথ্যে করে বাড়িয়ে বললেন কেন? চোখতুলে তাকালো মিস স্মিথের দিকে। উনি চোখের ভঙ্গিতে চুপ করে থাকতে বললেন। নিশ্চয় একটা কোনো গভীর অর্থ আছে। যাক, চুপ করে থাকাই ভালো।

মিস স্মিথ নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বসলেন। তারপর ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, এর কথাই বলেছিলাম আপনাকে মিঃ স্টিভেনসন।

মিস স্মিথের দিকে একবার তাকিয়েই লিঙ্গার চোখে চোখ রাখলেন মিঃ স্টিভেনসন। আপনার কথা শুনলাম মিস স্মিথের কাছ থেকে। আপনার জন্মে কিছু করতে পারলে নিজেকেই ধন্য মনে করব আমি।

মাথা নিচু করল লিঙ্গা আনন্দের আবেগে। কি সুমাজিত ব্যবহার আর নিখুঁত উচ্চারণভঙ্গী। পাকার ছেলেদের অভদ্র গলা মনে পড়ল। মনে হচ্ছিল যেন ঋণ ঋটেনের চারপাশের লোনা সমুদ্রের এক ঝাপটা বাতাস এসে লাগছে চোখে মুখে। নিশ্চয়ই ঋণ ঋটিনার হবেন ভদ্রলোক। নিজের অকিঞ্চিৎকর পোশাকটার জন্মে বড্ড লজ্জা লাগছিল। আড়চোখে একবার পায়ের দিকে তাকিয়ে নিল লিঙ্গা। জুতো ঘোড়া সতিাই বড় পুরনো।

পকেট থেকে একটা সুদৃশ্য সিগ্রেট কেস বের করলেন মিঃ স্টিভেনসন। সে আই অফার ইউ ওয়ান, উঠে এসে খুলে ধরলেন সিগ্রেট কেসটা সামনে।

থ্যাংকস্‌, কম্পিত স্বাভুলে একটা সিগ্রেট তুলে নিল লিঙ্গা। ব্যাচ ছেলে ধরিয়ে দিয়ে মিস স্মিথকেও একটা সিগ্রেট অফার করলেন ভদ্রলোক। তারপর ফিরে এসে নিজে একটা ধরিয়ে বসলেন পুরনো জায়গায়।

গয়গুজব হতে লাগল। ভদ্রলোক বেশ আলাপী। আজকের ওয়েদার, শীতটা

এবারে বেশি পড়বে কিনা, ইডেনের সাম্প্রতিক বিবৃতি, ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের বাণিজ্যনীতি বৃটিশপুঞ্জকে কতটা আঘাত করছে ইত্যাদি অনেক ছিনিস নিয়েই বললেন ভদ্রলোক। মাঝে মাঝে লিভার দিকে তাকিয়ে ওর সমর্থনও চাইলেন। কিন্তু লিভা কথা বলবে কি, এমন আলোচনা শোনা জীবনে প্রায় এই প্রথম ওর। ছ'বেলা ঠিকমত কুটির দান চুকিয়ে দেওয়া যায় কিনা কিংবা বাবার মদের ধার আরো কতটা বাড়ল, এছাড়া বাড়িতে আলোচনার অন্য কোনো বিষয়বস্তু পাওয়া যায় না। খুব বেশি হলে, পাড়ার কোন মেয়েটা মওকায় ভালো অফিসার বাগিয়ে বিয়ে করে চলে গেছে বা কার বিবাহ বিচ্ছেদের সময় আসন্ন হয়ে এসেছে, এই নিয়ে হুচারটে সরস আলাপ।

তবু প্রাণপণে সহজ হবার চেষ্টা করছিল লিভা। আর স্মার্ট। মাথা নাড়ছিল সমর্থন বা অসমর্থনের ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে। কখনো কখনো বিশ্বয় বা হুঃখুচক ছ'একটা অব্যয়ও বের করছিল গলা দিয়ে। আর মাঝে মাঝে আড়চোখে মিস স্মিথের ভাবভঙ্গীটা দেখে নিচ্ছিল। উনি কেমন ভাবে লক্ষ্য করছেন লিভাকে। আনাকে গৈয়ো ভাবছেন না তো ভদ্রলোক। মিস স্মিথ কত উঁচু করে আনার পরিচয় দিয়েছেন। সেই মিথ্যা পরিচয়ের গৌরব রক্ষা করা উচিত আমার।

কিছুক্ষণ পরে চুপ করলেন ভদ্রলোক। নিজের হাত ঘড়িটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হুঃখিত। আজকে আর সময় নেই হাতে। ক্রাবে এনগেজমেন্ট আছে, উঠতে হবে। আপনি চিন্তা করবেন না, আপনার জন্তে কিছু একটা করবই জানবেন। তবে হ' ছ'একদিন হয়ত অপেক্ষা করতে হতে পারে। হুচারদিন হয়ত ঘুরতে হতে পারে আনার সাথে এর ওর সঙ্গে পরিচয় করবার জন্তে। আচ্ছা কাল এই সময়ে আপনার সাথে এইখানেই দেখা করব। শুভ নাইট মিস সিম্পসন, শুভ নাইট মিস স্মিথ।

টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে ছ'পা এগিয়ে গেলেন মিঃ স্টিভেনসন। তারপর হঠাৎই ধমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘুরে দাঁড়ালেন একপাক। তারপর ফের এগিয়ে এসে লিভার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন—একসট্রীমলী সরী, কাল তো এই সময় এখানে আসতে পারব না। জরুরী কাজ আছে একটা। ওএল, ইফ ইউ ভোর্ট মাইও, কাল রাত আটটা নাগাদ কি একবার মেট্রোর সামনে এসে অপেক্ষা করতে পারেন। জাস্ট এ্যাট এইট, আপনার সম্বন্ধে কতটা কি করতে পারলাম এর মধ্যে জানিয়ে দিতে পারতাম তাহলে। অব কোর্স ইফ ইউ হ্যাভ নো বিজনেস, অত্যন্ত লজ্জিত মুখে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে বললেন মিঃ স্টিভেনসন।

ওঃ নো, নাথিং অব বিজনেস টুদরো, আমি আটটার সময় ঠিক হান্সির থাকতে পারব মেট্রোর সামনে। ব্যস্তভাবে বলে উঠল লিভা।

তাহলে ওই কথাই রইল। বিদায় নিয়ে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন এবারে। আমি এখন কি করি! আনার যে নাচতে ইচ্ছে করছে। বাপ্পাকুলচকে লিভা মিঃ স্টিভেনসনের অদৃশ্যমান মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইল। এত তাড়াতাড়ি ভদ্রলোক রাজী হয়ে যাবেন, কে ভাবতে পেরেছিল, মিস স্মিথ সত্যিই কাজের লোক, আর মিঃ স্টিভেনসন বা কম কি। বেশ দেখতে কিন্তু ভদ্রলোক, বাই

বলো, কতোই বা বয়েস হবে ? উনত্রিশ ? ত্রিশ ? এরি মধ্যে কত বড় পোস্টে কাছ করে । আর বাবা ? বয়স হোলো পয়তাল্লিশ ! এখনো প্রেশান এও ফ্রাডেনে একটা মিত্রীর কাছে ঘষটাচ্ছে । সত্যি মিস স্মিথ তখন মিথ্যে করে বাবার অল্প পরিচয় দিলেন কেন ? কথাটা আবার মনে হল লিঙ্কার । যাকগে, কোনো গভীর উদ্দেশ্য নিয়েই হয়ত মিস স্মিথ কাছটা করেছেন । এখন কথাটা তুলতে গেলে লজ্জা পাবেন, বিরক্তও হতে পারেন, থাকগে ।

মিস স্মিথ ওর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন । চোখে চোখ পড়তেই হাসলেন । গালের অসংখ্য কুঞ্জনগুলোয় একটা কম্পন ছেগে উঠল । যেন একটা মাকড়সা পা দিয়ে ঝড় ঝড় করে মুখের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

কেমন, দেখলেত ? সেই পুরনো হিসহিসে গলায় বললেন ।—হেঁজিপেজি লোক নয় । রীতিমত বড় মহলের মানুষ । আর দুদিন পরেই তো জেনারেল ম্যানেজার হয়ে বসবে । বাপ ঝগস ইন্টিশার । কোম্পানী থেকে অনেক টাকা দিয়ে ইস্টার্ন জোনএর কর্মকর্তা করে নিয়ে এসেছিল এখানে । সেই সূত্রে এখানেই থেকে গেছে ওরা । বাঁচি রক্তের আভিজাত্য যাবে কোথায় ।

মুণ্ডা ফণিনীর মত কান খাড়া করে শুনছিল লিঙ্কা । কি ভাগ্যি আমার ! মাকে বললে তো বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে এরকম দরের লোকের সাথে আলাপ পরিচয় হতে পারে আমার । যাক এখনই কিছু ভাঙছি না । তারপর একদিন যখন চোখের সামনে দেখিয়ে দেব, তখন চোখমুখের ভাবখানা কেমন হবে মা'র । করনায় ভেবেও খুব আনন্দ পেল লিঙ্কা ।

বড় সার্কলের লোক । তাই তোমার পরিচয়টাও একটু বাড়িয়েই বললাম । নইলে আমল দেবে কেন বলো ! বলে হাসলেন মিস স্মিথ । যাক এবারে কয়েকটা কথা শোনো আমার । চেহারার চর্চায় এবার থেকে মনোযোগ দাও একটু । ভালো চেহারার অনেক দাম বুঝলে ? আমার তো মনে হয়, তোমার শরীরের গাঁধুনি আর মুখটো ভালো থাকতেই ভদ্রলোক অত তাড়াতাড়ি তোমার জন্যে কিছু করতে রাজী হয়ে গেলেন । এবারে একটু চালাক চতুর হও, আর দশজনের মত যুগের সাথে খাপ খাইয়ে চলবার চেষ্টা করো । দেখবে, কামের অভাবও হবে না, টাকার দুঃখও থাকবে না । বলতে বলতে মিস স্মিথের চোখ চকচক করে উঠল, আহ, এ পিওরলি র গার্ল ।

এবার থেকে আমরা ভালোভাবে বাঁচতে পারব, স্কুলের ছিমছাম ঘর দোর, সুখী উজ্জল না, ভালো পোশাকখাশাক । আর বাবার দৌরাণ্ডি সহ করতে হবে না, গোটাকরোক টাকা বাবাকে ফেলে দিলেই নিশ্চিন্দ, টাকা পাবার আগেই যেন চকচকে নোটগুলো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল লিঙ্কা, আর সেই ওল্ড ফাগারুটোর ছুকছুকেপনাও সহ করতে হবে না, এবারে মুখের উপর স্পষ্ট বলে দেবে, ওর কোনো আশা নেই, আলাদীনের দৈত্যের মত যেন ধোঁয়ার মধ্যে সেই হতভাগা লোকটার মুখের ছবি ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছিল । আর সেখানে ভেসে উঠছিল সন্ত পুরিচিত একটি মাহিভ খান-বিলাতী ভদ্রলোকের মুখ, সে-মুখ ভদ্রতায় কমনীয়, আশ্বাসে উজ্জল ।

যেন লম্বু ডানায় ভাসতে ভাসতে বেরিয়ে এল লিঙ্গা দোকান থেকে, রাস্তায় গ্যাসের আলো কার রহস্যময় চোখের মত ! ঠুং ঠুং শব্দ তুলে ট্রান চলে গেল, পিয়ানোর বাজনার মত মিষ্টি যেন, লম্বু পায়ে হাঁটতে লাগল লিঙ্গা, গুনগুন করে গান ধরল এক কলি—এও হোএন আই স দোজ আইজ !

মার্কুলার রোডের উপর এসে পড়ল লিঙ্গা । আধো-অন্ধকারের গায়ে জোড়া-গির্জাটা খোদাই করা টেরাকোটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে । মহিমময় গান্ধীর্ষে শুদ্ধ ! যেন এই কালো রাত্রির বুকে মা মেরী যিশুখ্রীস্টকে কোলে নিয়ে অপলকে ত্রাণকর্তার কচিমুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, এক সুবিপুল পবিত্রতায় লিঙ্গার দেহ মন ভরে উঠল; প্রভু আমার আশীর্বাদ করো : ও হোলি মাদার, হ্যাভ ব্রেসিংস্‌ অন মি । তাড়াতাড়ি কুশ চিহ্ন আঁকল লিঙ্গা নিম্নের বুকে, আমার নূতন যাত্রাপথের উপর তাঁর করুণা বর্ষিত হোক ।

হালকা মেঘের মত কতগুলো দিন চলে গেল ভেসে ভেসে, লিঙ্গার যেন খেয়ালই ছিল না কোনো । একদিন সে কখনো লাইট হাউসে সিনেমা দেখেছে, হোটেল নেট্রোপোলে ডিনার খেয়েছে, গদ্যায় নোকাবিহার করেছে, আর কানের কাছে শুনেছে রবার্টের মুগ্ধ গুঞ্জন ।

পিছন ফিরে তাকালে পনেরো দিন আগেকার জীবনটাকে যেন কত বৎসর আগেকার এক হৃঃস্বপ্নের মত মনে হয় । উচু খুরতোলা জুতো পায়ে খুটখুট করে হাঁটতে হাঁটতে, হাঁটু পর্যন্ত নেনে থমকে পড়া স্কার্ট একটু হুলিরে চানড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ ষাড়ের সাথে ঝুলিয়ে চলতে চলতে লিঙ্গা আজ ভাবতেই পারে না, কোনো একদিন সে সেলাই-করা জুতো পায়ে দিয়ে রাস্তায় চলাফেরা করেছে, রিপু করা জামা গায়ে কখনো সে বাজারে কুটি কিনতে বেরুত ।

আগে কি জানত, স্ট্রাম্পেন, জিন আর শেরীর মধ্যে স্বাদের তফাৎ কতখানি ? এতদিন শুধু ক্রিসমাসের রাতে বছরে একদিন করে একটু মদ মিলেছে, তাও সম্ভাদরের রম কয়েক কোঁটা । পুরনো পরিচিতদের বাগায় গিয়ে হু'একদিন হয়তো রেকর্ডের সাথে বান্ধবীদের হাত ধরে নাচবার চেষ্টাও করেছে । কিন্তু রাত বারোটায় প্রশস্ত হলে ভালো ফ্লোরে ডানসিং টিউন-এর সাথে পা মিলিয়ে পাশের পুরুষ বন্ধুর বক্ষলগ্ন হয়ে নাচার সৌভাগ্য স্বপ্নেও হয়নি কোনোদিন । কি বিশ্বাস জ্বালো আর বিবর্ণ সেই আগের দিনগুলো । আমি কি তখন বেঁচে ছিলাম ? ভাবতে গিয়ে অবাকই হয়ে যায় মাঝে মাঝে লিঙ্গা । কি গৈয়ো মেয়ে ছিলাম আমি তখন ।

চাকরী তার হয়েই গেছে ধরে নিতে পারে লিঙ্গা, রবার্ট আশ্বাস দিয়েছে । এমনকি কিছু আগাম পর্ষস্ত দিয়েছে তার সম্ভাব্য চাকরীর সম্ভাব্য মাইনে থেকে । আর, ভাবতেও অসহ আনন্দে সারাদেহের লোমকূপ পর্ষস্ত ধরুধর করে যেন কাঁপে, রবার্ট ভালোবেসে তাকে যেচে চুমু দিয়েছে আর তারই প্রতীক স্বরূপ ঝকঝকে একটি ডেস ।

এত সৌভাগ্য লিঙ্গা মাইবে কি করে । তার চাকরী হয়ে গেল, রবার্টের ভালোবাসা পর্ষস্ত পেল । শুনেও-যে কেউ বিশ্বাস করবে না ।

রবার্টের মত ভালো ছেলে হয়না। আর্টি, উচ্ছৃঙ্খল গলায় বলেছিল লিজা মিস স্মিথকে। পারফেক্ট স্পেসিমেন অফ এ জেন্টলম্যান। আমার জন্যে চাকরির বন্দোবস্ত পর্যন্ত করে ফেলেছে এরি মধ্যে।

সত্যি নাকি? মিস স্মিথ জ্ব কুণ্ডিত করে প্রশ্ন করেছিলেন।

নিশ্চয়। জোর গলায় বলে উঠেছিল লিজা। আর মিস স্মিথের মুখ নিঃশব্দ হাসিতে ভরে উঠেছিল। ইউ নো আর্টি, বলতে বলতে লিজার কণ্ঠমূল পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছিল—বার্টি লাভ্‌স্‌ নি বিলীভ নী, হী ডাড। আবেগে গলা প্রায় বুঁজে এসেছিল লিজার। উপুড় হয়ে নিজের হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়েছিল।

বোকা মেয়ে, পুরুষ মানুষের কথায় অত চট করে বিশ্বাস করতে নেই। মিস স্মিথ যেন আধা-অবিশ্বাসের সুরে বলেছিলেন। আর লিজা সাথে সাথে ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ করেছিল, ইউ ডোন্ট নো আর্টি, ও বাজে কথা বলবার মানুষ নয়। সেদিন কথা বলতে বলতে ওর গলা কেঁপে উঠেছিল, কথা বন্ধ হয়ে এসেছিল। স্টাম্পেনের গ্লাস হাতেই ধরা ছিল, আমার দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সব ভুলে গিয়েছিল। ও-দৃষ্টি কি বুঝতে ভুল হয়? আফটার অল, হী ইজ এ সিরিয়াস ম্যান।

আর ওর কথা শুনতে শুনতে অপলকে মিস স্মিথ ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এই ক'দিনেই কত ঝকঝকে হয়ে উঠেছে লিজা। একটু ভালো পোশাক পরা আর একটু ভালোভাবে প্রশাধন করা শুধু। এ্যাও শী লুক্‌স্‌ লাইক এ প্রিনসেস্‌। আমার চোখ কখনো দামী হীর বাছতে ভুল করে না। মনে মনে আশ্বপ্রসাদ অনুভব করলেন মিস স্মিথ। অমন সুন্দর সুগঠিত শুন, সরু মাঝা দার সরু নিতম্ব হাছারেও কি একটা মিলবে?

আজ উঠি মিস স্মিথ। সেরাড্যাডএ আবার ড্যান্স প্রোগ্রাম আছে আজ। ব্লু হেসে ব্যাগের চেনটা খুলেছিল লিজা। ছোট একটা আয়না বের করে মুখের সামনে ধরে ঠোঁটে একটু লিপস্টিক মাখিয়ে নিয়েছিল। তারপর চুল ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিয়ে ড্যানিটি ব্যাগটা বন্ধ করে মিস স্মিথের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে সিজেন্স করেছিল—ডু আই লুক এনাফ মডার্ণ নাউ? বলে তির্যকভাবে ঘাড়টা একটু কাত করে বিদায় নিয়ে উঁচু হীলের অত ঝুটঝুট শব্দ ভুলে বেরিয়ে গিয়েছিল।

দিনকয়েক পরেই আবার নূতন সংবাদ নিয়ে এল। এই দেখুন, আমাকে ফোটা অ্যালবাম প্রেজেন্ট করেছে বার্ট। আমার কতো ছবি ভুলে দিয়েছে। এগিয়ে গিয়ে মিস স্মিথের টেবিলের উপর রাখল। ইডেন গার্ডেনে কোয়ারার পাশে হান্সরতা লিজা, ছপুরে রেড রোডের উপরে ছোট ছাতা মাথায় চলেছে লিজা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে পুষ্পস্তবকের সাথে মিশে থাকা লিজা, গজায় আউটরান ঘাটের বুকেতে রেলিং ধরে খুঁকে দাঁড়ানো লিজা—নানান বর্ণের নানান চংএর ছবি।

একি, এতো শুধু একলা ভেঁসারই? তোমাদের দুজনের একসাথে তোলা ফোটা কোথায়? মিস স্মিথ বিস্মিত সুরেই যেন প্রশ্ন করলেন।

হঁ, হঁ, কোতুকে লিজা মাথা নাড়ল—ও' ভারী ছেলেমানুষ। বলে কিনা, আমার ছবির পাশে ওর ছবি থাকলে ওর সৌন্দর্যের দৈন্ত নাকি স্পষ্ট হয়ে উঠবে সবার

চোখে । কিছুতেই তুলল না একসাথে ফোটো । একটা নিছক পাগলামী, না মিস স্মিথ ? চকচকে চোখে গর্ব উপচে পড়তে লাগল লিজার ।

পাগল নয় সে সেয়ানা । মনে মনে বললেন মিস স্মিথ । বাহাছর ছেলে । বেশ গুছিয়েই এগুতে জানে ।

আজ আবার ডায়মণ্ডহারবার যেতে হবে । দেখুন তো, কি আবদার ! ওখানে স্থানক্‌এ দোল খাবে, জেটিতে ফোটো তুলবে । আবোল তাবোল যত সব । দেখুনতো, এমন অবুঝ মানুষকে নিয়ে পারা যায় ? যেন বিরক্ত হয়েছে লিজা রবার্টের এই অহেতুক আবদারে । কিন্তু গলার স্বরে শুধু অকারণ খুশিই ছড়িয়ে পড়ল । আর মিস স্মিথ নিঃশব্দে মুখের রেখাগুলো প্রসারিত কুঞ্চিত করে দিয়ে হাসলেন শুধু ।

নূতন প্রেমের অগ্নন লেগেছে চোখে । বর্ণাঢ্য টেকনিকলার ছবির মত অপূর্ণপ মোহময় হয়ে উঠেছে জীবন । বার্টি, মাই সুইট ! কোথায় সেই বুড়ো লোকটা আর কোথায় অভিজাত রবার্ট ! জীবনটা এমন কিছু খারাপ নয় । মেঘের পরেও রোদ ওঠে । নিজের জীবন দিয়েই তো দেখছে লিজা । যুগ যুগ ধরে শুধু বার্টি আর আমি যদি এমনি করে বেঁচে থাকতে পারি ! ও লর্ড ! তোমার করুণাময় চোখের ক্ষমা-স্বিগ্ন হাসি বসিত হোক আমাদের উপর । তিনি আমাদের পাপ থেকে ত্রাণ করেছেন । বাবার হাতে কয়েকটা টাকা গুঁজে দিয়েছে এর মধ্যে । প্রসন্ন করেনি বাবা, কোথা থেকে সে পেল এ টাকা । লোকটাকেও লেলিয়ে দেয়নি লিজার পিছনে । লিজা বেঁচে গেছে ।

শুধু বাঁচা নয়, দিনে দিনে যেন নূতন করে জন্ম হচ্ছে তার । কাল আসানশোল ট্রিপ, পরশুদিন হয়ত আউটরামে বুকে ডিনার । নিজের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে ভাববার চেষ্টা করে লিজা । আমি কি এখনো যথেষ্ট মডার্ন হইনি । এক ছরস্তু প্রতিজ্ঞার মত সে দিনের পর দিন বুকের মধ্যে পালন করে আসছে কথাটা : তাকে মডার্ন হতে হবে, স্মার্ট হতে হবে । এতদিনের পিছিয়ে পড়া জীবনটাকে যেন একলাফে সে উত্তীর্ণ করে দিতে চায় আধুনিকতার আলোকরাশ্মি । আর তর সইছে না তার । ঘোড়াকে কাঁটা মেরে এগুবে সে । শুধু সবার সাথে সমান হবে না । এগিয়ে যাবে সবাইকে ছেড়ে ।

আমি নিশ্চয় আগের চাইতে অনেক মডার্ন হয়েছি । আমি তো এখন তির্যকভাবে তাকাতে পারি, মুখে আলতোভাবে ক্রমাল বুলিয়ে অকারণে ছোট করে হেসে উঠতে পারি, মদের গ্লাস অকম্পিত হাতে তুলে নিয়ে একটু পরেই বলতে পারি, কোনোরকমে ভেটোটা একটু মিটল । তবু ভয় হয় মাঝে মাঝে । বার্টি বুঝি এখনো তাকে যথেষ্ট মডার্ন বলে ভাবছে না । বোধ হয় ঠোঁটের কোণে বিজ্রপের ক্ষীণ রেশটুকু ঢাকতে গিয়ে অকারণেই আর একটা সিক্রেট তুলে নিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরছে । ভাবে, ভয় হয় আর বেশি সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে লিজা । ইচ্ছে করেই আসানশোলে আউট হাউসে রাতটা কাটিয়ে এল সেদিন । জোর করেই রবার্টকে আটকে রেখে রাত ছটোয় বাড়ি ফিরল এর মাঝে । রবার্ট জাহুক, সেও আর সব আধুনিকদের মত গভীর রাতে বাড়ি ফিরতে একটুও ভয় পায় না ।

আর মিস স্মিথ তার নূতন নূতন অভিযানের একজন শ্রোত্রী। রবার্টের প্রেম কম ফুট গভীর, শুধু দোকানে বসে থেকেই তা আজ অনায়াসে বলে দিতে পারেন তিনি, কি কি জিনিস এ পর্যন্ত প্রেজেন্ট পেয়েছে লিজা, তার নিখুঁত হিসাবও। চাকরী কেন এখনো আরম্ভ করছে না লিজা, তার কারণ আর কেউ হয়তো জানে না, কিন্তু মিস স্মিথ জানেন। মিঃ পাকিংইন, যার প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে মনোনীত হয়েছে লিজা, তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হোমে গেছেন মাস চারেকের জন্যে। তাই বলে লিজা বেকার বসে থাকবে কেন? সুতরাং এ্যালায়েন্স হিসেবে একমাস তাকে পঞ্চাশ টাকা করে দেওয়া হবে। অবিশিষ্ট কাজ পেলতো এই মাসের দিনকুড়ি হোলো। এমাসে তিরিশ টাকাই পেয়েছে সে রবার্টের হাত থেকে। আর কি সুবিধে! এখন অফিসে যাবার দরকারই হবে না তার।

এসব খবর অবশ্য অতটা চমকপ্রদ নয়। কিন্তু দিন কয়েক পরে আরক্তিম মুখে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে নাটকীয়ভাবে লিজা যে সংবাদ দিল, তাতে চমকেই উঠতে হল মিস স্মিথকে।

বার্টি আমাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করেছে। ওহ্ আর্টি হোয়াট উইল আই ডু নাউ। হু'হাত দিয়ে আবেগে বুক চেপে ধরল লিজা।

কি বললে? চমকে উঠলেন মিস স্মিথ। সন্দিক দৃষ্টিতে তাকালেন লিজার হাতের দিকে। না, এনগেজমেন্ট রিং নেই।

হ্যাঁ, কাল রাতে হোটেল মেট্রোপোল থেকে ফিরে আসবার সময় আমার কানে কানে কথাটা বলেছে। বলেছে, আমাকে ছাড়া ওর চলবে না জীবন। ঠিক করেছে, আমাকেই বিয়ে করবে। অবিশিষ্ট আমার যদি আপত্তি না থাকে। তাহলে মাস চারেকের মধ্যেই ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলবে। মাসচারেক লাগবে, কারণ ফ্যামিলি কোয়ার্টার এখনো পায়নি সে। বললে, আশা আছে, মাস কয়েকের মধ্যেই কোয়ার্টারের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

না, রবার্ট ছোকরার বুদ্ধি আছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মিস স্মিথ।—তা তুমি কি বললে?

আমি? আমার তখন কোনো কথা বলবারই শক্তি ছিল না। এমন সোভাগ্য কি বিশ্বাস করতে পারা যায়? এ্যাও ইট ওয়াস সো সাড্‌ন্‌।

সিওরলি। মিস স্মিথ যেন কোনো ছেলেরাঙ্গকে উপদেশ দিচ্ছেন, এমনি সুরে বললেন, এসব ব্যাপারে চটপট মত দিয়ে ফেলতে নেই। কে জানে, এটা হয়তো রবার্টের ক্ষণিক নেশা। পরে তোমাকে পস্তাতে হতে পারে একবারে। তাছাড়া, এখুনি বিয়ের কঁাদে আটকা পড়তে যাবে কি দুঃখে? আফটার অল, ইউ হ্যাভ নট এটেইও স্ট্রট এক হোয়েন ওয়ান থিংক সিরিয়াসলি অব ম্যারেজ।

যুধ নিচু করে কথাগুলো শুনল লিজা। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের রং-করা নখের উপর কড়ে আঙুল দিয়ে খুঁটতে লাগল নিঃশব্দে।

যাকগে। ইটস ইওর এ্যাফেয়ার। আমি আর কি বলব বলো? মিস স্মিথ চুপ করলেন।

কোন কথা না বলে বেরিয়ে এল লিঙ্গা ঘর থেকে। এতদিনে চিনলাম মিস স্মিথকে। আমার সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করেন উনি। রবার্ট আমাকে ভালোবাসে, এ কথাটা শুনেও এর আগে উনি খুব সন্দেহ করেছিলেন। স্বীকার করতে চাননি ঠিক। সেদিনের কথাগুলো, তারপর ওঁর হাবভাব সব মনে পড়তে লাগল। এখন সব স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নিজে বিয়ে করেননি, করতে পারেননি, তাই সবার ব্যাপারেই বাগড়া দিতে চান।

কি নীচমনা! কোন্ডে হুঃখে কুলে কুলে উঠছিল লিঙ্গা। সী ডান্স নট লাইক টু সি মী সেটেন্ড ইন লাইফ, আর এর নামেই আমি সেদিন চার্চে মোমবাতি দিয়ে এলাম। উঃ, মানুষকে এমনি করেই চেনা যায়। আর আসছি না এখানে।

রবার্ট, রবার্ট! ওহ্ হাউ আই লাভ ইউ, ওর মত মানুষের প্রেমেও সন্দেহ করে এমন মানুষও ছুনিয়ায় আছে? কিন্তু মিস স্মিথ তো জানবে না কোনোদিন, কী গভীর উত্তাপ নিয়ে কাছে টেনে এনে যখন গভীর প্রেমের স্মারক চিহ্ন লিঙ্গার উষ্ণ ঠোঁটে মুদ্রিত করে দিয়েছে, সে ক্ষণটি কি ভুলবার! এখনো যেন ঠোঁটের প্রতিটি অংশে তার উত্তাপ জড়িয়ে আছে। আর সেই কবিতার মত কথাগুলো এখনো কানে বাজছে, প্রে, লাভ মী ভায়োলেটলি, লাভ মী লং!

আমি রবার্টকে বিয়ে করবই। একটা সুখী শান্ত নীড়ের ছঁবি যেন চোখের সামনে এখনি দেখতে পাচ্ছে লিঙ্গা। আমি তো এই চেয়েছিলাম। ভদ্র প্রেমবান স্বামী, স্বচ্ছল সংসার। কোমল ধূমের মত চিরদিনের আশাগুলো ঘিরে এল লিঙ্গার চারধারে। আর তিনচার মাস পরেই বার্টি কোয়ার্টার পাচ্ছে। তারপর বিয়ে করে সেখানে উঠে যাচ্ছে লিঙ্গা। আমার মনোমত ঘর সাজাব। আমার ঘর। আমার স্বামী। কি হবে চাকরী দিয়ে। সেও তো এই ভুলেই। এই ভদ্র সুখী জীবনের পত্তনের জন্মেই।

রবার্টের পছন্দমত করে গড়ে তুলতে হবে এখন নিজেকে। কথায় কথায় ও আধুনিক মেয়েদের উল্লেখ করে, আধুনিক জীবন সম্বন্ধে দরদ প্রকাশ করে, আমি আরো মর্ডার্ন হব। টু হিজ এক্সপেক্টেশন, নো ইভন বিয়ও জাট।

হাত দেখিয়ে একটা ট্রাম দাঁড় করিয়ে উঠে পড়ল লিঙ্গা। আজ আর হেঁটে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

তবু আবার হেঁটে হেঁটে এল একদিন মিস স্মিথের দোকানে। এসেই শোফায় ব্রুসে ইঁদুর মধ্য মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ল লিঙ্গা।

কি হয়েছে? এতদিন আসোনি যে? মিস স্মিথ অভ্যস্ত চেয়ার থেকে প্রশ্ন করলেন। কোনো কথা বলল না লিঙ্গা। শুধু পিঠটা কুলে কুলে উঠতে লাগল।

আরে মেয়েটা কঁদছে যে? চেয়ার ছেড়ে ভাড়াভাড়ি উঠে এলেন মিস স্মিথ। লিঙ্গার পিঠের উপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? ওরকম বাচ্চা মেয়েদের মত কঁদছ কেন?

মুখ তুলল লিঙ্গা এবারে। এ কি চেহারা! এলোমেলো উকোঁকো চুল।

চোখের কোণে স্পষ্ট কালি। অনেক বিনীত রজনীর ছাপ সেখানে। চোখের জলে
রক্ত ধুয়ে নেমেছে গাল বেয়ে। লিপস্টিক ওঠা ঠোঁট কেমন বিকৃত ফ্যাকাশে। যেন
কোন ভ্যাম্পায়ারে রক্ত চুষে খেয়েছে।

রবার্ট আমার সর্বনাশ করেছে। আমার কি হবে এখন। আই এ্যাম গোইং টু
বি এ মাদার। মুখের মধ্যে ক্রমাল ওঁজে কুঁপিয়ে উঠল লিজা। ঝড়ে ডানাভাঙ্গা
পাখার মত লুটিয়ে পড়ল সোফার উপর।

আর ইউ সিওর ?

মাথা নাড়ল লিজা। আর কোনো সন্দেহ নেই। মিস স্মিথকে সে সব কথা
খুলে বলেনি এর আগে। রবার্টের ভালোবাসায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে একান্তভাবে তার
হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। রবার্ট বুঝিয়েছিল, আধুনিক নেয়েরা আজকাল
ঠুনকো দেহচেতনা নিয়ে মাথা ঘামানো লজ্জার ব্যাপার বলে মনে করে, লিজা
প্রাণপণে তার দেহের সংকোচকে লজ্জার ব্যাপার বলে মনে করছে, আর টেকা দিয়ে
মর্ডার হবার চেষ্টা করেছে। আসানসোলে রাত কাটিয়েছে কোনোদিন-বা গভীর রাতে
হোটেল-ক্যাবারেতে মদ গিলেছে, প্রাণভরে নেচেছে আর যৌবন ধন্য করেছে।
তার অবশ্যস্বাবী ফল ফলতে দেবী হয়নি।

যেদিন সন্দেহ করেছিল লিজা, সেদিনও কিছু বলেনি প্রথমে। বড় লজ্জা
লেগেছে। রবার্ট আবার হাসবে না তো একথা শুনে। অবশেষে কয়েকদিন পরে
বলতে বাধ্য হয়েছে। রবার্ট সত্যিই প্রথমটা হেসেছে একচোট। কি পাগলের মত
যা-তা বলছে লিজা। বড় ভীকু আর সন্দ্বিগ্ন মন ওর। তারপর যখন খোলাখুলি
সবস্ত অবস্থাটা ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিয়েছে লিজা, তখন রবার্ট গভীর হয়ে গিয়েছে।

লিজা ওর হাত আঁকড়ে ধরে অশ্রুনের সুরে বলছে বিয়েটা ভাঙাভাঙি সেরে
ফেলতে হয়। নইলে জানাজানি হলে সে বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। আমরা কেউই
আর মুখ দেখাতে পারবো না সমাজে।

হঁ, গভীর মুখে হুঁ একটা কাটা কাটা কথা বলে চুপ করে গিয়েছে রবার্ট।
দেখি, একটা কিছু করতেই হয়। তারপর অকস্মাৎ ওকে বুকের উপর টেনে নিয়ে
অমল্য চুষনে লিজার ঠোঁট গলা, ঘাড় ভরে দিতে দিতে বলে উঠেছে, তাই ভালো।
তাহলে কোয়ার্টারের জন্মে একটু আগেই তাগাদা দিই, কি বলো।

বুকের উপর থেকে একটা গুরু হুঁচিভার পাষণ্ডভার যেন নেমে গিয়েছিল
লিজার। চোখ বুজে সে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছিল রবার্টের প্রশস্ত বুকে। আর,
আবোল তাবোল কত কি বকে গিয়েছিল, তার ঠিক ঠিকানা নেই। সে যা হতে
যাচ্ছে। রবার্টের ছেলের মা। পুতুলে পুতুলে ভরিয়ে দেবে ঘর। কট কিনবে
দামী। কত রংবেরং এর জামা আর খেলনা আনবে। বাচ্চার খিলখিল হাসিতে ভরে
যাবে ঘর। সত্যি, কি মিষ্টি নাঁ। বড় ইলে ছেলেকে কিন্তু সে বিলেতে পড়তে পাঠিয়ে
দেবে, ইণ্ডিয়াতে পড়াশোনা নয়।

হাসিমুখে সব শুনে গিয়েছিল রবার্ট। সায় দিয়েছিল, কখনো-বা একটু আধটু
ছবি যোগ করে দিয়েছিল লিজার সাথে। আয়া রাখতে হবে, ভালো ছানক কিনতে

হবে। রোজ সকালে বিকেলে প্যারাদুলেটের করে বাচ্চাকে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যাবে আয়া।

তারপর আরো কয়দিন নিশ্চিন্ত আরামে ক্ষুতি করেছে ওরা। আর কি, দুদিন পরেইতো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ভয়ের আর কি আছে। লিজা ভেবেছে। আর তার মনের কথাই যেন প্রতিধ্বনি রবার্টের মুখেও শুনেছে।

তারপর হঠাৎ এক সন্ধ্যায় রবার্ট জানিয়েছিল, অফিসের জরুরী কাজে দিন চারেকের জন্যে তাকে বাইরে যেতে হচ্ছে। ফিরে আসবে শীগগীরই। বলে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু চারদিন গেছে, পাঁচদিন গেছে, এক সপ্তাহও গেছে, রবার্টের আর দেখা নাই। নিশ্চয়ই বিপদ হয়েছে রবার্টের। আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে লিজা ভেবে। পাগলের মত হয়ে উঠেছে লিজা। ওর বন্ধুবান্ধব পর্যন্ত জানা শোনা নেই, যার কাছে খোঁজ করবে। অবশেষে আর থাকতে না পেরে রবার্টের অফিসেই ছুটেছে শেষ পর্যন্ত। আর, সব বেরিয়ে গেছে তখন। রবার্ট কানপুর ডাক্তার ম্যানেজার হয়ে বদলী হয়ে গেছে এখান থেকে। এখানে আর ফিরবে না।

সেদিন বোধহয় সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিল লিজা। কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। মাথারচুল ছিঁড়েছে, হাত কামড়েছে, উদ্ভ্রান্তের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেరిয়েছে। তারপর একটু শান্ত হয়ে পথ ভাববার চেষ্টা করেছিল। তার করেছিল রবার্টকে প্রথমে। কোন উত্তর মেলেনি। চিঠি দিয়েছে, অনুরোধ করে, তারপর শাসিয়ে। তাও সেই একই ব্যাপার। উত্তরে শুধু একটা মনিঅর্ডার এসেছে একশ' টাকার। ক্রম এ্যান আননোন ফ্রো ও।

ওহ্ হি হাজ বিট্রেড মি। ওর ভালোবাসার নিষ্টি বুলিতে মুগ্ধ হয়ে আমি সব কিছু ভুলে দিয়েছিলাম ওর হাতে। আর, স্টাট স্টাউণ্ডেল, তার এই প্রতিদান দিল আমাকে। বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল লিজা। উকোখুকো চুল ঝাঁকিয়ে মিস স্মিথের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সহজে ছেড়ে দিচ্ছি না ওকে। কেস করব ওর নামে।

কুছা সাপিনীর মত কোঁসকোঁস করছিল লিজা। বুক উঠানামা করছিল ঘন ঘন। জনস্রু চোখে তাকিয়ে ছিল সামনের দিকে। কি ঘণা, কি নীচ এই পুরুষ জাতটা। ঘণায় নাক কুলে উঠছিল। আই মাস্ট টিচ হিম এ গুড লেসন।

কেস করবে। হেসে ফেলেন হঠাৎ মিস স্মিথ। কোনো সাক্ষ্য আছে তোমার কাছে। এনগেজমেন্ট রিং, ফোটো! ওর চিঠি?

চিঠি! ফোটো! আংটি। মনে মনে হাতড়াতে লাগল লিজা। এক একটা কথা ভেঁ নয়, যেন এক একটা বয়শেল। মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল একমুহুর্তে। যেন কুঁ দিয়ে চোখের দীপ্তি নিভিয়ে দিল কেউ। নেই, কিছু নেই তার কাছে। নিশ্চিন্তে সরে গেছে রবার্ট ধরা ছোঁয়ার একটুও ফাঁক না রেখে। বোকা, কি বোকা, আমি স্বভাব হতে গিয়েছিলাম! আমাকে ভুলিয়ে গেঁয়ো করে রেখে কাজ হাসিল করে চলে গেছে সেই নিষ্ঠুর প্রবঞ্চকটা। উঃ।

চোখের সামনে থেকে সব আশা সরে যাচ্ছে। যেন হাতের পাশের দেয়াল

কাকি দিয়ে সরে যাচ্ছে ক্রমশ দূরে। আমি এখন কি করব আন্টি? বলতে বলতে ভেঙ্গে পড়ল লিঙ্গা।

কোন কথা না-বলে ছ'বার পায়চারি করলেন মিস স্মিথ। তারপর এসে দাঁড়ালেন লিঙ্গার সামনে।

যাবড়াচ্ছে কেন? পথ আছে এখনো।

পথ আর কি? দি অনলি ওয়ে নাউ ইজ টু কমিট সুইসাইড।

না, ও-পথ ভীক বোকা মেয়েদের জন্যে। তুমি কিসের দুঃখে ও-পথ বাছতে যাবে? চোখের জল মোছো তো এখন। আমার কথা একটু মন দিয়ে শোনো।

কুমাল দিয়ে চোখ চাপা দিল লিঙ্গা। তারপর স্তবোধ বালিকার মত জড়োসড়ো হয়ে বসে মিস স্মিথের দিকে তাকালো।

আরো একটু এগিয়ে এলেন মিস স্মিথ। একটু ঝুঁকে পড়লেন। হাত দুটো রাখলেন লিঙ্গার সুর্যপড়া সংকুচিত কাঁধের উপর। প্রায় ফিসফিস গলায় ডিজেন্স করলেন, ক'মাস হবে এখন? হিসেব করেছ?

হ্যাঁ, ছ'মাস প্রায়। বিহ্বল গলায় বলল লিঙ্গা।

ও। তাহলে তো কেবল প্রথম অবস্থা। ওটাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

হোয়াট ডু ইউ মীন? বিমূঢ় গলায় উচ্চারণ করল লিঙ্গা। মিস স্মিথের শীর্ণ শীতল হাতদুটো এখনো ওর কাঁধের উপর আটকে আছে, কবরের ভেতর থেকে ঝুতুর শীতল হাত এগিয়ে এসে চেপে ধরেছে ওকে। আর কোনো পরিজ্ঞানের পথ নেই লিঙ্গার। আঁৎকে উঠল লিঙ্গা। এক ঝটকায় মিস স্মিথের হাত সরিয়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল

ডোন্ট বী আউট অব নার্ভস্। নির্ভুর গলায় মিস স্মিথ বললেন সংকোচহীন সুরে।

যা বলছি এছাড়া আর কোনো পথ নেই। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব তোমার। নিজের হাতেই সব ঠিকঠাক করে দেব। দুনিয়ায় আর কেউ জানবে না। নাউ-এ-ডেজ ইট ইজ এ্যান ইজি এ্যাফেয়ার। হামেশাই বহুলোক এ-কাজের জন্যে আসছে আমার কাছে। ভয় কি? বৃহা হাসি ফুটল মিস স্মিথের ঠোঁটে।

না, না, না। পাগলের মত চেষ্টিয়ে উঠল লিঙ্গা। আপনি ধুনী, ধুনী! যা মুখে এল বলে গেল লিঙ্গা। এ কি অসম্ভব কথা বলছেন মিস স্মিথ! আমি স্বেচ্ছায় নিজে হাতে আপন মস্তানকে হত্যা করব?

তুমি কি পাগল হলে লিঙ্গা? ধমকের সুরে বলে উঠলেন মিস স্মিথ। আমার কথায় রাজী না হওয়ার মানেটা একবার ভেবে দেখেছ ভালো করে? সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না। বাড়ি থাকতে পারবে না। যা বলেছ, শেষ পর্যন্ত সেই আরহত্যাই হবে তোমার শেষ আশ্রয়। আর আমার কথা শুনলে তোমার লাভ বৃহা ক্ষতি হবে না। এই ব্যয়েসেই এরকম একটা এ্যাফেয়ারে জড়িয়ে পড়লে তোমার ভবিষ্যৎটাই মাটি হয়ে যাবে। অথচ এখন তোমার ব্যয়েস আছে, দেহ আছে। উজ্জল ভবিষ্যৎ তোমার সামনে এখনো। চাকরী না-করলেই বা তোমার ভাবনা কি?

অপরের অধীনতাই কেন স্বীকার করতে হবে তোমাকে ? স্বাধীন থাকো, কত পয়সা উপার্জন করতে পারবে ? আমিই আছি সে-বন্দোবস্ত করে দেবার জন্যে । একজন রবার্ট তোমাকে বিট্টে করেছে, তুমি হাজারজনের উপর তার শোধ নিতে পারবে । আর দেবী কোরো না, ব্যাপারটা শীগগীর চুকিয়ে ফেলে নাও । ওই শ'খানেক টাকাতেই হয়ে যাবে ।

দীর্ঘ লেকচার দিলেন মিস স্মিথ । মুখ নিচু করে সব শুনে গেল লিঙ্গা । তারপর দুর্বল পায়ে একসময় উঠে দাঁড়াল, নিস্পৃহ গলায় বলল—আজ আসি মিস স্মিথ, কোনদিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ।

ঠাণ্ডা সন্ধ্যা । শীতের ঘন আবহাওয়া । কেবল দিন কুরিয়েছে । গ্যাসের আলোগুলো জ্বলেছে রাস্তার একপাশে । আমার দিন কুরিয়ে গেল । কান্না চাপতে চাপতে ভাবল লিঙ্গা । গ্যাসের আলোগুলো বিষাক্ত নীলাভ চোখ মেনে সাপের মত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে । যেন বুড়ুর হাতছানি দিচ্ছে । চমকে অজান্তে তলপেটে হাত রাখল লিঙ্গা । মাই বেবী ! গোটা দুনিয়া যেন ষড়যন্ত্র করে এগিয়ে আসছে লিঙ্গার দিকে চেয়ে । পেটের ভিতর থেকে বের করে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে জগৎকে । কোথাও কি এক কোঁটা নিরাপদ আশ্রয় নেই ? বাতাস টানতে পর্বন্ত ভয় পাচ্ছিল লিঙ্গা । বীজাণুগুলো পর্বন্ত হয়ত ভেতরে ঢুকে তার সন্তানকে মেরে ফেলবে ।

উদ্ভ্রান্তের মত অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল লিঙ্গা । কোথায় যাবো ? কোথায় আমার আশ্রয় ? রাত নামল । অন্ধকার ঘন হয়ে উঠল আকাশে । শীতরাত্রির তীক্ষ্ণ দাঁত তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল । তবু ঘুরতে লাগল লিঙ্গা । এ পথ থেকে সে পথ । আলোকোজ্জ্বল চওড়া রাস্তা থেকে অসুজ্জ্বল ছোটগলি । অবশেষে শ্রান্ত পায়ে একসময়ে চার্চে এসে চুকল । প্রেয়ার হলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল উঁচু অলটারের সামনে । মা মেরীর মূর্তির পদপ্রাপ্তে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ।

মুখ তুলে তাকাল হোলি ভারজিনের নিকলক মূর্তির দিকে । কোলে শিশু যেসাস । কি অপক্লম মমতায় তাঁর মুখ উদ্ভাসিত । যেন ষাড় একটু বেঁকিয়ে মাতা মেরী লিঙ্গার দিকেই তাঁর মমতান্বিত দৃষ্টি প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছেন । পৃথিবীর সকল কনুষের মাঝে নিকলক শিশুকে বুকে চেপে ধরে পরম পবিত্র হয়ে গেছেন তিনি ।

কাঁদছিল লিঙ্গা । বার বার করে জল গড়িয়ে পরছিল দুই চোখ দিয়ে । খেয়ালই ছিল না তার । চোখের সামনে জলের অস্পষ্ট পর্দার ভেতর দিয়ে শুধু মনে হচ্ছিল : হোলি মেরীর মূর্তি অনেক এগিয়ে এসেছে ।

ও মাদার, সেভ নী, বিড় বিড় করে প্রার্থনা করছিল লিঙ্গা । শুধু ঠোঁট দুটো নড়ছিল । আই এ্যাম এ্যাক্স অ্যানহোলি ক্রিচার । আমি সিনার । প্রভু তুমি পার্গীকে জ্ঞান করো । এ্যাপ হোয়াইল উই ওয়্যার ইয়েট সিনারস, থাইট ডায়েড ফর আস । তুমি তো সব জানো, আমার আর কোনো পথ নেই । কিন্তু তুমি কি বুঝবে না । আমাকে ক্ষমা করবে না ?

অনেকক্ষণ পরে উঠল লিঙ্গা । বাইরে থেকে এক প্যাকেট মোমরাতি কিনে

নিয়ে এল। তারপর, যে সন্ধান কোনোদিন পৃথিবীর আলো দেখবে না তার নামে মেরীর পদপ্রান্তে আলো সাজিয়ে দিল ধরে ধরে। মাই ডালিং, আমার পাপের জন্তে তুমি ক্রুশ বিক্রি হবে। কিন্তু তুমিয়ার কেউই জানবে না।

কুঁপিয়ে কেঁদে উঠল লিজা। যেন কোন দূরের অন্ধকার থেকে অসহায় শিশুর কচিগলার কান্না ভেসে আসছে। যে তার মুখ-না-দেখা মাকে খুঁজে পাবার জন্তে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এই পৃথিবীর বুকে। তার কান্নার শব্দ মাটির অন্ধকার থেকে অন্ধুরের মত বেরিয়ে আসতে চাইছে আলোকিত ধরণীর দিকে। বুকের ভেতরটা সেই অসহায় শিশুর ব্যথার মুচড়ে উঠল লিজার। গলা ফেটে যেন বেরিয়ে আসবে ব্যথা। হাত তুলল গলায়। না টিপে ধরলে যেন শান্তি হবে না কিছুতেই।

পরের দিন সকালেই মিস শ্বিথের কাছে গিয়ে রাজী হয়ে এল লিজা।

মাঝে মাঝে আজকাল মিস শ্বিথের দোকানে একটি মেয়েকে বসে থাকতে দেখা যায় তার আঁকা ভুরু, বাঁকা ঠোঁট ম্যাক্সফ্যাক্টর দিয়ে গাঢ় রং করা। ঘনকুঁজের প্রলেপে রঙিন গাল। মাঝে মাঝে তার তীক্ষ্ণ গলার মাদকভাষ্য হাসির উচ্চশব্দ ফুটপাথের চলতি পথিকের কানেও তরঙ্গ তোলে। পাতলা অর্গাণ্ডির ব্লাউজের ভেতর দিয়ে যৌবনের নিঃশব্দ মূর্তি বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসতে চায় যেন।

তবে মেয়েটি বেশিদিন বসে থাকে না সেখানে। একটুপরেই হয়তো দেখা যায়, কোনো সুপুরুষ যুবকের বাহুসংলগ্ন হয়ে বেড়াতে বেরিয়ে যাচ্ছে। কোনোদিন-বা চোখেপড়ে কোনো প্রৌঢ় বাহুতে ভর দিয়ে সামনে পার্ক করা নতুন মডেলের গাড়ীতে গিয়ে উঠছে হাসতে হাসতে।

এ মেয়ের সাথে সেই লিজার শাদৃশ্য খুঁজতে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না।

শ্রীমতী

// ১৩ //

বছর দেড়েক পরে ।

অবনী আপিসে মাধবের কাছ থেকে ফোন পেলো যে সে যেন আপিসের পর সোজা চ'লে আসে বিশ্রামে । অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার ।

এলো অবনী । দেখলো তাদের বাঁধা কেবিনটার মধ্যে ব'সে আছে মাধব একঠায়, গালে হাত দিয়ে ।

‘কী ব্যাপার হে ? এ কী চেহারা করেছে ? অর নাকি ?’—অবনী বললো উদ্বেগে । মাধবের কপালে হাত দিলো ।

‘না গো, জরুর নয় । বোসো । এই ছকা, আমার ঘণ্টে এক কাপ চা আর বাবুর ঘণ্টে চা আর—কী ?’

‘যা খুশি ।’

‘তুমি তো ডিম ভালোবাসো । কিন্তু এই গরমে ডিম সহ্য হবে তো ? আচ্ছাঃ একটা মামলেট । যাঃ । এখন শোনো যেমন্তে ডেকেছি । আজ চূড়ান্ত হ'য়ে গেল । তোমার খোঁজে বাসা-টাগা আছে ?’

‘নানে ? আলাদাই হতে চাও নাকি ? ব্যাপার কী ?’

‘আর ব্যাপার কী ! সেই পুরনো কান্ড । মানসীকে নিয়ে খেঁচাখেঁচি মা-বাবার । আজ সকালে টিউশনি সেরে এসে চান করতে যাব, শুনি মা বলছে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে, হত রমেশের মায়ের মতো বউকাটকি শাউরি তো অমন বোয়ের মুখে হুড়ো ছেলে মাখায় খোল চেলে খাঁটা মেরে দিত তাড়িয়ে বাড়ির থেকে । ঘরের মধ্যে সিন্ধের শাড়ি প'রে দেয়াক দেখাচ্ছিল এত তো বিয়ের সময় যে সেলাইকল দেবার কথা ছিলো সেটা আজ পর্যন্ত দেবার নাম করে না কেন রে তোর মা ! আমি তো প্রথমটা বুঝতেই পারিনি ব্যাপার । রান্নাঘরে গিয়ে দেখি মা ভেবেছি তাই, একটা মুশিদাবাদী সিন্ধের শাড়ি প'রে মানসী রান্নাবান্না করছে । জিগ্যাস করলুম, একী, এ-শাড়ি পরেছো কেন ? যাবে কোথায় ? প্রথমে, অ্যাডামার্ট তো, কথাই বলে না । জ্বাকপই নেই । তোমাকে কী বলব অবনী, এর'ম ইম্পার্টিনেন্ট হ'টি মেয়ে'ছেলে আমি আর. ছুটি দেখিনি । আমি তখন আরো এগিয়ে যেতেই বোধ হয় ভয় খেলে একটু, তখন বলে কি, সিন্ধের শাড়ি পরব না তো কী পরব সেটা এনে দাও । বিয়ের পরে কখনো শাড়ি দিয়েছো আমাকে তোমরা । দিদিকে চিঠি লিখেছি হু-খানা আটপোরে শাড়ি কিনে আমাকে দিয়ে যাবে—যদি তা না আসচে, সিন্ধের শাড়িই পরতে হবে । তোমাকে কী বলব তাই, মাস্তুরের গছের একটা সীমা আছে । আমি একদোড়ে ঘরের থেকে নিয়ে এলুম

আমার একটা ধুতি, বলনুম এটা প'রে ওটা ছেড়ে দাও । ও কিছুতেই ছাড়বে না, আনিও ছাড়াবই । ও তখন করলে কি জানো, হঠাৎ উঠুন থেকে ভারের হাঁড়িটা নানিয়ে শাড়ির আঁচলাটা ফেললে উঠনে । সিচুয়েশনটা ভাবো ।'—ব'লে মাধব তিক্ত-হাসি হাসে ।

'চুপ করলে যে । তারপর কী হ'লো বলো ।'—অবনী গরম হয়ে ওঠে ।

'কী আবার হবে । হুড়োহুড়ি পাড়াপাড়ি হ'লো একটা । মা চিংকার করতে লাগলো ব্যাপার দেখে । কেলেকারির একশেষ ভাই । পাড়াশুদ্ধ টি-টি । তারপর বাবাকে নিয়ে আবার আর এক প্রস্থ । প্রথমে তো বাবা মানসীর সম্বন্ধে কটুকাটব্য করতে লাগলেন । তারপর বলেন কি, এ-মাস থেকে তোমাকে আরও অন্তত পনেরোটা টাকা বেশি দিতে হবে সংসারে । আমি ক্রীম বলনুম, বেশ তাই হবে, কিন্তু তা'লে আমি পনেরো দিন বাজার দিতে পারব না, দশ দিন দেব । শুনে তো ফায়ার একেবারে । তুমিই বলো ভাই, চাকরিতে টিউশানিতে সব মিলিয়ে এখন আমার পৌনে-দুশো মতো হয় । তা বিয়ের আগে আমি সিক্সটি ক'রে দিয়েছি, বিয়ের পরই করলাম হানরেড, তারপর মেয়েটা হ'তে আরও ফিফটিন বাড়িয়ে দিলাম স্বতঃপ্রস্তুত হয়ে—তো হঠাৎ আমি আরো পনেরো ক'রে দিতে যাব কেন ? কিন্তু কা কস্ত পরিবেদনা ! আরো পনেরো দিতেই হবে তোমাকে ।'

'তোমার বাবা কত রোজগার করেন ?'—অবনী ।

'চাকরিতে পান আড়াইশো আর টিউশানিতে শ'খানেক । আর তা-ছাড়া আমার সেকেন ব্রাদারও তো এখন সংসারে দিচ্ছে চল্লিশ ক'রে । অথচ, আরো পনেরো দিতেই হবে তোমাকে । এ আর কিছু না, বুঝলে, এ হচ্ছে বুড়োর মানসীর ওপর আক্রোশ ।'

'এখন অ্যাট-ওয়ান্স আমার একটি বাসা দরকার'—এই ব'লে মাধব তার কাহিনীর উপসংহার করলো । বললো, 'তুমি না বলছিলে সেদিন, তোমাদের ওখান থেকে চ'লে যাচ্ছে এক ভাড়াটে ?'

'হ্যাঁ চ'লে তো গেছে । বোধ হয় খালি আছে এখনো । কিন্তু সে কি তোমার চলবে ? দেড়খানা ঘর অন্ধকার স্যাভসেতে, ভাড়া ভিরিশ ।'

মাধব জানায় চলবে । এখন সে আস্তাকুঁড়েও যেতে প্রস্তুত । সুতরাং অবনী যেন খবর নিয়ে কালকেই তাকে ফোনে জানায়, পাওয়া যাবে কি যাবে না সেই দেড়খানা নরককুণ্ড ।

কিন্তু প'রের দিন অবনী, ফোন করার আগেই, ফের মাধবের ফোন পেলো । মাধব জানালো, 'বাড়ির দরকার নেই ভাই । আমরা আলাদা হয়ে যাব শুনে মা ভীষণ কান্নাকাটি করছেন । বুলবুলিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে কী যে সে আকুল কান্না । সে এক প্যাথোটিক সিচুয়েশন ভাই । তাই ভাবনুম, মাকে এ-ভাবে কষ্ট দিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়াটা'—মাধবের কথা শেষ হবার আগেই অবনী নানিয়ে রাখলো রিসিভার ।

দিন পনেরো পরে আবার মাধব ফোন করলো অবনীকে, 'কাল আমি বাড়ি বদল করেছি ভাই, এ-ভাবে আর পোষালো না । প'রদিন বাড়িরে মানসীকে নিয়ে

একেবারে ভীষণ কাণ্ড, সব তোমাকে বলব'খন। কাল তো রববার, সকালের দিকেই চ'লে এসো না আমার বাসায়, এখানেই থাকবেদাবে? আনি অবিশ্টি প্রসাদ আর কৃত্তিকা আর তোমার বাকুণীকেও নেনমন্ত্র করতে চেয়েছিলেন আমার নতুন বাসায়। কিন্তু মানসী বললে, সে পরে হবে'খন, এ-রববার অবনীবাবুকে একাই বলো শুধু, পরে একটু গুছিয়েগাছিয়ে সবাইকে বলা যাবে একসঙ্গে। তা কী বলো ভাই, আসবে তো?

মাধবের নতুন বাসা চাকুরিয়াতেই। ওর বাবার বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিট। অষ্টাদশ দশ-বারো ঘর ভাড়াটের মধ্যে একখানি ঘর, রান্নাবান্না ঘরের বাইরে দাওয়ায়। ঘর মাটির তবে মেঝে পাকা ওপরে টালি। পুরোপুরি বস্তি-টাইপ। ইলেকট্রিক আলো নেই, ছল উঠোনের মাঝখানে এক বারোয়ারি টিউব-ওয়েল। ভাড়া আঠারো।

অবনী যখন পৌঁছলো মাধবের বাসায় তখন বেলা এগারোটো।

অবনীকে মাধব সব দেখালো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। বললো কেনন-ক'রে দর কবাকবি ক'রে সে কুড়ির থেকে আঠারোয় নানিয়েছে ভাড়া, বলতে বলতে যেই মাঝখানে বিভা উঠে ঘরের বাইরে গেল একটু, অমনি ফিসফিস ক'রে সে দ্রুতবেগে বলতে শুরু করলো, 'ওঃ গত বিশ্বদবারটা যা একটা ইনঅস্পিশাস্ ডে গেছে না আমার, সুইসাইডের অ্যাটেম্পট নিয়েছিলো মানসী। আপিস থেকে ফিরে—'

'ধামো ধামো'—অবনী ধমকেই ওঠে। বলে, 'ও-সব কথা পরে শোনা যাবে। বাইরে। আরে তোমার মেয়ে পেছাপ ক'রে দিলো।'

'অ্যা— : হ্যা। দিলি তো সব ভাগিয়ে'—বিদ্যাপাতের মতো মাধবের হাতছটো গিয়ে পড়ে মেয়ের ওপর, ঋটিতি গুটিয়ে দিলো জামাটা, সরিয়ে দিলো পাশবালিশছটো। আর তারপর চেষ্টা করে উঠলো, 'আরে কোথায় গেলেন? মানসী, মানসী—'

'কী হয়েছে'—বিভা এসে দাঁড়ায়।

'তোমাকে না একশো-দিন বারণ করেছি, অয়েলক্রথ ছাড়া শোয়াবে না মেয়েকে। আর এই অর্গাণ্ডির জামাটা গায়ে দিয়ে রেবেছো কেন এখন। তোমার কি সবই উন্টো-উন্টো ব্যাপার।'

বিভা নিবিকার। শব্দটি না ক'রে সে পেছাপটা মুছে নেয়, অর্গাণ্ডির জামাটা খুলে নেয় মেয়ের গা থেকে, ভাঁজ ক'রে রাখে স্টকেসের ওপর আর তারপর বেরিয়ে যায় চুপচাপ। কিছুমাত্র প্রতিবাদ সে না মুখে করলো, না মেজাজে।

কিন্তু প্রতিবাদ করলো অবনী। বললে, 'তোমার দেখছি নতুন বাসায় আসা ক'খাই হ'লো।'

বোকা-চোখে মাধব তাকিয়ে থাকে।

বিভা ঘরে ঢুকলো একটু পরেই আবার, বললে, 'চারটে পয়সা দাও তো, ছটো লেবু আনিয়ে নিই।'

'নেবু? কেন, নেবু তো আছে। কাল তো তিনটে নেবু এনেছিলাম?'

'সে কুরিয়ে গেছে।'

অশ্রুসন্ন মুখে মাধব উঠে জানার পকেট থেকে বের করলো মনিব্যাগ। একটা আনি বের ক'রে ফেলে দেয় খাটের ওপর।

আর বিভা, নির্বাক নিবিকার মুখে সেটা কুড়িয়ে নেয়, বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

‘তোমার সঙ্গে তোমার বোয়ের সম্পর্ক তো বড়ো চমৎকার!’—অবনী কঠিন ব্যঞ্জে বললো।

মাধব হাসে কিছু না বুঝে, বলে, ‘কেন বলো দেখি?’

অবনী তা বলে না।

বিভা ঘরে ঢোকে একটু পরে এক গ্রাশ বোলের সরবৎ নিয়ে। অবনীর সামনে এগিয়ে ধ'রে বলে হাসিমুখে, ‘বাঃ তাকিয়ে আছেন কি, ধরুন না—’

গ্রাশটা নিয়ে অবনী দারুণ উদ্বেগে বলে, ‘সরবৎ কেন? আমার না ভাতের নেমস্তন্ন?’

বিভা হেসে ফ্যালে ঝিলঝিল ক'রে। মাধবও হেসে ওঠে হো-হো।

‘আমাকে তো উনি ভাতের কথা বলেননি?’—গভীর হবার চেষ্টা করতে করতে বিভা রসিকতাটা টেনে রাখবার চেষ্টা করলো।

// ১৪ //

বছর দুই পরে আবার একটি দিন।

বেলা গোটা তিনেকের সময় মাধব এসে উপস্থিত অবনীর আপিসে। বলে, ‘বাইরে চলো একটু। পারো তো ছুটি নিয়ে নাও।’

মাধবের চেহারা দেখে অবনীর চমক লাগে। ছুটিই নিয়ে নেয় সে।

রাস্তায় বেরিয়ে মাধব বলে, ‘শুনে তুমি কী ভাববে জানিনে কিন্তু আমি তোমার কাছে লুকোব না কিছু। প্রসাদকেও বিশেষ কিছু বলিনি আমি এখনো, যদিও দেখা হয়েছিলো রাস্তায়। কিন্তু তোমার কাছে বলতেই হবে সব। সব শুনে তুমি যা বলবে আমি তাইই করব। কিন্তু তুমি ভাই ইম্পাশিয়ালি যাজ্ করবে আমাকে। একতরফা রায় দেবে না। কেননা—’

‘ধানাইপানাই ছেড়ে আসল কথাটা ব'লে ফ্যালো তো।’

বাধা পেয়ে মাধব নীরব থাকে কিছুক্ষণ আর তারপর হঠাৎ ব'লে ফ্যালো, ‘আজ পাঁচদিন পর্যন্ত নির্খোঁজ মানসী। বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেছে। শি হাজ লেফ্ট মী।’

অবনী ধমকে দাঁড়িয়ে যায়। স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে বলে, ‘কোথায় গেছে?’

‘জানিনে। খোঁজ নিইনি। সেও কোন চিঠি-ফিট দেয়নি।’

‘খোঁজ নাওনি কেন?’

‘দরকার মনে করিনি।’

‘ও! তাহ'লে তো চুকেই গেল। তাহ'লে আর আমার কাছে কী দরকারে এলে। সুসংবাদটা শোনার জন্তে।’

‘সে তুমি যা-খুশি বলতে পারো। কিন্তু আমি ম’রে গেলেও ওর দিদির বাসায় যেতে পারব না। যাবে আর কোথায়, গেছেন ঐ দিদির কাছেই। কোন্ চুলোটা আর আছে যাবার। নাই দিয়ে দিয়ে একেবারে মাথায় চড়িয়ে দিয়েছি তো—মা আমাকে আগেই সাবধান করেছিলেন, ঐ-দিদিটাই যতো নষ্টের গোঁড়া, ও-ই ওর কানে মস্তুর জপে-জপে মাথাটা ঝাচ্ছে ওর, ওকে সেধুতে দিসনে বাড়িতে, বোকেও যেতে দিসনে দিদিটার কাছে। তা তখন তো শুনি নি মার কথা, শুধু আসনেই বসিয়েছিলাম কিনা ভদ্রমহিলাকে—এখন হাতে-নাতে তার শিক্ষা পেলুম।’

‘শিক্ষা পাবার এখুনি হয়েছে কী’—ছুরির ফলা চকচক ক’রে ওঠে অবনীর ঠোঁটে, ‘সারা জীবন তো প’ড়েই রইলো। ছেলেমেয়েছোটো কোথায়? নিয়ে গেছে?’

‘ইঃ নিয়ে গেছে। বেরিয়ে যাবার সময় ফিরে একবার তাকালে পর্যন্ত ওদের দিকে? কী ধাতুতেই গড়েছেন ওকে ভগবান, মা হয়ে যে কী ক’রে—কী আর বলব তোমাকে অবনী, আই মার্ট সে, মা হবার ধাত ওর নয়, শি ছাড়া নো মাদারলি ফীলিং ইন হার হার্ট। আই অ্যান কনভিন্সড।’

‘কনভিন্সড আমিও। তোমার ফাদারলি ফীলিং এত বেশি যে তার মাদারলি ফীলিং বাপ-বাপ ক’রে পালিয়ে হাঁপ ছেড়েছে। এখন মনের সুখে যতো পারো তুমি ফাদারলি ফীলিং ফলাও।’

‘তোমার যদি প্র্যাক্টিকাল সেন্স থাকত—’

‘তাই’লে এরকম বোকার মতো কথা আমি বলতাম না, কেমন। আর তোমার প্র্যাক্টিকাল সেন্স অত্যন্ত টনটনে তাই বোকে তুমি ঝিয়ের অধম ক’রে রেখেছিলে। ক’-ঝিছুক দুধ খাবে তোমার ছেলেমেয়ে সেইটে ঠিক ক’রে দেবে তুমি, কখন খাবে, কোন বাটিতে খাবে ঠিক ক’রে দেবে তুমি, তোমার হুকুমের এক চুল এদিক-ওদিক হলে তুমি তাকে ধমকাবে ইত্যরের মতো। অথচ তার মাদারলি ফীলিং কম প’ড়ে গেলে তুমি ভীষণ অবাক হ’য়ে যাবে। রোজ কী দিয়ে রান্না হবে তার প্রতিটি আইটেম তুমি ফরমান করবে, পাই পরমাটি দরকার হ’লেও তাকে তোমার কাছে এসে দাঁড়াতে হবে একটা রাস্তার ভিঝিরির মতো। অথচ নির্লক্ষের মতো তারই কাছ থেকে দাবী করবে তুমি আদর্শ পত্নী। আমি কখনাই করতে পারি না, এরপরেও কেমন ক’রে তুমি আবার সেই বোয়ের কাছেই রাতের অন্ধকারে প্রেমের কথাবার্তা কও, তার কাছে ছেলেমেয়ে দাবী করো। আমি আজ তোমাকে সামনাসামনিই বলছি, আই হেট ইউ। আই হেট ইউ লাইক এ ডগ।’

বউবাজার দিয়ে হাঁটছিলো দুজনে। অবনীর একধার পরে মাধব ছিটকে ম’রে গেল তঁকাতে। মিনিট পনেরো আগে-পিছে হাঁটলো। মাধব আগে অবনী তার পেছন-পেছন। শেষে অবনীই আবার এগিয়ে এসে সঙ্গ ধরে মাধবের, জিগ্যাস করে, ‘কী হয়েছিলো ব্যাপারটা? আমি তোমার বউকে যথেষ্টই চিনেছি, সহজে সে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে এ আমি বিশ্বাস করি না। কী করেছিলে বলো তো।’

মাধব কথা বলে না অনেকক্ষণ।

কিন্তু অবনী ছাড়ো না। নরম-গরম নানান ভাবে সে মাধবকে খোঁচাতে থাকে।

শেষ পৰ্বন্ত যখন মাধব মুখ খোলে, তার কঠম্বরে ফুটে ওঠে অপরিণীত আশ্রয়ানি, 'গত-রববার আমার আগিসের এক বন্ধুর বোভাতে নেমস্তন্ন ছিলো আমার। রাতে। সেজেগুজে বেরুতে যাব এমন সময় এসে বলে কি, একটু চিড়ে কিনে দিয়ে যাবে আমাকে? সারাদিন তো কিছু খাইনি, একটু চিড়ের ভাত করে খেতাম। পেট খারাপ করেছিলো ওর তাই খায়নি সারাদিন, কিন্তু চিড়ে আমার কথা মনে পড়লো যখন আমি বেরুতে যাচ্ছি। হাতে আর সময় ছিলো না আমার আর নানা কারণে নেছাজটাও খারাপ ছিলো। একটা সিকি ফেলে দিয়ে বলনুম, আমার সময় নেই এখন, দরকার হ'লে আনিয়ে নিও। যাক। নেমস্তন্ন খেয়ে ফিরনুম যখন তখন রাত এগারোটা। এসে দেখি কি, দরজা হাঁ-হ'য়ে আছে, বিছনা-টিছনা কিছু পাতা নেই, ছেলেমেয়ে-ছুটো ঘুমোচ্ছে এলোপাখারি আর মানসী শুয়ে আছে খালি মেঝের ওপর। আমি ঘরে ঢুকতেই উঠে ব'সে বলে কি, পয়সা তো দিয়ে গেলে কিন্তু চিড়ে আনতে পারিনি, কাউকে পেলুম না, এখন কি খোলা পাওয়া যাবে দোকান? দেখবে একটু? শোন কথা। রাত্তির এগারোটার সময় যদি মুদী দোকান খোলা থাকে তো আমি চিড়ে এনে দেব তখন আর সেই চিড়ের ভাত ক'রে সেই ছপুর-রাত্তিরে উনি খাবেন। পাগলানির একটা সীমা আছে মানুষের। আমি ব'লে ফেলনুম, তুমি তো আশ্চর্য মেয়েমানুষ, বিয়েবাড়ি থেকে ফিরনুম, কী খাওয়ালে, কী দিলোখুলো কনেপক্ষ, কেনন হ'লো বর-কনে—কোথায় সেইটে জিগ্যেস করবে আগে আগ্রহ ক'রে, তা না তোমার নিজের খাওয়াটাই বড়ো হ'লো। তা-ও এই ছপুররাত্তিরে। চমৎকার টেনিং পেয়েছো দিদির কাছ থেকে। শুনে তখন আর কিছু বললে না ও। পরের দিন সকালবেলা দেখি কি ঘুম থেকে উঠবার নামটি নেই আর। সাতটা পৰ্বন্ত ঝাঁতে-ঝাঁতে চেপে রইলুম, কিছু বলনুম না। ছেলেটা কঁদতে লাগলো খিদের তরাসে। শেষে বুলবুলিকে বলনুম, তোর নাকে ডেকে তোল তো। বুলবুলি গিয়ে ঠেলাঠেলি করতেই, তুমি বিবেশ করবে না, উঠে প'ড়ে ও নিরীহ নিরপরাধ রোগা মেয়েটাকে কান ধ'রে টানতে টানতে ঘর থেকে বের ক'রে দিলে। কত আর সহ্য করব বলো, আমিও ছুটে গিয়ে মানসীর চুলের মুঠি ধ'রে দিলুম দুই চড় কষিয়ে। মার খেয়ে ও কিন্তু শান্ত হ'য়ে গেল। কিন্তু উঠে ঝাঁড়িয়ে বললে : কুকুর কোথাকার। আর তারপর সেই অবস্থাতেই, সেই হেঁচা শাড়ি প'রেই, একবস্ত্রে সে বেরিয়ে গেল।'

'এত নীচ ইতর হয়ে গেছো তুমি। এতটা কিন্তু সত্যিই আমি ভাবতে পারিনি। তা যাক, বোকে গ্রহণি কি তুমি নাহে-মধ্যেই ক'রে থাকো নাকি।'

'আর একদিন মেরেছিলাম। যেদিন বাবা-মা'র সঙ্গে আলাদা হয়ে গিয়ে নতুন বাসায় এলান তার আগের দিন।'

'বেশ করেছিলে। তোমাকে আমার আর কিছু বন্ধবার নেই'—বলতে বলতে অবনী আচমকা একটা বাসে উঠে পড়লো।

ছুটে চ'লে গেল বাস আর মাধব স্তম্ভিত হ'য়ে রইলো সেদিকে তাকিয়ে।

কিন্তু দিন পনেরো পরে মাধব আবার এসে উপস্থিত অবনীর কাছে আগিসে। বললে, 'খবর আছে। চলো, বাইরে চলো। ছুটি নিয়ে নাও।'

ছুটি নিতে অবনী রাজী হয় না। অগত্যা আপিসের বারান্দার এক নিরিবিলিতে দাঁড়িয়ে মাধব বলে, 'খোঁজ পেয়েছি মানসীর। কিন্তু সমস্ত কাহিনী শোনার তো তোমার সময় হবে না এখন, সংক্ষেপেই বলছি। সেদিন তুমি হঠাৎ অননি ক'রে চলে যাবার পরে আমি স্ট্রেট মানসীর দিদির বাগায় গেলুম। গিয়ে দেখি মানসীও নেই, মানসীর দিদিও নেই, আছে শুধু শান্তি। জিগ্যাস করলুম কোথায় গেছে ও, তো বুড়ি কিছুতেই কিছু ভাঙলে না। পরের দিন সকাল আটটার গেলুম আবার। দেখা হ'লো ওর দিদির সঙ্গে, তখনো ডিউটিতে বেরোয়নি দিদি। বললে : বিভা বাড়ি নেই। কোথায় গেছে ? সে এখন বলতে পারব না। তোমাকে আমি নুকোব না ভাই, আমি শেষ পর্যন্ত দিদির পায়ে পর্যন্ত ধরলুম। বললুম, আমাকে ক্ষমা করুন, ওকে ফিরিয়ে দিন আমাকে, বাচ্চুটাকে কিছুতেই রাখা যাচ্ছে না, কেবল মা-মা করছে। তা বলে কি : বাচ্চুকে আর বুলবুলিকে দিয়ে বেঁচে এখানে। ওদের আমরাই মানুষ করতে পারব। যাক, শেষ পর্যন্ত বললে, আর দু-দিন পরে এসো। ওকে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে চুকিয়ে দিয়েছি, জুনিয়র ট্রেনিং, নিউওয়াইফারি কোর্স। দেড় বছরের আগে সেখান থেকে ছাড়া পাচ্ছে না, সুতরাং এখন আর ফিরে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। এখন থাকতে হবে সেবাসদনের কোয়ার্টার্সেই। মঙ্গলবার অফ-ডিউটি আছে, ইচ্ছে করলে দেখা ক'রে যেতে পারো। যাক, পাগলের মতো ফিরে এলুম বাড়িতে। এদিকে বাবা-মা আমার কানের পোকা খসেছেন—তুই ঐ হতভাগীর কথা ভুলে যা, আমরা তোকে আবার বিয়ে দেব ইত্যাদি ইত্যাদি হেনতেন-কতো! মা তো ব'লেই ফেললেন : ও-মেয়ের চরিত্র নেই আমি এই ব'লে দিলুম। আমি শুনে কানে আঙুল দিয়ে বলেছিলাম : ও কথা বোলো না মা, ও-কথা বোলো না, ও তোমার ঘরের বউ। যাক, সে অনেক কথা। এখন, মঙ্গলবার পর্যন্ত আমি আর অপেক্ষা করতে পারলুম না ভাই। আপিসে গেলুম না সেদিন, খেয়েদেয়ে গোটা-ডেরেকের সময় গেলুম সেবাসদনে। এনকোয়ারিতে গিয়ে খবর নিলুম, বিভাবতী ধর নামে নতুন কোন বিবাহিতা মেয়ে নার্স হ'য়ে চুকেছে এখানে ট্রেনিংয়ের মধ্যে ? তা বলে কি, সে-খবর তো এখানে না, মেট্রনের কাছে গিয়ে খোঁজ করতে পারেন। কোথায় পাই মেট্রনকে। হঠাৎ দেখি একজন স্টাফনার্স যাচ্ছে সেখান দিয়ে, তাকেই জিগ্যাস ক'রে বসলুম। মেয়েটি বেশ ভালো, বললে সে, আপনি তার কে হন। বললুম হাজিরাও। তো বলে কি, এখন তো দেখা হয় মুশকিল। তবে তিনটের সময় ট্রেনি-নার্সেরা ক্লাস করতে যাবে। ঐ যে তাদের কোয়ার্টার্স। যদি বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেন তো ঐ বিড়লা ব্লকের গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন, দেখা হলেও হতে পারে। হলোও কিন্তু ভাই। ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, দু-চারজন ক'রে ট্রেনি-নার্স গল্প করতে করতে পাস করছে কম্পাউণ্ডটা দিয়ে, হঠাৎ দেখি কি, মানসীও যাচ্ছে আর একটি মেয়ের সঙ্গে। ডাকতে গিয়ে গলা কাঠ হ'য়ে গেল আমার। অনেক কষ্টেও কিছুতেই আর স্বর বের করতে পারি না—বোধ হয় হাত ভুলেছিলাম আর তাইতেই ওর নজর পড়লো আমার দিকে। কতক্ষণ ধমকে থেকে শেষে কাছে এসে দাঁড়ালো ও, আর তখন, তোমাকে নুকোব

না ভাই, আই কুড নট চেক নাই টিয়ার্স । আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো । আর সকলের মতো ওরও সেই এক পোষাক—কালোপাড় সাদা শাড়ির ওপর অ্যাঞ্জন পরা, খোঁপার ওপর ছোট ক্যাপ, হাতগলাকান সব খালি একেবারে, কপালে সিঁদুরের টিপটি শুধু দগদগ করছে আর বাঁ-হাতে একমাত্র এয়োতিচিহ্ন নোয়াটা রয়েছে । সে যে কী মূর্তি ভাই । আমার হুঁচোখ দিয়ে জল পড়ছে, ওর চোখহুটোও দেখলাম লাল হয়ে গেল পলকের মধ্যে । ওই প্রথম কথা বললে, আমি তো এখন দাঁড়াতে পারব না এখানে, সবাই দেখে ফেলবে, তোমার সঙ্গে দেখা করার আমার পারমিশান নেই । মঙ্গলবার দিন সকালবেলা যদি বাচ্চু-বুলবুলিকে নিয়ে দিদির বাড়িতে আসো তো তখন কথাবার্তা হতে পারে—বলতে বলতে ও একরকম ছুটেই পালিয়ে গেল সেখান থেকে । সেদিন বাড়িতে ফিরে ভাই, তুমি বিবেচনা করবে না, আমি বাচ্চুকে জড়িয়ে ধরে একটা বাচ্চা-ছেলের মতো হাউহাউ ক'রে কাঁদনুম ।

‘আচ্ছা দাঁড়াও আমি ছুটি নিয়ে আসি’—ব’লে অবনী চ’লে গেল আর তারপর ফিরে এসে রাত্তার চ’লে এলো মাধবকে নিয়ে ।

মাধব শুরু করে আবার, ‘মঙ্গলবার গেলুম । সকালবেলাই । বাচ্চু-বুলবুলিকে কিন্তু নিয়ে যাইনি । তা, ওর দিদি আর নড়ে না আমাদের স্মৃথ থেকে । আমি যতো বলি মানসীকে, তোমার এ ট্রেনিং নিয়ে কী হবে, তোমাকে তো আর নার্সের চাকরি করতে দিতে পারব না, তুমি আজই ফিরে চলো, তো ও যে-মুখনিচু সেই মুখনিচু ক’রেই ব’সে রইলো একঠার । আর থেকে থেকে তাকায় দিদির দিকে । আর দিদির তো সেই এক-রা, চুকে যখন পড়েছেই তখন চাকরি করুক না-করুক ট্রেনিংটা নিয়ে বেরুনোই ভালো । আমি তখন লজ্জা বেড়ে ফেলে ব’লেই ফেললুম : আমি ওর সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই দিদি । দিদি তখন সূঁরে গেল বটে কিন্তু যাবার সময় আবার খানিকটা বিষ চেলে গেল, ব’লে গেল, একা কথা-বলার তো যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধে এর আগে পেয়েছো ভাই, এখনো পাবে যতো-খুলি, কিন্তু ভবিষ্যতের কথাটা আর ভুলো না । আমি তোমাদের মধ্যে থাকতে চাইনে, কিন্তু একথাটা যেন মনে রেখো যে কেউই তোমরা ছেলেমানুষ নও আর । ব্যস, হয়ে গেল । মানসীও ঐ রা ধরলো । আমি মানসীরও পারে ধরনুম সেদিন । তুমি আমাকে সেদিন কুকুর বলেছিলে, মানসীও বলেছিলো, ওর পারে ধ’রে বলনুম, আমাকে এ-বারের মতো ক্ষমা করো মানসী । ও আমার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প’ড়ে তখন কী কান্নাটাই কাঁদলে । আমার তখন ভরসা হ’লো একটু । কিন্তু কীসের কী, আগল কথা দেখলুম ওর ঠিকই আছে । তখন জানা গেল আবার আর এক খবর । ট্রেনি-নার্সকে যে হাঁসপাতালেই থাকতে হবে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই । কিন্তু ওর সে-পথও বন্ধ । স্বামীর কাছে থেকেই ট্রেনিং নেয়া যাঁয়, কিন্তু ও যে ইতিমধ্যে কোর্টে গিয়ে এফিডেফিট ক’রে পাশ কুরিয়ে নিয়েছে যে যদিও তার স্বামী বর্তমান, কিন্তু ট্রেনিংও থাকাকালীন ওর ওপর ওর স্বামীর কোন অধিকার থাকবে না । ওদের বোডিঙের খাতার লিখে দিতে হয়—কে কে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে, তা তার মধ্যে ও কোন পুরুষেরই নাম দেয়নি । বোঝ ব্যাপারটা । কী ভীষণ টাইপের মেয়েছেলে ওর ঐ দিদিটি । চান্দিকে একেবারে

কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে চুকিয়ে দিয়েছে বোনকে ঐ নরককুণ্ডে । কেন ? না পাশ করতে পারলে ভালো! চাকরি পাবে, অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে । টাকাটাই হ'লো সব ! স্বর-সংসার স্বামী-পুত্র সব ভাসিয়ে দিয়ে উনি টাকার লোভে মান-সম্মান-চরিত্র সমস্ত বিসর্জন দিয়ে এখন নার্সগিরি করবেন ! কী আর বলব বলো । নিজে বালবিধবা তো, স্বামীপুত্রসংসারের স্বাদ তো আর জানে না । নিজে যা সার বুঝেছে, বোনটাকেও কানে ধ'রে তাইতে চুকিয়ে দিয়েছে । আর মানসীও তো একের নম্বরের ইডিয়েট একটা, যা বোঝাচ্ছে তাই বুঝছে । যখন চলে এলুম সেদিন, ও বললে, বাচ্চু বুলবুলিকে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে, আমাকেই নিয়ে এসো না একবারটি । আমি বললুম, এ তোমার ক্ষণিকের ইচ্ছা ক্ষণিকেই নিলিয়ে যাবে । হাঁসপাতালে তো কত ছেলেমেয়ের জন্ম দেবে তাদের দেখেই বুক জুড়িও । আবার বলে কি, আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই এখন, আমার জামাকাপড়গুলি দিয়ে দেবে আমাকে ? আমি স্পষ্টই ব'লে দিলাম, না । ব'লে চ'লে এলুম সেদিন । নতুন-বাসাটা ছেড়ে দিলাম । কী হবে আর আলাদা ভাড়া টেনে । দিনকয়েক পরে আপিসের ঠিকানায় চিঠি পেলুম : অমুক দিন সকালবেলা বাচ্চু-বুলবুলিকে নিয়ে ওর দিদির বাসায় আসি যেন, ওদের না দেখে ও আর থাকতে পারছে না । তার মানে গতকালের কথা আর কি । গিয়েছিলাম । বা বুলবুলিকে দিলেন না, শুধু বাচ্চুকে নিয়েই গেলুম । শাড়ি শায়া ব্লাউজও ছুটো ক'রে নিয়ে গেলুম । কালকে আমি আবার জোর ক'রে ধরলুম ওকে, বাচ্চুও মাকে পেয়ে আর ছেড়ে আসতে চায় না কিছুতেই । তখন কিন্তু ভাই ও অন্তরকম হয়ে গেল । আমাকে বললে তখন, তুমি আমাকে আমাকেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবে কী ক'রে—ও বাড়ি তো তুমি ছেড়ে দিয়েছো । নতুন বাড়ির খোঁজ করো, পেলো আমি ফিরেই যাব যদি বলো তুমি । কিন্তু তুমি নিজেই শান্ত মনে ভেবে দেখো একটু, আমার কী করা উচিত । তোমার ইচ্ছামতোই আমি চলব । বা হবার হয়ে গেছে তার জন্মে অনুশোচনা করি না, কিন্তু ট্রেনিংটা নিয়ে রাখলে আমাদের ছেলেমেয়েদের পক্ষেও সেটা শুভই হবে মনে হয় । তবু যদি বলো এখন ফিরে যেতে, আমি তাইই যাব । আমি তখন ওর কাছে সময় চাইলাম দুদিনের । বাচ্চুকে দিয়ে এসেছি ওকে । এখন বলো ভাই, তোমার কাছেই আমি পরামর্শ চাইছি, কী আমার করা উচিত এ অবস্থায় । আমি তো ভেবে-ভেবে কোনোদিকে আর কুল কিনারা পাচ্ছি নে ।'

অবনী তার উত্তরে তখন অনেক কিছুই বললো । অনেক তর্ক-বিতর্ক হ'লো দু-জনের মধ্যে একেকটা কথা ধ'রে-ধ'রে ।

• শেষ পর্যন্ত মাধব বললো, 'বেশ, তবে তাই হোক । ট্রেনিংটা নিয়েই নিক ।'

[ক্রমশ]

উপেক্ষিত কবি অজিত দত্ত

কাতিক লাহিড়ী

বাউল একতারাতে আপন মনে গান গেয়ে চলেছে রাস্তার পাশে চোখ বুঁজে । হাজারও মানুষের গতায়ত সেই পথে । কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে চারপাশে গান শোনার জন্যে, কেউ হয়ত বারেক খেমে পা চালিয়ে দেয়, আবার কেউ শুনেও না-শোনার ভান করে পাশ কাটিয়ে যায় বাউল আর জনতাকে । অজিত দত্তর কাব্য-সাধনা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই ছবিটি ভেসে এল সম্মুখে । বাউল গেয়ে চলেছে গান, কে শুনছে আর কে শুনলো না—সেদিকে খেয়াল নেই । ভাবটি তার একান্ত আত্মগত । অজিত দত্ত যে তারে সুর বেঁধেছেন সে-তারের সুর একান্ত আত্মগত । আপন মনে তিনি রচে চলেছেন কবিতা । একান্ত আপন মন । সম্মুখে পাঠকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নেই, কঠোর সাধনায় ত্রুটি সাধকের মত বাহ্য-জ্ঞান শূন্য । এক আশ্চর্য-তন্ময়তা অজিত দত্তর কাব্য-সাধনার বৈশিষ্ট্য । এই আত্ম-তন্ময়তার ফলে তিনি যেনন অন্তর্মুখীন হয়ে পড়েছেন, তেমনি তাঁর কল্পনা রোমান্সের ডানায় ভর দিয়ে পাড়ি ছনিয়েছে আকাশের পথে, নীল-দিগন্তের ওপারে । অথবা আমাদের না-দেখা কোন রাজ্যে ।

“—অথবা সেখায় চলো নোর সাথে—যেখায় অরোরা

বর্ণের আলিম্পন আঁকে বিজ্ঞান, ভীষণ মেরু-শিরে,”

“কুসুমের মাস” এবং “পাতাল কন্ঠা”য় অজিত দত্ত একান্ত রোমান্টিক । অথচ এই রোমান্টিক দৃষ্টি আবার বিধা-বিভক্ত কাব্যগ্রন্থ হুঁটিতে । “কুসুমের মাস”—এ তিনি বোধহয় বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক, নিজেকে নিয়ে সদাই ব্যস্ত । কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক হয়েও তিনি আশ্রয় নিতে চেয়েছেন, অনুসন্ধান করেছেন “তোমাকে”—

“ভাবিতেছিলাম আমি এতক্ষণ কেবল তোমায় ।

তোমারেই ভাবি রোজ একা-একা থাকি যতক্ষণ ।”

এই “তুমি” যে কে তার কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত দেননি কবি । রোমান্টিক কবি সহজে ধরা দিতে চান না । বিচিত্র এক কুহেলী সৃষ্টি করে সেই কুয়াশার অন্তরালে থাকতে চেষ্টা করেন । তাঁকে আমরা বুঝতে পারি, দেখতে পারি, এমন কি মনে হয় এই বুঝি তাঁকে স্পর্শ করতে পারবো, কিন্তু হয় ! তিনি থাকেন অ-ধরা হয়ে, যাকে আমরা কাছে পেয়েও পাই না । স্পর্শ-সীমার সেই “তুমি” একজন মেয়ে “—আবুছা ছায়ার মত মেয়ে এক” এবং কবি এর সন্ধানে ফিরে চলেছেন—

“আমি শুধু এ জীবনে আহরিতে চাই প্রাণ ভরে

তোমার সুন্দর প্রেম, তোমার সিন্ধুর মত স্নেহ...”

বিরাট অভূষিত নিয়ে রোমান্টিক কবি হয়, নিজের অভ্যন্তরে অনুসন্ধান করতে থাকেন তাঁর প্রাণিতকে, না-হয়, ইন্দ্রিয়-প্রাহ্ন জগৎ অপ্রাহ্ন করে চলে যান অচিন রাজ্যে “যেখানে রূপালি চেউয়ে ছলিছে নবুদপত্নী নাও—” । স্ব-কল্পনার পরিপূতির

জন্মে কবি আপন মনের মাধুরী নিশিয়ে গড়ে তোলেন এক নায়িকাকে, “মোহিনী সে অপরূপ রূপময়ী মায়াবীর কাছে” ।

একদিকে নিজের অন্তরের অন্তলান্তে অহুস্কান, অন্যদিকে নীল আকাশে ওড়া—হুই-ই আমাদের দৃশ্য-জগৎ ছাড়িয়ে । কবি ‘অজিত দত্ত হুই দেশেই পাড়ি ঘনিয়েছেন তাঁর প্রথম দুটি কাব্য-গ্রন্থে । “জানি, এই পৃথিবীতে কিছুই রয়ে না,” সেইজন্য, “আকাশের শূন্য নীলে মোরা কাব্য লিখি অবিরত” কিন্তু “সে আকাশ তোমার অন্তর...” । “একটি কবিতার টুকরো” কবিতাটি এজন্মে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কবির মনোভঙ্গী, চেতনার-ধারা উপলব্ধি করি কবিতা পাঠে । নিজের অন্তরে আবার লৌকিক জগৎ ছাড়িয়ে দ্বিতীয় জগতে-গমনের আকৃতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত উক্ত কবিতাটিতে । সম্পূর্ণ আত্মগত হওয়ার ফলে কবি সমাজ, সংসার প্রভৃতি সম্বন্ধে নিরাসক্ত । তাঁর কবিতায় ধরা-ছোঁয়া পড়ে না দেশ-কাল । আসলে, কবির চেতনা বিশুদ্ধ কল্পনাময় । তিনি হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে ভালবাসেন, রূপকথার রাজ্যে বাসা বাঁধাত সচেষ্ট, আবার সে মেয়েকেই বেঁধে রাখতে চান, “যে মেয়ে ঋণা যেন, যায় না ধরে রাখা—”

আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে বিষয় নির্বাচনে কবি অবশ্য, কয়টি জীবনের অনেক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে । বিষয়ের মধ্যে তাঁর সংশয় দৃষ্টির পরিচয় তাই সহজ বোধ্য । “কুসুমের মাস”, “পাতাল কন্যা”র কবিতাগুলি এর নিদর্শন । প্রায় সব কবিতার সমাপ্তি কবি টেনেছেন প্রশ্ন-বোধক চিহ্নে । প্রশ্ন-বোধক চিহ্ন দ্বিজ্ঞাসার, অন্বেষার পরিচায়ক সন্দেহ নেই কিন্তু আত্মমুখীন কবির এ চিহ্ন কোতূহলের নয়—নিলিপ্ততার, সংশয়চ্ছন্ন । “সে কোঁড়ে কি কাজ”, “আনি কি লুপ্ত হবো”, “স্বপ্ন”, “পাতাল-কন্যা” ইত্যাদি কবিতার মধ্যে কবির সন্দেহ প্রকটরূপে প্রকাশিত । সংশয়চ্ছন্ন দৃষ্টির জন্মে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে মৃত্যুই তাঁর কাছে মধুর হয়ে ওঠে, “—জানি ওরা মৃত্যু আনে, তথাপি সে মরণ মধুর—”

এ-রকম কবির পক্ষে স্বভাবতই প্রয়োজন ইমেজ, উপমা, চিত্ররূপ সৃষ্টির । কিন্তু অজিত দত্ত এমনই নিলিপ্ত, এমনই উদাসীন যে কষ্টকল্পিত কোন উপমা, চিত্রকল্প বা ভাষা সৃষ্টির প্রয়াস পাননি । অতি সহজ, সরল কথায় রচনা করেছেন কবিতা । কবিতাগুলি সেজন্মে যতখানি হৃদয়ের বস্তু, ততখানি মুক্তির বা বস্তিকের নয় । হৃদয়ের অন্তলান্তে প্রবেশ করে অকথিত বাণী স্বগতোক্তির মত প্রকাশ করেছেন কবিতায় । “মালতী” কবিতা বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত মন্তব্যের সত্যতা নিশ্চিত হবে । দীর্ঘ কবিতায় নায়িকার উৎকণ্ঠা, নায়কের সঙ্গে মিলন-বাসনা, তার জন্মে রাজ-জাগরণ, অবশেষে “মালতীর আঁখি হতে পুণ্ড পুণ্ড কুসুম মিলালো মৃত্যুর মোহন স্পর্শে তবু তার শিথিল, অবশ ।” নায়িকার সম্ভাষণ থেকে শুরু করে উৎকণ্ঠার ক্রমবিকাশ—অতি স্বল্পে তুলে ধরেছেন কিন্তু কোথাও দেবিনা ইমেজের চাতুর্য, বর্ণনার ইন্দ্রজাল । এমন কি কবিতাটিতে যে-যৌবনের মদলসা, মধুস্বরা চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, সে-চিত্র ইন্দ্রিয় প্রাণ বা ইন্দ্রিয় উত্তেজক নয়—শান্ত । দেহের সৌন্দর্য সেখানে রেখায় রেখায় পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত অতি সহজ ও অনায়াসে । কথার পর কথা এসে তুলে ধরেছে

নাট্যিকার ছবি এবং তার গাঢ় ঘনতা এসেছে বিরহের মধ্যে। অজিত দত্ত সুখের কবি ন'ন, মিলনেও তাঁর সুখ নেই। অজিত দত্ত বিরহের কবি, বিরহেই তাঁর কল্পনার অবাধ ক্ষুতি।

তবু, আত্মগত-মন নিয়ে বাস্তবের দু'টি বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন—“পুলিশ”, “বড়বাজার”। কিন্তু কবিতা দুটির নামের মধ্যেই যা বাস্তবতার আঁচ, কবিতার বক্তব্য সেই রোমাটিকধর্মী। পুলিশ রাত্রিতে পাহারা দেয়। কিসের জন্যে? দুটোর দমন নিশ্চয়ই তার কর্তব্য তবু তার সংগে থাকে জীবিকা ও জীবন-ধারণের প্রশ্ন কিন্তু কাবর আক্ষেপ পুলিশ “দেখে না সে আকাশের জ্যোৎস্নার স্রির ওড়না।”

কবির আত্মমুখানতার জন্যে দৃষ্টিভঙ্গী ঈষৎ কুঞ্চিত। তিনি শুধু আক্ষেপ করেই কান্ড অথবা আপন মনে আত্মতৃপ্তি করে চলে—

“তার মাঝে ফিরিওলা ফিরি করে কুল
বড়বাজারের পথে, ক্ষীণ স্বর, আপনার মনে ;
ফিরিওলা ভুলে যায় কুল তাকে বেচতেই হবে,
ফিরিওলা ভুলে যায় খোলার কুটির খানি তার।”

। ২ ।

কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় যখন হাতে আসে “নষ্টচাঁদ”। প্রথমে খুলেই চোখে পড়ে—

কালো এক বিহঙ্গ ডানায় বসে আনে অমঙ্গল,
শাদা আকাশের রৌদ্র মুহূর্তেকে হয় অন্ধকার।”

যুঝতে কষ্ট হয় না সম্মুখে বিপদ উপস্থিত এবং সে বিপদও মারাত্মক বিপদ আর তার ঠিক বাঁ-পাশে দেখি, “এ বইয়ের সবগুলি কবিতাই যুদ্ধের মধ্যে লেখা। পাঠককে একথা মনে রাখতে অনুরোধ করি।”

“নষ্টচাঁদ”—এ অজিত দত্তের যে পরিচয় পাওয়া যায় “কুসুমের মাস”, “পাতাল কন্যা”র থেকে তার প্রায় সমুদ্র ব্যবধান। এই বিরাট পরিবর্তন আমাদের বিন্মিতই করে না, কোতূহলীও করে তোলে। যে কবি-মন ছিল নিম্নেকে নিয়ে ব্যস্ত, কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে যে উড়ে চলেছে আকাশের নীল থেকে নীলের ওপারে, তাঁর মুখে শুনি—

“মানি বটে রোপা-ক্ষীত মদমত্ত বণিক দস্তেরো
শক্তি আছে, তবু জানি, হে জীবন, অমোঘ শাস্ত,
আমাদের স্বপ্নে গাঁথা হাসি-কান্না মণিমুক্তো যতো,
তোমার ভাণ্ডার কোণে হয়তো সঞ্চয় হবে এরও.....”

দেশ-কাল নিরপেক্ষ কবির এ-ধরনের ঘোষণা প্রায় বিপ্লবের মত। এখানে নেই উড়ে-চলার কল্পনা, এখানে আছে—

“নতুন জীবন, নতুন জগৎ—
গড়ার অভিসন্ধি ;”

কবিতাগুলি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লেখা। ইউরোপে তখন চলেছে ভয়াবহ

মুন্সের অবিম্বলকারী পরিণাম। এশিয়াতেও লেগেছে তার ঢেউ। জাপান লোভী হয়ে উঠেছে পর-রাজ্য প্রাসের আশায়। ভারতবর্ষে তখন “নব নব বন্ধনার স্বপ্ন দেখে লোভাক্ত বণিক।” এছাড়া কবির “জানা আছে কিছু কিছু লোভেরো ঘৃণিত নিয়ন্ত্রণ।” এবং কবিতার শাস্ত তপোবনে “ঘৃণ্য ব্যবসার জাল” বিস্তারিত হয়েছে। কবি এজন্তে ক্ষুব্ধ।—তিনি প্রস্ত করেন—

“আর যারা স্থির ধ্যানে আত্মমন দিল কবিতারে,
সাধনা গবিত যারা পরাঙ্মুখ আপন প্রচারে

তাদের আসন কোন মহাশুভে, বুড়া কি তা জানে?”

কবিতাগুলি মানবিকতা মূল্যে পূর্ণ। কিছুটা সাময়িকতা এসেছে বলে কবির কত সংকোচ কিন্তু সাময়িক সমস্যা নিয়ে ভাল কবিতা লেখা যায় “নষ্টচাঁদ” তার সফল উদাহরণ। কবির এখানে কোন সংশয় নেই, দ্বিধা নেই। এখানে তিনি আত্ম-বিভোর হয়ে কবিতা রচনা করেন না। এ যুগের কবিতায় কবি বাস্তব জীবন থেকে বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন—

“নইলে

রইলে

ভাত না খেয়ে

চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।”

অথবা—“না কিনে ধুতি

যতোই দোকানে গিয়ে করো আকুতি।”

তাই কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে ওড়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। নিছক দৈহিক বা শারীরিক অভাব, যার সংগে জড়িয়ে আছে জীবন ধারণের প্রশ্ন। কবি বুঝেছেন—

“জীবন তো নয় সুখের জোয়ারে পান্সি,

আসল প্রশ্ন প্রাপটা কি ভাবে বাঁচে।”

প্রাণ বাঁচানোর জন্তে যে চাঁদ-কে নিয়ে তিনি এত সুকোচুরি খেলেছেন, আজ মনে হয়—

“.....চাঁদের ভেত্নি সব জানা গেছে মেকি,

মিথ্যে শব্দ, নেহাৎই মিথ্যে আকাশ—ছড়ানো তারা।”

কবি জীবনের মূল প্রশ্নে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ফেনিল ভাবানুভূতি, উচ্ছ্বাস, কল্পনা উবে গেছে। তাঁর কাছে চাঁদ আজ নষ্টচাঁদ বা দেখলে অসদল হয়।

পারিপার্শ্বিক জীবন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে মানবিক মূল্যবোধের গভীর প্রত্যয় নিয়ে কবিতাগুলি রচিত তাই আজ যারা দেশের বা দশের অন্তর্ভুক্ত করছে তাদের প্রতি কবি নির্মম—

“সূর্যেরে যে ছুঁতে যায় পুড়ে মরা ভাগ্যালিপি তারি” এবং মনুষ্য, জীবনের সংকট মুহূর্তে আহ্বান করে কবি বলেছেন—

“হে কবি, আহ্বান করি, মনুষ্য পিষ্ট ক্রিষ্ট হবে—

ভব ক্ষীণ কণ্ঠে আনো জীবনের অধিকার দাবী,

জীবন সংগ্রামে যদি, বলো এই জীবন আহবে
একমাত্র অস্ত্র মোর আনন্দের মঞ্জুষার চাবি ।”

মাঝে মাঝে তাঁর পুরনো রোমান্টিক মন চাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছে কাব্যগ্রন্থ
ছ’টিতে । “পলাতক”, শিলাভট্টারিকা, “সাঁওতালি মেয়েরা” কবিতাগুলি যার নিদর্শন ।
কবিতাগুলিতে “কুসুমের মাস”, “পাতালকন্য়ার” কবিকে খুঁজে পাই । কিন্তু “নষ্টচাঁদ”
ও “পুনর্নবা”য় করি আরো পরিণত, প্রাজ্ঞ । অনেকে হয়ত মন্তব্য করবেন—নষ্টচাঁদ ও
পুনর্নবার মত কাব্যগ্রন্থে এদের স্থান কোথায় ? আমার মনে হয় উড়ে চলার মধ্যে যদি
পরিণতি থাকে তবে সে উড়ে চলায় দোষ কি ?

“গেলো চাঁদ, গেলো কোথা, কদর ?
পেরিয়ে সমুদ্র,
পেরিয়ে আকাশভরা তারা—
পার হয়ে গেল চাঁদ চোখের গাহারা ।”

কবিতাটির পাশে যখন শুনি—

“মনে হয় যেন এখনো কোথাও গুহার তলে
আগামী দিনের অগ্নি জ্বলে ।”

তখন মন বলে এই তো চাই, এ না হলে চলতো না ।

। ৩ ।

“ছায়ার আশ্রয়”র আবার পুরনো অঙ্কিত দন্তকে ফিরে পাই । মনে হয় পৃথিবীর
সমস্ত কর্ম-ব্যস্ততা, আধুনিকতা বর্জন করে কবি চলে গেছেন অল্প এক ভগতে, সেখানে—

“.....জীবনের ভাল-লাগা ভুলগুলি নিয়ে
খুশির শেফালী বনে বেঁচে থাকা ছন্দ কুড়িয়ে ।”

বাস্তব কবির উপজীব্য নয়—

“জীবিকার দুঃখ-সুখ চতুরালি ভরা যতদিন—
ভাল প্রেমের ছোট আনন্দেরে করে প্রদক্ষিণ ।”

কবি আবার নেমে এসেছেন মনের অভ্যাসে । তার ফলে দেখা দিচ্ছে নৈরাশ্র,
সংশয় তথা অবশ্যের প্রতি আকর্ষণ—

জীবনের ছোট ছোট অলস নিবেদনগুলি ঘিরে
মৃত্যুখোলা প্রতিদিন, সবি এক ভুলের ভিমিরে
বারে বারে কেবলি হারায়”

সেই—“তবু সেই ভুলগুলি জীবনের থেকে মুছে নিলে
সকল খুশির আলো নিবে যাবে আমার নিখিলে”

কিন্তু “সাধারণ” কবিতার বক্তব্য আমাদের সহজে স্পর্শ করে ।

“সাধারণ মন নিয়ে হৃদয়ের খোলা দরবারে
সকলের সাথে মিশে এক হয়ে যাওয়া একবারে ।”

তবু কবি এই প্রতিজ্ঞা পালন করতে সক্ষম হননি । যে “ভূমি”কে নিয়ে

তার কাব্য জীবনের শুরু, সে-“তুমি” শুধু তুমি হয়ে রইল, তাকে সাধারণ করা গেল না। প্রেমের কবিতায় অজিত দত্ত তাঁর মানসীকে “বিশেষ প্রিয়া” রূপে দেখেছেন, তাতে পাঠক নিজের হৃদ-স্পন্দ খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থকান হয়। অবশ্য প্রেম নারক-নাগিকার মধ্যে সীমিত তবু সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রেমের বিস্তৃতি একান্ত প্রয়োজনীয়। স্ব-প্রেমের কথা কেউ শুনেবে না আর শুনেই বা লাভ কি যদি-না পাঠক তাতে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে? অজিত দত্ত ঠিক এই সিদ্ধি লাভ করেননি, অথচ তাঁর সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। প্রেমিকার সন্ধানে তিনি কাব্য রচনা করেছেন। বাউল যেমন কৈদে কৈদে মনের মানুষকে খোঁজে, অজিত দত্ত তেনি তাঁর প্রেমসীকে খুঁজেছেন কিন্তু কি এক আবর্তে জড়িয়ে পড়ে সে-প্রয়াস তাঁর ব্যর্থ হয়েছে। তাই শুনি তাঁর দ্বিধা, সংশয়—

“ধূসর সন্ধ্যার ছায় ছুঁয়েনে দৃষ্টি আজ স্থান,
কভু ভাবি সব আছে, কভু দেখি নিঃস্ব এ-পরাণ।”

। ৪ ।

ব্যঙ্গ কবিতায় অজিত দত্ত সিদ্ধ-হস্ত। কবির রোমাটিক মন যখন বাস্তবের কঠোরতার মাঝখানে উপস্থিত হয়েছে—তখন তাঁর মন স্বভাবতই পীড়িত হয়েছে নানা কারণে। তিনি বাস্তবকে ব্যঙ্গ, বিক্রমে চর্জিত করতে চেষ্টা করেছেন। “নষ্টচাঁদ” বা “পুনর্গবা”র ব্যঙ্গ কবিতাগুলির মধ্যে শ্লেষ নেই, আছে লঘু পরিহাস। সেই পরিহাসের মধ্যে আমরা পাই তাঁর আশাবাদ—

“কহি এলেন ভুজারতের অবতার—

জলুক আগুন, আমরা সে আঁচ সব’ তার।”

কিন্তু “ছায়ার আলনা”র ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে কুটে উঠেছে শ্লেষ ও বিক্রমের সংগে সিনিক-মনোভঙ্গী। কবি এখানে বাস্তবকে মোটেই সহ্য করতে পারছেন না। তিনি নভোচারী জীব, মর্ত্যের অধিবাসী তাঁর কাছে কপার পাত্র। এই নেতি দৃষ্টি আসার ফলে “ছায়ার আলনা”র ব্যঙ্গ কবিতাগুলি যথেষ্ট স্বার্থক হয়ে ওঠেনি, বরঞ্চ কবির সিনিক-ভঙ্গী আমাদের পীড়িত করে মাঝে মাঝে।

রোমাটিক কবিতা দিয়ে অজিত দত্ত কাব্য-সাধনা আরম্ভ করেছিলেন, পরিণতিতেও বিস্তৃত রোমাটিক মন। যে-মন সমাজ-সংসার, দেশ-কাল নিরপেক্ষ হয়ে কালোত্তীর্ণ হতে চায়। দেশ-কাল উত্তীর্ণ হওয়া মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ কিন্তু দেশ-কালকে উপেক্ষা করে নয়। অজিত দত্তর কবিতায় আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই, এমন কি মাঝে মাঝে তাঁকে অত্যন্ত বেশি সং বলে মনে হয় কিন্তু কবি অজিত দত্ত কেমন এক রহস্যের জগতে কুয়াশায় পথ হারিয়ে ফেলেছেন। এই আধুনিক যুগে সেই বিস্তাপতি, চণ্ডীদাসের স্বপ্ন দেখছেন। এক্ষেত্রে সমালোচকেরা তাঁর কবিতায় আধুনিকতার যথেষ্ট খোঁরাক পান না। “আর খোঁরাক পান না বলেই বার বার অজিত দত্ত হয়েছেন উপেক্ষিত। অথচ ঘনিষ্ঠ পাঠে এ-মন্তব্য সহজেই পরিবর্তন করা যায়। বলা যায়, অজিত দত্ত যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক না-হলেও উপেক্ষার যোগ্য নন। অতীতের সংগে আধুনিকতার মিলনের প্রয়াসে তিনি একক এবং সমালোচনার দাবী রাখেন।

বিকেল

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রোদের আশ্রয় কত দূর কত দূর—
বিকেল আবার সেই তো সোনার ছড়,
টুকরো টুকরো গাছের পাতায়
সারা মাঠে শিশু চেউএর ছন্দে লীন ।
সীর্জাচূড়ায় ও কোন পাখির গান !
উড়ছে ঘুরছে ফিরছে অধীর
শান্ত সন্ধ্যার তট,
অ্যাসফল্টের তাতানো দিনের শেষে
শান্ত সন্ধ্যার ঘর ।

বাঁকা পৃথিবীর পথ দিয়ে ফেরে গোধূলির পলাতক
ক্লান্ত ঘোড়ায়, রুখু চলে তার ঝড় ।
তাত ঝলসানো তাঁবাটে চামড়া,
লক্ষ মিনিট চোখের তারায় স্থির,
একটু হাসির প্রার্থনা নিয়ে চুপ ।
ফেরারী ফিরছে পথ চিনে চিনে
সবুজ জাঙ্গিয়ে যেন সে শিলির শব্দ ।

কাঁচের পাত্রে রঙিন গোধূলি
মুঠো মুঠো নীল ব্যথার পলাশ,
মন-কেমনের বেলা-নাবা এই সন্ধ্যা যেষের ধার
বিকেলের রোদে এই তো অনেক সোনা ।

জীবন এখান থেকে

শিশিরকুমার দাশ

সে ঘেঁষে ছুয়ার খুলে ঝাঁড়িয়েই আছে
চিরদিন, চিরকাল একটি আশায়
বুকভরা, তবু কেন আছে তার কাছে
আমরা পারি না যেতে, কেন কুয়াশায়
এতবার পথভুলি, ভুলে যাই পথের শেষেও
পথ আছে, ছঃখ নদী পেরোবারও পর
ছঃখ থাকে, কেন তবে অধরের নিকটে এসেও
একটি মুহূর্ত ধরে অমৃত অনর
হতে ভয় পাই !

ভয়, শুধু ভয়েতেই শেষ ।

কিন্তু এই রাত্রিধরে যত দেখি দূরে
নীলাস্ত্র আকাশ তার সীমাহীন ছায়াপথে,
পৃথিবীর সব ছঃখ হতাশার কান্নাঘল
তারা মেলে উজ্জ্বল করেছে । সূর্যহীন আকাশের দেশ
চেয়ে দেখে পৃথিবীতে কে আজ জাগল
নেভাতে রাতের দীপ
কেলে দিতে রজনীগন্ধার স্নান মালা
ছঃখজয়ী প্রাণের শপথে—
হায় ভাগ্য, নধ্যরাত্রে স্বপ্নের একটি খোঁড়া চালে
এ বুকের আগুন লাগল ।

এখনও সময় আছে, যদি চাই, একফালি গীর্জার আকাশে
শব্দচিলের সাদা ডানাটির মত ছায়া কেলে
যেতে পারি, যেহেতু এ স্বপ্নের পরেও জীবনপেয়লা
সমস্ত বোধের বিষ্ণু জমে জমে ভরে উঠবে—
তবুও সমস্ত ক্রান্তি পথে দিয়ে বন্দী করে
সত্যগ্রহী সৈন্য হয়ে ।

তবে কবে কুল কুটবে
 পথের ছপাশে ? না সে কুল কুটবে না কোনদিন ।
 নীভাৰ্চ হিম্মানি রাত্রি । অঞ্চ আকাশে এত আলো বরে
 কালপুরুষ সাতভাই নক্ষত্রের গায়
 জনকীর আকুলিত মুমুর্ষু বোঁপায় ।

শুধুই তোমাকে আজ সন্টার ভিতর থেকে অনুভব করা
 তবেই কুটবে তুমি আগনের সূতীক্ষ্ম আলোকে
 আলো হওয়া স্বপ্নের ভাষায়
 মনে হয়, জীবন এখান থেকে বেশি দূরে নয়
 যদিও এখনও নয় একান্তই কাছে

সে যেন ছম্মার খুলে দাঁড়িয়েই আছে ।

হারিয়ে যাবার পথ উৎপলকুমার বসু

হারিয়ে যাবার নানান পথ খোলা
ভ্রমিত মন সেই ভয়েতে কাঁপে
সুপেয় স্বল একটি হৃদে আছে
অশ্রুগুলি শুক অভিধাপে ।

কে চলেছে অন্ধকারে ওগো
পথের গায়ে চিহ্ন ছিল লেখা
যেনন করে আদর অনাদরে
পৃথিবীতে সকল কিছু শেখা

লুটিয়ে দিয়ে মানুষ চলে গেল
চেতনাময় বনের রাঙা ধূলি
ভেমনি আহা চিহ্ন ফেলে গেছে
মাটির বুকে ধরে কুসুমগুলি ।

নীরবতা—ধেনেছ তুমি মেঘ
নিরুদ্দেশ—ধেনেছ তুমি পাখি
তাহ'লে ঐ করুণাহীনা শাপে
ভয়গাটুকু রাখি ।

ভগ্ন

শিবশঙ্কু পাল

ঝকঝকে এভিনিউ, বহুবর্ণ চোরঙ্গীর রাস্তা,
টুকরো আকাশ, ভিড়, কলেজ ট্রিটের' কুটপাথ,
সিনেমার বিজ্ঞাপন ইত্যাদির 'পরে চোখ পাতা ;
আমার স্বভাবে দেখি ব্যাপ্ত হয়ে আছে কলকাতা ।

স্বাভাবিক । সময়ের বৃত্তে বাঁধা কালের পুতুল
আমার হৃদয় যদি, তবে তাতে হয় দৃঢ়মূল
ধূলিকণ বর্তমান শহরের বাস্তব প্রতিভাসে :
ট্রামবাগ, ভিড় আর গলিটার টুকরো আকর্ষণে ।

তাহলে এ হৃদয়ের কোন সে নিভৃত ছায়াঘরে
সোনালী ইচ্ছার শিল্পী জেগেছিল জাগার মস্তুরে
যে দেখেছে পৃথিবীকে শিশুদের অবাক বিস্ময়ে
যজ্ঞাসুর প্রত্যাহের বাঁধভাঙা বিদ্রোহের জয়ে ?

সেতো প্রায়ই দেখা দেয় যখন ভেবেছি কলকাতা
চেতনার, জীবনের, স্বভাবের অনন্ত নির্মাতা ;
দুরন্ত আবেগে তার মাথা তোলা ; জানি সেতো থাকে
হৃদয়ের সেইখানে যেখানে পেয়েছি আপনাকে ।

প্রাণ প্রেম প্রত্যাশ ও সন্ধ্যা

জ্যোতির্ময় গদ্যোপাখ্যান

সমর্পণের সবক'টি রীতি জানা আছে যার
তারই আছে বুঝি অধিকার শুধু ভালোবাসবার
স্মৃতি যে ছেনেছে পলাতক নয়, চিরদিনকার
তারই ছুটি চোখ ছুটি বাতায়ন আলোআসবার

ভালোবেসে আরো ভালোবাসবার কঠিন শপথ
যার চোখে তারই কঠে ভোরের ভরা নহবৎ

যার, প্রেমে এক ধারাবাহিকতা, আয়ু অক্ষয়
তারই করপুটে পৃথিবী ধরেছে আলো ও সময়

যার পায়ে পায়ে বন্ধিম হলো ঋতুপথরেখা
ক্রান্তি কি তারই ভোরবেলাকার আরক্তলেখা ?

* * *

প্রেমের এমন শিক্ষা সেই নারী কোথা থেকে পায়
যার টানে ইতিহাসে সে খুঁজেছে নতুন অধ্যায়,
নিষ্ঠাবান প্রেমিকের আর সেই ধ্যানমগ্ন মন
নাগরিকার চোখে চেয়ে কোন আলো করে অধ্যয়ন
রাত্রি তার অশ্রুরও বহু আগে ছিলো এক ভয়
দৃঢ়চিত্ত সে পুরুষ তারপরে দেখেছে সময়
দেখেছে রাত্রির ক্ষয়ে অস্পষ্ট আলোর ইশারা
বৃত্তারও বহুপরে জীবনের চিহ্ন, স্মৃতি তারা

এই যে শহর আর অতৃপ্ত অসংখ্য নাগরিক
করুণার বেঁচে আছে—এই চিন্তা তাকে সর্বাধিক
আকর্ষণ বস্ত্রণামগ্ন আযোবন জীবন-দ্বিজ্ঞাসায়
অধীর অস্থির করে প্রেমের নিবিড় নিষ্ঠায় ;

মানুষের পৃথিবীতে দয়িতার শুভইচ্ছা, কতো
কতো বেশি ব্যাপ্ত হলে পুরুষের সামর্থ অক্ষত,
এই এক উপলব্ধি বিশ্বাসের উপাস্তে এলে পরে
ইচ্ছা আর অভিনাষ প্রসারতা পেল অস্তরে,
সময়ের কঠ শুনি প্রেমিকের লেখা অক্ষরে :

ক্ষুদ্রতায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে কয়েকটি প্রাণ ক্ষীণজীবী
আকাশের খুব নিচে চেয়েছিলো আলোর পৃথিবী ।

তিমিরান্ত

জ্যোৎস্না ভড়

রাতারাতি অন্ধকারের দরজা ভেঙে আলোর দরজা খুলে
দিয়েছি । সেখানে প্রভাতসূর্যের আনাগোনা । আকাশের
নীল সংকেত জানায় : আরি আছি ।
তোবড়ানো আমার হৃদয় আড়মোড়া ভাঙে । বজ্রের সুরে গান
গেয়ে ওঠে—তার রেশে নামে মুক্তির প্রচণ্ড বজ্রা—
গ্রামে শহরে ।
শিশু চিৎকারের রাত্রি খসে পড়ে ।

তারার আকাশ ।
রজনীগন্ধার আকাশ ।

তখনো, তখনো জড়িয়ে থাকে অন্ধকার ।
কে যেন বলে : আলো জ্বালো ।
সম্মিলে তাকাই—আলো জ্বালো । পিছনে তাকাই—
আলো জ্বালো ।

সারা দিনমান গান গাই ।
পৃথিবী আলোয় আলো ।

মান-বিন-দায়ের কাহিনী
২০১৯ চন ১৩৩

॥ ২১ ॥

পনেরো বছর দীর্ঘ সময়। কিন্তু এতখানি কি দীর্ঘ যাতে করে একটা গ্রামকে এমন করে ওলটপালট করে দিতে পারে। মুচিপাড়ায় পাঁচ সাত ঘর বাসিন্দা কি একেবারে নিশিহ্ন হয়ে গেছে? না, একেবারে নিশিহ্ন হয়নি। লোভী মানুষের সীমাহীন ক্ষুধা তাদের ছন্নছাড়া করে দিয়েছে। পুবের বিলের সরস মাটি ভৈরবের ওপারে ধনীবারুদের লোভ দেখিয়ে আকর্ষণ করেছে। তারা পরস্পর ছড়িয়ে ভিটে ছাড়া করে দিয়েছে ওদের। কেউ উঠে গেছে মজুতখালি, কেউ বয়রা, বানেশামার, কেউ-বা বউগারি। শুধু মুচিরাই নয়, এমন অনেকেই গিয়েছে। বামুন, ছোট কাম্বোজ ক'ষর আছে আর আছে মাহিষ্ঠ আর ছেলেরা। পুবের বিলে লোক যেন অর্ধেক কমে গেছে। মূষ নাই, আছে ধুধু করা ধান, পাটের ক্ষেত আর রুমারী ক্ষেতের আবাদ। পনেরো বছর অল্পপন্থিতির পরে কেউ যদি ফিরে আসে, নিজের গ্রাম হলেও, পুবের বিলকে চিনতে কষ্ট হবে। পুবের বিলের আয়তনটা যেন বেড়েছে। মূড়ির খাল কেটে বিলের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়েছে। বস্তা প্রাবনের সময় আসেপাশের সব ভেসে একসার হয়ে যায়। শুধু দীপের মত ঘড়, হোগলা-টালির ছোট ছোট ঘর, মাঝখানে আসে।

ও ভাই, শোনো, এটা কথা শুনে যাও।

লাঙল কাঁধে বলদ নিয়ে চাষী ক্ষেতে চলেছে। ডাক শুনে বলল, কি কও?

এখানকার মানুষ বাড়িঘর সব গেল কেন?

বাড়ি? মস্করা কর নাকি? দেখতিছ না ধান খেত।

লোকটা নতুন এসেছে, কিছুই জানে না বোধহয় পুবের বিলের।

নটবর রিশিরে চেন না?

না। ওসব আঙ্গুড়ে গল্পে কাম নাই। আমার সময় নাই দাঁড়াবার।

লোকটি চলে গেল।

এই পথের বাঁকে জামগাছটা এখনও আছে। ঐ যে ডোবা। তার ও ভুল হবার কথা নয়। তবে বাড়িঘর গেল কোথায়। মানুষগুলিও-বা কোথায়? ভিটে ছাড়া হতে পারে কিন্তু সবাইত আর মরে যেতে পারে না। অপলক দৃষ্টি দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল সে, যেন স্বপ্ন দেখছে। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে বটগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল। বঁহ সংগ্রামের চিহ্ন রয়েছে তার দেহে। জীবনযুদ্ধে হতোম্মম। একটা পা হাঁটু অবধি কাটা। মাথার রক্ত লম্বা চূলে ঝট পড়েছে। বিক্রী নোংরা গোপেদাড়িতে লোকটির মুখ প্রায় ঢাকা পড়েছে। তার উপর মুখের বাঁদিকটা পুড়ে একটা চোখের চেলা বেরিয়ে এসে সমস্ত মুখটা বিকট

অকৃতি হয়েছে। পরনে তার ময়লা ধান, লুটির মত করে পরা, গায়ে ফর্সা একটা বিলাতী কমল।

পুর্বের বিলের বহু পরিবর্তন হয়েছে চিনতে কষ্ট হলেও ভুল তার কিছুই হয়নি। বাড়ি না-থাক, ডোবাটা আছে। কত কি ঘটনা ছবির মত পর পর চোখের সামনে যাওয়া আসা করতে লাগল। পাগলের মত লোকটা কখনও হাসে, কখনও কাঁদে। সে চিনবে সব, তাকে কিন্তু কেউ চিনতে পারবে না। যেচে পরিচয় দেবার মত তার আর কিছুই নাই। যে জিদ করে সে চলে গিয়েছিল তার চরম অপমান হয়েছে সে নিজে। কাপুরুষ সে, ভীকু অববেচক, মুখসর্বস্ব বাচাল। সে হয়ত একাধিক জীবন নষ্ট করেছে। কানাটা হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল।

ঝির ঝিরে বাতাস বইছে। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত লোকটির মনে হল তার বহুদিনের হারানো মা যেন পাখার বাতাস দিচ্ছে। ধানের চারায় বাতাস লেগে শব্দ হচ্ছে। সে শুনছে ছোট পায়ে মল বাজছে। কাঠঠোকরা পাখা তার শব্দ মধ্য ঠেঁটি দিয়ে গাছের উপর আঘাত করছে। সে শুনছে, কে যেন ছ কার তামাক টানছে। বিলের ভেতর এ ডিঙ্গি থেকে যেন কে আর এক ডিঙ্গির লোককে ডাকছে। লোকটি শুনছে : ওরে ও বাবা, ফের—ফের—

পনের বছরের বহু কথা টুকরো টুকরো হয়ে পুর্বের বিলের বাতাসে ডাসিয়ে নিয়ে আসছে।

একটি অতি উষ্ণ সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে। সোদনকার নায়ক একটি ষোল মতেরো বছরের বালক। বাপের অমানুষিক শাসনের প্রতিবাদে জানাকাপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সে বেরিয়ে গিয়েছিল। কী যে ঘৃণা কী যে বিতৃষ্ণা সেদিন জীবনে এসেছিল তা আজও স্মরণ হয়। তবে আজ আর কোনো জ্বালা নেই, উত্তেজনা নেই। সেদিন উন্মাদের মত কাঁপতে কাঁপতে দারুন আক্রোশ বসে বিলে স্বাপ দিয়েছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ত্রৈলোক্যে উঠে কাপড় চুরি করে পরের ডিঙ্গি বেয়ে রেলস্টেশনে এসেছিল। ভাবনাচিন্তাহীন বেপরোয়া উত্তেজনার বশে অনেক দূরের এক বড় শহরে এসে পৌঁছল অবশেষে। তারপর ?

সেও এক রোমনাক্কর ইতিহাস। দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্মে সে কী ভীষণ সংগ্রাম। কত ভুলত্রাস্তি অন্তায় আর অধর্মের ভেতর দিয়ে দরিদ্র অশিক্ষিত অল্প অসহায় একটি প্রাম্য বালকের অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ জীবনযাপন। তার নিজের অতীত, নির্মম বিশ্বরণের সাধনা আজ হাজার লক্ষ গুণ সর্বাঙ্গিক হয়ে তাকে আঘাত করছে। পরানুগ্রহে ভিক্ষকের জীবন তার। মুচি বলে যাদের ঘৃণা করেছে তাদের চোখে অন্ধ সে পরন কপার বস্ত্র।

...ঘল শুধু ঘল—সামনে পেছনে সব দিকে। আহাঙ্কের নাবিক। এ ঘাটে ও ঘাটে আনাগোনা। রূপকথার যেন সব রাজত্ব। বড় ইচ্ছা ছিল সেধাপড়া শিখবার। তা হয়নি। শেষ পর্যন্ত টাকা রোজগার করে ধনী হবার ইচ্ছায় সাত-ঘাটের ঘল খেল, তাও হল না। লাভ হল যুদ্ধের সময় এক দারুন হৃৎটনায় পা গেল, চোখ গেল, জীবনসংশয় রোগে ধরল। সুদূর বিদেশের এক

হাসপাতালের নির্ধাতন থেকে মুক্তি পাবার আশায় পালাতে গিয়ে বরা পড়ল—হল হাঙ্গতবাস ।

খালাস পেল শুধু কুকুরের মত রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করবার জন্যে । আশ্রয় নাই, সম্বল নাই, আছে শুধু ককিয়ে ককিয়ে ভিক্ষা করবার জন্যে ভঙা গলার আওয়াজ । অপমান আর নির্ধাতনের অশুশোচনায় অনেক কষ্টে, বহু ফিকির ফন্দী খাটিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে দীর্ঘপনের বছর পর নিষের প্রানে ফিরে এসেছে আশ্রয়ের আশায় । জী আছে, বাপ আছে, মায়ের মত অন্তরঙ্গ আত্মীয় আছে, স্বজনপরিজন আরও আছে । একটু শান্তি কি মিলবে না ? সে অনেক অপরাধ করেছে, তবু তারা ত আপন জন । আশ্রয় কি দেবে না ?

হাঃ হাঃ হাঃ—

পাগলের মত হেসে উঠল লোকটা ।

কেডারে, কেডা হাসে ?

আমি রে ভাইডি, আমি ।

রাঘব ঘোষের ছেলে চরণ । চরণ কিন্তু চিনতে পারেনি ।

তুই কেডা ?

আমি ভিনদেশী । বড় ফিদে রে দাদা, খাতি খেবা হুডো ?

ভিক্ষে তোরে এখানে দেবে কেডা । প্রানের মধ্যে যা—

একবার ইচ্ছা হল চরণকে ডেকে কটা প্রশ্ন করে কিন্তু কি ভেবে কিছুই বলল না ।

লাঠি ছুটি বগলে পুরে সে ঠক ঠক করে প্রানের ভেতর এগিয়ে গেল ।

পথ দিয়ে হাঁটছে আর চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে । পরিবর্তন অনেক হয়েছে কিন্তু অতিপরিচিত সেই সব ঝোপঝাড় বুনোভা মুড়িপথ সবই ঠিক আছে । হাঁটছে আর ভাবছে কোথায় গেল সবাই । সবাই কি মরে গেল ? একবার মজুতখালি যাবে নাকি ? তারা কোঁচ দেবে সবার ।

বায়ুনপাড়ার সেই পাঠশালা । থরকে দাঁড়িয়ে সে দেখতে লাগল । নতুন গুরু এসেছে । সুন্দর সুন্দর সব ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করছে, সুর করে কড়াকিয়া পড়ছে । অনন্ত পণ্ডিত কোথায় ? একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস শুধু বেরিয়ে এল । জীবনে লেখাপড়া শিখে বড় হবে এই সাধ ছিল । কিন্তু আশা পূর্ণ হল না । ভাগা বিক্রপ তাই লেখা পড়া হল না, কিছুই হল না । শুধু অত্যাচার আর অপমান পুরস্কার পেল । নিবিঘ্নে পড়াশুনা করতে পারলে আজ মানুষের মত বাঁচতে পারত । আজ এ জীবনের আর প্রয়োজন নাই, কোন মোহ নাই, আকর্ষণ নাই ।

সোনার চাঁদরা তোর পড়, খুব পড় । পড়ে বড় হ ।

মনে মনে শিশু ছাত্রদের উদ্দেশে চোখ বুজে সে আশীর্বাদ জানালো ।

চোখ বুজে যে কতক্ষণ ছিল সে-খেয়াল তার নিষেরই ছিল না । চোখ খুলতেই দেখে তাকে অসীম কৌতুহল নিয়ে ছেলেমেয়ের এক দল ঘিরে দাঁড়িয়েছে ।

সে হাসল । ইচ্ছা হল ওদেরকে কোলের মধ্যে টেনে নেয় ।

ওরা যে শিশু । কিছুই জানে না । দেখছে কিছুত কিমাকার একটা ঘাব ।
একজন ধু করে খানিক ধুধু ছিটিয়ে দিল । একজন তার লাঠিটা ধরে টান
মারল ।

সে হাসল । এতটুকু রাগ করল না । ওর বিকৃতদর্শন চোখদুটিতে সীমাহীন
করণা । শিশু ভোলানাথের নন্দী ভূদিরা আঙ্কারা পেল । এতক্ষণ তাদের খেলা বৃহৎ
পর্যায়ে ছিল । এবার আরম্ভ করল ঢিল ছুঁড়তে ।

সে সহ্য করতে চেয়েছিল । একটা মাথায় লাগতে মাথা ফেটে রক্ত গড়াল ।
সে আর্তনাদ করে উঠল ।

গুরু তামাক খেতে খেতে দিবানিদ্ৰা সাধছিল । চিংকার শুনে তড়াক করে
লাফিয়ে উঠতেই ছেলেরা সব ছুটে পালালো !

এই, এখানে চাস কি ?

বোবার মত বোকাটা তাকিয়ে রইল ।

ভিক্ষে চাস ত লোকের বাড়ি যা—এখান থে গরে পড়—যা—যা—

সে চিনতে পেরেছে হারু আচার্যের ছোট ভাই । বায়ুন হয়েও তার বাপের
কাছ থেকে যারা একদিন দান নিত । বেদনার মধ্যেও সে হাসল একটু । তারপর
লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল ।

গোটা গ্রাম সে ঘুরে ঘুরে দেখল । কোথাও কাউকে দেখতে পেল না । সবাইকি
ভাবে মরে গেল ? এবার মুখ কুটে সে প্রশ্ন করবে ।

আলো ঝাঝ, ঝাঝ বেটারে—হিঃ—হিঃ—হিঃ—

ওমা-মা, হিঃ হিঃ হিঃ

অন্নবয়সী ছুটি বউ জল নিয়ে ফিরছে । তার চেহারা দেখে তারা হেসে লুটো-
পাটি মাচ্ছে ।

সেও হাসল । হাসল এই ভেবে তারও একদিন রূপ ছিল । দেখলে সবাই
বলত, সোনার কাতিক ।

বউদের পেছনে আসছিল এক বুড়ি । সে প্রশ্ন করল, অতো হাসি ক্যানরে
হেমডী ? হইছে কি ?

উত্তরের প্রয়োজন হল না । বুড়ির নম্বরে পড়ল । বুড়ি তাকিয়ে তাকিয়ে
দেখতে লাগল লোকটিকে ।

সে খুড়িয়ে এগিয়ে এসে বলল, ওমা খাতি দেবা চাড্ডি ?

কেডা তুই, কন থে আইছিস ?

বুড়ি সন্দিগ্ধ সুরে প্রশ্ন করল ।

আমি বুড়ি-মা ডিম্বুক । আমারে চেনবানা । অনেক দূরির রাস্তার থে আইছি ।
খাতি দেবা হুডো ?

বুড়ির সন্দেহ নাই । এবার মন ভিচ্ছেছে ।

তা পথের মধ্যে তোমার জন্মি মুড়িগুড় নিয়ে বসে থাকপে কেডা । আসো
খাতির ভিতি ।

বুড়িই ডেকে নিয়ে এল তাদের বাড়ি ।

এইনেও খাও ননি ।

বুড়ি কলাপাতায় করে চিড়ে গুড় এনে দিল । নারকালের মালায় জল দিল ।

বরাত ভাল তাই এমন আহাৰ জুটল । কাল থেকে ধরতে গেলে পেটে কিছু পড়েনি । সে খায় আর এদিক ওদিক তাকায় । সবাই অচেনা কিন্তু ঐ বুড়িকে অপরিচিত মনে হয় না । ছেলে পাড়ার কোনো বাড়িতে দেখে থাকবে । হয়ত এদিকে সুবিধা পেয়ে উঠে এসেছে । এর কাছে খবর পাওয়া যেতে পারে ।

ও বুড়ি-মা নটবর রিশিরে চিনতে ?

বুড়ি বলল, কেডা নটবর রিশি ?

ঐ যে মুচিপাড়ার ।

ওঃ নটা মুচি । তুমি তার কেডা ?

আমি ? কেউ না । চেনা শোনা ছিল, তাই ।

আহা, মুচি বেটা অনেক ছঃখু পাইয়ে নরিল ! একমাস্তর ছেলে রেল কাটা পড়ল তারপর—

কি হল, রেল কাটা পড়িল ?

হ । তা তুমি এমন কর ক্যান ?

মিরগির ব্যানো মা, ও কিছু না । কও তারপর কি !

বুড়ি গল্প পেয়ে জেঁকে বসল ।

কব আর কি । নটা নরল, ওর ছেলে মরল । বিধবা পুত্রির বউডা পর্যন্ত আত্মহাতি হল । কওয়ার আর আছে কি !

গলা দিয়ে একটা বিলী আওয়াজ বের হল । লোকটা কি কাঁদছে নাকি !

ও কি, কি হল তোমার ?

জল টুকু খেয়ে মুখ যুছে বলল, আদেখলের খাওয়া, দন আটকে আইল ।

পাতে পড়ে আছে যে সব ।

পেটে ব্যথা গো বুড়ি-মা ! এখন আর পারবো না । সেই রাত্তিরে খাব ।

বুড়ির কথা তখনও শেষ হয়নি ।

বদমায়েসরা নাগল লইল, তাই । ছেমড়ী বড় ভাল ছিল । শেষের দিকি বড় কষ্ট পাইল । আহা, কত আর কবো তোমারে ।

আর সে শুনতে চায় না । যথেষ্ট শুনেছে । তার বরাত্তে এর চেয়ে ভাল আর কি খবর মিলতে পারে । সে ত ভুত । তার আত্ম আর রক্তমাংসের অস্তিত্বও নাই । এ সংবাদের যে রচয়িতা তাকে মনে মনে সে প্রণাম জানালো ।

তা তুমি কেডা ?

বুড়ির যেন কিছু সন্দেহ হয়েছে ।

ঐ যে কলান কেউ না । আমি পরদেশী । ফোলা পাট গাতি চেন ত ? সেই খানে থাকি । আচ্ছা মা, অনেক খাতি দেছ অনেক দয়া করিছ । সেবা সেলাম তোমারে ।

বুড়ির কি হল এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল সেই কানারোঁড়ার দিকে ।

ও অক্ষয়—

লোকটি চমকে উঠল যেন ভুত দেখেছে । কাঠের লাঠি হাঁচোট খেয়ে হাঁমড়ি খেয়ে পড়ল ।

অক্ষয়রে—

এই যে, কও কি ?

বাধা উঁচু করে উঠে বসল সে । এক বুড়ো আর এক বাচ্চা ছেলে । ওরই নাম বুঝি অক্ষয় । সে হাসল । তাকে চিনবে কে ? তবু দেখ কত ভুল হয় ।

কেডারে ওখানে ?

আনি !

বুড়ো এগিয়ে এসে বলল, বাড়ি কনে ?

সন্তোষীর হাট ।

নাম ?

পাঁচকড়ি রাজবংশী ।

তা ভাল ।

বুড়ো এগিয়ে যাচ্ছিল ।

এবার সে প্রশ্ন করল, ও বুড়ো এই মুচিরা গেল কনে ?

যাবে আবার কনে । কেউ মরিছে, কেউ পলাইছে । নটা মরল, তার ছেলে মরল । ওদিক ধর হারাণ, পাঁচু এরা মরল । আর কতক জমিদারের দাপটের চোটে ছুঁচোহাটির ওপাশে, সাওস, বাসুর মার ঘাটে উঠে গেছে । গেছে আপদ গেছে, ওগে জালায় গরু গোয়ালে রাখা যাতো না ।

বুড়ো বক্ বক্ করতে করতে এগিয়ে গেল ।

এতক্ষণে পুর্বের বিলের প্রয়োজন তার শেষ হল । এবারে নিশ্চিত হল । কোনো কৈফিয়ৎ কাউকে দেবার নাই । নিজের লোকেরা কি-ভাবে তাকে গ্রহণ করবে এই নিয়ে মনে তার বহু সন্দেহ ছিল । এবার সবার কাছ থেকে সে মুক্তি পেয়েছে ! নিশ্চিত মনে নিরুদ্দেশ পথের ভাবনাহীন জীবন শুরু করবে । তার কাছে মরা আর বাঁচার প্রভেদ কিছু নাই । কুকুরের মত এখানেওখানে ঘুরবে অন্তের জন্তে । মিলবে খেয়ে বাঁচবে, না মিলবে পথের অজ্ঞাত অবহেলিত পশুর মত একদিন মরবে । যা খুশি হোক । কিছুতেই কিছু তার আসে যায় না । চিড়ে গুড় বেঁধে এনেছিল খাবে বলে । এবার সেগুলি পথের কুকুরকে দান করল । তার আবার সঞ্চয়ের আছে কি ? খুম আসছে । ঐবসাদ এসেছে সর্বশরীরে ।

একটু ঘুরিয়ে নিতে হবে । পা আর চলছে না । প্রকাণ্ড এক তেতুল গাছের নিচে সে শুয়ে পড়ল ।

খুম আসছে আবার ভেঙ্গে যাচ্ছে । কত কি অর্থহীন স্বপ্ন দেখছে । মেটে ঘরে ছোট শিশু ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে । উঠান ভর্তি লোক...প্রকাণ্ড একটা হাঙর । কে যেন কাঁদছে . কঁকিয়ে কঁকিয়ে ! কাঁদতে কাঁদতে চোখ মেলল । হাত পা আড়ষ্ট হয়ে

গেছে, কথা বলতে পারছে না। আবার তন্দ্রা আসছে। সঙ্গীদের সঙ্গে ভৈরবে বাইচ খেলছে। দূরে আর এক ডিঙ্গি তার উপর লাল চেলির ঘোমটার আড়ালে সুন্দর কচি একখানি মুখ। কিছুতেই তার নাগাল ধরতে পারা যায় না। যত জোরে ডিঙ্গি যায় ওদের ডিঙ্গি কাছে এসে আবার কলের নৌকার মত দূরে পালিয়ে যায়। এই ধরে ত এই ফসকে যায়। প্রাণপণ শক্তিতে বৈঠা চালিয়েও তাকে ধরা যায় না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘানে সমস্ত শরীর ভিলে গেছে। হাত'পা আরও অবশ। দারুণ পিপাসা পেয়েছে। অথচ পাশ ফিরবার শক্তি নাই শরীরে। কুকুরটা চিড়ে গুড় বেঁধে এবার তার পা চাটতে শুরু করেছে। দারুণ একটা ভয় এসেছে মনে, চোখ ধুলে তাকাতেও সাহস হচ্ছে না। চোখ বুজে সে পড়ে রইল। মনে হচ্ছে যত্ন যেন আসছে ধীরে ধীরে।

ও অক্ষয় ধন্যপথে থাকিস।

অক্ষয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার বাবা নটবর এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। মনে অনুশোচনা আছে। হু হাত বাড়িয়ে সে বাপের পা ধরতে গেল। পারল না। নটবর পা সরিয়ে নিয়েছে। অক্ষয় উঠে বসল উত্তেজনায। বাবাকে পালাতে সে দেবে না। বিছানাগতিতে সে উঠে দাঁড়াল। সে যে খোঁড়া তা পর্যন্ত মনে নাই। সামনে দৌড়তে গিয়ে পড়ে গেল।

পড়ে গিয়ে এতক্ষণ বাদে সন্নিহিত ফিরে পেল অক্ষয়। দিনের আলো স্তিমিত হয়ে এসেছে। সে স্বপ্ন দেখছিল।

বিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অক্ষয়। এবার কোথায় যাবে সে? মজুতখাল যাবে কি? কিন্তু কি প্রয়োজন। সবাই তাকে যুক্তি দিয়েছে। সেও সকলকে যুক্তি দেবে। সে মরেছে। তার আর পুনর্জন্মের দরকার নাই।

সামনে দিয়ে ছোট এক ডিঙ্গি বাচ্ছে।

ও ভাই ভৈরব পার করে দেবা এই কানা খোঁড়াকে।

জলে বলল, তা দিতি পারি। যাবা কনে?

ছুচোহাটি!

অক্ষয় গিয়ে ডিঙ্গিতে উঠল।

বাড়ি কনে ওস্তাদ?

সন্ন্যাসীর হাট। তোমার?

মজুতখালি।

মজুতখালি?

অক্ষয় একটু ভেবে নিয়ে বলল, পুটিরাম রিশিরে চেন?

ভাল কথা কও দেখি। একসাথে হাটবাজার করিছি। বড় ভাল লোক ছিল।

তা গেল কনে? অক্ষয়ের সুরে ব্যাঘ্রতা।

সেই যে খুনির দায়ে ফাটকে গিইল আর ফিন্নল না। বউ ত আগেই মরিছে।

অত বড় বাড়ি এখন ঝংসলে ডরিছে।

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল অক্ষয়।

জলে মাঝি এবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তাকালো। ডিঙ্গিতে কি শেষে পাগল উঠালো নাকি।

ছুঁচোহাটি নেনে অক্ষয় বাজারে ঘুরে বেড়ালো। হাত পেতে এ-দোকান ও দোকান করে কিছু খাবারও পেল। খাবার খেয়ে গেল ইস্কুলে। সেই বুড়ো ঝাউগাছটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে। ইস্কুল ঘরের হলুদ রং ফিকে হয়ে গেছে। নতুন পাকা কোঠা উঠেছে একটা। অক্ষয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখল। একদিন বিজ্ঞাপিকা করে বড় হবার চেষ্টা সে করেছিল। এই বাড়ি তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। অক্ষয় গিয়ে ঘরের বারান্দায় উঠল। আজ রাতটা তার কাটবে ভাল।

তখনও ভাল করে ভোর হয়নি। অক্ষয় এসে কাছারী ঘাটে বসল। ছোট বড় ডিঙ্গি নৌকা আসছে যাচ্ছে সওয়ারী বা মাল নিয়ে। ঘাটে বড় বড় হাটুরে নৌকা বাধা রয়েছে। তার যদি আজ একখানা ডিঙ্গি থাকত। বেশ হোত। খুশিমত জলের বুকে ঘুরে বেড়ানো যেত। যে কটা দিন বাঁচত এভাবে কাটিয়ে দিত। মানুষের সংসারে তার স্থান নাই। সে থাকতেও চায় না।

বড় একখানা নৌকা কুল যে সে লগি ঠেলে যাচ্ছে।

ও বেপারা! কিসির নাও তোমার?

ছোলা মস্তুরীর।

আসতিছ কন খে?

বড়দে-পাটনা।

যাবা কনে?

চুরের হাট।

আমারে নেবা এষ্ট। কানাখোড়া মানুষ!

হাল ধরে যে তামাক টানছিল সে অক্ষয়ের আপাদ মস্তক ভাল করে দেখে বলল, তোমার বাড়ি ইতনে না?

অক্ষয় বুঝল বিখ্যার আশ্রয় না-নিলে এদের সঙ্গ পাওয়া যাবে না। মাথা নেড়ে বলল, হ।

এবার লোকটি হেসে বলল, তাই কও, চেনা চেনা লাগতিছে। আমার শউর বাড়ি ইতনে।

অক্ষয় দিবিয় হেসে বলল, তবেত ঘরের লোক। নেও, হাত ধরে টানে উঠোও আমারে।

হু'জনে হাত ধরে টেনে তুলল অক্ষয়কে। তারপর আদর করে বসিয়ে তামাক খেতে দিল।

যাবা কনে ওস্তাদ।

চল, চরের হাটেই যাব।

নেও নেও, পান ধর। কালের বাজারে বড় উপকার করিসে তুমি। আমার মনে আছে সব।

অক্ষয় বৃহৎ হাসল। মনে মনে ভয়ও পেল। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে না যার আবার।

লোকটা স্বত্তরবাড়ির গর আরম্ভ করল। অক্ষয়ের ভাগ্য ভাল তাকে কিছু বলতে সুযোগ দিল না লোকটা।

খাল-নদী-চরের আসেপাশে কত স্মৃতিই না জড়িয়ে আছে। ঐ ও মধু খাল। তার পরেই চড়কডাঙ্গা। টাঁপাকে মেলা দেখতে নিয়ে এসে কী ভ্রমটাই না করেছিল। মনে হচ্ছে টাঁপা যেন নদীর ভেতর হাবুডুবু খাচ্ছে। তার কান্নার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে।

কত কথাই না মনে পড়ছে। সেই সব অতিপরিচিত স্থানের কিছুই পরিবর্তন হয়নি অথচ তার জীবনে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। কি ছিল আর কি হয়েছে। ভাবছে আর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। লুকোতে গিয়েও ধরা পড়েছে।

সেই ইতনের জামাই ব্যাপারী প্রশ্ন করল, চোখি হোল কি তোমার? ভারী জল গড়াচ্ছে যে।

অক্ষয় চোখের জল মুছে বলল, ঐ ত রোগ দাদা। এটা গেছে আর এটা নিয়ে আলায় পড়িছি। দিনমান ভরে কট কট করবে আর জল গড়াবে।

ব্যাপারী বলল, সব সারে যাবে। তোমারে মদনার চরে নান্নায়ে দিচ্ছি। সোজা চলে যাবা মগরা কান্ধুন্দে চিস্তামণি ঠাউরীর বাড়ি। বলবা বড়দের কেদার দাস পাঠাইছেন। ব্যস, চোখ দেখাতি হবে না, এমনি অশুধ পাবা। চিস্তামণির অশুধ কথা কবে হুদিনেই বুঝতি পারবা।

অক্ষয় এমন ভাব দেখালো যেন সে কৃতার্থ হয়ে গেছে। মদনার চরেই সে নামবে। চর আর হাট সবই তার কাছে সমান সেদিন হুপুর আর রাতে ওদের সঙ্গে দিবি ডাল ভাত খেল। রাত কাটালো নৌকায়।

পঁয়তাল বেলা দশটা এগারোটার সময় ওরা অক্ষয়কে মদনার চরে নামিয়ে দিল। চারদিক রোদ্র খাঁ-খাঁ করছে। জনপ্রাণীর মুখ দেখা যাচ্ছে না। চর ভেঙ্গে মাঠে পড়ল অক্ষয়। যতদূর দৃষ্টি যায় তার একদিকে নদীর বিস্তীর্ণ চর আর একদিকে জংলা মাঠ। দূরে বনের প্রান্তভাগ দেখা যায়। এমন নির্জন আর ধুধু-করা মাঠ সে জীবনে দেখেনি। কেদার দাস লোক ভাল। ভগবান এমন সঙ্গী মিলিয়ে দিয়েছিলেন। আদর করেছে, হুবেলা পেট ভরে খেতে দিয়েছে। তার নিজের নিরুদ্ভিতার জন্যে এই হুর্ভোগ। চোখের কষ্টের কথা না-বললেও চলত। চলতে কষ্ট হচ্ছে তবু অক্ষয় প্রাণপণ শক্তিতে এগিয়ে চলল।

বন পেরিয়ে কাঁচা সড়কে গিয়ে উঠল অক্ষয়। হাঁটুটা বখায় টন টন করছে। একটু বসে জিরিয়ে না-নিলে টলে পড়বে। পথের পাশে ঘাসের উপর সে ধপ করে বসে পড়ল। গাছের ছায়ায় বাতাসে প্রাণ জুড়ালো।

গরুর গাড়ী ভতি খেজুর গুড় চলেছে।

গাড়োয়ানকে অক্ষয় জিজ্ঞাসা করল, এ রাস্তা কনে-গেছে ভাই।

গাড়োয়ান গড় গড় করে বলে গেল, সোজা ধরে বা দিকি গেলি মগরা কান্ধুন্দে, নন্দনপুর, কেওটখালি। ডানি যাও ছুতোখালি, আধারো খাদি, চন্দনপুর, চরেরহাট।

আসতিহু কনখে?

কেশবপুর ।

যাবা কনে ।

চরের হাট । ভূমি ?

আমিও যাব চরের হাট । তবে তোমার গাড়ায়ে বোঝাই ।

হ । তা হাটে চলে যাও । কোরোশ পাচেকের পথ হতি পারে ।

হাঁটা ছাড়া আর গতাস্তর আছে কি । সন্ধ্যার সময় অজানা গ্রামে চুকলে লোকে নানা সন্দেহ করবে । দিনের আলোয় ত সব পরিষ্কার । ভিক্ষুক সে । চাই কি বরাতে থাকলে দিব্যি ভাল এক পেট খাওয়া যাবে । রাত কাটাবার পক্ষে অবিশিষ্ট হাট বাজারই ভাল । অক্ষয় সোজা গিয়ে ডান দিকে মোড় ঘুরল । উদ্দেশ্য কিছুই নয় । নেহাৎ খেয়াল ।

ছুতোরখালি বাজারে পৌছতেই বেলা অনেক হয়ে গেল । সেখানে এক গোয়ালার বাসায় ঘোল আর ভাত খেল । রাত কাটালো মেছোহাটায় । ভিক্ষেও গোটাংশেক পয়সা মিলেছে । পরদিন বাজারে মজ্জ্বল ছিল । সেখানে খিচুরী খেয়ে হুপুরে গোয়ালার সঙ্গে ভিড়িতে তেরোবাঁকির চরের হাটের দিকে রওনা হোল ।

চরের হাট দেখনি কোনোদিন ?

না ।

বাড়ি কনে ?

সন্ধ্যাসীর হাট ।

হুঃ, ছুচো আর হাতী । চল, হাট করে কয় দেখবা ।

(আগামীবারে সমাপ্য)

হে বিদেশী কুল প্রসঙ্গে

বিশ্বের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য ভাষার কাব্যসাহিত্য থেকে বাছাই কবিদের রচনা আমাদের বাংলায় ভাষান্তরিত করার কাজে কবি বিষ্ণু দেব বহুদিনের পরিশ্রম ও একান্ত উৎসাহ বুদ্ধিভীষী ও বিদগ্ধ বাঙালী পাঠকের চিন্তা ও মননকে বিদেশী সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ও ভাবধারণার সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার কাজে সবিশেষ সাহায্য করে আসছে। কথাটা কিছুকাল থেকেই উপলব্ধ। তবু অধুনা পুরোনো কথাটারই পুনর্বার গভীর উপলব্ধির প্রয়োজন; হেতু, বিষ্ণু দেব 'হে বিদেশী কুল'-এর প্রকাশ। এ-সংকলনে তাঁর দীর্ঘসময়ব্যাপী বহু বিদেশী কাব্য পাঠের একটি স্ফূর্তি, প্রায় ধারাবাহিক ইতিহাসের সমাবেশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের সজাগ দৃষ্টি যেমন প্রিলিউড-এর অতীব সুখপাঠ্য অনুবাদে এলিয়টের প্রতিভাকে আবিষ্কারের কারণ, সূর্যকান্তনাথের এলিয়ট সম্পর্কে ঐতিহাসিক রচনায় (বিষ্ণু দেব লেখায় যার একাধিক উল্লেখ) যেমন এ-দেশে এলিয়ট চর্চার সূত্রপাত, তেমনি বোধ করি এলিয়টের কাব্যসাহিত্য থেকে বিষ্ণু দেব একনিষ্ঠ অনুবাদ-অনুশীলন বাঙালী পাঠকের বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার ঘটনা। রবীন্দ্রনাথে যার আকস্মিক সূচনা, বিষ্ণু দেব নিয়মিত অনুশীলনে হয়তো তার সহজ স্বাভাবিক পরিণতি। এ প্রসঙ্গে মনে হয় জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরীর ফরাসীচর্চা তাঁদের উত্তরসাধকদের হাতে অপরিণত থাকেনি। বাঙালী কবির ফরাসী চর্চা যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কতো আশাবহ হতে পারে কবি অরুণ মিত্রের সাম্প্রতিক রচনা তার উত্তম উদাহরণ।

হে বিদেশী কুলের সবচেয়ে দীর্ঘ অংশ জুড়ে আছে এলুয়ার্-এর কবিতাগুচ্ছের অনুবাদ। এ-অনুবাদ স্বধন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন, এলুয়ার্-এর রচনার ইতিহাস ও পদ্ধতি সম্পর্কে অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত অথচ যথেষ্ট মূল্যবান একটি ভূমিকাও ছিলো। ভূমিকাটির উপস্থিতির প্রয়োজন ও গুরুত্ব এখানেও যথেষ্ট ছিলো, মনে হয়। এলুয়ার্-এর কবিতাগুচ্ছের অনুবাদ প্রসঙ্গে ফাদার ফালোঁর সেই রচনাটির কথা উল্লেখ করতে হয়। তাঁর লেখায় বিষ্ণু দেব এলুয়ার্ অনুবাদে সাফল্য স্বীকৃত। আর তা'ছাড়া অনুমানে মনে করি, এলুয়ার্-এর অনেক কবিতারই অনুবাদে তিনি আসল রচনার নিকট স্পর্শ পেয়েছেন। উদ্ধৃতি হিসাবে আমার সহজে মনে আসে

যদি তুমি ভালোবাসো তবে ঐ মেঘ
ছেয়ে দেবে সবকিছু ছায়ায় ছবিতে
বসন্তের রক্ত তার
হাসিতে মেলায় তার স্বর্ণ ওষ্ঠাধর
অশ্রুতে মেলায় তার অনন্ত নয়ন
প্রবল আবেগ আনে পলাতক পায়ে

ইত্যাদি অংশ। প্রেমের গভীরতা ও নিবিড় আন্তরিকতার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জননয় অভিব্যক্তিই যেখানে কথা, সেখানে বিষ্ণু দেব গাফল্য প্রায় শতাংশে নিশ্চিত। নুই আরার্গার বহুপাঠিত স্বদেশ আমার নোকা নোড়রহীন বা বাতাসে বিষাদ হারায় বিশ্বরণের মতো সুর যেন এক অনন্ত বিস্তার, ও কম সুখপাঠ্য নয়। অনুবাদকের যথাপ্রাপ্য সুর্যোগের অতিরিক্ত কি গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে অল্প থেকেও এটুকু বলা যেতে পারে, অনুবাদকে যদি দারিদ্রপূর্ণ সাহিত্যকর্ম বলে মেনে নিতে বাধা না-পাকে তো আরার্গার স্বাধীন এলাকায় আমাদের অনুবাদ-সাহিত্য প্রায় অনবদ্য।

জর্মান বা ফরাসী কবিতার নির্ভরযোগ্য সমালোচনা কেউ আমার মতো নিতান্ত সাধারণ পাঠকের (বহুভাষায় অপ্রভা হেতু) কাছে প্রত্যাশা করেন না, এ-ধারণাবশেই কের সাহস করে এই নির্ভয় উক্তি করছি, নিষ্ঠাবান যথার্থ কাব্যানুরাগীদের অনেকেরই হায়নের সুনির্বাচিত অংশগুলি ভালো লাগবে। বিশেষ করে চতুর্থাংশে, শুরু যার হেনেছে তারা অনেক আলা-য়, বা পঞ্চমাংশ, যার প্রথম স্তবক

পুরানো স্বপ্ন আরবার কথা বলে :

চৈতালী রাতে যৌবন-জ্যোৎস্নায়

আমরা হৃদয়ে দিন্‌ডেন-তরুতলে

অমর প্রেমের শপথে বাতাস ছায়।

এখানে কিন্তু সকল সময়ে এ-কথাটা মনে রাখতে হবে, বিষ্ণু দেব অনুবাদপদ্ধতিতে তার কাব্যরীতির আপন বৈশিষ্ট্যগুলি সবই ধরা পড়ে। যেমন তাঁর শব্দচয়ন ও শব্দতৈরী, বা ছন্দের কয়েকটি অভিনব বাঁধুনি। যারা এলুয়ার বা আরার্গার, ও হায়নে বা রিল্‌কের মূল রচনা পড়েছেন তাঁদের কানে এইসব বিশিষ্ট কবিদের রচনার শব্দের ধ্বনি ও ছন্দের সংগীত কি ভাবে এসেছে আমার পক্ষে তার অনুমানও কঠিন। শুধু বিচার করতে পারি যে-অনুবাদে মূল রচনার মহত্ব ও মাধুর্য পাঠকের কল্পনাকে বিস্তার দেয়, পাঠককে আসল রচনার প্রতি কোতুহলী ও তৃপ্ত করে তোলে, সেই অনুবাদ অনুবাদকের কর্মবেশি সাফল্যেরই সূচনা করে। হায়নের কবিতার মাধুর্য ও মহত্ব একাধারে এই অনুবাদ-অংশগুলিতে উপস্থিত। ঠিক একই কারণে প্রায় রিল্‌কের শরৎ কবিতা আমার বরাবরই ভালো লেগেছে। মেয়েরা কবিতাটির শেষ স্তবকে রিল্‌কের নৈঃশব্দপ্রিয়তার পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি পাওয়া যায়। কবির মেঝাজের এমন নিখুঁত প্রতিলিপি যে-অনুবাদে আবিষ্কার করি সেই অনুবাদের কর্মীকে তাঁর যথাযোগ্য প্রাপ্য সম্মান না-দিয়ে উপায়ত্তর দেখি না। কারণ উল্লিখিত অংশে রিল্‌কে যে নৈঃশব্দপ্রিয়তাকেই ব্যক্ত করতে চাইলেন তা অনুবাদে স্পষ্টই ধরা পড়ে। অনুবাদ তাই বেশ সবল ও সক্ষম, অনুমানে মনে হয়।

ইংরেজী কবিতার অংশে আছে শেক্সপিরর থেকে সেদিনের সিডনি কীজ পর্যন্ত। আরো আগে আছে চসর, ড্রেটন ও স্পেন্সর-এর কবিতা। ড্রেটনের জনপ্রিয় Since ther's no helpe, Come let us kisse and part-এর সবচেয়ে কঠিন অংশের অনুবাদের বিচার পাঠক নিজেই করুন—

Now at the last gaspe, of loves latest Breath,
When his pulse fayling, Passion speechless lies,
When Faith is kneeling by his bed of Death,
And Innocence is closing up his Eyes,

এখন প্রেমের এই অস্তিমের নাভিপাশ কালে
যখন বাসনা নূক, নাড়ী ক্ষীণ চরম শয্যায়,
যখন আনত নিষ্ঠা প্রার্থনায় মরণ প্রাকালে,
এবং সারল্য তার চোখ ছুটি বোড়ে নিরুপায় ।

শেক্সপিয়রের চতুর্দশপদী ক'টির অনুবাদ পড়তে গিয়ে সর্বপ্রায়ে যা মনে হলো তা এই, এখানে সনেটের আঙ্গিককে কোথাও ক্ষুণ্ণ করা হয়নি ; আর আঙ্গিকের ধর্ম রক্ষাই বোধ করি এ-অনুবাদের সবচেয়ে কঠিন দায়িত্ব । নাট্যকার শেক্সপিয়রের এই বিশিষ্ট কবিতাবলীর শরীর ও আত্মা তাই ভাষান্তরণেও বহুলাংশে অক্ষত থেকেছে । Rough winds do shake the darling buds of Maie-র অনুবাদে যখন পাই : চৈতালির রুচ বায়ু হানা দেয় মাধবীবিপিনে, বা Nor Mars his sword-এর বাংলায় : তখনও চণ্ডীর খড়্গ অথবা If this be error and upon me proved-এর ভাষান্তরণে : এ যদি ভ্রান্তিই বলো, আমার সাদাকে বলো কালো, তখন যদি নিম্নেকে একান্তই কবিতার পাঠক মনে করি তো মনে নিই শেক্সপিয়রের এ-লেখ্যগুলির মেজাজ ঠিকমতো উপলব্ধি করার এ-ছাড়া অন্য কোনো অবাস্তব পন্থা নেই । এমন অনেক অংশে পাঠকের আপত্তির হেতু থাকতে পারে না এ-কথা যেমন জোর করে বলতে পারি না, তেমনি কারণও একটা খুঁজে পাই হয়তো, এখানে ব্যক্তিগত ভালোমন্দলাগা বা রুচির প্রাধান্য কি যুক্তি-জিজ্ঞাসার চেয়ে প্রবল ?

আবার ব্লেকের কবিতায়

For where-e'er the sun does shine

And where-e'er the rain does fall-এর বঙ্গানুবাদ পাই :

কারণ যেখানে সূর্য ছড়ায় সোনা

এবং যেখানে জীবনের ধারা ঝরে—বা

That flies in the night,

In the howling storm-এর অনুবাদ পাই

নিশাচর যেবা ঝঞ্ঝার হাহাকারে ।

ব্যক্তিগত রুচির রকমফের সত্ত্বেও পাঠক নিশ্চয় মানবেন ঐ দুটি কবিতারই অনুবাদ ভুলনাহীন । দি সিক রোজ-এর অনুবাদ আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও বেশ আগ্রাসসাধ্য । এরপরই নাম করতে হয় ডাউনিং-এর Meeting at Night ও Parting at Morning কবিতা দুটির । বিশেষ করে মিটিং এ্যাট নাইট-এর মতো হুজুহ কবিতাকে তিনি অনুবাদেও এমন যথায়থ রাখবেন তা পাঠকনাত্রেয়ই আশাতিরিক্ত । ইয়েটসের কবিতার কঠোর প্রশাস্তি ও সংগীতের ধীর লয় অনুবাদগুলিতে কি ঠিক পাওয়া গেল ? এর ঘরে হয়তো দায়ী মূল রচনার নিত্যন্ত নূক অসামান্যতা ।

অবিস্ত্রি ব্যক্তিগত ভালোলাগা বা না-লাগার ওপর ভিত্তি করেই বলা চলে কথাটা, এও ঠিক। আকাশজড়ানো থাকতো লেখাটি (সহজবোধ্য বলেই হোক বা আমার বিশেষ চেনা কবিতা বলেই হোক) অনেকবার পড়েছি। বিশেষ করে

কিন্তু আমি যে দীনদরিদ্র, পসরা শুধুই স্বপ্ন,
স্বপ্ন আমার দিলাম তোমার পায়ের তলায় বিছিয়ে
(But I, being poor, have only my dreams ;
I have spread my dreams under your feet.)

ব্লেকের দি সিক রোজ-এর অনুবাদ যেমন নিপুণ মনে হয়েছে, তেমনি মনে হয়েছে পো-র হেলেনের প্রতি (টু হেলেন)। পাঠক এখানেও মিলিয়ে পড়তে পারেন

Lo ! in you brilliant window niche
How Statue-like I see the stand,
The agate lamp within thy hand !
Ah, psyche, from the regions which
Are Holy-Land !

ঐ ! দেখি বাতায়নবেদীতে উদ্ভাস
আভঙ্গে খোদাই স্তম্ভ স্থির মূর্তি তুমি
মর্মরের দীপ জ্বলে করপুট চুমি।
আহা সাইকি ! যেই দেশে তোমার নিবাস
সে যে পুণ্যভূমি।

হুইটম্যানের কবিতার প্রাণাবেগ বা উদাত্ত কণ্ঠস্বর অধিকাংশ অনুবাদগুলির মধ্যে খুঁজে পেনুম না। নিজের সত্যার গান করি বা জন্তুদের সঙ্গে, বলা বাহুল্য, এ-ছাড়া অনুবাদ আসল কবিতার মতো আমাকে নাড়া দেয়নি। হুইটম্যানের কবিতার বিশিষ্ট লিখনপদ্ধতি (আমি দীর্ঘ-দীর্ঘ গল্পধর্মী লাইনগুলির কথা উল্লেখ করছি) কি করে আমাদের গল্পকবিতার ভিত্তিতে বাঁধা যায় তাও এখানে অতিশয় বিচার্য। ব্যাপক গভীর আলোচনার মধ্যে না-গিয়েও এখুনি যা মনে হয় তা হলো, হুইটম্যানের কবিতার অকুরন্ত শক্তি বোধহয় তরল ছন্দ পরিবর্তনের মধ্যেই। আর হুইটম্যানের কবিতার নিজস্ব ঋজুতা খুব বেশি করে চোখে পড়ে এরই মাধ্যমে।*

ওয়ালেস্ টীভু নস-এর অধুনা বহু প্রচারিত The House was quiet and the world was calm-এর অনুবাদ ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে আমার যে আপত্তি ছিলো, বিষ্ণু দে সম্পর্কেও প্রায় সেই আপত্তি উঠছে।

বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে ছন্দের অস্বাভাবিক তারল্য যেন টীভু নস-এর কবিতার নামকেই উপহাস করেছে মনে হয়। বিষ্ণু দে কবিতাটির মেজাজের খুব কাছাকাছি

* বিষ্ণু দে সাহিত্যের ভবিষ্যত প্রসঙ্গে বাংলা গল্পকবিতা নামের প্রবন্ধে লিখছেন
.....পাউণ্ড-এর গল্পকবিতা কবিতাপন্থী আর হুইটম্যানের কবিতা গল্পপন্থী বলতে হয়।

থাকতে চেয়েছেন, স্টেট ক্যাটনসফিয়ার-এর যাতে কোনো বিঘ্ন না-ঘটে এই উদ্দেশ্যে সম্ভবত । কিন্তু দি রিডার বিকেন দি বুক, সাবধানতা সত্ত্বেও, কি করে হয়, পাঠক হয়ে গেল বই ? এ-কবিতার অনুবাদের দুর্ভাগ্যতা কোনো বুদ্ধিমান পাঠকই অস্বীকার করতে পারেন না । আবার কোনো কোনো কবিতার বিশেষ কোনো পংক্তি বা শব্দবিশেষ আদৌ অনুবাদে আসে কিনা তাও প্রশ্ন । কিন্তু দাবীও থাকে পাঠকের ক্ষেত্র বিশেষে । অনুবাদক এখানে বিফল দে ।

অথচ কার্ল শাপিরোর মতো অতি আধুনিক কবির হোম কামিং কবিতার অনুবাদও অনেকাংশে বিচক্ষণ ও বেশ সাবলীল ।

উদ্বেগের ভিজে ভিজে ফালি কুরে কুরে বেয়ে
অসৈকত সমুদ্রভঙ্গ আর গাংশালিকের রক্ষীদল সঙ্গে
নিঃশব্দ রহস্যের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রবেশ করি
স্বদেশের সীমান্ত জলরাশিতে
Gnawing the thin slops of anxiety,
Escorted by the ground swell and by gulls.
In silence and with mystery we enter
The territorial waters

উপসংহারের উপাস্তে আসার প্রাক-মুহূর্তে স্মরণ করি লোরকার সেই ছোট কবিতাটি, যেখানে দেখি ভোরের আলোয় ছুরিকাহত মানুষটির সেই করুণ হৃদয়দীর্ঘ দৃশ্য । অনুবাদ প্রাণবন্ত ।

অমিয় চক্রবর্তীকে কোনো এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

সাহিত্যের প্রাণধারা বয় ভাষার নাড়িতে, তাকে নাড়া দিলে মূল রচনার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় । এ রকম সাহিত্যে বিষয়বস্তুটা নিশ্চল হয়ে যায়, যদি তার সম্ভাবনা না থাকে । এবারে আমারই পুরানো তর্জমা ঘাঁটতে গিয়ে একথা বার বার মনে হয়েছে । তুমি বোধহয় জানো বাছুর মরে গেলে তার অভাবে গাভী যখন দুধ দিতে চায় না, তখন মরা বাছুরের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে খড় ভর্তি করে একটা কৃত্রিম মূর্তি তৈরী করা হয়, তার গন্ধে তার চেহারার সাদৃশ্যে গাভীর স্তনে দুগ্ধক্ষরণ হতে থাকে । তর্জমা সেই রকম মরা বাছুরের মূর্তি—তার আহ্বান নেই, ছলনা আছে । এ নিয়ে আমার মনে সজ্জা ও অনুতাপ জন্মায় । সাহিত্যে আমি যা কাজ করেছি তা যদি ক্ষণিক ও প্রাদেশিক না হয়, তবে যার গরজ সে যখন হোক আমার ভাষাতেই তার পরিচয় লাভ করবে । পরিচয়ের যদি-বিলম্ব ঘটে, তবে যে বঞ্চিত হয় তারই ক্ষতি, রচয়িতার তাতে কোন দায়িত্ব নেই ।

অতএব অনুবাদ অনুবাদই । তবু অনুবাদকের ভূমিকা যে সাহিত্যিকর্মে গৌণ নয়, তাও চিন্তনীয় । রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষী শিল্পী সাহিত্যিকদের কণ্ঠে নিজেদের

রচনা সম্পর্কে ঐ জাতীয় উক্তি অত্যাশঙ্কিত অশোভন নয়, তবু ওই সব কথাই যদি সর্বাংশে সত্য হতো তবে বিশ্বের সেরা রচনা সমূহ এক বিরাট পাঠকসম্প্রদায়ের (এমনকি যথেষ্ট শিক্ষিত) কাছে শুধু অপঠিত নয় অজ্ঞাতও থাকতো হয়তো-বা । আমাদের সাধ্য যেহেতু সাধের ভুলনায় নিতান্ত স্বল্প, সে-কারণে কবি বিজ্ঞদের নিরলস পরিশ্রমলব্ধ এই অল্পবাদের কাছ বিশ্বসাহিত্যের ক'টি সিংহদ্বার আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধেছে ।

জ্যোতির্ষয় গঙ্গোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান ফোক লোর, ভল্যুম ১, ২ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৪৬ ।
১৪৪ বি, আন্ততোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা ২৫ থেকে প্রকাশিত ।

নামেই প্রকাশ, আলোচ্য পত্রিকাটি লোকসাহিত্য সম্পৃক্ত । ভারতের লোকশিল্প, লোকগাথা, লোকাচার বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় এটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা হয়ে আগামী বছর থেকে নিরমিতভাবে বেরুবে ; আপাতত এর দ্বিতীয় সংখ্যা বেরিয়েছে, সাতম্ন সালে আরো দুটি সংখ্যা বেরুবে, যে এবং সেপ্টেম্বরে, সম্পাদকদ্বয় জানাচ্ছেন । পত্রিকাটির পেছনে আছেন এ-সব বিষয়ে তত্ত্বপূর্ণ পণ্ডিতগণ । সুতরাং পত্রিকাটির ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, মূল্যবান এবং নির্ভরযোগ্য ।

বর্তমান সংখ্যায় যে রচনাগুলি পরিবেশিত হয়েছে তার সবগুলিই আপন-আপন অভিজ্ঞতা-প্রসূত বিশেষজ্ঞদের লেখা । এটিতে আছে যথাক্রমে গোরক্ষনাথের কাহিনী, লোকসংস্কৃতির স্থায়িত্ব, কাঁথা, আমেরিকার লোকসংগীত, 'জনগভারুর গীত' নামক অসমীয়া লোকগাথা, সাপ সম্পর্কে বাংলার লোক-সংস্কার, উড়িষ্যার লোকগাথা, লক্ষ্মী ব্রতকথা, ভোজপুরীর লোকসংগীতে ময়ূর, গো-বন্দনা উৎসব, উত্তর প্রদেশের একটি উপকথা, ত্রিপুরার রিয়ারদের একটি কিংবদন্তী, বাংলাদেশে নবজাতকের মঙ্গলকৃত্য, বাংলা লোকগাথার স্তম্ভ সূর্যের কাহিনী, লোকশিল্প ও খেলনাপাতি, পশ্চিমবাংলার প্রত্যন্তভাগের টুঙ্গ গান আর ব্রতানুষ্ঠান, বাংলার পটুয়া-গীত এবং পল্লীশিক্ষা, সাঁওতাল-ওরাওঁ ইত্যাদি আদিবাসীদের রীতিনীতি ।

পত্রিকার একটি সংখ্যায় এত বিষয়-বৈচিত্র্যের সম্মিলন করতে পেরে সম্পাদকদ্বয় পাঠকসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন সন্দেহ নেই ।

দক্ষিণারওণ মিত্র মজুমদার সংকলিত লক্ষ্মী ব্রত-কথার ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে মূল বাংলা রচনাটাও দিয়ে দেবার ফলে বাঙালী পাঠকদের উপরি-লাভ হবে । আরো কয়েকটি রচনার সঙ্গেও এমনি কিছু কিছু মূল রচনা দেয়া হয়েছে ।

অবিশিষ্ট সম্পাদকদের একটা ক্রটির কথাও উল্লেখ না ক'রে পারছি না । ছাপার ভুল দেখা গেল প্রচুর । শুধুমাত্র বানান ভুলই নয়, শব্দের বিকৃতি, এক শব্দের বদলে অন্য শব্দ—সবই আছে । এ-জাতীয় পত্রিকায় এই ধরনের ক্রটি অত্যন্ত নিন্দনীয় । সম্পাদকেরা এ-বিষয়ে ভবিষ্যতে সাবধান হবেন আশা করি ।

গোতম গুপ্ত

ভাই ভাই : শ্রীমতী বন্দনা রায় সম্পাদিত । প্রকাশক : দীপজ্যোতি প্রকাশনী, ১৩১, বোম্বার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২, দাম চার টাকা ।

আলোচ্য বইখানি রচিত হয়েছে ছোটদের জন্যে । বইখানির পরিকল্পনা অভিনব । বিষয়বস্তু চমকপ্রদ । রূপসজ্জা মনোমুগ্ধকর ।

এই বইখানির অভিনব পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্যে বন্দনা রায় অভিনন্দনযোগ্য ।

একটি সফরকে কেন্দ্র করে রচিত এই বই । বুলগানিন-ক্রুশ্চেভ-এর ভারত সফর ;—যা ঐতিহাসিক রূপ পেয়েছে ভারতবাসীর চিত্তে । সেই সফরকে, সেই সফরের আশ্চর্য স্মৃতিকে ছোটদের মন-ভোলানো ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । লিখেছেন মিহির সেন রূপকথার চণ্ডে আশ্চর্য নিষ্ঠি ভাষায় । আর লেখাটির মাঝে পাতায় পাতায় অল্প রঙীন ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । কয়েকটি ছবিকে কেটে এমন জীবন্ত রূপ দেওয়া হয়েছে (বিদেশী বইয়ের অনুকরণে) যে ছোটরা তা দেখে উল্লসিত হবেই, বিশ্বয়ভরা কৌতুক নাচবে তাদের ছোট ছোট চোখে । বইখানির শোভা তাই আরো বৃদ্ধি পেয়েছে তাৎপর্যবহ হয়ে । প্রামাণিক ছবিগুলি (আলোকচিত্র) সংগৃহীত হয়েছে বিভাস সোন ও প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর কাছ থেকে । আর অঙ্গসজ্জার কাজ করেছেন শিল্পী সন্নর দে ও প্রভুল বন্দ্যোপাধ্যায় । রঙীন কালিতে ছাপা আর রঙীন ছবিতে মোড়া লোভনীয় এই বইখানি ছোটদের কাছে যে আদর পাবে একথা জোর করেই বলা যায় ।

ইউরোপ ও আমেরিকায় ছাপা ছোটদের রঙীন গল্পের বই আনাদের বাজারেও অনেক পাওয়া যায় । কিন্তু এ ধরনের বিষয়বস্তুর উপর কোনো বই দেখা যায় না । দীপজ্যোতি প্রকাশনী অভিনবত্বের প্রথম কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন ।

বইটির প্রচ্ছদও হয়েছে অত্যন্ত মনোজ্ঞ, ছাপা বাঁধাই চমৎকার । এ ধরনের বই ছাপতে যা খরচ হয় সে-হিসাবে চার টাকা দাম বেশি নয় । বইখানি দেখলেই বুঝবেন উপহার পাবার কিংবা দেবার মত বই কি না ।

নীলরতন মুখোপাধ্যায়

সহস্ররণ : অননুয়া দেবী, প্রকাশক : মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২, দাম দু'টাকা বারো আন ।

এক জমিদার বংশের কাহিনীতে তিন পুরুষের ঘটনা বিধৃত হয়েছে । বংশের তৃতীয় পুরুষ অক্ষয় মিত্র, কাহিনীর নায়ক । এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই আলোচ্য উপন্যাসের আখ্যানভাগ রচিত হয়েছে ।

প্রথমটায় খট্কা লাগে উপন্যাস পড়ছি না আত্মজীবনী পড়ছি । কারণ গল্পের নায়ককে প্রথম পুরুষ দাঁড় করিয়ে কাহিনীটি ব্যক্ত করা হয়েছে । কাহিনীর শুরুতে নতুনদের স্বাদ পাওয়া যায় । কিন্তু ঘটনার সাথে সাথে যে চরিত্রগুলি আত্মপ্রকাশ করে, কাহিনীর সঙ্গে সেগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত না-হওয়ার উপন্যাসের আসল বক্তব্য কি তা শেষ পর্যন্ত অপরিষ্কারই থেকে যায় ।

এই উপন্যাসে স্বল্প পরিসরের মাঝে সেলিনা চরিত্রটিকে লেখিকা এঁকেছেন বেশ ভাল। কিন্তু কাহিনীকে সম্বন্ধ করার দিক থেকে চরিত্রটির কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয়নি।

উপন্যাসে বক্তব্যের মাধ্যম হল চরিত্র। বক্তব্য পরিষ্কৃত করতে হলে চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে হয়। স্থান-কাল-পাত্র অমুখ্যায়ী সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের আচার-আচরণের সম্ভাব্য বাস্তবতা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান সংগ্ৰহ করতে হয়, তাদের সমস্ত কাজকর্মের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার কারণগুলি সম্পর্কে সচেতনতারও প্রয়োজন। রসসাহিত্য সৃষ্টির কাজে এ অত্যন্ত সাধারণ জ্ঞান। আলোচ্য উপন্যাসে এই মূল ভিনিসগুলির অত্যন্ত অভাব ঘটেছে। যার জন্তে নায়কের চরিত্রে প্রকৃতিগত স্বন্দের বিশুমাত্র আভাস নেই, যেটা খুবই স্বাভাবিক এই ধরনের চরিত্রে। অস্বাভাবিক চরিত্রের মাঝেও প্রাণময়তা উৎসারিত হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা ভিনিস বোঝা যায় যে, লেখিকার রচনায় আন্তরিকতা আছে।

বইটির মুদ্রণ ভালো। প্রচ্ছদও সুন্দর।

শকুন্তলা সেন

॥ গুরুদাস-ভট্টাচার্য ॥

॥ আধুনিক বাংলা কবিতার গতি ও প্রকৃতি ॥

গুরুদাস ভট্টাচার্য

রবিবার, বারোই মে, উনিশশো সাতান্ন । ‘কবিতামেলা’র তৃতীয় দিনের প্রাতঃকালীন অধিবেশন । “আধুনিক বাংলা কবিতার গতি ও প্রকৃতি ।” বেলা তখন এগারোটা পনেরো । সূর্য কপালবরাবর বাতাসের দেহ অরতপ্ত, রবীন্দ্রভারতীভবন অলস উদ্বন । পাদপ্রদীপের সামনে সমবেত কবি ও সমালোচকবৃন্দ । মুখে ঘামের বড়ো বড়ো ফোঁটা মনে পরম উৎসাহ । সমাগত দর্শক ও রসজ্ঞ পাঠকবৃন্দের অনেকে উঠে এসে ঘিরে বসেছেন চারপাশে সমান আগ্রহ নিয়ে । আধুনিক বাংলা কবিতা আলোচনায় একটি উজ্জ্বল দিন, একটি আশাবাদী গতিরেখা ।

আলোচনার উদ্বোধন করে গুরুদাস বসু বললেন, কবিতারচনা একটি জৈববৃত্তি, খেয়ালবুদ্ধির স্বরাপাতা নয় ; এই মূল কথা মনে রেখেই আমাদের আলোচনায় অগ্রসর হতে হবে ।...আধুনিক বাংলা কবিতার গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে ভূমিকায় প্রথমে বলতে হয়, ‘কাল’ আধুনিকতার নিরিখ নয় । আজ যা সৃষ্টি হচ্ছে একমাত্র তাইই আধুনিক, একথা বলা চলে না । আধুনিকতা সব কালেই প্রকাশ পেয়েছে । যুগধর্মকে প্রকাশ করাই আধুনিকতা । প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যরচনার মধ্যেও আমরা আধুনিকতার পরিচয় পাই । আজকের বাংলা কবিতার আধুনিকতার স্বাক্ষর যুগের ধর্মের সঙ্গে তার আত্মীয়তায় । তাই দেখতে পাই, তার বিষয়বস্তু প্রসারিত জীবনের গভীরে ও ব্যাপকে । যুগের বেগকে সে ধরে রাখছে তার নিজস্ব আধারে । চিরন্তন আবেগকে ব্যক্ত করেছে নতুন নতুন রূপে । আধুনিকতার সম্মান তাইই । তাই এর প্রকরণও বদলে যেতে বাধ্য । তার ছন্দ ও অলংকারে আসে নতুনত্ব, নবীন বেশ । তাকে বুঝতে গেলে নতুন মনেরও দরকার । সেই নতুন মনকে গ’ড়ে উঠতে হবে । কিভাবে, তাইই আমাদের আলোচনা করে দেখতে হবে ।

এরপর রাম বসু বললেন, আমার মতে, শুধু চিরন্তন আবেগ নয়, বাস্তব জীবনের সাময়িক চেউগুলিও কবিতার উপাদান । সাহিত্যে প্রেম ও পলিটিক্‌স্ দুইই আছে ও থাকবে । বদলেছে ভংগি, প্রকাশের দিক থেকে । যুগধর্ম, যুগের কথাই বলছি, আমার ও অপরের চিন্তা-ভাবনা এসে মিশছে কবিতায় । ব্যক্তিভেদে ভংগি বিভিন্ন হয়ে উঠছে । একটা কথা ভাববার আছে বলে মনে করি । দেশ ঐতিহ্য থেকে আমরা অনেকটা সরে এসেছি । প্রাচীনের সঙ্গে আমাদের যোগ বিচ্ছিন্ন । হতে পারে, আমাদের কনসেপ্‌সনে কোন গোলমাল আছে । যার ফলে, পাঠকের কনসেপ্‌সনের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান খুব বেশি হয়ে উঠেছে । তাই তাদের আগ্রহ নেই আধুনিক বাংলা কবিতার প্রসঙ্গে ।

সুনীল চট্টোপাধ্যায় বললেন, যে আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে আমরা আলোচনায় রত হয়েছি, কালের দিক থেকে তা রবীন্দ্রোক্তর যুগের কবিতা । শুধু

সময়ের ব্যবধান অবশ্য নয়। রবীন্দ্রযুগের সঙ্গে এর পার্থক্যও আছে। কিন্তু কোথায় ? পার্থক্য চৈতন্যের। রবীন্দ্রনাথে ও তাঁর আশেপাশে যে চৈতন্য ছিল, সেখান থেকে আমরা অনেক সরে এসেছি। অথচ, বিগত যুগের বোদলেয়র, হাইনে, রিল্কে'র বিদেশী মেজাজের সঙ্গে আমাদের মিল আছে। এর কারণ, আমাদের চারপাশে রয়েছে অবশ্যের চেতনা এবং 'নবজাগরণের স্ফোতনা'। আমাদের চিন্তায় এবং সেইসঙ্গে আধুনিক কবিতায় এসেছে অশুভের চেতনা। আশ্বকের হৃদয় শুভ ও অশুভের। এই হৃদয় সত্য, কিন্তু একে অতিক্রম করতে হবে আমাদের। কয়কে জয় ক'রে আনতে হবে অস্তরীশ্বের মাধ্যমে। তবেই পথ মিলবে, নইলে ধ্বংস অবশ্যভাবী। আধুনিক বাংলা কবিতার এই প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হলে তবেই তার গতি হবে সহজ ও সুস্থ।

তারপর বললেন অতীন্দ্র মজুমদার, আমার বিশ্বাস, আধুনিক কবিতা সর্বত্রগামী। পারিপার্শ্বিক ছনিয়ার সমস্তা চেটে তুলছে কবিতায়। ফলে, তার মধ্যে সারল্য ও স্বচ্ছতার অভাব এসেছে। যতদিন না পরিপার্শ্ব সহজ ও সুস্থ হবে, ততদিন আধুনিক কবিতার জটিলতা ও সমস্তা থেকে যাবে। জীবনে যে বিরোধ, কাব্যে তা রূপ নিচ্ছে। আবার এই জাগতিক সমস্তার সমাধানে জীবনের যে শক্তি ক্রিয়া করছে, কাব্য তাকে কতটা সহায়তা দিতে পারে, তা জানা দরকার। কবিদের দায়িত্ব এইখানে, এই সহায়শক্তিকে জানা ও জানানোয়।

সুনীল বসু বললেন, আধুনিক কবিতাকে আমি ভালবাসি রক্তের সংগে প্রাণের সংগে। আধুনিক কবিতাকে আমি পেতে চাই সেইভাবে, যা অশুভুতিকে নাড়া দেবে, নবীনতা আনবে। মনে করুন ভ্যান্ গগের ছবির কথা। কমলালেবু যে সবসময়ে গোলই নয়, তিনি জানবার আগে একথা কে জানত। অথচ, কতো সুন্দরই না লাগল। এই বৈচিত্র্যকেই আনতে হবে আধুনিক কবিতায়। তবেই তা নবরংগের সৃষ্টি করবে। কিন্তু আধুনিক কবিতার দরজা লোহার; প্রবেশ নিষেধ না-হলেও মুশকিল অনেক। তাই কবিতাপাঠের আগে জানতে হবে কবিতার বৈশিষ্ট্য। পাঠকের কাছে আমার আবেদন রবীন্দ্রনাথের থেকে বাংলা কবিতার রূপান্তরের ইতিহাস সূক্ষ্ম ও ধীরভাবে জানতে হবে, বুঝতে হবে। চিনতে হবে নতুন ছন্দ ও অলংকারকে, ক্রমে ক্রমে। বিদেশে কবিতা রচনার ক্লাশ হয় নিয়মিত; আমাদের এখানে কবিতাপাঠের সঙ্গে হওয়া দরকার। তাতে, এর ঋতুকে চেনা ও চেনানোর সুবিধে হবে।

যুগান্তর চক্রবর্তী বললেন, আধুনিক বাংলা কবিতার সমস্তা বাইরের নয়। দল করে ক্লাশ ধুলে তার রচনা ও পাঠনা কোনোটাই সম্ভবপর নয়। কবি হলেন আত্মকথক। কবিতায় তিনি নিজের কথা নিজে বলেন। কতোটা ভালো ও সুন্দর করে তিনি বলেন, তাইই লক্ষ্যে হবে, আধুনিক কবিতার হৃদোন্মীলনকে সত্য বলে আমি মনে করি না। আধুনিক যুগের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণকে প্রকাশ করাই কবিতার চরম কর্তব্য নয়। আবার সবই যে 'বিদেশী ফুল' তাও নয়। আমার মতে, আধুনিক বাংলা কবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর রচনা জীবনময়, তিনি দেশজ কবি। আসলে, বাস্তবকে যথাযথ রূপ দিতে পারলেই কবিতার সার্থকতা। ভাষার দিক থেকে বিচার করলে দেখি, তিরিশের যুগ থেকে আধুনিক কবিতা ভাষাপথে খুব বেশি এগোয়নি ;

সার্থকও ভেগন হয়নি। তরুণ কবিদের পক্ষে লেখা একদিকে যেমন সহজ হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি কঠিন হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, 'চতুর কবিতা' হলে চলবে না; আংগিকসর্বস্ব হলেও না। সত্য হতে হবে কবিতাকে। অশুভূতির সত্য।

মুরারি সাহা, আমি একটিমাত্র কথাই বলব কবিতার পাঠক হিসেবে। আজ আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠক স্বয়ং কবিরাই। তাই পাঠক তৈরীর দায়িত্ব আছে সকলের। যারা এতদিন পশ্চ পড়ে এসেছেন, তাঁদের কবিতা পড়তে শেখাতে হবে। এবং এইভাবে রসিকসমাজ গঠন করা নতুন ব্যাপারও নয়। এইদিক থেকে ভাববার জন্যে আমি সকলকে অনুরোধ করছি।

সুশান্ত বসু : বাংলা কবিতার সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি কবিতাপাঠকের সংখ্যাও। অবস্থা একেবারে নৈরাশ্রজনক বলা চলে না। তবে, আধুনিক কবিতাকে অনেকে ভীতিকর বলে মনে করেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার মনে হয়, আধুনিক ভাঙা যুগের পটভূমিকায় পুরাতনের সংগে আমাদের নাড়ীর যোগ নেই। আমাদের মনে মনে বেলাতে পারেন এমন পাঠক মুষ্টিমেয়। বাস্তবক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু বাঙালীর ভাবালু মন তা যেমন মানতে পারছে না। ফলে, কবিতা দুর্বোধ্য ঠেকে পাঠকের কাছে।

নবেশু চক্রবর্তী : আজকের উৎপাদন রূপান্তরের ফলে আমরা অনেক কাছাকাছি এসেছি। কবিদের ভাবভাগ রূপক প্রতীক ব্যক্তিগত হয়ে উঠেছে। ফলে, জনগণবিমুক্ত হয়েছে আধুনিক কবিতা। আবার, কবিতার সংজ্ঞা বদলেছে। আজকের নাস্তিক্যবোধ, সমস্তা ইত্যাদির রূপ আজকের কবিতা। ভাবতে হবে, কিভাবে বধ্যগুলি সরিয়ে পাঠকের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করা যায়। কবিতা কিভাবে মহত্তর হতে পারে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : এতক্ষণ ধরে যা শুনলাম তার অনেক মতের সংগে আমার মিল নেই, অনেকগুলি সমর্থন করি। সমাজ ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতাকে আমি স্বীকার করি। কিন্তু সব সময়ে নয়। অসুস্থ সমাজে অসুস্থ কবিতার জন্ম, একথা আমি মানি না। তাহলে, বধ্যযুগের সেইসব বধ্যপার দিনে বৈষ্ণব কবিতার সৌন্দর্য ফুটে উঠত না। কিংবা পেতুম না চীনা কবিতার ছবিকে। কবিতার পাঠক সংখ্যা কম হুঃখ নেই তাতে। জানি, আজ না-হয় কাল তার সমাদর হবেই। তৎকালিক হেট্টে ক'রে কোনো লাভ নেই। মনে করুন স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের কথা। আধুনিক কবিদের মধ্যেও অনেকে আছেন যারা শক্তিমান হয়েও অনাদৃত। কবিতার আবহুকাই হয় পরকথা, বহুর ব্যথা একে এসে মেশে। নিজের গভীরে ও সমগ্রতার গভীরে যাচ্ছি ও লিখছি, এটাই ভ্রুপ্তি। হয়ত সমকালকে চিরকালকে পরিপূর্ণভাবে পরিপ্তি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবু বিমল ঘোষও কবি, সুকান্ত ভট্টাচার্যও কবি। আমার ধারণা, কবিতা ভিন্ন পথে চলে। যন্ত্রসভ্যতার আওতার মহীকাব্য গীতিকাব্যে পরিণত। আখ্যান-কাব্য কাব্যনাট্যে। তৃতীয়ত, ক্লাসিক শাস্ত্র কবিতা, যে রূপেই এ আসুক। কবিতা ক্লাসিক হওয়া দরকার। মিছিলের কবিতাও কবিতা হয়। ক্লাসিকও হতে পারে। আমার শেষ বক্তব্য : কবিদের প্রবন্ধ লেখা দরকার। কিসের ওপর? কবিতার

ওপর। তার ভাষা করা দরকার; তাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে। তবেই কবিতাপাঠ সহজতর হয়ে উঠবে।

এরপর সুনীল চট্টোপাধ্যায় আবার বললেন, যুগান্তর চক্রবর্তী আমার বক্তব্যকে একটু ভুল বুঝেছেন। সেটুকু সম্বন্ধে বলতে চাই। শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বা বলেছি, তা বাইরের সমস্তা বটে, কিন্তু বাইরের লক্ষণ হিসেবেই কবিতায় আসে না। বাইরের সমস্তাকে অন্তরংগ করে না-নিলে কবিতা হয় না। কবিতা হল কৈবল্য; সব কিছু নিলে আন্তরিক পদ্ধতিতে সে ফোর্থ ডাইমেন্সনে পৌঁছায়। কাজেই, ঐ অন্তর্দ্বন্দ্ব আর বাইরের থাকে না, সেও হয়ে ওঠে আন্তর ভাব। তখনই কবিতায় তার স্থান হয়।

প্রত্যুত্তরে যুগান্তর চক্রবর্তী জানান আগের মন্তব্যে একথা পরিষ্কার ক'রে বলা ছিল না। আমার বক্তব্য ছিল, কবিতা কবিরই কথা। কবিচিত্তে যে ভাবনা তা বৈখানকারই হোক, অশুভুতির দিক থেকে তাকে সত্য হতে হবে। তবেই তা হবে কবিতার উপাদান।

এরপর আমার ওপর নির্দেশ আসে এতক্ষণকার আলোচনাকে প্রস্তুত ক'রে তুলবার জন্যে। আমি বললাম, আজকের এই আলোচনার আসরে সমবেত কবি ও সমালোচক সকলেই মন খুলে যরোয়া পরিবেশে নিজের নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন। অন্তত, কবিতা সম্পর্কে কবির বক্তব্য হিসেবেও এগুলি মূল্যবান।

এতক্ষণ এখানে যা কিছু বলা হয়েছে সে সবই বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে ব্যক্তিগত মতামতের আধারে। প্রথমত, আমাদের আলোচনা হয়েছে আধুনিকতার সংজ্ঞা নিয়ে। তার পরিমাপ যে কালে নয় কলায়, এ-বাবদে সকলেই একমত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কবিতার আবেগ। তা চিরন্তন অথবা সমসাময়িক কিংবা দুটোই, এ নিয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। তৃতীয়ত, মতের পার্থক্য ও বৈচিত্র্য ঘটেছে আধুনিক কবিতার অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে। এর মূল বাইরের সমস্তায় অথবা কবিরই আন্তর জটিলতায়, এসম্বন্ধে যে সব মন্তব্য এখানে রাখা হয়েছে সেগুলির সাহায্যে এই দ্বন্দ্বকে বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। চতুর্থত, কবিতার ছন্দ চিত্র ও প্রতীক নিয়ে মতামত প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চমত, কবিতার সংগে পাঠকের যোগাযোগের পথ ও পন্থা নির্ণয়। আজকের কবিমেলার এইই হল মোটামুটি আলোচিত বিষয়। এ নিয়ে সকলে ভাববেন এবং আধুনিক বাংলা কবিতার প্রকৃতি নির্ণয়ে ও গতিনির্ধারণে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হবেন। পাঠকের সংগে কবিতার যোগাযোগ সাধনের সুস্পষ্ট পন্থা ও পরিকল্পনা সম্বন্ধেও চিন্তা করতে হবে। কবিতামেলার মুখ্য উদ্দেশ্য তো তাইই...কবিদের মুখে কবিতার সমালোচনা শুনতে ভালো লাগে; তাঁদের লেখা প্রবন্ধ পড়তে ভালো লাগে; কবিতার দোষগুণ আলোচনা করে, তার ক্রটি সংশোধনের চিন্তা ও চেষ্টা ভালো লাগে। কিন্তু একথাও সবাই জানি, যখন একটি কবিতা নেমে এসে হৃদয়ের প্রান্তগীষাকে ছুঁইছুঁই করে, তখন এই সব গভীর ও গম্ভীর চিন্তার দল সেখান থেকে তখন উধাও। পোএটি কোনোকালেই পোএটিকসের আঁচলধরা সলজ্জ বধু নয়। কবিতা তৈরী হয় না, হয়ে ওঠে।

॥ চন্দ্র ৫

খেলা ভান্ডার খেলা : কাহিনী : বিধায়ক ভট্টাচার্য, পরিচালনা : রতন চট্টোপাধ্যায়, সংগীত পরিচালনা : অনিল বাগচী, আলোকচিত্র গ্রহণ : সুধীর বসু, শব্দগ্রহণ, নৃপেন পাল, সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন ঘোষ, ভূমিকায় : বসন্ত, কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, সুমিত্রা, সবিতা, চন্দ্রাবতী, পদ্মা, রাধালক্ষ্মী, অর্পণা, বাণী গাঙ্গুলী, ঐতি মল্লুমদার, জহর, ভানু এবং আরো অনেকে ।

সাম্প্রতিক কোনো বাঙলা ছবি দেখতে গিয়ে দর্শককে সম্ভবত এত বেশি যন্ত্রণাদায়ক পীড়া অনুভব করতে হয়নি, যতটা হয়েছে খেলা ভান্ডার খেলা দেখতে গিয়ে । কাহিনীর অসম্ভব অবাস্তবতা এবং প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব দর্শকমনকে এত বেশি বিচলিত করে এবং বিষিয়ে তোলে যে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, এই ধরনের নিকটে গল্প নির্বাচন করার মত প্রযোজক-পরিচালকের বুদ্ধিবংশতা ঘটে কি করে ? পরে অবশ্য একটু চিন্তা করলেই সব পরিষ্কার হয়ে যায় ।

অবাস্তব গল্পের দুর্বল চিত্রনাট্য অযোগ্য পরিচালনায় যা হতে পারে আলোচ্য ছবির ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই । সামাজিক জীবনকে পর্দায় দেখাতে হলে বাস্তবতার বিচারের প্রশ্ন জাগে সর্বাত্মক । কাহিনীকে বাস্তবানুগ হতে হবে । বাস্তবানুগ হবে কাহিনীর রূপায়নও । অর্থাৎ ভাল ছবি করতে হলে ভাল কাহিনী এবং ভাল পরিচালনা —এ দু'য়ের সমন্বয় ঘটা চাই । একথা সৎ নিষ্ঠাবান পরিচালকেরা সজ্ঞানে মনে রাখেন । কিন্তু আলোচ্য ছবির পরিচালকের সে জ্ঞান আদৌ আছে বলে মনে হল না ।

ছবি শুরু হতেই দেখা যায় সুন্দর গ্রামের দৃশ্য । সেই গ্রাম্য পরিবেশে একটি কিশোর আর একটি কিশোরী । ছেলেটি জমিদার বংশের, মেয়েটি দরিদ্র ঘরের । দু'জনে খুব ভাবসাব । খেলার সাথী পরস্পরে । পুকুরধারে বসে মেয়েটি অর্থাৎ শুকতারার মালা গাঁথছিল আপনমনে । ছেলেটি সেখানে এল । মেয়েটি বললে, জানো বিহুদা, আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে । বিহুদা অর্থাৎ বিনয় বলে, কি ! বিয়ে ? দাঁড়া দেওয়াচ্ছি তোর বিয়ে । এদিকে আর, আর—আর । মালা নিয়ে আর ।

মালা কি হবে ? ক্রকপরা শুকতারার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় । হাফ-প্যান্টপরা বিনয় মতলব বাতলে দেয় এবং সেইমত কাজ হয় । বিনয়ের গলায় মালা দিতে গিয়ে শুকতারার মুখ দিয়ে কথা সরতে চায় না লক্ষ্যায় । বিনয় ধমক লাগায় । অমনি শুকতারার বলে, আজ থেকে তুই আমার বর । বিনয়ও শুকতারার গলায় মালা পরায়, আজ থেকে তুই আমার বউ ।

এরপরই বিনয় আর শুকতারার ছাড়াছাড়ি 'হয়ে যায়' । লেখাপড়া শেখার ক্ষেত্রে গ্রাম ছেড়ে বিনয়কে কলকাতায় আসতে হয় । তারপরই দেখা যায় যৌবনে পদার্পণ করেছে সে । বিনয় তখন ভাল শিকারী এবং 'নানারঙ' নামক এক পত্রিকা চালায় ।

ইতিমধ্যে শুকতারাকে ভুলে গেছে বিনয় ।

অপিতা নামে একটি ধনীকন্নার সংগে (অপিতার বাবা অপিতার মাকে রানীদি বলে সম্বোধন করে মেয়ের আড়ালে) বিনয়ের মা তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন । বিনয়ের কিন্তু খুব মত নেই এ-বিয়েতে (কারণ অজ্ঞাত) । কিন্তু অপিতার খুব ইচ্ছে । বিয়ের নামেই সে পাগলপ্রায় । একদিন সে স্বরচিত এক কবিতা নিয়ে পত্রিকা অফিসে হানা দেয় । কবিতা তখনি মনোনীত হয় । তারপর তার নাম-ধাম জেনে বিনয় বোঝে এ সেই মেয়ে যার সংগে বিয়ের কথা হচ্ছে । কিন্তু মনেই থাকে সে কথা, হাবভাবে দেখা যায় বিনয়ের প্রেমে পড়ো-পড়ো ভাব ।

এই ব্যাপার চলেছে এমন সময় একদিন বিনয়ের কাকা সংবাদ দেয়, এক বৃদ্ধের সংগে নাকি শুকতারার বিয়ের সব ঠিকঠাক । বিয়ের ভয়ে সে কলকাতায় পালিয়ে যায় বিনয়ের কাছে । কিন্তু কোথায় শুকতারা ? জানা যায়, শুকতারা তার মাকে কলকাতা থেকে মাসিক একশত টাকা পাঠায় । গ্রামের লোক এবং শুকতারার মা জানে যে শুকতারা কলকাতায় গিয়ে বিনয়ের কাছেই আছে. বিনয়ের সহধর্মীণীরূপে আর বিনয়ই তাকে টাকা পাঠায় । এই খবর বিনয়কে উদ্ভাস্ত করে ।

এরপর দেখা যায় বিনয় হাজারীবাগ সবাকাবে । সেখানে শিকার করতে গিয়ে একদিন আকস্মিকভাবে একটি মেয়ের সাক্ষাৎ পায় । পরে প্রকাশ পায় সেই মেয়েটি শুকতারা—বর্তমানে নামকরা ফিল্ম হিরোইন মেঘনা দেবী, সম্প্রতি স্টুটিংয়ের জন্যে হাজারীবাগ উপস্থিত । বিনয় আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে শুকতারাকে নিয়ে কলকাতায় ফেরে নিজের মোটরেই । এবার শুকতারার বাড়িতে অধিকাংশ সময় কাটে বিনয়ের । বিনয় শুকতারাকে বিয়ে করতে চায়, ফিল্ম ছেড়ে দিতেও বলে । ফিল্ম ছাড়তে শুকতারা রাজী, বিয়ে করতে রাজী নয় । কারণ ? কারণ আমি জানি না । পাঠকই অনুমান করুন । পারবেন না ? তাহলে শুধুন, শুকতারার সতীধর্ম কলুষিত হয়ে গেছে (?) হৃৎকেন্দ্রের পাল্লায় পড়ে—কলকাতার প্রথম এসে একা একা বিনয়ের খোঁজ করার সময় । প্রানিময় রাত্রির সেই স্বপ্নাস্ত শুকতারা অকপটে ব্যক্ত করে বিনয়ের কাছে । বিনয় বোঝে নির্দোষ । সব শুনেও শুকতারাকে সে পেতে চায় । শুকতারারও বিনয়ের প্রতি ভালবাসায় খাদ নেই কিন্তু তবু সে বিনয়কে গ্রহণ করতে চায় না জীবনে । অর্থাৎ ভালবাসে বলেই বিয়ে সে করবে না—যে প্রতিমায় একবার খুঁত হয়ে গেছে তা কি দেবতাকে উৎসর্গ করা যায় ?

শুকতারা বিনয়কে ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয় ।

এদিকে অপিতা ভালবেসেছে বিনয়কে । বিনয় বিয়েতে ইতিমধ্যে মত বদলানোর জোর করে অস্ত্র ছেলের সংগে বিয়ে দেবার আয়োজন চলে অপিতার মায়ের পক্ষ থেকে । তাই অপিতা পালিয়ে যায় শোক-পোশাক পরে । তারপর তাকে স্বন্দাবনে দেখা যায় । মালা-চন্দনে চর্চিত অপিতা ভাবে বিভোর মন্দিরের বিগ্রহের সামনে, কণ্ঠ গীত, আঁখিতে বারি.....পাশে বিনয়ের মাকেও দেখা যায় ।

বিনয়ও শুকতারাকে না-পেয়ে মাকে নিয়ে তীর্থে বেরিয়েছিল, অপিতার সংগে দেখা হয় স্বন্দাবনে । অপিতা আহ্বান জানায়, বিনয় তাকে চিনেও চিনতে চায় না । তারপর বিনয়ের কাশী আগমন । এখানে অবশ্য একাকীই ।.....

শুকতারার জ্ঞানচক্রে উন্মিলিত হয় প্রানে নায়ের কাছে গিয়ে। স্বামীই যে জীবনের সব একথা বুঝতে পারায় কলকাতায় ফিরে আসে এবং বৃন্দাবনের ঠিকানা সংগ্রহ করে রওনা দেয় শুকতারার। বৃন্দাবনে আলাপ অপিতার সংগে। তারপর সেখান থেকে ?...

কাশীতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে বিনয়। আধ-পাগলা এক অধ্যাপকের সংগে আলাপ হয়েছিল বিনয়ের, সেই অধ্যাপক তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য এ্যাম্বুলেন্স আনে। এমন সময় সেখানে হাজির হয় শুকতারার। তার সেবায় বিনয় অচিরেই রোগমুক্ত হয়। তারপর অপিতাকেও দেখা যায় ওদের সংগে।

শুকতারার বিনয়ের সংগে অপিতার মিলন চায়। তাই সে নিজের সমস্ত সম্পত্তি অপিতার নামে লিখে দিয়ে বিদায় নেয়। বিনয় কিছুই বলে না, বিদায় দিনে ঠেগনে যায়। দাঁড়িয়ে থাকে শুধু যেন বিব্রুত আবেশে। বাঁশী বাজিয়ে ট্রেন ছোটে শুকতারাকে নিয়ে। এই হল আলোচ্য চিত্রের সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

প্রথম থেকেই বিক্রী লাগে যখন দেখা যায় চোখা চোখা ডায়লগ দিয়ে কিশোর জীবন দেখানো হচ্ছে নায়ক-নায়িকার। নায়ক তো তখনই রীতিমত পাকা; কি ডায়লগে কি বেশবাসে এবং আচারে-আচরণে ভাবব্যঞ্জনায কোথাও তাদের মধ্যে প্রামাণ্যতার ছাপ পরিস্ফুট নয়। নায়ক যখন বড় হল তখন তার চরিত্র উদার, একপেশে ভাবেই সংস্কার সংশয়ের উদ্বেগ—এমন কি নাটকীয় মুহূর্তেও এ-চরিত্রে মানুষের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক স্বভাবের কোনো আভাস নেই। সস্তাহীন এক অসুস্থ বাপছাড়া চরিত্র। নায়িকাও তখৈবচ।

কাহিনীর মধ্যে নানারঙ পত্রিকার অবতারণা অপ্রয়োজনীয়, তার রূপায়নও অস্বাভাবিক। ফিল্ম এবং পত্রিকা সম্পর্কে হুঁচকারটে বুকনী চোকানো ছাড়া আর যদি কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় এ অংশে, তবে তা হচ্ছে জহর রায়, ভানু ব্যানার্জী প্রভৃতির কবিতা দেখানো।

চিত্রনাট্যটি যদি শুকতারার গভীর নষ্ট হওয়ার প্রবন্ধের উপর নির্ভর করতো, বিনয় এবং শুকতারার মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর কেন্দ্র করে এগিয়ে যেত—এবং এই সমস্তার উপর চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক বর্তমান সনাতনের পটে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা কোনো আলোকপাত করতে পারতেন তাহলে হয়তো ছবিটি দর্শনযোগ্য হোত। কিন্তু তা না-হয়ে ছবিটি এদের খেয়ালখুশির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে তোলা এত খারাপ ছবি অনেককাল দেখা যায়নি। এরই মধ্যে ছবি বিশ্বাস এবং সুমিত্রার অভিনয়টুকু মনে রাখার মত, এটা অস্বস্তি তাদের ব্যক্তিগত কৃতিত্বের ব্যাপার।

নতুন প্রভাত : কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : . বিকাশ রায়, আলোকচিত্র
গ্রহণ : অনিল গুপ্ত, শিল্পনির্দেশক : সুনীল সরকার, সংগীত পরিচালক : নটিকেশ্বর
বোষ, শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইরানী ও সত্যেন চ্যাটার্জী, সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী।
রূপায়ণ : সন্ধ্যা, সাবিত্রী, তপতী, ছবি, পাহাড়ী, অসিতবরণ, বিকাশ, নীরেন, রবীন,
ভানু, কল্লম, প্রীতি, স্বাগতা, মায়া, শুক্লা প্রভৃতি।

আদর্শবাদী এক ডাক্তার কর্তৃক দাঙ্গিলিংয়ে যক্ষ্মা রুগীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এক স্যানিটোরিয়ামকে কেন্দ্র করে গল্পটি গড়ে উঠেছে। স্যানিটোরিয়ামের ডাক্তার রুগী এবং নার্স—এরাই গল্পের পাত্র-পাত্রী। এদের দুঃখ-বেদনার পিছনে দেহ ও মনের যে খেলা, যে লীলাটৈচিত্র্য—সেই উপাদানটুকুর উপর নির্ভর করে কাহিনীকার মানুষের জীবননাট্যের এক নতুন দিক তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং নানবিক দৃষ্টি নিয়ে। নতুন কিছু বলার এই যে প্রয়াস এর মধ্যে বিকাশ রায়ের আন্তরিকতা ও নির্ভার পরিচয় মেলে। সেজন্য তাকে অকুণ্ঠিত চিত্রে ধন্যবাদ জানাই।

কাহিনীর মূল কথা হোল যক্ষ্মা রুগীদের সমস্যা। দেহগত রোগেরই নয়, মনোগত কারণেরও। সময়মত এ দু'টির চিকিৎসা হ'লে রুগী আরোগ্যলাভ করবেই। অর্থনৈতিক প্রভাবও যে এ রোগের অন্যতম প্রধান কারণ সেকথাও কাহিনীকার উপাধন করতে ভুল করেন নি।

কাহিনীতে নতুনদ খাকা সত্ত্বেও চিত্রায় সংহতির অভাবে পরিচালনায় কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ছাপ নেই। ঘটনার স্থান আগাগোড়া দাঙ্গিলিং। অথচ দাঙ্গিলিংয়ের পরিবেশ সৃষ্টিতে কৃত্রিমতার ছাপ স্পষ্ট। মনে হোল দু'একটি নিসর্গদৃশ্য ছাড়া বাকী সব দৃশ্যই ঝুঁড়িওয় তোলা। ঝুঁড়িওর দাঙ্গিলিং বেশ বোঝা যায় প্রকটভাবে। পরিবেশের সংগে চরিত্রগুলিকে একাত্মভাবে মিলিয়ে না দিতে পারলে বাস্তবতা ব্যাহত হয়, ফলে কাহিনী আপন সত্তা হারিয়ে কৃত্রিমতা ধারণ করে। এবং সেই কারণেই ছবিটি প্রাণস্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি—যদিও একথা জোর করেই বলা যায় যে হালে যুক্তিপ্রাপ্ত গতানুগতিক অবাস্তব ছবির ছড়াছড়ির মাঝে 'নতুন প্রভাত'-এর স্থান অনেক উর্ধ্ব।

প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে সোমেন্দ্রের চরিত্রটি চরিত্র হিসাবে সুস্পষ্ট এবং বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্রশ্রেণীর এবং অসিতবরণের বাস্তবানুগ অভিনয় নৈপুণ্যে দর্শকের মন আকৃষ্ট করে। আনন্দ চরিত্রটিও বড় নির্মল। আনন্দের ভূমিকায় নীরেন মোটামুটি সহজ স্বাভাবিক, তার স্বভাবদৃশ্যটি অবাস্তব। সেজন্য অবশ্য পরিচালক দায়ী। সোমেন্দ্রকে রমা ভালবাসে এই কথাটি জানাবার জন্যই যেন আনন্দের বেঁচে থাকার প্রয়োজন ছিল, তাই দেখা যায়, যে মুহূর্তে কথাটি বলা শেষ হয় সেই মুহূর্তেই আনন্দের স্বভাব হয়। স্বভাবদৃশ্যের ট্রিটমেন্ট অত্যন্ত খারাপ লাগে। যক্ষ্মা রুগীর আরোগ্যলাভের সময় যে দৈহিক জৈবতাড়না দেখা দেয়, তার ফলে রুগীর সমস্যা কিরূপ জটিল হতে পারে এই জিনিসটি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে এক যক্ষ্মা রুগী ও তার সুস্থ সবল স্ত্রীর অল্পপস্থিতি এবং উপস্থিতি দেখিয়ে। রবীন স্বামীরূপে মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে যতটা বাস্তব করে তুলতে পেরেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়, স্ত্রী-রূপে তপতী ততটা স্বাভাবিক হতে পারেন নি। সন্ধ্যারানীকে নার্স রমার ভূমিকায় চমৎকার মানিয়েছে, অভিনয়ও মোটামুটি সাবলীল। নীরেনের সঙ্গে সন্ধ্যার 'হাত ধরে পাহাড়ের উপর বৈত সংগীতটি গাওয়ার দৃশ্যটি চরিত্র বিকাশের দুর্বলতায় জমতে পারেনি। একটি সুন্দর সিকোয়েন্স সুযোগ পেয়েও নাটি করেছেন পরিচালক। অথচ কথা এবং সুর বেশ মিষ্টি হয়েছে গানটির। পাহাড়ের উপর তপতীর উজ্জ্বলতা প্রকাশ দেখানো হয়েছে আরেকটি গান দিয়ে, সে গানটিতে বসে সুরের ঠমক। স্যানিটোরিয়ামের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ ঘোষের ভূমিকায়

পরিচালক স্বয়ং অবতীর্ণ না হলেই পারতেন। পাহাড়ীর ডাঃ ব্যানার্জী চরিত্রে অভিনয় দেখানোর মত সুযোগ ছিল না, তাই কোন রকমে টিকে আছেন। ভানুকে নতুনভাবে দেখা গেল, অভিনয় তার নোটামুটি, রসপুষ্ট নয়।

ছবির সংলাপগুলি বড় কাঁচা। সম্পাদনার কাজ ভাল। কিন্তু আলোকচিত্র এবং শব্দগ্রহণের কাজ প্রশংসনীয় নয়।

মুসাফির : কাহিনী ও পরিচালনা : হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, চিত্রনাট্য : ঋষিক ঘটক ও হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, সংগীত পরিচালনা : মলিল চৌধুরী, ভূমিকায় : সুচিত্রা সেন, উষাকিরণ, নিরুপা রায়, রাস্তলক্ষী, বেবী নাজ, শেখর, কিশোরকুমার, দিলীপকুমার, ডেভিড, ডেইজী ইরানী, নাজির হোসেন এবং আরো অনেকে।

এ ছবির সমালোচনা লেখার সময় ছবিটি কোলকাতার কোন প্রেক্ষাগৃহেই আর প্রদর্শিত হচ্ছে না। তবুও এ ছবির আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, বম্বের হিন্দী ছবির মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

এটি একটানা একটি গল্প নয়। তিনটি পৃথক পৃথক ছোট গল্পকে একটি কাহিনীর সূত্রে গাঁথা হয়েছে। কাহিনীর যোগসূত্র একটি ভাড়াটে বাড়ি। পর পর তিনটি ভাড়াটে আসে এই বাড়িতে। জন্ম মৃত্যু বিবাহের তিনটি দৃষ্টিকোণে নিবন্ধ গল্প-তিনটি জীবননাট্যের যে বৈচিত্র্যময় লালালেলা পেশ করে তার মধ্যে নতুনত্বের স্বাদ রয়েছে, যদিও গল্প তিনটিই পুরোপুরি রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি।

একটি যুবক তার পিতার তীক্ষ্ণ অন্ত সহ্যেও তার প্রণয়িনীকে বিবাহ করে। যুবক—অজয়, যুবতীটির নাম শকুন্তলা। বিবাহের পর উপরোক্ত ভাড়াটে বাড়িতে এসে তারা প্রথম ঘর বাঁধে। খবর পেয়ে যুবকের পিতা ঐ বাড়িতে হাজির হয় ছেলের সংগে সম্বন্ধ চুকিয়ে যাবার জন্তে। কিন্তু মেয়েটির অপূর্ব মধুর ব্যবহারে অত্যধিক সন্তুষ্ট হয়ে পিতাকে তার সংকল্প ত্যাগ করতে হয় পুত্র এবং পুত্রবধুকে সানন্দে গ্রহণ করে। ভাড়াটে বাড়িটি ছাড়ার সময় যুবক যুবতীর মনে বাড়িটির স্মৃতি অমরতা লাভ করে। জীবনের এক ঋণাংশ ছোট এই কাহিনীটুকুই এ ছবির প্রথম গল্প। বিস্তারিত রসোত্তীর্ণ এই গল্পটি নিঃসন্দেহে দর্শকমনকে তৃপ্তি দেয়। তবুও একটি কথা না বলে পারা যায় না। একটি খুঁত—যা অনেকের নজরই এড়িয়ে গেছে হয়তো। যে দৃশ্যে যুবকটির পিতা ভাড়াটে বাড়িতে এসে চুকলো এবং দৃঢ় মন নিয়ে তেজের সংগে আগয়ে চললো ছেলেকে জব্দ করতে, ঠিক সেই মুহূর্তে ভিতর থেকে যুবতীকণ্ঠে স্নিগ্ধ এক গীতলহরী বাইরে ভেসে এসে যুবকের পিতার মন আকৃষ্ট করলো। ক্রমশঃই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদ্রমুগ্ধের মত যুবকের পিতা গানটি শুনলো। গানটি অমনকক্ষণ ধরে গাওয়া হয়েছে এবং গানটিও সুস্বীত, কিন্তু এখানে যুবতীটির মুখের ক্রোড় আপ যনমন দেওয়াতে দৃশ্যটি কথঞ্চিত বাস্তবতা হারিয়ে ফেলেছে। চিন্তাশীল দর্শকের মন এখানে পীড়িত হয়। কেবলই মনে হয় এমন সুন্দর একটি নাটকীয় দৃশ্য কেন পরিচালক সংঘম হারালেন? উচিত ছিল গায়িকা এবং শ্রোতার মাঝে দৃশ্যত যে দূরত্বের ব্যবধান, সেটি বজায় রাখা। তা করতে হলে ভিতর থেকে ভেসে আসা গানের

সুরটাকে গর্বদাই স্পষ্ট না রেখে, কখনো ক্ষীণ কখনো উচ্চ পর্দায় শোনানো প্রয়োজন ছিল। গায়িকা আপন মনে ঘুরে ঘুরে কাজ করছে, এবং গান গাইছে বাড়ির ভিতর। কখনো কাছে আসছে, কখনো দূরে সরে যাচ্ছে। দর্শককে শ্রোতা না করে প্রকৃত শ্রোতা এবং গায়িকার মাঝে দূরত্বের ব্যবধান বাস্তব করে তুলতে পারলে দর্শক যুবকের পিতার চরিত্রটির সংগে একাত্মতা বোধ করতে পারতো। দৃশ্যটি সূক্ষ্মতার ঔজ্জ্বল্যে পরিপূর্ণ বাস্তবতায় আরো প্রাণনয় হয়ে উঠতো।

দ্বিতীয় গল্পটি এক যুবক, তার বিধবা ভ্রাতৃবধু (যিনি বিধবা হয়েছেন তিনমাস অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়) ও পিতাকে কেন্দ্র করে। এরা ঐ বাড়িটির দ্বিতীয় ভাড়াটে। দরিদ্র সংসারকে দারিদ্র্যমুক্ত করার জন্য যুবকের সংগ্রামশেষে চাকুরী প্রাপ্তি এবং ভ্রাতৃপুত্র লাভ। এখানেই এ গল্পের যবনিকা।

তৃতীয় গল্পের নায়ক রোগগ্রস্ত ছিল বলে ডাক্তারের পরামর্শে তার বাকদত্তা প্রণয়িনীকে বিবাহ করেনি। বহুকাল পর যখন তাদের পরস্পরে দেখা হোল তখন মেয়েটি বিধবা এবং ছেলেটি উন্মাদপ্রায়। বিধবাটি এক পক্ষ ছেলের মা—তার চিকিৎসার জন্য এসে উঠেছে ঐ ভাড়াটে বাড়িতে। অতি করুণ পরিবেশের মধ্যে নায়কের স্বভাবের মাঝে এ গল্পের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

চিত্রনাট্য ও বাস্তবতার বিচারে প্রথম গল্পের তুলনায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্পটি অনেক দূর। তৃতীয় গল্পটি গল্প হিসাবেও দুর্বল শেষের অংশে। তাই শেষ পর্যন্ত গল্পের প্রতি ঔৎসুক্য থাকলেও দর্শকের মনে পরিপূর্ণ তৃপ্তি মেলে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে কাহিনী ও পরিচালনার বৈশিষ্ট্যে ‘মুসাফির’ চিত্রটি বোম্বাইয়ের অধিকাংশ ছবির থেকে অনেক অনেক তফাৎ। রুচি এবং শালীনতাবোধে সম্বন্ধ রসপুষ্ট চিত্র এটি।

পাত্র-পাত্রীর অভিনয়ও এ ছবির এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য জিনিস। শিল্পীরা প্রায় সবাই আন্তরিকতার প্রমাণ রেখে গেছেন, যদিও সবাই খুব উচ্চাঙ্গের অভিনয় কুশলতা দেখাতে পারেননি।

শকুন্তলার ভূমিকায় সুচিত্রা সেনকে নতুন রূপে দেখা গেল এ ছবিতে। অনেক বাড়লা ছবির তুলনায় সুচিত্রা এখানে অনেক জীবন্ত ও বাস্তবানুগ চরিত্রাভিনয় দেখিয়েছেন। নিরুপা রায় ও উষাকিরণও যথার্থ। কিশোরকুমার কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছেন। শেখর চরিত্রানুযায়ী স্বাভাবিক। হত্যা প্রেমিকের ভূমিকায় দিলীপ কুমারের অভিনয় অনবদ্য। নাজির হোসেন-ও অভিনয় নৈপুণ্যে স্বাভাবিক। আর মনে রাখার মত অভিনয় হয়েছে ছোট ছেলে ডেইজী ইরানীর। বিশেষ করে তার শেষ দৃশ্যটি—যেখানে সে প্রথম হাঁটবার ক্ষমতা লাভ করলো ; সে দৃশ্যটি ভুলবার নয়।

সলিল চৌধুরীকে পর্যন্ত এ ছবিতে দেখা গেল একঘেঁয়েমীর উর্ধ্বে, সংগীতাংশে নতুন সুরের পরিচয় পাওয়া গেল। ডুয়েট গানটির সুর মনোপ্রাহী।

চলচ্চিত্রে বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টিতে আলোকচিত্রের ভূমিকাও যে গুরুত্বপূর্ণ—এই পরিচয় পাওয়া গেল চিত্রগ্রহণের কাজে, অনেক ভ্রাম্যগায়।

পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী ছবির জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষায় বইলাম।

। চিত্রালাপী ।

অগ্রণী

॥ দশম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৬৪ ॥

তোমার গল্প

দেবকুমার মৈত্র

পরপর পাঁচদিন পাঁচ-আটে চল্লিশটা সিগারেট এবং তিন-পাঁচে পনেরো কাপ চা খেয়েছি সন্ধ্যাবেলা, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ ক'রে দিয়েছি মনকে স্থির এবং একাগ্র করবার জন্যে, তারপর টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসেছি আধদিস্তে সাদা কাগজ নিয়ে, ফাউনটেন পেন খুলেছি লিখবো বলে, তবু তোমার গল্প আরম্ভই করতে পারিনি। ছ'চার লাইন লিখেছি, কেটেছি, আবার লিখেছি, আবার কেটেছি। অথচ তোমার গল্প লেখবার ইচ্ছে আমার অনেকদিন থেকেই আছে। ঠিকমতো লিখতে পারলে এতোদিন শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু পাঁচদিনের চেষ্টায় আমি কলম কামড়েছি কেবল, আরম্ভ করতে পারিনি কিছুতেই, যদিবা আরম্ভ করেছি এগোতে পারিনি। কেন না তোমার জীবনের অনেক কিছুই আমি অন্য পাঁচজনের চাইতে বেশি জানি, এবং এই বেশি জানাটাই বারবার বাধা দিচ্ছে, ছ'চার লাইন লিখে সেটুকু পড়লেই মনে হয়েছে, না, এভাবে না, তোমার গল্প এভাবে লেখা যাবে না। কিভাবে যে লেখা যাবে বা লেখা উচিত চল্লিশটা সিগারেটের ধোঁয়া দিয়েও অল্পভূতি এবং বুদ্ধির সেই দরজা আমি পাঁচদিনের চেষ্টাতেও খুলতে পারিনি। আজ, ছ-দিনের দিন, হঠাৎ তোমার সাথে আবার আমার লাইমুখরার পুলিশ পয়েন্টে দেখা না-হলে হয়তো আজও আরম্ভ করতে পারতাম না।

পুলিশের খাতে জুন মাসে সরকারের কতো টাকা ব্যয় হয়েছে তার হিসেব করতে কেবলই ভুল হচ্ছিলো, আমার হিসেব এবং ট্রেজারির হিসেবে পাঁচশো টাকার গরমিল দেখা দিয়েছিলো, যদিও গরমিল হবার কথা নয়। কোথায় ভুল হয়েছে আমার হিসেবে সন্ধান করতে করতে কখন ঘড়ির কাঁটার বিকেল পাঁচটা বেজে গিয়েছিলো টের পাইনি। যখন খেয়াল হলো মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম সেকসনে কেউ নেই, বড়বাবুও না; বাইরে আবছা আবছা অন্ধকার নেমেছে, পাইন বনের মাথায় সিন্দুরে আমেজ সামান্য সামান্য তখনও ছিলো। খাতাপত্র গুটিয়ে, গুছিয়ে সাজিয়ে রেখে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

তারপর লাইমুখরার পুলিশ পয়েন্টে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম বাসের জন্যে। প্রায় দশমিনিট অপেক্ষা করে যখন বিরক্ত হয়ে উঠেছি খিদের জ্বালায়, তখন, হ্যাঁ, তখনই,

ইঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। লাইমুখরা বাজারের ওদিক থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছিলে।

‘অনেকদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা।’ তুমি বললে।

‘প্রায় তিনমাস।’ আমি বললাম।

‘তারপর খবর কি?’ তুমি বললে।

‘নতুন কিছু নেই।’ আমি বললাম।

‘পুছোয় যাবেন নাকি ক’লকাতা?’

বললাম, ‘ইচ্ছে আছে; ছুটি পেলে যাবো নিশ্চয়।’

‘ছুটি পাবেন ঠিকই।’

‘জোর ক’রে বলা যায় না। সরকারী অফিসের রীতিনীতি তো জানো না। হয় তো বলবে, তুমি গেলে অফিস অচল হয়ে যাবে।’

‘সে কি!’ আশ্চর্য হলে তুমি, ‘বছরে একবার বাড়ি যাবেন, তাও ছুটি দেবে না। এ কখনও হয়?’

বললাম, ‘হয়।’

তুমি বললে, ‘সে যাই হোক, যদি ক’লকাতা যান পুছোয় তাহলে আমাকে একবার খবর দেবেন।’

বললাম, ‘কেন, তোমার কি বিশেষ কোনো দরকার আছে?’

‘হ্যাঁ, কিছু টাকা দিয়ে দেবো আপনাকে, ভালো ইটালিয়ান বেহালা একটা কিনে আনবেন আমার এক ছাত্রের স্বার্থে।’

‘কিন্তু পরে যদি তার পছন্দ না হয়?’

‘কেন, পছন্দ হবে না কেন?’ তুমি যেন অবাক হলে, ‘আপনি তো আর এ ব্যাপারে আনাড়ি নন।’

বললাম, ‘একেবারে আনাড়ি না-হলেও খুব যে একটা বিশারদ তাও তো নই।’

তুমি বললে, ‘আপনার পছন্দের ওপর আমার ভরসা আছে।’

‘তুনে গণ্ডিত হলান।’

হাসলে তুমি, ‘তা হতে পারেন।’

একটু থেমে তারপর বললে, ‘আপনার বাজনা এখন কেমন চলছে।’

বললাম, ‘ছেড়ে দিয়েছি।’

যেন আকাশ থেকে পড়লে তুমি, ‘সে কি!’

বললাম, ‘তিনবছর চেপ্টা করেও গল্পের গাড়ির চাকার কঁয়া কঁয়া শব্দ ছাড়া সুর বার করতে পারলাম না, শুধু শুধু চেপ্টা ক’রে লাভ কি?’

‘এ আপনার বিনয়।’

হু’এক মুহূর্ত চুপ ক’রে থেকে বললাম, ‘আসলে কি জানো, কেরানিগিরি ক’রে এসব হয় না। গরীবের ষোড়ি রোগ।’

‘ক্যাটারি করছি ভাববেন না,’ তুমি জবাব দিলে, ‘রোয়াজ করলে আপনার হাত আমার চাইতেও ভালো হতো।’

একটু খেমে বললাম, 'কিন্তু ওই জিনিসটাই যে পারি না, ঘড়িঘণ্টা ধরে কোনো জিনিসের পেছনে লেগে থাকি আমার স্বভাবে নেই।'

ও বিষয়ে আর কোন কথা বললে না তুমি।

হঠাৎ ঝরঝর ক'রে ঝুটি নামলো। ঝুটি থেকে মাথা এবং শরীর বাঁচাবার জন্যে ছুঁতে একরকম ছুটতে ছুটতে গিয়ে উঠলাম একটি দোকানের সামনের বারান্দায়। তখন ঝুটি এবং অন্ধকার দুইই নেনে গেছে। আকাশের বুকে চাবুক মেরে সাপের জিভের মতো বিদ্যুত ক্ষণে ক্ষণে চমকাতো থাকলো। আর, বিদ্যুতের আলোর তাকিয়ে দেখতে পেলাম লাবান পাহাড় মেঘের যোনটায় মুখ ঢেকে নিয়েছে। অর্থাৎ বেশ কিছুসময় এই ঝুটি চলবে।

আমরা যে বারান্দাটার ওপর ঝাঁড়িয়ে ছিলাম তার সামনেই রাস্তা, রাস্তার ওপরেই একটি চা এবং মিষ্টির দোকান। ক্ষিদেয় পেট জলছিলো। সেই বেলা দেড়টার সময় ক্যানটিন থেকে দুটো রসগোল্লা এবং এককাপ চা খেয়েছিলাম, তারপর আর কিছু পেটে পড়েনি। কাজেই ক্ষিদে দোষ ছিলো না।

বললাম, 'চলো খাওয়া যাক।'

'চা?'

'চা।'

'কিন্তু ঝুটিতে ভিজে যাবো যে!'

বললাম, 'ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে, অফিস থেকে বেরিয়ে খাইনি কিছুই।'

'কিন্তু এত ঝুটিতে যাবেন কি করে?'

বললাম, 'শুধুমাত্র এক দৌড়ে রাস্তাটা পার হওয়া বই তো নয়। ওতে ভিজেবো না।'

তুমি বললে, 'আমার কাছে পয়সা নেই কিন্তু।'

আমি বললাম, 'আমার পকেটে আছে। অতএব বিধার কোনো কারণ নেই।'

'চলুন তবে।'

আমি এক দৌড়ে রাস্তাটা পার হয়ে দোকানে পৌঁছে গেলাম। তুমি হেঁটেই গেলে। দ্রুত পায়ে। ভিজে গিয়েছিলে ওইটুকুতেই।

'তুমি দেখি ভিজে গেছো একেবারে?'

'ও কিছু না।' চাদর আর মেখলা ঠিক করতে করতে জবাব দিয়েছিলে তুমি।

সেই দোকানে বসে আমরা চা খেলাম তারপর। এবং খাবার। আমরা ছাড়া দোকান অল্প কোনো লোক ছিলো না। অতো ঝুটির মধ্যে কেই-বা আসবে। চা খেতে খেতে অনেক কথা হলো। গত তিনমাসে কি কি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে তার বিবরণ দিলে তুমি। আমি দিলাম আমার খবর। বাইরে সমানে ঝুটি চলছিলো সুবলধারে। আর থেকে থেকে তেমনই বিদ্যুৎ চমকচ্ছিলো আকাশের বুক চিরে। তারপর দূরে ককড় ককড় শব্দে বাজ পড়লো একটা। আমাদের কথা কুরিয়ে গিয়েছিলো। চুপচাপ বসে ছিলাম দুজনে। তুমি খেতপাথরের টেবিলটার ওপর

আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটছিলে, আর আমি একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে
ধোয়ার রিং ওড়াচ্ছিলাম এক মনে।

‘এবার বাড়ি ফেরা দরকার।’ এক সময় তুমি বললে।

বললাম, ‘হ্যাঁ, অনেক রাত হয়েছে।’

‘কিন্তু যা স্বাষ্টি।’

‘এ স্বাষ্টি আজ রাতে খামবে বলে মনে হচ্ছে না।’

‘তাহলে উপায়?’

‘ভিজ্ঞে যাওয়া ছাড়া তো গত্যন্তর দেখি না।’

‘তাহলে তাই চলুন।’

বললাম, ‘তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?’

‘কেন?’ অবাক চোখে তাকালে তুমি। তোমার অসহায় দৃষ্টি দেখে আমার
হাসি পেলো।

বললাম, ‘এই স্বাষ্টিতে ভিজ্ঞে নির্ঘাত অসুখ করবে।’

‘কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে যে। এরপর ফিরতে দেবী করলে বাবা গালাগালি
করবে অকথ্য। বাবাকে তো জানেন।’

বললাম, ‘তা অবশ্য জানি।’

‘তবে?’

‘কিন্তু আমি তো কোনো উপায় দেখছি না।’

‘তাহলে আপনি থাকুন। আমি চলি।’

সত্যিই উঠে পড়লে তুমি। এগোলে রাস্তার দিকে। ভিজ্ঞেই বাড়ি ফিরবে।

আমি বললাম, ‘তোমার কি সত্যিই মাথা খারাপ হলো? একে ঝড়স্বাষ্টি, তার
অন্ধকার রাত, একা ওই নির্জন পথে যেতে তোমার ভয় করবে না?’

‘ভয় করলে করবে, আমি আর বসে থাকতে পারছি না। এরপর দেবী করলে
বাবা আমাকে আর আস্ত রাখবে না।’

বললাম, ‘দাঁড়াও, উতলা হয়ো না। তোমার বাড়ি ফেরবার ব্যবস্থা আমি
ক’রে দিচ্ছি।’

তুমি দাঁড়ালে। বললে, ‘কি ব্যবস্থা?’

‘সেটা দেখতে পাবে এখনই।’

দোকানের একটি ছোকরা চাকরকে আটআনা পয়সা বকশিস কবুল ক’রে ট্যাক্সি
আনতে পাঠালাম একটা। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ট্যাক্সি এসে গেলো।

বললাম, ‘চলো এবার।’

তারপর তোমাকে নিউ কলোনীতে তোমাদের বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়ে আমি
ফিরেছি রাত দশটার সময়। এখন রাত বারোটা বেজে গেছে। ভেমনই স্বাষ্টি হচ্ছে
এখনও। আকাশের বুক চিরে বিহ্বল চমকচ্ছে। ককড় ককড় শব্দে বাজ পড়েছে
আরও একটি, কিছুক্ষণ আগেই।

পাঁচদিন চেষ্টা করেও তোমার গল্প আরম্ভই করতে পারিনি. ছ'দিনের দিন আরম্ভ করেছি, কিন্তু শুধু ওইটুকুই। যতোটুকু লিখেছি সেটা কিছুই না—তোমার সাথে হঠাৎ লাইম্বুখরার পুলিশ পয়েন্টে কিভাবে দেখা হয়েছিলো তার বিবরণ। ওর মধ্যে আর যাই থাক গল্প নেই, অন্তত তোমার গল্প। আচ্ছ, সাতদিনের দিন, কাল যতোটুকু লিখেছিলাম সেটা পড়ে এ-কথা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। তোমার গল্প লিখতে বসে যেকথা সবচাইতে আগে লেখা উচিত ছিলো, কি ক'রে তোমার সাথে আমার আলাপ হয়েছিলো, সেটাই লেখা হয়নি। আর, দেওয়া হয়নি, গল্প লেখবার যেটা সাধারণ রীতি, তোমার চেহারার বর্ণনা।

চেহারা তোমার বেশ ভালো। সাধারণতই জোড়হাট ডিক্রগড অঞ্চলের অসমীয়া মেয়েরা দেখতে ভালো হয়, তুমিও জোড়হাটের মেয়ে, বলা বাহুল্য তুমিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নও। সহজ ভাষায় সুন্দরী। টানা টানা নাক মুখ। গায়ের রং একটু হলদে মেশানো করসা। দেহের গঠন সুঠাম। যেটা ঠিক যে রকম হওয়া দরকার সেই রকমই। উন্নত বুক, সরু কোমর, সুডোল নিম্নাঙ্গ। খুব লম্বাও নও খুব বেঁটেও নও : পাঁচফুট তিন ইঞ্চি মতো দেহের দৈর্ঘ্য। সমস্ত শরীর যৌবনের জোয়ারে টলমল। কানায় কানায় গুরা। তোমার যেটা সবচাইতে সুন্দর সে হলো চুল। ঘন কালো, ঠেং ঠেং কোঁকড়ানো, নেমে এসেছে কোমরের ও নিচে। সেই চুলে যখন দুই বেণী বেঁধে ঝুলিয়ে দাও তুমি পেছন থেকে দেখলে লোভ লাগে : সুঠাম সুডোল দেহ, ব্লাউজটা খাঁট হয়ে পিঠের সাথে লেগে, একটু শরীরটা সামনের দিক ঝুঁকিয়ে চলো তুমি, বেণী দুটো ছলতে থাকে তবু সব সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে তোমার চোখের জন্তে। কোনোরকমেই ও চোখকে সুন্দর বলা যায় না। ছোট ছোট, কুতকুতে চীনা মেয়েদের চোখের মতো। ওই চোখ দুটোও, শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো, যদি সুন্দর হতো তোমার, যদি টানা টানা আয়ত হতো, যদি ঘনপশ্চ হতো অথচ দুটো, তাহলে... না, থাক, বাকিটুকু বলা শোভন হবে না।

তোমাকে দেখার আগেই তোমার বাজনা শুনেছি রেডিওতে। এবং শুনে মুগ্ধ হয়েছি। তারপর একদিন তোমাকে চাক্ষুষ দেখলাম, তারপর আরও একদিন, তারপর প্রায়ই। তখনও তোমার সাথে আলাপ হয়নি। নামে এবং চেহারায় চিনতাম শুধু। কেন না, শুধু শিলঙের গণ্ডীর মধ্যেই নয়, সমস্ত আসামেই তোমার খ্যাতি ছিলো এবং এখনও আছে। বেহালায় অপূর্ব দক্ষতা তোমার। শিলঙ-গৌহাটি বেতার কেন্দ্রের তুমি একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী এবং মার্গসংগীতে সমস্ত আসামের মধ্যে, একমাত্র প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ছিলে আগে। এখন অবশ্য আরও দু' একজন আছেন। কিন্তু সেকথা যাক, যেকথা বলছিলাম। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর দিল্লী কেন্দ্র থেকে ঝাংঝাল প্রোগ্রামে নামে যে সংগীতানুষ্ঠান প্রচারিত হয় তাতেও একবার বজিয়েছো, এটা কম বড়ো সম্মান নয়।

তোমার মুখেই শুনেছি খুব ছোট বয়স থেকেই সংগীতের ওপর তোমার ঝোঁক ছিলো। গলা ভালো নয় বলে গান না শিখে বেহালা বাজানো শিখতে আরম্ভ করে দশবছর বয়স থেকে। ভারতবিখ্যাত একজন ওস্তাদের কাছে। ওস্তাদের নামটা গোপন

রেখেছি, কেন না সেই ওস্তাদই পরে হয়েছিলো তোমার জীবনের শনি। তোমার গল্প লিখতে গেলে সেকথায় আমাকে আসতেই হবে। আর সেকথা লিখতে গেলে অনেক অশ্রীতিকর প্রসঙ্গ এসে যাবে। ওস্তাদজী যদি জানতে পারেন আমার নামে মানহানির মামলা আনাটা বিচিত্র হবে না। প্রধানত এই কারণেই ওস্তাদজীর নামটা আমাকে গোপন রাখতে হচ্ছে। তোমার বাবা পরমেশ হাজারিক, এককালে প্রচুর পয়সাওলা লোক ছিলেন। একটি চা বাগান ছিলো তাঁর। তোমার গানে যৌক দেখে তিনিই সেই ভারতবিখ্যাত ওস্তাদকে (এখন ভারতবিখ্যাত, তখন অতো খ্যাতি ছিলো না) মাসিক তিনশো টাকা মাইনে দিয়ে বাড়িতে এনে রেখেছিলেন মেয়েকে বেহালা শেখাবার জন্তে। সাতবছর তাঁর কাছে তালিম নিয়ে তুমি শুধু সুরে-লয়ে-তানেই দক্ষ হওনি, কঁড়ি থেকে যেমন ফুল ফোটে, তেমনই ফুটে উঠেছিলে দেহে মনে যৌবনে। আর, তোমার এই ফুল হয়ে ফুটে ওঠা ওস্তাদজীর দৃষ্টি এড়ায়নি। যদিও ওস্তাদজীর বয়স তখন চল্লিশ তবু তিনি উন্মাদ হয়ে গেলেন। বেহালা শেখাবার বদলে নানা ছলে ছুতোয় তোমাকে কাছে পাওয়াটাই হয়ে উঠলো তাঁর ধ্যানজ্ঞান। আর, তুমি তখন সুরের মোহে নিমগ্ন, সুর লয়-তান ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নেই। দিনে বারো ঘণ্টা রেয়াত করতে : কি ক'রে হাত আরও তৈরী করা যায়, কি ক'রে বেহালার ওপর দক্ষতা অর্জন করা যায় ওস্তাদজীর মতো। ওস্তাদজী এবং দেবতাতে তখন তোমার কাছে কোনো ভেদ ছিলো না। ওস্তাদজী এটা জানতেন। এবং তার পূর্ণ সুযোগ নিতে ছাড়লেন না। আর তুমি, ওস্তাদজীর কাছ থেকে আরও নতুন কিছু জিনিস আদায় করবার নেশায় বিভোর তুমি, যাকড়সার জালে যেমন মাছি আটকে যায় তেমনই আটকে গেলে ওস্তাদজীর কামনার জালে। হুয়ে হুয়ে চার। কয়েকদিন বাদেই তুমি টের পেলে বিপদের খবর, ওস্তাদজীর ফুলিঙ্গ কিভাবে তোমার শরীরের রক্ত শুষে শুষে দাবানলের মতো বেড়ে উঠেছে। তোমার সুরের মোহ হঠাৎ ভেঙ্গে গেলো। বাবা মা'কে কোন কথা জানাবার আগে ওস্তাদজীকেই গিয়ে জানালে। কারণ, ওস্তাদজী দেবতা, তোমার অনিষ্ট তিনি কখনোই করবেন না।

ওস্তাদজী বললেন, 'তোমার কোনো চিন্তার কারণ নেই শিপ্রা। আমি বিয়ে করবো তোমাকে।'

আনন্দে গলে গলে তুমি। আকাশের চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে। দেবতা বরা দিয়েছেন মানুষের হাতে। এর চাইতে বেশি আর কি আশা করা যায়।

'কিন্তু—' ওস্তাদজী চিন্তিত মুখে তাকালেন তোমার মুখের দিকে।

তুমি চমকে উঠলে। কিন্তু কিসের ?

তোমার চমকে ওঠাটা ওস্তাদজীর দৃষ্টি এড়ালো না।

বললেন, 'তুমি ভয় পাচ্ছো কেন শিপ্রা। তোমার অনিষ্ট হয় এমন কাজ আমি কখনো করতে পারি ?'

তুমি বললে, 'না, আপনার ওপর আমার বিশ্বাস আছে।'

ওস্তাদজী একটু থেমে বললেন, 'তোমার বাবাকে এখন কিছু জানিও না। দিন দশবারো বাদে আমি ক'লকাতা যাবো কনফারেন্সে, ওখান থেকে ফিরে আসি

তারপর যা কিছু করবার করা যাবে। বিয়ের পর এ বাড়িতে তো আর থাকা চলবে না, নতুন সংসার পাততে হবে, টাকার দরকার অনেক।’

যেন আকাশ থেকে পড়লে তুমি, ‘আপনি ক’লকাতা যাবেন? কই, আগে তো কিছুই বলেননি!’

এক মুহূর্ত ইতস্তত ক’রে ওস্তাদজী জবাব দিলেন, ‘আজ সকালেই চিঠি পেয়েছি, আগে কোনো কথা ছিলো না।’

ওস্তাদজী তো দেবতা। তাঁর কথায় অবিশ্বাস করোনি। করতে পারোনি।

কিন্তু ওস্তাদজী সেই যে ক’লকাতা গেলেন, আর ফিরলেন না।

একদিন দু’দিন তিনদিন ক’রে দু’মাস যখন পার হয়ে গেলো তারও পরে তখন বুঝতে পারলে যে ওস্তাদজী আর ফিরবেন না, বুকের কোণে জমেথাকা শেষ আশাও ঝরে গেলো। তারপর পরমেশ হাজারিকা জানলেন সব। এ এমন জিনিস যে না জানিয়ে উপায় ছিলো না। কতোদিন আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব? ওস্তাদজীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারতেন পরমেশ হাজারিকা, নাবালিকা মেয়েকে ফুসলিয়ে তার সর্বনাশ করবার জন্তে, কিন্তু করেননি। শুধু শুধু লোক হাসিয়ে লাভ কি! যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। মামলা করলে হয়তো শাস্তি দেওয়া যেতো ওস্তাদজীকে, কিন্তু মেয়ের এবং নিজের সম্মান কমতো বই বাড়তো না। আর, এ জিনিস ঢোল পিটিয়ে লোককে জানাবার মতো নয়। মেয়ের সমস্ত জীবন পড়ে আছে সামনে। জানাজানি হলে পড়ে আর এ মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন না। গোপনে গোপনে সবকিছু বন্দোবস্ত ক’রে ফেলেছিলেন পরমেশ হাজারিকা। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। পরমেশ হাজারিকা পরমা ছড়িয়েছিলেন, অতএব ডাক্তারের অভাব হয়নি। তবু কি ক’রে যেন জানাজানি হয়ে গিয়েছিলো। নোংরা জিনিসে যেমন মাছির উৎসাহ, এসব খবরেও লোকের ভেমনই। কুৎসার মতো, কেলেঙ্কারির মতো—আর সে কেলেঙ্কারি যদি বড়োঘরের হয়—মুখরোচক আলোচনার বিষয় আর নেই। আর, এমন ব্যাপার সচরাচর ঘটেও না। টি টি পড়ে গিয়েছিলো জোড়হাট শহরে। সে এক এমন অবস্থা যে পরমেশ হাজারিকাকে বাধ্য হয়ে জোড়হাট ছাড়তে হলো। তোমাদের নিয়ে চলে এলেন শিলঙে। সেই থেকেই তোমরা আছো শিলঙে। চা বাগানের দেখাশোনার সব কাজই চালাতো ম্যানেজার। তোমার এক দূরসম্পর্কের কাকা।

নিজে দেখাশোনা ছেড়ে দিয়েই ভুল করেছিলেন পরমেশ হাজারিকা। একবছর বাদে দেখা গেলো বাগানে লাভ হয়নি একপয়সা, বরঞ্চ লোকসান, প্রায় বিশহাজার টাকা। তার পরের বছর বন্ডায় ভেসে গেলো বাগান, (এমনই কম্পাল তোমাদের) মোট ক্ষতি প্রায় একলক্ষ টাকা। একলক্ষ কেন, দশহাজার টাকাও ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ছিলো না পরমেশ হাজারিকার। যা টাকা আসতো বাগান থেকে খরচ করতেন ই হাতে। জমাননি কিছুই। অতএব অকূল সমুদ্র। পাওনাদাররা তাগাদা দিতে লাগলো। কিছুদিন সময় চাইলেন পরমেশ হাজারিকা। সব দেনা শোধ করে দেবেন। কিন্তু পাওনাদাররা অপেক্ষা করতে রাজী হলো না। আদালতে গিয়ে মামলা করলো তারা। মামলায় হেরে গেলেন তিনি। নীলামে বিক্রী হয়ে গেলো

বাগান, ছোড়হাটের বাড়ি, গাড়ি, দেনার দায়ে। তারপর থেকেই চলছে দুর্ভাগ্যের পালা।

পাঁচবছর আগেকার কথা এখন পরমেশ হাজারিকা বুড়ো হয়ে গেছেন। এসব আমার তোমার মুখেই শোনা। সাধারণত কোনো মেয়ে তার জীবনের কলঙ্কের কথা অন্য কাউকে বলতে চায় না। কিন্তু তুমি আমার কাছে সঙ্কোচ করেনি। আশ্চর্য হয়েছিলাম আমি। অবশ্য আমাকে এসব কথা তোমার বলবার একটা কারণ ছিলো, পরে ভেবে দেখছি, আমার সাথে তোমার একসময়—বছরখানেক আগে—যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো এবং সম্বন্ধটা এমনভাবেই এগিয়ে ছিলো যে আর কিছুদিন চললে হয়তো আমি একদিন বিয়ের প্রস্তাব করতাম তোমার কাছে। এটা তুমিও বুঝেছিলে। এবং সেই ক্ষণেই ও-কথাগুলো বলেছিলে আমাকে, যাতে ক'রে পরে আমি একথা মনে করতে না-পারি যে তুমি আমাকে ঠকিয়েছো। কিন্তু কতোগুলো কারণে আমাকে সরে আসতে হয়েছে তোমার কাছ থেকে। তবু, সরে এলেও, এখনও আমার সাথে বন্ধুত্ব আছে তোমার। শুধু বন্ধুত্বই, তার বেশি কিছু নয়। এবং আমরা দুজনেই এ বন্ধুত্ব মেনে নিয়েছি হাসিমুখে। কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়নি আমাদের মধ্যে। কিন্তু এসব কথা পরে। আগের কথা আগে বলে নিই।

তোমার সাথে যখন আমার পরিচয় তখন তুমি লক্ষপ্রতিষ্ঠ শিল্পী। আমি শিল্পের লোক নই, আসামেরও না। বছর দুই হলো শিলঙে এসেছি ক'লকাতা থেকে। চাকরি করতে। বেহালা বাজানো এককালে আমারও শখ ছিলো। ক'লকাতা থেকে যখন আসি সঙ্গে ক'রে আমার ইটালিয়ান বেহালাটিও নিয়ে এসেছিলাম।

প্রথমে কিছুদিন ছিলাম হোটеле। তারপর উঠে আসি নিউ কলোনীতে এক মেসে। যে বাড়িটার আশ্রমের মেস ছিলো তার ঠিক পাশের বাড়িটাই তোমাদের। তোমার নাম তখনই আমি শুনেছি কিন্তু চোখে দেখিনি তোমাকে। আর, তুমি যে আমাদের মেসের পাশের বাড়িটাতেই থাকো তাও জানতাম না। খুব সকালে আমি ঘুম থেকে উঠতাম। বাইরে কাক ডাকতো আর অন্যান্য পাখিরা। তাছাড়া শান্ত স্বর। আবছা আবছা অন্ধকার তখনও ছড়াজড়ি করতো ঘাসে, লতায়, পাইনবনে, পাহাড়ের ঢালুতে, আকাশে। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার কেটে যেতো। কুয়াশার আবরণ সরে যেতো বাটি থেকে। প্রসন্ন, প্রশান্ত, স্নিগ্ধ আলোর আভা লেগে ঘাসের শীর্ষে শিশির বিন্দুগুলি ঝকঝক ক'রে উঠতো যুক্তের মতো। যেন কুচো কুচো বরফ ছড়িয়েছে কেউ ঘাসের সবুজ গালিচায়। অতো সকালে ঘুম থেকে উঠতাম বলেই শুনতে পেতাম রোজ। পাশের বাড়িতে বেহালা বাজায় কে যেন। মলিত, ডায়রো, রামকলী। শুনতাম জ্ঞান মনে মনে তারিক করতাম। যেই বাজাক না কেন, অপূর্ব হাঁত। এমন স্পষ্ট, পরিষ্কার, মিষ্টি হাত, সুরের ওপর এমন দক্ষতা বিরল। সকালের পাইনবন আর পাহাড়ের ঢালু আর ঘাসের শীর্ষের শিশিরবিন্দু আর আকাশ আর প্রকৃতির গান এমন অপূর্ব ভাবে সুরায়িত হতো তার আগে কখনো শুনিনি। আমি নিজেও বেহালা বাজাতাম বলেই ওই সুরের প্রতিটি কারুকার্য, মিড় গমক তান মূর্ছনা, আমাকে ভগ্ন করতো। কতোবড়ো শিল্পী হলে এমন হৃদয় নিংড়ানো সুর বার করা সম্ভব।

যেন শব্দকে গন্ধের মতো ছড়িয়ে দিতে বাতাসে। কয়েকদিন সকালে শুনে শুনে কৌতুহল বোধ করলাম। কে বাজায়? আবার রাত গভীর হয়ে গেলে শুনতাম। চারদিক নিস্তব্ধ নিশুতি হয়ে যাবার পর। মেসের সেই ছারপোকা ভরতি খাটে শুয়ে আমার ঘুম আসতো না। নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় ভেগে থাকতাম। একে একে ঘুমিয়ে পড়তো সকলে। রাত এগারোটোর পর আরম্ভ হতো সুরের যাত্রা। দরবারী কানাকা, দেশ, মালকোশ, জয়জয়ন্তী। অন্ধকারে ডুবে যাওয়া চরাচর, আকাশে এক ঝাঁক ঝিকমিক তারা, পাইনবনের ডালে ডালে বাতাসের হাহাকার—সব ডুবে যেতো ‘আমার চেতনা থেকে। সুর, সুর, সুর। গান। পৃথিবীতে আর কিছু নেই, শুধু সুর, শুধু গান।

আমার সাথে একদিন খুব সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেছিল আমার কুম-মেট অলক মিত্র। ও আমার অনেক আগে থেকেই শিলঙে এবং ওই মেসেই আছে। বেহালার তারের ছড়ের টানে সুরের ঝঙ্কার তখন কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ছে পাশের বাড়ি থেকে। কিছুক্ষণ নিবিষ্ট হয়ে শুনলাম। শুনলো অলক মিত্রও।

কিছুক্ষণ পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আচ্ছা অলকবাবু, আপনি জানেন কে এমন বেহালা বাজায় রোজ ও-বাড়িতে?’

অলক মিত্র যেন আশ্চর্য হলো আমার কথায় ‘সে কি, আপনি জানেন না?’

‘না।’

‘শিখা হাজারিকা।’

‘শিখা হাজারিকা?’

অলক মিত্র বললো, ‘হ্যাঁ। কেন, আপনি ওর নাম শোনেননি?’

বললাম, ‘শুনেছি।’ একটু থেমে বললাম, ‘একদিন দেখিয়ে দেবেন আমাকে, মেয়েটিকে চেনা দরকার।’

‘এ আর এমন কি কথা।’ অলক মিত্র বললো, ‘যে-কোনোদিন খুনি দেখতে পাবেন ওকে।’

আমি বললাম, ‘আলাপ করা যায় না ওর সাথে?’

‘চেষ্টা করলেই যায়।’

কয়েক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে বলল তারপর, ‘আপনিও তো বেহালায় উৎসাহী, ইচ্ছে করলে শিখা হাজারিকার কাছেই শিখতে পারেন।’

বললাম, ‘ও আমাকে শেখাবে কেন?’

‘ওই তো ওর পেশা।’ বলল অলক মিত্র, ‘টাকা পেলেই শেখাবে। দেখেন না শনিবার রবিবার কতো ছেলেমেয়ে ও-বাড়িতে আসে বেহালা হাতে।’

অলক মিত্র বলাতে খেয়াল হলো। তাইতো। প্রতি শনিবারই হুপুরবেলা অফিস থেকে ফেরবার পথে দেখি অনেক ছেলেমেয়ে ওদিকে যাচ্ছে বেহালা নিয়ে। রবিবার সকালেও।

বললাম, ‘সে যাই হোক, শেখার কথা পরে ভাববো। আপাতত একদিন দেখতে হচ্ছে শিখা হাজারিকাকে।’

সেইদিনই দেখেছিলাম তোমাকে । অলক মিত্র দেখিয়েছিল । বিকেলবেলা আমি এবং সে ফিরছিলাম অফিস থেকে । আপল্যাণ্ড রোড থেকে যেখানে নিউ কলোনীর রাস্তাটা নেমে গেছে সেই মোড়টা থেকে আমরা নিউ কলোনীর দিকে নামছিলাম, তুমি উঠছিলে আপল্যাণ্ডে । আমার গায়ে একটা খোঁচা দিলো অলক মিত্র ।

‘শিখা হাজারিকা ।’ ফিসফিস করে বলল সে ।

‘তাই নাকি ।’

আমি তাকিয়ে ভালো করে দেখলাম । মাটির দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে তুমি হাঁটছিলে ।

অলক মিত্রকে বললাম ‘একে তো আমি অনেকবার দেখেছি এ পাড়ায় ।’

‘ওরই নাম শিখা হাজারিকা ।’ অলক মিত্র বলল ।

আমি কোনো কথা বললাম না । তোমাকে আমি অনেকবারই দেখেছি । নাম জানতাম না শুধু । পথে যেতে আমাদের মুখোমুখি দেখা হয়েছে যতোবারই প্রত্যেকবারই দেখেছি তুমি তেরছা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বঙ্কিম হাসির চেউ ছুঁড়ে দাও । আমরা দুজনেই দুজনকে নৌখিক চিনতাম ।

এর কিছুদিন পরেই আমাদের অফিসে সোশ্যাল গ্যাদারিং উপলক্ষে একটা গানের জলসা হয়েছিল । আমি ছিলাম তার মিউজিক সেক্রেটারি । আমাদের উৎসবে বেহালা বাজাবার জন্যে অনুরোধ করতে গিয়েছিলাম তোমাকে । আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল । এই সুযোগে তোমার সাথে আলাপ করা যাবে । সেদিন ছিল রবিবার । সকাল । বাইরের ঘরে এক বৃদ্ধ বসে ছিলেন । তোমার বাবা পরমেশ হাজারিকা ।

‘কাকে চান ?’ পরমেশ হাজারিকা জিজ্ঞাসা করলেন ।

বললাম ‘শিখা হাজারিকাকে ।’

আমার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখলেন পরমেশ হাজারিকা । তারপর বললেন ‘কি দরকার ?’

আমি আমার উদ্দেশ্য বললাম ।

পরমেশ হাজারিকা বললেন ‘বসুন আপনি । আমি ডেকে দিচ্ছি ।’

ভদ্রলোক বাড়ির ভেতর চলে গেলেন ।

আমি চুপচাপ বসে রইলাম । ঘরের চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম একবার । বেশ পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো । দেয়ালে একটি বাঁধানো ছবি । তোমার । বেহালা কাঁধে মুখ নিচু, বাঁ হাতের আঙুলগুলো নিচের মুদ্রার মতো ছলোবলভাবে বেহালার তারগুলোর ওপর, ডানহাতে ছড়, মুখের পেছন দিক থেকে আলো এসে পড়েছে চুলে, কপালের একাংশে, বাঁহাতের আঙুলগুলোর ওপর, ডানহাতের ছড়ে ; সব মিলিয়ে সুপূর্ব একটি ভঙ্গী । ছবিটা ভালো করে বারবার দেখছি এমন সময় তুমি এলে । আমি মুখ তুলে তাকলাম । তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে মনে হল : বিস্মিত হয়েছো যেন ।

বললাম ‘নমস্কার ।’

‘নমস্কার ।’

তুমি বললে চেয়ারে ।

বললে 'আপনি ওই পাশের মেসটার থাকেন না ?'

বললাম 'হ্যাঁ ।'

তারপর কিছুক্ষণ ইতস্তত করে তোমার কাছে আসার কারণটা বললাম ।

তুমি বললে 'আমার যেতে কোনো আপত্তি নেই । একঘণ্টা বাজাবে একশো টাকা দিতে হবে ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম 'দেখুন আপনি বেশি চাইছেন একথা বলতে পারবো না । তবে কি জানেন আর একটু কম হলে আমাদের সুবিধে হয় ।'

তুমি বললে 'কিন্তু ওর কনে আমার অসুবিধে হয় ।'

আমি বললাম, 'অন্তএব একটা মাঝামাঝি রফা করা যাক । আপনারও যাতে অসুবিধে না হয়, আমাদেরও সুবিধে হয় ।'

তুমি বললে 'দরাদরি জিনিসটা আমি পছন্দ করি না ।'

এর উত্তরে আমি কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে বসে ছিলাম ।

আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত নিম্পলক তাকিয়ে থেকে তুমি বললে, 'আচ্ছা, কতো দিতে পারেন আপনারা ?'

আমি বললাম 'টেনেটুনে পাঁচাত্তর, এই আমাদের সামর্থ্যের তুলনায় বেশি ।'

তুমি বললে 'বেশ ওতেই আমি যাবো । তবে টাকাটা এ্যাডভান্স দিতে হবে ।'

বললাম 'কবে চান আপনি ?'

'আপনাদের ফাংসান কবে ?'

'পরশু ।'

'তাহলে পরশু সকালের মধ্যেই পুরো টাকাটা এ্যাডভান্স দিয়ে যাবেন ! আমি কোনো রসিদ দেবো না টাকার ক্ষেত্রে বা কোনো কনট্রাক্টেও সই করবো না ।'

আমি বললাম 'সে কি !'

'আমাকে বিশ্বাস করতে হবে ।' তুমি ছবাব দিলে 'যদি কোনো কারণে শেষপর্যন্ত আমি যেতে না পারি তাহলে টাকা ফেরত পাবেন পরে ।'

বললাম 'তাই হবে ।'

আমাদের সেই সংগীতানুষ্ঠানে তুমি গিয়েছিলে । হেম বেহাগ এবং শুধকল্যাণ রাগের অমুরণনে মুগ্ধ মোহিত করে দিয়েছিলে সকলকে । আমাকেও । কিন্তু তার আগে আরও একটি কথা আছে । ওই অনুষ্ঠানে আমিও বাসিয়েছিলাম বেহালা । ভারতীয় রাগরাগিণীর ওপর দখল তখন আমার খুব অল্পই ছিলো । কলকাতায় থাকতে বেহালা শিখতাম একজন এ্যাংলোইণ্ডিয়ান সাহেবের কাছে । ফলে যা কিছু শিখেছিলাম সবই পাশ্চাত্য । সেদিন আমি বাজালাম নীল দানিউবের সুর । খুব কিছু হাততালি পাইনি । কিন্তু হাততালির চাইতেও বেশি কিছু পেয়েছিলাম । তোমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ।

'অপূর্ব আপনার হাত ।'

জবাব না দিয়ে বিনয়ে হেসেছিলাম ।

‘সত্যিই বলছি।’ স্টেডের পেছনের অঙ্ককার কোণে দাঁড়িয়ে আবার বলেছিলেন।

‘তুনে আনন্দিত হলাম।’

‘কিন্তু আপনি ভারতীয় কিছু বাজালেন না কেন?’

‘জানি না বলে।’

অবাক হলে তুমি ‘জানেন না?’

‘না।’

‘এমন আপনার হাত রাগ-রাগিণী বাজালে লোককে পাগল করে দিতে পারবেন।

আমি ছবাব না দিয়ে তোমার মুখের দিকে তাকালাম।

‘শিখুন না রাগরাগিণী, তৈরী হাত আপনার বেশিদিন লাগবে না।’

মুখ তুলে বললাম ‘আপনি শেখাবেন?’

‘আমি?’ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তুমি বললে ‘যেভোটুকু জানি শেখাতে আপত্তি নেই। তবে—’

আমি বললাম ‘আপনার পারিশ্রমিকের কথা বলছেন? নিশ্চয় দেবো, বিনে দক্ষিণায় কি পুজো হয়!’

তুমি চেপ্টা করা হাসি হেসে বললে ‘জানেন তো এই আমার পেশা।’

আমি বললাম, ‘পেশাটা কিছু লজ্জাস্বজনক নয়।’

তোমার সাথে পরিচয়ের সেই সূত্রপাত। তারপর আমি বেহালা শিখতাম তোমার কাছে। এবং দিনে দিনে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছিল। কবে, কখন, কিভাবে, সেটা লিখে বোঝানো শক্ত। বয়সে তুমি আমার চাইতে বছর তিনেকের ছোটই হবে। যদিও সেটা প্রধান কারণ নয়, তবে একটা কারণ বটে, সম্বোধনে ‘আপনি’র পাহাড় ডিঙিয়ে নেনে এসেছিলাম ‘তুমি’র সমতলে। কেন জানি না, আমার ওপর তোমার পক্ষপাতিত্ব ছিলো, হয়তো আমারও তোমার ওপর। এমন একটা জায়গায় আমরা দুজন এসে পৌঁছেছিলাম যে, ব্যবহারে দুজন দুজনের খুব কাছাকাছি, আবার সানাতন একটা দুরত্বও ছিলো তখনও। আর কিছুদিন ওভাবে চললে ওই দুরত্বটাও হয়তো সরে যেতো। পরমেশ হাজারিকা এটা লক্ষ্য করেছিলেন। লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়েছিলেন মনে মনে। তুমিই তখন তাঁর একমাত্র অবলম্বন, তোমার উপার্জনেই সংসার চলে। অন্যান্য ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, মানুষ হওয়ার প্রস্তুতি চলছে। জন গ্রন্থেরো ছেলেমেয়েকে বেহালা শেখাতে বাড়িতে বসে, তার থেকে শ’তিনেক টাকা এবং রেডিও প্রোগ্রাম থেকে গড়ে মাসিক একশো টাকা, এই চারশো টাকা ভরসা। তুমি চলে গেলে খরচ চালাবেন কি করে? শঙ্কার ছায়া পরমেশ হাজারিকার চোখে ছলেছিলো। না, এর পরিসমাপ্তি টানতেই হবে, যেভাবেই হোক। বহুপরিকর হয়ে উঠেছিলেন পরমেশ হাজারিকা। একদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে গিয়েছি তোমার খোঁজে, পরমেশ হাজারিকা বাইরের ঘরে বসে ছিলেন।

বললেন, ‘শিখা নেই।’

‘নেই?’

‘না।’

আমি চলে আসবো, পরমেশ হাজারিকা বললেন, ‘বসো, তোমার সাথে কথা আছে।’

হুচোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে বসলাম।

চেয়ারের হাতল নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে পরমেশ হাজারিকা বললেন, ‘একটা কথা বলবো, মনে কিছু করো না। তোমার চাইতে বয়সে অনেক বড়ো বলেই বলছি।’

আমি ভেমনই অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম।

‘শিপ্রার সাথে তোমার মেলানেশার কথা বলছি—’ কিছুক্ষণ সময় ধেম্বে চুপ করে বসে রইলেন। তারপর ইতস্তত করে বললেন ‘লোকে নানা কথা বলছে।’

বললাম ‘কেন, লোকের বলবার মতো কিছু তো আমরা করিনি।’

‘না। আমিও তা বলি না। তবে কিনা লোকে যখন পাঁচকথা বলছে তখন মেলানেশাটা কমানোই বোধহয় উচিত।’

বললাম ‘আপনারও যদি এই মত হয় তাহলে অবশ্য বলবার কিছু নেই।’

পরমেশ হাজারিকা বললেন ‘দেখো বাবা, হাজার হলেও শিপ্রা মেয়ে, দুর্নামটা ওর গায়েই লাগবে। তোমার আর কি।’

চুপ করে বসে রইলাম। একটা কথা বলি বলি করেও বলতে পারছিলাম না। তারপর মনকে শক্ত করে জিজ্ঞাসা করলাম ‘পরিষ্কার করে বলুন, আপনি নিশ্চয়ও কি শিপ্রার সাথে আমার আর মেলানেশা চান না?’

‘না। পরমেশ হাজারিকা এবার দিলেন ‘তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। শিপ্রার স্বার্থের দিকে তাকিয়েই আনাকে এই অশ্রুতিকর কথা বলতে হচ্ছে।’

বললাম ‘তাই হবে। আমি আর আসবো না।’

সেই যে সেদিন তোমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম তারপর সাতদিন আর তোমার সাথে দেখা হয়নি। দেখা করিনি। মনে মনে অভিমান বোধ করেছি। পরমেশ হাজারিকা নিশ্চয় তোমাকেও বলেছেন ওসব কথা। আর তার পরেও তুমি একবারও আমার খোঁজ করলে না, তুমিও কি তবে চাওনা আমার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক থাকুক! বেশ, আমিও তবে কোনো খোঁজ করবো না, এমন কি রাস্তায় দেখা হলেও মুখ ফিরিয়ে চলে যাবো। কিন্তু পারলাম না, আটদিনের দিন আপল্যাও রোড়ের ঘোড়ে তোমার সাথে আবার দেখা হলো। আমাকে দ্রুত উল্লসিত হয়ে উঠলে তুমি।

‘কি ব্যাপার, আপনার যে আর পাত্তাই নেই। অস্বস্তিকর করেছিলো না?’

‘না।’

‘তবে?’

‘এমনিই যাইনি।’

‘উহ, বিশ্বাস হলো না।’

‘কেন?’

কোনো কথা না বলে তুমি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলে যে বুঝলাম আমার কথা বিশ্বাস করোনি। বললাম 'বেহালা বাজানো ছেড়ে দেবো।'

চমকে উঠলে তুমি 'কেন?'

'ভাল লাগে না আর।'

মুহুর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেলো তোমার মুখ, চোখ, চোখের তারা।

'বাবা কিছু বলেছে আপনাকে?'

'না।'

'কেন লুকোচ্ছেন মিছিমিছি।'

একটু ধেমে বললাম 'তুমি কি করে জানলে?'

কঠিন হয়ে এলো তোমার চোখ, ঠেঁ টি দুটো ধরধর কেঁপে উঠলো একবার।

'আগে দুবার এমন ঘটেছে। ঠিক আপনারই মতো আরও দুজনকে বাবা ভাড়িয়েছে আমার সংস্পর্শ থেকে।'

এবার আমি সত্যিই অবাক হলাম, 'তাই নাকি? কেন?'

কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তুমি বললে 'নিজের বাবা, তবু একথা আপনাকে বলবো। বলতেই হবে। তবে আজ নয়, আর একদিন।'

তারপর সত্যিই একদিন তুমি আমাকে সব বলেছিলে। কেন পরমেশ হাজারিকার এতো সাবধানতা। সেকথা আগেই লিখেছি।

তুনে আমি বলেছিলাম, 'তোমার সাথে আমার না হয় অন্য কোনো সম্বন্ধ নাই থাকলো, বন্ধুত্বটা থাক।'

তুমি বলেছিলে, 'হ্যাঁ, দুজনকে হারিয়েছি, আপনার বন্ধুত্বটা আর হারাতে রাজী নই।'

তোমার সাথে আমার বন্ধুত্বটা তাই হয়তো এখনও আছে। আমাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং ঘনিষ্ঠতা থেকে আবার কোনো সমস্যা যেন উদয় না হয় যাতে পরমেশ হাজারিকা আবার বিচলিত হতে পারেন, সেইজন্মে নিউ কলোনীতে তোমাদের বাড়ির পাশের সেই মেস ছেড়ে দিয়ে আমি চলে এসেছি মোখারে আর এক মেসে। যতোটা দূরে থাকা যায়, ঘন ঘন দেখা যাতে না হয় তোমার সাথে। হয়তো একথা তুমিও বুঝেছিলে, এ নিয়ে কোনো কথা বলোনি আমাকে।

তোমার চোখারার বর্ণনা দিয়েছি, তোমার অতীত ইতিহাসের আভাস দিয়েছি কিছুটা, তোমার সাথে আমার আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল কিভাবে তাও লিখেছি, ~~কিছু~~ লিখতে বসে দেখছি, কিছুই প্রায় লিখতে পারিনি। তোমার জীবনের অনেক কিছুই আমি আর পাঁচজনের চাইতে বেশি জানি এরকম একটা গর্ব এবং অহঙ্কার আমার ছিল; কিন্তু কোনো মানুষ এবং বিশেষত ~~যে~~ মানুষদের পুরোপুরি জানা কি সম্ভব? আমরা যেটুকু দেখি এবং বুঝি সেটা ওপর ওপর, নিজের ছাড়া অন্যকারও মনের অভ্যন্তর খবর জানা সম্ভব নয়। তোমার গল্প লিখতে আরম্ভ না করলে এই সত্যি কথাটা বুঝতে এবং জানতে হয়তো আমার আরও কিছুদিন লাগতো।

ছপুরবেলা অফিস পালিয়ে গ্যারিসন হলে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। গিয়ে টিকিট পেলাম না। আড়াইটাকা দামের টিকিট ছিলো কিন্তু অতো পয়সা ছিলো না সাথে। অগত্যা ফিরে এলাম সেখান থেকে। তারপর গিয়েছিলাম মোরেলোতে কফি খেতে। সুন্দর ক্রিম কফি তৈরি করে ওরা।

মোরেলোতে ওইসময় তোমাকে দেখতে পাবো কল্পনা করিনি। দেখে অবাক হলাম। রেস্তোরাঁতে তুমি সহজে আসতে চাইতে না। বিশেষত দিনের বেলা। তার কারণ তোমার খ্যাতি। সকলেই ঘুরে ঘুরে তাকাতে থাকে তোমার দিকে, ফিস ফিস করে নিব্বদের মধ্যে কথা বলে তোমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে। অস্বস্তি বোধ করে। অস্বস্তি বোধ করাটাই স্বাভাবিক। আমাকে আগে অনেকবার এ-কথা বলেছে। দিনছপুরে রেস্তোরাঁতে বসবার আপত্তির কারণ (সেইসব রেস্তোরাঁয়, যেখানে আলাদা কেবিন নেই)। তবু আমি অবাক হতাম না, তোমাকে ছপুরবেলা মোরেলোতে দেখে যদি না প্রদীপ বরকাকতীকে তোমার পাশে দেখতাম। প্রদীপ বরকাকতীকে আমি চিনি, এক কথায় লোফার। লম্পট, মস্তপ। মোখারে সন্ধ্যাবেলা খাসিয়া মেয়ের আশায় ঘোরাঘুরি করতে ওকে অনেকদিন দেখেছি, দেখেছি বন্ধুত্বাত্মক অবস্থাতেও। শিলঙয়ের নামকরা বদমাইস একটি। ওপের মধ্যে আছে এক চেহারা। লম্বাচওড়া, স্বাস্থ্যবান, ববধবে ফরসা গায়ের রং, নিখুঁত নাকমুখচোখ। ওরকম একটি বদমাইসের সাথে তোমাকে দেখে তাই অবাক হয়েছিলাম। উচ্ছল হয়ে হাসছিলে তুমি, হাসতে হাসতে চলে পড়ছিলে প্রদীপ বরকাকতীর গায়ে।

কিন্তু আমার চাইতেও বোধহয় বেশি অবাক হয়েছিলে তুমি। ভুত দেখলে যেমন চমকে ওঠে সেইরকম চমকে উঠেছিলে। হাসির হিল্লোল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মুহূর্তে। ক্যাকাসে, বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল তোমার মুখ চোখ। তখন এমন একটা অবস্থা যে, আমি যেন তোমাদের দেখিনি এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবারও উপায় ছিল না।

বললাম ‘আরে, শিখা বে!’

তুমি বললে ‘আপনি?’

আমি বললাম ‘সিনেমা দেখবো বলে পালিয়েছিলাম অফিস থেকে, কিন্তু টিকিট পেলাম না।’

‘বসুন।’ তুমি পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বললে।

বসলাম।

‘আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই : প্রদীপ বরকাকতী, অশোক দাস।’

‘নমস্কার।’

‘নমস্কার।’

‘কফি খাবেন নিশ্চয়।’ তুমি বললে।

‘সেইসময়েই তো এসেছি।’

তারপর কফি এলো আমার ঘরে। পট থেকে কাপে চলে ক্রিম মিশিয়ে দিলে তুমি।

‘ক চামচ চিনি দেবো?’

‘হু চামচ।’

তারপর আর কথা নেই। ধীরে ধীরে কয়েকটা চুমুক দিলাম কফির কাপে। একটা সিগারেট ধরালাম। প্যাকেটটা এগিয়ে দিলাম প্রদীপ বরকাকতীর দিকে। ওটা ভদ্রতা। প্রদীপ বরকাকতী একটা সিগারেট নিল, দেশলাই জ্বলে তার সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিলাম।

তারপর নৈশক্যা। মৌনতা।

হাতঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটাটা কেঁপে কেঁপে ঘুরে চলল, একদৃষ্টে তাকিয়ে তাই দেখছিলাম।

হঠাৎ কথা খুঁজে পেলাম আমি।

বললাম ‘আমি কলকাতা যাবো পরশুদিন, ছুটি হয়ে গেছে, তোমার এক ছাত্রের সঙ্গে একটা বেহালা আনতে হবে বলছিলে সেদিন, টাকাটা এর মধ্যে আমাকে দিয়ে দিও।’

তুমি যেন স্বস্তি বোধ করলে আমার কথায়।

বললে ‘না, তার আর দরকার নেই, আমার সে ছাত্রের শখ কুরিয়ে গেছে।’

আমি বললাম ‘তাই নাকি?’

সিগারেটটা এ্যাসট্রের ধারে ঘষে নিভিয়ে উঠে দাঁড়াল প্রদীপ বরকাকতী।

হঠাৎ।

‘আমি তাহলে চলি শিপ্রা, বিশেষ কাজ আছে।’

‘আচ্ছা।’ তুমি মাথা নাড়লে।

‘চলি বিষ্টার রায়।’

প্রদীপ বরকাকতী চলে যাবার পর তোমাকে বললাম, ‘এর সাথে তোমার আলাপ হলো কবে?’

‘কেন?’

‘না, এমনিই জিজ্ঞাসা করছি।’

‘তা প্রায় মাস দুয়েক হবে। আমার কাছে বেহালা শিখতো।’

বললাম ‘ও, এরই সঙ্গে বোধহয় বেহালা আনবার কথা বলেছিলে আমাকে?’

‘হ্যাঁ।’

‘তা, শখ কুরোলো কেন ভদ্রলোকের?’

তুমি হাসলে।

‘যে কারণে বেহালা শিখতে এসেছিলো আমার কাছে সেটাই মিটে গেছে
— হুজুতো।’

তোমার হাসি দেখে আমি সাহস পেলাম।

‘কিছু যদি মনে না করো শিপ্রা, একটা কথা বলবো।’

‘প্রদীপ বরকাকতীর চারত্র সঙ্কে?’ কেমন অক্লান্তভাবে হাসলে তুমি।

বললাম ‘হ্যাঁ, কেমন ক’রে বুঝলে?’

‘আপনার চোখমুখ দেখে ।’

‘জানো নিশ্চয় ওর স্বভাবচরিত্র ভালো নয় ।’

‘জানি ।’

‘তবে ?’

‘সেদিক দিয়ে বিচার করলে আমিও নিকলঙ্ক নই ।’

কোনো জবাব দিতে পারলাম না । একেবারে ব্যক্তিগত ক’রে ফেলেছিলে তুমি কথার স্রোতকে ।

কিন্তু তুমি নিজেই বললে, ‘কি জানেন, আমিও রক্তমাংসের মানুষ, মাটির পুতুল বা লোহার কলকল্লা নই ।’

আমি বললাম, ‘সেকথা তো আমি বলিনি ।’

‘বাবা মনে করে তাই । আপনাকে যেভাবে আমার কাছ থেকে তাড়িয়েছে, আগে আরও দুজনকে যেভাবে তাড়িয়েছিল, ঠিক সেই ভাবেই তাড়াতে চেয়েছে প্রদীপকেও । অনেক সহ করেছে, কিন্তু আর না । আমার শরীরও রক্তমাংসেরই, আমারও আর সকলের মতোই কামনা বাসনা আছে । টাকা রোজকারের একটা যন্ত্র ক’রে রাখতে চায় বাবা আমাকে । কেন, আমি কেন সব কামনাবাসনা বিসর্জন দিয়ে সংসারের কথা ভাববো রাতদিন ।’

বললাম, ‘শিপ্রা, এটা তোমার রাগের কথা ।’

তুমি জলে উঠলে, ‘না । অনেক সহ করেছে আমি । আর নয় । এবার হয় প্রদীপের সাথে পালাবো নাহয় বেহালাটাকে আছড়ে গুঁড়ো ক’রে দিয়ে চুপ ক’রে বসে থাকবো । দেখবো কি ক’রে বাবা আমাকে মেশিন বানিয়ে রাখে ।’

আমি বললাম, ‘এ তুমি কি বলছো শিপ্রা !’

তুমি বললে, ‘দেখবেন, আমি নিশ্চয় পালাবো প্রদীপের সাথে । ও রাজীই আছে ।’

আমি বললাম, ‘তুমি জানো না শিপ্রা, প্রদীপ বরকাকতী একটি আস্ত বদমাইস । লম্পট, মস্তপ ।’

‘জানি, সব জানি ।’ তুমি বললে, ‘কিন্তু উপায় কি বলুন । ও-ই একমাত্র পুরুষ যার আমাকে নিয়ে পালাবার হুঃসাহস আছে । এ পর্যন্ত তো আর একটা লোকেরও দেখা পেলাম না যার এই হুঃসাহস আছে ।’

আমি বললাম, ‘তুমি যদি একবার বলতে, তাহলে এই সাহস হয়তো আমারও হতো ।’

‘সব কথা কি মুখ কুটে বলা যায় ?’

‘প্রদীপ বরকাকতীকেই বা তবে বললে কি ক’রে ?’

‘আমি বলিনি, ও-ই বলেছে ।’

‘অমনি তুমি রাজী হয়ে গেলে ?’

‘কি করবো, আমার সব কামনাবাসনাকে ব্যর্থ ক’রে শুকিয়ে মেরে ফেলতে পারবো না আমি ।’

বললাম, 'না শিপ্রা, সে-কথা তোমাকে আমি বলছি না। কিন্তু এখনও সময় আছে, ভালো ক'রে ভেবে দেখো। এতে তুমি দুঃখই পাবে বেশি।'

তুমি বললে, 'অনেক ভেবে দেখেছি আমি। এ ছাড়া আর পথ নেই।'

আমি বললাম, 'কিন্তু শিপ্রা, তুমি শুধু নিজের দিকটাই দেখছো, তোমার বাবা ভাইবোন সকলে নির্ভর করে তোমার ওপর, তোমার উপার্জনে তাদের খাওয়াপরা লেখাপড়া চলে, তাদের দিন চলবে কি ক'রে? এ-কথাটা তোমাকে ভেবে দেখতেই হবে।'

তুমি বললে, 'অনেক ভেবেছি ওদের কথা, নিজের দিকে তাকাইনি এতোদিন। এবার নিজের কথা ভাববো।'

আমি বললাম, 'তাহলে আমার বলবার আর কিছু নেই।'

মোরেলো থেকে বেরিয়ে তুমি চলে গেলে বাড়ি, আমি ফিরে এলাম মেসে। তারপর চা জলখাবার খেয়ে আবার বেরিয়েছিলাম পুলিশবাজারে একচকর ঘুরে আসতে। সন্কে হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। আকাশে মেঘ ছিল ভারতি, তারা দেখা যাচ্ছিল না একটাও। ঘুরতে ঘুরতে কেলভিন সিনেমার সামনে দেখলাম প্রদীপ বরকাকতীকে। সঙ্গে একটি খাসিয়া মেয়ে।

তারপর ফিরে এসে লিখতে বসেছি। তোমার কথা ভাবলে অবাক লাগছে। প্রদীপ বরকাকতী মস্তপ লম্পট বদমাইস একথা জানো, তবু.....আশ্চর্য! শিপ্রা, তোমাকে আর পাঁচজনের চাইতে বেশি জানি, বুঝি, এ গর্ব আমার ভেঙে গেছে। চকচকে খাপখোলা তলোয়ারের মতো ঝলু এবং স্পষ্ট, অকম্পিত এবং নির্দয়, এমন কোনো মেয়ে আমি আগে দেখিনি।

তোমার গল্প আমি শেষ করতে পারিনি। অর্ধেক লেখা অবস্থায় পড়ে ছিলো এতোদিন। পুজোর সময় ছুটি নিয়ে কলকাতা গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম আমি। দুমাস ছুটি বাড়িয়ে সুস্থ হয়ে শিলঙ ফিরেছি প্রায় দিন সাত আগে। শীত এসে গেছে। হাড় কনকন ঠাণ্ডা। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠলে দেখা যায় কুচো কুচো বরফ পড়ে আছে ঘাসের শীষে, গেটের রেলিঙে, করোগেটেড টিনের চালে। পাইন পাতা আর সব গাছ পাতাবিহীন। রুদ্ধ। রুদ্ধ।

সব মিলে প্রায় আড়াইমাস আমি শিলঙে ছিলাম না। সে কারণেও কিছুটা এবং অসুস্থতার জন্তেই প্রধানত তোমার গল্প শেষ করতে পারিনি। তাছাড়া, জানতামও না শেষ পর্যন্ত কি করেছে তুমি। সত্যিই প্রদীপ বরকাকতীর সাথে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছো কি-না। আর, গেলেও প্রদীপ বরকাকতী সত্যিই বিয়ে করেছে কিনা তোমাকে। যদিও জানতাম সব কিছুই প্রায় ঠিক ছিল তোমাদের, তাহলেও, কেন জানি না মনের কোণে একটা সন্দেহ ছিলো : শেষ পর্যন্ত তুমি যাবে না প্রদীপ বরকাকতীর সাথে। আর, এই ভেবেই সাধনা পেয়েছিলাম তখন। তার কারণ, প্রদীপ বরকাকতীর মতো একটি লম্পট মস্তপ বদমাইসের সাথে তুমি নিজের জীবন জড়াও এটা আমি চাইনি, শিপ্রা, তোমার মঙ্গল হোক, তুমি সুখী হও জীবনে, এই আমি চেয়েছি, এই আমি চাইতাম। প্রদীপ বরকাকতীর সাথে নিজের জীবন জড়িয়ে

ফেললে তুমি ভুল করবে, এই আমার ধারণা ছিল। সত্যি সত্যিই ও বিয়ে করবে তোমাকে। এটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। আমার মনে হতো নিচ্ছে আশা দিয়ে তোমার সর্বনাশ করাটাই ওর একমাত্র উদ্দেশ্য। নিজের কামনা বাসনা চরিতার্থ করে তারপর গভীর কলঙ্কের পাঁকে তোমাকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবে প্রদীপ বরকাকতী। এ ধরনের ছেলেরা তাই করে।

পরশুদিন রাতে প্রদীপ বরকাকতী এবং তোমাকে দেখে আমার এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে। বিকেলে গলফ লিংকসে বেড়াতে গিয়েছিলাম। অনেকদিন বাদে। গলফ লিংকসের ময়ূহ সবুজ ঘাস গালিচা বরফ পড়ে পড়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। খড়ের মতো হলদে। উচুনিচু ডেউ খেলানো মাঠ মাঝখান দিয়ে কালো চুলের ফিতের মতো আঁকাবাঁকা রাস্তা আর মাঠের ধার দিয়ে সার বাঁধা পাইনের বন দূরে দূরে ধোঁয়া ধোঁয়া পাহাড় অনেকদিন বাদে অত্যন্ত ভালো লাগছিল। ধীরে ধীরে সন্কে নেমে এলো, ঝিকমিক তারার ঝাঁক হেসে উঠলো, শিলং পাহাড়ের মাথায় জ্বলে উঠলো জোনাকি আলো। কনকন ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় নাকমুখকান জ্বালা করছিল আমার। তবু বসে ছিলাম আবিষ্ট হয়ে। কিছুক্ষণ পরে চাঁদ উঠলো, নিষ্ঠে নোহনর মদির আলোয় চকচক করে উঠলো মাঠের ওপরের ঘন কুয়াশা।

রাত্রিরবেলা এবং অমন হাডকনকন ঠাণ্ডার মধ্যে প্রদীপ বরকাকতী এবং তোমাকে গলফ লিংকসে দেখবো চিন্তাই করিনি। চনকে উঠেছিলাম। শিশির ভেজা মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কুয়াশার ঘন আবরণের আড়ালে মিলিয়ে গেলে তোমরা। আমার গায়ের প্রায় পাশ দিয়েই গেলে সেজন্তেই চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু তোমরা আমাকে দেখোনি। আমার কেমন যেন জেদ চেপে গিয়েছিলো। তোমরা চলে যাবার পর উঠে পিছু নিলাম। মাঠ গিয়ে যেখানে মিশেছে পাইনবনের সাথে সেখানে গিয়ে বসলে ছুজন। পাশাপাশি। আমি তোমাদেরকে ছেড়ে প্রায় একশো গজ দূর দিয়ে গিয়ে চুকলাম পাইনবনের ভেতরে, তারপর পাইনবনের ভেতর দিয়ে সম্ভর্পণে পা টিপে গিয়ে এমন জায়গায় বসলাম যেখান থেকে তোমাদের আমি স্পষ্ট দেখতে পাবো কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না। ঘুরে এসে যখন পাইনবনের ভেতর তোমাদের পেছনে বসলাম তখন তোমার কোলে মাথা দিয়ে ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়েছে প্রদীপ বরকাকতী। আর, তার মাথায় আঙুল দিয়ে চূলে বিলি কাটছে তুমি। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আমাকে উঠতে হলো। না, চোখের ওপর এ-দৃশ্য দেখা যায় না। আমিও রক্তমাংসের মানুষ, মাটির পুতুল বা লোহালকড়ের কলকল্লা নই। সম্ভর্পণে পা টিপে টিপে আবার ঘুরপথে উঠে চলে এলাম। ঈর্ষার আলা যৈ ছিল না তা নয়, ছিলো, তবু শান্তি পেলাম একথা ভেবে : প্রদীপ বরকাকতী তাহলে বিয়ে করেছে তোমাকে। তোমার রক্তমাংসের শরীরের কামনা বাসনা যে চরিতার্থ করেছে সে এটা তো চোখের ওপরই দেখে এসেছি।

ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে অসাড় হয়ে গিয়েছিল। জেল রোডে উঠে হাঁটতে হাঁটতে অরুণ রেট্রুয়েন্টে এসে চুকলাম। গরম এক কাপ চা খেয়ে সুস্থ মনে হলো খানিকটা। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম পুলিশবাজারের মোড়ে। তারপর সানি

হোটেলের এক বন্ধুর ঘরে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে প্রায় সাড়ে আটটার সময় উঠলাম, এবার মেসে ফিরতে হবে। পুলিশবাজারের মোড়ে অপ্রত্যাশিতভাবে তোমার সাথে আবার দেখা হয়ে গেল। তুমি একা। বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিলে। দেখে কৌতূহল হলো : একা কেন, প্রদীপ বরকাকতী কোথায় গেল ? তুমি আমায় দেখতে পাওনি তবু আমি নিজেই গেলাম।

‘এই যে শিপ্রা কেমন আছো ?

তুমি চমকে উঠলে ‘ও আপনি ?

বললাম ‘তারপর তোমার খবর কি ?

‘খবর আর কি এই একরকম। কবে ফিরলেন কলকাতা থেকে ?

বললাম ‘এই তো দিন সাত আগে।

‘অনেকদিন তাহলে কাটিয়ে এলেন বাড়িতে।’

‘বাধ্য হয়ে।’

‘বাধ্য হয়ে ?’ তুমি প্রশ্ন করলে ‘সেটা কিরকম ?’

‘অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। টাইফয়েড।’

‘তাই নাকি ? এখন শরীর কেমন ?’

বললাম ‘দেখতেই পাচ্ছে। সম্পূর্ণ সুস্থ।’

তারপর আর কথা খুঁজে পেলাম না। দুচার মিনিট চুপ করে রইলাম আমি।

তুমিও। চুপ করে থাকতে থাকতেই আবার খুঁজে পেলাম কথার খেই।

জিজ্ঞাসা করলাম ‘তোমার বাবা কেমন আছেন ?

‘বাবা ? বাবা মারা গেছেন।’ তুমি নতমুখে জবাব দিলে।

‘মারা গেছেন ? কবে ?’

‘মাস দুই হয়ে গেছে।’

‘হঠাৎ মারা গেলেন, কি হয়েছিল ?’

‘কিছুই হয়নি। হার্ট ফেলিওর।’

আবার চুপচাপ। কথা কুরিয়ে গেছে। এতোক্ষণ লক্ষ্য করিনি হঠাৎ তাকিয়ে দেখে অবাক হলাম : তোমার সিঁধি নিরং নিদাগ। তাহলে কি আমার সঙ্গেই সতি ? প্রদীপ বরকাকতী বিয়ে করেনি তোমাকে ? কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আমি যে দেখলাম.....

বললাম ‘তুমি একা যে ?’

মুখ তুলে তাকিয়ে তুমি বললে ‘হ্যাঁ আমি একাই।’

‘প্রদীপ বরকাকতীর খবর কি ?’

‘আমি কি করে জানবো ?’

বললাম ‘তুমি জানবে না তো জানবে কে ?’ অমাকে আঘাত দেবার লোভ পেয়ে বসলো আমাকে।

আবার বললাম ‘এই তো কিছুক্ষণ আগেই গলফ লিংকসে দেখলাম তোমাদের দুজনকে একসাথে।’

মুহুর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তোমার মুখচোখ ।

‘বললে আমাকে দেখেছেন গলফ লিংকসে ?’

বললাম ‘হ্যাঁ তোমাকে তো বটেই প্রদীপ বরকাকতীকেও ।’

‘আপনি ভুল দেখেছেন । তুমি বললে ‘আমি তো আজ গলফ লিংকসে বাইনি ।’

এই প্রথম তোমার কথা শুনে ঘৃণা বোধ হলো আমার । এর আগে তোমার মনের বলিষ্ঠতার এবং অসংকোচ কথাবার্তার চকচকে ঝাপখোলা তলোয়ারের মতো গন্ধু এবং স্ফুট ব্যবহারের প্রশংসা করতাম মনে মনে । কিন্তু কতোদূর নেমে গেছে তুমি এবং একথা নিজেও জানো প্রদীপ বরকাকতীর সাথে গলফ লিংকসের মাঠে অন্ধকার রাত্রিতে যে কারণে গিয়েছিল সেটা সম্বন্ধে একটা অপরাধ বোধ তোমার নিজের মনেই আছে, তা না হলে একথা অস্বীকার করতে না, অস্বীকার করেই তুমি নিজেকে ছোট এবং অপরাধী প্রমাণ করলে । প্রমাণ : তুমি অতি সাধারণ অসামান্য নও ।

ভাবলাম জোর গলায় বলি : না আমার দেখতে ভুল হয়নি । ঠিকই দেখেছি এবং চিনেছি তোমাকে । কিন্তু বলতে গিয়েও খেমে গেলাম । কি হবে বলে । মগন অস্বীকার করছে একবার তখন আর কিছুতেই স্বীকার করবে না ।

বললাম ‘হবে হয়তো ভুল দেখেছি । কিন্তু তোমাদের বিয়ের কি হলো ?’

একমুহুর্ত খেমে ছবাব দিলে তুমি কই আর হলো, বাবা মরে আমাকে ঠেকিয়ে গেছে । ছোট ছোট ভাইগুলোর মারা কাটাতে পারলাম না । আমি চলে গেলে ওরা না খেয়ে মারা যেতো ।

আমি বললাম ‘তা তো বটেই কর্তব্য সব আগে ।’

‘কর্তব্য করতে করতেই ফুরিয়ে যাবে একদিন ।’ তুমি বললে নতমুখে ।

আমি আর কথা বাড়ালাম না । ইতিমধ্যে বাস এসে গেল । তোমাকে বাসে দিয়ে আমি চলে এলাম মেসে । তারপর থেকেই ভাবলে আশ্চর্য লাগছে । কর্তব্য আর রক্তমাংসের শরীরের কান্না বাসনার টানাপোড়েনে তাঁতের মাকুর মতো এদিক থেকে ওদিকে ঘুরতে হচ্ছে তোমাকে ।

ভূদান যজ্ঞ—প্রতিক্রিয়া না বিপ্লব

শৈলেনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রামদান হচ্ছে ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনের পূর্ণ বিকশিত রূপ। ভূদান যজ্ঞের সূত্রপাত হয়েছিল ভূমিহীনদের কিছু ভূমি দেওয়ার মারফৎ। তারপর দেশ থেকে ভূমিহীনতা মেটানো ভূদানযজ্ঞ-কর্মীদের লক্ষ্য হোল। অতঃপর উড়িষ্সায় ঘোষণা করা হোল, “আম্রের পঁায়ে ভূমির মালিক রহিবে নাহি, রহিবে নাহি।” অর্থাৎ আমাদের গ্রামে ভূমির মালিক কেউ থাকবে না। এই সঙ্কল্পের সার্বক রূপায়ণ হচ্ছে গ্রামদান। গ্রামদানী গ্রামে ভূমির কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না। প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী কর্তৃক নিবিরোধে নির্বাচিত গ্রামসমিতি গ্রামের সমস্ত ভূমির মালিক হয়। প্রত্যেক পরিবারের পোস্ত সংখ্যা ও চাষ করার ক্ষমতা বিচার করে গ্রামসমিতি গ্রামের ভূমির পুনর্বণ্টন করে। এ ভূমি দান বিক্রয় বা বর্গা দেবার অধিকার কোনো পরিবারের থাকে না। নিজেদের পরিবারপরিচনের সহায়তায় প্রত্যেক ভাবে কৃষিকর্ম করার জন্যেই গ্রামসমিতির কাছ থেকে পরিবারগুলি ভূমি পেয়ে থাকে। অনাথ বিধবা ও অক্ষমদের ভূমি চাষ করার ব্যবস্থা গ্রামসমিতি করে। কিছুটা ভূমি সমবায়মূলক কৃষি করার জন্যে পৃথক রেখে দেওয়া হয়। এই ভূমির ফসলে গ্রামের খাজনা দেওয়া হয় এবং শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্তবিধ উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

কৃষকরা ইচ্ছা করলে ব্যক্তিগত পরিবারের ভিত্তিতে বা কয়েকটি পরিবার সম্মিলিত হয়ে কৃষিকার্য করতে পারে। সামুদায়িক (কলেকটিভ) বা সমবায় মূলক (কো-অপারেটিভ) কোনো প্রকার বিশেষ ধরনের কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ করার জন্যে গ্রামবাসীকে চাপ দেওয়া হয় না। কারণ চাপ দেওয়া অহিংসানীতি বিরোধী এবং স্ত্রী গণতন্ত্রও বাধা চাপের আওতায় গড়ে উঠতে পারে না। আর সমবায় বা সহযোগিতা ছোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। স্বৈচ্ছামূলক সহযোগিতার নামই সমবায়। অতএব গ্রামদানী গ্রামে অল্প পরিমাণ ভূমিতে সমবায়মূলক পদ্ধতিতে চাষ করে সর্বসাধারণের হিতার্থে ফসল উৎপাদন করার মারফৎ স্বৈচ্ছামূলক সহযোগিতার শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রয়োজন দেখা দিলে গ্রামদানী গ্রামে কয়েক বৎসর পর পর ভূমির পুনর্বণ্টন করা হবে। কোনো পরিবার তাদের স্বস্তির পরিবর্তন করলে বা কোনো পরিবারের লোক সংখ্যার তারতম্য হলে এর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে গ্রামদানী গ্রাম একটি বিশাল পরিবারের রূপ ধারণ করে। গ্রামের উৎসব-আনন্দাশুষ্ঠান ইত্যাদি সবই সামূহিক হয়। এমন কি, কোনো পরিবারের পুত্রকন্টার বিবাহও সমগ্র গ্রামের কর্তব্য বলে বিবেচিত হয় এবং এই জাতীয় অনুষ্ঠানের দায়িত্বভার সকলে সমানভাবে নিয়ে থাকেন।

ভূমির পুনর্বণ্টনের পর গ্রামসমিতি গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে কৃষি ও শ্রমশিল্পের (ইণ্ডাস্ট্রী) পরিকল্পনা রচনা করবে। গ্রামীণ পরিকল্পনা

বর্তমানের মত পুঁজি বা বৃহৎ কেন্দ্রীত শ্রমশিল্প আধারিত না-হয়ে শ্রমকেন্দ্রিক হবে। অর্থাৎ প্রতিটি কর্মক্ষম ব্যক্তিকে সামাজিক দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় উৎপাদনমূলক কর্মে নিয়োগ করা গ্রামীন পরিকল্পনার মূলধার হবে। গ্রামরাজ্যে কোনো দেশবাসী বেকার থাকবে না। এই জন্য খুবোতই গ্রামের নিত্যব্যবহার্য পণ্যরাশি কুটির শিল্পের দ্বারা উৎপাদন করতে হবে। এতে একদিকে যেমন সকলকে কাজ দেওয়া যাবে, অল্পদিকে সেইভাবে দেশের শিল্পীকরণের জন্যে অনর্থক বেশি পুঁজির অপেক্ষা করতে হবে না। অর্থনীতির ছাত্র মাঝেই জানেন যে যন্ত্রকৌশলের (টেকনোলজী) বর্তমান মান বজায় রেখে একজন কর্মহীনকে কর্মে নিযুক্ত করার জন্যে অন্তত ৫০০০ টাকা নিয়োগ করা প্রয়োজন। আর ব্যাশনলাইফেশনের শরণ নিলে তো এই উদ্দেশ্যে আরও বহুগুণ বেশি পুঁজি লগ্নি করতে হয়। অথচ কুটিরশিল্প মারফৎ একজনকে কাজ দেবার জন্যে এর শতাংশের একাংশ অর্থও লাগে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে চরখা, বন্দর, চৌকি, ঘানি ইত্যাদি গাছীজীর বাহুল্যতার নিদর্শন নয় বা ঘড়ির কাঁটাকে পিছিয়ে দেবার বড়যন্ত্রও নয়। অত্যন্ত সুদৃঢ় আর্থিক বনিয়াদের উপর কুটিরশিল্পের অবস্থিতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই কারণেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূলনীতি নির্ধারণকালে কুটিরশিল্পের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

তবে কুটিরশিল্পের শক্তির শক্তি খর্ব না-করে কেবল কুটিরশিল্প মারফৎ উৎপাদন করার কথা ভাবলেই বাস্তবিত সুফল পাওয়া যাবে না। কুটিরশিল্প মারফত নিত্য ব্যবহার্য পণ্য উৎপাদন করার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীত পদ্ধতিতে ঐ-সব পণ্য উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। দেশের বর্তমান অবস্থায় সরকার এতে সম্মত হবেন না। তাই গ্রামদানী গ্রামের অধিবাসীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে মিলজাত দ্রব্য বয়কট করবেন। গ্রামীন অর্থনীতির বনিয়াদ হবে গ্রাম একমুকে (ইউনিট) যথাসম্ভব স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা। অর্থাৎ গ্রামের শ্রমশক্তিকে পূর্ণমাত্রায় কর্মে নিয়োগ করে গ্রামের কাঁচামালকে গ্রামেই পাকা মালে (ফিনিগ্‌ড প্রোডাক্ট) রূপান্তরিত করা।

গ্রামদানী গ্রামের বর্তমান স্বরূপ ও ভবিষ্যত প্রগতির রূপরেখা সংক্ষেপে বিবৃত করা হোল। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে বিনোবাজীর উত্তর প্রদেশ পরিভ্রমণের সময় প্রথম গ্রামদান পাওয়া যায়। হামিরপুর জেলার মংরোঠ গ্রাম সর্বপ্রথম বিশ্বে অহিংস পন্থায় নব সমাজ নির্মাণের মর্যাদার অধিকারী হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ২৫০০ গ্রাম এইভাবে গ্রামরাজ্য স্থাপনা করার জন্যে স্বেচ্ছায় গ্রামদান করেছে ও প্রতিদিন এর সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। এর ভিতর ১৩০০ গ্রামই আবার উড়িষ্যার কোরাপুট জেলায় পাওয়া গেছে। গ্রামদানের ভিতর সর্বোদয় সমাজ ব্যবস্থা মূর্ত হবার বীজ রয়েছে বলে এ-বছরের সর্বোদয় সম্মেলনে (কেন্দ্রলের কালাত্তি নাম গ্রামে যে নামের ৯ই ও ১০ই অনুষ্ঠিত হয়) ভূদান কমিটি গ্রামদানের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগের সিদ্ধান্ত করেছে।

ভূদানের সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তিদান, শ্রমদান ও বুদ্ধিদান ইত্যাদি যে-সব কর্মসূচী চলেছে এবার তার কথা আলোচনা করা যেতে পারে। ভূদানের তব দর্শনের বীজ উপনিষদের একটি প্রোকে পাওয়া যায়—ঈশাবাস্তমিদং সর্বম্, বৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ,

তেন ত্যজেন ভুক্তিখা না গৃধঃ কস্তা স্বিক্তনম্ । অর্থাৎ এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের, তাই ত্যাগ করে ভোগ কর । অপর কারও সম্পদের প্রতি লোভ রেখা না । ঋষিবাক্যের উপর আধার করে বিনোবাজী ঘোষণা করলেন যে বায়ু, জল ও সূর্য কিরণের মত ভূমিও ঈশ্বর বা সমাজের—সবই ভূমি গোপালকী । সম্পত্তিদান, শ্রমদান ও বুদ্ধিদানের পিছনেও ঐ একই প্রেরণা বিদ্যমান । এক্ষেত্রেও ঐ “সমাজায় ইদং, ন নম”—অর্থাৎ এ সমাজের, আমার নয়—এই বিশ্বাস । সম্পত্তির সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমের সংযুক্তিকরণে । এতদুভয়ের কোনোটিই আমাদের কৃতি নয় । প্রাকৃতিক সম্পদ তো সমাজের বটেই, আমাদের শ্রমশক্তিও সমাজের । সমাজের ভিতর আমরা থাকি ও কাজ করি বলেই আমাদের শ্রমশক্তি ও বুদ্ধিশক্তি বিকশিত হয় । সমাজ থেকে দূরে একলা কোনো নির্জনস্থানে থাকলে আমাদের শ্রমশক্তি বা বুদ্ধিশক্তি—কোনোটিরই বিকাশ সম্ভবপর হোত না । আর বুদ্ধিশক্তির প্রাথমিক খোরাকও আমরা সমাজ থেকে পাই । মানুষের সাহচর্য, বিভিন্ন গ্রন্থ, বিদ্যালয় ইত্যাদি যে সব সুবিধার কারণে আমরা জ্ঞান আহরণ করি, তা সমাজেরই অবদান । এইভাবে সমাজের ভিতরে থেকে ব্যবসায় না করলে অর্থাৎ অন্য মানুষের সম্পর্কে না-এলে ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারাও সম্পদ সৃষ্টি করা যেত না । এইজন্মে আমাদের সম্পত্তি, শারীরিক শ্রমশক্তি বা বুদ্ধি—এ-সবের উপরই সমাজের পূর্ণ অধিকার আছে । অতএব সর্বোদয় আদর্শের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে এ সবের সমাজীকরণ । রাষ্ট্রীয়করণ ও সমাজীকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে । রাষ্ট্রীয়করণ শেষ অবধি আমলাতন্ত্রের এক নায়কত্বে পরিণত হয় । সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের মত একটা নির্গুণ (এ্যাবট্রাক্ট) আইডিয়া দ্বারা অনুপ্রাণিতও হয় না । রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিচালন ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের আয়ত্ত বহির্ভূত । পক্ষান্তরে সমাজ সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার ভিতর । এর পরিচালন, সঞ্চালন ও নীতি নির্ধারণ সাধারণ মানুষ করতে পারে । তাই অহিংস সমাজে রাষ্ট্রীয়করণের পরিবর্তে যথাসম্ভব সমাজীকরণ হবে ।

ভূদান আন্দোলনের কর্মীরা সমাজীকরণের এই আদর্শ সকলকে বুঝিয়ে তাঁদের নিজ নিজ সম্পত্তি, বুদ্ধি ও শ্রমশক্তির সমাজীকরণের প্রেরণা দেন । অন্তর্বর্তী কালের জন্মে এ-সবের মালিকরা সমাজের হয়ে এগুলির অছি স্বরূপ তাঁরা রাখতে পারেন এবং অন্তিম লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ নিজ উপার্জন, শ্রমশক্তি ও বুদ্ধির একাংশ সমাজকে দিতে পারেন । সম্পত্তিদান চাঁদা সংগ্রহের নব রূপ নয় । সম্পত্তিদানের অর্থ ভূদান কর্মীরা সংগ্রহ করেন না । দাতা স্বয়ং নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রদেয় অংশ সমাজ হিতকর কার্কে ব্যয় করেন ও বৎসরের শেষে এর হিসাব বিনোবাজী বা সর্ব সেবা সমাজের কাছে দাখিল করেন । এর ফলে কোনো অর্থকোষ সংগ্রহ করা রূপী অনিবার্য কেন্দ্রিকরণের পাপ থেকে যেমন মুক্তি পাওয়া যায়, তেমনি দাতাকেও ক্রমশঃ সমাজ সেবকে রূপান্তরিত করা হয় । কেবল অর্থ দিয়ে তাঁর নিষ্কৃতি নেই, সমাজ কল্যাণের জন্মে তার সহায় করার দায়িত্বও তাঁর ।

ধীর সম্পত্তি নেই তিনি সমাজের জন্মে নিয়মিতভাবে কিছু বৌদ্ধিক সেবা দেবেন এবং তাও যার নেই তিনি শ্রমদান করবেন ।

অর্থাৎ সর্বোদয় দর্শন আধারিত ভূদান যত্ন আন্দোলন সমাজের সর্বস্বব্যাপী দানের এক আন্দোলন। সকলেরই সমাজের জন্যে কিছু না কিছু দান করা কর্তব্য—এই এর শিক্ষা। এই দিক থেকে দেখতে গেলে পুঁজিবাদী দর্শন ও সাম্যবাদী দর্শনে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। কারণ উভয় মতবাদেই অধিকাধিক প্রাপ্তির উপর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রিত করা হয়েছে। পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের ভিত্তর মৌলিক পার্থক্য কেবল প্রাপকের, অর্থাৎ কে পাবে—পুঁজিপতি না শ্রমিক? তাই মূল বিচারে উভয়কেই সমগোত্রীয় আখ্যা দেওয়া যায়। ভূদান যত্ন আন্দোলন মানুষের মনোবৃত্তির মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে সমাজ থেকে অধিক পরিমাণে নেওয়া নয়, সমাজকে অধিকাধিক পরিমাণে দেওয়াকেই নব মূল্যবোধ রূপে স্থাপনা করার প্রয়াস করেছে। সমাজের সুস্থ বিকাশের পক্ষে এই মনোবৃত্তির অনুশীলন যে কত প্রয়োজনীয়—এ কথা উল্লেখ করাই বাহ্যিক।

কিন্তু কে করবে এই কাজ? গ্রামনয় ভারতের সাড়ে পাঁচ লক্ষ কেন্দ্রে কে নিয়ে যাবে এই অহিংস বিপ্লবের বার্তা? জাতির জীবনের নব রূপায়ণরূপী যত্নকর্মে পূর্ণাঙ্গি দেবার জন্যে কে করবে সেই সুকঠোর তপশ্চর্যা? এর উত্তর হচ্ছে জীবন দান। একদা দেশমাতৃকার বন্ধনমোচনের জন্যে যেমন লক্ষ লক্ষ যুবকযুবতীর তরুণ প্রাণের ডালি প্রয়োজন হয়েছিল, আজ আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিপ্লব সংসাধনের জন্যেও তেমনি লক্ষ লক্ষ তরুণতরুণীর অবিচল নিষ্ঠামুক্ত অক্লান্ত সেবা চাই। এরা জনগণের একজন হয়ে তাদের সেবক হিসাবে তাদের মাঝে বসবাস করবে। কোনো পদ বা প্রাপ্তির সম্ভাবনা তাদের কাম্য হবে না, নিকাম সেবাই তাদের ধ্রুবতারা হয়ে পরিচালিত করবে। কোনো ব্যক্তি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠি অথবা নেতা বা দলের স্বার্থসিদ্ধি তাদের ধ্যেয় হবে না, সমগ্র সমাজের অবিভাজ্য সেবা তাদের ভ্রত হবে। এইরকম লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণী নিয়ে গঠিত নিকাম লোকসেবকদল নব সমাজের বনিয়াদ স্বরূপ হবে। শিব যেমন দেবতা হয়েও কখনও তাঁর অনুগামী “গণকে” ছেড়ে যান না, তাঁদের মাঝেই থাকেন, তেমনি শিবশক্তির ধারক এইসব লোকসেবকেরা উচ্চপদের চাকুরী বা পরিষদ ও লোকসভার সদস্য হয়ে জনগণের সমাজ থেকে দূরে সরে যাবেন না। এরা জনসাধারণের মাঝে থেকেই তাদের সেবা করবেন এবং জনগণের উপর কোনো অন্যায় অনুষ্ঠিত হোলে অহিংস ভাওবের সৃষ্টি করে অবিচারের প্রতিকার করবেন।

প্রত্যুত এ বিচারধারা কিছু অভিনব নয়। পাশ্চাত্যেও চিরন্তনীন গ্রহরাকে স্বাধীনতার মূল্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই পাঁচবছরে একবার ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করলেই স্বাধীনতাকামীরা কাজ শেষ হয় না। অথবা সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থা কয়েম করলেই তা সর্বজ্বরহর বটিকা বলে প্রমাণিত হয় না। বস্তুত মানব কর্তৃক আবিষ্কৃত কোনো সমাধানই শেষ মীমাংসা নয়। গণতন্ত্র বা সাম্যবাদ সবই এই পর্যায়ভুক্ত। তাই সর্বোদয় বিচারের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, বিশেষ এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা কয়েম করলেই চিরকালের মত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল ভাবা ভুল। সুস্থ গণতান্ত্রিক সমাজের জন্যে সরকারী ও বিরোধী দলের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতালাভের আকাঙ্ক্ষা বিহীন এক দল নিঃস্বার্থ লোকসেবকও সমাজে থাকা চাই। এরা নিজেরা কখনও

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চাইবে না। সেবার দ্বারা সনাজে যে-শক্তি লাভ করবেন, তাতে সরকারী ও বিরোধী দল—উভয় পক্ষকেই সংযত রেখে জনস্বার্থ অক্ষুণ্ণ হবার জন্তে বাধ্য করবেন।

দেশে নিকাম সেবকদের এইরকম এক বাহিনী সৃষ্টির ভয়ে বিনোবাজী দেশবাসীর কাছে জীবনদানের আহ্বান জানাচ্ছেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

॥ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ॥

মাসিক অগ্রণীকে কিভাবে আরও সমৃদ্ধ করে তোলা যায়, এ-সম্পর্কে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি বিশেষভাবেই চিন্তা করছেন। কী কী বিষয়বস্তুর পরিবর্তন, সংশোধন বা সংযোজন হলে পাঠক-পাঠিকার কাছে অগ্রণী অধিকতর সমাদৃত হয়, তা আমরা জানতে একান্ত ইচ্ছুক।

ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজ্যে অগ্রণীর যত পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, অনুগ্রাহক-অনুগ্রাহিকা এবং লেখক-লেখিকা ছড়িয়ে রয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁরা যেন তাঁদের সৃষ্টিশীল মতামত আমাদের অবিলম্বে জানান। প্রত্যেকটি মতামতের উপরই আমরা গুরুত্ব আরোপ করব। ঐ মতামতের উপর ভিত্তি করেই আমরা অগ্রণীর পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে পরিবর্তন আনবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

অগ্রণীতে ধারাবাহিকভাবে নানাদেশীয় সংস্কৃতি-সংবাদ অথবা ভ্রমণকাহিনীর পরিবেশন, চলচ্চিত্রের খবরাখবরে ছবি সংযোজন বা অন্য কিছু, ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা দেওয়া, গল্প-প্রবন্ধ-কবিতা কোনটি বাড়ানো কোনটি কমানো, অগ্রণীর প্রচ্ছদ বা অঙ্গসজ্জা কেমন হওয়া উচিত—ইত্যাদি সম্পর্কে খুঁটিনাটি মতামত প্রত্যেকেই অনুগ্রহ করে পাঠান।

কার্যাব্যক্ষ, অগ্রণী

॥ ১৫ ॥

আরো বছরখানেক পরে আপিসে অবনী প্রসাদের কাছ থেকে ফোনে খবর পেলো যে, মাধবের ছেলে বাচ্চু পণ্ড নারা গেল কলেরা হয়ে। শুনে অবনী ছুটি নিয়ে ছুটলো মাধবের বাড়ি। সেই চাকুরিয়া।

মাধবের মায়ের ক্রন্দনরোল অবনী শুনতে পেলো রাস্তা থেকেই। কড়া নাড়তে মাধবই খুললো দরজা। অবনীকে দেখেই মাধবের চোখ দুটি জলে ভ'রে গেল, ঠোঁট কানড়ে ধ'রে নিজেসঙ্গে সামলে নিয়ে, অবনীকে হাত-ধ'রে নিয়ে গেল তার ঘরে।

ঘরের এককোণে বিভা মুখ খুবড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে প'ড়ে আছে।

‘এ আনি আগেই জানতুম অবনী, এ আনি আগেই জানতুম’—মাধব বিকৃত গলায় বলতে থাকে, ‘বাচ্চু আমার বড়ো অভিনানী ছেলে ছিলো, তাই এমনি ক'রেই আনাকে শাস্তি দিয়ে চ'লে গেল। মানসীর কোনো দোষ নেই, আমারই সমস্ত দোষ, আমারই দোষে—’

ষট্ঠাখানেক ধ'রে অবনী নির্বাক একটা শুড়পিণ্ডের মতো মাধবের বিলাপ শুনলো। বিভা মুখ তুললে না কিছুতেই।

বিদায় দেবার আগে মাধব বলে অবনীকে রাস্তায়, ‘মানসী বলছে হাঁসপাতালে আর যাবে না। ট্রেনিঙের এখানেই ইস্তফা। ওর পরীক্ষার বাকি আর মাস পাঁচ ছয়। আনি অবিশ্টি বলছি, সর্বনাশ যা হবার সে তো হয়েই গেল, এতদিনই যখন টানলে তখন পরীক্ষাটা দিয়ে ডিপ্লোমাটা নিয়ে রাখাই তো ভালো, যা দুদিনের বাজার। তাই না? তা ও আর কিছুতেই সে-সব কানে নিতে চাচ্ছে না। তুমি কী বলো?’

অবনী কিছুই বললে না এ-সম্বন্ধে।

মাস ছয়েক পরে আবার এক বুধবার।

‘বিশ্রাম’-এ জমায়েৎ হয়েছে তিন বন্ধু।

• মাধব বলছিলো হাত-মুখ নেড়ে, মানসীর ট্রেনিং শেষ হয়েছে, পরীক্ষা ভালোই দিয়েছে, সুভরাং পাস করবে সন্দেহবিহীন। আজ সাতদিন হ'লো সে বেহালায় নতুন বাসা ভাড়া নিয়েছে, আগামী রববার অবনী আর বাকুগীর, প্রসাদ আর কস্তিকার নেমস্তন্ন তার নতুন বাসায়। মেয়ে বুলবুলিকে নিয়ে নতুন বাসায় মানসী-মাধবের নতুন-ক'রে সংসার গুছনো প্রায়-সম্পূর্ণ। মানসীর ছকুম—মাধব জানায় হাসিমুখে—ওরা যদি সবাই তার নতুন বাসায় আসচে রববার বেলা এগারোটোর মধ্যে না

পৌছয়, তাহলে ভয়ানক-কিছু শাস্তির ব্যবস্থা তাকে করতে হবে। ব'লে মাধব উচ্ছ্বসিত আবেগে চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে হাসতে থাকে।

‘আর সবচে বড়ো কথা কি জানো’—মাধব ব'লে চলে, ‘আমার নতুন বাসা সম্পর্কে আমি ঠিক যেমনটি চেয়েছিলুম ঠিক তেমনটিই পেইছি। চতুর্দিক খোলানো বেশ সুন্দর দেখে নিজের একখানা বাড়ি হবে। ছোটো হোক, ছোটো সংসার ছোটো-বাড়িই ভালো, কিন্তু আলো-হাওয়া থাকবে অব্যাহত। তোমাদের কবিতার ভাষায় বলা যায় : মনে ছিলো আশা, ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে, ধন নয় মান নয় কিছু ভালোবাসা, এইটুকু আশা ! তা সে আশা ভাই আমার পুরনো এতদিনে। ভাড়াটা একটু বেশি, পঞ্চাশ। তা একটা মাস একটু কষ্ট হবে, আগস্ট মাস থেকে তো মানসী চাকরীতে ঢুকে যাচ্ছে, তখন আমার টিউশনি করারও দরকার হবে না আর। নিজের মেয়েটাকেই ভালো ক'রে দেখাশোনা করতে পারব। ঠিক হয়েছে আমার সেই-যে এক বিধবা পিসি আছেন, তিনি এসে থাকবেন আমাদের সঙ্গে। কাজেই মানসী চাকরিতে বেরিয়ে গেলে বুলবুলিকে নিয়ে বিশেষ অসুবিধে হবে না। তাছাড়া মানসীর দিদি বলেছেন, একটি বিশ্বাসী ঝি তাঁর হাতে আছে তাকেও প'ওয়া যাবে ও-মাস থেকে। সত্যি বলছি ভাই, আই অ্যান্ড রিয়ার্লি হ্যাপি, রিয়ার্লি হ্যাপি’—ব'লে খুশিনাখা মুখে মাধব তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে।

‘কী বলো ভাই, আসচো তো তোমরা রববারে, আমাদের নতুন বাসায় ? আমাদের নতুন জীবন দেখতে ?’—মাধব উদ্ভাসিত মুখে নতুন উদ্দীপনায় বললো, ‘কী গো, ছুটনাই তোমরা চুপ মেরে আছো যে ? কী অবনী, কথা বলছো না কেন ? না না হাসলে হবে না, কথা দাও যে বাকুণীকে নিয়ে তুমি যাবে, আর তুমি কৃত্তিকাকে নিয়ে। কী ?’

‘আমি যাব ঠিকই’—অবনী বিব্রত গলায় বললো, ‘কিন্তু বাকুণী যাবে কিনা তা ওকে জিগোস না ক'রে কী-ক'রে বলি ?’

‘কেন রববার তো। রববার নিশ্চয়ই ইস্কুল খোলা থাকে না। তা'লে ?’

‘ইস্কুল নাই থাক, গান শেখানো থাকতে পারে, এখন আবার হিন্দীতে ভাতি হয়েছে বলিনি তোমাদের ? সেটা থাকতে পারে। অন্য কোন এনগেজমেন্টও থাকতে পারে। আগেকার সেই বাকুণী তো আর নেই—সেটা ভুলে যাও কেন।’

‘কব। আবার হিন্দী স্কুলেও চুকেছে গিয়ে ? উৎসাহের আর বিরাম নেই ? হিন্দীর বাই আবার কী-ক'রে হলো গো ? তুমিই চুকিয়ে দিলে বুঝি ?’

‘আদৌ না। দিন-কয়েক আগে নিজেই বললো হিন্দী পড়ব। বললাম পড়ো। বললে, অমন আলাপ কথা বললে হবে না, নিয়ে গিয়ে ভাতি করিয়ে দিয়ে আসবে চুলো। তাই দিলাম। এও মাস-দশেকের কোর্স। পাস করতে পারলে ইস্কুলে গৌটাকয়েক টাকা মাইনে বাড়বে, উৎসাহটা তাই-।’

‘অনেক দিন দেবি না বাকুণীকে’—মাধব বললো, ‘বোধ করি বছর দুই হবে। কি তারও বেশি। ওর স্কুল-ফাইনাল পাসের খাওয়া খেলান, তারপর স্কুলের সেই সীনিয়র টেনিং না কী—সেইটের খাওয়া খেলান, ব্যস তারপর আর দেখা হয়নি।

বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে। তোমার সঙ্গেও তো বাকুগীর সেইই লাস্ট দেখা, না প্রসাদ ?’

অন্যমনস্ক প্রসাদ ঘাড় নেড়ে সায় দিলো।

‘রববার যদি ‘ও না আসে’—মাধব ফের বললো, ‘তা’লে হয়তো ফের দেখা হবে ওর সেই হিন্দী পাসের খাওয়ার সময়! তাই না?’—ব’লে বিপুল কৌতুকে মাধব একা-একাই হো-হো হাসিতে ভেসে উঠলো।

‘কিন্তু বিয়েটা যে তোমরা নিটিয়ে ফেলছো না কেন কিছুই বুঝিনে বাবা। ছুজনাই তোমরা সমান। স্ট্যাটাস কো! সেই এক কথা! এক গৎ! কী, না মন-বোঝাবুঝি হচ্ছে! মন! বিধাতা তোমাদেরই শুধু মন দিয়েছেন! ধই নেই আর! বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, বোঝাবুঝির আর শেষ নেই! এদিকে জীবনটি পাত হয়ে যাচ্ছে!’

‘খানো খানো’—প্রসাদ ধমকে উঠলো, ‘বোকার মতো হৈটচ কোরো না।’

‘কী হৈটচ-টা করা হ’লো বোকার মতো?’—মাধবও গরম হয়ে উঠলো, ‘অত বাজে মেজাজ ব’লেই কোনো কাজ গুছিয়ে উঠতে পারো না সেটা বুঝবে না। আমার যখন অন্তায় হচ্ছিলো মানসীকে নিয়ে, তখন তো তোমাদের উপদেশ আর গালাগালির ঠেলায় আমাকে চোখে অন্ধকার দেখিয়ে ছেড়েছিলে, তা নিজেদের বেলা তোমরা অন্ধ হলে সে-কথা বলা যাবে না?’

শুকনো গাভীরে অবনী বললো, ‘তা তুমি বলতে পারো হে। তোমার এখন বলবার মুখ সত্যিই হয়েছে। সত্যিই হয়েছে। মনে হচ্ছে প্রসাদও বলবে দু-দিন বাদেই। তাই না প্রসাদ? তোমাদের এবারকার জানিটা কীর’ম হলো? কোথায় কোথায় গিছে বেশ সবিস্তারে বলা?’

‘সবিস্তারে পরে হবে’ খন। এখন শুধু নামগুলো শুনে রাখো। প্রথমেই ভুবনেশ্বর। তোমাকে চিঠি লিখলাম খণ্ডগিরি থেকে, রাণীগুন্ডার ব’সে। আর মাধবকে বোধ হয় তো কোণারক থেকে, তাই না? সেখান থেকে পুরী। তারপর ব্রহ্মপুরম্। সেখান থেকে বাসে ক’রে সমুদ্রের দিকে মাইল তিরিশেক, গোপালপুর, আর পাহাড়ের দিকে মাইল তিরিশেক, হাজার পাঁচেক ফিট উঁচুতে, তপ্তপানি। সেখান থেকে কুন্তিকা তোমার কাছে চিঠি লিখেছে। ওটা হচ্ছে পূর্বঘাট রেঞ্জের মালিয়া পাহাড়। সালফার স্প্রিং আছে সেখানে। কুন্তিকা তো সেই পাহাড়ের চূড়ায় ডাকবাংলোর ইম্বিচেয়ারে সেই আশ্চর্য পরিবেশের মধ্যে ঘুমিয়েই পড়লো। সত্যি, জায়গাটা অদ্ভুত! অদ্ভুত! অদ্ভুত! চতুর্দিকে খাড়া পাহাড়, ডাকবাংলোয় আমরা ব’সে আছি, আমাদের পায়ের নিচেই গভীর উপত্যকা। আমাদের পাশে ব’সে আছেন এক উড়িয়া ডি, এস, পি আর এক বাঙালী এস, আই পুলিশের—আগের দিন তপ্তপানিতে বাস উঠতে গিয়ে উণ্টে গিয়ে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিলো তারই এনকোয়ারিভে তাঁরা গিয়েছিলেন, ওঁদের সঙ্গে ওখানে আমাদের খুব আলাপ হয়ে গিয়েছিলো। ডি, এস, পি ভদ্রলোক দেখলাম বেশ পণ্ডিত লোক। আর রসজ্ঞ। বললেন এই হচ্ছে সেই দণ্ডকারণা, রামায়ণ-মহাভারতের কথা মনে করতে পারেন, বা মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত। পূর্বমেঘ অবিশিষ্ট এদিকটায়

আসেনি—আঙুল দিয়ে উত্তরপশ্চিম দিকের দূরের পাহাড়ের দিকটা দেখিয়ে বললেন, ঐদিকে হচ্ছে রামগিরি পাহাড় যেখানে যক্ষ নির্বাসিত হয়েছিলো, পূর্বমেঘ ওখান থেকেই যাত্রা করেছিলো, ব'লেই ভদ্রলোক আশ্রভোলার মতো মেঘদূত আরাতি করতে লাগলেন : কশিচং কাস্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ শাপেনাস্তংগমি—'

'বাই-দি-বাই প্রসাদ'—মাধব বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো, 'যদি কিছু নাইও না করো—কথাটা প্রতিবারই জিগোস করব-করব ভাবি, হয়ে ওঠে না, অফেন্স নেবে না তো জিগোস করলে ?'

'কী ব্যাপার !'—বাধা পেয়ে বিরক্ত প্রসাদ বললো ।

'আচ্ছা, কৃত্তিকা তো রেল সেকেন্ড ক্লাস পাস পায় তাই না ?'

'তা পায় ।'

'আর তুমি তো থার্ড ক্লাস । তা তোমরা একসঙ্গে জানি করো কী করে ? হু-জনে হু-গাড়ীতে ওঠো ?'

অবনী হেসে উঠলো ।

প্রসাদও হাসলো । যদিও সেটা বিরক্তির । বললো, 'না, একগাড়ীতেই উঠি ! পাশাপাশিই বসি !'

মাধবের কৌতূহল মেটে না । ফের জিগোস করে, 'কোন্ ক্লাসে ?'

অবনী লক্ষ্য করে প্রসাদের কানছটি লাল টকটকে হয়ে গেছে ।

প্রসাদ কফির পেয়ালায় ধীরেস্থলে একটা চুমুক দিলো । তারপর ভারিকী চালে বললো, 'থার্ড ক্লাসে । একবার যদিও, গতবার পুজোর সময়, ভিড়ের জন্মে আমার পাসটা আমি টাকা দিয়ে (আমার নিজের টাকা দিয়েই, কৃত্তিকার নয় !) সেকেন্ড ক্লাসে বদলে নিয়েছিলাম । এনিথিং মোর ?'

'রাগছো কেন । রাগবার কী বলনুম আমি ।'

প্রাণপণ চেষ্টায় প্রসাদ রাগটা সামলে নিলো, প্রসঙ্গটা ঘোরানোর জন্মে বললো, 'তারপর অবনী ? বাকুণী কী ঠিক করলো ?'

'কীসের'—অবনী ।

'ঐ যে—ওর বাবা নাকি ফের তাল ভুলেছে ওকে নেবার জন্মে ? যাবে কি যাবে না, ফাইনালি কিছু ঠিক করলো ?'

'ও, সে তো ব'লেই দিয়েছে যাবে না ।'

'যাবে না' যে সেটা কি তোমার কথামতো ঠিক করলো ? না কি নিজেই ঠিক করলো ?'—মাধব ।

'নিজেই ঠিক করলো । আমার মতামত তো ও চায়ইনি । ওর দিদিমা 'অবিশিষ্ট' চেয়েছিলেন আমার মতামত । কিন্তু আমি হাঁ-না কিছুই বলিনি । বাকুণীর বক্তব্য হচ্ছে, পঁচিশ বছর পর্যন্ত যে-বাপ কোনদিন ডেকে জিগোস করেনি, আজ চতুর্থ পক্ষের বউ ম'রে যাবার জন্মে তার একগাদা অপোগণ্ডের তাল সামলাবার জন্মে আর বিনে পয়সার ঝগিরি করবার জন্মে তার কোনো দায় পড়েনি, এই বুড়ো বয়সে পিতৃশ্রদ্ধেই না পেলোও তার স্বচ্ছন্দে চ'লে যাবে ।'

‘আচ্ছা যাক’—এক চুমুকে প্রসাদ কফিটা শেষ করে ফেলে বললো, ‘দোপাটির খবর বলো। বার্ষা শেলের সেই ছেলেটির কী হলো? বলছিল এটা আশা আছে হবার?’

‘হ’লো না। সব ঠিক হয়ে যাবার পরে ছেলে হঠাৎ নিজে দেখতে এসে ব’লে গেল নেয়ে বড় রোগা, চলবে না।’

শুনে প্রসাদ জ’লে উঠলো, অসহ্য বিরক্তিতে উঠে প’ড়ে বললো, ‘হুইসেস! !’

‘প্রসাদের বোনের বিয়েটা যদি-বা হয়ে গেল, তোমার বোনেরটা এখনো হয়ে উঠলো না। কী যে বিড়ম্বনা এই জীবন’—মাধব বললো, ‘আমি একটি ছেলের খোঁজ পেয়েছি, রববার দিন তোমাকে বলব’ধন কদ্দুর কী করা যায়।’

‘উঠে পড়লে যে? কটা বাজে?’—অবনী বললো প্রসাদকে।

‘মোট আটটা’—মাধব।

‘তা’লে বোসো না আর একটু’—অবনী।

‘নাঃ ভান্ লাগছে না আর’—প্রসাদ।

‘কোথায় যাবে এখন?’—অবনী।

‘চলো রাস্তায় হাঁটি বরং’—প্রসাদ।

‘চলো’—অবনী।

‘তা’লে রববার দিন’—মাধব ব্যস্ত হয়ে পড়লো, ‘আমার নতুন বাসায় তোমরা কে-কে আসচো কবে জানতে পার?’

‘একুনি। আমি কৃত্তিকাকে নিয়ে যাচ্ছি। অবনী, তুমিও নিয়ে যেয়ো বাকুগৈকে। অন্য কোন কাছ থাকে তো সেটা বাদ দিতে বলবে। সেদিন আশা করছি তোমাদের একটা সুখবর দিতে পারব।’

‘অ্যা প্রসাদ?’—লাফিয়ে উঠে অবনী প্রসাদের হাতছটো জড়িয়ে ধরলো, ‘ঠিক তো?’

প্রসাদ মুচকি হাসলো।

‘তারিখ ঠিক করেছে?’—অবনী অধীর হয়ে পড়লো উদ্বেজনা, ‘বলো বলো তারিখটা ব’লে ফ্যালো। আর না বলবে তো চলো কৃত্তিকার কাছ থেকেই জেনে নিই তারিখটা। চলো, যাবে নাকি মাধব? দেখলে তো অনর্থক তুমি ঝগড়া করছিলে প্রসাদের সঙ্গে। আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, এবার বনিয়ে এসেছে প্রসাদের সুদিন। তার দুঃখের পালা শেষ, এবার তারও নতুন জীবন শুরু হবে, তোমার মতো তারও নতুন বাসা হবে। আমি সত্যিই খুব খুশি হলাম প্রসাদ। বলো না তারিখটা। বললে আমায় আমি বাকুগৈকে সেটা জানিয়ে আসি। ও-ও ভয়ানক খুশি হবে শুনলে। হয়তো—’

প্রসাদ এতক্ষণ অবাক চোখে অবনীর আকস্মিক বিচলিত ভাবটা লক্ষ্য করছিলো, বললো, ‘বলো? কী হয়তো?’

‘না, কিছু না’—অবনী সংবরণ করলো নিজেকে, বললো, ‘বলো না তারিখটা।’

‘তারিখ কালকে ঠিক করব দুজনে। পনেরো দিনের নোটিস দিতে হয়। তারিখ

ঠিক ক'রে কালকেই দিয়ে আসব। ঐ তো বললাম রববার তারিখ জানাব। তুমিও চলে না—রেজিস্ট্রেশন অফিসে কালকে একসঙ্গেই যাই। একসঙ্গেই হয়ে যাক ব্যাপারটা। বেশ মজা হবে'খন। কী বলো, যাবে ?

'না তুমি একাই যাও। একসঙ্গে হয়ে কী লাভ। বরং লোকসান দক্ষিণ হস্তের'—রাস্তায় এসে অবনী কিন্তু রাস্তা-হাঁটার কথা ভুলে গেল, বাকুণীর সঙ্গে তার আজকেই একবার দেখা করা দরকার বলে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিলো।

// ১৬ //

বাকুণীর কাছে যাবার ইচ্ছে নিয়ে অবনী বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্রামে চাপলো। বটে, কিন্তু খানিকটা গিয়েই তার ইচ্ছে বদলে গেল। শরীরটা হঠাৎ ভয়ানক খারাপ লাগলো। ট্রাম থেকে নেমে প'ড়ে হাঁটতে শুরু করলো বাড়ির দিকে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন শহর। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন নন। একটু হাওয়া কোথাও নেই নিশ্বাস নেবার। চিন্তা করবার শক্তি আর ইচ্ছেও যেন ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। মনে পড়লো কৃত্তিকার ঠাটা। মাস কয়েক আগে সে আর কৃত্তিকা আর প্রসাদ ব'সে ছিলো রেডিও পার্কে বিকেলবেলায়। 'এই তাপ্নিমারা স্টাণ্ডেলে আর ক'ষুগ চালাবে। ফলে-কাদায় ভিজ়ে কী অবস্থা হয়েছে বাবুর চটির। বাকুণী বলে না কিছু ? ছাতলা প'ড়ে গেছে যে। স্টাণ্ডেলে গাছপালা গজিয়ে যাবে যে'—কৃত্তিকা বলেছিলো। উত্তরে সে বলেছিলো, 'আমার স্টাণ্ডেলে এই যে-বৃক্ষ একে ছত্রক বা ছাতা বলতে পারো। তবে এ বৃক্ষের ফুল বা ফল হয় না'—একটু থেমে সে বলেছিলো, 'বীজ হয় না।' 'ওধু তোমার স্টাণ্ডেলে তো নয়'—কী বলতে গিয়ে কৃত্তিকা থেমে গিয়েছিলো। 'কী ? বলো ?' 'না থাক। বললে চটেবে তুমি। এতটা বলা হয়তো উচিত হবে না।' 'বলো কী। অসুচিত কথাতেই যে আমার আগ্রহ বেশি। বলো বলো।' 'বলব ? কথাটা হচ্ছে এই যে, ঐ-জাতীয় বৃক্ষ তো ওধু তোমার স্টাণ্ডেলে নয়, তোমার নগরের মধ্যে ঐ-বৃক্ষের বোধ হয় চাষ-আবাদ আছে।' 'আই ডিটো'—সহাস্ত্রে প্রসাদ মন্তব্য করেছিলো। সমস্ত চৈতন্যে অবনীর প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছিলো কথাটা শুনে।

পকেট হাতড়ে বিড়ি পাওয়া গেল না। ছ'পয়সার বিড়ি কিনে নিলো অবনী। কিন্তু দেশলাইটা কোথায় গেল ? সন্দের সময় নতুন দেশলাই কিনলাম যে ? যাক গে, একটা দেশলাইও কিনলো সে আবার।

আর একদিন তর্কের সময়ও কৃত্তিকা তাকে নির্মম আঘাত করেছিলো। 'কী-একটা প্রসঙ্গে অবনী বলেছিলো, 'পাখীর চোখে কোন-কিছুই দেখতে আমি অভ্যস্ত নই। আমি গভীরতায় বিশ্বাসী।' তাইতে কৃত্তিকার মুখে ছুরির ফলার মতো হাসি খেঁলে গিয়েছিলো, বলেছিলো, 'তাই নাকি ! কিন্তু গভীরতার পরেও যে গভীরতা থাকে এই যুক্তিতে কি তুমি অবিশ্বাসী ?' তার উত্তরে সে নিজেও চের পেয়েছিলো।

মুখখানা তার বোকার মতো হয়ে গিয়েছিলো। কৃত্তিকা আরো বলেছিলো, 'তুমি মনে করো একাই তুমি বোকা। জগৎসংসারটা একটা পাঠশালা আর তুমি হচ্ছে। তার গুরুমশাই। সবাই আমরা ভুল করছি ভুল বকছি আর তুমি আছো আমাদের ভুল ধরিয়ে দেবার জন্যে, যাবতীয় কথা টিপে-টিপে ব্যাখ্যানা ক'রে বুঝিয়ে দেবার জন্যে, সামান্য একটা সাদামাটা তুচ্ছ কথার থেকে পাহাড়প্রমাণ তাৎপর্য টেনে বের করবার জন্যে। এত বাজে চিন্তা করো ব'লেই তোমার স্বাস্থ্যের হাল দিনকে-দিন এমনি হচ্ছে। সেদিন বললে শেক্সপীয়ার নামটার ছ'হাজার রকম বানান হয় কিনা তাই নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। তুমি তাইই যাও, জগৎসংসার ছেড়ে ঐ গবেষণা-সমিতির সদস্য হও গে যাও !'

তাই কি ? জীবনের অর্থ বুঝবার চেষ্টা করতে হলে জীবনের সীমানার বাইরে যেতে হবে ? একটা কলার খোসায় পা প'ড়ে হড়কে যেতে-যেতে অবনী নিজেই সামলে নিলো। বিড়ি ফেলে দিয়ে আঙুল মটকাতে মটকাতে অবনী নিজের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছলো—ভাড়াটেদের মধ্যে এক ভদ্রলোক হস্তদস্ত হয়ে বললো, 'অবনী, ধ'রে একটা নাড়া দিয়ে, 'এই যে মশাই আপনি। কোথায় ছিলেন এতক্ষণ ?' অবনীকে আপনার ঘরে যে হলুদলু ব্যাপার। যান শীগগীরি দৌড়ে।' 'কী হয়েছে'—ব'লেই অবনী কাঁপতে-কাঁপতে দৌড়লো ঘরের দিকে। অন্ধকার সিঁড়ি। হাঁটু ভেঙে পড়লো সে কয়েক সিঁড়ি উঠেই। কিন্তু ব্যথা টের পেলো না কোনরকম। এখন ব্যথার সময় নেই। হে ভগবান হে ভগবান। ঐ তো আমার ঘর, অত ভিড় কেন দরজায় ?

অবনী এসে দাঁড়াতেই নতুন ত্রস্ততা দেখা গেল ভাড়াটেদের জড়ো-হওয়া এক-হাট মেয়ে-পুরুষ কাচ্চা-বাচ্চার ভিড়টার মধ্যে। অবনী দেখলো মা ব'সে আছেন মাথায় হাত দিয়ে, বোনগুলি সব মুখ খুবড়ে কাঁদছে, ভবানী আর ফণী কোথায় গেল ? কী হয়েছে ?

পাশের ঘরের প্রবীণা গিন্নী অবনীর হাত ধ'রে একটু তফাতে টেনে নিয়ে বললেন, 'দোপাটি এক কীতি করেছে। এই স্ত্রাখো চিঠি। বিকেলবেলায় সেতারের তার কিনে নিয়ে আসি ব'লে একটা টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলো। সন্কে হয়ে গেল তখনো মেয়ে ফিরে আসে না দেখে তোমার মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু কাকে বা কোথায় খুঁজতে পাঠাবে। তুমি নাকি আপিস থেকে বাড়িই ফেরোনি। কী করবে কী না-করবে—এমনি সময় পাওয়া গেল এই চিঠি। আজ বিয়দবার, লক্ষ্মীপূজা হবে খেয়াল আছে তাই মেয়ে চিঠিটা তোমার মায়ের লক্ষ্মীর পাঁচালীটার মধ্যে গুঁজে রেখে দিয়ে গেছে। এখন স্ত্রাখো কোথায় খোঁজ নেবে। স্ত্রাখো প'ড়ে স্ত্রাখো।'

অবনী চিঠি খুললো :

'শ্রীচরণেবু মা, আমি তোমাকে ছেড়ে, আমার ভাইবোনদের ছেড়ে, জীবনের সব কিছু ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি। মাগো তোমরা কেঁদো না, আমি শরতে যাচ্ছি না। বিশ্বাস করো মাগো, আমি হয়তো আবার তোমার কাছে ফিরে আসতে পারব। তোমাদের ছেড়ে আমি কী ক'রে থাকব। কিন্তু এখন আমার কোন খোঁজখবর কোরো না, কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ কোরো না। তুমি আশীর্বাদ কোরো না গো, আমার কপাল যেন না ভাঙ্গে। সব দিক বজায় রাখতে আমি এই পস্থা বেছে নেওয়া

মাঝা অন্য কোন উপায় দেখলাম না। মাগো আমি যার সঙ্গে কলকাতার বাইরে চলে
ছি আপাতত, সে অমায়ুষ নয়। মাগো আমাকে ভুল বুঝো না। আমার প্রণাম
নাও। আর লিখতে পারছি না। আর একটা কথা মা, দাদাকে আর দেবী করিও
না, যাকে দাদা ঠিক করেছে তাকেই তোমরা সবাই আদর ক'রে বরণ ক'রে নিও।
এতে সকলেরই ভালো হবে মা, আমার মন তাই বলছে। দাদার বিয়েতে আমি
থাকতে পারলাম না এর চাইতে দুঃখের আর কী হতে পারে। দাদা যেন আবার
আমাকে খুঁজতে না বেরোয়। দাদার দিকে একটু দৃষ্টি রেখো মা। আমরা সবাই
সবাইকে ভুল বুঝে আমাদের সুন্দর ছোট সংসারটুকুকে যেন নষ্ট ক'রে না ফেলি।
আমি ফিরে আসবই মা। তোমাদের ছেড়ে আমি বেশী দিন বাইরে থাকতে পারব
না। মাগো আমার প্রণাম নাও। দাদা তুমি আমার প্রণাম নাও। জুনি, ভবু,
বিষ্টি, ছুটি, ফণী—আমি তোদের ছেড়ে বেশী দিন বাইরে থাকতে পারব না রে।
তোরা যেন তোদের দিদিটার জন্যে কাঁদিস না। মাগো আমার প্রণাম নাও। ইতি
তোমার পোড়াকপালী মেয়ে দোপাটি।'

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

বিবস্থানের ভূয়োদর্শন

বিবস্থান ঘোষ

॥ সাধুসঙ্গ ॥

পরামর্শ দিয়েছিলেন সহকর্মী আনন্দলাল। বললেন, 'সাংসারিক জালা যন্ত্রণার এমন দাওয়াই আর পাবে না ভায়া। একেবারে এনাগিন ট্যাবলেট। একদিন খেয়েই দেখ না। তারপর ফিরে এসে আশায় বোলো কি মনে হলো।' আমার মনের অবস্থা তখন অকেজো ব্রেকওয়ালা হাইস্পীড স্টেটবাসের মত। ভাবলাম গিয়ে দেখিই না একবার। হাজারো ধন্যবাদ দিই এখন আনন্দলালকে। তার কথাগুলোই না আমি প্রথম সেখানে গিয়েছিলাম।

আমার পরিচয় চান? নিশ্চয়ই আপনারা চিনবেন না আমাকে। বিখ্যাত দৈনিক বার্তাবহের অধ্যাত সাংবাদিক আমি বিবস্থান ঘোষ। আমার বহু লেখাই আপনারা পড়ে থাকেন প্রতিদিন বার্তাবহের নান্নকে পৃষ্ঠায়। কিন্তু অনামী লেখাগুলোর জন্মদাতা আমি বিবস্থান চিরদিনই পর্দার আড়ালে রয়ে গেলাম। তা, আমার নাম না-হয় নাই জানলেন আপনারা। তারজন্মে আমার দুঃখ নেই, অভিযোগও নেই। আমার অভিযোগ বেয়াড়া সংসারটাকে নিয়ে। কিছুতেই বাগ মানাতে পারছি না ওটাকে। সম্প্রতি আবার টি-টির নয়া বাজেটের ধাক্কা সংসারের ঘাটতিবাজেট পোল ভর্টের চক্ষে বিপজ্জনক সীমানাও টপকে গেছে। গর্জন-পারঙ্গমা গৃহিণী আমার বিদ্রোহিত আর মুরোদকে লক্ষ্য করে আজকাল যে-সব প্রাকৃত ভাষা প্রয়োগ করছেন, তা আমার মত মৎস-লহ লোকের পক্ষেও হজম করা কষ্টকর হয়ে উঠছে। সবই আমার কপাল! পে কমিশনের রায় বেরোবার পর কয়দিন অফিস থেকে ফেরার মুখে আছুলে ইলিশ ঝুলিয়েছি—হলোই বা তা ধার করা টাকায়। মাইনেটা হঠাৎ যখন অতটা বাড়ছে তখন একটু বেহিসেবী হতে ক্ষতি কি—এইছিল মনের ভাব। কিন্তু আমি বদলে গেলে আমার কপালটিও সঙ্গে চলেন। দেখলেন তো কাণ্ডটা। সরকারী সুউচ্চ নাসিকার সামনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নেড়ে আমাদের প্রভুরা স্ত্রীম কোর্টে কেস ঠুকে দিয়েছেন। মাইনে বৃদ্ধি এখন বিশ হাত জলের তলায় অদৃশ্য। দৈব না মেনে উপায় কি বলুন! সত্যি কথা বলতে কি, হালফিল আমি ভুত, ভাগ্য, হাঁচি, টিকটিকি, ভগবান, মাদুলী, দৈব—সব কিছু মানছি।

মনের যখন এই অবস্থা তখন বন্ধুর শ্রীশ্রীভবতারণ ঠাকুরের ধ্বনির আনন্দলাল আমায় পরামর্শটা দিলেন। ব্রহ্মদেশ ঘুরে এসে ঠাকুর এখন বিখ্যাত কল্মসিক্‌ব্যবসায়ী স্তার গোবর্ধনের বাড়িতে উঠেছেন, বন্ধুর সে-খবরটাও জানালেন। ঠাকুর ভবতারণের নাম শোনেননি? আমাদের দৈনিকেও তো বেরিয়েছে তাঁর অলৌকিক জীবনকথা। আপনারা না-পড়ে থাকলে সাতই আশাতের রবিবাসরীয়টা পড়ে নেবেন। সে-অলৌকিক কাহিনীর এককণ্ঠেও আপনারা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না—এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

ভুতকাজে বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের রীতি নয়। পরদিনই সন্ধ্যায় আনন্দলালের সঙ্গে হাজির হলান স্মার গোবর্ধনের দরজায়। ঠাকুর রয়েছেন—লাল নীল কত ডুন জেলে গাজানো হয়েছে বাড়িটা। সারি সারি গাড়ী দাঁড়িয়ে দরজায়। অব্যবহৃত দ্বার দিয়ে শত লোকের আনাগোনা। দ্বারবানরা কোনো ভক্তকেই বাধা দিচ্ছে না চুকতে। পাঁচতলার ছাদে সামিয়ানা খাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত এখানে ঠাকুর দর্শন দেন ভক্তদের—ভাঁদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করেন। আনন্দলাল বলছিলেন, ভক্ত সমাগম বেশি হওয়ায় ভক্ত-আসরের টাইম ঠাকুর বাড়িয়ে দিয়েছেন সম্প্রতি। আজকাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত না-কি তিনি ভক্তদের সামনে থেকে ভাঁদের মন-প্রাণ-নয়ন-কানকে তৃপ্ত করেন।

আসরে চুকে ছাদের ফরাস পাতা নেবেয় যেন আমার পা আটকে গেল বিশ্বয়ে। এ কি দেখলাম! ধূপ ধূনো আর ফুলের সমারোহে আসরের চেহারাটা একেবারে কলকাতার বারোয়ারী দুর্গাপূজোমণ্ডপের মত হয়ে গেছে। এই স্বর্গীয় সুগন্ধী পরিবেশে আসরের ঠিক কেন্দ্রে বিরাট এক চৌকীতে বিরাট এক তাকিয়া হেলান দিয়ে বিরাট দেহ এক গৌরবাস্তি পুরুষ অর্ধশায়িত। সেই দিব্যদেহ পুরুষের শ্রীপা একজন পুরুষ আর একজন গুণবতী নারী টিপছেন কোলের মধ্যে নিয়ে। পুরুষটিকে চিনলাম—স্বয়ং স্মার গোবর্ধন। ঠাকুরের শ্রীমুখে স্বর্ণময় নলের একপ্রান্ত। প্রায় সাত হাত লম্বা সেই নলের অপর প্রান্ত বহু দূরে বসানো গড়গড়ায় সংযুক্ত। জনা দুই ভক্ত সর্বক্ষণ সেই গড়গড়া পরিচর্যায় ব্যস্ত। সত্যি চোখ ভরে দেখবার মত দৃশ্য। দেখলেই ভক্তি পায়।

আসরের ভক্তদের দিকে চোখ ফেরাতে চমকে গেলান। ঠাকুর তাঁর চুম্বকী শক্তিতে কাকে না আকর্ষণ করেছেন। পুলিশ কমিশনার থেকে কর্পোরেশন কাউন্সিলার পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরের মাথা মাথা লোক এখানে এসে মিলেছেন। এম পি, এম এল এ, সাহিত্যিক, সংস্কৃতজ্ঞ, পত্রিকা-সম্পাদক, কোটিপতি ব্যবসায়ী, হাইকোর্টের জজ—কে নয়। এ দৃশ্য দেখবার মত। মনে মনে ষাড় নেড়ে বললাম—‘ইউরেকা, তোমায় যখন ভাগ্যগুণে পেয়েছি ঠাকুর, তখন তোমায় আর ছাড়ছি না।’

কিছুক্ষণের মধ্যে গম্ভীর ওম্ ওম্ আওয়াজের মধ্যে ভক্ত-আসরের কাজ শুরু হয়ে গেল। ঠাকুরের পাশে রাখা একটি সুদৃশ্য মাইকের সামনে বীরপদে এসে দাঁড়ালেন সেদিনের আসরে বিশেষ সম্মানিত অতিথি বিখ্যাত জননেতা শ্রীত্রিভঙ্গ বটব্যাল। এঁকে আনি চিনি। শোনা যায় এঁর বাম ঘোঁষা বক্তৃতার তাপে বিধানসভার শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষও নাকি প্রায়ই গরম হয়ে ওঠে। একটু কেসে গলা সাফ করে নিয়ে শ্রী বটব্যাল ভাবগম্ভীর কম্পিত কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন—‘সাধুসঙ্গিগণ, আমাদের পরম সৌভাগ্য—আজ আমরা আমাদের মধ্যে স্বয়ং নবরূপী ভগবানকে পেয়েছি। সব অবতারের শ্রেষ্ঠ অবতার আমাদের শ্রী ঠাকুর নানারূপে লীলা করছেন আমাদের মধ্যে—আর সেই মহালীলার মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে স্বর্গস্থলের পারমিট যোগাড় করে দিচ্ছেন। ইনি মাতৃরূপিনী—পিতৃরূপী বাতৃরূপী ভদ্রীকূপিনী—একাধারে ইনি শত লীলার আশ্রয়। ইনি লীলাময় স্বয়ং ভগবান, এঁর মধ্যে আণবিক শক্তি,

পরমাণবিক শক্তি, মহাজাগতিক শক্তি—বিশ্বের সকল শক্তি বিধৃত। আমি শ্রীঠাকুরের কোলে বসে বসে এইটুকু বুঝেছি যে এঁর কাছে ধনী নেই, দরিদ্র নেই, বামপন্থী নেই, দক্ষিণপন্থী নেই, জ্ঞানী নেই, মূর্খ নেই—কোনো ভেদাভেদই নেই। ইনি সকলকেই এঁর বরকোড়ে আশ্রয় দিচ্ছেন। ইনি হরি—ইনিই হন, ইনি ব্রহ্মা—ইনিই যম, ইনি লক্ষ্মী—ইনিই সরস্বতী, ইনি উর্বশী—ইনিই মা শীতলা। আস্তন সাধুসঙ্গিগণ, আমরা সকলে মিলে একে আশ্রয় করে পারের কড়ি যোগাড় করি। ভয় ঠাকুর।’

আমার পাশে বসে ছিলেন সাহিত্যিক স্বপনশঙ্কর নিয়োগী। বক্তৃতা শেষ হতেই তিনি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কণ্ঠে চেষ্টা করে উঠলেন—‘সাধু, সাধু! সভা জুড়ে প্রতিধ্বনি উঠলো নানা কণ্ঠে—সাধু, সাধু। চেয়ে দেখলাম প্রায় সকলেই কোঁচের খুঁট দিয়ে, না-হয় কনাল দিয়ে চোখ মুছেছেন আর কোঁপাচ্ছেন।

এরপর পা টেপা বন্ধ না রেখেই বাড়টা যথাসম্ভব উঁচু করে মাইকের কাছে মুখ এঁনে স্তার গোবর্ধন ঘোষণা করলেন—‘শ্রীঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী আমি ঘোষণা করছি যে, আজ শুভ উদ্দেশ্যে রথযাত্রা উপলক্ষে ঠাকুর সাধুসঙ্গীদের মনোবাসনা মনোবেদনা স্বকর্ণে শুনবেন আর প্রয়োজনমত প্রার্থনা পূরণ করবেন। আপনারা যে যার মনোগত কথা শ্রীঠাকুরের কাছে নিবেদন করতে পারেন।’

একটা ভীষণ সাড়া পড়ে গেল। সকলে গুনগুন করে উঠলো—ঠাকুর কলতরু হয়েছেন, ঠাকুর কলতরু হয়েছেন। একে একে ভক্তরা ঠাকুরের কাছটিতে গিয়ে মনের কথা জানাতে লাগলেন। শ্রীমদ্ হাসতে হাসতে ঠাকুর কাউকে একটা ফুল, কাউকে একটু ধূনার ছাই দিয়ে যেতে লাগলেন। আবার কাউকে মাথায় শুধু হাত রেখেই আশীর্বাদ করলেন। যারা যারা শ্রীচরণে মনোবেদনা নিবেদন করলেন, তাঁদের মধ্যে পুলিশ কমিশনার আর যি ব্যবসায়ী লক্ষ্মীদাসই যা একটু বেশি সময় নিলেন—আর সকলেই বেশ সংক্ষেপে সারলেন দেখলাম। আমার বাঁ ধারে বসেছিলেন সমাজসেবী শঙ্করনাথ রায়। ইনি সারাক্ষণ হাত ছোঁড় করে ঠাকুরের দিকে চেয়ে বসে ছিলেন। সম্ভ্রান্তি বিধান সভার বাই-ইলেকশনে চিৎপুর থেকে ইনি দাঁড়িয়েছেন প্রার্থী হিসেবে—বাড় চিহ্ন নিয়ে। এবার ইনি উঠে দাঁড়ালেন। ইনি উঠে দাঁড়াতেই এঁর দিকে ঠাকুরের দৃষ্টি পড়লো—আর ঠাকুর তাঁর মেষনিন্দিতকণ্ঠে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন—‘তোমার ভাবনা নেই—কেল্লা ঘেরে দিয়েছিস। ভাবিসনি বাড়ি যা।’ বিপুলভাবে পুলকিত শঙ্করনাথ এগিয়ে গিয়ে যথারীতি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন ঠাকুরকে। তারপর পকেট থেকে কিছু নোট বের করে ঠাকুরের পদতলে রেখে ধীর পদে প্রস্থান করলেন।

ক্রমে আরও ভিড় কমে এলো। আমি ছাড়া শেষে ছাদে রইলেন ঠাকুরের বিশেষ স্নেহের পাত্র কয়েকজন মাত্র। ঠাকুর এবার একবার আসরের চতুর্দিকে চেয়ে দাঁড়ালেন। আমি তখন ঠাকুরের বেশ কাছাকাছি বসে আছি, সঙ্গে আনন্দলাল। আমার দিকে চোখ পড়তেই ঠাকুর ঠিক বুঝলেন যে আমি আসরে নবাগত। তাই সন্মুখে ভিজে ভিজে গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—‘কি রে শালা, তুই কি চাস?’ তারপর আমি কিছু জবাব দেবার আগেই হেসে বললেন—‘বুঝেছি।’ আমি চমকিত রোমাঙ্কিত হলাম। কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি। আমি ভাবাবেগে উঠে দাঁড়িয়ে কেঁদে

ফেললাম। আমি যে ঐর চরণে আশ্রয়প্রার্থী এ-কথাটা যতবার বলতে যাই ততবারই কারা এসে বাধা দেয়। কয়েকবার চেষ্টা করলাম; শুধু ষড়ষড় আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শব্দ গলা দিয়ে বার করতে পারলাম না। ঠাকুর আঙ্গুলের ইঙ্গিতে আমায় বসতে ইসারা করলেন—কে একজন পাশ থেকে জামা টেনে আমায় বসিয়ে দিল। আমি ভাবাবেগে কঁপোপাচ্ছি, এমন সময় আবার শুনলাম ঠাকুরের বানী। আনাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন—‘বস, প্রসাদ পাবি।’ আমি অযাচিত রূপার প্রাচুর্যে কৃতার্থ হয়ে গেলাম। আর করে আনা পাঁচটা টাকা পকেট থেকে বের করে ছুপা এগিয়ে গেলাম ঠাকুরের পায়ে দেবো বলে। বাধা পেলাম। ছুপা এগিয়েছি কি-না এগিয়েছি, হঠাৎ আসরে উদ্ভাসের মত প্রবেশ করলেন বাবরি চুল, খ্যাপামত চেহারা একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি। চুল এলোমেলো কপালে এসে পড়েছে, চাদর ভুলুষ্ঠিত—ছুইহাত সামনের দিকে প্রসারিত ছুটেতে ছুটেতে আসরে প্রবেশ করলেন তিনি। স্মিটে উদাত্ত কণ্ঠে তিনি অনর্গল আবৃত্তি করে চলেছেন গীতগোবিন্দ—‘কশ্চিৎ কাস্তা বিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ!’ সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে বন্ধু আনন্দমালার দিকে চাইলাম। ইঙ্গিতে বসে পড়তে বললেন বন্ধুবর। আমি বসতে কানেক কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন—‘কবি ঔপন্যাসিক সূচিস্থিত চট্টোপাধ্যায়। ইনি ককভাবে ঠাকুরকে ভজনা করেন। এঁর কাছে ঠাকুর রাধা উনি কক।’ অবাক বিষয়ে বন্ধুকে কি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম—অপর পাশে বসে থাকা ভক্তটি ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে ফিস্ফিস্ করে বললেন—‘চুপ, দেখুন, লীলা দেখুন। কথা বলবেন না।’ তাঁর আঙ্গুল লক্ষ্য করে আবার ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। দেখি কবি একেবারে ঠাকুরের গা ঘেঁসে গিয়ে বসেছেন। কবি তাঁর চাদর দিয়ে ঠাকুরের মুখের ঘাম মুছিয়ে দিলেন। স্তার গোবর্ধন এতক্ষণ সমানে ঠাকুরের পা টিপছিলেন—তাকে এক কলুইয়ের ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে ককভাবে কবি ঠাকুরকে একেবারে কায়মনো করে নিলেন তখনকার মত। হঠাৎ ছুইহাতে ঠাকুরের ছুই কাঁধ ধরে কসে নাড়া দিয়ে স্মিটে কণ্ঠে কবি বললেন—সখি, সখি, আজ কিছুক্ষণ আগে তোমাকে ভারতে ভারতে হঠাৎ বাল্মীকীর মত আপনা হতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল অপূর্ব কবিতা। শুনবে সখি শুনবে?

ঠাকুর ততোধিক স্মিটে কণ্ঠে জবাব দিলেন—‘শোনাও সখা, শোনাও তোমার পদাবলী। আমরা সবাই শুনে তৃপ্ত হই।’

গলায় ঝোলানো গরদের চাদরটা প্রেমভরে ঠাকুরের বরঅঙ্গে নিক্ষেপ করে উঠে দাঁড়ালেন কবি। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সুরেলা গলায় আবৃত্তি করলেন—

খুঁজে খুঁজে দেউড়িতে হাজির হলাম

আমি রঙের গোলাম।

বিবি তুমি কেসে নাও,

হেসে নাও, শেষে নাও

হৃদয়ে আমায়

আমি নইলে ম’লাম ॥

ঠাকুর দাঁড়িয়ে উঠে ছুপা এগিয়ে এসে প্রেমালিঙ্গনে বেঁধে ফেললেন কবিকে।

বহুক্ষণ পরে ঠাকুরকে ছেড়ে দিয়ে কবি এক ঝটকায় স্মার গোবর্ধনের দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—‘কই?’—‘এই যে আনছি’—ভীত সম্ভ্রান্ত স্বরে এই কথা বলে স্মার গোবর্ধন ছুটে চলে গেলেন আসরের গেটের দিকে। বুঝলাম ঠাকুরের প্রেমধন্য প্রভাবশালী কবিকে এখানে সকলেই বেশ সমীহ করেন।

অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এলেন স্মার গোবর্ধন। তাঁর বাঁহাতে এক টুকরো পরিষ্কার কাপড় আর ডানহাতে ডমরু আকৃতি নিনেকরা ধাতুস্বর্য একটি ধূনায়মান কলকে। স্মার গোবর্ধনের হাত থেকে নিমিষের মধ্যে ছোঁ মেরে কাপড়ের টুকরো আর কলকেটা কেড়ে নিয়ে কবি তাতে একটান দিলেন। ননেন হল সে-টানে সমুদ্রকে বুঝি শুবে নেওয়া যায়। তারপর ঠাকুরের হাতে কলকেটি দিয়ে তিন মিনিট মুখ নাক চোখ বন্ধ করে শুম হয়ে বসে রইলেন কবি। হঠাৎ আরক্ত চোখ মেলে তাকিয়ে ঠাকুরকে বললেন—‘যাই সখি, আজ একবার চন্দ্রাবলীর কুণ্ডে আনায় যেতেই হবে। আবার কাল আসবো।’ এই বলে মস্তরঙচীতে কবি চলে গেলেন আসর ছেড়ে।

ঠাকুর ঠোঁটে কলকে রেখে তিন চারটি দিবাটান দিলেন। দিয়ে হঠাৎ আমার দিকে কলকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘লে ব্যাটা, প্রসাদ লে। যা কামলা করে টালবি তাই সিদ্ধ হবে। লে টাল।’ এই বলে কয়জোড়া দীর্ঘাকান্তর দৃষ্টির সামনে আমায় এগিয়ে দিলেন কলকেটা। তাঁর কণ্ঠ ভাব-জড়িত।

ভক্তি ভরে ঠাকুরের হাত থেকে প্রসাদ নিয়ে মনোবাসনা ঠাকুরকে জানাতে জানাতে দিলাম টান—একবার দুবার তিনবার—

তারপর? তারপর তিনদিন আর আমি এ যন্ত্রণাময় জগতে ছিলাম না। আমার স্ত্রী বলেন, আমি নাকি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। আশ্রয়দেও তাই ধারণা। কিন্তু আমি তো জানি কী দিব্য আনন্দে কেটেছে আমার ঐ তিনটে দিন। কত দিব্যদৃশ্যই না মনশ্চক্ষে দেখলাম ঐ কদিনে। সে এক অস্ত্র অমুভূতি। দিব্যস্বর্য।

সে কাহিনী শুনতে যদি আপনাদের ইচ্ছা থাকে আর অগ্রণী সম্পাদক যদি রাজি হন তাহলে সে-সব কাহিনীর বিবরণ অগ্রণীতেই দেবার ইচ্ছা রইল।

আমৃত্যু বাসনা

মানস রায় চৌধুরী

ভধু আমি নই, এসো এ'হুদিনে হুজনেই অলি ।
দিগন্তে বৃশংস সূর্য হানে শর তীত্র জ্বালাময়,
পুড়ে যায় মাঠবন, জীবনের সহজ সরল অঙ্গীকার—
যন্ত্রণায় ভগ্নস্বর বার বার ডাক দিয়ে বলি :
পা রাখো! মাটিতে এই ধুলোর চাবুকে দীর্ঘ আর্ত পিপাসার
সঙ্গী হও । বিরহের হাহাকারে মেলাও হৃদয় ।

দারুণ দহন দিনে তুমি বিনা কতো সহ করি ।
প্রচণ্ড আতপদগ্ধ আকাশের নিচে অকস্মাৎ
তুমি নামো ছায়া হয়ে, হৃৎকেন্দ্র একান্ত সহচরী
অঙ্গারে ছড়াও স্নিগ্ধ শ্রাবণের নীল, ছিন্ন প্রেমের নগুরী
উঠুক পুষ্পিত হয়ে—আকস্মিক আবির্ভাবে রাজাও প্রভাত ।

আকাশে নিষ্ঠুর রোদ্র ঝলসায়, কঠে ধামে কথা
অক্ষয় এই দিন বইতে পারে না একা সহনশীলতা ।
সস্তা খোঁজে তোমাকেই । নিশ্চিহ্ন হবার ঠিক আগে
দেহ যেন স্পর্শ পায় । অন্তরঙ্গ নরনী সংরাগে
তপ্ত করো তৃষ্ণা, প্রেমে ধুয়ে দাও রক্তলাগা ব্যথা ।

ফান-বিন-দায়ে কহিনী ফানিল্ল দানলু

॥ ৩০ ॥

হরষিত চামড়ার চালান নিয়ে দৌলতপুর গিয়েছে। চাঁপাকে বলে গেছে বাড়ি ফিরতে ক'দিন দেবী হবে! মেয়ে দুর্গা আর ছোট ছেলে নিয়ে বাড়িতে আছে চাঁপা। আর কেউ নেই বাড়িতে।

শনি, মঙ্গলবারে হাট বসে তেরোবাঁকির চরে। বাড়িতে বসে অবসর সময় না মেয়েতে কুলো-ডালা-খালুই বাঁধে। হাটে গিয়ে সেগুলি বিক্রী করে তেল, ছুন, তামাক কেনে। কখনসখন সখ করে কাঁচের চুড়ি পরে আসে বা সস্তা বিলাসের অন্য কোনো উপকরণ যোগাড় করে আনে।

হাটবারে হরষিত নাই বাড়িতে। চাঁপা গিয়ে পাশের বাড়ির রসিকের বুড়ী নাকে ধরল বাড়ি আগলাতে আর ছেলে পাহারা দিতে!

অ বুড়োমা, তোর ছেলে ঘরে নেই। বাড়িতে এটু চোখি চোখি রাখবি না? বুড়ি শুধালো, হাটে যাবি বুঝি?

হ। তোর নেগে তেজালো তামাক আনব বুড়ী। ছেমড়ারে কোলে নিয়ে বসবি।

তামাকের নামে বুড়ীর নোলায় ফল এসে গেল। হেসে বলল, আপন নোক তোরা। হরষে ঘরে নেই বলে কি আর পর হয়ে গেলি! তা চল—বুড়ী লাঠি হাতে ঠুক ঠুক করে বেরিয়ে এল।

মধুমতীর ওপার ভেঙ্গেছে, এপারে পড়েছে চর। চরে লাঙ্গলের ফলায় সোনা ফলেছে। ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে। নতুন ফসল মেজাজ এনে দিয়েছে চাষীর। তেরোবাঁকির হাট গম গম করছে লোকের ভিড়ে।

বেলা পড়ে এসেছে। ডালা কুলো বিক্রী করে সওদা সেরে চাঁপা মেয়েকে নিয়ে ভাড়াভাড়ি ফিরছিল। আজ আর সঙ্গে কোনো পুরুষ যাত্রী নেই।

হঠাৎ দুর্গার নজরে পড়ল। ভয়ে আঁতকে উঠে সে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, হেই গো মা, দো দেখসে ঠ্যাং কাটা!

হাঁটু অবধি একটা পা নেই লোকটার। মুখে মাথার একরাশ লম্বা ময়লা চুল। মুখপোড়া লোকটা তুই বগলে লাঠি ওঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে হাঁ করে। লোকটার চাহনি ভাল নয়। কুংগিত লোকটাকে দেখে চাঁপা অস্বস্তি বোধ করল। তবু ধনক দিয়ে মেয়েকে বলল, বাঘ নাকি যে খাবে। ইঃ মাইয়ের ভয় হতেছে ভদ্র লোকের মতন। নে, গতর নাড়া লম্বীছাড়ী!

লোকটি অপলক দৃষ্টি দিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন নতুন এই সে মেয়ে মানুষ দেখছে। ভুতের মত ত চেহারা অঞ্চ আঁকল দেখ মুখপোড়ার।

চাঁপা মেয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল। একটু ভাড়াভাড়িই চলল। ওর চাহনিটা

ভাল নয়। পেছনে ঘেন লাঠির ঠুক ঠুক আওয়াছ হচ্ছে। চাঁপা জোর করে যেন পেছন ফিরল না। সমানে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলল।

হুর্গা ভয় পেয়েছে। পেছন ফিরে দেখে সেই ঠ্যাংকাটা আসছে। চাঁচিয়ে বলল, লোকটা যে পেছু আসতেছে না।

সত্যি সত্যি এবার ভয় পেল চাঁপা। মেয়ের কথায় সেও পেছন ফিরে দেখে ঠ্যাংকাটা হুঁলাঠি বগলে পুরে যেন ছুটেতে ছুটেতে আসছে। ওর উদ্দেশ্য ভাল নয়। চাঁচিয়ে লোক ঝড়ো করবে নাকি।

নাককাটির খাল পারে যাবার কেউ আছে তোমরা ?

দূরে চলন্ত এক জনতাকে লক্ষ্য করে চাঁপা চাঁচিয়ে ডাকল। ডাকল ত না কাদল। হুর্গাও কেঁদে বলল, আমরা একা পড়ে গিছি গো মাশায়রা—

এবার উত্তর এল একেবারে পাশ থেকেই। চরের পাশে বসে নাককাটির খালের ভৈরব মরা গরুর ছাল ছাড়াছিল। চিংকার শুনে হেঁকে বলল, এই হুগুগি, চাঁচাস ক্যান ?

ভৈরব। চাঁপা আর হুর্গা হুজনেই আশ্রয় হোল।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছেন, ডর নাগতেছে খুড়ো মাশায়। হুর্গা বলল।

তবে দাঁড়া এটু। আমার সাথে যাবি !

এবার চাঁপার হাঁস এল কিন্তু পেছন ফিরে দেখে লোকটা নেই। কখন পালালো ! গেলই-বা কোথায় ! বনবাদাড়ের মধ্যে সরে পড়েছে নিশ্চয়ই। ভাগ্যি ভৈরব ছিল না-হলে যে কি কাণ্ডটা হোত ভাবতে গিয়ে চাঁপা শিউরে উঠল !

ঝোপের মধ্যে বসে উদ্ভেজনার হাঁপাতে লাগল অক্ষয়। ও কাকে দেখল সে ? চাঁপা—চাঁপা বেঁচে আছে। কত বড় হয়েছে কত ভারিকী হয়েছে চেহারা তবু চিনতে তার ভুল হয়নি। না-না ভুল তার হয়নি। চাঁপা, ঠিকই চাঁপা। কপালে সিঁহুর ছোট মেয়েটা মা-মা বলে ডাকছিল। তবে কি চাঁপা ফের বিয়ে বসেছে। তবে যে পুকের বিলের জেলে বুড়ী বলল, জলে ঝাপ দিয়ে মরেছে। অক্ষয়ের মাথার ভেতর ঝিমঝিম করতে লাগল।

হাটে ফিরে এল অক্ষয়। আক আর ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে খাবার প্রস্তুতি নেই। নির্জনে এক পড়োচালার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। চাঁপা তবে বেঁচে আছে। আবার বিয়ে করেছে সে ! মেয়েটা কার ? বোটি চাঁপা ত বটে। তার চোখের ভুলও ত হতে পারে ! নাককাটির খাল কত দূর ? দূর হোক ছাই বত সব বাসে চিন্তা। চাঁপা বাঁচলেও বা কি মরলেও বা কি। সে ত মরে গেছে। তার আর বাঁচার কোনো অর্থ হয় না। বত চিন্তা দূর করতে চাইছে মাথা তত গরম হয়ে উঠছে। ঘুমের দফা গয়া। অক্ষয় উঠে বসল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে এসে নদীর পারে চরের উপর বসল। নদীর হাওয়া গায়ে এসে লাগছে। আয়-আয় ঘুম আয়। তাকে বিধে ভাবনা থেকে মুক্তি দে।

নদীর হাওয়া মাথা ঠাণ্ডা করতে পারল না। না, তার ভুল হতে পারে না। চাঁপা বেঁচে আছে। তার স্বামী আছে, সন্তান আছে। চাঁপা মরেছে বিধে কথা।

তার রেলের কাটা পড়ার মত গল্পকথা । সেই মল বাজানো মেয়েটা দিবা গিল্লী হয়েছে । ভাল ভাল । আহা, সে ত তাকে আনন্দ দিতে পারেনি, সুখ শাস্তি দিতে পারেনি । আর একজনে দিক । না, কারো পরে অভিনয় নেই, ঘেঁষ নেই তার । কোনো দোষ নাই টাপার । সে কেন মরতে যাবে ।

নদী দিয়ে গান গেয়ে হাটুরে নোকা যাচ্ছে ।

নাককাটির খাল কতদূর ভাই বেপারী ?

সামনে ফুটুনিগু—মোড় ঘুরলি খাল পাবা, নাককাটির খাল ।

মেঘশূন্য নিঃসীম আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলছে । সামনে, পেছনে—চারদিকে হুশ্ছেলু আঁধার ।

নদীর জলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু স্পষ্ট দেখবার উপায় নেই । অক্ষয় নিকম্প দৃষ্টি দিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে রইল ।

এ কি সে ছেলেমানুষি আরম্ভ করেছে । কোথায় না কোথায় বাড়ি, কার না কার বউ অমনি তাকে টাপা বলে মনে করার মত মতিচ্ছন্ন হোল কেন তার । ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি । নিষের মনেই হেসে উঠে অক্ষয় হাটের দিকে পা বাড়ালো । হাঁটতে হাঁটতে সেই বউটির কথা মনে পড়ল আবার, তার মুখ, তার দেহ চোখের সামনে ভেসে উঠল । আশ্চর্য সাদৃশ্য ! তবে কি—

হু'দিন গেল, তিন দিন গেল, হরষিত বাড়ি ফিরল না । চামড়ার চালানে কাঁচা টাকা পেয়েছে । তার উপর কোনো ছারি বা কবির আসরের যদি খোঁজ পেয়ে থাকে তবে ত কথাই নেই । কোনো বদ খেয়াল নেই লোকটার, এতেই টাপা নিশ্চিত । গানের পেছনে হু'চার টাকা নষ্ট করে করুক ।

টাপা বসে বাঁশের টাচ দিয়ে ডালা বাঁধছিল ।

হুর্গা দৌড়ে এল । হাঁপিয়ে বলল, সেই লোকটা না—

কেডারে ?

আপন মনে কাজ করতে করতে টাপা প্রসন্ন করল ।

ঐ সেই ঠ্যাংকাটা বেটা ।

এবার টাপা আঁতকে উঠল । হাতের কাজ হঠাৎ খেনে যেতেই বাঁশের টাচে আঙুল কেটে রক্ত বেরল । হুর্গার কথায় শূঙ্কিত হয়ে বলল, কয় কি বেটা ?

ঠোঁট উলটিয়ে হুর্গা জবাব দিল, দেখনা যায়ে । নাস্তার মধ্যি বসে পড়ে আমাগো ঘরের দিক চাইয়ে হাঁপ ছাড়তেছে ।

বাড়ির বার হবার সাহস নেই । জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে টাপা গালাগাল দিতে আরম্ভ করল । গায়ের খাল মিটিয়ে গাল দিল সে কানাটাকে ।

চারদিন পরে হরষিত বাড়ি ফিরল অনেক বেলায় ।

না মেয়েতে আরম্ভ করল সেই ঠ্যাংকাটার গল্প ।

টাপা বলল, বজ্জাত বেটা কেবল ঘুর'ঘুর করে বেড়াতেছে । আর এটা ঠ্যাং খোঁড়া না হলি আর নড়তিছে না । তুমি ঘরে নাই । ওরে দেখলি আমার ডর নাগে ।

হরষিত মেজাজে আছে । সব শুনে হেসে বলল, তোরে ভালবাসিছে তাই ক
চাঁপা ক্ষেপে উঠল, অমন ভালবাসার মুখি আশুন ।

হরষিত বলল, তা আমি করব কি ?

ধরে ঠ্যাঙানি দেও । তাহলি আর আসবে না ।

হরষিত গম্ভীর হয়ে বলল, সমাচারডা খুলে ক দেখি ।

চাঁপা হাটের ঘটনা বলে বলল, হাটের কথা ভুলে গিছি । ও মা—মা,
সনখে বেলায় সেদিন জল নিয়ে ফিরতিছি দেখি পথের মধ্য হাঁ করে দাঁড়ায়ে বেটা ।
কাঁথের কলসি পড়ে গুড়ো গুড়ো হোল । চৈঁচালার । বেটা যেন ভাল মানুষ এমনি
ভাবে পলাল । তবু ভয় নাই । কাল আবার আসেছিল ।

হরষিত হো হো করে হেসে উঠে বলল, ঠ্যাংকাটা, কানা, তারপর ধর
বোবাও হতি পারে । হুডো ভাতের জন্মি হয়ত বেটা ঘুর ঘুর করে । তোর অতো
ভয়কিসির ?

নাককাটির খালের এপারে লোকটাকে আর দেখা গেল না ।

কাঁচা পয়সা যতদিন ট্যাকে থাকে ততদিন কাজে তাগাদা থাকে না হরষিতের ।
বসে বসে পানতামাক খায় আর গালগল্প করে । কখনকখন খোল বাড়িয়ে
গান ধরে ।

চাঁপা চাল ভেঙ্গে দিয়েছে । দাওয়ায় বসে হরষিত হুন লক্ষ্য মেখে তাই
চিঝুছিল । হুর্গা বাঁশের কঞ্চি কুড়াতে গেছে ।

হুর্গা দৌড়ে এসে উঠানের মাঝখানে কঞ্চির বোঝা ঝপ করে ফেলে দিয়ে
চৈঁচিয়ে বলল, ও মা, মাগো, সেই ঠ্যাংকাটা—

কে কনে ?

কাজ ফেলে দৌড়ে এল চাঁপা ।

ঐ যে বাড়ির ছয়োরে ।

হুর্গা হাঁপিয়ে বলল ।

স্বামীর সামনে এসে চাঁপা বলল, নেও, এবার ত পায়েছ । ধর বেটারে ।
ঘুর ঘুর করতি আসে কেন বেটা শোন একবার ।

বাটি হাতে করে হরষিত মেয়েকে ডেকে বলল, চল দেখি লোকটারে দেখি
একবার ।

মেয়ে নিয়ে হরষিত বেরিয়ে গেল ।

চাঁপা কিন্তু কাজে মন দিতে পারল না । হরষিতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে
রইল । এমনি শাস্ত কিন্তু রাগলে আর রক্ষা নেই । লোকটাকে আবার খুন করে না
ফেলে ।

কিছুক্ষণ বাদেই লোকটাকে সঙ্গে নিয়েই ফিরল হরষিত ।

লোকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে হরষিতের পাশে দাওয়ার উপর বসল ।

হরষিত বলল, ও হুর্গা, তোর মারে ভাত দিতে বল । বড় খিদে নেগেছে
ওস্তাদের । ভাল হয়ে বসো গো মাতব্বর ।

হরষিতের কথা শুনে চাঁপা জলে উঠল। কোথায় নেবে তাড়াবে তা নয় বাড়ির ভেতর নিয়ে এসে কুটুমের আদর দেখাচ্ছে। মুখ খামটা নেবে ঘরের ভেতর অদৃশ্য থেকে চাঁপা খাঁঝালো সুরে উত্তর দিল, ভাত নাচতেছে !

হরষিত নাছোড়বান্দা। বলল, তবে চিড়ে গুড় নিয়ে আয়রে ছুগুগি ! বেশি করে আনিস।

হরষিত যখন তাল ধরেছে তখন ছাড়বে না। চাঁপা চিড়ে গুড় মেয়ের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিল।

লোকটি কোনো দিক দৃকপাত না করে মুঠো মুঠো মুখের ভেতর ঠেলে দিতে লাগল।

চাঁপা আর হুর্গা ঘরের ভেতর থেকে তার ঘাড়টা দেখতে লাগল !

লোকটি জল খেয়ে হাত মুছল।

একটা বিড়ি ধরিয়ে আর একটা দিয়ে হরষিত বলল, নাম যেন কি বললে ? অক্ষয়।

সাকিন ?

পুবির বিল।

চাঁপা শুনতে পেয়েছে। চমকে উঠে ঘরের ভেতর থেকেই চিৎকার করে উঠল, কেন ?

উত্তর দিল হরষিত, পুবির বিল।

দুয়ারের কবাট ধরে টাল সামনে নিল চাঁপা।

পিতার নাম ?

নটবর রিশি।

অক্ষয়ের কোনো ভাবান্তর নাই। যেমন প্রসন্ন করছে কলের মত উত্তর দিয়ে যাচ্ছে।

কি বললে ?

নটবর রিশি।

ঘরের ভেতর ছরমুড় করে শব্দ হোল।

হুর্গা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ওমা, না রে—এ।

হরষিতের কোনো দিক খেয়াল নাই। বহুদিনকার একটা গল্প হঠাৎ এমনভাবে বাস্তব হয়ে উঠতে পারে নাকি ! ফ্যাল ফ্যাল করে হরষিত অক্ষয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তুনি অক্ষয় রিশি ?

অক্ষয় মাথা নেড়ে বলল, হ।

পুবির বিলি বাড়ি ছিল ?

হ।

নটবর রিশির ছেলে তুমি ?

অক্ষয় মাথা নাড়ল।

নজুতখালির পুটিরান কেডা ?

এতক্ষণ মুখ উচু করে নি। এবার অক্ষয় মুখ তুলে হরষিতের দিকে তাকিয়ে হাসল। কোনো উত্তর দিল না।

তুমি না মরিছ ?

বাঁচে আর আছি কৈ ! অক্ষয় উত্তর দিল।

ঘরের ভেতর থেকে দুর্গা চৈচিয়ে উঠল, ও বাবা, মা-য়ে কথা কয় না ! ও মা, মা গো ! ও বাবা, মা যে ভিরনি খায়েছে !

অক্ষয় ব্যাকুল হয়ে এদিক ওদিক তাকালো। হরষিতের কোনো কথা কানে চুকছে না। একবার বসছে, একবার উঠছে। উঠোনময় পায়চারি করছে। মাথার চুল টেনে টেনে ছিড়ছে।

হঠাৎ যেন খেপে উঠল হরষিত। লাফিয়ে দাওয়ার উপর উঠে অক্ষয়কে জাপটে ধরে বলল, মুখির কথায় হবে না। পেরমান আছে তোমার ? চোর তুই, ডাকাত তুই—

লোকটাকে পিষে মেরে ফেলে আর কি। অক্ষয় নিজেকে মুক্ত করবার কোনো চেষ্টা করল না। শান্ত সুরে বলল, কিসির পেরমান চাও তুমি ? দয়া করে খাতি দেছ, ভাই বধেট। ছাড়ে দেও, আমি চলে যাই।

চাঁপা যেন কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদছে।

দুর্গাও কাঁদছে।

হরষিত বলল, চুপ করে থাক। ছাড়া পাবা না সহজে। হেস্টেনেস আমি করতিছি।

ঘরের ভেতর এসে চাঁপার মাথায় ঘল ঢালতে শুরু করল সে।

চাঁপা চোখ মেলেই আবার চিৎকার করে উঠল।

হরষিত শক্ত হাতে জাপটে ধরে তাকে উঠিয়ে বসালো। চাঁপার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করল, ও কেডা ?

চাঁপা ক্লান্ত সুরে বলল, আমার মাথার ভিতর জলতেছে। আমি কিছু জানি না। আনারে ছেড়ে দেও গো—

হরষিত তাকে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ধমকে উঠল তারপর পাঁজাকোলে নিয়ে এসে অক্ষয়ের সামনে তাকে বসিয়ে দিল।

ভাল করে নজর দিয়ে কও কেডা ?

একখানা পা ত নেই। আর যেখানে আছে তার চারটে আঙুল, কড়ে আঙুলটা নেই। চাঁপার নজর সেদিকে পড়তেই সে ক্ষীণ আর্তনাদ করে মুখ লুকালো।

কি কথা কও না যে বড়। হরষিত আবারও ধমক দিল চাঁপাকে।

চাঁপা বলবে কি। সাজে পোশাকে চেহারায় চিত্তবার কোনো উপায়ই নেই নইলে একদিনেই চিনতে পারত। এখন মনে হয় গলার সুরটা একেবারে যেন অচেনা নয়। কিন্তু একটা পায়েও যে চারটি আঙুল। বতই ভুলুক সে-ঘটনাটি এখনও স্পষ্ট মনে আছে চাঁপার। মানুষকে এত রাগতে চাঁপা কখনো দেখেনি।

বাপরে বাপ ! রাগের বশে নটবর দা ছুড়ে নেরেছিল, ছেলের একটা আঙুল ছ'ভাগ হয়ে গেল ।

চাঁপা মুখ ঘুরিয়ে আবারও পায়ের দিকে তাকালো । তারপর জোর করে মুখ তুলে অক্ষয়ের মুখের দিকে তাকাতেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল ।

হরষিতের তখন বাজজ্ঞান শূন্য । মাথার চুল ধরছে আর পট পট করে ছিড়ছে । চাঁপার অবস্থা দেখে এতটুকু বিচলিত হোল না । তার মনে দারুন সংশয় এসেছে । চাঁপা নিজে মুখে বলুক ও তার আগের স্বামী কি না ।

চাঁপাকে ধরে হরষিত বলল, কও কেডা ও ? আমার মাথার ঠিক নেই । কও নিগগির ।

চাঁপা কাঁদছে । কোনো উত্তর দিতে পারল না ।

এতক্ষণে মুখ খুলল অক্ষয়, মাইয়ে মামুষটারে আর টানাইয়াচড়া করো না । যাও, ঘরের ভিত্তি নিয়ে যাও । আমি কেউ না । ভিন দেশী ভিক্ষুক । যাও ভাই নিয়ে যাও ওরে ।

হরষিত একবার চাঁপার মুখের দিকে আর একবার অক্ষয়ের মুখের দিকে তাকালো । তারপর বউ নিয়ে ঘরের ভেতর গেল ।

অক্ষয় চলে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু তাকে অপেক্ষা করতে ইশারায় বলে গেল ।

মাথা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে কিন্তু মনে ভয় ধরেছে এবার । অক্ষয়ের হাত ধরে হরষিত বলল, চোর বলিছি, আমারে খেমা দেও ওস্তাদ ।

অক্ষয় হেসে বলল, দোষ ত করনি, খেমা দেব কিসির ।

অক্ষয়কে ধরে এনে ও-পাশের ছোট ঘরে বসালো হরষিত ।

মন পুড়তেছে ! তোমার কথা কও শুনি ।

ছটির কথা শুনে হবে কি তোমার । ওসব বাতি দেও ।

না-না-খুলে কও ভাই সনাচার ।

সবটা স্পষ্ট করে বলল না অক্ষয় । গোড়ার দিকটা একদম চেপে গেল । মুহুর সময় জাহাজে কাজ নিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এসেছে । পা গেল, মুখ পুড়ল চাকরী করতে গিয়ে । হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসতে গিয়ে জেল খাটল । কত দেশ বিদেশের পথে পথে ঘুরে পনেরো-বছর পরে নিজের গ্রামে ফিরে এসে দেখল কেউ নেই ! তেরো বাঁকির চরের হাটে সে বউ খুঁজতে আসেনি, ভিক্ষা করতে এসেছে ।

অক্ষয় হেসে বলল, আমি মরিছি রেল, বউ মরিছে জলে । বাস, সব শেষ ।

হরষিত কিন্তু এসব হালকা কথা কানে তুলল না । ব্যগ্র হয়ে অক্ষয়ের ছ'হাত ধরে বলল, এখন তবে কি হবে ওস্তাদ ?

অক্ষয় বলল, হবে আবার কি । আর জন্মে চাঁপা আমার ছিল, এ জন্মে তোমার । আমার কিছু নাই ? তোমার সাজানো সন্সার । দোষ তোমার না, আমার না, চাঁপারও না । সবই অদেষ্ট ।

এসব কথা হরষিত কানে তুলল না । চিন্তাক্রিষ্ট হয়ে বলল, তুমি কও, আমি করব কি ?

অক্ষয় বলল, আমি কি কব।

চাঁপাও বা বলবে কি। অক্ষয়কে ত অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু স্বামী বলে স্বীকার করেও বা এখন সে করবে কি? গাঁয়ের লোক বলল, কলকাতার ওদিকে গাড়ী চাপা পড়ে মরেছে অক্ষয়। খবর শুনে বুড়ো নটবরও মরল দু'দিন বাদে। চাঁপা এখানে ওখানে ভেসে বেড়ালো। কত লাঞ্ছনা, কত অপমান সে সয়েছে। বদলোকে পেছু নিয়েছে। আত্মহত্যা করা ছাড়া আর অন্য কোনো পথ ছিল না। আত্মহত্যা করতে সে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল। সেই রোমাঞ্চকর রাতের কথা আজও ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। কোথায় ছিল হরষিত, নাককাটির খালের হরষিত রিশি। তার মৃত্যু ত অবধারিত ছিল। হরষিত এসে কোথা থেকে হাজির হোল। তাকে দেখে নোকায় টেনে তুলল। পরিচর্যা করে বাঁচিয়ে তুলল। শুধু নিজের বাড়িতে এনে আশ্রয়ই দিল না, বিয়ে করে বউএর মর্যাদা দিল। সব দুঃখ সব কষ্টে চাঁপা ভুলে গেল। হরষিতের সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধল, ছেলে হোল সংসারে আকর্ষণ বাড়ল। সুখশান্তিতে দিন কাটছিল চাঁপার। ধুমকেতুর মত পনেরো বছর ঠেলে আজ ইঠাং কোথা থেকে এসে হাজির হোল সেই মরা মানুষটি।

চাঁপা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। যদি নাই মরে থাকে তবে এতদিন বাদে আজ আবার কেন ফিরে এল অক্ষয়। ভুলব বললেই ত আর রক্ত মাংসের মানুষটিকে ভোলা যায় না। হরষিতকেও ত এখন সে বলতে পারে না, তুমি আমার কেউ নও।

সবার মনে ভাবনা চিন্তার ঝড় বইছে। অক্ষয় কিন্তু নিষিকার। চুপ করে সে বসে আছে। তার ভাব হরষিতের অসহ বোধ হোল। হুহাত দিয়ে মাথার চুল টানতে টানতে হরষিত বলল, কি করি বল ওস্তাদ? চুপ করে থাকো না, কথা কও।

অনাসক্ত সুরে অক্ষয় বলল, আমার কিছু করার নেই।

সন্দেহের দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ হরষিত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সদর কোর্টে এক বউ নিয়ে দুই সোয়ামীর লড়াই সে এই সেদিন দেখে এসেছে। সন্দেহটা যাচাই করে নেবার ক্ষমতা বলল, এই নাতটা তবে শেষ হোক! ফর্সা হাতি চল দুইজনে আমাগো নাতক্বরের কাছে যাই। দেখি কি বিধান সে দেয়।

অক্ষয়ের মাথায় কি এক হুঁটুঝুটু এসে, বলল, বেশ কথা।

এমনটি কিন্তু আশা করেনি হরষিত। সন্দেহটা তার এবার দৃঢ় হোল। তবে কি বউ ফিরে পাবার চেষ্টায় এসেছে ঠ্যাংকাটা। মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বেরলো না হরষিতের। ভুতের মত শুধু এদিকওদিক ঘুরতে লাগল।

ছোট ঘরে পাশাপাশি শুয়েছে হরষিত আর অক্ষয়। বড় ঘরে চাঁপা ছেলেমেয়ে নিয়ে আছে। হরষিত কিন্তু ঘুমুতে পারছে না, উসখুস করছে আর ওঠবস করছে।

পাশে শুয়ে অক্ষয় তার ভাব দেখে মনে মনে হাসছে।

ভাবনায় চিন্তায় মাথা গরম হয়ে উঠেছে হরষিতের। বাঁশের বেড়ায় চকচকে ধারালো ছুরি গাঁজা রয়েছে। টেনে এনে বসিয়ে দেবে নাকি শালা ঠ্যাংকাটার বুকে! উত্তেজনায় হরষিত বিছানার ওপর উঠে বসল।

এবারে আর না হেসে পারল না অক্ষয়। বলল, চোখির পাতা যে এককরতি পারতেছে না! নেতের তালে আবার ঘাই মারে বসো না যেন ওস্তাদ!

ছিঃ ছিঃ, অক্ষয় কি তবে মনের কথা জানতে পেরেছে! এমন কুভাব কেন এল তার মনে। লোকটি ত চলেই যেতে চেয়েছিল।

না-না, মানে, উড়োসে কামড়াতেছে বড়—কৈকিয়ৎ দিল হরষিত।

ন বছর বয়সে চাঁপার বিয়ে হয়েছিল। তবে যখন চোদ্দয় পড়েছে তখন অক্ষয় পালিয়ে গেল। বাপ বেটাতে বনিবনা ছিল না। দিনরাত ঝগড়া চলত। অক্ষয় বাড়িতে একগাছি কুটোও সরাতে না। শেষে একদিন বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেল, আর ফিরল না। বউএর কথা এতটুকুও ভাবল না। চাঁপার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

ভূর্গা ভয়ে ভয়ে বলল, ওনা, কঁাদিস ক্যান? ও লোকটা কেডা?

চাঁপা তাকে কাছে টেনে এনে বলল, কেডা আবার! তুই ঘুমো।

সন্ধ্যার খেজুর রস গাঢ় নিশ্চির সববতকে হার মানায়। চাঁপা আবদার ধরেছিল খাবে বলে। গোন্দোর ভিটেয় রস চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে শাস্তি পেল অক্ষয়। কিন্তু তার জন্তে জব্ব হোল চাঁপা। চড়কডাঙ্গায় মেলা দেখতে গিয়ে খালের মাঝে অক্ষয় ইচ্ছা করে নৌকা ডুবিয়ে দিল। সে কী অবস্থা! নাকানি চুবানি খেয়ে চাঁপা মরে আর কি।

ভূর্গা মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, মা, অ মা, হাসতেছিস ক্যান অমন করে?

চাঁপা সম্বিত ফিরে পেয়ে বলল, ও কিছু না, স্বপন দেখতিছি।

সত্যি চাঁপা স্বপ্ন দেখছে।

...অক্ষয় এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। হাত ইশারায় ডাকছে তাকে, আয়, ফিরে চল পুবির বিলে। আয়, বেরিয়ে আয় চাঁপা! তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমার চাল নেই, চুলো নেই, মরলে এক কোঁটা চোখের জল ফেলবার লোক নেই।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে চাঁপা সামনের দিকে তাকালো। শুধু আঁধার! বাইরে অনেক দূরে একটা কুকুর যেন কঁকিয়ে কঁকিয়ে কঁাদছে। দেহ অবসন্ন। বুকের ভেতর ঢেকির পাড় পারছে। চাঁপা কোনো মতে উঠে কলসি থেকে জল গড়িয়ে খেল।

বুকের ভেতরটা হা হা করে উঠল চাঁপার। যে মানুষটি একদিন ঘরের আপন জন ছিল, তাকে কত গালাগাল দিয়েছে একদিন। ভাল করে একটা কথা বলেনি, মুখের দিকে একবার তাকিয়েও দেখেনি! না আছে ঘর, না আছে কোনো সম্বল, তার উপর এক পা কাটা। আহা ওর ত আর কেউ নেই, কিছুই নেই। সমস্ত অন্তর তার করুণায় উবেল হয়ে উঠল। ইচ্ছা হোল মানুষটিকে ডেকে এনে কাছে বসায়। হুটী কথা বলে। অক্ষয়কে কি কাছে রাখা যায় না? হরষিতকে সে বলে দেখবে একবার! এক সোয়ামী যদি ছুই বউ নিয়ে ঘর করতে পারে তবে এক বউ কি তার ছুই সোয়ামী নিয়ে থাকতে পারবে না।

চুপি চুপি বাড় উঁচু করে দেখল অক্ষয় হরষিত ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাবনার চিন্তায় যস্থির হয়ে অবশেষে লোকটি ঘুমিয়ে পড়েছে। অক্ষয়ের কোনো সমস্যা নেই, কোনো

ভাবনা চিন্তাও নেই। তার আছে শুধু অসুস্থীনের দুঃখ আর নিঃসীম নিরাশ্রয়তা। ভাগ্য তাকে উপহার দিয়েছে অপারমের্য অশান্তি। এই তার ভাল। আর কিছু সে চায় না। তার কাজ শেষ হয়েছে। নিঃসন্দেহে সে জেনে গেল চাঁপা বেঁচে আছে—চাঁপা সুখে শান্তিতে আছে। আহা, তার শান্তি অখণ্ড হোক। নিজে সে শান্তি পায়নি, সুখ তার বরাতে ছোটেনি, তার জন্মে আজ আর কোনো কোভ নেই। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চাঁপার অমঙ্গল সে ঘটতে দেবে না। চাঁপার নতুন জীবনে সে বিঘ্ন ঘটাবে না। না-না, প্রাণ গেলেও না। অক্ষয় নিঃশব্দে উঠে বসল। হাতড়ে দেখল কাঠের ঠেদো দুটি পাশেই আছে। জানালা খোলা আছে। তাকিয়ে দেখল আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলছে। বাইরে জমাটবাধা আঁধার। রাত শেষ হবার এখনও বহু দেরী। ঘরের বেড়া ধরে অক্ষয় তার লাঠি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আশু আশু ঘরের খিল খুলল। তারপর আর একবার পিছন ফিরে হরষিতকে দেখল, চারিদিক স্তব্ধ দৃষ্টি ফেলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল।

পথে নেমে আর পিছন ফিরল না অক্ষয়। তার কাঠের ঠেদো রক্তমাংসের পায়ের চেয়ে হাজার গুণ শক্তি পেল। অক্ষয়কে যেন ভুতে ভাড়া করেছে এমন ভাবে পালাতে লাগল।

ভাড়াভাড়ি ছুটে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে অক্ষয়। কঞ্চলটা ভিজে গেছে ষামে। বগলের ভিতরটা ব্যথায় টন টন করছে। পাঁজরে জোর পাচ্ছে না। অক্ষয় তবু ধামল না। সমানে এগিয়ে চলল। ভোর হবার আগেই এই অঞ্চল তাকে পেরিয়ে যেতে হবে। যেমন করে হোক অনেক দূরে, আরও দূরে তাকে সরে যেতে হবে। কোথায় যাবে সে? সে জানে না, বলতে পারে না সে তার ঠিকানা। তার ভয় নেই, তার ভাবনা নেই, তার দেশবিদেশ নেই। আপনজন বলতে কেউ নেই। জীবনমৃত্যু তার কাছে সমান। চলতে চলতে যদি এই মুহূর্তে মৃত্যু এসে তাকে সবার কাছ থেকে আঁড়াল করে রাখে, সেই ত হবে তার চরম পুরস্কার।

ছোট বেলায় শংকরী-মা গল্প বলত মানুষ মরে আকাশে তারা হয়ে ফোটে। এখন মনে হোল তা গল্প নয়, সত্যি। অক্ষয় আকাশের দিকে তাকালো আবার। ঐ-ঐ ত তার মা, ঐ বাবা, ঐ সেই হারাণ কা, চাঁপার মা, আরও কত কে! আরে আরে ঐ ত সেই মল বাজানো ছোট মেয়েটা—ভৈরবের জলে ইচ্ছত বাঁচাতে যে কাঁপ দিয়ে মরেছিল। ঐ ত তার অতি প্রিয় সব আপনজন কেমন মিটি মিটি হাসছে হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে :

আয়, আয়, আয়, আমাদের কাছে আয়। এখানে অক্লান্ত সুখ, অপার শান্তি, অগাদ ভালবাসা। আয়-আয়-আয়—

ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্...

শুধু হ'খানা কাঠ যেন অত্যন্ত গতি নিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে।

(সমাপ্ত)

প্রাণ প্রেম প্রত্যাশ ও সঙ্ক্যা

ছোঁতিষ্য গদ্যোপাধ্যায়

এতো বড় পৃথিবীতে কবে কার ইচ্ছা বলো
অপূর্ণ থেকেছে

দেখো তুমি, ওই যে পুরুষ প্রেমিকপ্রিয়
দৃঢ়চিত্ত নিষ্ঠাবান একনিষ্ঠ সত্যদ্রষ্টা
প্রত্যাশে যাত্রা যার তোমারই তো মুখ দেখে
মুখচেয়ে তোমারই তো পথপরিক্রমা তার
দিবসের সংঘর্ষের প্লানির তিক্ততায়, আর,
সব পথ ফেলে এই চেনা দরজায়
শহরের পথের নক্সার
জটিল ধাঁধার
এ কী অনায়াস সমাধান

তোমার সঁজুতি তার ক্রবদীপালোক

সে তো ফিরবেই, তুমি জানো,
তোমার দারুণ ইচ্ছা—প্রেমের দাবীর সত্যতার
ঘরে ফেরবার কথা
অরণে বাস্তবে কতো তার ।

অপূর্ণ থেকেছে, তাই বলি, পৃথিবীতে
ইচ্ছা কবে কার ।

সংগীতের মতো এই পৃথিবীর সংসারে
তুমি তাই কবিতার কণ্ঠে কথা বলো

এই আলো এই সঙ্ক্যার তারা ছেড়ে
কোথাও যাবো না, যাবো না কোথাও আমি
তুমি ইচ্ছাকে শতপাকে বেঁধে বলো
এই দরজা ও গলির গ্যাসের আলো
আনায় করেছে সাধারণ সংসারি

তবু ঝোড়োরাতে সন্ধ্যার রাজপথে
চেতনা আমার সংসারে সংগ্রামী
মনে হয়, সব ছুঁড়ে ফেলে পথে নারি ;

তুমি আলম্বে প্রত্যাষে প্রথামতো
দেখো নির্বাক নিদ্রাভঙ্গশয্যায়
কণ্ঠলগ্না অতিসাধারণ নারী

তোমার দারুণ ক্রান্তির শয্যায়
প্রেয়সীর মতো ছুটি হাতে কাজ সেরে
রচনা করেছে হৃদয়ের ব্যথা দিয়ে
পরম নিবিড় নৈশ নীড়ের ছায়া ;

দাঁড়িয়ে থেকেছে উৎকণ্ঠার দরজায় ।

একদা অনাশ্রুত অন্ধকার
পশ্চাতে রেখে, আলোর নৈশযাত্রা

সেই যাত্রার শেষে আকাশের আলো
নিদ্রাভঙ্গশয্যায় দেখো পাশে
অতিসাধারণ রূপসী প্রেয়সী নারী
করুণায় তার গারামুখ ভরে আছে
দেখে রেখে তার নবজন্মের মুখ ॥

উপসংহার

তবে এই বলে রাখি—

ওই যে নায়ক নটিকেতা
নবীন নিষ্ঠায় প্রেমে সন্ততায়
বাহু যার প্রসারিত নিতি
অনেক শ্রান্তির কথা ক্রান্ত অবয়বে
পথপ্রান্তে পথিকের পঙ্কপদরেখা
নিষ্ঠুর যাত্রারন্ত্রে কয় কতি কবাহীন
কী কঠিন ।

আৰু সেই যাত্ৰাপৰ্ব, যাব
 প্রতিদিনপঞ্জিকায়, যত্ন আৰু অসম্ভৱ
 সময়ৰ সঙ্কীৰ্ণ শঠতায়

কোথাও কৰুণা নেই লোকাৱত এই পৃথিৱীতে
 এৰুও বড় কোন শাস্তি
 যাত্ৰাপৰ্বে পেৰেছে সম্ভৱ মানুহৰে !

আলোনেই হাওয়ানেই প্ৰেমনেই
 নারীৰ কঠোৰ মতো শব্দ আছে তবু

তুমি আছ,

তবে এই বলে ৰাখি—

একনিষ্ঠ নিষ্ঠাৰান দৃঢ়চিত্ত
 নবীন নায়ক নচিকেতা
 তার কিন্তু ইচ্ছামৃত্যু ব্যতীৰেকে
 অন্ধ কোনো যত্ন নেই ঘেনো ॥

॥ ॐ নমঃ শিবায় ॥

ব্রাহ্মণ শাস্ত্রমুখ্য



নর্তকী

চন্দ্রাভিনী কিংবা চন্দ্রাভেনী কিংবা চন্দ্রকলা, কি একটা নাম ।

নাম ঠিক মনে পড়েনা । তবে 'চন্দ্র' শব্দটা নামের সঙ্গে জড়ানো ছিল । মোটকথা, তিনি দেবী । এবং খাস মণিপুরের একজন সুন্দরী মহিলা । এক পরিচ্ছন্ন যুবতী ।

কি একটা কারণে কলকাতা এসেছিলেন । কলকাতার কাজ শেষ হবার পর যখন ইশ্ফলে ফেরত যাচ্ছিলেন, তখন একই বিমানে আমিও যাচ্ছিলাম ইশ্ফলে ।

আবহাওয়া সেদিন দুর্যোগপূর্ণ ছিল । আকাশের অবস্থা যতক্ষণ না ভালো হয়, ততক্ষণ বিমানটা অ'র ছাড়ছিলনা । বিমানটা অবিশি কুন্তীরপ্রাণ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল । কিন্তু তারপরেই যন্ত্রের পক্ষীরাজ রইলেন বিমানবন্দরে অচল হয়ে ।

ক্যাপ্টেন বললেন, আকাশের অবস্থা যদি আধঘণ্টার মধ্যে ভালো না হয়, তবে বিমান আর ইক্ষলে না গিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসবে।

মাটিতে যদিও অতটা হুঁসিগ ছিলনা, কিন্তু আকাশে নাকি ছিল। বিমানবন্দরের আবহাওয়া তববিদ্রা অবশ্যই আমাদের চাইতে বেশি জানতেন আকাশের খবর। কাজেই তাঁদের কথায় বিশ্বাস করা ছাড়া আর উপায় ছিলনা। তবে আমি সেদিন লাভবানই হয়েছিলাম। কেননা, আকাশের ঐ হুঁসিগ না থাকলে মাটিতে বসে বসে আমাদের ঐরকম করে প্রথম পরিচয়টা হত না।

কুস্তীরগ্রাম বিমানবন্দরের বিশ্রামগৃহের চেয়ারে বসে বসেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়টা হল। সেদিন তাঁর চোখেমুখে ছিল একটা অপ্রসন্নতা। এবং এটা অস্বাভাবিক ও কিছু ছিলনা। বিমানটি যদি সত্যিই সেদিন ইক্ষলে না যায়, তবে হুঁসিগতার কারণ বটে। মহিলাটি হুঁসিগতপ্রস্তু হয়ে পড়েছিলেন।

বিমানের অনিশ্চিত অদৃষ্টকে ভড়িয়ে ভড়িয়ে প্রাথমিক পরিচয়ের সেই যে সূত্রপাত। কোনো একটা প্রসঙ্গ যখন পরিচয় সৃষ্টি করে, তেমনি পরিচয়ও সৃষ্টি করে প্রসঙ্গ। নানা প্রসঙ্গের টুকরো টুকরো কথা আমাদের মুখ থেকে বাতাসে ছড়িয়ে যেতে কেবল শুরু করেছিল। ঐরকম একটা সময়ে লাউডস্পীকারে জানিয়ে দেয়া হল যে, ইক্ষলগামী যাত্রীগণ যেন অবিলম্বে বিমানে ওঠেন। আবহাওয়া খানিকটা পরিষ্কার হওয়ায় ইক্ষলবাতার ভয়ে আকাশে উড়বে বিমান।

মেঘলোকে কিছুটা নাচন নেচে শেষ পর্যন্ত পক্ষীরাজ ইক্ষলে অবতরণ করেছিলেন। আকাশে সেদিন সূর্য মেঘাবৃত থাকলেও বুশির সূর্যালোকে ঝিলিমিলি করে উঠেছিল মহিলাটির চোখ মুখ। আহা, ইক্ষলের মাটিতে তিনি যে পা দিতে পেরেছেন।

নগরের বিমান অফিসে যাওয়ার পরই বিদায়ের পালা। তিনি তাঁর ঠিকানা দিয়ে বললেন, 'একেবারে বিদায় নেবেন না, দেখা করবেন।'

রিকশা করে আমি উঠলান গিয়ে একটি হোটেলে। আমার উড়ুনচণ্ডী চাকরিতে লেখাপড়ার কী কম ঝামেলা। প্রায় বিকেল পর্যন্ত বাতাপত্র মেলে খালি লিখলাম আর লিখলাম।

লেখা শেষ হবার পর হোটেলের দোতলার বারান্দায় যখন এসে দাঁড়িলাম, তখন দেখলাম আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। নিচে গুঞ্জন মুখরিত রাজপথ। দূরে পাহাড়ের ওপর সূর্যের করুণ আলো।

মনস্থ করলাম, আজ আর কোনো কাজ নয়। বিকেল থেকে রাত অবধি শহরটায় শুধু বেড়িয়ে বেড়ানো যাক। ইক্ষলটা সামান্য শহর হলেও অসামান্য তার নাম। ললিতকলা চর্চার ক্ষেত্রে গোটা ভারতেই এই শহরটির সুনাম রয়েছে।

রাস্তায় বেরিয়েই বুঝলাম যে, একেবারে প্রমীলারাজ্য এসে পড়েছি। শহরের কেন্দ্রেই রয়েছে বাজার। যেখানে শাকসব্জী, মাছ বা ফল, মণিপুরী তাঁতের কাপড় থেকে শুরু করে সব কিছু খুচরো জিনিসের বিক্রেতা হচ্ছেন মেয়েরা। শত শত মণিপুরী মহিলা বসেছেন পসরা সাজিয়ে।

যে দৃশ্যটা কলকাতায় বসে কখনোই দেখা যাবেনা, সে দৃশ্যটা দেখবার মত বৈকি। ঘুরে ঘুরে বাজার দেখতে লাগলাম। পসারিনীরা অনবরত আমাকে ডাকতে লাগলেন। কোন ডাকে যে সাড়া দিই? সব ডাকেই সাড়া দিতে ইচ্ছে করে। পড়ন্ত সূর্যের আভাষ ওদের মুখচোখ খানিকটা রঙীন হয়ে উঠেছে। আকাশের পশ্চিম দিক থেকে এমন একটা স্নিগ্ধ আলো আসছে, যাকে বলা হয়, কনে-দেখা আলো। অবিস্তি, পসারিনীরা অনেকেই কনে সাক্ষ্যবার বয়েস পেরিয়ে এসেছেন। অনেকেই বয়স্ক। অথচ, সারাক্ষণ একটা মিষ্টি হাসি ওদের মুখে। প্রত্যেকটি ঋদ্ধেরের সঙ্গেই ওঁরা রক্তরস করছেন। কৌতুক-প্রিয়তা তাঁদের জাতের একটা সুলক্ষণ।

কেউ শুধালেন, 'নব্বীপ থেকে আসছেন?'

কেউ শুধালেন, 'কলকাতা থেকে?'

ওদের ভাষা বোঝা অসম্ভব। আকারে ইঙ্গিতে, ভাবে ভঙ্গিতে যতটুকু আমি বুঝছিলাম, আর তাঁরাও যা বোঝাচ্ছিলেন। তবে একজন দো-ভাষীর সাহায্য আমি নিয়েছিলাম বটে।

তুলোর একধরনের লাল কাঁধাকে ওঁরা বলেন 'লাইসেন্সি।' আমি শুধালেন, এটার দাম কত?

'আট টাকা।'

'না, চার টাকা দেব।'

পসারিনীরা পরস্পরের গায়ে গড়িয়ে গেলেন হাসতে হাসতে।

'ঐ দামে হবে না,' একজন পসারিনী বললেন। সঙ্গে সঙ্গে উনিই বললেন, 'আমাকে যদি পুরী যাওয়ার ভাড়া দেন, তবে দাম লাগবে না।'

'সে কি কথা?'

'জগন্নাথ দেবকে দেখবার ইচ্ছে।'

ঐ দোকান ছেড়ে চলে আসছিলাম। পসারিনী সরাসরি বললেন, 'আমাকে যুঝি পছন্দ হলনা?'

কোনো জবাব না দিয়ে হাসতে হাসতে এগোতে লাগলাম। বাজারের যে দিকটায় বালের মত একটা ছোট নদী, সেদিকে নাগা পুরুষ আর মেয়েরা মদের বড় বড় হাঁড়ি নিয়ে বসেছে। ক্যানেরায় একটি ফটো নিয়ে চলে আসছিলাম। পেছন ফিরে দেখি, একটি নাগা তরুণী মদের হাঁড়ির গায়ে আন্তে আন্তে তাল ঝুঁকছে। সম্ভবত নাগানাচের তাল। তার কাচের চুড়ি বারংবার যা খাচ্ছিল কাছে-রাখা একটি কাচের গেলাসে। কখন কনিকিনি আওয়াজে।

কিশোরী একটি কুকী মেয়ে সুন্দর সাক্ষ্যগোজ করে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। তার দিকে ক্যানেরা ফোকাস করতেই তার বাবা হা-হা করে ছুটে এল।

'ফটো ভুলবেন না।' আমরা পরস্পর দিতে পারব না।

'পরস্পর দিতে লাগবে না।'

'আমরা গরীব। আমাদের কিছু পরস্পর দিলে খুশি হবে।'

‘তাই হবে । তোমার নেয়েকে খুশি মুখে দাঁড়াতে বলো ।’

সেখান থেকে চলে এলাম । এখানে ওখানে অনিশ্চিত ভাবে আরও চলতে চলতে সহসা একজন বয়স্ক পানওয়ালীকে শুধালেন, ‘বাজারে ঘিনিস কিনতে মণিপুরী পুরুষেরা কি আসেন না ?’

‘না । নিয়ম নেই ।’

‘তাইত দেখছি । কেন, চরিত্র-বিচ্যুতির কোনো অপরাধ ঘটবে নাকি ?’

বুঝা পানওয়ালী আমার কোতুকটা ঠিক বুঝলেন না ।

সেখান থেকেও চলে এলাম । হাঁটতে ভারী ভালো লাগছিল । তার চাইতেও ভালো লাগছিল দেখতে । কিংবদন্তী বলে, মণিপুর নাকি চিত্রাঙ্গদার দেশ । মহাভারতের সেই নারী, যে একদিন ষাষাবর অর্জুনের মনোহরণ করেছিল । তার বাহিনী ছিল নারীসেনার । আধুনিক মণিপু্রে হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করছিলাম যে, কিংবদন্তীটা হয়ত আংশিক সত্য । পুরোটা যে সত্য নয়, তাই বা বলি কেমন করে ।

ক্রমে সন্ধ্যা মিলিয়ে এল । আলো অলে উঠল চারদিকে । হারিকেন, মশাল, মোমবাতি আর বিজলি বাতি । আলোর ছোট ছোট বস্তুকে ঘিরে থাকল বৃহত্তর অন্ধকার । একটা স্বপ্নময় আবেশ বুঝি রচিত হল ।

এতক্ষণে মনে পড়ল সেই মহিলাকে, যিনি বিমানে আমার সহযাত্রিনী ছিলেন ।

‘উরিপোক কোন দিকে বলতে পারেন ?’ একজনকে শুধালেন ।

‘ঐদিকে ।’ উনি দিক নির্দেশ করলেন ।

পা চালিয়ে দিলাম । ছোট তো শহর । ভাবলাম, দশ পনের মিনিট হাঁটলে নিশ্চয় পৌঁছে যাব গন্তব্যস্থলে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম, ঘোরাঘুরি করতে হল আধঘণ্টা । শেষে অবিশিষ্ট পেলান বাড়িটা ।

এবং মহিলাকে ও পেলান । উজ্জ্বল টেবিল-ল্যাম্পের কাছে বৈঠকখানার বসে তিনি একটি ইংরিজী সচিত্র সাময়িকীর পাতা ওলটাজ্জিলেন । আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন, ‘আসুন, আসুন ।’

‘তাহলে চিনতে পেরেছেন ঠিক ।’

‘বা-রে । এত শীগগির কি ভোলা যায় ?’

তিনি উঠে দাঁড়ালেন । যতক্ষণ-না আমি বসলাম, ততক্ষণই দাঁড়িয়ে রইলেন । তাড়াতাড়িই আমি পাশের একটি চেয়ারে বসে পড়লাম । তিনিও এমন একটা মিষ্টি ভাব দেখাতে লাগলেন, যাতে মনে হল, আমাদের পরিচয় কেবল আমের নয়, অনেক দিনের ।

• ‘কেন লাগছে আমাদের শহরকে ?’ তিনি প্রশ্ন করলেন ।

‘চমৎকার ।’

• ‘এ রকম শহর আর দেখেছেন কোথাও ?’

‘দেখেছি ।’

‘কোন শহর ?’ ওৎসুক্যে প্রশ্ন করলেন তিনি ।

‘পুণা ।’

‘সে কি ?’

হাসতে লাগলান আমি । হেসে হেসেই জিগগেস করলাম, ‘পুণা গেছেন কখনো ?’

‘না ।’

‘পুণা গেলে বুঝতে পারতেন, মেয়েদের সাইকেল-চড়ার কী রেওয়াজ । আপনাদের শহরেও মেয়েরা কী সাইকেলই না চড়েন ।

তিনি হাসতে লাগলেন । বললেন, ‘আমাদের মেয়েরা তাহলে খুব স্মার্ট । কি বলেন ।’

‘শুধু স্মার্ট নয়, ভারী সুন্দর । লাল, নীল, বেগুনী চাদর জড়িয়ে সাইকেল-আরোহিনীদের ছোটোছুটি দেখতে চমৎকার লাগে । কপালে গোরচনা অর্ধাং তিলক, এবং কানে টাপার ফুল ।’

‘যানবাহন বলতে ইম্ফলে সাইকেলটাই প্রধান ।’ তিনি বললেন ।

ইম্ফলে আর দ্রষ্টব্য কি কি আছে ?’ জিগগেস করলাম ।

‘অনেক কিছু । আপনি কি কি দেখতে চান, আগে বলুন ।’

এক মিনিট একটু চিন্তে করলাম । একটা জাতিকে জানতে হলে কি কি জিনিস জানা বা দেখা প্রয়োজন, তার একটা হিসেব নিলাম মনে মনে । শেষে বললাম, ‘আপনাদের নাচ, গান, শিল্পচর্চার খবরাখবর জানতে বা দেখতে গেলে সুখী হব ।’

মুহুর্তে মনে হল, মহিলাটির চোখে একটা কোতুকের বিদ্যুৎ খেলে গেল । টেবিল-ল্যাম্পের দিকে একবার খুঁকে ইংরিজী সচিত্র সাময়িকীটা হাতে তুলে নিলেন ।

‘এই দেখুন, মণিপুরী নাচের একটা ভঙ্গিমা ।’ সচিত্র সাময়িকীটাকে আমার হাতে তুলে দিলেন তিনি ।

গভীর অভিনিবেশ সহকারে মুদ্রিত নাচের ভঙ্গিমা দেখতে গিয়ে সহসা বিস্মিত হলাম । অবিকল একই চেহারা । অবাক-ই হবার কথা ।

‘এ যে দেখছি আপনার চেহারা ।’

‘হাঁ, আমারই । নাচের অভ্যাস আমার আছে ।’ তিনি মিষ্টি হেসে বললেন ।

‘তবে তো ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি । আপনার নাচ দেখান একদিন ।’

‘আমার নাচ ? সে কি করে হয় ? সে কি করে হয় ?’

‘আপনাদের দেশে আমি একজন অতিথি । করেই ফেলুন না বলোবস্ত ।’

আমার কথার কোনো জবাব না-দিয়ে চোখ বুজে বসে রইলেন গৃহস্থামিনী । এক মিনিট, দু’মিনিট । প্রায় তিন মিনিটের মুখে মুখ খুললেন, ‘আপনার জোর বরাত । কালই আপনাকে নাচ দেখাব । ঠিক পাঁচটা নাগাদ বিকেলে আমার এখানে আসবেন । এই নাচের জন্যেই আজ রাতে একটু ব্যস্ত থাকব । •আমার কাছে দু’চারজন লোক আসবেন এখনি । তাঁদের জন্যেই আমি বৈঠকখানায় বসে আছি, কি-না ।’

এরপরে আর বসে থাকা যায় না । মহিলাটিও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ইতিমধ্যে । সুতরাং, আমিও উঠলাম ।

‘কাল তাহলে নিশ্চয় আগছেন?’

‘নিশ্চয়ই।’

পরদিনের ভোর। ভোর থেকে নানা কাজকর্মের তড়িনায় ব্যস্ত রইলাম। এল বিকেল।

ইশ্রুলের কৃষ্ণচূড়ার আগুন পথের আকাশে আকাশে। মরি মরি কনেও লাল ফুলগুলি নরছে না। জুনমাস। মৌসুমী মেঘ যেদিন আকাশে উড়ে আসে, সেদিন ছায়ামুখ হয় রাজধানী। গজমোতির বিচ্ছিন্ন নানা থেকে বৃষ্টির মোতিগুলি ঝরে পড়ে। যেদিন আকাশে মেঘ থাকেনা, সেদিন উজ্জ্বল থাকে রাজধানীর চোখ।

হাতধড়িতে বিকেল প্রায় পাঁচটা বাজে বাজে। তাড়াতাড়ি রওনা হলাম উরিপোকের দিকে। খালের মত সেই নদীটার পোল পার হলাম।

দেবী প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। আজ তিনি বাঙালিনীর মত শাড়ি পরেছেন। সমস্ত অবয়বে একটা ছিমছাম ভাব। প্রসাধনের ক্ষেত্রে রঙটা আরো খুলেছে। স্বর্ণটাপার মত না হোক, রঙটা উজ্জ্বলই। পাশে একটি বছর পাঁচেকের মেয়ে। তাকেও সাজানো হয়েছে সমস্তে।

‘আসুন’, স্থিত মুখে তিনি বললেন।

সেই পাঁচ বছরের মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, ‘এই আমার একমাত্র মেয়ে।’

‘আপনার স্বামী কোথায়?’

প্রশ্নটা সঙ্গেসঙ্গেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। এই প্রশ্নটা যে গতকাল কেন করিনি, সেটাও ভাবতে লাগলাম। হয়ত তাঁর সঙ্গে পাঁচ বছরের কোনো বালিকা কাল ছিলনা বলেই এ ধরনের প্রশ্নের কথা মনে জাগেনি। আশ্চর্য আমার ভুলো মন।

‘চলুন, হেঁটেই চলুন, আর দেরি নয়।’

‘কোথায় যেতে হবে?’

‘চলুন না আমার সঙ্গে।’ তিনি বললেন।

যেদিকে এসেছিলাম, সেদিকেই ফিরে চললাম। পিচঢালা রাস্তা, দুধারে গাছপালা, বাহুবের ঘরবাড়ি। বাটির ঘর, কাঠের ঘর। রাস্তা থেকেই দেখা যায়, ঐ সব অধিকাংশ ঘরবাড়ির ভেতরেই একটি উঠোন রয়েছে। নিকনো আঙিনার কাছে ফুলের গাছ। ভেতরে বুধি তুলসী-মঞ্চ। বৈষ্ণবের দেশ মণিপুর। রঙীন লুঙির মত পুরু বসনে আবক্ষ জড়িয়ে মেয়েরা কাজকর্ম করছেন। প্রবীন পুরুষেরা হাঁটু পর্যন্ত কাপড়ই পরেছেন নালকোঁচা মেয়ে। অনেক পুরুষের কপালেই চন্দনের কোঁটা। গোড়ীয় বৈষ্ণবেরা যেমন করে তিলক কাটেন।

‘কোথায় যাচ্ছি?’ ‘আবার ছিগগেস করলাম।’

‘নাচ দেখবেন না?’

‘দেখব বলেই তো এসেছি।’

‘ভবে কথা না-বলেই চলুন।’ বৃহৎ হস্ত করলেন তিনি।

উন্মনাভাবে চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর নেয়েকে উদ্দেশ্য করেই মণিপুরী ভাষায় কী যেন বললেন। মেয়েটি ঘাড় নাড়ল।

‘কি ব্যাপার?’ জিজ্ঞেস করলাম।

‘আমার এক দূর সম্পর্কের ভাই আছে এখানে। আর্টিস্ট। তাকেও নিয়ে যেতে হবে নাচের জায়গায়। আমার ছোট ভাই। চলুন না, তার স্টুডিওতে যাই। দেখি, কি করছে সে এখন?’

দেবীর সঙ্গেই একটি স্টুডিওতে ঢুকলাম। স্টুডিও নয়, কালিঝুলি-নাখানো একটি ঘর। বাইরে সাইন-বোর্ড রয়েছে। বাংলা অক্ষরে লেখা মণিপুরী ভাষায় কয়েকটি কথা লেখা আছে ঐ সাইনবোর্ডে। সম্ভবত লেখাগুলি চিত্রশিল্প সম্পর্কেই বিজ্ঞাপন।

আর ভেতরে? মাটির দেয়ালে টাঙানো অল্পস্বল্প চিত্র। রাসলীলা, রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ থেকে শুরু করে নানা বিষয়ের ছবি। সব থেকে যে-ছবিটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, সেটি হচ্ছে, মণিপুরী একটি গৌরাদ্রী তরুণীর তাঁত-বোনার সময়ে তন্ময়তা। সমস্তই জলরঙের ছবি। একটি মাটির কুটিরের আড়িনায় এক কালো রঙের মণিপুরী প্রতীক্ষমানা যুবতী। তার চোখে মুখে যে ভাবটা ফুটে উঠেছে, তাহল, ‘প্রিয়তম বুঝি এলনা।’

খোদ চিত্রশিল্পীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, একটি তরুণের স্বপ্নময় একজোড়া চোখ। পৃথিবীর সকল দেশের শিল্পীর চোখে যে-স্বপ্নময়তা থাকে। সম্ভবত আমার কৌতূহলী দৃষ্টির অনুসরণ উনিও করছিলেন। নিজেই আঁকা ছবি কি-না। আমার কাছ থেকে প্রশংসাসূচক কোনো বাক্য তিনি আশা করছিলেন নিশ্চয়ই।

দেবী বললেন, ‘ইনি হিন্দী বোঝেন। ইংরিজী বা বাংলা জানেন না। কোনো আর্ট-স্কুলে আদৌ পড়েননি।’

‘চমৎকার ছবি’, আমি বললাম।

দেবী কিন্তু শিক্খিতা। ইংরিজী যেমন কিছুটা বলতে পারেন, তেমনি বাংলাও কিছুটা বলতে পারেন। একসময় কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে নাকি পড়েছিলেন। কুড়ীরগ্রাম বিমান-বন্দরে বসেই আমাকে তাঁর ভাষাশিক্ষার পরিচয় দিয়েছিলেন।

আমার প্রশংসাসূচক মন্তব্য আন্দাজে আন্দাজে শিল্পী বুঝলেন। আর বেজায় খুশি হয়ে গেলেন। তাঁর চোখেমুখে কেউ বুঝি নিমেষের জন্যে খানিকটা আলো চলে দিল।

দেবী বললেন, ‘চলুন, আমার ভাইটি যাবেনা। সমস্ত সময় কেবল সে ছবিই আঁকতে চায়।’

আবার বাইরে বেরিয়ে এলাম। সূর্যের শেষ আলোয় রাস্তাঘাট একটা ক্রোমল রঙ ধরেছে। প্রকৃতির এ রঙ একমাত্র ওস্তাদ মানুষ-শিল্পী ছাড়া কেউ দিতে পারবে না।

ইতিমধ্যেই সেই পাঁচ বছরের বালিকা আমার সঙ্গে একটু একটু মিশতে শুরু করেছে। আমি তার ভাষা বুঝিনা। কিন্তু চোখের যে দরদময় একটা সার্বজনীন ভাষা আছে, সেটা আমি যেমন বুঝি, তেয়ি সেও বোঝে। আমার হাত ধরেছে বালিকাটি।

‘ঠিক ছ’টায় নাচ শুরু হবে’। দেবী বললেন।

‘কাদের নাচ ? আপনি কি নাচবেন না ?’

তিনি হাসলেন । মাথা নাড়লেন হুঁবার । ঠিক বোঝা গেল না, কি বলতে চাইছেন ।

ব্যারাক প্যাটার্ণের একখানি লম্বা ঘর । ওপরটা টিনের । বাইরে ভলার্টিনারের দল । দেবীকে দেখে সামান্য একটা ওড়ন উঠল । আমার দিকে বড় একটা কেউ ভাকালো, ঠিক বুঝতে পারলাম না ।

খুব শীগগিরই অনুভব করতে পারলাম যে, আজকের জমায়েতে দেবীর একটি সম্মানজনক স্থান আছে । আর আমি সেই সম্মানের লেজুডমাত্র । সেই সূত্রেই অল্প অল্প অভ্যর্থনা পাচ্ছিলাম ।

হল-ভাতি মালুম । আমি বসেছি সামনের দিকে একটি চেয়ারে । দেবীর অন্য পাশে । কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হল অনুষ্ঠান । শেষ মুহুর্তে দেবীকে ভিগেগেস করল’ম আরেকবার, ‘আপনি নাচবেন না ?’

‘আজকাল বড় একটা নাচি না । নাচটা আমাদের কুমাবী মেয়েদের ব্যাপার ।’



ঘর অন্ধকার, কেবল মঞ্চটা আলোকিত ।

প্রথমেই শুরু হল, পুরুষের মৃদঙ্গ লহরী । ফুলের মালা গলায়, পায়ে ঘুড়ুর, কপালে তিলক, হাতে সোনার বাজুবন্ধ । নাচের তালে তালে মৃদঙ্গের গুরুগুরু যাওয়ায় ।

আমার প্রায় কানের কাছে মুখ এনে দেবী বললেন, 'এই বাজনা বাজিয়ে প্রাচীন কালে মণিপুরীরা অনারটির সময় মেঘের আবাহন করতেন।'

'ভারী সুন্দর।' উত্তর দিলাম ফিস ফিস করে।

দেবী ফিস ফিস করেই বললেন, 'ভারতের প্রধান নাচ চার প্রকার। মণিপুরী, ভরতনাট্যম, কথাকলি আর কবক।'

অন্ধকার ঘরে কেবল মঞ্চটাই আলোকিত। হলঘরের একেবারে পেছনে যারা বসে আছে, তারা বিড়ি বা সিগারেট টানছে। মঞ্চের কাছাকাছি যারা বসে আছেন, তারা এ ব্যাপারে খুবই গভ্য বলতে হয়। তারা নিবিষ্ট মনে কেবল অমুঠানটিকেই দেখছেন।

নতুন অমুঠান শুরু হল। একটার পর একটা। এক দফা নাগানাচও হয়ে গেল। একটি নাগাতরুণী অপূর্ব নাচই নাচল। দেহের কী অপকল্প লালিত্য। নাগাদের মধ্যেও যে দীর্ঘাঙ্গী নারী আছে, তা ত' আগে জানতাম না।

রাসনৃত্য শুরু হল। রাসনৃত্যের পর খাম্বা-খইবীর প্রণয়লীলা নিয়ে নাচ। ব্যাপারটা লয়লা-মজনুনের মত। কিংবা আমাদের বাংলাদেশের বিষ্ণু ও সূন্দরের ব্যাপার। দেবতার বিষয় নিচে নাচের পর এটা নাকি খাঁটি লৌকিক নাচ। আর আমি বোধ হয়, সব চাইতে এবারই বেশি মুগ্ধ হলাম। স্মিতহাসি মানুষকে মুগ্ধ করে। কিন্তু লাস্ত্র? কী সাম্প্রতিক সুন্দর। মেয়েটির লাস্ত্র ভোলবার নয়। খাম্বা-খইবীর প্রণয়-লীলাটা যে শেষ পর্যন্ত করুণ। বিয়োগান্ত প্রেমই বুঝি সুন্দর।

সহসা দেবীর দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি কাঁদছেন। তাঁর চোখ দিয়ে জল আসছে। অথচ, জল আসছে কেন? দেবীর মুখটি আবছা, আবছা। কিন্তু চোখের জল যে গোলাকৃতি ফটিক-বিন্দুর মত। তাতে দূরের আলোক প্রতিফলিত হয়।

'আপনি কাঁদছেন?' যত্নস্বরে প্রশ্ন করলাম।

হঠাৎ লজ্জিত হয়ে পড়লেন তিনি। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন।

'এইসব শিল্পীরা শীগগিরই সাম্প্রতিক মিশনে চীনে যাবেন। সেজন্তেই এই প্রস্তুতি চলছে। যাকে আপনারা বলেন রিহার্সাল।' তিনি বললেন।

'কিন্তু আপনি কাঁদছিলেন কেন?'

'কি হবে কারণটা শুনে?'

'শোনাতে আপত্তি আছে?'

দেবী চুপ করে গেলেন। ইতিমধ্যেই হোলি-নাচ শুরু হয়েছে। নাচটা বসন্তের। কক রঙ ছুঁচ্ছেন রাধার শরীরে।

'বসন্তোৎসব আমাদের দেশের সেরা উৎসব। সাতদিন চলে এই উৎসব।' তিনি চাপা আওয়াজে বললেন।

'আমার এ-নাচটা ভালো লাগছেনা।'

'কেন, কেন?'

স্বাব আমি দিলাম না। চুপ করে নাচ দেখতে লাগলাম। কিন্তু তিনি আমার কাছ থেকে একটা স্বাব চান।

ফিস ফিস করে শুধালেন, 'কেন ভালো লাগে না ?'

'জবাব তাহলে শুনতেই চান ?'

'হাঁ ।'

'তবে শুনুন । আমি বাঙালি । আমার মজ্জায় মজ্জায় কেবলি কান্না । সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক সমস্ত বন্ধনায় আমি তিলে তিলে গড়া । আনন্দের উৎসব আমার ভালো লাগেনা ।'

'কিন্তু প্রত্যেক দেশেই যে বসন্তের উৎসব রয়েছে । যেদিন তরুণ-তরুণীরা পরস্পরের গায়ে, হয় ফুল ছোঁড়ে, নয়, রঙ ছোঁড়ে । যেমন রয়েছে মণিপুরে ।'

'ঐ যে বললান, আমার ভালো লাগে না ।'

'আপনি বেরসিক ।'

সহসা আচ্ছন্নের মত হয়ে গেলান । ঈষৎ অন্ধকারে-বসা পার্শ্ব-বতিনীর বিকল্প আমার মগজে একটা তরঙ্গের সৃষ্টি করল । সত্যিই কি তবে আমি বেরসিক ? আমার কোনো সৌন্দর্যভূতি নেই ? রাজনীতি ছাড়া কি আর কিছুই বুঝিনা ?

কতোকণ যে আচ্ছন্নের মত বসেছিলাম, মনে নেই । হঠাৎ বৃষ্টি ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পারলাম, দেবী আমাকে ঠেলছেন আর বলছেন, 'উঠুন, উঠুন, নাচ শেষ হয়েছে ।'

স্বপ্নোন্মিতের মত উঠে বাইরে বেরিয়ে এলান । ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়ালাম রাস্তায় । দেবী কোথায় যে ছিটকে পড়েছেন । তাঁকে খুঁজে পাচ্ছিলান না ।

প্রেক্ষাগৃহের বাইরে আলো আর অন্ধকারের খেলা । কাছকাছি এসে না-দাঁড়ালে যুব আর ঠাইর করা যায় না । এই আলো-অন্ধকারের মধ্যে কে যেন এসে আমার হাত ধরল ।

'মেয়েটাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম । না হলে ঘুমিয়ে পড়ত । চলুন, আমার এক দিদির বাড়ি আপনাকে নিয়ে যাই । হাতে আর অন্য কাজ আছে ?'

'না । চলুন ।'

পাশাপাশি পথ চলতে চলতে তিনি জিগগেস করলেন 'কেমন লাগল আমাদের নাচ ?'

'ভালো । কিন্তু আপনার নাচ তো দেখলাম না ।'

'আজকাল আর নাচি কোথায় ? এখন নাচের পরামর্শ দিই,'

'তবে এই সব সংগঠনের ব্যাপারেই কি কলকাতা গিয়েছিলেন ?'

তিনি কোনো জবাব দিলেন না । তাঁর সম্পর্কে একটা মিনিম স্পট লক্ষ্য করতে পারছি যে, মহিলাটি মাঝে মাঝে নীরব হয়ে যান । ঠিক ঐ সময় একটা রহস্যের পর্দা সহসা তাঁকে ঘিরে ফেলে । রহস্যাবৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জোরে জোরে পা ফেলেন । এবং অনেকখানি রাস্তাই উন্নয়ন অবস্থায় হেঁটে আসেন ।

'আমাদের দেশের থিয়েটার তো দেখেননি । সেও ভারী মজার । কিছুদিন আগে জাপানীদের ইন্ফল-চড়াও নিয়ে একখানি নাটক রচনা করা হয়েছিল । জাপানীরা তো ইন্ফলে কম বোঝা ফেলেনি । ঐ নাটকটা যদি দেখতেন ।'

কথা শেষ হতে-না-হতে রাস্তার বাদিকে ছোট একটি রাস্তায় চলতে শুরু করে আনাকে বললেন, 'এবার সাবধানে হাঁটুন। রাস্তাটা কিন্তু চওড়া নয়।'

'পড়ে যদি যাই, তবে বিদেশীর হাত না-হয় ধরবেন।'

'কি বললেন?'

একটা সঙ্কীর্ণ রাস্তা। রাস্তার ওপর আলোর কোনো গাছই, অর্থাৎ ল্যাম্প-পোস্ট নেই। দূর থেকে আলো আসছে একবারে সামান্য। আন্দাজে আন্দাজে হাঁটছি। পা ফেলছি প্রায় গুনে গুনে।

'আমার ভয়ে আপনার আতিথেয়তাকে কী ভাষায় যে ধন্যবাদ দেব।' আবেগের স্বরেই বললান।

'ও কিছু নয়, ও কিছু নয়।'

ঠিক সেই মুহূর্তে আমি লাফিয়ে উঠলাম। পায়ের ওপর দিয়ে সরসর করে দ্রুত একটা কিছু গড়িয়ে চলে গেল। পায়ে পাতলা মোজা থাকার সঙ্গেও ভীষণ ঠাণ্ডা ছিনিসটার সংস্পর্শ বুঝতে পারলাম।

'কি হল?'

'সাপ।'

'সাপ?'

'পেছিয়ে আসুন, পেছিয়ে আসুন। সমুখের দিকেই গেছে।'

তিনি মুহূর্তে পিছিয়ে এলেন। আতঙ্কে কি-না জানিনে, পেছিয়ে এসে আমার হাত ধরলেন। আকাশের তারার যদি সামান্য আলো থাকে, সেই আলোয় বোঝা গেল, আমার দিকে চেয়ে আছেন অবাক হয়ে। একটি বা দুটি নিমেষ। শেষে বললেন, 'কাজ নেই দিদির বাড়িতে গিয়ে। বড় রাস্তায় ফিরে চলুন। আজকের রাতটা অবিশ্বাস্য।'

'অবিশ্বাস্য?'

'চলুন, তাড়াতাড়ি চলুন।'

দ্রুত পা চালিয়ে আনাকে অনেক পেছনে ফেলে তিনি বড় রাস্তায় গিয়ে পৌঁছলেন। আমিও তাড়াতাড়ি এসে তাঁর সঙ্গ নিলাম। আবার পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম।

বললেন 'আমার বাড়িতেই চলুন। মেয়েটা এতক্ষণে বোধ করি ঘুমিয়ে আছে।'

'তাই চলুন। কিন্তু কী যে বলছিলেন, অবিশ্বাস্য?'

'ওটা আমার বনিপুরী সংস্কার। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'তবু বলুন।'

'আমার বৃত্ত স্বামীর কথা বনে পড়েছে।'

'সাপের সঙ্গে কি সম্পর্ক?'

'কি জানি।'

আবার সেই রহস্যের পর্দা তাঁকে বুঝি ঘিরে ফেলেছে। উন্মনা হয়ে চলছেন। আমার সঙ্গে কোনো কথাও বলছেন না। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা।

কিন্তু তিনিই কথা শুরু করলেন, 'নাচের সময় আমি কাঁদছিলাম কেন, জানেন। কাঁদছিলাম, আমার মৃত স্বামীর কথা মনে করে। মাত্র পাঁচ বছর আগে মারা গিয়েছেন। আমি তখন অসুস্থ। আহা, নাচ তিনি কী অসম্ভবই না ভালোবাসতেন।'

আমার পার্শ্ববর্তিনী যে গভীরভাবেই শোকার্ত, তাতে এই মুহূর্তে আর কোনো সন্দেহ নেই আমার। তাঁর উপগত অশ্রু আবার চকচক করে উঠল। অশ্রুর ঝিকিঝিকিটা দেখলাম চলতে চলতে এক দোকানের পেট্রোলমাস্কের এক ঝলক আলোয়।

পাশাপাশি একজন সঙ্গিনী থাকলেও অনবরত নিঃশব্দে যে অনেকখানি পথ চলা যায়, আমি সেদিন আনাকে নিয়েই তা প্রমাণ করেছিলাম।

উরিপোকে তাঁর নিজের বাড়ির কাছাকাছি এসে স্বতঃপ্রসূত হয়ে মুখ ঝুললেন নিজেই।

'মৃত স্বামীর কথা অনেকক্ষণ ধরেই ভাবলাম। অথচ, তিনি একান্তই মৃত। আমার জীবন যে একা একা কী করে চলবে, তাও আজকাল ভাবি। একটা নতুন পথ বেছে নেয়া প্রয়োজন। কি বলেন?'

'আপনার ইচ্ছিত বুঝতে পারছি না।'

'ধাকগে। নাই বা বুঝলেন।'

'না বুঝালে কি করে বুঝব?'

'আমি প্রমীলা রাজ্যের নারী, এটা তো বোঝেন। বাংলাদেশ থেকে এর আচার-আচরণ, চাল-চলন পৃথক। স্ত্রী-স্বাধীনতা আমাদের অনেকখানি।'

আমি আর কোনো ফোড়ন দিলাম না। তাছাড়া, তাঁর বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেছলাম আমরা। চাকর এসে দরজা খুলে দিল। ভেতরে চলে গিয়ে প্রায় সন্দেশেই তাঁর পাঁচ বছরের মেয়েটিকে নিয়ে ফিরে এলেন তিনি।

'দেখুন দিকি, এখনো সুমোয়নি। আমার জন্তে দুর্ভাবনায় ওর যেন খুব আসছেনা।' সশব্দে হাসলেন গৃহস্থামিনী।

দুর্ভাবনার তো কোনো কারণ ছিল না।'

'সেটাও যে এর কাছে অবিশ্বাস্য।'

পাঁচ বছরের মেয়েটি কিন্তু তার মুক-পাওয়া ছোট ছোট দুটি চোখ নিয়ে আমার কাছে সেই মুহূর্তে এগিয়ে এল। নিঃশব্দে আত্ম-সমর্পনের মত আমার দুটি বাহুতে ধরা দিল সে। একেবারেই নিঃসঙ্কোচ, নিরাসক্ত।

'কি খুকি, আমার কোলেই সুমোবে নাকি?' বালিকাকে শুধালেন।

বালিকা আমার কথা বুঝল না। আমিও যে তার ভাষা জানিনা। একেবারেই নিরুপায় ছুঁয়ে।

'নিতান্ত অপরিচিত' হলে কি হয়। আমার কথা যে আপনাকে ভালো বেসে ফেলেছে।' হাসতে-হাসতে বললেন তিনি।

বালিকাটির পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বললাম 'আমি এখন উঠি। অনেক রাত হয়েছে। যাই খুকী।'

অথচ, ওঠবার চেষ্টা করতেই পাঁচ বছরের মেয়েটি আমার গলা জড়িয়ে ধরল। বুঝি আমাকে যেতে দেবেনা সে। আমাকে তার পরমাত্মীয় বলেই মনে করেছে। কেননা, শিশু যে সব দেশেই শিশু। তার মনের আকাশে চিরকালই আলোকোজ্জ্বল রয়েছে।

‘কাল কি আসবেন? ইম্ফল ছাড়ছেনই বা কবে?’

‘কাল আসতে পারব না। হাসপাতালে আমার অনেক কাজ। পরশুর বিমানে কলকাতা ফিরে যাব।’

দরজা ছাড়িয়ে একটু ঘেসো জমি। সেখান থেকে ছোট রাস্তা বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়েছে। ততোটুকুই তিনি এলেন টর্চ হাতে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে। সঙ্গে এল তার কন্যা।

‘টর্চটা ছিল কোথায়?’ জিগগেস করলাম।

‘বাড়িতে ফেলে গিয়েছিলান ভুলে।’ সশব্দে হেসে উঠলেন।

ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝে এতজোরেও হাসতে পারেন। কিন্তু পরের দিনের পরের দিনই দেখলাম, তাঁর চোখে বিষাদের ছায়া। যেদিন ইম্ফল ছাড়ব। বালিকা কন্যার হাত ধরে রিকশা থেকে নামলেন। আমাকে বিদায় দিতে এসেছেন শহরের বিমান-অফিসে। এসেছেন স্বেচ্ছায়। কই, আমি তো আসতে অনুরোধ করিনি।

বেশি কোনো কথা তিনি বলেননি। আর বলবারও সময় ছিল না। বিমান-বন্দর পর্যন্ত যে-বাসখানি যাবে, সেটা তখন ছাড়ে ছাড়ে।

কেবল পাঁচ বছরের বালিকাটি আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শেষ বারের মতো। আর তাঁরও চোখ হয়েছিল ছলোছলো।

॥ চন্দ্র

তাদের ঘর : প্রযোজক : জি, সি, বর্মণ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : মঙ্গল চক্রবর্তী, সংগীতপরিচালনা : হেমন্তকুমার, আলোকচিত্র : সুহৃদ ঘোষ, শব্দগ্রহণ : শিশির চ্যাটার্জী, সম্পাদনা : বিশ্বনাথ নায়ক, শিল্প-নির্দেশক : বটু সেন, রূপায়ণ : সবিতা, দেবযানী, সাবিত্রী, চন্দ্রাবতী, অপর্ণা, উত্তম, জহর, রবীন, নিহির ভট্টাঃ, প্রীতি মজুমদার এবং আরো অনেকে ।

নবাগত পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তীর পরিচালনায় স্ত্রাণানাল ফিল্মসের প্রথম চিত্রাৰ্ঘ্য এটি । কাহিনীকার রাসবিহারী লাল ।

কাহিনীর প্রথমেই দর্শককে ধাক্কা খেতে হয় যখন দেখা যায় দারিদ্র্যের জ্বালায় একজন শিক্ষিত যুবক মোটর চাপা পড়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে । আত্মহত্যাটা অবশ্য প্রথমে বোঝা যায় না, পরে জানা যায় । দর্শকের মনে তখন প্রশ্ন জাগে, আত্মহত্যার আর কি কোনো পথ খুঁজে পেল না যুবকটি ? কলকাতার রাস্তায় মোটর চাপা পড়াটাই কি আত্মহত্যার সহজ পথ ? এ প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, তা না-হলে যে গল্প হয় না । ধনী-দরিদ্রের যোগাযোগ ঘটানো হবে কি করে । যোগাযোগও আবার এমন—সেই আত্মহত্যাকারী এবং মোটর গাড়ীর মালিকের চেহারা ছবছ একরকম হয়, ঠিক জমজ ভাইয়ের মতন । তাতে বিস্মিত হয় গাড়ীর মালিক এবং নিজের গাড়ীতে করে তাকে বাড়িতে নিয়ে যায় (যুবকটির তেমন কোনো আঘাত লাগে নি কিন্তু) এ্যাকসিডেন্ট বাঁচানোর পর । গাড়ীর মালিক বিরাট ধনী কোটি কোটি টাকার মালিক—অজয় মিত্র । বলে : প্রাচুর্যের অভিশাপে সে বিপর্যস্ত । মানে বেশি আরাম বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বেশি সুখই তার জীবনে দুঃখের কারণ ! অর্থাৎ অতিমাত্রায় একটি সিনিক চরিত্র । না হলে কি বলতে পারে যুবকটির (বিনয় দত্ত) সংগে জীবন বিনিময় করবে । শুধু বলাই নয়, করেও তা । বিনয় দাড়ি কামিয়ে অজয়ের দানী স্মার্ট পরে অজয় মিত্র হয়, অজয় বিনয়ের ছেঁড়া শার্ট আর ময়লা ধুতি পরে বিনয় দত্তের জীবনটা অর্থাৎ দারিদ্র্যের মাঝেই শান্তি খুঁজতে যায় । তারপর একদিকে ধনীর বিলাস ও অল্পদিকে দরিদ্রের (মধ্যবিত্তের দারিদ্র্য) বেদনাময় জীবনের ছবি দেখানো চলতে থাকে । অজয় মিত্র চালেও নিয়েছিল দরিদ্র জীবন যাপন করবার কিন্তু দারিদ্র্যের কাছে হার মেনে একদিন ঠগ সাজতে হয় তাকে । এ থেকে সে এই শিক্ষাই পায় যে ধনী আর দরিদ্রের বিরাট ব্যবধান যতদিন না যুচবে ততদিন সমাজে মানুষের মঙ্গল নেই, সুখ নেই । প্রায় ষোল হাজার ফিট ফিল্ম ব্যয় করেও পরিচালক এ-ছবির মারফৎ কোনো উত্তাপ বা আবেগ কিছুই সৃষ্টি করতে পারেননি দর্শকমনে । লঘু পরিহাসের মধ্য দিয়ে ছবি এগিয়ে গেছে । তবে বৈশিষ্ট্য এই যে কোনো দৃষ্ট কখনো ছায়াবলানির পর্যায়ে পড়েনি, সর্বত্র একটা মাজিত এবং পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় পরিচালকের । কিন্তু ধনী ও দরিদ্রের রূপটা পাশাপাশি

চিত্রায়িত করে কোতুককর নাট্যপরিস্থিতির মাধ্যমে সাম্যবাদের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে ছবিটি হাস্যকর প্রতিপন্ন হয়েছে। উদ্দেশ্যটা যদি নির্ভেজাল হোত, তাহলে কাজটা হোত কঠিন। কঠিন এ-জন্মেই যে সে-ক্ষেত্রে কাহিনী মারফৎ আসল বক্তব্যের অল্পকূলে একটি অটুট আবেদন সৃষ্টি করতে হোত; এবং তা করতে হলে সমাজের গভীরে চুকে বসিত এবং লাক্ষিত মানবাত্মার প্রকৃত রূপটির রহস্য সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরতে হোত রসঘন উপাখ্যানের মাধ্যমে, কাহিনীকে চিত্রায়িত করতে হোত সম্ভাব্য বাস্তবতার পটে। সেজন্যে চাই আবেগসঞ্চারি কাহিনীর নিটোল চিত্রনাট্য এবং পরিচালনায় রীতিমত মুগ্ধীয়া। পরিচালক স্বয়ং এ ছবির চিত্রনাট্যকার। আলোচ্য ছবির চিত্রনাট্য বা পরিচালনায় ছককাটা সস্তা সেক্টিমেন্টের পরিচয় মেলে, কিন্তু শিল্পীমনের গভীরতার আভাস মেলে না।

ছবির মূল আকর্ষণ দর্শক যা অনুভব করে তা হচ্ছে উত্তমকুমারের দু'টি ভূমিকায় একই সংগে বিপরীতমুখী অভিনয়। সাধারণ দর্শকের কাছে ক্যামেরা ট্রিক্সও বেশ কোতুক এবং বিস্ময়ের উদ্ভেক করে এবং এই কোতুকপ্রিয়তার মোহে শেষ পর্যন্ত দর্শক অপেক্ষাও করে সর্ধর্ষে। যদিও মাঝে মাঝে দর্শক গ্যালারী থেকে শোনা যায় : 'গাঁজা, গাঁজা।'—'এ কি সম্ভব?', 'বোগাস'—ইত্যাদি।

চরিত্রগতভাবে আলোচনা করতে গেলে একথাই বলতে হয় যে অজয় মিত্র এবং বিনয় দত্তের দ্বিমুখী চরিত্র দু'টির রূপায়ণ আবেষ্টনীগত মনোভাব ফুটনের দিক থেকে সম্ভাব্য বাস্তবতা পেয়েছে। এই চরিত্র দু'টির উপর পরিচালক এত বেশি সজাগ থেকেছেন যা অন্য কোন চরিত্রে থাকেননি। কাজেই চরিত্র দু'টির আচার-আচরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উৎরেছে। কিন্তু দৃশ্য হিসাবে বহু জায়গায় পরিচালকের সূক্ষ্মতার অভাব লক্ষ্য করা গেছে। দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি কয়েকটা :

- (১) প্রায় নামের সামনে বিনয়রূপী উদ্ভমের সূষমার বিহুনী ধরে টানা স্থূল চপলতার পরিচায়ক
- (২) প্রকাশের গান রেকর্ড করার দৃশ্য বিলম্বিত হওয়ায় বিরক্তির উদ্ভেক করে, এ ধরনের দৃশ্য গান সবটা না শোনানোই বাঞ্ছনীয়। কারণ গান শোনানোটা তো এখানে উদ্দেশ্য নয়
- (৩) প্রকাশ ও বীণার প্রেমের দৃশ্যও উত্তমকে হারগোড়ায় অতক্ষণ দাঁড় করিয়ে অতখানি গান শোনানোও অপ্রয়োজনীয়
- (৪) রোগশয্যায় প্রকাশের গান গেয়ে মনবেদনা প্রকাশ করা এবং সে সময় বীণার হাবভাব দর্শকের বিস্ময় সহানুভূতি আকর্ষণ করে না, অজয়রূপী উদ্ভমের সামনে পিসীমার চমকে ওঠা দেখানোটা আরো আবেগবহ হোত, যদি ওখানে গানটা সংক্ষিপ্ত হোত। এ-ছবির গানগুলি দৃশ্যের সুর অনুযায়ী কোথাও আবেগ সঞ্চারে সক্ষম হয়নি।
- (৫) প্রকাশ এবং বীণার প্রেমের দৃশ্যগুলি সর্বদাই কৃত্রিম এবং স্থূল মনে হয়েছে, ফলে চরিত্র দু'টির রূপায়ণ ব্যর্থতার পর্ববসিত।
- (৬) পিসীমার চরিত্রটিও অসুত। অজয় চলে যাবার পর একদিনের তরেও তার কথা আর পিসীমার মনে পড়ে না, বা মনে পড়লে চঞ্চল বা অধীর হয়ে অজয়ের খোঁজ করবার বা দেখবার অস্বাভাবিক ইচ্ছা জাগে না।
- (৭) অজয় মিত্রের ব্যক্তিগত ডাক্তারের চেহারা অত্যন্ত বেমানান হওয়ায় ডাক্তারের সংগে অজয়ের দৃশ্যগুলি বেশ খারাপ লাগে।

অভিনয়ে উত্তম যথাসম্ভব স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করেছেন। কোথাও কোথাও তার অভিনয় বেশ আবেগপূর্ণ। সুসমা চরিত্রে সবিতা আগাগোড়া যে সাবলীনতা বজায় রেখেছেন সেজন্য অবশ্যই প্রশংসা পাবেন। সাবিত্রী উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবে অত্যন্ত ম্লান। রবীন মজুমদারকে সহ্য করাই কঠিন! রেবা চরিত্রে দেবযানীর স্মার্টনেসের অভাব অত্যন্ত বেশি। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে জহর, নিহির, ঐতি, চন্দ্রাবতী ও অপর্ণার নাম উল্লেখ করা যায়।

ফটোগ্রাফী নোটামুটি পরিচ্ছন্ন; নয়নযুগ্মকর নয়—কোথাও কোথাও বড্ডো কটকটে, ফ্যাট। ছবি শুরু হবার আগে টাইটলে সেটিং-এর কাজ দর্শকের চোখ বড় বেশি ধাঁধিয়ে দেয়। সুহৃদ ঘোষের ফটোগ্রাফী আরো ভাল হবে আশা করেছিলাম।

শিশির চ্যাটার্জির শব্দগ্রহণ প্রশংসনীয়। শিল্প-নির্দেশনায় বটু সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

রাস্তার ছেলে : প্রযোজনা : রতন পিকচার্স, পরিচালনা : চিত্ত বসু, কাহিনী : বিশ্বন ভট্টাচার্য, সংগীত পরিচালনা : নটিকেতা ঘোষ, আলোকচিত্রগ্রহণ : রামানন্দ সেনগুপ্ত, শব্দগ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ, সম্পাদনা : বৈষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকায় : বাবুয়া, তপনকুমার, তরুণকুমার, সুধেন, শম্ভু, ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তী, শোভা সেন, সাধা দত্ত এবং আরো অনেকে।

শিল্পকর্মের মাধ্যমে বাস্তববাদী বিষয়বস্তুকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করা আধুনিক মনের পরিচয়, যদি তা হয় যুগধর্মী। কিন্তু বাস্তবকে যদি সঠিকভাবে জানা এবং জানানো না-যায় তাহলে শিল্পকর্ম ব্যর্থ হতে বাধ্য, আধুনিক হবার আশাও হারাণা। পরিচালক বিফল এখানে হু'দিক থেকেই।

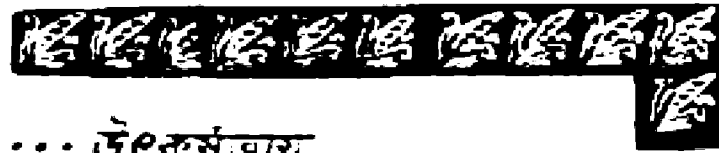
পরিচালক বাস্তববাদী বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল এবং মূল পরিচালনায় আলোচ্য চিত্রখানি বাস্তব বোঝা হয়েছেও অবাস্তবতায় পর্যবসিত হয়েছে। ফলে, দর্শক যে আশা নিয়ে এ-ছবি দেখতে যায় সে আশা নিভে গিয়ে তার বদলে একটা প্রচণ্ড বিভ্রান্ত মন নিয়ে তাকে ফিরতে হয় ছবি দেখার পর।

গল্পটি এমনই অস্বাভাবিক, চিত্রনাট্যের ঘটনাবিস্তার এমনই অসংবদ্ধ এবং পরিচালনা এত কল্পনাহীন যে গল্পের কোনো একটি অংশও দর্শকের মনে দাগ কাটতে পারে না। তাছাড়া কলাকৌশলের দিকে, একমাত্র রামানন্দ সেনগুপ্তের ক্যামেরার কাজ ছাড়া, সবই অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ। বিশদ বিবরণ দিয়ে আলোচনাটি নিম্নাবাদে ভারাক্রান্ত করতে চাই না, কাজেই সংক্ষেপে আমাদের অভিমত জানানিয়ে শেষ করছি।

অভিনয়ে অনুপকুমার চলনসই। ছবি বিশ্বাস এবং শোভা সেন পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অন্যান্য অনুরোধ। যে সব ছবিতে ছোট ছেলের চরিত্র প্রাধান্য পায়, সাধারণত দেখা যায় ছবি যদি খারাপও হয়, ছোট ছেলের চরিত্রটির অভিনয় হয় প্রশংসনীয়। এ-ছবিতে মামীর ভূমিকায় বাবুয়াকে দিয়ে স্বাভাবিক অভিনয় করিয়ে সে কতিয়টুকুও অর্জন করতে পারেননি পরিচালক।

সম্পাদনা অনুরোধ। সংগীত কোনোটিই সুপ্রযুক্ত নয়।

। চিত্রালাপী ।



... উৎকর্ষতার
অদ্বিতীয়
ভেষজ
কেশ তৈল



কেশি

কমলীয়া কেশবাণির সংরক্ষণ
সমৃদ্ধি ও প্রীতি কন্যা
আধুনিকতম
শাদবপূর কোমল্য
এবং
কামার্সিউটিকল ওয়ার্কস

১২ বি. লেংগী সড়ক রোড,
কলিকাতা-১ ফোন : ২২-৩৩১৩
ওয়ার্কস হাউসিং ভাটী-৫২।

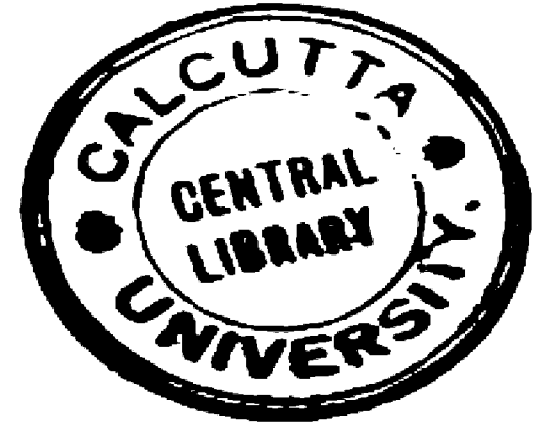
GPC/JCP/7157

মূতীকাপড় কাচায়
আমাদের পিওর ঢাকাই অদ্বিতীয়



॥ বসু সোপ ওয়ার্কস ॥

॥ কারখানা : চারু মার্কেট, নাকতলা, কলিকাতা-৪০ ॥



অগ্রণী

॥ দশম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৬৪ ॥

জ্বলন্তিহি

স্বরগুন ভাড়া

মহিলা-পরিচালিত ক্যানটিন । আমীর-ওমরাহ, উজির-নাজিরদের পৃষ্ঠপোষকতায় চলে । তবে খাণ্ড-ব্যবস্থা আনিবী চালের নয় । বাজারের থেকে একটু কম-পয়সায় এখানে সবাই খেতে পারেন । মূলত এই কলেজের ছাত্র, অধ্যাপক, করণিক আর কলেজের কার্য-বাহক সুল এই সুবিধা-ভোগের অধিকারী । কিন্তু ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ধর্ম থাকেই, কাজেই আশেপাশের ইন্সকুলেও এঁদের খাবার পৌছে দেবার ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত আছে । কলেজের মধ্যকার যে-ঘরখানায় এঁরা কাজকর্ম করে থাকেন তা কলেজ কর্তৃপক্ষ বিনাভাড়াতেই ছেড়ে দিয়েছেন । আধুনিক কলেজের শিক্ষার একটা বড় উদ্দেশ্য—সমাজের সেবাতত্ত্ব গ্রহণ । কলেজ কর্তৃপক্ষ সেদিক দিয়ে পেছিয়ে থাকতে চান না । কিন্তু শ্রেয়-কাজে বহু বিষয়, শ্রেষ্ঠে কাজে তো আরও বহু । বিশেষ করে বর্তমান যুগটাই অভিযোগের যুগ । খাওয়া-পরা নিয়েই মানুষের অভিযোগ যেন আরও বেড়ে চলেছে । এই ক্যানটিনের খাবার নিয়েও অনেক নালিশ জমা হয়েছে । কেউ বলেন ‘সব জিনিস দালদা দিয়ে ভাজে’, কেউ বলেন, ‘পানতুয়ার মধ্যে ময়দা বেশি’ ‘চা-য়ে চা মাত্রই থাকে না ।’ ক্যানটিনের লোকে বলেন, ‘খাঁটি বি পাবই বা কোথায়, দালদা খাঁটি কিনা তাই বলুন ; ছানার অবস্থাও তাই, তবে ময়দার মধ্যে যে তেঁতুল-দীচি মেশানো নেই, একথা ইলপ করে বলা যায় কারণ তাহ’লে ময়দার-কলে পুলিশ চুকত । আর চা-র কথা ? খাঁটি দাজিলিং চায়ের লিকার ভালো হয় না ।’ নিরপেক্ষ লোকে বলেন, ‘অভিযোগ কিছু নয়, আসল কথা আমরা বাঙালীরা খেতে ব’সে একটু বেশি কথা বলি, এই মাত্র ।’

এখানেই চাকরী করে মাজু । সাধারণত সে স্টাফ-রুমে, অফিসে চা-জলখাবার সরবরাহ করে থাকে । প্রথম দিন তাকে যখন পরিচয় করিয়ে দেওয়া হ’ল সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ।

চঁওড়া জলচুরির লালপাড় সামলাতে সামলাতে খসখস করে একটি বিনোদিনী বোঁপা অধ্যাপকদের কামরায় প্রবেশ করলেন ।

দেখুন !

অধ্যাপকেরা ড্রিন-করবার ভঙ্গিতে একসঙ্গে ডান-বাঁ করে মুখটা সোজা করলেন । কেবল ‘দেখুন’ শব্দটিই নয়, সৌরভও ছাড়লেন । হেজেলিন-পমেড-পাউডারের

কোন-একটার উগ্রগন্ধ ঘরটিতে ছড়িয়ে পড়ল, হয়ত তিনটেই একসাথে । ঘরময় যেন চূর্ণকানের ঝিলিক মেরে গেল ।

এই ছেলেটি ক্যানটিন থেকে আপনাদের চা-টা এনে দেবে; দরকার হলে একেই সব বলবেন, এর হাতেই পয়সা দেবেন, কেমন—উ ।

দেবাংশুও এবার তাকাল ; ছাত্রদের রচনা-খাতার লোখন-মস্ত্র ছপছিল, কিন্তু ঐ 'উ'-এর টানে সে আর নিবিকার থাকতে পারল না ।

তা হলে ইনিই সেই স্বনামধন্য ক্যানটিনপরিচালিকা মিসেস্ অনীতা বোস্ । বয়স হয়ত নেই, কিন্তু বেশ মাজা রূপ ; দেমাক থাকা তো স্বাভাবিকই ।

দেখার-ঘোর কাটলে বেশ কিছুক্ষণ পর প্রবীণ অধ্যাপক যোগেনবাবু শুধু বলতে পারলেন, আচ্ছা ।

অনীতা বোস আবার বললেন—ওকে মাজু বলেই ডাকবেন ।

প্রিয়তোষবাবু কোতূহলী হয়ে উঠলেন, আপনারই ছেলে ?

সঙ্গে সঙ্গেই যোগেনবাবু বাধা দিলেন, ধ্যৎ !

অনীতা বোস বেদনাস্রাবী কণ্ঠে ইতস্তত করলেন, ম্যা, আমার কোনো ছেলে নেই ।

মাধববাবু নিশ্চিত রপরাধ ফালন করেন, হ্যাঁ, আমরাও তো তা-ই জানি ।

অনীতা বোস চলে গেলেন বটে, কিন্তু অধ্যাপকদের কামরায় গুপ্তন থেকে গেল ।

অনীতা দেবী সম্বন্ধে সবাই অনেক কিছু জানেন, কিন্তু নোট কত জানা হয় সে বিষয়ে অঙ্কের নিশ্চিত ফলপ্রাপ্তি ঘটল না । তবে অবাধে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল, অনীতা বোস মহিলা । ক্যানটিনের খাবারের ত্রুটির সঙ্গে তাঁর স্বভাবের মিল নেই ।

দেবাংশু শুধু মাজুকে ডাকে—মাজু শোন্ এদিকে ।

মাজু কথা বলে না, কিন্তু শোনে সব ।

ছুখানা সিঙাড়া, আর একটা চা, কেমন—উ ।

দেবাংশু 'উ'-য়ের প্রভাব স্বীকার করেছে ।

মাজুর গতি সর্বত্র । অবশ্য সে নবকুমার নয়, মাইনে পায় । কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারে, সব পয়সাই সমান নয় । কেউ সিকি দিয়েই চলেছেন, কেউ পাঁচ আনা, কেউ চার পয়সা । তার মধ্যেও কত রকমফের । কোনটা ঘসা, কোনটা দস্তার, কোনটা পয়সাই নয় । মাজুর কাছে একটা জিনিস প্রমাণ হ'য়ে গেল, প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট হারে খেয়ে থাকেন । প্রত্যেকেরই ক্ষিদে পাওয়ার আর ক্ষিদে মেটানোর নির্দিষ্ট মাপ আছে । এ বিষয়ে খুব একটা ব্যতিক্রম নেই । ব্যতিক্রম শুধু ঐ দেবাংশুবাবু । তাঁর খাওয়া আর ক্ষিদে হিসাব রাখতে মাজু-হিমসির খেয়ে গেল । আজ ছ'পয়সা তো কাল দশ আনা, কাল দশ আনা তো পরশু আট আনা । দেবাংশুর সঙ্গে ক্যানটিনের খাবারের বেশ একটা মিল আছে । এ কাপ লিপটন তো সে-কাপ পুরনো পাতা ভেজানো, লেডিকিনি বাসি তো গন্ধেশ টাটকা, সিঙাড়ায় খোল নতুন তো তার আনু পচা ।

যতই দিন যাচ্ছে ততই সে ভাবছে, এ-বিষয়ে দেবাংশুবাবুকে একটা নিয়মের

ভেতর আনা দরকার। কারণ অনেক সময় ডাক বুঝেই কি আনতে হবে সে স্থির করে। নতুবা, একবার নাঠ পেরিয়ে ও-দালানে যাবে আবার ফরমাস নিয়ে এ-দালানে আসতে হবে; ফলে, অনেক সময় ঠাণ্ডা চাই নিয়ে যেতে হয়। অবশ্য নাঠটা পেরোতে তার আরামই লাগে, বেশ নরম তুলতুলে ঘাস। কিন্তু কলেজের দারোয়ান বড় খিটখিট করে। ঘাস নষ্ট হয়ে যাবে। আরে বাবা, চলবার সুবিধের জন্মেই পায়ের তলার ঘাস। নতুবা ঘরে ঘাস বুনেলেই হয়। মাস্তুর এক পড়শী বৌদির কথা মনে পড়ে; তাঁদের ঘরে কার্পেট পাতা ছিল, কিন্তু খালি-পায়ে তার ওপর দিয়ে কাউকে যেতে দিতেন না; জুতো পায়ে যাঁরা আসতেন তাঁরা কিন্তু দিবা কার্পেটের ওপর দিয়ে চলতেন।

যাই হোক দেবাংগুকে সে খাওয়ার নিয়ম বিষয়ে কিছু একটা বলবেই। হয়ত বলবে—বলা হ'ল না। হেডক্লার্ক ধরনী কুণ্ডু হাঁকাহাঁকি করছেন। মানুষের মনের নিষ্ঠা আর একাগ্রতা বুঝি এমনি ক'রেই ভেঙে যায় অন্য কাজের হিড়িকে। বড়বাবু অনেক খাওয়া—চা, ডবল ডিমের মানলেট, সন্দেশ আর একটা হাফ-পাউণ্ড ক্রটি। ডব্রলোক রোজ এই খান, আর খান পান আর দোস্তা। পান-দোস্তা তাকেই বাইরের দোকান থেকে এনে দিতে হয়।

ধরনী কুণ্ডুর খাবার নিয়ে এক মহা সমস্যা বেধে গেল। সে হাতে ক'রে দাঁড়িয়েই আছে, নামানোর ফরমাস আর পায় না। ধরনী কুণ্ডুর সঙ্গে টাইপিষ্ট বীরেন মহাপাত্রের ঝগড়া লেগে গেছে।

প্রিন্সিপ্যাল আপনার ছুটি মজুর করলেন না, তা আমি কি করব?

মজুর হ'ত, আপনিই তাঁকে নিষেধ করেছেন—বীরেনবাবু বেশ গরম হয়েছেন। বেশ করেছি যান, যা পারেন করুন গে।

কিন্তু কেন বেশ করবেন? আপনার কাছে ইনসিওর করিনি ব'লে?

ইনসিওর করবেনই বা না কেন শুনি। এই কলেজের দারোয়ান, বেয়ারাগুলো পরিস্রু করেছে; প্রোফেসরেরাও কেউ বাদ যায়নি। আর, আপনি কি এমন মহাকুলীন এলেন শুনি।

দেখুন বেশি নিরীহ সাজবেন না। আপনার কীতি আমি অনেক জানি। গতবারকার তপেন ঠাঁ-র ডেপুটেশন এ্যালাওয়েন্স আপনি শুধু শুধু কাটিয়ে দিয়েছিলেন—সে খবর আমার জানা আছে। কিছু জানিনে বলতে চান? সাহেবকে একবার বলব?

ধরনী কুণ্ডু এ কথায় মহা গরম হয়ে টেবিলের কয়েকখানা ব্লটিং পেপার ছিঁড়ে ফেললেন, আর হাতের ধাককায় চায়ের কাপটা মাস্তুর কাছ থেকে গেল প'ড়ে। ভাগ্যিস কাপটা পড়েছিল, তাই সে যাত্রায় ঝগড়াটা একটু থেমে গেল। দুর্ঘটনার দুর্ঘটনার হাত থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে দেয়। কিন্তু বড়বাবু কাপের দামটা আবার দিলে হয়।

মাস্তুর এইসব ঝগড়াঝাঁটি ভালো লাগে না। ঝগড়াঝাঁটি দেখলে মনের সব কথা কেমন যেন গুলিয়ে যায়। বীরেন মহাপাত্র চোখ বেশ বড় বড় ক'রেই রেখেছেন।

কি যেন ফন্দী আঁটছেন। কিন্তু ধরনী কুণ্ডুর ব্যবহার তার কাছে বিচিত্র লাগল। তিনি আজকে কোন অচল পয়সা দেননি, কাপটার দানও দিলেন, উপরন্তু তাকে বকসিস দিলেন একআনা। কিন্তু সে তো নিতে পারে না, বকসিস ফেরৎ দিল।

কেন, আরো চাস নাকি ?

না, বকসিস আমি নিই না।

এইবার ধরনী কুণ্ডু মহাসমস্তার পড়লেন যেন। পয়সা আবার কেউ ফেরৎ দেয় নাকি ?

এসব কুলীনদের নিয়ে তো বিপদে পড়লাম দেখছি। এঁয়া, সোমেনবাবু দেখুন তো আমি কি এমন দোষ করলাম ! বলি বকসিস দেওয়াটা কি দোষের ?

সোমেনবাবু মাজের টেবিলে বসেন। টেবিলের উপর 'অল্পসন্ধান করুন' বলে একটা কাঠের ফলকে লেখা আছে। তিনি অল্প কসতে কসতে বলেন, গান্ধীর দেশ তো। চন্দনের বাতাস সকলের গায়ে লেগেছে।

কিন্তু কুণ্ডুর সেদিকে দৃষ্টি নেই। তিনি তখন বাইরে তাকিয়ে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেবাংশুর সঙ্গে বীরেনবাবু কি যেন কথা বলছেন। কুণ্ডুর সেই ভয়ঙ্কর বাক্য চোখ একমাত্র মাজুই দেখতে পেল।

খাওয়ার বেলাতে মানুষ অল্পব্যাপার থেকে নিরপেক্ষ থাকে। খাওয়াটাই একটা অসতর্ক মুহূর্ত। কিন্তু খাবার জন্তে আর যা-কিছু করতে হয় সবই সতর্কতার সঙ্গে। মাজুকে ডাকা পর্যন্ত সতর্ক হয়ে করতে হবে। দেখতে হবে সে এল কিনা। কিন্তু সে যখন আসে এমনি অনেক অসতর্ক মুহূর্তেই আসে। আর মাজুকে তাই সবাইয়ের অসতর্ক ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়। তার কাজটিই যেন কারও গোপনীয়তা মেনে চলে না। নতুবা অধ্যাপকদের হাসি-মস্তুরা তার সামনে থামে না কেন, কেন চা নিতে নিতে ছাত্রেরা তাঁদের অধ্যাপকদের নিন্দা-বান্দা করেন। আর এই সব শুনতে শুনতে তার অনেক ধারণাই বদলে যায়। সে যাকে ভালো বলে মনে করে তাঁরই নিন্দা যখন তার গায়ে পাথরের ঢিলের মতো এসে পড়ে, তখন তার আর সাধ্য থাকে না সে কথাকে উপেক্ষা করে।

সেদিনও এমনি এক অসতর্ক মুহূর্তে সোমেনবাবুর চা নিয়ে উপস্থিত। ধরনীবাবু ব্যাঙ্কে গেছেন কলেজের মাইনেপত্র আনতে। কলেজেরই গাড়ী, বারোমাসে দেউলে গদাধর গাড়ী চালিয়ে গেছে। অফিসের ভেতরে মাত্র সোমেনবাবু বসে টেলিফোন করছেন : বিমলদা, দেবাংশুবাবুর কন্ফারেন্স অর্ডার-টা কিছুদিন ফাইল-চাপা রাখুন ; এ্যা, হ্যাঁ ধরনীদাই আমাকে বলতে বললেন ; সেই যে প্রথম দিন থেকে ইনসিওর করবেন বলে শ্রোত্র দিয়ে রেখেছেন, আজ পর্যন্ত—, হ্যাঁ, ধরনীদাই বলে দেবেন কখন পাঠাতে হবে। বারে, আপনারা একটু সাহায্য না করলে—; কেরানীদের সঙ্গে দেবাংশুবাবুর ব্যবহারটাও ভালো না ; ন তবে আর বলছি কি ; আচ্ছা পেলাম।

পরে মাজুর দিকে তাকিয়ে সোমেনবাবু হাঁকলেন—টেবিলে রাখ, দাঁড়িয়ে আছি কেন হাঁ করে।

মাজু তখন বোকা বনে গেছে ; ঐ ইংরিজি শব্দটা 'কনফারেন্স' 'অর্ডার' । ওটা কি ? অফিসের পিওন পক্ষ বলতে পারবে । ওটা তো জানতে হবে । স্মৃতির চর্চায় সে বাইরের দিকে উদাস হয়ে গেছে । বিজ্ঞা অর্জন করতে গেলেই বাইরের বিষয়ে মানুষকে উদাসীন হতে হয় । মাজুরও তাই হয়েছে । বিজ্ঞার কষ্ট সকলের বেলাতেই সমান কাজ করে, বড় গণতান্ত্রিক ।

এই সোমেনবাবুকে মাজু খুব নিরীহ বলে মনে করত ; কিন্তু তিনিও যে এমন মাপের ছায়া মেপে মেপে চলবেন কে জানত । কেউ হয়ত জানেও না, শুধু ক্যানটিনের বেয়ারা মাজুই জানতে পেল । মাজুর মনে হল দেবাংসুবাবুকে সাবধান করে দিতে হবে । কিন্তু কি-ভাবেই বা কথাটা তোলা যায় । দেবাংসুবাবুর চা-খাওয়া হয়ে গেছে । দ্বিতীয়বার যে চা খাবেন এমন রীতির মানুষ নন তিনি । থাক কালকেই বলা যাবে । কিন্তু ইংরেজি শব্দটা ?

তারপরদিন ভীষণ হৈ-চৈ কলেজে । একটা বড়দরের সভা । বড় বড় লোক এসেছেন, ভালো দামী জুতো, কোট পাতলুন । দামী গাড়ী, দামী মালা, দামী কনট্রাকটরের ঘর গাজানো । সবই দামী । আর দান বেঁধে এসেছেন মহিলারা ।

চা-আর স্ট্রাওউইচ পরিবেশনের তার পড়ল মাজু আর বিরিকির উপর । বিরিকি পুরোনো, কিন্তু আজকের ব্যাপারে মাজুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারল না । অনীতাদি নিজে সামনে থেকে প্রিন্সিপ্যালের দোতলার কামরাঅবধি যেন চায়ের গন্ধ ছুটিয়েছে । এই-ই হল চা, খাঁটি কালো রঙের পাতার । অল্পদিন কোথেকে বিমলাদি সাদা পাতা বের করে দেন ।

তবু সবাই যে চা খেল তা কিন্তু নয় । কেউ কেবল বক্তৃতা শুনছেন, কেউ কেবল হাসছেন । ঐ যে উঁচু বক্তৃতার আসন, ঐখানে দাঁড়িয়ে সুন্দর মতো এক ভদ্রলোক সাহেব সেজে মাইকে কি যেন বলছেন । সবাই তাঁর কথা শুনবার আগেই হেসে অস্থির । ভদ্রলোক কুলদানীটা নাড়ছেন আর বলছেন । তাঁর হাসি বোঝা যায় না, কোন সময়ে দাঁত দেখা যায়, কোন সময়ে ঠোঁটটা একটু বাঁকিয়ে দিচ্ছেন । আর নিচে যাঁরা বসেছেন তাঁরা মাথা হুলিয়ে শশঙ্কে হেসে সায় দিচ্ছেন । যোগেনবাবু তো সারাক্ষণ মুখ চওড়া ক'রেই থাকলেন । মুখ চওড়া হয় সূঁচলো মুখে হাসতে যাওয়া সত্যিই কষ্টকর । যজ্ঞবাবুর ঠিক এই ছরবস্থা । বিরিকি বলে, 'যিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন, তাঁর উপরই এখানকার সকলের চাকরী নির্ভর করে । উনি চোখের পলক ফেলেছেন কি একজনের চাকরী গেল ।' মাজুর বাবার সেই গল্পের কথা যেন পড়ে, 'ত্রাণার পলক, পলকে প্রলয় ।'

এত বড়লোক আর এত ভালো চা-স্ট্রাওউইচ, কিন্তু খেলেন না কিছুই । স্ট্রাওউইচগুলো কেটে কেটে ডিসের উপর রাখলেন । কথা বলতে বলতে তার হু এক টুকরো গাটিতে ফেলে দেন । চায়ের কাপ মুখে না-তুলে প্লেটের উপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন । অদ্ভুত খাওয়া, দেবতাদের খাওয়ার মতো । নিচের সারিতেও অনেকে তাঁর নকল ক'রে চলল । মেয়েরা কিন্তু ভালো খেলেন, মাজুর মা এমন খেতে পারতেন না । মেয়েরা খেলেনও যেমন, হাসলেনও তেমন । খেলেই হাসি পায় । কি হাসি-কি

হাসি, কিছু না শুনেই হাসি। বোদিদের মতো হাসি। মাজুর দাদা নেই, কিন্তু অনেক পড়শী বোদি আছে; এই যেমন কার্পেট বোদি, রেডিও বোদি। সুদূর গ্রামে ঘরের ভালো জিনিস দিয়ে মানুষের নামকরণ করা হয়। কলকাতায় যেমন মোটরের ট্রেড মার্ক দিয়ে নাম রাখা হয়। মাজুর সঙ্গে ও এঁরা সবাই হেসে কথা বলছেন, না খোকা, আর চা লাগবে না।

ছেলেটি ভারী চটপটে তো।

আমার একটা এইরকম বাচ্চা ছিল। কিন্তু সেই যে দেশের থেকে আসি বলে—আর একজন মহিলা তাঁর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, আপনার চাকরের দরকার?

ও-হো হো, ঐখানে চা বাদ পড়েছে। কাপ ডিস? কাপ-ডিসগুলো বিরিকিদি যদি গুছিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু কে হকুম করবে বাবা তাকে। পুরোনো বেয়ারা। মাজু এঁর চেয়ার তাঁর চেয়ারের মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে কাপডিস খুঁজে পেতে বের করে। খোয়া যায়নি, একটি জিনিসও খোয়া যায়নি। কিন্তু এতক্ষুতি তার ভালো লাগে না, ঝগড়াঝাটি থাকবে না বলে কি এত হাসিই সহ্য করা যায়। মাজুর কেমন যেন মনে হল হাসির ভিড়ানে সবাই যেন ঝগড়া নুকোচ্ছেন। যেমন করে বেশি গরম মসলা দিয়ে বিনলাদি পচা চিংড়ির গন্ধ লুকোন; আর তাই মানুষে খায় টাটকা কাটলেট বলে। এই যে ডিমের স্টাণ্ডউইচ করা হয়েছে, এর কতটা যে পচা ছিল তা আর কেউ না-জানুক মাজু আর বিরিকি তো জানে। অথচ খাওয়ার পর কেউ বলুক দিকি-কোনদিন একটি ডিমও পচা ছিল। এদের হাসিও যেন তেমনি। সব পচা ডিম, বিরিকির মতো মাজুরও বলতে ইচ্ছে করছে—“হঁ হঁ বাবা পচা-দা, একেবারে আগুনের সামনে পড়েছে।”

বিরিকি ছুটি না-নিলে মাজুর দিন মন্দ কাটছিল না। কিন্তু বিরিকি ছুটি নেওয়াতেই তার সব কিছু যেন গোলমাল হয়ে গেল। প্রথমে মনে করছিল, রাত্রে একা একা শোওয়াই এক ঝগড়া। বারোটা-একটার আগে তার যেন ঘুমই আসে না। বিরিকি থাকলে বিড়ি কঁকত, কোন্ তারা-টা ছিটকে পড়ল তা দেখাত। কিন্তু তার চেয়েও বড় বিপদ পাশের ইস্কুলের চা-যোগান দেওয়া। ইস্কুলে যেতে মাজু পারবে না। ‘ইস্কুলের মাস্টার’-নাম শুনেই মাজুর কেমন যেন গা শিউরে ওঠে। বিরিকির এত সাধ্য সাধনা সবেও সে কোনদিন ইস্কুল-মুখো হয়নি।

অথচ পরদিনই অনীতা-দি বললেন, ইস্কুলের মাস্টার মশাইদের চা দিয়ে আয় যা।

মাজু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পা খুঁটতে থাকে। পরে এক বোঁকে বলে ওঠে, ওটা পারব না দিদি—

কেন?

কাপডিস ভেঙে যাবে।

অনীতা বোসের চোখ দুটো যেন তীক্ষ্ণ হয়ে নরমভেদ করে বসল। এ ছেলেটা বলে কি? ষাড়টা ঝাঁকিয়ে অনীতা বোস বলেন, বিনলা, আজকের মতো চা-টা তুমিই দিয়ে এস।

কেন, মাজু যাবে না কেন ?—বিমলাদির কৃষ্ণ স্বর

কি জানি, দেখি । আজকের মতো তুমি চালিয়ে নাও তো ।

অনীতা বোস মাজুর দিকে টানা-টানা চোখ রেখে কি যেন বুঝতে চেষ্টা করেন । মাজু তেমনি মেঝেতে পায়ের নখ বুলোচ্ছে । অত্যন্ত গভীর হয়ে অনীতা বোস পাশের ঘরের দিকে গেলেন ।

মাজু জানে, সে অন্ডায় করেছে । তবু ইস্কুলের কাজ করতে কিছুতেই মনটাকে প্রস্তুত করতে পারে না । যতবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে ততবারই ‘ইস্কুল’, ‘ইস্কুলের মাস্টার’, ঐ ছটোর চেহারা তাকে যেন কেমন বিভ্রান্ত করে । শরীরের সমস্ত রক্তশ্রোত যেন ঐ কলেজের দারোয়ানটির মতো হাঁ-কার ছাড়ে । অপরাধীর মতো সে ক্যানটিন থেকে বেরিয়ে পড়ে কলেজের মাঠে । দক্ষিণদিকে ইস্কুল-আর-কলেজের গাড়ী রাখবার আস্তানা । ঐদিকে এগিয়ে যেতেই কক্ষচূড়ার গাছটার দিকে তার নজর ফিরে আসে । ছোটবেলা থেকে সে কক্ষচূড়া গাছের সঙ্গে এক আত্মীয়তা পেতে রেখেছে । তাদের গ্রামের সেই কক্ষচূড়ার কাছে সন্ধ্যার সময় আপন কথা বলে আসত । কেন যেন তার মনে হ’ত, ঐ গাছে ঈশ্বর থাকেন । গাছকে উদ্দেশ্য করে সে ঈশ্বরকে কত মিনতিই না জানিয়েছে । আজও সেই কক্ষচূড়া । কিন্তু কেন যেন মনে হ’ল, অনীতাদির মতো কক্ষচূড়াও তার দিকে গভীর চোখ মেলে রয়েছে, শান্ত, স্নিগ্ধ তবু যেন হতবাক্ ? অনীতাদি মাজুকে ভালোবাসেন, মাজু ইস্কুলকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসে, তবু ইস্কুলের কাজ সে করতে পারে না । প্রাচীরের ওপাশে ইস্কুলের দালানটা দেখা যায় । হঠাৎ তার মনে হল, তার একটা চোখের সমস্ত দীপ্তি অন্ধ চোখ টেনে নিয়ে কেবলই ইস্কুলটাকে দেখছে । ঝড়ের মতো এক ধাককা খেয়ে পড়ে গেল সে গাছটারই তলায় । জীবনে এই দ্বিতীয় সন্ধ্যা তার ইস্কুলের দিকে তাকিয়ে কাটল ।

গভীর রাতে আর-একবার সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে । আকাশ, খুব কালো আকাশ । আত্মকে অমাবস্যা বুঝি । পাতার ফাঁকে ফাঁকে আকাশের অন্ধকার কলমের নিবের মত ঝিলকিয়ে যায় । অনেক আলো অন্ধ করে দেয়, কিন্তু অনেক-কালো ফুট ফুট করে । কালো-পাথরের বাটিতে যেন সোনার দাগ ফুটে উঠেছে । মাজু স্বপ্নে পাওয়া মাজুঘের মতো আবার কক্ষচূড়া গাছটার দিকে এগিয়ে যায় । ইস্কুলের সাদা বাড়িটা যেন একখানা খান পড়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে পড়ে আছে । সবটুকু দেখা যায় না । ইস্কুল কথা বলে ? সারাদিনে এত কথা বলে আর রাত্তিরে একটু কথা বলবে না ? গাছে উঠে একটু দেখবে ?

কে ?

মাজু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে দারোয়ান ।

ক্যা, মতলব ক্যা ? চোরি ?

মাজু কিছু বলবার আগেই দারোয়ান তাকে হুক্কার ছেড়ে বলল, যা, ঘরমে যা । বেঅকুফ্ ।

অনীতাদিকে প্রিন্সিপ্যাল ডেকে পঠিয়েছেন । মাজু আজ আর লোভ সামলাতে পারে না । সাহেবের চা-জলখাবার ঠিক এই সময়েই নিয়ে যাওয়া চাই । বেরোতে

একটু দেবী হয়ে গেল। সিঁড়ির মুখে পড়লেন দেবাংগুবারু। কাল-বৈশাখীর মতো গভীর। এই চেহারা সে চেনে। মফঃস্বলের ছেলে। বছবার কালবোশেখের মেঘ দেখেছে। আর সেই মেঘের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে চৈত্রের সেই গাজনসন্ন্যাসীর চেহারা। কেমন যেন ত্রিশূল বহু একাকার। কিন্তু সে ভয়ঙ্কর চেহারা আরও স্পষ্ট হ'ল। জীবনে শুধু একবার। তবু তাই মাজুর জীবনে গভীর ছাপ রেখে গেছে। মাজুর বাবার মুখে-চোখে একবার মাত্র ঐ কালবোশেখীর মেঘ দেখতে পেয়েছিল সে। তারপর সেই মেঘের ঝড় নিয়েই মাজুর বাবা মারা যান। আজ দেবাংগুর মুখেও সেই মেঘ।

দেবাংগু তাকে দেখতে পেয়ে একটু হাসলেন মাত্র। মেঘের মধ্য দিয়ে একটা বিছাৎ চিরে বেরিয়ে গেল যেন।

মাজু একটু থমকে দাঁড়ায়। কেন তার এসব মনে হয়। বিরিকির কথায় তবে কি সে ভূতে-পাওয়াই হয়ে গেল।

প্রিন্সিপ্যাল অনীতা বোসকে বলছেন, কিন্তু হেডমাষ্টার মশাই ছেলেদের ইস্কুলে নেয়েদের চা নিয়ে যেতে দেবেন না বলছেন; আর ভালোও তো নয়।

অনীতা বোস একটু বীরে বললেন, কিন্তু বিরিকি ছুটি নিয়েছে, লোকও আমার কম।

মাজু ঠক্ করে চা আর খাবারটা টেবিলে রাখে। মাজু সমস্ত কথা শুনেছে বলই চায়ের কাপটা একটু ঠক্ করে উঠল।

প্রিন্সিপ্যাল চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বললেন, লোক কম থাকে, লোক রাখুন।

ওপর থেকে লোক দিতে স্বীকার করছে না।

তবে একে পাঠান। এই ছোকরাটিতো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু ও ইস্কুলে যেতে চায় না।

যেতে না-চায় তাড়িয়ে দিন।

প্রিন্সিপ্যালের কড়া হুকুম। কারণ মাজুকে শোনানো হল। প্রত্যেক কনতা থাকলে তিনি নিজেই হয়ত তাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু অপ্রীতিকর কাজে তিনি থাকতে চান না বুঝি।

মাজু চলে আসছিল। হঠাৎ হস্তদণ্ড হয়ে দারোয়ান ঘরে ঢুকল। মাজু শকিত হয়ে পড়ে, এবার বুঝি রাত্রে সেই চুরির ব্যাপারটা

কি অমর ছুটছে কেন দরোয়ান?

ছজুর, বড়াবাবু তো নর্ গিয়া,

প্রিন্সিপ্যাল, অনীতা বোস চমকে উঠলেন। প্রিন্সিপ্যাল তবু ব্যাপারটা বুঝবার জন্যে একটু ধমক দিলেন, নর্ গিয়া? উনি তো ব্যাঙ্কে গেলেন এই মাত্র।

দারোয়ান তার ভাঙা বাংলা আর হিন্দীতে বিলকুল সমঝায়ে দিল। ব্যাঙ্কে যাওয়ার পথে কলেজের গাড়ীর মধ্যেই মরে গেছেন। ড্রাইবর সব বলতে পারবে বলে দারোয়ান মহা অপরাধীর মতো প্রিন্সিপ্যালের সামনে হাত-জোড় করে দাঁড়ায়।

প্রিন্সিপ্যাল বাক্যব্যয় না-করে উঠে নিচের তলাতে চললেন।

ভিড়ের মধ্য থেকে মাজু দেখল, হ্যাঁ ধরনী কুণ্ডুই বটে, পানথ্রেয়ে ঠোটটি তেমনি লাল করে আছেন। ঘুনের মতো গাড়ীর গীটের উপর পড়ে আছেন।

বহুবার ফোন হল, ডাক্তার এল, পুলিশ এল, ডাক্তার ঘোষণা করলেন, মরেছেন যে সে-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই।

প্রিন্সিপ্যাল সোমেনবাবুকে বললেন—উনি তো বিয়ে করেননি, কিন্তু আত্মীয় স্বজন কে আছে তাঁর ?

সোমেনবাবুর চোখে জল, কিন্তু গলা ঠিক রেখে বললেন, কেউ নেই স্ত্র, এক বুড়ো বাপ কিন্তু তিনি ক্যানসার রুগী, আসতে পারবেন না।

তাঁকে খবর দিতে হয়। একজন পিওনকে পাঠান।

শুনলেই মারা যাবেন, স্ত্র। ক্যানসারের সঙ্গে আর একটা বড় রোগ হয়েছে তাঁর হৃদ্রুশিতা—এক ধরনী কত খরচ চালাবে ? আর, সে-ধরনীও তো চলে গেল।

প্রিন্সিপ্যাল এবার ধনকের সুরে বললেন, গল্প না কেন্দে একটা খবর পাঠিয়ে দিন।

কালকের গোলমালে ঘর-ঘর থেকে কাপ-ডিসগুলো ফিরিয়ে আনা হয়নি। কলেজ খুলবার সঙ্গে সঙ্গেই মাজু কাপডিসগুলো আনতে গেল। অফিসে তেমনি সোমেনবাবু ; ওদিকে বীরেনবাবু টাইপ করার কাগজ কাটছেন। সব ঠিক আছে। ধরনী কুণ্ডুর টেবিলে সেই রঙ-বেরঙের কাগজ চাপা, ফাইল, টিকিটের আঠা জড়ানোর স্পত্ত, নিচে ছেঁড়া কাগজের টুকরী। মনে হচ্ছে, ধরনীবাবু এখনই আসবেন।

সোমেনবাবুর টুল থেকে কাপ-ডিস টানতেই সোমেনবাবু হাঁকলেন, এই রানফল, বলেছি না রাস্তার মধ্যে টুল রাখবি না, বড়বাবু এসে আবার—

কথা শেষ হওয়ার আগেই সোমেনবাবু চমকে উঠলেন, আপন মনেই বললেন, তাই তো। সব তো শেষই হয়ে গেছে। বুঝলে বীরেন, বোঝা যায় না—কিছু বোঝা যায় না।

বীরেনবাবু কাগজ কাটা কনিয়ে বললেন, কি বোঝা যায় না ?

এই সব মানব-চরিত্র। বেঁচে থাকতে বড়বাবু হেন দিন যায়নি, যেদিন সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া না-করেছেন, সাহেবের নিন্দে না-করে উদ্ভলোক যেন জলগ্রহণ করতেন না ; অথচ কালকের ঐ-কাজের, বুঝলে দাহ করার সমস্ত খরচা কিন্তু ঐ সাহেবই দিলেন ; শুনছি শ্রাদ্ধের সব বন্দোবস্তও উনিই করছেন। ধরনীবাবুর বাবার কাছে গিয়ে ঐ সাহেব বলেছেন কি জ্ঞান ?

বীরেনবাবু উৎসুক হলেন জ্ঞানতে।

বলেছেন, ‘এক সঙ্গে কাজ করতান। আমাকেও আপনার সম্মানের মতোই মনে করবেন ; বিপদ আপদ বা অন্য কোনো অসুবিধা হলে আমাকে খবর দেবেন।

বীরেনবাবু খোঁচা দিলেন, পায়তারা কসছেন বুঝি সোমেন দা, হেডক্লার্ক হওয়ার সঙ্গে এখন থেকেই এত।’

সোমেন বাবু হতভস্ত হয়ে বলেন, মানে ?

মানে, কীর্তন গাওয়ার মধ্যে বাড়াবাড়ি দেখতে পাচ্ছি। আশ্চর্য আপনি। অথচ

কুণ্ডুর সঙ্গে আমার কোনোদিন মতের মিল হয়নি ; তবু আজ ঐ টেবিলটার দিকে তাকিয়ে বারবার মনে হচ্ছে, ভগবান একবার যাকে নিয়ে গেছে তাকে কি কোনোমতেই ফিরিয়ে দিতে পার না । ঐ কাঁকা যায়গাটা কেমন যেন—

সোমেনবাবু হঠাৎ মাজুকে ধমকে বললেন, এই ছোঁড়া, তুই দাঁড়িয়ে কি শুনছিস ?

মাজু বেরিয়ে এল । সত্যিই তো এমন করে লোভীদের মতো বাবুদের নিজেদের মধ্যকার কথাবার্তা শুনতে নেই । যার যেটুকু অধিকার সেইটুকু নিয়েই তাকে থাকতে হয় । অধিকার অতিক্রম করতে নেই । সে শুনতো না ও-সব । শুধু সোমেনবাবুর আর বীরেনবাবুর বিচিত্রধরনের কথাবার্তাই তাকে আটকে রেখেছিল । দুজনের কথাই সুন্দর, অথচ দুজনেই কথার বাইরে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন । এমন অভিজ্ঞতা তার জীবনে বুঝি আসেনি ।

সে ওখান থেকে বেরিয়ে প্রিন্সিপ্যালের ঘরে গেল । কল-লাগানো দরজাটা ধীরে ধীরে খুলতেই প্রিন্সিপ্যালকে তার নজরে পড়ল । অদ্ভুত তাঁর দৃষ্টি । কোন কিছুই লক্ষ্য হচ্ছে না যেন । সে দেখেছে কিছুক্ষণ আগে তিনি ঘরে ঢুকেছেন । কিন্তু এসেই যেভাবে বসেছিলেন, বুঝি তেমনি একঠায়েই বসে আছেন । নিঃসাড় । যেন ঝড়ের শেষের খম্বশে ভাব ।

সে চুপকাল । কালকে যেখানে খাবার রেখে গিছিলো, সেইখানেই খাবার এবং চা কেমন বাসি চেহারা নিয়ে পড়ে আছে । চায়ের উপর পাতলা সরের মতো কি যেন পড়েছে ; খাবারটা যেন বিবর্ণ আর রুগ্ন হয়ে পড়ে আছে । সাহেব কিছুই নজর করলেন না । সে সবশুদ্ধ ভুলে নিয়ে এল । অথচ কালকেও দেখেছে সে, সাহেব এই সময় চিঠির বাঙুল নিয়ে কেবল লাল পেনসিলের দাগ দিচ্ছেন । এই সময়েই তিনি দিনের মধ্যে বেশি ব্যস্ত থাকেন । আর আজ কেমন যেন পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন ।

আত্মীয় স্বজনও বেশিদিন শোক করতে পারে না । ইশ্বরের বিধানের উপর আপীল চলে না । স্বর্গের এলাকায় শাস্তকালের ১৪৪ ধারা জারী করা, ওখানে পৌঁছতে গেলেই মৃত্যু । মৃত্যু না-ঘটলে স্বর্গলাভ ঘটে না । তাই তাড়াতাড়ি মৃত্যুকে ভুলে যাওয়াই জ্ঞানীদের রীতি । সম্মাসী, ব্রাহ্মণদের থেকে শুরু করে শূদ্র পর্যন্ত যারা যতবেশি জ্ঞানী তারা তত অল্প সময় অশৌচ পালন করে । কলেজ বিদ্যার ক্ষেত্র, এখানে অশৌচ নেই । যত বড় ব্যক্তিই হোক তার মৃত্যুতে এখানে অশৌচ ঘটে মাত্র আধমিনিটের নীরব দণ্ডায়মান অবস্থার মধ্য দিয়ে । এই কলেজেও প্রথম দু-এক ঘণ্টা একটু খম্বশে ভাব ছিল মাত্র । তারপরই সব ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেল । তেমনি আফিস থেকে সোমেনবাবু চায়ের অর্ডার করেছেন, তেমনি বীরেন মহাপাত্র টাইপ ক'রে চলেছেন, আর নরকঙ্কাল নিয়ে ডাক্তারবাবু তেমনি ক'রে ছাত্রদের শারীর-বিজ্ঞান পড়াচ্ছেন । কলেজের দিকে তাকালে কোনো পরিবর্তন বোঝা যায় না । বোঝে কেবল মাজু । এই সময় ধরনীবাবুর কি হাঁকাহাঁকি । কত তাঁর খাওয়া । এইতো এখানে কলেজের সিঁড়ির কাছটিতে কালকে গাড়ীখানা ধরনীবাবুর মৃতদেহটা নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিল ; ঠিক কুলগাছটার গোড়াতে । আজ সেই পথের উপর দিয়ে কলেজের ছাত্র

বেয়ারারা হেঁটে হেঁটে সেই ঘটনাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। আর পরিবর্তন ঘটেছে খ্রিষ্টিপ্যালের। খাবারের কোনো অর্ডার আজ আর এল না।

হুদিন পর বিরিকি ফিরে এল। মাজুর একটা হুশিহুতা গেল। একা-একা আজ সে থাকতে পারত না। হুই রাত্রিরই তার কেবল ধরনীকুণ্ডুর কথা মনে হয়েছে। সেই সঙ্গে মানুষের জীবন সম্বন্ধে তার অদ্ভুত সব স্বপ্ন।

বিড়ি ফুকতে ফুকতে বিরিকি বলে—অত ভাবছি কি করে মাজু ?

ধরনীবাবুর কথা।

হ, ভদ্রলোক সত্যিকারের ভালো লোক রে। গাড়ীর মধ্যে মারা গেলেন। নে, এখন যুসো।

মাজু বিস্মিত হয়ে যায়। এমন করে কাউকে বলে নাকি। আমার তোমার কাছে ধরনীবাবুর হয়ত কোন দাম নেই, কিন্তু তার রুগ্ন পিতার কাছে।

নে বিড়ি ঝা।

না।

ওহ্ রাগ হয়ে গেল। জানিস, তোর চাকরী থাকবে বলেই ধরনী কুণ্ডু এমন করে মরে গেল। সেই গোলমালে আর তোর কথা কারও মনে পড়েনি। রাগে তোর গায়ের রক্ত টগবগ করে না, জমে বরফ হয়ে যায়। তখন আর মায়াদয়ী তাঁর থাকে না।

বিরিকির কথায় মেদিনীপুরের টান। কথাগুলো যেন সরসর করে বয়ে যায় গাছের গায়ে বাতাস লাগার মতো। মাজুর ইচ্ছে হল বলে, তুমি ছাই জান। মানুষ কখনও পাথর হতে পারে না, নদী হতে পারে না, আগুন হতে পারে না—কোন জীবজানোয়ারও নয়। এ এক সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের জীব। এইজন্যই মানুষ বাঁচতে বাঁচতে মরে, আবার মরেও বেঁচে থাকে। অনেক দিন পর মাজুর বাবার একটা কথা মনে পড়ে। কথাটা। ঠিক মনে নেই তবে তার ভাবটা অনেকটা আকাশের ঐ তারার মতো ; অন্ধকার যে নিতান্তই অন্ধকার নয়, আলোর একটা খেলা মাত্র—সেই কথা ; মানুষ কাউকে ক্ষতি করতে পারে না, কাউকে ভালো করতে পারে না ; মানুষ চাকরী করে না, মানুষের চাকরী যায় না, মানুষের মধ্যে জন্মজন্মান্তর-পূর্ব থেকে একটা ইচ্ছা সঞ্চিত থাকে ; তোমার নিজের শত চেষ্টায়ও সে ইচ্ছার গতি-বদল হয় না।

মাজুর মার এক কথার উত্তরে বাবা এই জবাব দিয়েছিলেন। জবাব দিয়েছিলেন, গাছ জন্মে-বাড়ে, তুমি কেটে ফেললে তাকে—তার কোন ক্ষতি হয়নি ; তুমি যখনই তাকে কেটেছ তখনই তার শক্তিকে স্বীকার করেছ ; তার শক্তি স্বীকৃত হল, এইতো গাছের প্রাণের ইচ্ছা।

মায়ের এত বুদ্ধি ছিল না যে এসব কথা বোঝেন। তবে চুপ করে স্বামীর সঙ্গেই উপবাস করতে শুরু করেছিলেন। বাবা সেই অনশনে মারা গেলেন, কিন্তু মা বেঁচে আছেন।

ভাগ্যিস সেদিন সবকথা শুনেছিল, তাই আজ এতদিন পর সম্পূর্ণ অর্ধ এর

বুঝতে পারছে। বাবারই তো কথা, 'শুনে যাও, আজ না হয় কালকে বুঝবে।' সত্যিই তো সে আজ সব বুঝতে পারছে। মার বাঁচবার ইচ্ছা ছিল বলেই আজ সে চাকরী করতে এসেছে, সে নিজের বাঁচতে চায় বলেই চাকরী করেছে। যখন এ ইচ্ছা থাকবে না, যখন ঘটবে এ সবেব অবলুপ্তি—

তার মনের মধ্যে কেবল ঘুরছে যত রাজ্যের কথা। ঘুম নেই, তার ঘুম নেই। বিরিকিই কি ঘুমিয়েছে? তা হলে স্বপ্নের ঘোরে অমন বিড়বিড় করেছে কেন? স্বপ্নে ভাবনা করার চেয়ে জেগে থাকাই ভালো।

পরদিন সোমেনবাবুকে খাবার দিতে যেতেই আর-এক কাণ্ড ঘটল। দেবাংশুবারু চেয়ারে সোমেনবাবুর সামনে। কালবোশেখার মেঘে তেমনি বিদ্যুৎ। মেঘ আজও কাটেনি, বরং ধেয়ে আসছে যেন। সোমেনবাবু বলছিলেন, আপনি ছুদিন আর সবুর করুন; যদি এর মধ্যে অর্ডার না আসে আপনি ছেড়ে দেবেন চাকরী, আমি আপত্তি করব না।

দেবাংশুবারু একটু মুচকি হেসে জবাব দিলেন, আপনার আপত্তি বা সম্মতির উপর কিছু নির্ভর করছে না সোমেনবাবু। প্রিন্সিপ্যাল নিজেই ওপরে ফোন করেছেন অর্ডারটা তাড়াতাড়ি আনবার জন্যে। কিন্তু আমাকে তার আগেই যেতে হবে। একমাসের নোটিশ হয়ে গেছে।

সোমেনবাবু চায়ের কাপটা এপাশ থেকে ওপাশে রেখে বললেন, আচ্ছা আমি বিমলদাকে ফোন করছি, এখনই যাতে অর্ডারটা আসে—

কিছু করতে হবে না। আমি জানি সব। গ্রাও ট্রাঙ্ক রোডটাকে আমি চিনি অনেকদূর তার পথ। চলতে চলতে ক্ষয়ে যাওয়া যাবে।

সোমেনবাবু রাগে কঁদে ফেলবার মতো, আপনি বড় গোঁয়ার দেবাংশুবারু। জীবনে অনেক দুঃখ পাবেন—

দেবাংশুবারু উঠে পড়লেন। একটা শাল গাছের মতো যেন। শাখা-প্রশাখা নেই, কেবল উঁচু। কপালে কোন ভাঁজ নেই, ঠোঁটটা সহজ অথচ দৃঢ়। ডান হাতটা ঘড়ি সমেত সোজা লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে।

দেবাংশুবারু বেরিয়ে গেলে সোমেনবাবু চায়ের চুমুক দিতে দিতে বললেন, থাকত যদি বাছাধনের আমাদের মতো পুত্র-কলত্র দেখতাম কেমন জিদ থাকে। অন্তায়ের প্রতিকার। হঁ, অন্তায়ের প্রতিকার। অন্তায় কিসের হে বাপু, পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে লড়াই করতেই হয়, লড়াই করতে এসে পিছিয়ে গিয়ে বীর্ষ দেখাচ্ছেন। বুঝলে বীরেন,—

বুঝছি। এই কথাটা আপনি আগে বোঝেন নি যে, সংসারে সবাই উৎকর্ষ; আপনাদের কারসাজি সবাই জানতে পারে; দেখেননি, যুদ্ধের সময় যেখানে-সেখানে পকেট রেডিও বসিয়ে কথাবার্তা শোনা হত, আজকালকার লড়াই হয় 'কে বেশি শুনতে পায়' তারই মহড়ায়।

যানে? তুমি বলছ, আমি আর ধরনীদা ষড়যন্ত্র করে—

বীরেনবাবু ডিড কাটলেন, ছিঃ, মরা-মানুষকে কি অশ্রদ্ধা করতে পারি, তা হলে আমার ডিড যেন খসে যায় ; এখনকার লড়াই শুধু আপনাতে-আমাতে । বড়বাবুর গদিটা অনেকদিন খালি পড়ে আছে, আস্ত্রন কে বসতে পারি দেখা যাক—। ভাস্ত্র মানুষই লড়াই করে—আস্ত্রন । তা ধিন্ ধিন্ না—আস্ত্রন ।

মাজুর সব কথা কানে গেল না ! দেবাংগু যেন তাকে চুম্বকের মতো টেনেছে । সে আর থাকতে পারে না, বেরিয়ে এল । হঠাৎ দেবাংগুবাবু পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, কি রে মাজু ?

একটা কথা বলব ।

বল্ ।

আপনি চাকরী ছেড়ে দিচ্ছেন ?

হ্যাঁ, বকসিস চাস্ ?

ছিঃ, মানুষে যেন আর কিছু ভাবতে পারে না । পয়সা, পয়সা—পয়সা আর লোভ । সে বিরিকি না কি ।

না ।

তবে ?

আমার বাবা একবার বলেছিলেন, অনশনে অনেকেই মরে কিন্তু সত্যাপ্রহ তাদের সবাই করতে পারে না ।

দেবাংগুবাবু একটু চমকে ওঠেন ।

তোমার বাবা কি করেন ?

মাস্টার । ইস্কুলের মাস্টার ছিলেন । তারপর কেন যেন চাকরী ছেড়ে দিলেন, উপোস করতে হ'ল, সবদিন খাওয়া জুটত না ; খুব গরীব তো আমরা । কান্ধেই একদিন ঐ অবস্থাতেই মারা গেলেন ।

দেবাংগুবাবুর চোখ হঠাৎ বিস্ফারিত হয়ে পরস্পরে কুঞ্চিত হ'ল । ঘাড় ফিরিয়ে কি যেন ভাবলেন । পরে নরমগলায় বলেন, আমার সঙ্গে যাবি ?

মা ।

এত জোরের সঙ্গে 'না' মাজু আর বুঝি কোনোদিন বলেনি । দেবাংগুবাবু তার মাথাটাতে হাত বুলিয়ে বললেন, তোমার বাবা ঠিকই বলেছিলেন ।

সামনে এগিয়ে গেলেন তিনি ।

এই সময় বিরিকি ইস্কুলের চা আর খাবার নিয়ে যাচ্ছিল ।

কোথায় চলেছিসরে বিরিকিদা ?

ইস্কুলে আর কোথায় ? তোকে দিয়ে তো আর কিছু হবে না । কুঁড়ের বাদশা ।

মাজু একটু ইতস্তত করে । এখনও দেবাংগুবাবুর চেহারাটা মিলিয়ে যায় নি ।

দে, আমিই যাই ।

বিরিকি একটু হেসে ফেলে, তবে যা । যাওয়া ভালোরে, পুজোর সময় গুঁরা ভালো বকসিস দেন । যা, এই নে ।

মাজু তার কোন কথাতেই কান দেয়নি ।

॥ দ্বিতীয় দশ ॥

রাজেন্দ্র দশমুখ্য

॥ অবিশ্বাস্য ॥

দ্বীপটা নির্জনই বটে ।

তবে পুরোপুরি নির্জন নয় বলে 'প্রায়-নির্জন' বলাটাই সংগত হবে । পাহাড়ি দ্বীপ । সপরিবারে সেই দ্বীপে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন বেলা দশটা । আরও জনকয়েক নরনারী আমাদের সঙ্গে একই লঞ্চে একফালি-সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন ।

বনের ইণ্ডিয়া-গেট থেকে একটি ছোট লঞ্চে সাতমাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছি । একটা বড় জাহাজে এলে এতটা ভয় পেতাম না । কিন্তু সমুদ্রের বুকে ছোট পানসির মত সাদা লঞ্চখানি । চেউয়ে সব সময়ই বুঝি ডোবে ডোবে । কাছেই সারাক্ষণ ধুকধুক করছিল বুক । লঞ্চখানি তুলছিল । চেউয়ের দাপাদাপিতে সমুদ্র ছিল দামাল । আমরাও তুলছিলাম খাঁচায় টিয়াপাখির মত ।

দ্বীপের নির্জন তপস্বীকে কোলাহলে আমরাই বিদ্বিত করলাম । গাছের ডালে যে-সামুদ্রিক পাখিগুলি নিশ্চিন্তে কাকলি শুরু করেছিল, তারা মানুষের পদধ্বনিতে বিরক্ত হল । কিন্তু আমাদের অক্ষিপ কোথায় ? খুশির কলরবের সঙ্গে পদধ্বনির দ্রুত তালে ক্রমাগতই সংগত স্রষ্টা করতে করতে চড়াই উঠতে লাগলাম আমরা ।

পর্ভুগীজরা নাম দিয়েছিল এলিফেণ্টা দ্বীপ । পাথরের হাতি দেখতে পেয়েই তারা ঐ নামকরণ করেছিল । আগে ঐ দ্বীপটির কি নাম ছিল, জানা যায়নি । পনেরশ' চৌত্রিশ খ্রষ্টাব্দে মূলগুহার স্থাপত্য আর ভাস্কর্য নষ্ট করতে পর্ভুগীজরা কামান দেগেছিল । মলদস্যুর উপযুক্ত কাজই করেছিল ওরা । উড়িষ্কার সমুদ্র-তীরের মন্দিরগুলি যেমন করে ইতিহাসের কালাপাহাড় নামক ব্যক্তি নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেছিল ।

সতেরশ' চুয়াত্তর খ্রষ্টাব্দে এই দ্বীপের দখল নিল ইংরাজ । সেই থেকে দ্বীপটা সংরক্ষিত এলাকা হয়ে গেল । এলিফেণ্টা দ্বীপের একটুকরো ভাস্কর্যকে বনের ভিক্টোরিয়া গার্ডেনের মুজিয়ামে আনা হল সরিয়ে ।

পাথরের পাহাড় কেটে কেটে গুহা আর গুহার ভাস্কর্য । ভারতের পশ্চিম প্রান্তের এই অপূর্ণ ভাস্কর্যের বয়স কত ? কেউ বলেন, খ্রষ্টাব্দ সপ্তম-শতাব্দীর গোড়া থেকেই তিল তিল করে এই ভাস্কর্যস্রষ্টার কাজ শুরু হয় । প্রধান গুহায় শিবের যে বিখ্যাত ত্রি-মূর্তি আছে, তার জন্ম সম্ভবত খ্রষ্টাব্দ অষ্টম শতাব্দীতে । গুহার ঐ হলঘরে যে স্তম্ভগুলি আছে, তাতে অশোক আমলের কারুকার্যের খানিকটা নমুনা মেলে ।

ঘুরে ঘুরে ঐ অপক্লপ ভাস্কর্যকে দেখতে লাগলান। হরগৌরীর রূপানুরাগ, বিবাহ ইত্যাদি যুগলজীবনের নানা শিল্পরূপ। ওহাটি প্রায়াক্রকার। আলো হাতে নিয়ে গৌরীর মুখ দেখলে চমকে উঠতে হয়। কুমারী গৌরীর মুখে অনুরাগের কী লজ্জাকর ভঙ্গিমা। হাতের ওটা কি লীলা কমল ?

পরিবারের সবাই আনাকে ঐ প্রায়াক্রকার ওহায় রেখে বাইরে চলে গেলেন। বাইরে সূর্যালোকে কোথাও বসে ওরা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে হীপের নিসর্গ শোভা দেখবেন। এবং টিফিন-কেরিয়ারে আনীত বস্তুর সন্ধ্যাবহার করবেন।

শিবের ত্রি-মূর্তিটা স্ট্রিট-স্থিতি ধ্বংসের প্রতীক। এতে ভারতীয় হিন্দু-দর্শনের গুঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে। অথচ, একই শিবের নটরাজ রূপও রয়েছে ওহায়। নাচের যে-ভঙ্গিমাকে বর্তমান শতাব্দীতে নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর খুবই ব্যবহার করেছেন মঞ্চ মঞ্চে।

মানুষের দৃষ্টি ছরকম। ভাসাভাসা আর গভীর। যে-লোকটি নানা দেশ ঘুরে ঘুরে কেবলি শিল্প-শোভা দেখে বেড়ায়, তার দৃষ্টি ভাসাভাসা। হাতে প্রচুর পয়সা থাকলে এ-দৃষ্টি লাভ করা সহজ। দেখে আসুন না, স্ট্রেন নদীর ধারে সুন্দরী প্যারী শহরকে। সেখানে গথিক গীর্জার গায়ে অপক্লপ ফরাসী চিত্র ও ভাস্কর্য। দেখে আসুন আমাদের বুদ্ধআমলের অজস্র ওহার শীর্ষ-সজ্জা। সাদা স্নিগ্ধ পদ্ম, সারি সারি হাঁস, ময়ূর আর হাতি এঁকে কী বিচিত্র কাণ্ডই না করা হয়েছে। পারলে দেখে আসবেন, প্রাচীন ইটালীর শিল্পসাধনা। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরই দেশের পরবর্তীকালের মুঘল যুগের শিল্পীদের আঁকা ছবিও কষ্ট করে দেখতে ভুলবেন না। ঘুরে ঘুরে সবই দেখা সম্ভবপর, যদি আপনার পকেটে পয়সা থাকে।

কিন্তু গভীর দৃষ্টি যে অন্য বস্তু। এটা আয়ত্ত করা কঠিন ব্যাপার। এ-দৃষ্টির সঙ্গে জড়ানো রয়েছে স্বপ্ন। প্রায় স্বপ্ন-দর্শনের-ব্যাপার। এ দৃষ্টি শিল্পী ও শিল্পরসিকের প্রাণেরই বিকীরণ। পাথরের কিংবা ব্রোঞ্জের মূর্তির চোখে কত গোপন কথা। মূর্তির চোখে চোখ রেখে শত শত বছর পেরিয়ে যাওয়া যায়। একটি মূর্তির চোখেই যে হাজার পৃষ্ঠার লিখন, যা পড়তে গেলে পড়া আর কুরোয় না।

এলিফেণ্টা হীপের প্রধান ওহার ভেতরে যে-আমি দাঁড়িয়ে আছি, সে-আমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ। কিন্তু যে-শিল্পীরা দিনের পর দিন, সামান্য মজুরির বিনিময়ে, শিল্পপতি রাজার আদেশ তামিল করেছেন, তাঁরা অন্তঃকরণে। সেদিনও শিল্পীদের মনে মনে জীবিকার অন্তান্ত শর্ত নিয়ে অসন্তোষ ছিল। তবু কী প্রাণচালা কাজই না করেছেন। পাথর যে কথা বলতে চায়। পাথরের ভেতরে নিজেদের প্রাণকে শিল্পীরা চালান করেছিলেন বলেই পাথর এত জীবন্ত।

• ‘কী দেখছেন?’ কে যেন আমাকে পেছন থেকে শুধালো।

‘গৌরীকে।’ জবাব দিলাম।

‘গৌরীর চোখে প্রেমের কী স্নিগ্ধ রূপ।’

‘কী বললেন?’

কৌতুহল বশে পেছন ফিরে তাকিয়ে ভোঁ অবাক হয়ে গেলাম। একটি ফ্যাকাসে

বধু । গুহার ক্ষীণ আলোয় তার মুখের করুণ আদল । একটি ছাইরঙের শাড়ি পরনে । সমস্ত অবয়বে দারিদ্র্যের লক্ষণ । শরীরে কোনো অলংকার নেই । ছাই রঙের শাড়ির সঙ্গে গুহার প্রায়াক্রকারের রঙের একটি মিল আছে । কেবল চোখ দুটি উজ্জ্বল । ক্যাকাসে মুখকে আলোকিত করে আছে একজোড়া চোখের অস্বাভাবিক দীপ্তি । সেই দীপ্তিতেই তার করুণ মুখখানি সুন্দর ।

‘আপনিই তবে কথা বলছিলেন ?’

‘হাঁ ।’

‘আর কাউকে তো আপনার সঙ্গে দেখছি না ।’

‘না, আমি একাই এসেছি ।’

‘আশ্চর্য ।’

‘কেন, কেন ?’

‘আপনাকে জীবন্ত মানুষ বলে মনে হয় না ।’

বধুটি কোনো জবাব দিলেন না । স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন ভাস্কর্যের দিকে । দৃষ্টিটা নিবন্ধ রয়েছে কেবল উমার দিকে । পাথরের উমা যেখানে লজ্জায় রাঙা হয়ে আছেন ।

ঠিক এই সময় অপর একজন দর্শক একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে গুহার একদিক থেকে অন্যদিকে চলে গেলেন । লোকটি গুহরাটি ।

বধুটি বললেন, ‘লোকটি অন্ধ ।’

‘না, না, লোকটির চোখ ভালো । আমি দেখলাম যে, লোকটির চোখে আমাদেরই মত দৃষ্টি রয়েছে ।’

‘তাহলে মোমবাতি জ্বালিয়েছে কেন ?’

‘শিল্পের শোভা আরো ভালো করে দেখবার জন্যে ।’

‘লোকটাকে আমি চিনি । একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী । সত্যিই সে অন্ধ ।’

বধু বললেন ।

‘আপনি কতোকণ এখানে দাঁড়াবেন ?’ হঠাৎ বেখাপ্পা প্রশ্ন করলান ।

‘কেন বলুন তো ?’

অনেকক্ষণ ধরেই আমি দাঁড়িয়ে আছি কি-না । ভয়ানক ভেট্টা পেয়েছে, চা কিংবা জলের ।’

‘জলের ভেট্টা ? জল তো এই গুহার সঙ্গেই আছে । ঐ দিকে একটু এগোলেই পাবেন জলের প্রাকৃতিক উৎস ।’ বধুটি ডান হাত তুলে রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেন ।

‘আপনি সব খবরই রাখেন, দেখছি ।’

‘প্রায়ই আমি এখানে আসি । আমাকে এখানকার একজন বলে ধরে নিতে পারেন ।’

‘শুধু জলের চাইতে চা কিংবা শরবত কি ভালো নয় ? আপনিও চলুন না আমার সঙ্গে । বাইরে কোনো চক্রে কিংবা কাঁকা জায়গায় আমার পরিবারের লোকেরা

আছেন। তাঁদের তৈরী চা কিংবা শরবত। ঐ সঙ্গে আপনার পূর্ণ পরিচয়টাও জেনে নেব।

‘না, না আপনাকে ধন্যবাদ। কোনো পানীয়ের তৃষ্ণা নেই।’

‘তবে কি কেবল শিল্পশোভা দেখেই তৃষ্ণা মেটাবেন।’

বধুটি হাসলেন। ষাড় নেড়ে বললেন, ‘তৃষ্ণার অন্ত নেই। আপনি যান, সামান্য পানীয়ের তৃষ্ণা মিটিয়ে আসুন। এসে আমাকে এখানেই পাবেন।’

‘বড় অদ্ভুত তো আপনি। আপনার পরিচয়টা দিন। আপনি নিজেই কি শিল্পী? মহারাষ্ট্রেই কি আপনার জন্ম?’

‘তৃষ্ণা মিটিয়ে ফিরে আসুন। তখন পরিচয় দেব।’

বধুটিকে এখানে ছেড়ে চলে এলাম। চলতে চলতে মনে হল, মহিলাটি ছদ্মবেশে কোনো বিখ্যাত শিল্পী। কথাবার্তা আশ্চর্য মনোরম। কোনো দরিদ্র ঘরের বধু এমন সুন্দর শিল্পীজনোচিত কথা বলতে পারেন না। হয়ত আধুনিক কালের কোনো শিল্পীর স্ত্রীও হতে পারেন। শিল্পীর কাছ থেকে শিল্পসম্পর্কে গভীর জ্ঞান পেয়েছেন। কিন্তু, চেহারা এমন ফ্যাকাসে হল কেন? এই প্রশ্নটাই বারংবার আলোড়িত করতে লাগল আমাকে। তাঁর দারিদ্র্য এবং কচ্ছসাধন তবে কি স্বেচ্ছাকৃত?

বাইরে বেরিয়ে এসে পেলাম গাছ-গাছড়া নিয়ে রাজারাজড়ার মত পাহাড়ের ওপর প্রকৃতিকে। পাথুরে এই পাহাড়ের আনাচে কানাচে সবুজ গাছের কালো ছায়া। পাহাড় উঠে গেছে অনেক ওপরে। ওপরে ওঠবার রাস্তাও আছে।

গুহা আর গুহা। কিন্তু প্রধান গুহার মত অন্ধগুলি তেমন মহিমনয় নয়। দেখলাম, শিল্পতীর্থে আরো যাত্রী এসেছেন। প্রামোফন বাজিয়ে, হলা করে, চলচ্চিত্রের গান গেয়ে সময় কাটাচ্ছেন ওঁরা। আমার পরিবারের লোকদেরও পেলাম। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জরজর হয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন সকলে। সকলের মুখেচোখেই এই ভাব, বাউতুলে লোকটা আসছে না কেন?

সেই আমিই এলাম। উন্মনা ভাবটা কিছুতেই কাটাতে পারছি না। বারংবার মনে পড়ছিল অপর্ণা উমার মতই কচ্ছসাধিকা বধুটিকে। তাঁকে রেখে এসেছি প্রায়াক্ষকার গুহার। অপলক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শ্রীতি-মিথ্য উমার মুখের দিকে তাকিয়ে। কী আশ্চর্য রূপতৃষ্ণা তাঁর। পাষণ-মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে এক স্বপ্নরাজ্য থেকে আর এক স্বপ্নরাজ্যে যেতে যেতে আত্মহারা হয়ে আছেন।

কারো সঙ্গে আমি বেশি কথা বলতে পারলাম না। ছ’একটা কথা বলে বুঝিয়ে দিলাম যে, প্রধান গুহাই আমার একমাত্র আকর্ষণ। কিছু খাবার মুখে ও ছে দিয়ে চা গিললাম। সবাইকে বললাম, যে যার খুশিমত আনন্দ করো। আমাকে ফিরে যেতে হবে সেই গুহাতে, যেখানে পাথর ফুল হয়ে ফুটেছে, জীবন্ত হয়ে উঠেছে হরগৌরীর জীবনলীলায়।

সাত তাড়াতাড়ি করে ফিরে এলাম সেই জায়গায়। বধুটির পরিচয় নিতেই হবে। এখনো হয়ত অপলক চোখে ধ্যানস্থের মত দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

কিন্তু কী আশ্চর্য। বধুটি নেই। তাঁর ছায়ামাত্র নেই। আনাচেকানাচে কোথাও নেই। সেদিন সেখানে তাঁকে আর খুঁজেই পেলান না।

নানা জায়গা ঘুরে বেড়ানো আমার নেশা। আমার দেশটি যে অনন্ত রূপময়। তার জীবন্ত অধিবাসীরা আমার কাছে শিল্পেরই উপকরণ। এবং তার গুহায়, চৈত্যে, মন্দিরে যে ভাস্কর্য, স্থাপত্য আছে, সেগুলি বড় সুন্দর। বৌদ্ধযুগ থেকে ভারতের শিল্পসাধনার শুরু। ষষ্ঠপূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে গ্রীকরা ভারতে এসেছিলেন। গ্রীকদের শিল্পের সামান্য পরিচয় মেলে গাক্সার বা পণ্ডাবে। কিন্তু গ্রীকশিল্পের প্রভাব আর কোথাও গিয়ে পড়ল না। ভারতীয় স্তূপ বা গাঁচি স্তূপে যে শিল্প রয়েছে, তা একান্তই ভারতীয়।

বৌদ্ধ যুগ, হিন্দু যুগ, মুঘল যুগ ইতিহাসের রথে চড়ে একে একে বেরিয়ে গেল। কোনো যুগটাই কম নয়। অজস্র বা গাঁচি থেকে শুরু করে ক্রমে ক্রমে শত শত বছর পেরিয়ে ইলোরা বা কোনার্কের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে ভারতীয় শিল্পীরাই শেষে তাম্রমহল গড়েছিলেন।

এই সনাতন শিল্প দেখা আমার নেশা। কিন্তু সব সময় হয়ে ওঠে না। তাছাড়া, দেখারও বোধ হয়, শেষ নেই। ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য যে অকুরন্ত। হাজার হাজার স্থাপত্য, হাজার হাজার মন্দির। নদী আর সমুদ্রের তীরেই বেশির ভাগ মন্দির বা মঠের অবস্থান।

আছে বৈকি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও গীর্জা, মসজিদ বা প্যাগোডাকে কেন্দ্র করে স্থাপত্য আর সুন্দর ভাস্কর্যের কাজ। কিন্তু ভারতের, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের কতগুলি মূর্তি ও মন্দিরে এমন একটা সুনিপুণ কৌশল রয়েছে, যা পৃথিবীর অন্যত্র দুর্লভ। মূর্তি বা মন্দির নিম্নেরাই গান গাইতে পারে। মাছরাইতে মদনপত্নী রত্নির পাখরের মূর্তির ডান হাতে টোকা দিলে স্বরশ্রাব্যের প্রথম সুর তিনটি, সা, রে, গা, ধ্বনিত হয়। তাম্রের জেলায় বিষ্ণুর একটি ধাতব মূর্তি আছে, যার গায়ে কোনো ধাতু-দণ্ড দিয়ে টোকা দিলে স্বরশ্রাব্যের সাতটি স্বরই শোনা যায়। মূর্তি ছাড়াও দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি মন্দিরের সামনে সংগীতের স্তম্ভ বা ধাম আছে, যাদের গায়ে আঘাত করলেও স্বরশ্রাব্য ধ্বনিত হয়। পাথরে বা ব্রোঞ্জে এই জমাট-বাঁধা সংগীত পৃথিবীর একটি আশ্চর্য বস্তু বৈকি।

সেই যে বধুটিকে দেখেছিলাম এলিফেণ্টায় বা হস্তীদ্বীপে, তাঁর কথাই বলা যাক। তখন বর্ষাকাল। বসন্তেই আনি আছি। আরব সাগরের জল আকাশে কালো মেঘ হয়ে রোজই কোটি কোটি ধারায় ভেঙে পড়ছে শহরের ওপরে। বর্ষার গাছে ভিড় করছে কাক।

বধুটিকে কিন্তু শহরের বড় রাস্তায় অথবা গলিতে খুঁজে খুঁজে পাইনি। পেলাম এসে এক অখ্যাত গুহায়। গুহার নাম যোগেশ্বরী। রেলস্টেশনের নামটাও তাই।

কিংবদন্তী আছে, এই ধরনের গুহায় রণ-ক্লান্ত শিবাজী নাকি সন্নিবেশিত আশ্রয় নিতেন। মুঘল সৈন্যদের দৃষ্টিকে কঁাকি দেবার জন্যে এই সব গুহায় তিনি দিন কয়েক

কাটিয়ে যেতেন। 'হয়ত' এর অন্তেই তাঁর নাম ছিল পার্শ্বত্যাগ-মুখিক। কথাটার সত্যাসত্য ঐতিহাসিকেরা বিচার করবেন।

যোগেশ্বরী মাত্র একটি গুহা। গুহাটি যে খুব ছোট, তাও নয়। কিন্তু ভেতরে যে ভাস্কর্য আছে, তার আপেক্ষিক মূল্য কম। সারা ভারতে ঐক্যেই গুহাটি তেমন স্বনামধন্য নয়।

মাটির নিচে প্রায়াক্রমিক সেই গুহায় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। এমন সময় শুনলাম, কিছুদিন আগের হারানো কণ্ঠস্বর।

'তাহলে এখানেও এসেছেন আপনি?'

চমকে চেয়ে দেখি সেই বধূ। অবিকল একই বেশ। নিরলংকৃত অবয়বের শিথরে ফ্যাকাসে ঐ ককণ মুখখানি। শাড়িখানি আজো ছাইরঙের। বৃষ্টির জলে অন্ন অন্ন ভেজা শাড়ি আর শরীর।

'সেদিন এলিফেণ্টায় আপনাকে আর খুঁজে পেলাম না।' আমি বললাম।

'আমি চলে এসেছিলাম।'

'আজ আপনাকে পেয়েছি। পরিচয় না দিলে ছাড়ব না।'

'কি হবে পরিচয় দিয়ে?'

'আশ্চর্য, সেদিনের মত আজো মনে হচ্ছে যে, আপনি জীবন্ত নন।'

'তবে আমি কি?'

'নিজের পরিচয় নিজেই দিন।'

'আজ নয়, আর একদিন দেব।'

'আর একদিন পাব কোথায় আপনাকে?'

'আমি সমস্ত শিল্পতীর্থই ঘুরে ঘুরে বেড়াই। কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।'

'হয়ত আর পাব না।' আমি বললাম।

'আশা তো রাখতে পারেন।'

'আজ আপনার সঙ্গে কে এসেছে?'

'কেউ না, আমি একাই এসেছি।'

'গুহার ওপরে গিয়ে সবুজ ঘাসে বসবেন?'

বধূটি সহসা চমকে উঠলেন। 'না, না, না, আমি যেতে পারব না। আপনি যান।' আর্তনাদের সুরে তিনি বললেন।

তাঁর চাপা আর্তনাদে গুহাটি যেন ফিস ফিস করে উঠল। ভাষণ লক্ষ্য অনুভব করতে লাগলাম। না জানি, কী মনে করেছেন আমাকে।

অথচ, পরক্ষণেই শুনলাম, তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর।

'অপরাধ নেবেন না। আমি ঐ রকমই। জীবনটা আমার দুঃখের। আমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন। মাঝে মাঝে লোকের সঙ্গে বিসদৃশ ব্যবহার করি। অনেক দুঃখ পেয়েছি বহলইনা মেজাজ সব সময় ঠিক থাকে না।'

'ঐ রকম একটা প্রস্তাব করে অপরাধ তো আমিই করেছি। বুঝতে পারছি আমার অন্তরটা।'

বধূটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এক একবার মনে হতে লাগল, এই বুঝি তাঁর দুঃখের কাহিনী ঝরঝর করে বলতে শুরু করবেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সামলে নিয়েছেন নিজেকে।

‘আপনি কি বসেতেই থাকেন?’ তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম।

‘হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন বলুন তো?’

‘প্রশ্নের জবাবটা দিন না।’

এইবার স্নান একটা হাসি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

‘সুরিয়ে ফিরিয়ে আমার পরিচয়টা জানবার ইচ্ছে করছেন কেন?’

‘না, আর প্রশ্ন করব না। আমি নিরস্ত হলাম।’

বুট্টি ধরে এসেছিল। ক্রমেই গুহার ভেতরের অন্ধকার ভাবটা কেটে আসছিল। অবিশি, অন্ধকার যে একেবারে কাটবে না, এ তো জানা কথা। মাটির নিচের বড় একটা গহ্বর। তাতে থাকবেই ঈষৎ আলো, ঈষৎ অন্ধকার।

ছেড়ে এলাম বধূটিকে। আর সাহস হয়নি, গুহা থেকে একসঙ্গে বেরোবার অসুযোগ জানাতে। তিনি যে লজ্জা-পরায়ণা, এতে আমার সংশয় নেই। অথচ, কী মাজিত কথাবার্তা। যদিও যোগেশ্বরী গুহায় শিল্পসম্পর্কে কোনো আলাপ-আলোচনার দিকও নাড়াইনি আমরা।

কালো রঙের পর্দাখানি, অর্ধাৎ যবনিকা উঠল আশ্রয় আবার।

মাসুকের জন্তে এত বিস্ময়ও আছে। আশ্রয় এসেছিলাম, তাজমহল দেখতে। পুণিমা রাত্রে নয়, অমাবস্য়ায় তাজ দেখতে এসেছিলাম। মসৃণ-মর্ম্মরে তাঁদের আলো যে ঠিকরায়, তা জানি। কিন্তু অমাবস্য়ার তারাগুলি মর্ম্মরের ওপর কী রহস্য সৃষ্টি করে, তা-ই দেখতে এসেছিলাম।

অন্ধকার রাত। তাজের বাইরে, তোরণে কে একজন চামেলী ফুলের মালা বেচছিল। তার কাছ থেকে মালা নিয়ে, শহরের বিজলি আলোর কৃত্রিম জ্যোৎস্নাকে ভিড়িয়ে, ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

গুল্মের মত ছোট ছোট গাছগুলোকে মনে হচ্ছিল কালো ওড়নায় ঢাকা পরীর দল। পায়ের একটু শব্দ পেলেই পরীরা ঝেঁড়ে যাবে। অথচ শেষ পর্যন্ত ওরা উড়ল না। উপবনে বসে বসে নিঃশব্দে দেখতে লাগল আমাকে।

ঝাঁকড়া-মাথা একটি গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিছুটা দূর থেকেই তাজকে দেখা ভালো। কাছে গেলে যে পূর্ণ দৃষ্টি সম্ভব হয় না।

সাদা, অস্পষ্ট তাজ। তার অবয়বটা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু অলংকারকে দেখা যাচ্ছে না। আকাশে মেঘ নেই, কেবল তারা আর নীহারিকা।

কতোক্ষণ যে অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম, জানি না। হঠাৎ চমকিত হলাম। কাছেই কে একজন ফস্ করে দেশলাই জ্বলে একটা মোমবাতি ধরলো। ঐ আলোর দিকে মাত্র মুখ ফিরিয়েছি, অমনি মোমবাতি গেল নিভে। আর তৎক্ষণাৎ ক্রান্ত হেঁটে কে একজন আরও কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো। একটি নারীমুতি। আমি বিহ্বলবেগে ঘুরে দাঁড়ালাম।

‘আজ রাতে আপনি যে এখানে ?’ প্রশ্ন করল নারীকণ্ঠ ।

‘কী আশ্চর্য । আপনি কেমন করে ?’ বিস্ময়ে ভিগগেস করলান আমি ।

সত্যি বলতে কি, বিস্ময়ের চাইতেও বেশী অসুভব করছিলাম ভয় । সেই ফ্যাকাসে মুখ । আজো একই ধরনের বেশভূষা । অন্ধকারেও তাঁর চোখ জ্বলছে ।

‘এ অসম্ভব । একা একা এত রাতে এখানে কেন ? কে আপনি ?’

‘আপনিই বা এখানে এত রাতে কেন এসেছেন ?’ তিনি প্রশ্ন করলেন ।

চুপ করে গেলাম । তাঁর প্রশ্নের উদ্ভীতে ঝাঁজ আছে । তা ছাড়া, সমস্ত বিষয়টা তলিয়ে দেখবার মতই । চুপ করে ঝাঁড়িয়ে ঝাঁড়িয়ে নিজের অজ্ঞায়ের দিকটা ভাবতে লাগলাম ।

তবে ? আমি শিউরে উঠলাম । অজ্ঞায়টা কি তবে প্রথম থেকে আমারি ? কী লজ্জাকর ব্যাপার ! এলিফেণ্টাতে তাঁকে প্রথম দেখার পর থেকে আমিই কি তবে রূপ-বিমুগ্ধ ? যোগেশ্বরীতে আমিই কি তবে তাঁকে অসুসরণ করেছিলাম ? এবং শেষ পর্যন্ত নুকিয়ে নুকিয়ে এখানেও অসুসরণ করেছি । কোথায় বসে আর কোথায় আশ্রয় ? উনি আশ্রয় যাচ্ছেন ভেনেই কি আমি আশ্রয় রওনা হয়েছিলাম ?

আমার মনের ভেতরে কে যেন ধিকার দিয়ে উঠল আনাকে । তার হাসির অফুট আওয়াজ শুনছি মনে মনে । আমার ভেতরে বসে যে হাসছিল বঁকা হাসি, সে-ই চাপা কণ্ঠে বুঝি অবশেষে বলে ফেলল, ‘কেমন এবার জবাব দাও ।’

‘আমাকে কমা করবেন । বিস্ময় করুন, আমি আপনার অসুসরণ করিনি ।’

‘আমি কি বলেছি যে, আপনি আমার পেছন নিয়েছেন ?’ শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন ।

‘আমি জানতাম না, আজ এই সময় আপনিও তাজ দেখতে আসবেন ।’

এত অসুতপ্ত হচ্ছেন কেন ? আসুন না, দুজনে মিলেই তাজ দেখি ।

কী শান্ত নিলিপ্ত কণ্ঠ তাঁর । কাছাকাছিই ঝাঁড়িয়ে আছেন । হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় । তাঁর শাড়িটা বুঝি বাতাসে কাঁপছে । হয়ত কাঁপছে না । ওটা আমার আবেগময় মনের একটি ধারণা মাত্র ।

তবে কে ইনি ? প্রথম দিনের প্রথম দর্শনের কথা মনে এল । এলিফেণ্টা দীপে যেদিন ঐতিহাসিক, শরম-বিহীন উমার মুখের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন । নিজেও তিনি কী রকম তৃষ্ণার্ত হয়ে পাথরের উমার দিকে চেয়ে রয়েছিলেন । সেদিন স্পষ্টই আমার ধারণা হয়েছিল যে, বধূটি জীবন্ত নন । ফ্যাকাসে একটি করুণ মুখে কী অস্বাভাবিক দীপ্তিতে তৃষ্ণা-কাতর তাঁর হাট চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল ।

ঠিক এ-ধরনের চিন্তায় চিন্তায় আমি উন্মনা হয়ে পড়েছিলাম । হঠাৎ বধূটির কণ্ঠস্বর শুনলাম, ‘এবার আমি বাই, সময় হয়ে এসেছে ।’

আমার সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে মিলিয়ে গেলেন । যখন অন্ধকারে একেবারে মিলিয়ে গেলেন, তখন আমার চেতনা হল যে, তিনি আর সামনে নেই ।

আর তাঁকে কোনোদিন দেখিনি। একথাও সত্য যে, কোনো শিল্পতীর্থে এরপর আমি যাইনি। শিল্প-তীর্থেই তো তাঁকে দেখার কথা। সুতরাং, কোনো শিল্পতীর্থে না-গেলে কী করে তাঁকে দেখা যাবে।

এই কাহিনী যারা পড়বেন, তাঁরা বলবেন, সমস্ত ঘটনাই অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, ভৌতিক। আমিও স্বীকার করি যে, সকলের অবিশ্বাসকে ভুড়ি মেরে ওড়ানো অসম্ভব।

তবু একটা 'কিস্তি'কে কোনোমতেই ওড়ানো যাবে না। এই কিস্তিটার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রয়েছে শিল্প এবং রসবোধের। আশ্চর্য-সুন্দর কোনো প্রাচীন ভাস্কর্যের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে বাস্তব জগতের জ্ঞান স্বভাবতই লোপ পায়। তখন অন্তরীক্ষ থেকে দর্শকের চোখের ওপর আলোর ছাছ এসে পড়ে।

চোখের সেই ছাছ নিয়ে দর্শক দেখতে শুরু করেন। চোখের সামনে একটা প্রাচীন কাল উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। দেখা যায় একাধ্রমনা সে যুগের খোদ শিল্পীকে। বছরের পর বছর নিবিষ্ট মনে শিল্পের কাজ করে যাচ্ছেন। ওদিকে শিল্পীর বিরহিনী বধুকেও দেখা যায়। অনন্ত প্রেমভুজায় কাতর হয়ে, যে বধু, নগরের এক কোণায় কোনো কুটিরের দাওয়ায় বসে, নীরবে চোখের জল ফেলছেন। সে যুগের উপেক্ষিতা বধু।

তবে আমি কি এলিফেণ্টা দ্বীপে ঐ ধরনের কোনো মৃত বধুর ছায়াকেই দেখেছিলাম। হয়ত হতেও পারে। তাঁকে সূর্যালোকে আসতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও ছ' ছ'বার তিনি প্রস্তাবে রাজি হননি। তাঁর মুখটা ছিল বৃতারই মত। অথচ, শিল্প সম্পর্কে যেন জাতিশ্রম ছিলেন।

আসল কথা হয়ত তা-ও নয়। ঐ বধুটি আমারি ক্ষুধিত হৃদয়ের ছায়ামাত্র ছিলেন। শিল্পক্ষেত্রে যখন উন্মনা হয়ে পড়েছিলাম, তখন আমারি রূপভুজার অদৃশ্য আলোকে চলচ্চিত্রের ছবির মত কুটে উঠেছিলেন।

সত্যি বলতে কি, সত্য ব্যাখ্যা দেবার ক্ষমতা আমার আক্ষেপে আসেনি।

অসত্য পৃথিবী

শিশিরকুমার দাশ

রাত্রির অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভারী ইশারানয় মনে হয় রাতের ট্রেনের শব্দ। দূরের স্টেশন থেকে বাতাসে ভেসে আসছে ট্রেনের বাঁশী। শিরশির করে হাওয়া ডালে ডালে মর্মর ভুলে এগিয়ে আসছে। ঘুম আসেনা চোখে—এমন সময় রাতের ট্রেনের বাঁশী মনটাকে হঠাৎ সতর্ক করে তোলে।

অরুণা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল। ঘুম এখনও আসেনি তার। আত্ম নতুন এসেছে এই জায়গায়। নতুন জায়গায় ঘুম, একটু কেমন যেন লাগছে তার। মাটির সৌন্দর্য গন্ধ আসছে। নতুন বড়ের ছাওয়া চাল থেকে ঝট্টভেজা একটা মিষ্টি সুবাস উঠছে। অরুণার মশারীর ভেতরে একটা জোনাকী চুকে পড়েছে। জলজল করে জলছে ছোট পতঙ্গটি। দূরের লেবুগাছের তলায় একঝাড় জোনাকী ঘুরছে ফিরছে। এই অপরিচিত, অজানা ছোট মফঃস্বল শহরের একটি নেয়ে-ইস্কুলের বোর্ডিং-এর অন্ধকার ঘরে অজস্র ভাবনার ঢেউ উন্মাদ হয়ে আছড়ে পড়ছে বারবার। জীবনের অনেক কথা যেন রাত্রির স্তব্ধতায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। মিসট্রেস অরুণা দস্তের চোখে ঘুমের রেখাটুকুও হারিয়ে যায়। নিশ্চিত বিশ্বাসে সবাই যখন মগ্ন, তারার অতল প্রহরায় বিশ্বজগতের পথে ঘাটে এক গাঢ় ঘুমের ছায়ায় বিস্তারিত তখন অরুণা দস্তের মনপ্রাণ একটা অজানা সংশয় ও সংকোচে উদ্বেল হতে থাকে। ভয়ের কোন কারণ নেই, সংশয়ের কোন যুক্তি নেই, কারণহীন, যুক্তিহীন উদ্বেল দোলাবর্তের মধ্যে অরুণা দস্তের কানে আসে রাতের রেলগাড়ীর শব্দ। হঠাৎ একটা একটানা শব্দ, তারপর হঠাৎ স্টেশনের ধারে থানা, দুটি চারটি প্রাণীর কলস্বর, আবার একটি দুটি ঘণ্টার শব্দ, তীব্র বাঁশীর আওয়াজ। ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় সেই রাতের রেলগাড়ী। বাতাসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভেসে আসে একটানা ঝিকঝিক। তারপর পরম ক্রান্তিতে ঝিমিয়ে পড়ে বাতাস। নিস্তব্ধ অন্ধকারে মর্মর বাজে শালের পাতায় পাতায়। সেই আশ্চর্য স্তব্ধতায় ঘুম ছড়িয়ে যায় দিকে দিকে। অরুণা দস্তের ক্রান্ত চোখের পাতাছটিও বন্ধ হয়ে আসে।

সকালবেলা তার ঘুম ভাঙল তিলোত্তমা। তিলোত্তমা এখানকার দাসী। অল্পাল্প মিসট্রেসরা ডাকেন তালোত্তমা বলে। ‘উঠে পড় দিদিমণি।’ ভোরবেলা উঠে মনটাকে যথাসম্ভব প্রস্তুত করল অরুণা। অল্পাল্প মিসট্রেসদের সঙ্গে কথা হল দুপাঁচটা। অরুণার কিন্তু মনটা কেমন কেমন করছে। ইস্কুলে নতুন এসেছে সে কাল থেকে। প্রথমদিন স্কুলে তার ভাল লাগেনি। জায়গাটাও খুব ভালো লাগছে না তার। কলকাতায় কলেজ জীবন কাটিয়ে হঠাৎ এই মফঃস্বলে আসাটাকে ঠিক মনে নিতে পারছে না অরুণা। একটা ক্রান্তির ছায়া তার মুখের ওপর ছড়িয়ে আসছে। কাল স্কুলে তিনটে ক্রাশে পড়িয়েছে। অরুণা ইংরেজি পড়াবে, ইতিহাস পড়াবে। ইতিহাসে সেকেন্ড ক্রাশ অনার্স প্রাক্‌টিক্যাল অরুণাকে একটু ঈর্ষার চোখে দেখলেন

অন্যান্য মিসট্রেসরা। স্কুলে অনার্স প্রাজুয়েট কেউ নেই। দুজন এম, এ, আছে খার্ড ক্লাশ। বাঁকা চোখে তাকালেন ইংরেজির আরেক মিসট্রেস বনানী। প্রথম কথা হল : ‘আজ জয়েন করলেন বুঝি।’ ‘হ্যাঁ’—অরুণা যথাসম্ভব মিষ্টি করে উত্তর দেয়। বনানী বললে : ‘আপনার কথা কদিন ধরে শুনছি, সুরমাদি বলছিলেন সেদিনও। এখন আছেন কোথায়।’ অরুণা বলল : ‘এখানে আমার এক দূর সম্পর্কের পিসিমা থাকেন। সেখানেই উঠেছি। তবে আজই চলে আসছি বিকেলে। জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি বোডিং-এ।’ বনানী বললে : ‘সেই ভালো ভাই চলে আসুন। কিন্তু হঠাৎ এই জায়গায় চলে এলেন যে কোলকাতা ছেড়ে।’ মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকালো আরেকবার।

অরুণা হাসবার চেষ্টা করল : ‘চাকরী যখন করতে হবে তখন টাকা যেখানে বেশী...’ বনানী বোধহয় আর কথা বলার দরকার বোধ করল না।

সুরমাদি একটু খিটখিটে লোক। এখানে রাস্তার লোকেরাও বলে—মাষ্টারনী। সুরমাদির স্বামী এখানকার প্রায় জমিদার। সান্তালদের বাড়ির কাঠের গোলায় কাজ করেন। সুরমার প্রথম কথাই হোল : ‘কেমন লাগছে এখানে।’

বিনীতভাবে অরুণা বলল : ‘প্রথমদিন তো। ঠিক বলা যাচ্ছে না। দিন কয়েক কাটুক।’ সুরমা বলল : ‘হ্যাঁ দেখ, তারপর হঠাৎ যেন চলে যেও না। আত্মকাল তোমরা যা সব হয়েছে। আর ইকুলের পক্ষে কি রকম হাস্যামা বলত।’

অরুণার কথাগুলো খুব ধারাপ লাগল। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়ল বাড়ির কথা। ‘মা, আর ছোট ভাই বোন দুটির কথা। কোলকাতার আলোহীন অঞ্চলের ছোট একটা ঘরে দণ্ডে দণ্ডে আত্মকালের নিগ্রহটুকু হঠাৎ স্পষ্ট আলোয় যেন ধরা পড়ল।

সুরমার কর্কশ কথার ধারে যেন ছিঁড়ে গেল তার জীবনের ওপরের একটা মুখোশ। সত্য বড় কঠিন, কঠোর রূপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। ‘মা-ত বাধা দিয়েছিলেন। হয়ত আজই মা একটা চিঠি লিখবেন রাত্রে : অরুণা ফিরে আয়, তোর বাবা থাকলে তিনি কি তোকে ইত্যাদি। কিন্তু অরুণা জানে মা এমন অনেক চিঠি লিখবেন, চোখের জলের অঙ্করে। অরুণা স্নান হাসি হাসবে, উত্তরও দেবে : না মা বেশ আছে। ভালই আছে। কোন ভয় নেই। ছুটিতে যাবো। গীতা আর বকুলকে ভালোবাসা জানিয়ে চিঠিও শেষ করবে।

অরুণা সুরমাকে বলল : ‘না এ কি আর সখের জন্ত এসেছি। প্রয়োজন ত।’ সুরমা বললে : ‘হ্যাঁ কিন্তু বেটার চালের জন্তে তোমরা সব প্রস্তুত থাকো কিনা। আজকালকার মেয়ে তোমরা। এই দেখোনা আমরা যখন এখানে প্রথম আসি। উনি এখানে কাঠের ফার্মে এসে বসলেন আর আমি স্কুলে। একদিনও নড়িনি চড়িনি।’

অরুণা চুপচাপ কথাবার্তা শোনে। যাবার সময় সুরমা বললে : ‘দেখ. নতুন বলেই বলে দিচ্ছি। সাবধানে থেক। দেখ ইকুলের নামের ওপর কিন্তু...’ অরুণা চমকে ওঠে : ‘কি বলছেন আপনি বুঝছি না তো।’ সুরমা তার রুক্ষ চুলের ওপর ছোট চিরুণী চালাতে চালাতে বললে : ‘বুঝবে কিন্তু সাবধানে থেক। আচ্ছা এখন এস।’

ভারী ভারী পায় মিসট্রেস অরুণা দত্ত এগিয়ে চলেছে ক্রাশের দিকে। একটা শতাব্দীর জালা তাকে যেন ঘিরে ফেলেছে। চলতে যাচ্ছে, চলতে পারছে না। ঘড়ির দিকে তাকায়—ক্রাশের ঘণ্টা বাজছে। মিসট্রেস অরুণা দত্তের পা আরো ভারী হয়ে যাচ্ছে। একটা যুগের সমস্ত হতাশা তারই বুকে এসে জমা হচ্ছে। সে যেন চলেছে একটা বড় মাঠের মধ্য দিয়ে—শেষ হয় না কখনও। একটা আলোহীন সংকীর্ণ পথ দিয়ে সে চলেছে। তার সমস্ত আশাগুলিকে ভেঙে ঝঙ ঝঙ করে, ভাবনাগুলিকে তালগোল পাکیয়ে। ছপুরের নিস্তরূ রোদ ভাঙাগরাদের কাঁক দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। সেই কাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ইংরেজির মিসট্রেস বনানীর হাসি। কাঠের গোলার ম্যানেজারের বৌ সুরমার কথা। সাবধানবাণী। সমস্ত ঠেলে ঠেলে ঘণ্টা বাজছে। ক্রান্ত ভীকু পায়, একটা ক্রান্ত যুগান্তের মতো মিসট্রেস অরুণা দত্ত এগিয়ে যাচ্ছে।

ক্রাশে চুকে ছয়েক মুহূর্তের মধ্যে মন তৈরী হয়ে গেল। মেয়েগুলি মোটামুটি ভালই। ছুটু কেউ কেউ, কিন্তু খারাপ নয় কেউ। ভারী ভালো লাগল। প্রথম দিন বই খুলতে তারই ভালো লাগল। মেয়েরা আরো খুশি। ক্রাশে চুকে বসতে না বসতেই হঠাৎ নিভে এল রোদের গান। একটুকরো কালো মেঘের ছায়া আস্তে আস্তে ঘিরে ফেলল আকাশ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঝমঝম ঝট্ট নামল। ঝট্টের মধ্যে অরুণা তার ছাত্রীদের সঙ্গে ভারী নিবিড় হয়ে এল। সবাই গল্প শুনতে চাইল। গল্প বলুন—কেউ বললে ভুতের। কেউ রূপকথা। অরুণা খুব খুশি হয়ে উঠল, বলল, আর আমিই শুধু বলব না। তোমারাও বলবে। আমরা গল্প করি। নানান কথাবার্তা প্রমাদি করে এক ঘণ্টার মধ্যে সকলের প্রিয় অরুণাদি হয়ে উঠল। বর্ষার কালো ছায়ায় সেদিন অরুণার সমস্ত ক্ষত হারিয়ে গেছে আড়ালে। তাই, কয়েকটা মুহূর্ত আজ সে আবার প্রাণের ড্রাণে তপ্ত হয়ে মুখরিত হয়ে উঠেছে। তারপর আবার সেই ঘণ্টা বাজল। ক্রাশের বাইরের জলেকু ছাঁটে ভেজা করিডর বেয়ে ফিরে এল অরুণা।

বিকলে বাড়ি যাবার আগে বনানী বলছে : ‘উঃ খাটতে খাটতে মরে গেলাম। যতসব জুটেছে। অন্যদের মত গল্প করেতো আর কাটাতে পারি না।’ পানের ডিবে থেকে পান বার করে মুখে পুরল বনানী। অরুণাকে দেখে বলল, ‘এই যে আসুন, আসুন। তা আজ কি পড়ালেন ওদের। আমি ওদের প্রায় সব শেষ করে দিয়েছি। আপনি আসার আগে আমাকেই নিতে হোত কিনা।’ কথাগুলো ভালো লাগল না অরুণার।

মায়া এসে অরুণার হাত ধরল। ‘ও আপনি এসেছেন আজ থেকে। যাক বাঁচা গেল। বোডিংটা বড় কাঁকা কাঁকা লাগে।’ বনানী মুখ বাঁকালো, ‘কেন, বোডিংটা কেন, তোমার তো সবই-কাঁকা লাগে। অত কবিত্ব কেন বাপু।’ মায়া হাসলো : ‘যা বলেছ বনানীদি। তুমিত তোমার পানের কোটো নিয়েই ঘরের মধ্যে দিনরাত। আমি একা কি করি বলত। শক্যো হতে না হতেই নাক্ ডাকাচ্ছ।’ অরুণা হঠাৎ হেসে ফেলল। বনানী ভীষণ চটে গেল। ‘খুব হাসছেন যে। কলকাতার মেয়েগিরি এখানে চলবে না, দেখবেন।’ বনানী গজগজ করতে করতে চলে গেল। মায়া প্রায় জড়িয়ে ধরল অরুণাকে। ‘আপনাকে আমার দেখেই ভালো লেগেছে।’

‘ওকি ভাবছেন, আরে বনানীদি ওই রকম। চলুন চলুন আপনার ঘরটা আমি গুছিয়ে টুছিয়ে দি।’ অরুণা হেসে বলল : ‘না না আপনি কেন, আর গোছাবার কি বা আছে।’ মায়া ঠোঁট ফুলিয়ে বলল : ‘হ্যাঁ আমিই গোছাব, আমাকে বেশি রাগাবেন না বলে দিলাম।’ অরুণা হেসে ফেলল।

টিপটিপ করে তখনও বৃষ্টি পড়ছে। ইকুলের কম্পাউণ্ড ছাড়ায়নি ছুজনে। হঠাৎ একটি লোক সিন্ডের পাঞ্জাবি পরা—দাঁড়িয়ে গেল। মায়া গভীর হয়ে গেল। লোকটি এগিয়ে এল : ‘ও আপনি বুঝি নতুন এসেছেন। হেঁ।’ অরুণা প্রতি-নমস্কার করে একটু অবাক হয়ে গেল। ‘আঃ আমায় চিনলেন না। আমি আপনাদের হেডমিস্ট্রেসের-এ এ।’ অরুণা ব্যস্ত হয়ে বলল : ‘ওহো আমি ঠিক চিনতে পারিনি।’ ‘তা নতুন আর চিনবেন কি করে। হেঁ হেঁ’ শানিত দৃষ্টিতে তাকালেন। মায়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। ‘মানে আমাদের সেক্রেটারি মশাই কাল আপনাকে চায়ের নেমস্তম্ব করেছেন। যাবেন আপনি সকালবেলায়।’

‘কাল সকালে—কিন্তু।’

‘কিন্তুর ব্যাপার নেই। আপনি যাবেন—তিনি আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন যে। ঐ মাঠের পারে সাদা দোতলা বাড়ি। আচ্ছা হেঁ হেঁ।’ মায়ার দিকে তাকিয়ে একটা হাসি ছুঁড়ে দিলেন।

অনেকরাত অবধি মায়ার সঙ্গে গল্পগুস্তাব হল। রোগা কালো মেয়েটি। সবসময় হাসে। বাংলা পড়ায়। ভারী ভালো লাগল অরুণার। ভাব হয়ে গেল তার। তারপর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল অরুণা। কিন্তু কিছুতেই পারে না। তার ছাব্বিশ বছরের ধরে-রাখা-যৌবন কাঁপতে থাকে—তাকে জ্বকুটি করে, ব্যঙ্গ করে। মেয়ে হয়ে জন্মানোর একটা অভিশাপ আবিষ্কার করে রাত্রির অন্ধকারে। শুকিয়ে আসে অনেক স্বপ্নের ফুল। তার সমস্ত মনের একটা আকাঙ্ক্ষা জ্বলে ওঠে। কিন্তু সব মিথ্যে, মিথ্যে। চাইনা চাইনা। গভীর ক্রন্দনে কেঁপে ওঠে। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে। ইতিহাসে অনার্স প্রাক্সুয়েট একটি আধুনিকা। ইতিহাসের একটি উপেক্ষিত ঘটনা। কাঁদতে কাঁদতে শুনতে পায়—রাতের বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে ভেসে আসছে ট্রেনের ঝিকঝিক শব্দ। হাওয়ায় হাওয়ায় ঝিলিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে। তারপর সব স্তব্ধ। একটানা ঝাঁঝের শব্দ।

সকালবেলা তিলোত্তমা বলে, ‘হ্যাঁগা দিদিমণি। অত ভাবো কি দিনরাত। এসেই দেখছি ভাবনা আর ভাবনা।’ অরুণা হঠাৎ যেন ছেলেমানুষ হয়ে উঠল তিলোত্তমার স্নেহস্বর শুনে।

‘আচ্ছা তিলোত্তমা পুকুরে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে আসি চল।’ তিলোত্তমা তিনটের বেশি ডুব দিতে দেবে না। ‘ওমা যদি নতুন জলে অসুখবিসুখ করে তখন কাঁকে সইতে হবে শুনি। সবইত এই পোড়ারমুখীকে। না উঠে এস। তোমার দিবি।’ ভালো লাগে অরুণার। শাড়ি বদলে বেরোচ্ছে। তিলোত্তমা বললে : ‘ওকি চলে কোথাগো।’

অরুণা বললে, ‘সেক্রেটারীর কাছে। সুরমাদির স্বামী এসেছে হরিবাবু—তার

সঙ্গে ।’ তিলোত্তমা চোখ বড় বড় করে বললে : ‘ও মিন্‌সের কাছে কি । না না ওসব চলবে না । যেওনা বলে দিলাম । ও বড় খারাপ লোক কিন্তু ।’ অরুণা বললে : ‘খারাপ লোকত’ আমার কি তিলোত্তমা । আমি এসেছি কাজ করতে ।’ মায়া পেছনে এসে দাঁড়াল ।

সেক্রেটারী শঙ্কর সান্তাল এ অঞ্চলের ধনী তনু লোক । নানা অঞ্চলে তাঁর প্রতিষ্ঠা । লোকজন সম্মানও করে । সুন্দর বাড়িটা তাঁর । বয়স হয়েছে ভদ্রলোকের । বেশ শাস্ত সোম্য দেখতে । দামী কার্পেটে তাঁর বসবার ঘর মোড়া । অরুণার জন্মে তিনি প্রায় প্রতীক্ষা করছিলেন ।

আমুন আমুন । গাদরে অভ্যর্থনা জানালেন শঙ্কর সান্তাল, অরুণা নমস্কার করে বসল । কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেশ আলাপ জমে উঠল । তিলোত্তমাটা যেন কি । পাড়ারগায়ের নেয়েত । বারো বছরের ছেলে দেখলেও ঘোমটা দেয় । ভদ্রলোক বেশ চমৎকার ।

যতক্ষণ আলাপ হল হরিবাবু বসে রইল বাইরের ঘরে । শঙ্করবাবুর মা নেই । এক পিসিমা আছেন—তিনি এসে অরুণাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন—গল্প করলেন কিছুক্ষণ । শঙ্করবাবুর ছোটভাই আছে । কলকাতাতেই সাধারণত থাকে । এখানে এসে আছে কিছুদিন । হঠাৎ খেয়াল হল ইস্কুলের সময় হয়ে গেছে । তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল অরুণা । শঙ্কর বললেন—‘ইস্কুলে যাবার জন্মে অত তাড়ার কি আছে । ওসব ভাববেন না ।’ অরুণা ব্যস্ত হয়ে বলল : ‘না না তাকি হয় ।’ শঙ্করবাবু বললেন : ‘আচ্ছা এখন আমুন তাহলে । সময় পেলেই মাঝে মাঝে আসবেন ।’ অরুণা আর বোডিংএ ফিরল না । সোজা ইস্কুলে এসে পৌঁছল । পথে আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল ।

ও পথে চলে যাচ্ছে—যুগাক না ।

পথের বাঁক নিল—মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেল । হ্যাঁ যুগাকইত । পা ছটোকে টানতে টানতে নিয়ে এল ইস্কুলের দরজায় । ঘণ্টা পড়ছে । বনানীর সঙ্গে দেখা । ও এই যে এসেছেন তাহলে । আমরা ভাবছিলাম আসবেন না । অরুণা ভাবল কিছু শুনিয়ে দেয় । আসতে না আসতেই মেয়েটা পেছনে লেগেছে, আশ্চর্য । সুরমা বলল : ‘সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা হল ।’ ‘হ্যাঁ ।’ মায়া চুপি চুপি বললে : ‘তিলোত্তমা ক্ষেপে গেছে আপনার’ পর—তাড়াতাড়ি গিয়ে খেয়ে আসবেন বুঝলেন ।’ ‘আচ্ছা ।’ বিকেলে তিলোত্তমার বকুমী খেয়ে কিছু খেয়ে দেয়ে একা একা বেড়াতে বেরোল অরুণা । চোখ দুটো মেলে কাকে যেন নিশ্চিত আশ্রয়ে খুঁজছিল । দেখাও মিলল । ওদিকে রাস্তা দিয়ে আসছিল যুগাক । একটু থমকে দাঁড়াল সে । অরুণা ততক্ষণে কাছে এসে গেছে । যুগাক উদ্ভাসিত আনন্দে জিজ্ঞাসা করল : ‘তুমি এখানে কবে এসেছ ?’

‘আমি এসেছি হুদিন । চাঁপাতলা বালিকা বিদ্যালয়ের—’

‘ও তুমিই এসেছ তাহলে । হ্যাঁ শুনছিলাম । ভালো আছ ?’

‘আছি । তুমি ?’

শুগাঙ্ক হাসল। শুগাঙ্ক হয়ত আরো কিছু বলত। তার চোখেমুখে অনেকগুলো কথা ঘুরছিল। অরুণাও কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। সন্ধ্যাবেলার একটা ট্রেনের শব্দ ভেসে এল। শুগাঙ্ক একটু চুপ করে দাঁড়ালো।

কেমন লাগছে।

লাগালাগির কি আছে। চাকরী যখন করতে এসেছি তখন ওসব। শুগাঙ্ক একটা বেখান্না প্রশ্ন করল : ‘চাকরী কেন করছ আর কিছু করা যায় না?’ ট্রেনের শব্দটা এবার ধীরে ধীরে বোধ হয় মিশে যাচ্ছে। অরুণা হাসল : ‘আচ্ছা আসি।’

নির্জনে অন্ধকারে এসে ঘরটাতে বসল। তিলোত্তমা আলো জ্বলে দিয়ে গেল। চুপচাপ বসে রইল অরুণা। মায়ের চিঠি এসেছে। বোনের অসুখ। ভাইটা পার্টির কাজ করে, কখন কোথায় থাকে। তুই ফিরে আয়। কি দরকার চাকরীর। তিনি থাকলে—

ভীষণ রাগ হয় অরুণার। বাবা থাকলে কি হোত ভেবে কি লাভ। চাকরী ছাড়া আর কি উপায় আছে। চাকরী ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

না, ছিলইত। সমস্ত জীবন ধরে তাইইত চেয়েছি। চেয়েছি কিন্তু পেয়েছি কোথায়। কতবার রাত্রির অন্ধকারে ছাদে ঘুরে ঘুরে মনে হোত জীবনে শুধু ওই আশ্রয়টুকুই চাই। কিছু চাই না। সব ধুলোয় মিশে গেছে। পথের জন্তে আমি। আমার ঘর নেই, সংসার নেই, আমি মাটির। আমি অসহায় পৃথিবীর। প্রবল যন্ত্রণায় বুক ফেটে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছিল তার।

বিছানায় শুয়ে পড়ল। কঁদতে কঁদতে ভিজে গেল বালিশ। হঠাৎ কার ছোঁয়ায় চোখ তুলে তাকাল। মায়ী বসে আছে। কঁদছে অরুণাদি। অরুণা মায়াকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বাইরের অন্ধকার যেন ভেতরেও ঘন হয়ে এল।

কয়েকটা দিন বেশ হৈটচ করে কাটল। মেয়েরা একটা অভিনয় করবে। নাটিকা নির্বাচন করা হল। অরুণা খুব উৎসাহের সঙ্গে খাটতে লাগল। ধীরে ধীরে অভিনয়ের দিন এগিয়ে এল। অভিনয়ে সকলকে নিমন্ত্রণ করা হল। অরুণা গেল শঙ্করবাবুর বাড়িতে। ইতিমধ্যে ছুটারদিন সে এসেছে আরো। শঙ্করবাবুর সুন্দর লাইব্রেরী আছে একটা। সেটার লোভে মাঝে মাঝে এসেছে। প্রথমে লোক পাঠিয়ে বই আনাতে। এখন শঙ্করবাবুর অকুরোধে সে নিজে এসেই বই নিয়ে নাড়াচাড়া করে। নিয়ে যায়। ফেরত দেবারও কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।

শঙ্করবাবু দেশবিদেশের বহু খবর রাখেন। শাহরিক না হয়েও তিনি যথেষ্ট প্রগতিশীল। অরুণার পরিবারের খবরও রাখেন। অরুণার এইরকম আত্মোৎসর্গের জন্তে তিনি অত্যন্ত খুশি। তবু তিনি বলেন : এখন এখানে কাজ করছেন, করুন, কিন্তু মেয়েদের অন্য জীবনও আছে। সে জীবনের স্বাদ অন্য, হয়ত অনন্ত।

অরুণা চুপ করে থাকে।

শঙ্করবাবু অরুণার মাইনে বাড়াবার প্রতিশ্রুতি দেন নিজে থেকে। এত ভালো লোক। আমাদের দেশের মেয়েরা যে এইভাবে নিজেদের সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে বহুকে বাঁচিয়েছে তার জন্তে তিনি যথেষ্ট গর্বিত।

অরুণা নীরবে শোনে ।

সেদিন বাড়ির বাইরে এসেই দেখা হল যুগাক্তর সঙ্গে ।

এইটেই আমার বাড়ি অরুণা ।

ও তুমি তাহলে শঙ্করবাবুর ।

হ্যাঁ । ভাই । চল ভেতরে চল ।

না আজ থাক আমি এতক্ষণ ভেতরে ছিলাম ।

আর একটু বসবে না হয় ।

না । একটু কর্কশ শোনালো নিজের কানে কথাটা । অরুণা মরমে মরে গেল ।

আচ্ছা এস । যুগাক্ত তাকাল ।

স্মরণ্যার কথাটা শুনে ভারী বিরক্তি লাগছে ওর । সাবধানে চলো । ইকুলের মান সম্মান এত্যাতি ।

এখনও বোঝে না সে-কথাটা সে ।

বিকলে হরিবাবু এসে বলে : ‘আপনাকে একবার যেতে হবে শঙ্করবাবু ডেকেছেন ।’ অরুণা বলে : ‘যেতে পারব না কাজ আছে ।’

হরিবাবু একটু হাসেন : ‘কাজ না হয় অন্তঃসময় করবেন । এখন একটু গেলেই ভালো হয় ।’ অরুণা বলে : ‘না শরীরটা ভালো নেই ।’ হরিবাবু বলে : ‘ও শরীরটা ভালো নেই । থাক তাহলে । কিন্তু দেখুন স্মরণ্য দেবীর ভর নয়ত ।’ অরুণা চকিত হয়ে ওঠে : ‘তার মানে কি বলতে চান আপনি ।’ হরিবাবু হাসলেন—‘মেয়েতে মেয়েতে অমন হয় আরকি ।’ অরুণা তিক্তস্বরে বলে : ‘ভুলুন কি ব্যাপার বলে যান ।’

হরিবাবু বলেন : ‘আচ্ছা শরীর ভালো হলে বলে যাব ।’

ভারী বিজ্রী লাগে তার । আস্তে আস্তে ইকুল থেকে বেরিয়ে আসে । যুগাক্তর সঙ্গে দেখা হয় রাস্তায় । পোষ্টোপিসে যাচ্ছে । চল না একটু ঘুরে আসা থাক ।

অরুণা বললে : বেশ চল, আমারও যদি চিঠিপত্র থাকে ।

অনেকটা পথ যেতে হয় । হঠাৎ যুগাক্ত বললে, দাদা কি বলছেন ।

অরুণা চমকে উঠল : কি বলছেন-মানে ।

যুগাক্ত ইতস্তত করলে : মানে কেমন লোক আরকি ।

হালকা করে দেবার জন্যে বলে : এ্যাডুয়েট মেয়ে এটুকু বুঝলেন না ।

অরুণা হাসল : বেশ ভালো লোক । কিন্তু লোকে যা তা বলে কেন ।

যুগাক্ত বললে : লোকই জানে ।

কথা বলতে বলতে পোষ্টোপিসে পৌঁছে গেল । যুগাক্তর ছোটো পার্শেল এসেছে কলকাতা থেকে । অরুণার কয়েকটা চিঠি ।

আচ্ছা অরুণা-এত জায়গা থাকতে এই জায়গায় এলে কেন ?

জানিনা কেন এলাম । নিজের ইচ্ছেতে তো আর আসা যায় না ।

একটা মেঘ উঠছিল আকাশে । যুগাক্ত সেদিকে তাকিয়ে বলল : একটু

তাড়াতাড়ি পা চালাও, বৃষ্টি আসবে। মিষ্টি ভেজা ভেজা হাওয়া আসছিল। দূরে কেথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে। সেই ঠাণ্ডা হাওয়াই এসে লাগছে। মেঘটা আকাশ ছেয়ে ফেলল প্রায়। অরুণা বললে : না হয় ভিজবে। অত তাড়া কেন।

শৃগাক হাসল : না, তাড়া আমার নেই—বেশ ভিজতে চাও দেখা যাবে। হ্যাঁ তোমার নাকি ভীষণ অহঙ্কার।

কোথায় শুনলে।

কাল তোমাদেরই এক কলীগ বলছিলেন পিসিমাকে। বনানী কি যেন—

অরুণা হঠাৎ মুখে বললে : ঠিকই বলেছে। কোলকাতার মেয়ে না আমি। হঠাৎ শুরু হয়ে গেল অরুণা। বাতাসে গাছের পাতার মর্মর উঠছে। একটা দুটো পাখির ডাক। বিকেল হয়ে আসা আকাশে মেঘের অন্ধকার। শৃগাক চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

আচ্ছা শৃগাক—বলত এ জীবন কিসের জন্তে, কেন? কি করব এ জীবন নিয়ে? হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন।

হঠাৎ নয় শৃগাক। বাবার মৃত্যুর পর থেকে কতদিন ধরে, কত রাত ধরে, এই প্রশ্নই বার বার করে এসেছি নিজেকে। কেন এ জীবন? এ জীবন যদি পেয়ে গেছি, এ নিয়ে কি করব? কতজনকে চিন্তাশা করব ভেবেছি সংশয়ে আটকে গেছি। পাছে কেউ যা তা ভাবে। কিন্তু রাত্রে ঘুম আসেনি। আলায় জ্বালায় ছাদে ঘুরে বেরিয়েছি। বন্ধুরা হেসেছে ঠাট্টা করেছে—কেউ বলেছে প্রেমে পড়ার আগে অমন হয়। কিন্তু একটা বেদনার স্তব্ধ ঝড়কে বুকে নিয়ে বেড়াই। জানো, বলতে পার কোথায় পথ? শৃগাক চুপ করে থাকল। কি উত্তর দিচ্ছে না যে। শৃগাক বলল :

দেখ, এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারলেত' দিতাম। কিন্তু পথ তোমায় নিজেই খুঁজে নিতে হবে। কেউ কি কারো পথ খুঁজে দেয়।

বৃষ্টি নামল ঝর ঝর করে।

তাড়াতাড়ি ওরা গিয়ে একটা অশ্রু গাছের তলায় দাঁড়াল। বেখানে অন্ধকার জমে আছে। অরুণা বসে পড়ল। শৃগাক দাঁড়িয়ে থাকল একপাশে। আচ্ছা মানুষ এত কঠিন হয় কেন? এত অমানুষ হয় কেন? অরুণা তার সমস্ত প্রশ্ন আত্ম সমাধান করবে। পথ তার চাইই চাই। চাই না আর এই নিঃস্বতার গুহায় আত্মসাধনা। চাই অন্তপথ, চলবার পথ। অন্ধকে বাঁচানোর সঙ্গে নিজের বাঁচবার পথ।

শৃগাক বললে, ইস্কুলে তোমার ভালো লাগছে না বুঝলাম। কিন্তু আমি আর কি করব। তুমি বরং কলকাতায় ফিরে যাও। এখানে তুমি ঠিক থাকতে পারবে না। জীবনের একটা পুরনো কথা যেন মনের তারে শৃগাক বাজিয়ে দিল। যেদিন গর্বভরে অরুণা বলেছিল : আমি কোন সংস্কারের মধ্যে বাঁধা নই, ধর্মের বন্ধনে জড়িত নই। এমন কি সম্পর্কের বন্ধনেও বাঁধা থাকতে চাই না। আমি চাই একটি স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ং স্বতন্ত্র নারীত্ব।

মিস্ অরুণা দত্তের ছবিটাকে আজ মিস্ট্রেস অরুণা দত্ত স্পষ্ট মনে করতে পারে। সেদিন তার কোনো অভাব ছিল না। হয়ত ছিল কিন্তু অভাব বেছে ওঠেনি। অভাব তাকে হাহাকারে ডরায়নি। করিডর দিয়ে সে হেঁটে যেত। কুলের পাশ দিয়ে অশ্রুর

মত । তার পদভরে কম্পিত কোন উর্ধ্বমুখী-সেও জানত । সে যে সংস্কারের বাইরে । হৃদয়ের তুচ্ছ অশুভুতির বাইরে । যেখানে সম্পর্ক তুচ্ছ, সেখানে যুগাক্ত তুচ্ছতর । তার কোন হৃদয়ের আবেগের প্রকাশ ক্ষুরিত হোত কি না হোত সে দেখেনি, দেখতে চায়নি । তার জুতোর শব্দ আছো সে শুনতে পাচ্ছে । অশব্দ গাছের ছায়ায় ঝুটির অন্ধকারে ঐ যে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে কিঞ্চিং সংকোচে, তাকেও দেখতে পাচ্ছে । কিন্তু এই যে যন্ত্রণাটা—তাকে সে আগে চেনেনি । মনেরই কোনো রক্তে লুকিয়ে থাকে—জানত নায়ে । বুক কেটে যদি বলতে পারত—আমি চাই না অন্ধ কিছু । আমার নিজের পথ খুঁজে দাও ।

ঝুটিতে আরো ঘনিষ্ট হয়ে আসে অরুণা ।

তুনি কতদিন এখানে এসেছ যুগাক্ত ।

এই মাগ ছয়েক ।

হঠাৎ এখানে চলে এলে ।

আমার বিয়ের স্তম্ভে ।

অরুণা চমকে উঠল বিদ্যুতের মত । তোমার বিয়ে হয়ে গেছে জানাও নিত ।

যুগাক্ত হাসল, না বিয়ে হল না একটা গোলমালে । সে অনেক কথা ।

চলো ঝুটি খেঁমে এল । বেশ যাওয়া যাবে ।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছে অরুণা কারা যেন অভিশাপ দিচ্ছে পৃথিবীকে । এত' সত্য নয়, এ একটা মিথ্যা পৃথিবী । কিন্তু সত্য জগৎ কোথায় কতদূরে—ভাবতে গিয়ে ভাবতে পারে না । রাত্রে শেষ টেনের শব্দ শোনা যায়—হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে ভেসে আসে ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক । ধীরে শব্দ এগিয়ে আসে কাছে পাশে, আবার সরে যায়, দূরে যায় সরে যায় । কাঁপতে থাকে ঝিল্লীর ডাক । অসত্য পৃথিবীর অন্ধকারে ঘুমোতে থাকে মিস্ অরুণা দস্তের অসত্য কামনাগুলি ।

মার চিঠি এসেছে । বোনটার অসুখ বেড়েছে । ডাক্তার দেখানো হচ্ছে কিন্তু এখনও কোন উপশম হয়নি । মনটা ভারী ক্লান্ত আছে তার । মায়া এসে দাঁড়ালে । ‘কি হয়েছে ।’ ‘কিছু না বেশ আছি ।’ মায়া মিষ্টি হেসে চলে গেল । স্কুলে সুরমা বলল : ‘কাল উনি তোমাকে কি বলেছেন ।’ অরুণা বলল : ‘দেখুন আমিত’ কিছু বুঝি না । উনি এসে বললেন সেক্রেটারীর বাড়িতে যেতে—তিনি ডেকেছেন । আমার শরীর খারাপ ছিল—আমি যেতে পারিনি । উনি বললেন আপনি নিষেধ করেছেন তাই ।’

সুরমা ক্ষেপে উঠল : ‘ইডিয়টটা তোমাকে তাই বলেছে ।’ দেখো আমার এখানে থাকতে হলে ওসব চলবে না ।’

• অরুণা বিরক্তিতে বলল : ‘কি বলছেন কি চলবে না সেটাই বলুন ।’

‘কচি ঝুকি নও তুনি ।’

সুরমা বেরিয়ে গেল । বনানী এসে চুকল । ‘ও আপনি ভালত ।

বিকলে হরিবাবুর সঙ্গে দেখা : ‘এই যে শরীর ভালো হয়েছে আশা করি ।

সুরমা দেবী কিছু বললেন নাকি ।’

দেখুন আপনার মাইনের গ্রেড বাড়ানো নিয়ে একটা কথা হচ্ছিল। সেই ব্যাপারে উনি একবার আপনাকে ডেকেছেন।

চলুন। আচ্ছা—অরুণা কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

দেখুন একটু বোল্ড হবেন—যতকি। আগেকার দিনে মেয়েরা দরকার হলে কাঁদত। এখনকার মেয়েরা দরকার হলে হাসবে। একটা তীক্ষ্ণ শীসের মত অরুণার কানে কথাগুলো বিধল : কি বলছেন আপনি।

কিছুনা কিছুনা একটা ট্যাক্টিক্স বলছিলেন। রাগ হয় বলব না। চলুন চলুন।

অরুণা চলতে লাগল : আচ্ছা সুরমাদি আপনাকে কাল কি বলেছেন।

বলবেন আর কি। মেয়েতে মেয়েতে অমন হয়।

কি হয়? তীব্রকণ্ঠে প্রশ্ন করল অরুণা।

ঐ আর কি, আপনি এসেছেন যত সব মেয়েলি ব্যাপার কি আর বলি। ওঁর এখানে আসাযাওয়া একটু কমাতে হয়েছে বোধ হয়।

বোধহয় মানে আপনার স্ত্রী আপনি খবর—

আমার স্ত্রী হ্যাঁ হ্যাঁ তাত বটেই।

কি থেমে গেলেন কেন। আমি যাব না বলল অরুণা।

সে কি

যাব না।

শরীরটা কি আবার খারাপ হল।

অরুণা আর ধৈর্য রাখতে পারল না। হরিহরবাবুর মুখের ওপর সশব্দে একটা চড় মারল। একটু হাসলেন। যত সব মেয়েলি ব্যাপার। আমি জানতাম যুগাক্তবাবুর সঙ্গে আপনার—তা শঙ্করবাবুর খেলাল। আচ্ছা নমস্কার।

রাত্রে সাদা চাদরটা জড়িয়ে নিল গায়ে। ভ্রতপায়ে এগিয়ে চলল সান্দ্রাল হাউসের দিকে। দেউড়িতে কেউ নেই। সোজা দোতলার ঘরে গিয়ে টোকা দিল। যুগাক্ত খুলেই হকচকিয়ে গেল। একি অরুণা এত রাত্রে। এভাবে এসেছ। নিচে এসেছিলে। পিসিমার কাছে গিয়ে বস।

অনেকগুলো প্রশ্ন করে উঠল সে।

অরুণা বলল : আমার সময় নেই যুগাক্ত। আমার কথার উত্তর দাও।

যুগাক্ত দরজাটা বন্ধ করে দিল। অরুণা ফিরে যাও এখনি কেউ দেখতে পেলো কাল তুমি স্কুলে যাবে কি করে।

ইস্কুলে আমি যেতে চাইনা। তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

আমি শুনতে চাইনা তোমার কথা।

কেন শুনবে না।

তার উত্তর আমি দিতে পারব না।

অরুণা যুগাক্তর দুটি হাত সমস্ত আবেগের নির্ধাণ দিয়ে চেপে ধরল। যুগাক্ত আশ্চর্যে আশ্চর্য বলল না।

অরুণা আবিষ্ট হয়ে বলল : আমি কিছু চাই না শুধু আশ্রয় চাই। বিরাট বটের মত তুমি দাঁড়াও। শাখায় শাখায় পাখির গান, তলায় ছায়া। তার তলায় আমি বাঁচতে চাই। সে ছায়ায় আমি সকালে প্রণাম করব সন্ধ্যায় দীপ দেব।

যুগান্ত হেসে বলল : একেবারে হিন্দুমেয়ের মত কথা। তুমি না সংস্কারবিরহিত। কার মত বলছি জানি না। কিন্তু আমার আশ্রয় কথা। এর সাধনা করেছি। কিন্তু আজ সময় নেই।

আমারও সময় নেই অরুণা। রাত্রে ট্রেনে আমায় চলে যেতে হবে।

অরুণা আরেকবার ক্লান্তকণ্ঠে বলল : আজ আমায় ঘর তুমি ফিরিয়ে দেবে না। না পারব না। আমি ক্লান্ত। তোমার ঘরকে ক্লান্ত করি কি করে। আরও বড় কথা। আমি অশুচি। তোমার ঘরে আমি শুচিতার হানি করি কি করে। আমি যে এক বিরাট অসত্য। তোমার সত্যকে মানবার ক্ষমতা আমার নেই।

ক্লান্ত অরুণা অন্ধকারে বেরিয়ে এসে যার সামনে পড়ল সে শঙ্কর সান্যাল। এই যে অরুণা এসেছে।

ভয়ে বুক কাঁপছে তার। এসেছি, কোথায় এসেছি কোন অন্ধকারে কোন অসত্য পৃথিবীর মধ্যে। সরে যেতে চায়। শঙ্কর সান্যালের দৃঢ়হাতে চাপা আরেকটা অসত্য পৃথিবী। আরেকটা অসত্য মানবী। সে কোনদিন অরুণা ছিল না—কোনদিন থাকবে না। সে একটা অসত্য পৃথিবীর অসত্য মানবী।

ধীরে ধীরে বলে : চলুন কোথায় যাব।

খুশি হয় শঙ্কর সান্যাল। স্পন্দন তার বুকের। এসো এসো। নিঃশব্দে নিজেকে ছেড়ে দেয় শঙ্কর সান্যালের হাতে।

একটু জল খাবো। আরো সরে আসে অরুণার অসত্য ওষ্ঠাধর শঙ্কর সান্যালের সামনে।

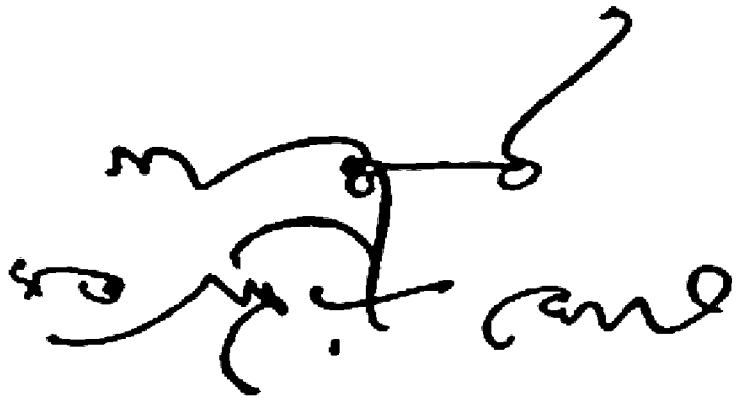
একটু দাঁড়াও আসছি।

আর না—আর না—এবার প্রায় ছুটতে আরম্ভ করে অরুণা। পেছনে তাড়া করছে তার অসত্য জীবন। পথে ছুটছে ছুটছে। রাত্রির ট্রেন কি ছেড়ে দিয়েছে। না, না, এখনও আসেনি। শব্দ হচ্ছে ঐত-ঐত—আসছে ছুটছে হুলছে। কাঁপছে অরুণার বিপ্রস্তু দেহবসন। অন্ধকারে ট্রেনে বসে অরুণা। ট্রেন চলতে শুরু করে।

যুগান্ত যেন আত্মদ্রোহী হয়ে ওঠে। কেন আমি পারব না। এখনও সময় আছে। ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে। বোডিংএ আসে। ভিলোত্তমাকে বলে অরুণাকে ডেকে দাও। মায়া চকিত হয়ে উঠল : অরুণা-অরুণা-অরুণা কোথায়—যুগান্ত চকিত হয়, সের্কি, কোথায় গেল। ট্রেনের অস্পষ্ট শব্দ শোনা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক।

যুগান্ত ছুটতে আরম্ভ করল ট্রেনের দিকে। ট্রেনের শব্দ শেষ ট্রেন।

অসত্য পৃথিবীর অসত্য জীবন ছাড়িয়ে ট্রেন চলছে। চোখ বন্ধ করল অরুণা। সত্য যুগান্ত যেন একটা সংকীর্ণ ঝিলীচাকা পথ বেয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে।



॥ ১৭ ॥

দরজা বন্ধ। অবনী ঠকঠক করলো।

‘কে?’—ভেতর থেকে বকুলের সাড়া এলো।

‘আমি’—অবনী একটুকাল চুপ থেকে শেষে বললো।

‘আমি? আমি তো সকলেই। আমি আবার কী!’—দরজা না খুলেই বকুল ভেতর থেকেই তরল গলায় কলকল করতে লাগলো, ‘আমি। তা আপনার তুমি তো বাড়িতে নেই, তা’লে কি আর ঢুকবেন!...রা নেই কেন? ও মশাই? আরে ও কী, চ’লেই যাচ্ছেন নাকি’—অবনীর পেছন-ফেরার শব্দ পেতেই বকুল ছড়মুড়িয়ে দরজা খুলে বেরুলো, কিন্তু তবুও অবনী ফেরে না দেখে অগত্যা বকুল অবনীর জামার পেছনটা সাপটে ধরলো।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বকুলের দিকে তাকিয়ে অবনীর হৃৎপিণ্ডের ওপর যেন হাতুড়ির ঘা পড়লো।

তাতাতাড়িতে দরজা খুলে বেরুনোর দরুনই হয়তো, বকুলের বেশবাস বিস্ত্রস্ত, বুকের আঁচল অসংযত। তা-ছাড়া অবনী লক্ষ্য করলো বকুলের পরনে খুব জমকালো রঙীন শাড়ি, ব্লাউজটাও তেমনি এবং সবচাইতে যা দেখে অবনীর ভয় আরো বাড়লো সে হচ্ছে ওর দৃষ্টি। অন্ধকারে যেন জ্বলছে বেড়ালের মতো।

জামার খুটটা বকুল তখনো ছাড়েনি। টানতে-টানতেই তাকে চোকালো ভেতরে। ভেতরে হারিকেন জ্বলছে। নতুন-কেনা হারিকেনটার স্থির উজ্জ্বল শিখাটা অবনীর কেমন যেন বেমানান লাগলো এই পরিবেশে। কিন্তু বকুলের সম্পূর্ণ সাজসজ্জাটা এইবারে সে ভালো ক’রে দেখতে পেলো।

চড়া প্রসাধন মুখে। মুখটা সাদাই হয়ে গেছে প্রায়। চোখে কাজল ভুরুতে কাজল। চুলে এখনো হাত পড়েনি তাই মাথাটা অনিশ্চয় চুলগুলি খোলা।

অবনী অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো বকুল বুকের কাপড় ঠিক করছে না দেখে। কী ওর মতলব?

বকুল খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। বললো, ‘বড়ো যে চ’লে যাওয়া হচ্ছেলো রাগ ক’রে, এদিকে যে জ্বর সমাচার। প্রজাপাতর নির্বন্ধ লেগে গেছে আমার। এই যাঃ ব’লে ফেললাম। ভেবেছিলাম বলব না সহজে। নিন এখন কী-খাওয়াবেন খাওয়ান, এত বড়ো শুভ সংবাদ পেলেন!’

‘কী ব্যাপার?’—অবনী হাসবার চেষ্টা ক’রে বললো।

‘ব্যাপার? ব্যাপার বড়ো জ্বর। আমার ভবের বাজি হচ্ছেলো ভোর, এমন সময় এই কাণ্ড জ্বর। দেখলেন আমিও কবিতা বানিয়ে ফেললাম মুখে-মুখে।

সদ-গুণে কী না হয় বলুন । এবার যে আমার মরা মালকে ফুটলো ফুল, টেকো মাথায় উঠলো চুল ।’

বকুলের রকমসকম কথাবার্তায় অবনী স্তম্ভিত হলো । তবুও মুখে সাহস এনে বললো, ‘খুব যে ফুটি ? হঠাৎ কী হলো এমন ? প্রজাপতির নির্বন্ধ মানে ?’

‘এই মরেছে ! পেরজাপতির সাথে এত আপনার ছলাকলা, আর তার নির্বন্ধ কাকে বলে তা-ই জানেন না । আচ্ছা বাম্বিকে বলব’খন কানে-কানে ব’সে দিতে ।’

‘আপনিই বলুন না ।’

‘কানে-কানে ?’

অবনী এবার গম্ভীর করলো মুখ । কেমন অস্বাভাবিক গলায় ব’লে বসলো, ‘কী সব বলছেন পাগলের মতো । বাকুণী কোথায় গেছে ? দিদিমাই বা গেলেন কোথায় ?’

ধমক খেয়ে বকুল চুপসে গেল । কাজল-মাথানো প্রগলভ চোখদুটো মুহূর্তে যেন আতুর, বিবর্ণ হয়ে গেল, তবুও ফের বললো যেন বুক ঠুকে, ‘কোথায় ? কোথায় আবার যাবে । গেছে আমার বিয়ের জোগাড়ে ।’

বকুলের হু-চোখে অবনী বিকারের পূর্ণ লক্ষণ দেখতে পেলো । মনের মধ্যে তার প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগলো । শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল এ ?

‘বিশ্বাস হচ্ছে না তো ? হবে না জানি । আমার আবার বিয়ে ! পেড়ীর হাতে রাঙা শাঁখা ! কিন্তু তা বললে কী হবে—হোক না যেমন তেমন বিয়ে, তিরিশ টাকার বিয়ে ! না-হোক সেই তিরিশটা টাকাও তো লাগবে নিদেনপক্ষে । তারই বা সংস্থান কই আমাদের । সেই ধান্দাতেই মা আর বাম্বি বেরিয়েছে ।’

‘কথা নেই বার্তা নেই, পট ক’রে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল কী ক’রে ।’

‘আরে মা, এ বলে কী ! পঁইতিরিশ বছর বয়স হতে চললো আমার, তবু বলে কিনা পট ক’রে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল । ওহো, আপনাদের শাস্তুর অবস্থা আলাদা, আপনাদের শাস্তুরের বিধেন হচ্ছে বিয়ে ঠিক হলে পর দশ-পনেরো বছর ধ’রে ঘষটাও আর ঘষটাও, তবুও বিয়ের পিঁড়ির তত্ত্বালাস করা হবে না । তা বেশ, ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে, আমার না হয় তাইই হলো । তা সে এখন যা-খুশি-তাই বলতে পারেন । কিন্তু বিয়েটি হয়ে গেলে পর কীরকম আদরটি হবে আমার তাই শুধু ভাবছি । লোকের দোজবরে তেজবরে হয় তাইতেই সোহাগের অন্ত থাকে না, আমার কপাল যে এমন ফাটা কপাল তা কে জানত এতদিন, আমার হচ্ছে তারও ডবল, একেবারে পাঁচবরে । আমি হব গে পঞ্চম পক্ষ । আরে মা, কী সোহাগ কী সোহাগ ! এখন কদিন বাঁচব, সোহাগের অন্ন কদিন ভোগে আসবে সেই ভাবনায় পড়েছি । সে যাক গে, আপনি এমন সময় এলেন, বিয়ের দিনে কেমন সাজব-গুজব তাই একটু দেখে নিচ্ছিলাম আগে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে, তা ধরা প’ড়ে গেলাম । আচ্ছা এখন কী করি বলুন দেখি । এক পায়ে আলতা প’রে তারপর ভাবছিলাম ব’সে-ব’সে হু-পায়ে পরব কিনা । কী বলেন ? কথায় যে বলে, কোন বা বিয়ে তাঁর হু-পায়ে আলতা—তা মানতে গেলে তো আমার হু-পায়ে আলতা পরা চলে না । বলুন না মশাই, চুপ ঘেরে আছেন কেন ।’

অবনী নজর ক'রে দেখলো গতিয় বকুলের বাঁ পা-টি আলতা-রাঙানো, ডান পাটি সাদা ।

‘কী, দেখে শুনে চোখ কপালে উঠে যাচ্ছে তো ! হবেই জানি । তা সে যাই হোক, আপনি কিন্তু এখন থেকে আমাকে আরো সমীহ ক'রে চলবেন তা ব'লে দিচ্ছি । ছিলাম মাস-শাওড়ী—অবিশিষ্ট সেটাও সমীহেরই সম্পর্ক—কিন্তু এখন এক-লাফে একেবারে খোদ শাওড়ীই বনতে চলেছি, সাবধান ! ...ফ্যালফ্যা—ল ক'রে তাকিয়ে আছেন । কেন ! এত কী আকাশ থেকে পড়ার হলো ? আমার কি হতে পারে না বিয়ে ?’

‘কেন পারবে না । কিন্তু কেমন ক'রে ঠিক হলো, কবে ঠিক হলো তাই ভাবছি । তা কবে হচ্ছে ?’

‘হয়ে যাবে একদিন । যেদিন সুবিধে হয় । তাড়াহড়োর কী !’

‘দিদিমা কোথায় গেছেন ?’

‘টাকার জোগাড় বললাম যে ? আমার সেলাইর দাম অনেক পাওনা আছে—আমার তো এখন বিয়ে ঠিক হয়েছে, বিয়ের কনে, আমি তো এখন আর হটপাট এখানে-সেখানে যেতে পারি না, লোকে বলবে কী—তাই মাকে পাঠিয়েছি তাগাদায় । বাম্বিও গেছে সঙ্গে । বাম্বিরও অনেক টাকা পাওনা আছে এ-বাড়ি সে-বাড়ি । সব পেনে পর তবে তো বিয়ের বাজার শুরু হবে । এখনো ভেবে দেখুন কী করবেন । পুঁজিপাটা যে-কটা টাকা আছে আমাদের, আমার বিয়েতেই কিন্তু সব ফক্কা হয়ে যাবে, সুতরাং আগেভাগে আপনিই এবার আপনাদেরটা চুকিয়ে ফেলবেন কিনা দেখুন ভেবেচিন্তে । পরে কিন্তু পস্তাবেন ।’

‘আমার অবিশিষ্ট আগেই সন্দেহ হয়েছিলো ব্যাপারটা । কিন্তু তাই ব'লে, চতুর্থ পক্ষটি গত হতে-না-হতেই, মাস-দুয়েকের মাথাতেই ভদ্রলোক ফের বিয়ের কথা তুলতে পারবেন, এতটা আমি ভাবতে পারিনি । তা, আপনাকে তো বেশ খুশি-খুশিই দেখছি ।’

‘তা তো দেখবেনই । খুশিতে ডগোমগো হয়েছি যে । বাম্বির মারফৎ ভদ্রলোক প্রস্তাবটা দিলেন, আমি তো কালবিলম্ব না ক'রে হ্যাঁ ব'লে দিলাম । মা-ও যদিও মনে-মনে যথেষ্টই খুশি হয়েছে বেশ বুঝি, কিন্তু বাইরে তো আর সেটা বলতে পারে না পেটের মেয়েকে, তাই ঠিক-হয় ইন্তক কেবল মাথা কুটছে আর বলছে, ওরে তোর ডোল-ডরা আশা ছিলো, পেলি কুলো-ডরা ছাই । কিন্তু আমি বলি, তা কেন মা, ছাই কেন পাব গো, সত্য-সত্যিনের ঘরে তো আর যাচ্ছি না, একা-ঘরের গিন্নীই তো হব, তবে আর এত কান্নাকাটি কীসের । তা-ছাড়া আমার মনে-মনে আরো মতলব আছে । লোকটা আমার দিদিকে খেয়েছে, সে-কথা কি আমি ভুলে গেছি মনে করেন । একটুও ভুলিনি । সারাক্ষণ কেবল ঐ কথাটা আমার মনের মধ্যে রাবণের চিতার মতো জ্বলছে । তাই ঠিক করেছি, বিয়েটা একবার হয়ে যেতে দাও না, চাবিকাঠিটা একবার হাতের মধ্যে আনুক না, তারপর । তারপর । আলিয়ে-পুড়িয়ে খাব লোকটাকে, আলিয়ে-পুড়িয়ে খাব । কথায় কথায় কেবল কানে ধ'রে ওঠাব আর বসাব, বুঝলেন, কানটি ধ'রে ওঠাব আর বসাব’—বলতে বলতে বকুল বিকারপ্রস্তু চোখে হেসে উঠলো, ‘বিয়ের পরে মা আর বাম্বিও তো আমার সঙ্গেই উঠে যাবে ঐ লোকটার বাড়ি, সেইর'মই ঠিক হয়েছে । এই

অন্ধকূপ থেকে এ্যাঙ্গিন বাদে আমাদের সকলেরই মুক্তি মিলবে। মুক্তি মিলবে, মুক্তি। শুধু বাবা এই নরককুণ্ডের মধ্যে দমবন্ধ হয়ে শেষ হয়ে গেলেন। বাবা গো, তুমি তোমার পাগলী মেয়ের স্বপ্নের মুখ দেখে যেতে পারলে না, তোমার পাগলী হতভাগী মেয়ের বিয়েটা দেখে যেতে পারলে না গো—আঁচলে মুখ ঢেকে বকুল ডুকরে কেঁদে উঠলো।

বাইরের লোহার জালের দরজাটায় খটাং ক'রে শব্দ উঠলো।

এসে চুকলো বাকুণী। তার পেছন-পেছন ভ্রজবাল।

অবনীকে দেখে বাকুণী মুখ মচকালো। হাতের প্যাকেটগুলো খাটটার ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বকুলের দিকে তাকিয়ে গালে হাত দিয়ে থ মেয়ে রইলো।

বকুলের কান্না ততক্ষণে থেমেছে। চোখ মুছে আঁচলে।

ভ্রজবাল। ক্লান্ত ভারী দেহটাকে স্থাপন করেছেন জানালাটার পাশে নড়বড়ে চেয়ারটার ওপর। তাঁরও চোখ পড়েছে বকুলের অন্ধুত বেশবাসের দিকে।

প্যাকেটগুলো দেখিয়ে অবনী জিগ্যেস করলো বাকুণীকে, 'কী এ-সব?'

বাকুণী তার কোন জবাব দিলে না। অবনীর দিকে একবার আগুন-চোখে তাকিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

'কোথায় ছিলে এ্যাঙ্গিন?'—ভ্রজবাল। জিগ্যেস করলেন, 'দশ দিন পর্যন্ত দেখা নেই তোমার? সেই মঙ্গলে এসেছিলে, তারপর আরেক মঙ্গল গেল, আশ শুকুর। কী হয়েছিলো? শরীরও তো বেশ খারাপ দেখি। অসুখবিসুখে পড়েছিলে নাকি? বাম্বি বললো তোমার আসবার কথা ছিলো শুকুরবার, কোথায় নাকি নিয়ে যাবার কথা ছিলো খুব দরকারী কাজে। তা তুমি এলে না দেখে মেয়ের কী হুশ্চিন্তা। একদিন শেষেষ তোমাদের সেই বিশ্বাস না কী, সেখানেই গিয়েছিলো খবর নিতে। তা সে রেট্রুর্গেণ্টের ম্যানেজার ব'লে দিলে, তোমরা নাকি শনিবার কেউ আসোনি। সেদিন নাকি তোমাদের আসবার কথা—কেন আসোনি তা সে লোকটা কিছু বলতে পারলে না। ঠেকা-বেঠেকায় আসতে না পারলে একটা চিঠি লিখেও তো সেটা জানাতে হয়। তা'লেই আর হুশ্চিন্তার ভোগে পড়তে হয় না।'

'খাক দিমা তোমাকে আর পাঁচালী গাইতে হবে না'—বাকুণী বাম্বিটা দিয়ে উঠলো, 'না এসেছে তো বয়ে গেছে। ভারী তো।'

'কেন আসতে পারিনি'—অবনী বললো, 'তা পরে বলছি। তা শুনলে আর রাগ করতে পারবে না। কিন্তু এখানে এসে তো—সাগীর নাকি বিয়ে ঠিক হয়ে গেল?'

বাকুণী অবনীর মুখের দিকে এবার ভালো ক'রে তাকালো। আশঙ্কা ঘনিয়ে এলো তার চোখেমুখে। বললো এবার সহজ গলায়, 'হ্যাঁ হয়ে গেল। কিন্তু কেন আসতে পারোনি তুমি? কী হয়েছিলো?'

• 'বলছি'—অবনী বললো।

বাকুণী অধীর হয়ে উঠলো, তাড়া দিয়ে বললো, 'চুপ ক'রে আছে কেন? বাঃ। এ আবার কী চণ্ড। বলো না কী হয়েছে।'

অবনী তখন দোপাটির নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার খবরটা এদের দিলো।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

ভূদান-যজ্ঞ—প্রতিক্রিয়া না বিশ্বব

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে সর্বোদয় সমাজ স্থাপনা করা। সর্বোদয় অর্থাৎ সকলের উদয় বা মঙ্গল। “অধিকতম সংখ্যক ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক হিত সাধন”—এই সঙ্কুচিত আদর্শের মধ্যে মানবের আশা আকাঙ্ক্ষা আজ সীমাবদ্ধ নেই। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হিত সাধনের ক্ষেত্রে ব্যাপকতর করে সর্বমানবকে তার পরিধির অন্তর্ভুক্ত করে সর্বোদয় বিচারধারার প্রবর্তন করা হয়েছে। ইংরেজ মনীষী জন রাস্কিনের “আনটু দিস লাস্ট” গ্রন্থ থেকে গান্ধীজী এই বিচারধারার বীজ আহরণ করেন। টলস্টয় এবং ভারতীয় দর্শনের প্রভাবে এই বীজ এক মহান আদর্শের মহির্মহি রূপে বিশ্বের সম্মুখে প্রকট হয়।

অন্তোদয় থেকে সর্বোদয়ের প্রারম্ভ। অর্থাৎ “সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে” প্রথম এর ঘট স্থাপন করা হয়। ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলন এর অলস নিদর্শন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কমবে কি না, ভূমি বর্জিত হলে তা অলাভজনক (আন-ইকনমিক) টুকরায় পরিণত হবে কি না, ভূদান আসলে দারিদ্র্য বর্জননের কার্যক্রম কি না—এ সব প্রশ্ন আর্থিক দৃষ্টি থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলেও ভূদান-যজ্ঞের তত্ত্বদর্শন এর প্রতি প্রধানত জোর দেয় না। দীনতম ব্যক্তিটির উপকার সাধন করার ক্ষমতা রাখে কি না—এই দিয়ে সর্বোদয় কোনো কার্যক্রমের গুণাগুণ বিচার করে। এ-সম্বন্ধে গান্ধীজীর একটি উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলতেন, “তোমাদের আমি একটি মন্ত্র দেব। যখনই কোনো কর্তব্য সঙ্কটে পতিত হবে, অর্থাৎ কোনো কাজ করা উচিত কি অসুচিত—এই প্রশ্ন জাগবে, তখনই বিচার করে দেখবে যে তোমাদের সে কার্য কি দেশের দীনতম ব্যক্তিটির হিত সাধন করবে?” সমাজের বর্তমান অবস্থা এই যে ধনী ও দরিদ্র উভয়েই রোগাক্রান্ত। ধনীরা প্রয়োজনাতিরিক্ত আহাার করার কারণে অজীর্ণ রোগে ভুগছে এবং দরিদ্রদের শরীরে নূনতম পুষ্টির অভাব হওয়ায় তাদের ভিতর ক্ষয় রোগ চুকেছে। সর্বোদয় উভয়শ্রেণীর হিতসাধন করতে চায় বলে ধনীকে বলে দরিদ্রদের জন্যে স্বেচ্ছায় দান করতে। এতে ধনীরা অতি আহাারজনিত ব্যাধির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং দরিদ্ররা প্রয়োজনীয় আহাার পেয়ে সুস্থ হয়ে উঠবে। এইভাবে স্বার্থ সংঘর্ষ বা শ্রেণী সংঘর্ষ সর্বোদয়ের লক্ষ্য নয়। “শ্রেণীর” পরিভাষাতে যদি বলতেই হয়, তাহলে বলা যায় যে, শ্রেণী বিলীনীকরণ বা ধনিক সম্প্রদায়ের শ্রেণীপরিবর্তনই হচ্ছে সর্বোদয়ের পন্থা।

মানব সমাজের প্রগতির পথে তিনটি সুস্পষ্ট ধাপ চোখে পড়ে। আদিম যুগে “দাঁতের বদলে দাঁত এবং চোখের বদলে চোখ” অর্থাৎ জঙ্গলের নিয়ম চলত। . জোয়ান যার মূলুক তার—এই হচ্ছে এই যুগের ধর্ম। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় অবস্থায় যায় ও নিয়ম কাহ্ননের রাজত্ব স্থাপিত হয়। এখন কোনো হুঙ্কতি সাধিত হলে মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নেয় না। শাসনশক্তি অর্থাৎ হিংসা প্রয়োগ করার অধিকার এই অবস্থায় ব্যক্তির হাত থেকে সমাজের প্রতিনিধীদের হাতে চলে যায়।

আইন পরিষদ, লোকসভা এবং আদালত, কাছারী, পুলিশ ও সেনাবাহিনী ইত্যাদি এই যুগের সামাজিক সুরক্ষার ধারক ও বাহক হয়। মানবেতিহাসের তৃতীয় বা আদর্শ স্থিতিতে এ সবেও প্রয়োজন থাকবে না। হিংসা প্রয়োগের অধিকার ব্যক্তির হাত থেকে সমাজের প্রতিনিধীদের হাতে গেলেই সমস্যার সমাধান হয় না। তাই তৃতীয় অবস্থায় হিংসাক্রিয় শরণ নেবার প্রথাই রদ হবে। প্রেম বা ভালবাসা হবে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের নির্ণায়ক। এরই নাম সর্বোদয় সমাজ।

সর্বোদয় মানবীয় বিপ্লবের সর্বশেষ পরিণতি। এ যুগে কার্ল মার্কস সর্বপ্রথম তাঁর মনীষী দৃষ্টি দ্বারা মানবসমাজের অসাম্য ও শোষণের কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। তাই তাঁকে এ-যুগের প্রথম বিপ্লবী বলা যায়। গান্ধীজী বিপ্লবসাধনের পন্থাতেও বিপ্লব সংসাধন করেন। অর্থাৎ যে-মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার জন্যে বিপ্লবের প্রয়োজন, বিপ্লবের আবাহনের পন্থাতেও গান্ধীজী সেই মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করলেন। তাই গান্ধীজীর পদ্ধতি মানবীয় বিপ্লব বা সুসংস্কৃত বিপ্লবের দ্ব্যাক্ষর। মহান লক্ষ্য উপনীত হবার জন্যে পন্থাও সমরূপে মহান হওয়া চাই—এই হচ্ছে সর্বোদয়ের বক্তব্য। জ্যানিতির সরলরেখার সংজ্ঞা অনুযায়ী যেমন কিছুতেই কোনো সরলরেখা অঙ্কন করা যায় না, তেমনি কোনো দিন কোনো সম্পূর্ণ শুদ্ধ আদর্শে মানবসমাজ উপনীত হতে পারে না। ঘোষিত আদর্শের পথে মানবসমাজ যতটা অগ্রসর হতে পারে, তাদের প্রগতিও ততটুকু হয়। তাই লক্ষ্য মহান হলেও পন্থা যদি অশুদ্ধ হয়, তাহলে সমগ্র বিপ্লবের প্রক্রিয়ার শেষে লাভ লোকসান খতালে অশুদ্ধ পন্থা ছাড়া জমার ঘরে আর কিছু থাকে না। এই জন্যে গান্ধীজী শুদ্ধ পন্থার উপর এত জোর দিতেন।

সর্বোদয় মনে করে যে “রাষ্ট্র শোষণের যন্ত্র,” তাই কোনো বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্থাপনা করা সর্বোদয়ের লক্ষ্য নয়, শোষণ ও শাসনবিহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সর্বোদয়ের কাম্য। শোষণের সঙ্গে শাসনের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ রয়েছে। শোষণ করার জন্যে শাসন এবং শাসন দ্বারা শোষণ—এই দুই চক্র পৃথিবী জুড়ে চলছে। সর্বোদয় শোষণের অন্ত চায় বলে শাসনেরও অবসানাকাঙ্ক্ষী। তবে শাসনবিহীন সমাজ মানে উচ্ছৃঙ্খল সমাজ নয়। শাসনবিহীন সমাজে জনসাধারণ এতখানি সাংস্কৃতিক গুণের অধিকারী হবে যে কোনো বাহ্য তন্ত্র ব্যক্তিরেকেই তারা সমাজহিতার্থে স্বতঃ আরোপিত বিধিনিষেধ দ্বারা চালিত হবে। এর জন্যে সমাজের যথাসম্ভব অধিকাধিক ক্রিয়াকলাপ জনসাধারণকে স্বাবলম্বী পদ্ধতিতে সঞ্চালিত করতে হবে। এইবার আধিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তা না-নেবার উপর কেন-যে সর্বোদয় বিশ্বাসীরা জোর দেন, তার কারণ বোঝা যাবে। রাষ্ট্রের অবনুপ্রিই যদি অস্তিম লক্ষ্য হয়, তাহলে সমাজ থেকে তার প্রয়োজনীয়তা যথা সম্ভব কমাতে হবে। ভূমির সমবন্টনের জন্যে বা নিত্যব্যবহার্য ভোগ্যোপকরণ উৎপাদন ও বন্টনের জন্যে যদি আমাদের রাষ্ট্র বা কোনো কেন্দ্রিত ব্যবস্থার শরণ নির্ভে হয়, তবে স্বভাবতই তার অস্তিত্ব অপরিহার্য হয়ে পড়বে। এই জন্যে সর্বোদয় সমাজের আদর্শে বিশ্বাসী কর্মীরা জনসাধারণের জাগ্রত চেতনার উপর নির্ভর করে ভূমির সমবন্টন বা আধিকসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। এই কারণেই তারা বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থাৎ চরখা চেকি, ঘানি ইত্যাদির শরণ নিয়ে

কেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট কেন্দ্রিত রাজ্য ব্যবস্থার অবসান প্রয়াসী। যঁারা মনে করেন যে, যেন-তেন-প্রকারেণ একবার রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে তার মারফৎ রাষ্ট্রের বিলীনীকরণ (উইদারিং এওয়ে) করবেন, তাঁদের যুক্তির ত্রুটি এইবার চোখে পড়বে। সমাজে কোনো প্রকার চাহিদা বজায় রেখে তার বিলুপ্তি সাধন করা যায় না এবং ক্ষমতার স্বর্ধ্ব হচ্ছে অধিকতর কেন্দ্রীকরণ—এই দুটি নিয়মের কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে এই যে সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর একচ্ছত্র আধিপত্যযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালন সত্ত্বেও সোবিয়ৎ রাশিয়ায় রাষ্ট্রযন্ত্র বিলীনীকরণের দিকে তিল মাত্র না-যেয়ে তার বিপরীত দিকে গেছে, অর্থাৎ সেখানে জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার করায়ত্ত।

এইখানে আর একবার সাধ্য ও সাধনের (এণ্ডস এণ্ড মীনস) প্রশ্ন এসে পড়ে। যে লক্ষ্য আমরা উপনীত হতে চাই, আমাদের বর্তমান কার্যক্রমে তার সুস্পষ্ট অভিপ্রকাশ থাকা চাই। হিমালয়ের শিখরে আরোহণ যদি আমার লক্ষ্য হয়, তবে এখনই আমাকে উত্তর দিক লক্ষ্য করে চলতে হবে। পৃথিবী যে-হেতু বর্তুলাকার অভ্রম এখন দক্ষিণ দিকে চলা আরম্ভ করা যাক এবং অবশেষে কোন-না-কোন দিন দক্ষিণ মেরু ঘুরে হিমালয়ের শীর্ষে উপনীত হব—এই কথা বলার মধ্যে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সমর্থক যতই থাক না কেন, কোনো বাস্তববাদী এ-পন্থা গ্রহণ করবেন না। এইভাবে কোনো বাস্তববাদী বিপ্লবী নিশ্চয় এ-কথা মেনে নেবেন না যে এখনকার মত রাষ্ট্রযন্ত্রকে অধিকারিক শক্তিশালী করা যাক এবং বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে যখন পূর্ণতার পর পরিস্ফুটন আপনাই হয়, তখন রাষ্ট্রও একদিন বিলীন হয়ে যাবে। এ মনোভাবের সঙ্গে প্রাচীনকালের স্বর্গপ্রাপ্তির কল্পনার যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই, একথা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। প্রাচীনকালে বিশ্বাস করা হতো যে এই জীবনে খুব দুঃখ কষ্ট সহ করা যাক, তাহলে পরিণামে স্বর্গে অসীম সুখ ভোগ করা যাবে। এ যুগের নব্য স্বর্গবাদীরাও মনে করেন যে এখনকার মত রাষ্ট্রযন্ত্রের শতবিধ দমননীতি ও স্বাধীনতার পরিপন্থী দাপট সহ করা যাক এবং এর পরিণামে কোনো এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতে রাষ্ট্রবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এ-যুক্তির অসারতা সহজেই চোখে পড়ে। রাষ্ট্রহীন সমাজ যদি কাম্য হয়, তবে এইখানে এখনই (হিম্মার এণ্ড নাউ) তার সূত্রপাত করতে হবে। সাধন যে সাধ্যের মতই গুরুত্বপূর্ণ, একথা এবার স্পষ্ট হবে।

বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি সর্বোদয় বিশ্বাসীর দৃষ্টিভঙ্গী কি রূপ হবে—এই সম্বন্ধে আলোচনার পর এ-প্রসঙ্গের ইতি করা হবে। এ কথা স্পষ্ট যে রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিতরে থেকে, তার অভ্যন্তরে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধন করা যায় না। গাছের যে ডালে বসে আছি, সেই ডাল কাটার পরিণতি কি হবে, এর প্রশ্ন কালিদাস অভিহিত দিয়ে গেছেন। নুতন করে কালিদাস সেজে আর লাভ নেই। সুতরাং রাষ্ট্রের বিলীনীকরণ (বা এমন কি শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন মানসেও) সর্বোদয় বিশ্বাসী রাষ্ট্রযন্ত্রের অভ্যন্তরে হবেন না। বিরোধীদলকে প্রয়োজন হলে শাসনযন্ত্রের কর্তৃত্ব হতে হয়, অর্থাৎ সরকারী দলে পরিণত হতে হয়। (আর পার্লামেন্টারী

গণতন্ত্রে প্রত্যেকটি বিরোধীদলের আকাঙ্ক্ষাও তাই।) তা-ছাড়া গণতন্ত্রের বিরোধী দলও শাসনযন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁরা স্বর্ভূভাবে শাসন দণ্ড প্রয়োগের সতর্ক গ্রহণী (ওয়াচ ডগস অফ ডেমোক্রেসী)। অর্থাৎ তাঁদের পরোক্ষ সহায়তায় রাষ্ট্রযন্ত্র সঞ্চালিত হয়। তাঁরা বড় বেশি হলে শাসনরূপী তিরুবটিকার উপর মধুর প্রলেপ অবলেপন করেন। তাই অস্তিত্বে সর্বপ্রকার শাসনব্যবস্থার বিলোপ সাধনকারী সর্বোদয় বিশ্বাসীর বর্তমান নীতি হচ্ছে শাসনযন্ত্রের মর্যাদা হ্রাস করা। গণতান্ত্রিক বা এক নায়কত্ববাদী—যে-কোনো দেশেই এবং কল্যাণধর্মী (ওয়েলফেয়ার) বা কমিউনিস্ট—যে-কোনো ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেই শাসনযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থা আজ প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য ভাবে সর্বশক্তিমান এবং তার মর্যাদাও সর্বাধিক। রাষ্ট্রবিহীন সমাজের প্রথম ধাপ হচ্ছে জনসাধারণের মন থেকে রাষ্ট্রের এই মিথ্যা উচ্চ মর্যাদা দূর করা। সুস্থ গণতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রযন্ত্র সমাজের সেবায় নিয়োজিত বহুবিধ তন্ত্রের (ইনস্টিটিউশন) মধ্যে একটি ছাড়া আর কিছু নয়। পূর্বোক্ত ধারণা লোকসমাজে জনপ্রিয় করে ক্রমশ জন জীবনের এক একটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রভাবমুক্ত করতে হবে। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রিত করে এবং স্বাবলম্বী গ্রামপঞ্চায়েত স্থাপনা মারফত জনসাধারণের আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে শাসন ও বিচার ব্যবস্থাকেও বিকেন্দ্রীভূত করতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে ভূদানযন্ত্র ইত্যাদি আন্দোলন দ্বারা সমাজে নব মূল্যবোধ স্থাপনের কার্যক্রমের নেতৃত্বশক্তি জনসাধারণের কর্তব্যে প্রয়োজন। অতঃপর জনসাধারণ যে-যে ক্ষেত্রের কাজ স্বয়ং করে নিতে পারবে, সেই সব খাতে প্রদেয় সরকারী খাজনাও সরকারকে দেওয়া বন্ধ করবে। এই ভাবে শাসনযন্ত্রের এক একটি বিভাগ বন্ধ হয়ে যাবে। সর্বোদয় বিশ্বাসী নির্বাচনে কোনো পক্ষকে ভোট দেবেন না। ভোট দেওয়ার অর্থ রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বব্যাপক মর্যাদা স্বীকার করে নেওয়া। বর্তমানে যে-হেতু সরকারী বা বিরোধী—সকল দলই রাষ্ট্রবাদে (স্টেটইজম) আস্থাশীল, সেই ক্ষেত্রে সর্বোদয় বিশ্বাসীর সামনে নূনতম ক্ষতিকারক (লেসার ইভল) হিসাবে কাউকে বাছার প্রশ্ন নেই। তাঁকে বরং এই রকম সময়ে রাষ্ট্রবাদের শোষণ রূপ জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট ভাবে অনাবরিত করতে হবে।

লোক কল্যাণের ক্ষেত্রে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে মহাপ্রাণব্যক্তির পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। এক যুগের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে অপরযুগের মনীষী এগিয়ে চলেছেন। এ যাত্রার শেষ হয়নি, কোনোদিন হবেও না। একজন যেখানে শেষ করে যান, অপর জন সেখান থেকে শুরু করেন। একজনের ভুল, ত্রুটি এবং অপূর্ণতা থেকে উত্তরকালে অপর একজন শিক্ষা গ্রহণ করে মানব হিতের নূতন পথ আবিষ্কার করেন। তাই সমাজবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের পথে কোনো এক যুগের কোনো এক মনীষীর কথা বা তাঁর পুঁথিকে শেষ কথা মনে করা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক এবং কুসংস্কারপ্রসূত দৃষ্টিকোণ। এই জাতীয় মনোভাবের সঙ্গে মধ্যযুগীয় ধর্মাত্মতার কোনো রূপ ওগত পার্থক্য নেই। ভারত তথা বিশ্বের সম্মুখে আজ হিংসা এবং তার অশ্রুতম বাহ্য রূপ—অসাম্যের যে অলস্ত সমস্তা বিদ্যমান, গান্ধীশিষ্ট বিনোব তাঁর গুরু পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর এক যুগোপযোগী সমাধান দেবার প্রয়াস করছেন। আমরা যেন বিষয় মুখ দৃষ্টিকোণ থেকে

এৰ অন্তৰ্নিহিত বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা কৰি। এই সংক্ষিপ্তাকার প্রবন্ধমালা সেই প্রয়াসের উপক্রমণিকা স্বরূপ পরিগণিত হবে আশা করা যায়।

ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন এবং সর্বোদয় সমাজের আদর্শকে বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে বোঝার চেষ্টা না-করলে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের চাণ্ডিল সর্বোদয় সম্মেলনে শ্রদ্ধেয় জয়প্রকাশবারু যা বলেছিলেন, তাই সত্য হয়ে দাঁড়াবে। তাঁর মতে, “আমরা ‘বিপ্লব চাই, বিপ্লব চাই’ বলে চিৎকার করছি; কিন্তু বিপ্লব যে আমাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, তা লক্ষ্য করছি না।”

সমাপ্ত

বিবস্থানের ভূয়োদর্শন

বিবস্থান ঘোষ

। স্বর্গারোহণ ।

কার্পেটের মত নরম ঘাসের উপর আধশোয়া অবস্থায় বসে আনমনে ঘাসের গোড়া চিবুচ্ছিল। ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তেমনভাবেই দখিনা বাতাস আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল—আর কাছেই কোনো গাছের ডালে লুকিয়ে বসে একটা কোকিল ডাকছিল কু কু করে ।

ভোরের একটা কাব্যময় পরিবেশ । কবি গজেন দেব বা কবিশেখর দাদা তারাদাস রায় এখানে হাজির থাকলে নির্ঘাত দু'চারটে সুন্দর সুন্দর নিল দেওয়া পশ্চ যে লিখে ফেলতেন এতে কোনো সন্দেহ নেই । এক লক্ষ ষাট হাজার জীবিত কবির প্রতিপালিকা মা বাঙলা আমাকে কেন-যে কবি করেন নি তা শুধে খুবই দুঃখ হচ্ছিল ।

সুরকী ছড়ানো লাল টুকটুকে রাস্তা—জ্যানিতির আঁকাছোকায় মত বিচিত্র চঙে ঘাসের বুকে বিছানো । দলে দলে সুবেশা সুন্দরীরা বনিং ওয়াক করছিলেন সেই রাস্তায় । তাঁদের কারো হাতে বেঁটে ছাতা, কারো-বা সঙ্গে চেনে বাঁধা ছাপানী কুকুর । আমাদের বুঝলাম এঁরা সব একান্ত প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সঙ্কয়ের আশায় ভ্রমণে বেরিয়েছেন । এঁরা বেড়াচ্ছিলেন আর টেরিয়ে টেরিয়ে আমার দিকে বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করছিলেন । হয়তো ওটা ওঁদের অভ্যাসের দোষ । আমার কিন্তু বেশ ভালই লাগছিল ।

খালি আশ্চর্য লাগছিল একটা ব্যাপারে । আশেপাশে যারা ঘুরঘুর করছিলেন কেন জানি না তাঁদের মুখগুলো একেবারে চেনা চেনা ঠেকছিল । অনেকক্ষণ ঠাওর করে দেখবার পর কারণটা বুঝলাম । এ যে আমাদের সব খাস খাস চিত্রতারকারা । শুধু চেহারা কেন, হাঁটা-চলা পর্যন্ত সবই ঠিক ঠিক মিলে যায় ।

মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে লাগলাম—ঐ যে সম্মানিতা দেবী, উনি তো বৈচিত্র্য সেন, আর ওটি কল্যা সিংহী, ইনি কুমারী বিশ্বী, এটি কুমারী যতুবালা । পিছনের ওটিকে ঠিক চিনতে পারছি না—ঐ যে যিনি ষাগরা পরে বালিগত্তী হাঁটা হাঁটছেন, বোধ হয় কোনো নবাগতা তারকা ; কে জানে, হয় তো স্তোতনা দত্ত । সেই যে, ধীর নামে নতুন ডিভাইনের সাজী বেরিয়েছে—স্তোতনা সাজী ।

তখনই হয়ে ছুচোখ ভরে তারকা শোভা পান করছিলাম—কানে এস গীটারের মিষ্টি আওয়াজ । কে যেন পাকা হাতে 'ব্যাং আওয়ারা হু' সুর বাজাচ্ছে । একেবারে নিশ্চুঁত তুলেছে । একটু পরে বাজিয়েকেও দেখতে পেলাম । সাদা দাড়িওয়ালা পাকা আম মার্কি বুড়ো—গেরুয়া পুজামা আর ছোকা পরা । এর চেহারাটিও খুব চেনা চেনা ঠেকলো । একেও কি কোনো সিনেমায় দেখেছি'না-কি ?

আপন মনে বিভোর হয়ে গীটার বাজাতে বাজাতে বুড়ো চলেছে । সামনে বরাবর আসতেই ডাক দিলাম—

‘কুনছেন ?’

দাঁড়িয়ে গেল বুড়ো। তারপর ভুরু কঁচকে আমার দিকে সন্দেহভরে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো—‘তুম্ কৌন হায় ?’

পরিচয় দিলাম—‘আমি বিবস্বান ঘোষ ; ঠাকুর ভবতারণের কৃপায় মর্তে দেহ না রেখেই স্বর্গে বেড়াতে এসেছি।’

বুড়োটা ভারি বেয়াড়া। আমার অমায়িক কথাবার্তায় বিশেষ খুশি হ’ল বলে মনে হ’ল না।

‘কেয়া মাংতা’—মুখ ভেংচে প্রশ্ন করলো।



আমি আবার বোঝাবার চেষ্টা করলাম। শ্রীশ্রীভরতারণ ঠাকুরের ভক্ত-আসর—আমার সেখানে প্রসাদী কলিকা সেবন—তারপর মন্ত্রপুত ধোয়ার তেজে মহাশুদ্ধির মধ্য দিয়ে রকেট-বেগে অভিযান—শেষে এই স্বর্গের নন্দনকাননে ল্যাঙ-করণ—সবিস্তারে সব বললাম বুড়োকে।

বুড়োর মুখের ভাবটা একটু সহজ হল। তবু সে খুঁতখুঁত করতে লাগলো—

‘ভবতারণটার কোনো আক্কেল নেই। আজকাল যাকে-তাকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাচ্ছে। কোন কঁকে কোন ব্যাটা কমিউনিস্ট এসে সৈধ্যবে—দেবে স্বর্গের সোশ্যাল লাইফ শুলিয়ে। নাঃ, বিছুকে বলে এর একটা বিহিত করতে হচ্ছে। সব আকাটই যদি সশরীরে স্বর্গে আসতে পায় তবে স্বর্গলাভের আর দাম রইল কি ?’

জিজ্ঞাসা করছি। জানো তো আধুনিক সাংবাদিকরা পলিটিক্স নিয়ে মাথা ঘামায় খুবই, কিন্তু নিজেরা পলিটিক্সে নামে না—বিশেষ করে বাম-ঘোঁষা পলিটিক্সে।’

বুড়ো সন্তুষ্ট হাঁসি হেসে বললো, ‘নাঃ, তোমাকে বলতে আপত্তি নেই। এরা কি সব সর্বনেশে কথা বলছে জান? বলছে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ চাই, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র চাই, কুবের ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ চাই, সহ-অবস্থানের ভিত্তিতে দৈত্যরাজ্যের সঙ্গে স্থায়ী শান্তিচুক্তি চাই—আরও কত কি সব, জান চাই, ত্যান চাই। জালিয়ে খেলে ছোঁড়াগুলো। স্বর্গের এতদিনের ঐতিহ্য—কিছু কি মানতে চায়।’

হেসে বললাম, ‘রাগ কোরো না ঠাকুর, তোমরা দেবতারা ভারি বোকা। এই সব সামান্য সামান্য সমস্যা মেটাতে পারো না? কি করে যে তোমরা রাজ্যি চালাও বুঝি না। হাওয়া বুঝে সব কিছুই চাকনা বদলাতে হয়—তা আসল চিহ্ন পালটাও আর না পালটাও।’

বুড়ো সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো।

আমি বললাম, ‘পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের দাবী মেনে নাও। ওটা আমদানী করলে ওর মধ্যে এসে সব গরম রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ঠিকভাবে ইলেকসন চালাতে পারলে গদীদারদের জয় অনিবার্হ—পার্লামেন্টে নেতৃরিটি হবেই। দেবরাজ তখন হবেন স্বর্গ সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট। ইন্দ্র থেকে প্রেসিডেন্টগিরি সহস্র গুণে ভাল। খাও-দাও, ছত্রিশ ঘোড়ার গাড়ী চড়—আর তুহাতে বেপরোয়া সরকারী টাকা ওড়াও। মুখে বললেই হল, গণতন্ত্র, গণতন্ত্র। কুবের ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ চায়? তাই করে ফেলো। কুবেরকে করে দাও জাতীয় ব্যাঙ্কের গভর্নর। কিংবা ওকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী করে দাও। মূল ব্যবসাটা না-হয় ও ভাই বা ছেলের নামেই করবে—তাতে ক্ষতি কি। তারপর ধর শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান আর শান্তিচুক্তির দাবীটা। স্বর্গরাজ্য আর দৈত্যরাজ্যের মধ্যে এখন যখন কোনো যুদ্ধ হচ্ছে না তখন খাতায় কলমে একটা শান্তিচুক্তি রাখতেই বা আপত্তি কিসের?’

বুড়ো সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথাটা দোলাতে থাকলো। বুঝলাম কথাগুলো তার মনে লেগেছে। মগজটা তো বেশ সাফ। বুড়ো শুধু রসিক নয় বুদ্ধিমানও বটে। বাঘনার হাতও তো বেশ পাকা। মনে মনে বেশ পছন্দ করে ফেললাম বুড়োকে।

চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলাম—‘আচ্ছা ঠাকুর, এতক্ষণ এত সব আলোচনা হ’ল কিন্তু তোমার পরিচয়টা যে জানা হ’ল না।’

‘নাম—শ্রীনারদগোপাল সেনগুপ্ত, ধাম—বৈকুণ্ঠ টেরেস, পেশা—কলহ উৎসাহদান ও গানের মাস্টারী, নেশা, মানে হবি—কেলেকারীর কাহিনী সংগ্রহ—’

‘ধাক ধাক ওতেই হবে—’ বাধা দিয়ে আমি বললাম।

পবন স্টেডিয়ামকে বাঁ-পাশে রেখে একটু উত্তর মুখে এগোতেই সামনে পড়লো বিরাট নদী মন্দাকিনী। ইঁা স্বর্গের নদী বটে। পরিষ্কার কাঁচের মত টলটলে জল—তাতে রাশি রাশি পদ্ম ফুটে রয়েছে—সাঁতারু হংস-হংসীরা গুগলীর লোভে ঘন

ঘন ডুব দিচ্ছে জলে। এদিকে ওদিকে পাড়ে ছিপ হাতে বসে রয়েছে উঠতিবয়সী দেবকিশোররা।

নদীর ধারে ধারে সুন্দর সাজানো পাশ্বনিবাস। পাশ্বনিবাসের সামনে বিরাট লন—ফুল গাছে ঘেরা। লনে গোল গোল বিরাট আকারের রংবেরং এর ছাতা মাটিতে পৌতা ছাওলে ভর দিয়ে উর্ধ্বমুখে ঝাড়া। ছাতার তলায় পাতা ছোট ছোট ফরাসে দেবদেবীরা নানা ভঙ্গিমায় শায়িত। প্রত্যেকেরই হাতে দেখলান এক একটি বৃহদাকৃতি ভাঁড়। পাশ্বনিবাস থেকে ভেসে আসছে বৃহৎ অর্কেষ্ট্রার সুর। সংগীত উপভোগ করতে করতে বিহ্বলদৃষ্টি দেবদেবীরা ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছেন। কেউ কেউ আবার মাথাও তুলছেন না—ভাঁড় সহ গড়াগড়ি খাচ্ছেন ফরাসে। কেমন একটা ঢিলা ঢালা বেপরোয়া আবহাওয়া।



বুড়ো পাশ্বনিবাসের মধ্যে চুকে গিয়ে দুটি ভাঁড় হাতে করে বেরিয়ে এলো। একটা ছাতার তলায় আরাম করে বসে একপাত্র আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বুড়ো বললো—‘নাও, সোমরস খাও আদার।’

ভাঁড়ের পর ভাঁড়—সোমরসের স্রোতে ভেসে চললান দুজনে।

পরম ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে বুড়োকে প্রশ্ন করলাম—

‘আচ্ছা ঠাকুর, এখানে নন্দনকাননেতে আমাদের মর্তের বহু সিনেমা তারকাকে দেখলাম যেন। ওনারা কি সব রাতারাতি পটল তুলে এখানে চলে এসেছেন, না আমার মতই কোনো মহাপুরুষের আসরে একযোগে কলকে টেনে সদলে সশরীরে এসে হাজির হয়েছেন?’

বুড়ো জোরে হেসে উঠলো।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম ‘না না—এটা হাসির কথা নয়। সত্যিই আমাদের সব তারকারা যদি আজ মর্ত ছেড়ে চলে এসে থাকেন তবে মর্তের ছেলেছোকরাদের

দশা কি হবে ? তারা কাদের গাড়ীর নম্বর, বাড়ির নম্বর মুখস্ত করবে ? কাদের ক্ষণিক দর্শন আশায় তারকা-পদধূলি-ধনু সিনেমা ঘরের সামনে দলে দলে ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা করবে ? কাদের আকুল আগ্রহের জমাট চাপে প্রাণহরণ-বিশারদ টান বাগ হিংস্রস্বভাব ভুলে গিয়ে বিস্ময়ে অনড় হয়ে রাজপথে দাঁড়িয়ে থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ?

বুড়ো চোখ মটকে বললো—‘ঘাবড়াও মৎ । তোমাদের ভেনারা কেউই স্বর্গে হানা দেননি । এরা সব স্বর্গেরই অঙ্গরী কিল্লরীর দল ।’

‘তাহলে ?’

‘বাপারটা তোমায় খুলেই বলি ভায়া । ইদানিং স্বর্গের দেবতার, বিশেষ করে যুবকদের দল স্বর্গের রূপসীদের দিকে আর ভেনন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না । তাঁদের নজর এখন মর্তের বৈচিত্র্য সেন, যত্নবালাদের দিকে । ইন্দ্রসভার নাচগানের আসর ছেড়ে তাঁরা এখন মর্তের সিনেমা থিয়েটারের দিকেই ঝুঁকছেন । একটু নজর করলেই দেখতে পাবে ভাদার, টিকিটলুক হবুদর্শকদের যে-বিরিট লাইন সিনেমাগুলোর সামনে হররোজ অপেক্ষা করে সেই লাইনের বোশরভাগই হলেন ছদ্মবেশী দেবতা বা দেবখোকা । অনেক চেষ্টা করেও আর এদের স্বর্গে আটকে রাখা যাচ্ছে না দেখে দেবরাজ সব অঙ্গরী-কিল্লরীদের নোটিশ দিয়েছেন যে তারা যদি স্বর্গের ছোকরাদের স্বর্গে আটকে রাখতে না পারে তা হলে নির্ঘাত তাদের চাকরি যাবে । এই বাজারে বিনা কাজে মাইনে দিয়ে নাচিয়ে গাইয়ে পুষতে তিনি নারাজ ।

ভায়া, তাই বিপন্ন স্বর্গললনারা চেষ্টা করে দেখছেন যে তোমাদের দেবীদের মূর্তি ধরে স্বর্গের যৌবন জলতরঙ্গকে স্বর্গেই আটকানো যায় কি না ।’

‘বাঁচলাম !’ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলি আমি ।

আরও কয়েক ভাঁড় অতিক্রম করাতে বুদ্ধিটা আনার আরও খুলে গেল মনে হলো । সাঁ করে একটা নূতন আইডিয়া বিদ্যুতের মত খেলে গেল মাথায় । নারদকে একটা ঠেলা দিয়ে বললাম—

‘শোনো ঠাকুর, তোমায় একটা প্র্যান বাতলাই । তোমরা স্বর্গে মাসে গোটাকতক করে বিচিত্রানুষ্ঠান করো না কেন ? আমাদের মর্তের তারকারাই সেখানে চেহারা দেখাবেন, নাচবেন, গাইবেন । ওঁদের আনাবার ব্যবস্থার জন্তে ভাবতে হবে না । ঐঐভবতারণ ঠাকুরকে বলে ছিলুম-পথে তোমাদের ফেব্রিটদের স্বর্গে আনবার ব্যবস্থা না-হয় আমিই করবো । ইম্প্রেশ্যারিও হিসেবে আমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিলেই আমি খুশি ।’

‘দেবরাজকে বলে দেখি ।’ চিস্তিত মুখে বুড়ো বললো ।

কিঞ্চিৎ অর্ধাগমের আশা আছে বুঝে আমি বুড়োকে আরও উৎসাহিত করতে চেষ্টা করলাম—

‘এ ধরনের ফাংশানের ফলে শুধু যে স্বর্গের দেবতার স্বর্গে ফিরে আসবেন তাই নয়—স্বর্গের সঙ্গে মর্তের একটা সাংস্কৃতিক যোগাযোগও গড়ে উঠবে ধীরে ধীরে । আর দেখ ঠাকুর, এতে তোমাদের হাদ্যমা কত কম । কর্ণের সহজাত কবচ কুণ্ডলের মত নাচ আমাদের তারকাদের সহজাত । না শিখেও ওঁরা নাচতে পারেন সকলেই ।

আর গান ? প্রে ব্যাক সিস্টেম থাকতে ভাবনা কি । ওঁরা ঠেজে চেহারা দেখাবেন আর নেপথ্য থেকে গানগুলো গেয়ে দেবেন তোমাদের এখানকারই কিন্নরীরা । কত সুবিধে । আরও দেখ, মর্ত থেকে আবহ সংগীত শিল্পীদেরও আনতে হবে না । তুমি আর স্বর্গের আর আর সব পেশাদার বাজিয়েরাই ওটা বেশ পারবে ম্যানেন্স করতে ।’

নারদের মুখটা আরও চিন্তাকুল হয়ে উঠলো । বুঝলাম আমার প্রস্তাবের আকর্ষিকতা আর অভিনবত্বের ধাক্কা বুড়োকে কাহিল করে দিয়েছে । সাংবাদিকের সাফ মাথা থেকে যত ঝট্ করে প্ল্যান বার হয় অত ঝট্ করে কি সে-প্ল্যান যার তার মাথায় ঢোকে ? বেশ গর্ব অনুভব করলাম মনে মনে ।

নীরবে ছ’জনে ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছি এমনসময় ঠিক আমার পাশটিতে কার মধুকণ্ঠ শুনলাম—

‘কি ঠাকুর, রামগুরুড়ের ছানার মত মুখ করে বসে কেন ? তোমার আবার এত ভাবনা কিসের ?’

মুখ ফিরিয়ে দেখি আমার পাশে ভাঁড় হাতে ‘বৈচিত্র্য সেন । বুড়োও মাথা তুলে দেখলো ।

‘আরে ঘুতাচী যে । এস, বস । এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই । এ মর্তের সাংবাদিক বিবস্থান ঘোষ । শরীরে স্বর্গে বেড়াতে এসেছে । ভারি চমৎকার ছেলে ।’

আমার পাশে ঘেঁষে বসে পড়ে ঘুতাচী বিহ্বল, কি খাই-কি খাই চোখে আমার দিকে তাকালো । সেই সিনেমার নায়কের সঙ্গে ভাগাভাগি করে গান গাইতে গাইতে আমাদের ভারতীয় নায়িকারা নায়কদের দিকে যেমন দৃষ্টি হানেন, ঠিক সেই রকম দৃষ্টি । আমার বুকটা ধড়াস ধড়াস করে উঠলো, মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরে গেল ।

আর বার কয়েক সেই রকম দৃষ্টিঘাত করতেই আমার আর কোনো পদার্থ রইলো না ।

খপ্প করে আমার হাতছটো ধরে মিহি সুরে ঘুতাচী বললো—

‘আমি সাংবাদিকদের ভারি পছন্দ করি । কবে থেকে আশা করে আছি যে একজন জ্যাস্ত সাংবাদিকের সঙ্গে ভাব করবো কিন্তু জানেন, একজনকেও এর আগে পাই নি কাছে । আপনাকে পেয়ে কি ভাল যে লাগছে । ওঃ, ওয়াওয়ারফুল ।’

‘স্বর্গে সাংবাদিকদের তো চুকতেই দেন না এঁরা, এমন কি দেহত্যাগী সাংবাদিকদেরও না । মুখে কারণ দেখান, সাংবাদিকরা জীবনে কখনো সত্যকথা লেখেন না—তাই স্বর্গে তাঁদের প্রবেশ নিষেধ । কিন্তু আসল ব্যাপার কি জানেন ?’ এঁরা সবাই মনে মনে সাংবাদিকদের ভয় করেন—প্রচণ্ড ভয় করেন ।’

ঘুতাচীর মুখের দিকে তাকিয়ে বাক্যসুধা পান করছি, হঠাৎ আমার দুই কাঁধের উপর নিষের দুখানা হাত চালিয়ে দিয়ে ঘুতাচী আবদারের সুরে বললো—

‘শুনেছি আপনরা সবজাস্তা, আপনি গানও গাইতে জানেন নিশ্চয়ই । শোনাবেন একটা গান ? আমার অনুরোধ । সত্যি গান আমি ভী-ষ-ণ ভালবাসি ।’

জীবনে কোনোদিন সুরচর্চা করিনি । কিন্তু কেন জানি না মনে হল গান

আমার কুস্কুসে গজ গজ করছে। হাঁটুতে তাল দিয়ে গাইতে লাগলাম—‘আমি চিনি গো। চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী—’

অনুভব করলাম ভাবের জোয়ার আমার প্রতি স্নায়ুতে। মনে হল স্বরধ্বনি আমার খাস জমিদারী। মাথা ঝাঁকিয়ে তান বাট সহযোগে দিল খুলে গাইতে লাগলাম। দ্বতাচী আরও বনিষ্ঠ হয়ে আমার গায়ে হেলান দিয়ে বসলো। মাঝে মাঝে মাথাও নাড়তে লাগলো।

উৎসাহে খুব প্রাণ ঢেলে গাইছি, হঠাৎ বুড়ো আমার পিঠ চাপড়ে অস্থানে গলা ছেড়ে চৈচিয়ে উঠলো—বাহবা, বাহবা। আমি মারাত্মক চমকে গিয়ে ভীষণ বিষম খেললাম। দম আটকে—কেশে অনেক কষ্টে যখন সামলালাম তখন গান আমা থেকে প্রস্থান করেছেন বিলকূল।

ভীষণ চটে গেলাম। সন্দেহ হল, বুড়ো দ্রষ্টাকাতর হয়ে ইচ্ছা করেই আমার গানের মাঝপথে বাধা দিয়েছে। রেগে বললাম, ‘আচ্ছা বেরসিক তো।’

বুড়ো বললো, ‘রাগ কোরো না আদার, তোমার অমন বলিষ্ঠ গান শুনে আমি আর মানসিক উত্তেজনা ধামাতে পারলাম না।’

রেগে ছ’কথা শোনাতে যাচ্ছিলাম, দ্বতাচী বাধা দিয়ে আদরের সুরে বললে—‘না না ঝগড়া নয়। এমন মধুর পরিবেশে আপনাকে মন খারাপ করতে আমি দেবো না। দাঁড়ান ছ’ভাঁড় নিয়ে আসি।’

দ্বতাচী উঠে গিয়ে ছ’ভাঁড় সোমরস নিয়ে এল।

আবার ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে দ্বতাচী একান্ত হয়ে আলাপ শুরু করলো। অনুভব করতে লাগলাম ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই দ্বতাচীর সঙ্গে আমার ভয়ানক ভাব হয়ে গেছে। মনে হতে লাগলো ও যেন আমার কত কালের চেনা।

এই কথাটাই বেশ লাগসই কোটেশন দিয়ে বলবার জন্তে মনে মনে হাতড়াতে লাগলাম কবিতা। কিন্তু কিছুতেই ভাল ছটো লাইন মনে আসতে চাইল না। অনেক অনেক চেষ্টার পর আমার এক আধুনিক কবি বন্ধুর কবিতার আরম্ভটা মনে এল। ফিস্ ফিস্ করে দ্বতাচীকে বললাম—

মনের দেওয়ালে একি ভ্যানগগ্ আঁটা।

বিনতা সে অসময়ে ভাঙ্গে যেন গরুড়ের ডিম।

তোমার দিঠির ঘায়ে হৃদয়ের ফুটি হল ফাটা ;

বেদনা অস্বিষ্ট দেখি, আনন্দ নিঃসীম।

দ্বতাচী মাথাটা কানের কাছে এনে চুপি চুপি বললো—‘আমিও মরেছি।’

আরও চার পাঁচ ভাঁড় সহযোগে চললো আমাদের মধুর আলাপ। মধুর থেকে মধুরতর! মধুর আধিক্যে জিভ জড়িয়ে যেতে থাকলো। শেষে শব্দ, বাক্য সব অস মাগু চোহারা নিয়েই জিভ বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বেরোতে লাগলো। চোখও টেনে

টেনে খুলতে পারছি না। আবেশে বিভোর হয়ে অক্ষুট আলাপ চালিয়ে যেতে লাগলাম চোখ বুজেই।

মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে ঘুতাচীর মুখটা যতবারই ধরতে যাই ততবারই এক গোছা পাট হাতে লাগে যেন। মনে মনে হিসাব করি, বাঁ দিকে নারদ—ডান দিকে ঘুতাচী। হাত বাড়াই ডান দিকে, আবার মুঠিতে আসে সেই কুরকুরে পাট জাতীয় বস্তু। প্রবল বিরক্তিতে চোখ বুলে দেখতে চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা কি। কিন্তু পারলাম না।

মনে হল দোলনায় দোল খাচ্ছি। আবার মনে হল কানের কাছে কে যেন ঘুমপাড়ানি গান করছে—কেমন একটানা কান্না কান্না সুর—কলকাতা বেতার কেন্দ্রের লম্বু সংগীতের আসর না কি? শুনতে শুনতে পা দুটো ছড়িয়ে ঘুতাচীর কোলি লক্ষ্য করে মাথাটা নামিয়ে নিয়ে এলাম। কই কোল! বহু চেষ্টা করেও কোলে মাথা ঠেকাতে পারলাম না। চোখে রঙিন ফুল দেখতে লাগলাম শত শত—রামধনু হাজার হাজার। তারপর আর কিছু মনে নেই।

কায়েকটি কবিতা ও একটি রাতের কাহিনী

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

। সমুদ্রের কলরব ।

হঠাৎ একঝলক বাতাসে
কার যেন সুরেলা গলা ছলকে ওঠে
রাস্তায়
ট্রামেবাসে
রিক্সার ঠুনঠুন
রাস্তায় ভিড়
আবার হঠাৎ একঝলক বাতাসে
কোথায় যেন ঘুড়ুরের দ্রুত বোল শোনা যায়

সারাটা রাস্তায় অগণিত লোকজন
ট্রামবাস
কলরব
সারাটা রাস্তায় ফেনিয়ে ফেনিয়ে ওঠে
কলরব
ক্রান্তি
অবিশ্রান্ত পথ-হাঁটায়
রাস্তায় শুধু ছলকে ছলকে ওঠে

রাস্তায় দমবন্ধ ভিড়
ভিড়ের মাঝে আমি ভেসে চলি
কলরব-সমুদ্রে
ক্রান্তির ছপুরের মতো নিশ্চেষ্ট নৌকায় চড়ে
ভিড়ের আবর্তে আমি পাক খাই
কোথায় যেন কার সুরেলা গলা
বাতাসে টুকরো টুকরো হয়ে আমার কানে আসে
কোথায় যেন তালে তালে
কার পায়ে নেশা-ধরানো ঘুড়ুরের বোল
ছপাশে দোকান
দোকানে রঙবেরঙের আশ্চর্য ফুল
নানারঙের লোক
আর তাদের বর্ণালী কলরব

এই কলরব-সমুদ্র পেরিয়ে
 এই ক্রান্তি মুছে
 তার সুরেলা গলা ছলকে ওঠে
 তার চলার শব্দে ঘুড়ুরের ঝঙ্কার
 আমি রাস্তায় আর তখন নেই
 আমার হাতে একগুচ্ছ কুল
 অগণিত লোকের উজ্জ্বল চাহনির মতো
 এর সৌরভ রাশি রাশি স্বপ্নের মতো
 ছড়িয়ে ছড়িয়ে যায়
 শুধু ফেনিয়ে ফেনিয়ে ওঠে
 থৈ থৈ হয়ে যায় বিশাল ভিড়ের মতো
 তারপর সমুদ্রের মতো
 অসংখ্য ঢেউয়ের কলরব তুলে
 সে হঠাৎ আমার সামনে ভেঙে পড়ল ।

॥ যুগযুগধরে..... ॥

সূর্যের আলোকে
 রক্তপদ্মটি কুটে উঠল ধীরে ধীরে
 আমার চোখ যেন ঝলসে গেল
 কিছুই স্থাখা গেল না

আমি চোখ তুললাম
 দিনের দীপ্তির মতো তার দেহ
 অক্ষিসন্ধিতে ছড়িয়ে গেছে
 দারুণ ছুপূরের মতো তার দেহের উজ্জ্বলতা
 আমার হাত এগিয়ে দিলাম
 সারাটা আকাশ অন্ধকার হয়ে এল
 পাতালের মতো অন্ধকার
 আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম
 আমি সেই দেহে ফিরে গিয়েছি
 বহুযুগধরে, সেই অন্ধকারে
 গাঢ়, উত্তপ্ত
 ইচ্ছার আগুনে-মেলা
 তার পাপড়ি

আমি তার গর্ভে ছুঁ ডোবাই
 সে যেন সমুদ্র
 ঢেউয়ের গর্ভ থেকে শাদা ফেনা ছিটকোয়
 কেয়েন তাদের আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেয়
 আমি তার দিকে তাকাই
 আমার চোখ সেই অমুভূতি
 সূর্যের আগুনের মতো সেই উত্তপ্ত পাপড়ি
 আকাশের মতো রহস্যময়
 সুগন্ধগন্ধে, অন্ধকারে
 এই অজ্ঞাত দেশ

আমি সেই দেহে ফিরে গিয়েছি
 অমুভূতির শিলায় শিলায় শ্রোত
 গাঢ় ঝরনা, বাধার পাথরে
 ঝনঝন বসন্ত
 ছমছম শিলাময় দেয়াল
 যৌবনের ক্ষতবিক্ষত কুল
 সেইদেহে
 আমি ফিরে গিয়েছি

সুগন্ধগন্ধে অন্ধকার আলিয়ে দেয়
 সূর্যের আগুন
 তারপর রক্তপট্টাটি কুটে উঠল ধীরে ধীরে
 আমার চোখ যেন ঝলসে গেল
 চারপাশে পাতালের মতো অন্ধকার
 ঘোর অচৈতন্যে আমি কোথায় হারিয়ে গেলাম
 কোথায় গেলাম কিছুই স্থাখা গেল না ।

। আবার বেঁচে উঠব ।

একটা ভালোবাসার গান শোনাও
 আর চুপ করে থাকি যার না
 ধমধমানো পাহাড়
 নদীর শ্রোত ঘমে বরফ
 তোমার গানের উত্তাপ দাও
 আমাদের নৌকাটা ভাসাই
 আমরা আবার বেঁচে উঠব

আর চুপ করে থাকি যায় না
 আনের বোলের মিষ্টিগন্ধ
 বাতাসে কে যেন নিঃশব্দে ছড়াচ্ছে
 প্রেমিকের হাসির মতো
 চাঁদের আলো উবছে উঠছে
 আর কেন
 তোমার হৃদয়ের সকল উদ্ভাপ
 এবার ঢেলে দাও

আমাদের সাধ মিটল না
 বাতাস হয়তো সারারাত আফসোস করবে
 প্রতিবেশী এতে শিউরে উঠবে
 পোয়াতি মেয়েটি ঘুমে অচেতন
 তার শিশুকে বোধ হয় খুঁজছে
 ধমধমানো দুঃস্বপ্ন
 উদ্ভাপহীন স্বামীর দেহটা পড়ে আছে
 চারদিকে বরফ অন্ধকার

আর চুপ করে থাকি যায় না
 তোমার ভালোবাসার গানটা গাও
 আকাঙ্ক্ষার মুকুলগুলি এবার কুটে উঠুক
 কোথায় তরুণ-তরুণীরা তাদের পাবে
 কোথায় যৌবনের নরম বিশ্বয়ে
 তারা চমকে উঠবে
 আর পরস্পরের দিকে তাকাবে
 আর কেন
 পাহাড় পেরিয়ে উপত্যকায় নামা থাক
 নদীর স্রোতে এসো ভেসে যাই
 আমরা আবার বেঁচে উঠব ।

। স্মৃতি ।

স্মৃতি আবার নব্বরে ফিরে এল । এখন সে কোথায় বেরুবে
 সর্বকালের সুকঠিন স্থিতিকে সে এখন আর ধরে রাখতে
 পারছে না । এ-কথা এখন সে আর বলে না—অপ্রয়োজনীয়,
 জানায় না—কারণ হৃদয় মতো অজ্ঞাত ।

সুশ্ৰিতাকে আমি জানি । সে আমাকে শ্ৰিতহেঁসে আসতে বলে,
বলেও বলেনা তার হাসির প্রাসাদে একটা ভীষণ শূন্যতার
অচেতনতা—যার রাজ্যের গীমানা দিনরাত্রি প্রতিমুহূর্তে
বস্ত্রের ফলের মতো এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে । সে আমাকে
বসতে বলে । আমাদের বসার জায়গাটা ভয়ানক অস্থির
অঞ্চল নিপ্রাণ কাঠের মতো । সেটা তার দৃষ্টির আভাসে
বোঝা যায়, তার নৈঃশব্দ্যে অনুভব করি । একসময় দিকশূন্য
হয়ে উঠে পড়লাম বেন—দিকশূন্য কারণ আমার সামনে
দিগন্তের কোনো অস্তিত্ব ছিল না । বোধহয়, আমি দেয়ালে-টাঙানো
তার কোনো ছবি দেখছিলাম ।

কে যেন বলে : স্বত্বের কথাটা একবার ভেবে স্মাখো ! প্রতিনিয়ত
ক্ষুধার অত্যাচার, আর দেহের তাপে-গলা কতকগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ
মুহূর্ত ! ব্যস !—সুশ্ৰিতা শ্ৰিত হেঁসেই এ-কথাটা আমাকে
বলে । আমি জানিনা, সে কী বলতে গিয়েছিল : আমি
বোধহয় বলতে পারি—সে কী বলবে না । সুশ্ৰিতা আমাকে
জানে, চেনে । তাকে আমি জানি ঠিক দেয়ালে-টাঙানো
একটা দৃষ্টি-জীর্ণ ছবির মতো—একটা শুধু ছবি ।

তাই সে আর বেরতে পারে না । আবদ্ধ । তার কল্পনা
রোদ্দুরে-বাতাসে ছড়িয়ে, হয়তো কখনো-বা ঘুনিতে
সুরপাক খায়—কারণ চিরকালের স্থিতি তার নেই,
নেই তা' সে ইতিমধ্যে জেনেছে । জেনেছে বলেই বোধহয়
আমার জানাটা তার কাছে অপ্রয়োজনীয়, স্বত । আমি
অস্থির হয়ে বেরিয়ে পড়ব বলে সে কোনো কথা বলে
না—শুধু হাসে নিঃশব্দ্যে, শ্ৰিত সৌজন্যে—না, বোধহয়
দাক্ষিণ্যে !

দেয়াল ।

অন্ধকারে দেয়ালটা ঠাহর হল না । হাতের আঙুলে সমগ্র
অনুভূতি এসে জড়ো হয় কী হোঁবার আশায় । কিন্তু সেখানে
শুধু জমে আঘাতের দাগ, মাংস ফেটে চাপ-চাপ রক্ত
আর অসহ যন্ত্রণা । অন্ধকারের দেয়াল-ঘিরে থাকে মগ্ন
যন্ত্রণার মতো একটা অশ্রুট স্বপ্ন ।

এই অন্ধকারে আমি থাকি । স্বপ্নের কথা আমি ছেনেছি ।
বলতে পারি কেমন ভাবে একটা নদী একদিন হঠাৎ
চীৎকার করে উঠে চিরতরে নির্বাক হয়ে গেল । সে-কথা
মৃত স্রোতের চোখ দেখে বুঝেছিলাম । সেখানে আমি
পৃথিবীকে ছুঁয়ে আছি । কী ভয়ানক ঠাণ্ডা । আমার পাথর
হয়ে-যাওয়া কান্নার মতো একটা দেহ নিম্পন্দ হয়ে পড়ে
আছে যেন । আমি তার গায়ে হাত বোলাই । আমি
আচ্ছন্ন হয়ে গেছি । ভাবি, উত্তাপ আবার ফিরে
আসছে ।

কোথায় গিয়ে যেন তার স্মৃতি পাওয়া গেল । সে
তাকিয়ে ছিল দূর পাহাড়ের দিকে । সমতলে সূর্যালোকের
উৎসব । আমি সেদিকে এগুতে লাগলাম । আমার
গায়ে অন্ধকার-গন্ধ । এক ছুরারোগ্য ব্যাধির মতো
আমার দেহে এদের আক্রমণ । সে এ-কথা জানত না ।
আমি কী বলব তার কাছে গিয়ে । আমার এই
মৃত্যু-আক্রান্ত মুখ তাকে কী করে দেখাব । দূর স্বপ্নের
মতো তার দৃষ্টি ছড়িয়ে । ভাবি, কোথায় গিয়ে তাকে
বলা যায় ।

কিন্তু কী আশ্চর্য এই জীবন, এই অন্ধকার, এই মৃত্যু ।
শাস-রোধী দেয়ালের মতো অন্ধকারের কটু গন্ধ আমার
চৈতন্যকে চূপ করিয়ে দিতে চাইছে । আমার আঙুলগুলো
যন্ত্রণায় ছমড়ে বেঁকে গেল । সমগ্র অমুভূতি তাল
পাকিয়ে যাচ্ছে যেন । যন্ত্রণার দেয়ালটা ক্রমেই যেন
উঁচিয়ে উঠছে । এই দেয়ালের বাইরে দূরতম নদীর
মতো আমার অক্ষুট স্বপ্ন—এর ভেতরে সুপহয়ে
আছে আমার ভালোবাসার হৃৎসহ মৃত্যু—পৃথিবী আমার ।

। রাতে, রাত নেই ।

রাত নেই, নেই । এখানে শুয়ে আছি আমার নিভে-যাওয়া
স্নায়ুগুলিকে নিয়ে । না, নিভে যায় নি—একেবারে পুড়ে গেছে ।
শুধু ছাই । আমার পাশে মৃতসূর্য । কিছুক্ষণ আগে তাকে
আমার নিঃসঙ্গ চাঁদ বলে মনে হয়েছিল । তা' আমি তাকে
বলেছিলাম ।

সে বলেছিল : রাতে এমনি মনে হয় ।

রাত নেই, নেই । দিনের তাড়নায় আমি পালিয়ে পালিয়ে
বেড়িয়েছি । খোলাপথকে ভয় করেছি । মানুষের ছায়ার
ত্রিসীমানায় ঘেঁষিনি । নদীকে আমার মনে হল গলন্ত ধাতুর
স্রোত । ধাতব পৃথিবী । ওখানে গেলে আমার যত্ন হত ।
বরং অরণ্য ভালো । আমি কখন মাতালের মত টলতে টলতে
এখানে এসে থেমে পড়েছিলাম তা' আমি বলতে পারব
না । চোখ খুলে দেখলাম : চারপাশের অবয়বে রাত ।
আমার দৃষ্টির অসুসজ্জান তার চোখের স্বেচ্ছা দেখতে
পেয়েছিল ।

আমার মনে হল আমাকে ঘিরে আছে অসংখ্য চোখ । তারা
অদৃশ্য, অদৃষ্ট । তাদের অণুরীতি মর্মভেদী চাহনি আমার
অস্তিত্ব ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে তুলছিল । আমি যেন যন্ত্রণায় অন্ধ
হয়ে গেলাম । না, নিদ্রা আমার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে । আমি
প্রাণপণে ঝাঝবার চেষ্টা করলাম, বলবার চেষ্টা করলাম :
আমি শু অন্ধ ! আমাকে নিস্তার দাও—যদি পারো আমাকে
যত্ন দাও । তারা কিছু বলল না । শুধু দেখলাম, অসংখ্য
চোখের আকাশে আমার দৃষ্টি একেবারে কখন হারিয়ে
গেছে । আমি অন্ধ !

এখন কত রাত ! আমি যেন বহুকণ শুয়ে আছি ।
আমাকে ভয়ঙ্কর বলে মনে হল । আমি তাকে বললাম,
আমাকে তবে উড়িয়ে দাও । আমি আর আমার
দেহভার বইতে পারছি না, না । যত্নতেও শান্তি নেই,
স্বস্তি নেই । আমার চারপাশের অবয়বে রাত ।
আমার পাশে যত্নহীন আর নৈঃশব্দের কঠিন পৃথিবী ।
আর সে । তখন তাকে যেন মনে হল ভয়ানক নিঃশব্দ চাঁদ ।
তা' আমি তাকে বললাম ।
সে বলল : রাতে এমনি মনে হয় ।

॥ চন্দ্র ॥ ৭

কাঁচামিঠে : প্রযোজনা : মতিমহল থিয়েটার্স, কাহিনী : দেবপ্রভ সুর চৌধুরীর 'ঘরভাড়া' নামক একাংক নাটক অবলম্বনে। চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : জ্যোতির্ময় রায়, সংগীত পরিচালনা : রাহেন সরকার, শিল্পনির্দেশনায় : বটু সেন, শব্দগ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ, আলোক-চিত্র গ্রহণ : সুহৃদ ঘোষ, সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকায় : ছবি বিশ্বাস, অম্বুপকুমার, রবীন মজুমদার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নবদীপ হালদার, জীবন বসু, সাবিত্রী, তপতী, রেণুকা, বিনতা এবং আরো অনেকে।

ভোলানাথবাবু পেনসন নিয়েছেন। মনে বড়ো আশা—এইবার নিশ্চিত আরামে একটানা বিশ্রাম নেবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। ছেলে আর মেয়ের খেলাধুলির পাল্লায় অস্থির হয়ে উঠলেন। বাড়ির মধ্যে হলঘরে শেখর ও ইভার ক্লাব 'সংস্কৃতি পরিষদ'-এর অফিসের ঠেলায় ভোলানাথবাবুর একটানা বিশ্রামে ক্রমাগত বাধা পড়তে থাকলো। এ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে হলঘরটি ভাড়া দেবেন স্থির করে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। এমন সময় অরুণা গিন্নীর অস্থির তাগাদায় গিন্নীকে নিয়ে সহসা পুরী চলে যেতে হোল। যাবার সময় ভাড়াটে নির্বাচনের ভারটা দিয়ে গেলেন ছেলেমেয়ের উপর।

ভাড়াপ্রার্থীর ভিড় হোল অসংখ্য। তাদের সামলাতে ডাকতে হোল তাগড়াই ব্যোমকেশকে। ব্যোমকেশ প্রার্থীদের বিদায় করে দিল। তারপর দরখাস্ত নিয়ে বিচার-বিবেচনা শুরু হোল ভাড়াটে নির্বাচনের। ইতিমধ্যে ভৃত্য বংশীকে ঘুষ দিয়ে সশরীরে বিভিন্ন সময়ে হাজির হোল প্রফেসর সুবীর ও ওয়াকিং গার্ল অঞ্জনা। ইভার ইচ্ছে সুবীরকে ভাড়া দেয়, শেখরের ইচ্ছে অঞ্জনাকে। কিন্তু ঘটনার আবর্তে দু'জনই ভাড়াটে হয়ে গেল। ইভা-সুবীর আর শেখর-অঞ্জনার দিনগুলো। এরপর থেকে বেশ কুতিতেই কাটতে লাগলো মেলামেশা ঘনিষ্ঠতার ভিতর দিয়ে।

ফ্যাসাদ বাধালো ব্যোমকেশ। সে ছিল ইভার প্রণয়প্রার্থী। ঈর্ষাবশে সে ভোলানাথবাবুকে এক ইংগিতময় চিঠি লিখলো। খবর পেয়ে ভীষণ খেপে গিয়ে ফিরে এলেন ভোলানাথবাবু। সব দেখে শুনে একেবারে থ বনে গেলেন। ঘটনার স্রোতকে বিপরীত মুখে চালিত করতে গিয়ে আরো ফ্যাসাদ বাধালেন, শেষ পর্যন্ত অপত্যস্নেহের দুর্বলতায় তাকে হার মানতে হোল ছেলেমেয়ে খেলাধুলির কাছেই। সুবীর ও অঞ্জনা এবং ইভা ও শেখরের মিলন বাঁধী বাজলো সানাইয়ের সুরে। এই হোল 'কাঁচামিঠে'র গল্পাংশ।

সন্দেহ নেই, গল্পাংশটুকু নির্মল আনন্দ উপভোগ করার মত। কিন্তু চিত্রনাট্যে

গল্পের বিশ্বাস দুর্বল। ফলে, প্রথম দিকটা অত্যন্ত কৃত্রিম হয়ে উঠেছে। হাসির ছবিতে কিছু অতিরিক্তন থাকবেই। কিন্তু তা বলে যদি স্বাভাবিকতাকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হয় তা'হলে কৃত্রিমতা দোষ এসে পড়েই। আলোচ্য ছবিতেও তাই এসেছে।

যথাসম্ভব স্বাভাবিকতা বজায় রেখে কৌতুককর পরিস্থিতির সংলগ্ন প্রবাহে যদি রসস্রষ্টি করা যায় তাহ'লেই হাসির ছবি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। দৃশ্যবিশ্বাসের দুর্বলতায় এবং সুষ্ঠু প্রয়োগকৌশলের অভাবে ছবিটিতে আশানুরূপ চিত্রময়তা আনতে চিত্রনাট্যকার-পরিচালক সক্ষম হননি। অবশ্য কিছু কিছু দৃশ্যে পরিচালকের রসজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। যেমন দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে ইভার হাঁচি আনানোর দৃশ্যটি, পুরী থেকে ফেরার পর ইভা ও শেখরের সংগে ভোলানাথবাবুর প্রথম হাসির দৃশ্যটি। এখানে যেন হাসির বন্ধা বয়ে যায়। সংলাপ কোথাও কোথাও বড় সুন্দর। যেমন, ইভা বলেছে শেখরকে : তুই ভগবান বিশ্বাস করিস? শেখর : না। ইভা বললে : আমি কিন্তু করি। কিন্তু ভগবান আমাদের সংগে যে ব্যবহারটা করলে না—.....ইত্যাদি। এই দৃশ্যের সংলাপটুকু সত্যিই প্রশংসা করবার মত। কিন্তু সংলাপ দুর্বল হয়েছে অনেক জায়গায়। সে আর উল্লেখ করবো না। তবে একথা বলা যায় যে সামগ্রিকভাবে জ্যোতিষ্ময় রায়ের এই হাসির ছবিটি মোটামুটি উপভোগ্য হয়েছে, ছবির শেষার্ধ্বে রসসিক্ত হওয়ায়। অভিনয়ের দিকটাও প্রশংসনীয়। সাবিত্রী তো আগাগোড়া মাতিয়ে রেখেছেন দর্শককে ইভা চরিত্রে স্বাভাবিক সাবলীল অভিনয়ে।

অনুপকুমারও শেখর চরিত্রে প্রসংসার্য। ছবি বিশ্বাসের অভিনয় কয়েক জায়গায় উচ্চাঙ্গের। ভান্নুকে ভালভাবে কাজে লাগাতে পারেননি পরিচালক। নবদ্বীপকে অসহ মনে হয়। জহর ছোট্ট একটি চরিত্রে উজ্জ্বল। জীবনে চরিত্রাঙ্গ। রেণুকা যে-ধরনের অভিনয়ে পারদর্শী এখানেও সে সুর্যোগ পেয়েছেন এবং কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন। উদ্ধা চৌধুরীর চরিত্রটি ব্যঙ্গের প্রতীক,—যদিও এ-চরিত্রে বিনতার অভিনয় উল্লেখযোগ্য, তথাপি এ-ছবিতে এই চরিত্রটি আদৌ সুখপ্রদ নয়, অবাস্তব মনে হয়েছে। রবীন, তপতী এবং অন্যান্যের অভিনয় খারাপ নয়।

আলোকচিত্রের কাজ ভালই। শব্দগ্রহণও মন্দ নয়। সম্পাদনা অল্পশ্রেষ্ঠ।

সমবেত সংগীতটি উল্লেখযোগ্য।

মমতা : প্রযোজনা : প্রভাত প্রোডাকসন্স, চিত্রনাট্য সংলাপ ও পরিচালনা : প্রভাত মুখোপাধ্যায়, আলোকচিত্রগ্রহণ : অজয় মিত্র, শব্দগ্রহণ : রণজিত দত্ত, সম্পাদনা : হরিদাস মহলানবীশ, শিল্পনির্দেশনা : সুনীতি মিত্র, সংগীত পরিচালনা : নির্মল ভট্টাচার্য, ডি, বালসারা ও ক্রাশনাল অর্কেস্ট্রা, ভূমিকায় : বলরাজ সাহনী, অরুণতী, মঞ্জু দে, তপতী, অপর্ণা, বাণী গাঙ্গুলী, আশা দেবী, রাধা মুখোঃ, দীপক মুখোঃ, অমর মল্লিক, ডাঃ হরেন মুখোঃ, মণিকা, নমিতা, জহর, শুভেন্দু এবং আরো অনেকে।

বাঞ্চে ছবি বাঙলাতে ভুরিভুরি হয়েছে ও হচ্ছে—এ কথা যেমন অনস্বীকার্য,

তেমনি বাঙলাই যে আবার এমন শিল্পগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ চিত্র সৃষ্টি করেছে যা বাঙলার তথা ভারতের মর্যাদা উন্নীত করেছে বিশ্বের আসরে—এ কথাও তেমনি সত্য। কাছেই কাছে ছবি দেখে বাঙলা চলচ্চিত্র সম্পর্কে নিরাশ হবার কারণ নেই। আলোর উজ্জ্বল যে অঙ্ককারকে হুঁহাতে ঠেলে বেরিয়ে আসতে জানে তার প্রমাণ যুগান্তকারী চিত্রসৃষ্টি ‘পথের পাঁচালী’। ‘পথের পাঁচালী’র পর থেকে ‘পঞ্চতপা’ পর্যন্ত যে ক’খানি ছবি বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পের এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে, সৃষ্টি করেছে এক নতুন ঐতিহ্য—সেই ঐতিহ্যের পরিপূরক হিসাবে চিহ্নিত করার মত আরেকখানি চিত্র আত্মপ্রকাশ করলো। সেটি পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ‘মমতা’। প্রভাত মুখোপাধ্যায়কে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

এক মমতাময়ী নারীর আশ্চর্য বলিষ্ঠ মনের চারুময়তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আলোচ্য চিত্রের যে কাহিনীটি তা হচ্ছে এই :

বিপত্নীক এক ধনী যুবকের সাথে বিয়ে হোল মমতার। সে শুধু স্বামীই পেল না, সেই সঙ্গে পেল চারমাসের একটি কণ্ঠা—প্রভাতের প্রথম পক্ষের সন্তান রাধা। স্বপুত্রালয়ের গৃহদেবতা গোবিন্দজীর বিগ্রহের সামনে মমতা রাধাকে বুকে তুলে নিয়ে দেবতাকে প্রণাম করলো। রাধার সেবা-যত্নের ভার নিজহাতে তুলে নিল সে প্রথম দিন থেকেই। তারপর তার প্রতি সংসারের রীতি অনুযায়ী সৎমায়ের প্রাপ্য অবাচিত ব্যঙ্গ-বিক্রপ বর্ষিত হতে লাগলো। অসহায় ঐ মাতৃহীনা শিশুর মুখ চেয়ে মমতা সবই সহ্য করে চললো।

বহুরথানেক কাটতে দেখা গেল রাধা কাপেও শোনে না, কথাও বলতে পারে না। সংসার রায় দিল সৎমায়ের অভিশাপ বলে। বড়ো বেশি করে মমতার প্রাণে বাজলো একথা। এবং সে বুঝলো যে রাধার মুখে যদি কথা ফোটাতে পারে কোনোদিন তবেই তার জীবনের এ কলংক মুচবে।

মমতার পরামর্শে প্রতাপ ডাক্তারী চিকিৎসার সর্বরকম চেষ্টাই করে দেখলো। কেউ কোনো আশা দিতে পারলো না। স্বামী প্রতাপ বললো : ভগবানের অভিশাপ। এ মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কী? মমতা বললো : রাধাকে স্কুলে দাও। প্রতাপ রাজী নয়। সে তার পছন্দ সন্তানকে সভ্য সমাজে বার করবে না। স্বাম-স্ত্রীতে এই নিয়ে বাদানুবাদ চললো। শেষে ক্লিষ্টাঙ্গ বিক্রপ মেশানো ভাষায় প্রতাপ একদিন মমতাকে অপমান করলো।

রাধাকে নিয়ে চুপিচুপি মমতা সেই রাতেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। যাবার আগে জানিয়ে গেল যে স্ত্রীর কাছে স্বামীর সম্মান বড়ো, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড় রাধার ভবিষ্যত।

কলকাতার এক শূক-বধির স্কুলে গিয়ে মমতা রাধাকে ভর্তি কর’র ব্যবস্থা সম্পন্ন করলো। এই স্কুলের অধ্যক্ষ সুবীর আদর্শবাদী সেতাবতী যুবক। ঘটনা পরম্পরায় সুবীরের সান্নিধ্যে এল মমতা এবং তার কাছে থেকেই মমতার সাধনা শুরু হোল প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করার।

স্কুল কমিটির মতের তোয়াকা না-রেখেই একদিন স্কুলের এক শিক্ষয়িত্রীকে জবাব

দিয়ে দিল সুবীর—অসহায় শিশুদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করার জন্ত। এবং তার জায়গায় কাছে নিল মমতাকে।

স্কুলের প্রেসিডেন্টের মেয়ে রিতার বিয়ের সম্ভাবনা সুবীরের সংগে, সুতরাং রিতার কানে এ খবর পৌঁছবার পর তার প্রতিক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটলো না।

সুবীর ও মমতাকে নিয়ে কুৎসা রটলো। মমতা একদিন সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলো যে সুবীর রাধার মা। রাধার মা মায়া—যার ডাকনাম লক্ষ্মী—সুবীরের বোন সে, যাকে সুবীর নাস্ত্র করতেন। লক্ষ্মী মারা যাবার পর প্রতাপ যে আবার বিয়ে করেছে, বিয়ের সময় খবরটা পর্যন্ত একবার জানায়নি সুবীরদের। তাই সুবীর প্রতাপের সংগে আর কোনো সম্পর্ক রাখেনি। মমতা সুবীরের বোনের সেই শূণ্য আসন দখল করে নিল নিজ ব্যবহারের ওণে।

কুৎসা কলংকে রূপ নিল। এ সব উপেক্ষা করার মত বলিষ্ঠতা মমতার আছে। কাজেই মমতার প্রতি সুবীরের শ্রদ্ধা আরো বেড়ে চললো। সে প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে যেতে লাগলো নতুন নতুন প্রথায় রাধাকে কথা বলাতে। শেষ পর্যন্ত রাধা কথা বলতে সমর্থ হোল। তার মুখে প্রথম বুলি না ডাক শুনে মমতা আনন্দে আব্বহারা হোল।

সুবীর ও মমতার নামে যে কুৎসা রটেছে তা প্রতাপের কানে গেল। প্রতাপ আইনজ্ঞের পরামর্শ নিচ্ছিল মেয়েকে ফিরিয়ে আনার জন্তে। এবার নিজেই কোলকাতায় এল মেয়েকে নিয়ে যেতে।

এমন সময় রিতার ভবিষ্যত নষ্ট দেখে রেগে গিয়ে স্কুলের প্রেসিডেন্ট বরখাস্ত করলেন সুবীরকে।

প্রতাপ-ও এসে এমন সময় পৌঁছল, মমতার কলংকের প্রমাণ হাতে-নাতে দেখতে পেল। প্রতাপ ভুল বুঝলো মমতাকে।

তারপর এক নাটকীয় ঘটনার মধ্যে দিয়ে সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান হোল।

এই আখ্যানবস্তুটুকু অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে তুলে ধরেছেন পরিচালক। কাহিনীতে মানবিকতার যে আদর্শ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তা দর্শককে মুগ্ধ না করে পারে না, যদিও চিত্রনাট্যে কাহিনীগত চরিত্র-চিত্রণে কিছুটা শৈথিল্য দোষ থাকায় প্রথম দিকে মমতা চরিত্রটিকে মেনে নিতে দর্শকের মন পুরোপুরি সায় দেয় না। কিন্তু পরবর্তী অংশে ছবির গতিবেগের সাথে সাথে ঘটনা-বিশ্লেষণের কুশলতায় প্রথমদিককার অন্বাভাবিকতা কেটে যায়। প্রভাতবাবুর অত্যন্ত সংযমশীল ও পরিচ্ছন্ন পরিচালনার ওণে যে-একটানা কোতুহল ও আগ্রহ সৃষ্টি হয় তাতে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দর্শক আবিষ্ট না হয়ে পারে না। অনাস্বাদিতপূর্ব্ব এক আনন্দাবেগের মাঝে ছবি শেষ হবার সাথে সাথে দর্শক তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

কিন্তু ছবিতে একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তির ঝটিক কথা উল্লেখ না করে পারা যাচ্ছে না। সেটি হোল : ডাক্তাররা পরীক্ষা করে ভবিষ্যতের কোনো আশাই দিতে পারলো না রাধার মূক-বধিরতা থেকে মুক্তি পাবার। অথচ দেখানো হোল মূক-বধির স্কুলে রেখে রাধার মূক-বধিরতা ভাল হয়ে গেল। এইখানে বৈজ্ঞানিক যুক্তির কঁাকি রয়ে গেছে। কারণ এটি বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। অত অল্প বয়সে পরীক্ষা করে ভবিষ্যত

সম্বন্ধে ডাক্তররা উক্তরূপ মন্তব্য করলে তাকে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বলে অভিহিত করা যায়। কারণ আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রের বিকাশ তখন না হলেও পরে হতে পারে এবং নূক-বধির বিপ্লবালয়ে দিলে সে ক্ষেত্রেই কাজ হয়। আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রের বিকাশ না ঘটলে নূক-বধির বিপ্লবালয়ের পক্ষেও কিছুই করা সম্ভব নয়। এটাই বৈজ্ঞানিক সত্য। এ বিষয়টির প্রতি পরিচালকের আরো সচেতন হওয়া উচিত ছিল।

যাই হোক, সামান্য দোষ-ত্রুটি বাদ দিলে মমতা ছবিটি কাহিনীর ভাবসম্পদে ও পরিচালন-বৈশিষ্ট্যে বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পে এক নতুন মর্যাদা যে পাবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

চরিত্রাভিনয়ের কথা বলতে গেলে সর্বাপেক্ষে উল্লেখ করতে হয় বলরাজ সাহানীর কথা। হাবভাব আচার-আচরণ এবং বাচনভঙ্গী সব মিলিয়ে সুবীরের ভূমিকায় বলরাজ সাহানীর অভিনয় এত স্বাভাবিকতা পেয়েছে যে তার এ অভিনয়কে অতি উচ্চাঙ্গের অভিনয় বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। এই চরিত্রটিতে বলরাজকে নির্বাচন করার জন্যে পরিচালকও অভিনন্দনযোগ্য। প্রায় প্রতিটি চরিত্রই সুঅভিনীত হয়েছে এ ছবিতে। মমতার ভূমিকায় অরুন্ধতী সুন্দর অভিনয় করেছেন কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি পুষ্প ভাবব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে তাঁর অভিব্যক্তি এখনো পরিণতি লাভ করতে পারেনি বা পরিচালক করাতে পারেননি। আর বিশেষ উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে নাম করতে হয় অপর্ণা, দীপক, তপতী, অমর মল্লিক, মঞ্জু দে প্রভৃতির। রাধা চরিত্রটির অভিনয় অনবদ্য হয়েছে, এই ভূমিকাটিতে অভিনয় করেছে রাধা মুখোপাধ্যায়।

সংগীতাংশও এ ছবির এক সম্পদ। মাত্র দুটি গান আছে। দু'টিই সুগীত ও সুপ্রযুক্ত। আবহসংগীত অপূর্ব। শব্দগ্রহণে কিছু ত্রুটি আছে। কিন্তু আলোকচিত্র গ্রহণ সাধারণ স্তরের উর্ধ্বে।

‘মমতা’ ছবিটি দেখার পর পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমাদের আরো আশা বাড়লো।

পুনর্মিলন : প্রযোজনা : জীবন দত্ত, কাহিনী : লীলা দেবী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : মাহু সেন, আলোকচিত্র : বিভূতি চক্রবর্তী, সংগীত পরিচালনা : কালীপদ সেন, শব্দগ্রহণ : জে ভি ইরানী, শিল্পনির্দেশক : সুনীল সরকার, ভূমিকায় : উত্তমকুমার, জহর, কমল, অশুপ, তরুণ, প্রেমাংশু, অনিল, মাঃ তিলক, সাবিত্রী, সবিতা, সরস্বতী, মঞ্জু দে, অপর্ণা, মিত্রা বিশ্বাস এবং আরো অনেকে।

কি করে একটি একাক্ষবর্তী সুখী পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং সেই পরিবারের একমাত্র কন্যা মায়ার শুভবুদ্ধি প্রণোদিত কলাকৌশলের দ্বারা আবার ভাঙা পরিবারটি ঝোড়া লাগলো—এই হচ্ছে ‘পুনর্মিলন’র কাহিনী। এই ধরনের একটি বিষয়বস্তুকে পল্লিয় রূপায়িত করতে যে যুক্তি পরম্পরায় কাহিনী গড়ে ওঠা উচিত তা এ-ছবিতে অল্পপস্থিত। ফলে কাহিনীটি অবাস্তব এবং অস্বাভাবিকতার পর্যায়ে পড়ে। ছবি দেখলে মনে হয় পরিচালক এ বিষয়ে সজ্ঞান।

সিরিয়াস এই বিষয়বস্তুটির অন্তর্নিহিত রহস্যোন্মচনের বদলে এটিকে প্রমোদ উপযোগী করে তোলার দিকেই কাহিনীকার এবং পরিচালকের ঝোঁক। তাই কাহিনীটির স্তরে স্তরে হাস্যরস ও কোতুককর নাট্যপরিস্থিতির উদ্ভব করে ছবিটিকে একান্তই প্রমোদ উপযোগী করে তোলার প্রচেষ্টা সর্বত্রই বিদ্যমান। কাজেই এটিকে হাসির ছবি আখ্যা দেওয়াই উচিত। বাঙলা ফিল্মে অধিকাংশই অবাস্তব ছবি। কিন্তু অধিকাংশ ছবি দেখতে গিয়ে দর্শক যেমন অতৃপ্ত হয়ে ফেরেন এ ছবিতে সে সম্ভবনা কম—যদিও এটিও একটি অবাস্তব ছবি। আপনি যত যুক্তিবাদী বা সিরিয়াস দর্শকই হোন না কেন এ ছবি আপনার মনকে ঝানিকটা হালকা করে দেবেই, ছবি দেখতে দেখতে যুক্তির কথা ভুলে গিয়ে আপনি কোতুকপ্রিয় হয়ে উঠবেন। এ ছবির এটাই বৈশিষ্ট্য।

অভিনয়ে এ-ছবিতে সাবিত্রীর জুড়ি নেই। সাবিত্রী তার অত্যন্ত আবেগমাখা স্বাভাবিক অভিনয় দ্বারা দর্শককে এত হাসিয়েছেন যে গতি্যই উপভোগ করার মত। মিনির ভূমিকায় মঞ্জু দে-কেও চমৎকার মানিয়েছে এবং কতিপয়পূর্ণ অভিনয় করেছেন। অমৃত ভূমিকায় কমল মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, উত্তম, অরূপ, তরুণ, প্রেমাংকু, সবিতা, অপর্ণা, সরযুবালা, মিত্রা—এদের উল্লেখযোগ্য অভিনয় হয়েছে।

সংগীতে নতুনত্ব নেই। শব্দগ্রহণ প্রশংসনীয়। আলোকচিত্র গ্রহণ সাধারণ স্তরের।

। চিত্রালাপী ।

তিনজন নবীন কবি

সূর্যমুখী : শ্রীযুক্ত গুপ্ত । প্রকাশক : নবচেতনা, হাওড়া । মূল্য : এক টাকা ।

আষাঢ়ে শ্রাবণে : শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায় । প্রকাশক : বুক রিডা । মূল্য : দেড় টাকা ।

জন্মলগ্ন : শ্রীশিশিরকুমার দাশ । প্রকাশক : পূর্বনেষ প্রকাশ ভবন । মূল্য : দুটাকা ।

বঙ্গসাহিত্যের যে-কোনো সতর্কমনা পাঠকই জানেন, গত দুতিন দশকের মধ্যে বাংলা কবিতার কী বিপুল বিবর্তন ঘটেছে । এই বিবর্তন শুধু কাব্যের প্রসাধনকলা তথা আঙ্গিকেই নয়, কাব্যের বিষয়বস্তুতেও যথেষ্ট পরিমাণে পরিস্ফুট । এই পরিবর্তনের পটভূমিকায় তাই যে-কোনো নবীন কবিকে অত্যন্ত হুঁশিয়ার হয়ে কলম ধরতে হয় । ছন্দের ব্যবহার, শব্দ চয়ন প্রভৃতি খুঁটিনাটি ব্যাপারে কোনো শৈথিল্য ইদানীংকার কাব্যপাঠকরা তেমন বরদাস্ত করেন না । তাদের কুশলী শ্রবণেন্দ্রিয় একটিও বেসুরো আওয়াজ সহ্য করতে রাজি নয় । সহজেই অস্বাভাবিক করা যায় যে, বাংলা কাব্যের ইদানীংকার মনোযোগী পাঠকদের মনোরঞ্জনসাধন অতি দুর্লভ ব্যাপার, কঠিন শ্রমসাপেক্ষ । লাইনের পর লাইন ছড়া মিলালেই আজ আর তা কাব্যস্তরে উত্তীর্ণ হয় না ।

যে তিনজন নবীন কবির কাব্যগ্রন্থ আমার সামনে আছে তাঁরা অল্পবিস্তর সকলেই বাংলা কাব্যের গৌরবময় ঐতিহ্যের অংশীদার । ‘অংশীদার’ শব্দটি দিয়ে আমি বোঝাতে চাই যে, এঁরা বাংলা কবিতার অতীত সম্পর্কে সচেতন । এঁরা ছন্দের বিস্তৃত ব্যবহার জানেন, শব্দচয়নেও নিতান্ত অক্ষম নন, উপরন্তু স্থানেস্থানে এঁরা বিষয়বৈচিত্র্য এনেছেন । তবু কেন যে তাঁরা সর্বত্র পাঠকদের তৃপ্ত করতে পারেন না তা গভীরভাবে বিবেচনার বিষয় ।

‘সূর্যমুখী’র কবি যখন তাঁর কবিতায় আত্মগত সংলাপের ভাষায় বলেন :

“আমার স্বপ্নের চোখে তুমিতো সুললিত
সূর্যমুখী, ভোরের আলোয়” (সূর্যমুখী)

কিন্তু “ভালোবেসেছি তোমাকে
তোমার বুকে শিশুর মাতামাতি দেখে,
আদিগন্ত ধানের ক্ষেতে
হাওয়ার দুটুঁমি দেখে ।

ভালোবেসেছি অন্ধকার রাতে হারিকেন হাতে
ভাঙ্গা গাঁকো পার হতে গিয়ে...” (তোমাকে ভালোবাসি)

তখন কবির হার্দ্য উদ্ভাপ অনুভব করতে দেয়ী লাগে না । কবিতা পড়তে আমরাও রোমাঞ্চিত হই, একটি গভীর মনতাময় উচ্চারণ শুনে তৃপ্তি লাভ করি ।

কিন্তু কয়েকপাতা পরেই যখন “জোনাকি” কবিতা পড়তে গিয়ে কয়েকটি দুর্বল, নিরুত্থাপ লাইনের মুখোমুখি হই, তখন যথেষ্ট বিবাস্তি জাগে—

“একান্ত নির্জন রাতে

সুমাচ্ছন্ন আলো আর প্রাণ

গভীর নিবিড় ঘুমে

হিম ঠাণ্ডা মরণের স্পর্শ পেয়ে”... (জোনাকি)

মনে হয় নেহাতই একটি কবিতা খাড়া করবার ক্ষমতা কবি তৎপর হয়ে উঠেছেন।

‘দুর্ঘমুখী’র রচয়িতা স্বদেশসচেতন কবি। আনি স্বীকার করি, কবিতা যে কোনো বিষয়বস্তু অবলম্বনেই রচিত হতে পারে। কিন্তু যে গভীর মৌল অল্পভব ও প্রেরণা সার্থক কবিতার জন্ম দেয়, মনে হয়, সে-অল্পভূতি এ প্রহের কোনো কোনো কাব্যে অল্পপস্থিত। তাই কয়েকটি লাইন।

‘দিশেহারা হলাম

বেসুরে গান সাধলাম,

হঠাৎ ভোরের রঙে ঘুম ভাঙলো’

স্বর্ধক বলেই মনে হয়। তবু অসঙ্কোচে বলি, এ-কবির রচনায় যে প্রতিশ্রুতির পরিচয় পেয়েছি তা হতাশাব্যঞ্জক নয়। এবং সেই কারণেই শ্রীযুক্ত অরুণ গুপ্ত-র আগামী কাব্যপ্রহের অপেক্ষায় রইলাম।

‘আষাঢ়ে শ্রাবণে’ প্রহের মলাটের ঘোষণায় বলা হয়েছে “যে উপলব্ধি এবং বিশ্বাস জীবনের সমস্ত চেতনায় কবিত্বের সঞ্চার করে—তরুণ কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায় সেই দুর্লভ সম্পদের অধিকারী।...বক্তব্যের অনন্ততায় তিনি ইতিমধ্যেই বাংলা কবিতার একটি নিম্নস্থ স্তর পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন।”

ইদানীং দেখা যাচ্ছে যে কোনো কোনো প্রকাশকপ্রতিষ্ঠান প্রহের মলাটে লেখক তথা প্রহটি সম্পর্কে ছুচার লাইন মন্তব্য ছেপে দিচ্ছেন। উল্লেখ না করলেও বোঝা যায়, এই মন্তব্যগুলি সকলক্ষেত্রেই স্ততিবাচক এবং অতিরঞ্জনে ছুটে। এই প্রথা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, এবিধ বিজ্ঞপ্তি কোনোক্রমেই দোষাবহ নয় যদি সেটি অন্তত কোথাও সমালোচনা প্রসঙ্গে কথিত হয়ে থাকে। নতুবা কোনো পুস্তক সম্পর্কে যে-অতিরঞ্জিত ভাষণ কেবলমাত্র পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা চলে সেই প্রশস্তি পুস্তকের সঙ্গে নামাবলীর মতো মুদ্রিত দেখলে রুচি-বিগহিত বোধ হয়। বিশেষত কোনো কাব্যপ্রহ, (যার প্রকাশক কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়) এ জাতীয় প্রচার বিশেষ দৃষ্টিকটু ঠেকে।

“ভীর কবিতা শব্দ এবং সুর, গভীর চিন্তা ও লঘু চিন্তা বিলাপের সমাহার”• ভেনে কোতুহলী কাব্যপ্রহ খুললাম।

একটি পাতা উন্টাতেই চোখে পড়লো ‘চেনা পাখা’ কবিতা। শুরুতেই যে চমক, কয়েক লাইন এগোতে না এগোতেই তা দুর্বোধ্য হেঁয়ালীতে পর্যবসিত হয়। উদাহরণ হিসেবে দুটি পঙ্ক্তিই যথেষ্ট—

‘পুরোনো দিনের ছায়া ছুঁয়ে আসে সেই চেনা পাখী
হৃদয়ে এখন কালের হৃদ কোন সুরে ডাকি ?’

এই কবিতার শেষ দুই পঙ্ক্তিও আমার কাছে হৃর্ষোধ্য এবং হয়তো অনেক সাধারণ পাঠকের কাছেও ।

‘সেই সময় ফিরে এল ধীরে হৃদয়ের তালে,
সেই চেনা পাখী উড়ে গেল ফের দূর গতকালে ।’

হৃদয়ের হৃদ যদি চতুর্ভুজিক ত্রিতাল কি পঞ্চমাত্রিক ঝাঁপতাল-এ ধ্বনিত হয় তো তা বুঝতে তেমন বিলম্ব হয় না । এবং সেই ত্রিতালের কোন মাত্রায় সম্ তা স্নেহে নিতেও কষ্ট হয় না । কিন্তু সময়ের সম্ হৃদয়ের তালে কেমন করে কি ভাবে ফিরে আসে তা উপলব্ধিতে আনতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয় ।

অথচ এই পুস্তকের কয়েক পাতা এগিয়ে গিয়ে যখন দেখি জননী দেবীর স্মরণে কবি লিখেছেন,

‘হৃঃখ তার হৃঃখ নয় । ভয়ের গুরুভার
তা-ও বিধেছে কী সুকঠিন হাসির তলোয়ার
যা ছুঁয়ে দেয়—হৃঃখ কি ভয়—হৃঃখ সমুজ্জ্বল
হাঁসের মতো ডানায় খুশি ঝরিয়ে ফেলে জল ।’

(নাকে ভেবে)

তখন কবিকে অন্তর থেকে বলতে সাধ জাগে, সাবাশ ! এই কবিতার পুরোটাই পাঠকদের উপহার দিতে সাধ জাগে । শেষের চার লাইনেই নয় সম্পূর্ণ কবিতাটিতেই রোমান্সিভ হবার মতো বহু পংক্তির সমাবেশ আছে । পরবর্তী কবিতা ‘পুরবী’-তেও কবি যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন । আবেগ ও অশ্রুভূতির মিশ্রণে এটি একটি সুরেলা সংগীতের মতোই প্রতিভাত হয় ।

এই কাব্যগ্রন্থের অন্যান্য কবিতার মধ্যে আমার মতে “কেউ তাকে”, “জয়”, “আষাঢ়ে আবেগ” প্রভৃতি কবিতাগুলিই বিশেষভাবে মনে রাখার মতো । নবীনকবি মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যে আবেগের উত্তাপ আছে, স্থানে স্থানে চিন্তার গভীরতারও পরিচয় মেলে । কিন্তু অনাবশ্যক জটিলতা আনার ক্ষমতা যখন তিনি বিবাস্তিকর পংক্তির অবতারণা করেন, পাঠক হিসাবে তখনই আমার আপত্তি জানাই । নবীন কবির এটি প্রথম কাব্য সংকলন ; আশা করা যায় সাহিত্যসাধনার পরবর্তী স্তরে তিনি নিশ্চয়ই আরো অধিক পরিমাণে আমাদের মনোহরণ করতে সমর্থ হবেন ।

“জয়লগ্ন”-এর প্রচ্ছদ পটে যে পরিচ্ছন্নতা, দৃষ্টমান, কাব্যপুস্তকের সর্বত্রই তার পরিচয় মেলে । প্রায় সমস্ত কবিতাগুলিতেই একটি পরিশীলিত ক্লাচিকর মনের স্পর্শ পেয়ে তৃপ্ত হওয়া যায় । যে কয়েকটি দুর্লভগুণের একত্র সমাবেশ ঘটলে রচনা ‘পঙ্ক্ত’ থেকে ‘কবিতা’-র স্তরে উন্নীত হতে পারে—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমারের কোনো কোনো কবিতায় তার প্রমাণ পেয়ে সবিশেষ আনন্দিত হয়েছি । এর কবিতায় একটি মহৎ গুণ এই যে, ইনি চিন্তা করে লেখেন, অথচ পাঠকদের তেমন চিন্তিত করে তোলেন না ।

যদিও এর ছ'একটি কবিতা আমার কাছে অস্পষ্ট বোধ হয়েছে, তবু মোটামুটি ভাবে এর অধিকাংশ কবিতাই চিত্তগ্রাহী।

এই গ্রন্থের অনেক কবিতাই বারবার পড়ার মতো। 'জ্বলাঙ্গী', 'অবিনশ্বর', 'আজ রাত্রে', 'শান্তি' প্রভৃতি কবিতাগুলি আধুনিক বাংলা কাব্যের উল্লেখনীয় সংযোজন। ঐযুক্ত শিশিরকুমার দাশের কবিতার একজন মনোযোগী পাঠক হিসাবে আমার ছ'একটি অভিযোগ না জানিয়ে নিরস্ত হতে পারছি না। এঁর কোনো কোনো কবিতায় ছ'একজন সমকালীন তরুণ কবির প্রভাব দেখে হুঃখিত হয়েছি। 'পিতামহ-পিতামহী' কবিতায় পত্রিকাস্তরে প্রকাশিত অন্য একজন তরুণ কবির স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তেমনি অনুসরণ দোষে ছুটে 'বিবাদ নদীর নারী' কবিতাটি। কবির বক্তব্যে এবং প্রকাশ ভঙ্গীতে যথেষ্ট মৌলিকতা বর্তমান, তিনি কেন সেই স্বকীয়তাকে বিকশিত না করে অপরের অনুসরণে নিম্নেকে নিয়োজিত করবেন। "জ্বলাঙ্গী"-এর কবির কাছে আমার এইটুকুই নিবেদন।

আলোচিত তিনটি কাব্য সকলনেরই প্রচ্ছদচিত্র সুরুচিসম্পন্ন; মুদ্রণকার্যও নিশ্চিন্দ নয়। মূল্যও মধ্যবিত্তদের ক্রয়ক্ষমতার ভিতরে। এই বইগুলির বহুল প্রচার আমার একান্ত কাম্য।

রইস মনসুর চৌধুরী

অগ্রণীর বই

সত্যেন্দ্রনাথ মল্লিকদ্বারের 'ষ্টালিন' তৃতীয় সংস্করণ চলছে।
ষ্টালিনের জীবনকাহিনী এত সুন্দর করে বাংলা ভাষায়
আর লেখা হয়নি। চমৎকার ছাপা বাঁধাই। তিনখানি
ছুরঙা ছবি। ৬৮

অনুবাদগ্রন্থ : ম্যাকসিম গর্কীর লেখা ছোট ও বড় গল্প, ডায়েরীর
বাছাইকরা কয়েকটি অংশ, জবানবন্দী, একটি সম্পূর্ণ নাটক
ও কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন 'শিল্প ও সংগ্রাম' ৩।০
রম্যা রলার। আই উইল নট রেস্ট-এর বাংলা 'শিল্পীর
নবজন্ম' ৫৮

বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভেরকর ও ইউরোপের অন্যান্য বিখ্যাত
লেখকদের গল্পসংগ্রহ 'বিদেশী গল্প' ২।০
লিও টলস্টয়ের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কাহিনী ক্রুয়েটজার সোনাটার
বাংলা অনুবাদ 'রাহ' ২৮

আধুনিক জার্মানীর শক্তিশালী লেখিকা আন্না সেবেরসের
'সাবোতিয়ারস' ২৮

আইভান তুর্গেনিভের 'অশ্রুমতী' ২।০

ছোট গল্প : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিস্থিতি' ; ২।০

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বেদিয়া-ছন্দ' ২৮

শান্তি দেবীর 'শাস্ত্রী' ১।০ ; সুবোধমোহন ঘোষের
'উৎস' ২৮

নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের 'অপরিচিতার চিঠি' ২৮

উপন্যাস : গুণময় মাল্লার 'লবীন্দ্র দিগার' ৪।০ ; মিহির
আচার্যের 'দিনবদল' ২৮ ; বৈষ্ণবনাথ ঘোষের 'কল্লান্ত' ৫৮

প্রবন্ধকথা : ডাঃ গৌরমোহন দাসের 'মহামুদ্রের পরে
মালয়' ২।০ ; রাহুলের 'জনপদের ছন্দ' ৩।০

কবিতা : মায়াকভ স্কির কবিতা অনুবাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ
মৈত্র ২।০ ; এঁরই স্বরচিত 'আকাশের মুখ' ১।০ ; চিত্ত
ঘোষের 'অন্তরা' ১।০ ; রামেন্দ্র দেশমুখের 'জনসমুদ্র' ১।০

বিবিধ : সরোজ আচার্যের 'মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞান' ২৮

অগ্রণী বুক ক্লাব

। ১৩, শিবনারায়ণ দাস সেন, কলিকাতা-৬।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

শ্রাবণ মাসের পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শারদীয় অগ্রণীর কাজ শুরু করা হচ্ছে ।
নবীন ও প্রবীণ লেখকদের গল্পে, প্রবন্ধে, কবিতায় ও রসরচনায় সুলসল করে
সাহিত্যে মহালয়ার দিন এটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারব
বলে আশা করছি । এই সংখ্যার দাম ঠিক হয়েছে একটাকা ।

। বিজ্ঞাপনের জন্যে পত্রালাপ করুন ।

। বিক্রেতার যোগাযোগ রাখুন ।

কার্যাব্যাহক, অগ্রণী

১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬



॥ অগ্রণী ॥

। দশম বর্ষ, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬৪ ।

গণেশঠাকুর

সত্যপ্রিয় ঘোষ

গণেশঠাকুর কে সাজবে শেষ পর্যন্ত তাই নিয়েই সমস্তা দাঁড়ালো। ‘না-দুর্গার চিড়িয়া-খানা দর্শন’ নাম দিয়ে বিপিনমায়ু যে নাটকটা নিজেই লিখে গিনু-আনু-ভিনু-মদন ওদের দিয়ে এবার পুজোয় অভিনয় করানোর তোড়জোড় করছেন তাতে অশ্রান্ত সব ভূমিকাতেই ঠিকমতো পার্ট দেওয়া যাচ্ছে, কিন্তু ঐ মুশকিল দাঁড়ালো গণেশঠাকুরকে নিয়ে। সবাই একবাক্যে মদনের নানই করেছিলো, সবাই বলছে গণেশের পার্টে মদনকেই খুব চমৎকার মানাবে। কারণ ওর পেটটিও বেশ যেমন একটু নেয়াপাতি-গোছের আছে, কানহুটিও বেশ বড়োসড়ো কুলোপানা, চোখহুটিও তেমনি আছে-কি-নেই বোঝা দায়, নাকটাও একদম যেন ঠিক হাতীর ডাঁড়, হাত-পাগুলো গোদা-গোদা—সবাই এইসব দেখে শুনে বলছে, তা’লে আর বাপু তোমার আপত্তি কেন, তোমার তো বাছা গণেশ ‘সাজতেও’ হবে না, না-সেজেই তো তুই একটা গণেশের বাবা গণেশ একদম রামগণেশ হয়ে ব’সে আছিস, তবে? না বললেই হবে? তুই সাজবিনে তো তোর ঘাড় সাজবে গণেশ।—কিন্তু কে বা শোনে কার কথা, মদন গোঁ ধরেছে কিছুতেই গণেশ হবে না সে। কেন? সবাই জিজ্ঞেস করছে, কেন? কেন সাজবিনে গণেশ? কী দোষ করেছে গণেশ? তা সে-সব মদন কিছুই ভেঙে বলছে না। শুধু খুদে-খুদে গোল-গোল চকচকে গুলির মতো চোখহুটো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বলছে, ‘গণেশ আমি কিছুতেই হবো না কিছুতেই হবো না কিছুতেই হবো না।’

‘গতবার পুজোয় ভীমের পাট ক’রে নাম ক’রে ওর খুব পায়া ভারী হয়েছে তাই দাম বাড়াচ্ছে’—ভিনু বললো।

‘তা না রে তা না, চাহারাটা ওনার গণেশের মতো হলে হবে কী, মনে-মনে ওঁর কান্তিক সাজবার ইচ্ছে’—বললো আনু।

‘ভীতুর ডিম কোথাকারে’—গিনু চোখ পাকিয়ে বললো, ‘সন্দের পর একা-একা বাধক্রমে যেতে ভয় খাস, চীনেম্যান দেখলে ভয়ে ইঁহুরের গর্তে পালাস, তবু বলে কিনা গণেশ সাজব না! লজ্জা করে না ও-কথা বলতে, বাঁদর কোথাকার।’

‘বাঁদর কেন বলছিস রে’—ভিনু মুখ মচকে বললো, ‘ইঁহুর বল। ওর বাহন তো ইঁহুর।’

মদন আর সই করতে না পেরে দাঁতমুখ খিচিয়ে ব’লে ওঠে ভিনুকে, ‘আর তোর বাহন তো হাঁস। পাতিহাঁস। প্যাক-প্যাক-প্যাক-প্যাক-প্যাক।’

সবাই হাততালি দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে ।

‘খুঁজে-খুঁজে আর বাহন গেলি নে রে’—আমু বললো, ‘শেষমেশ ইঁহুরের পিঠেই চেপে বসলি রে হাঁহুরান ! তা তোর অমন মুখশ্রী দেখলে এক নেংটি ইঁহুর ছাড়া আর কেই বা তোর বাহন হতে রাজী হবে !’

‘তোর হতোম পেঁচার চে চের ভালো’—মদন ঠাস করে বললো ।

‘আচ্ছা বাবা আচ্ছা তোমার ইঁহুর সবার চে ভালো সবার চে সুন্দর, তা’লে তুই সাজবি তো গণেশ ?’—গিহু বললো ।

‘না’—মাথাটা ভয়ানকভাবে নাড়িয়ে মদন বললো, ‘কিছুতেই না ।’

সবাই গালে হাত দিলো । এ কী ঠা’টা ছেলে রে বাবা, এই গণেশ আর ইঁহুরের নিন্দে করলে খেপে আঙুন হচ্ছে, আবার গণেশ হতে বললেও মারতে উঠছে ।

‘তবে তুই কী হবি ?’—সবাই তাকে ছেঁকে ধরলো । কাতিক ? অম্বর ? সিংহ ? না, কোনটাতেই মদন হ্যাঁ দিচ্ছে না । ঘাড় গোঁজ করে মুখ কুলিয়ে সে দাঁড়িয়েই রইলো চোখ পাকিয়ে ।

গিহুর হাতছটো নিশপিশ করতে লাগলো হতচ্ছাড়াকে মজাটা টের পাইয়ে দেবার জন্যে । কিন্তু তাতে যদি ঐ গোয়ারগোবিন্দটা আরোও বিগড়ে যায় ! যদি বলে বসে থিয়েটার আদি করবই না যাঃ । তাহ’লে ভীষণ মুশকিলে পড়ে যেতে হবে । কারণ মদনটা যা দারুণ পার্ট করে, চেষ্টিয়ে-মেচিয়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে একদম জমিয়ে দেয় স্টেজ । অবিশিষ্ট ওকে গণেশ সাজালে মুশকিলও একটা হবে—গণেশের বোধ হয় চেষ্টামেচি নাচনকোদন নেই, হয়তো পৈতে বাগিয়ে থপথপ করে স্টেজের ওপর তবে তাকে হাঁটতে হবে সকলের পেছন-পেছন । সত্যি, এতে কিন্তু মদন ভেঁদড়টার মুশকিলও হবে দারুণ । ভাবতে ভাবতে গিহুর মেজাজটা একটু নরম হয় । ভাবে, তাহলে কি মদনটা এই-সব ভেবেই গণেশ হতে চাচ্ছে না ? আচ্ছা এক কাজ করলে হয়—ওর যেমন খেড়ে বাদরের মতো খেইখেই করে নাচা স্বভাব, গণেশঠাকুরকে দিয়ে তাই একটু করালে কার কী ক্ষতি ? তাহলেই তো সব দিক রক্ষা । গণেশ বেচারীর পেটটা একটু মোটা আর ঝুলে পড়েছে বলে তার কি একটু লাফঝাঁপ করতে সাধ যেতে পারে না কখনো ? তাহলে যে সামনের গলির ভাবলার ছোটকাকা অত বড়ো একটা পেট নিয়ে রোজ নেচে-কুঁদে বেড়ায়, সেটা কেমন করে হচ্ছে ? অ্যাংচার বাবার পেটের সাইজ তো আরো বড়ো, তো সেদিন পাড়ার স্পোর্টসের দড়ি-টানাটানিতে তো অ্যাংচার বাবা অমন জালার মতো ভুঁড়িটা নিয়েও কেমন দড়ি-টানাটানির খুঁটি হয়ে তার দলকে জিতিয়ে দিয়েছিলো । তাহলে গণেশ-ঠাকুরের বেলাতেই যত আঁটিশুটি কেন—সব সময় তাকে পায়ের ওপর পা তুলে আঙুলে পৈতে জড়িয়ে বিড়বিড়িয়ে মন পড়তে হবে তার কী মানে আছে । গিহু তখন বিপিনমামুর খোঁজে গেলো । বিপিনমামুকে এই-সব বুঝিয়ে বললে তিনি যদি গণেশঠাকুরকে একটু স্মার্ট করে দেন তাহলেই সব-দিক বেঁচে যায় ।

বিপিনমামু সব শুনে নিজের নাক টানতে টানতে কী-সব ভাবতে লাগলেন ।

গিন্নি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে ধৈর্য হারিয়ে বললো, 'সব সময় অত নাক টানলে তুমি নিজেই যে গণেশ হয়ে যাবে বিপিনমামু।'

'নাক টানলে বুদ্ধি খোলে তা জানিস?'—বিপিনমামু বললেন, 'যার নাক যত লম্বা তার বুদ্ধি তত বেশি। গণেশের নাকটা অত লম্বা বলেই না সে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। দেবতার মধ্যে সবচে পণ্ডিত কে জানিস? গণেশ।'

কথাটা মদনও শুনতে পেলো। কারণ একটু আগে মদন দৌড়ে এসেছিলো বিপিনমামুকে কী বলবার জন্যে, কিন্তু দোরগোড়ার এসে যেই দেখলো ফুলদি অর্থাৎ গিন্নি কী-সব বলাবলি করছে বিপিনমামুর সঙ্গে, অমনি সে দরজার পাশে চুপটি করে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। মদনের ধারণা তাকে বিপিনমামু কি ফুলদি কেউই দেখতে পায়নি, কিন্তু আসলে দুজনেই মদনের লুকিয়ে দাঁড়ানোটা টের পেয়ে গেছে।

আর সেইটে টের পাবার জন্যেই গিন্নি একটা কথা বলি-বলি ক'রেও চেপে গেলো। তার মুখে এসে গিয়েছিলো—নাক শুঁড়ের মতো লম্বা হলেই যদি বুদ্ধি বেশি খোলতাই হবে তাহ'লে বুদ্ধি-বুদ্ধি কথা বললে সবাই হস্তীমূর্খ ব'লে গাল পাড়ে কেন। গিন্নি ভাবলো, থাক বাবা অত খুঁচিয়ে কেঁচো থেকে সাপ বের করে আমার কী দরকার, মদনটার কানে সে-কথা ঢুকলে আর রক্ষে থাকবে না। তারচে ওকে যে শোনানো হলো গণেশ খুব পণ্ডিত গণেশ খুব বিদ্বান সেই ভালো।

বিপিনমামু গলা আরো একটু তুলে বললেন, 'অত বড়ো যে মহাভারতখানা, তা কে লিখেছে জানিস?'

গিন্নি কাঁপরে পড়ে চুপ করে রইলো।

মদন ওদিকে এর উত্তর জানে, মুহূর্তে সে ছুলে গেলো যে সে লুকিয়ে আছে, এক লাফে সে ঘরে ঢুকে বললো, 'ব্যাসদেব।'

বিপিনমামু খুব যেন অবাক হয়ে গেছেন এমনি ভাব করে বললেন, 'ওরে হনুমান, তুই কোথেকে এলি হঠাৎ। তা বেশ, ব্যাসদেব যে বললি তা ঠিকই বলেচিস বটে কিন্তু ওর মধ্যে একটা কিন্তু আছে। ব্যাসদেবই অত বড়ো মহাভারতটা মনে-মনে বানিয়েছেন বটে, কিন্তু নিজ-হাতে তিনি তো তা লেখেননি। তাঁর হাতের লেখা বড় খারাপ ছিলো কিনা, নিজে কিছু লিখলে কী লিখলেন নিজেই বুঝতে পারতেন না—ডাক্তারদের মতো ছিলো বেচারীর হাতের লেখা। তাই দেবতাদের মধ্যে যার হাতের লেখা সবচে সুন্দর তাঁকে দিয়েই ব্যাসদেব মহাভারতটা লিখিয়ে নিয়েছিলেন। কে তিনি বলতে পারিস কেউ?'

ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে অশ্রান্ত বাচ্চারাও সব এসে গেছে।

গিন্নি আন্দাজেই বলে ফেললো, 'গণেশ।'

'ঠিক বলেচিস। গণেশের হাতের লেখা কী যে চমৎকার না সে আর বলার নয়—রবীন্দ্রনাথের চাইতেও চমৎকার। দেখলে চোখ ঠিকরে যায়। অত চমৎকার লেখা তো, অথচ গণেশঠাকুর আবার লেখেনও ঝড়ের বেগে। সে কী স্পীড, তুফান মেল পাঞ্জাব মেলকে বলে দূরে থাক। চার হাতেই সমানে লিখতে পারেন কিনা।

তালেই বোঝা গণেশের কত গুণ। দেবতারা রোজ ঘুমের থেকে উঠেই আগে গণেশের পা-ধোয়া জল খেয়ে তবে গিয়ে পড়তে বসে, তা জানিস ?

ভিকু ঠোঁট উন্টে বললো, 'যত সব বাজে কথা। খেড়ে খেড়ে দেবতারা সব পড়তে বসবে, না! তারা যেন সব ছেলেমানুষ।'

'আরে বুদ্ধির চিপি'—বিপিনমামু বললেন, 'খেড়ে দেবতারা পড়তে বসে আমি বলেছি নাকি। পড়তে বসে তো বাচ্চা-বাচ্চা দেবতারা। খেড়ে দেবতারা তো আমাদের মতো হাট-বাজার আপিস-কাছারি করে।'

কেউ-কেউ প্রতিবাদের সুরে চোঁচিয়ে উঠলো, 'স্বর্গে বাজার আছে ?'

বিপিনমামু আরোও জোরসে বললেন, 'না থাকলে দেবতারা খাবে কী ?'

তা বটে। ছেলেমেয়েরা সব চুপ মেরে গেলো।

'গণেশের মতো আর দেবতা হয় নাকি'—বিপিনমামু বলে চললেন, 'যে পুজোই করো না আর যার পুজোই করো না, হু হু বাবা গণেশের পুজোটি আগে করে নিতে হবে। কথায় বলে সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ। দোকানদারেরা যা ভয় খায় না গণেশকে—দেখিসনি যে-কোন দোকানে, বড়ো-বড়ো ইয়া-ইয়া গদীতে পর্যন্ত, মাথার ওপরে গণেশঠাকুরকে বসিয়ে তেল-সিঁদুর দিয়ে রোজ পুজো দিতে হয়। একদিন তাঁকে পুজো দিতে ভুলে গেলে ব্যস সেদিন আর একটি পয়সা বিক্রী হবে না—সেদিন বসে-বসে ঘেঁচু খাও।'

গণেশকে এতটা উঁচুতে তোলা গিন্নুর আর সহ হলো না। কারণ সে সাজবে দুর্গা। মদনাটাকে খুশি করার জন্যে গণেশকে ভালো-ভালো করা-তে তারও সায় ছিলো। কিন্তু তারও একটা সীমা থাকবে তো। এ যে দেখি বিপিনমামু নাক টানতে টানতে গণেশকে মা-দুর্গার চাইতেও টেনে ওপরে তুলে দিচ্ছেন। সুতরাং গিন্নু ফঁস করে উঠলো, 'বড্ড বাড়াচ্ছে কিন্তু বিপিনমামু। গণেশ বুঝি মা-দুর্গার চাইতেও বড়ো।'

'ওরে হাঁদা মেয়ে'—বিপিনমামু বললেন, 'সে-কথা আসচে কেন রে অঁা। গণেশ তো দুর্গার ছেলে রে। তা ছেলে আবার তার মার চে বড়ো হবে কেমন করে। মা মা ছেলে ছেলে। তবে হঁা, মা-দুর্গার শক্তি গণেশের চে বেশি হলে কী হবে, মানুষের কাছে কিন্তু গণেশের সম্মান সকলের চে বেশি। ঐ যে বললাম, সব পুজোর আগে গণেশপুজো করতেই হবে, গণেশকে পুজো না দিলে কোন কার্যসিদ্ধি হবে না।'

'কেন ?'—নিমাই ভয়ানক রেগে গিয়ে বললো। তার রাগের কারণ সে সাজবে কান্তিক।

বিপিনমামু বেগতিক দেখে চোখ বুজলেন। চোখ বুজেই শুরু করলেন, 'সে জানিসনে বুঝি ? আচ্ছা বলি শোন। মা-দুর্গার সখীরা একদিন তাঁর কাছে নাশিশ করলো, তুমি যখন চানটান করো তখন মহাদেব তাঁর যত ভূতপ্রেত যত্তাণ্ডাদের নিয়ে সেখানে গে গোলমাল করে' এটা কি উচিত ? আমাদের এমন একজন দরকার যে তুমি যখন চান করবে তখন ওরা যাতে কেউ চুকতে না পারে তা দেখা। তার গায়ে খুব জোর থাকা দরকার যাতে সে একাই মহাদেবের সব ভূতগুলোকে ঠেঙিয়ে

হাটিয়ে দিতে পারে। তা উমা—উমা কে জানিস তো? না-ভূর্গা—তা উমা তখন সরোবর থেকে খানিক পাক না তুলে এমন চমৎকার এক মূর্তি গড়লেন সে আর বলার নয়।’

পাক থেকে মূর্তি গড়া হলো শুনেই গিছু এবং আরো কেউ-কেউ খুশি হয়ে মুখ মচকালো নাক সিটকালো।

‘পাক থেকে গড়া হলে হবে কী’—বিপিনমামু গিছু-ওদের মনোভাবটা বুঝে বললেন, ‘উমার তো অদ্ভুত সব ক্ষমতা, সেই পাকগড়া মূর্তিকেই তিনি এমন সৌন্দর্য দিলেন না, চাদ্রিক আলোয় আলো হয়ে গেলো। সবাই আদর করে নাম দিলো সেই ছেলের—গণেশ। ঐরকম নামই তখন স্বর্গে খুব আপ-টু-ডেট ছিলো কিনা, এখন না হয় আর ওটা সেরম চলে না। তা গণেশের যেমনি রূপ তেমনি তার গায়ে জোর চুকিয়ে দিলেন উমা। তারপর বললেন, ‘যাও বাছা গণেশ, এবার তুমি সদর দরজায় গিয়ে একটু পাহারা দাও তো, আমি এখন চান করব, কারুক্ষে এখন ভেতরে ঢুকতে দিও না যেন, তোমার বাপ হচ্ছেন মহাদেব, তাঁকেও না।’ গণেশ গিয়ে দাঁড়ালো সদর দরজায় বুক ফুলিয়ে। একটু পরেই নেশাভাঙ করে ব্যোমভোলা মহাদেব আর তাঁর চেলাচামুওরা হল্লা করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত। কিন্তু ভেতরে যেই ঢুকতে যাবে, গণেশ অমনি লাঠি বাগিয়ে বললে, এইও ভাগো ইঁহাঁসে, আর এক পা এগিয়েছো কি ঠ্যাঙ খোঁড়া ক’রে দেব পিটিয়ে। অতটুকু বাছা ছেলের এই কারবার দেখে পালোয়ান-পালোয়ান সব ভুতপ্রেতেরা হেসে গড়িয়ে পড়লো। গণেশ তাইতে রেগে গিয়ে লাঠি উঁচিয়ে সবাইকে তাড়া করলো। তাড়া খেয়ে সবাই ভড়কে গিয়ে ভেঁা দৌড়। ওদের মধ্যে সবচে সাহসী ছিলেন স্বয়ং মহাদেব, তা তিনি তো ব্যাপার গুরুচরণ বুঝে অনেক আগেই একেবারে মাইল দুয়েক দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভুতেরা তাঁর কাছে গিয়ে ব্যাপার বললো। মহাদেব তাই শুনে রেগে গিয়ে কয়েকটা ভুতের কান ম’লে দিয়ে বললেন, একটা ফিকড়ে ছোঁড়ার ভয়ে তোরা এতগুলো জোয়ানমদ্দ পালিয়ে এলি। যা জলদি, ওটাকে ষাড়খাক্কা দিয়ে সরিয়ে পথ পরিষ্কার কর, তারপর আমি যাচ্ছি। ভুতেরা ফিরে গিয়ে যেই গণেশের ষাড় ধরতে যাবে অমনি গণেশ দমাদম লাঠি মেরে কয়েকটা ভুতের মাথা চিচিংকাক ক’রে দিলে। আর কয়েকটাকে অ্যায়াস্ টেনে চড় আর চাঁটি লাগালে না, বাস, সবাই চোখে একদম জোনা কি পোকা উড়তে দেখলো। কাজেই ছোট্ট ছোট্ট ছোট্ট পালা পালা। মহাদেব খেঁকিয়ে উঠে বললেন, কী রে গাধারা, আবার সব ল্যাঞ্জে গোবরে হয়ে এলি বুঝি, ছিছি এরা আমার নাম ভোবালে। মহাদেবের কপাল চাপড়ানো দেখে নন্দী-ভূঙ্গী বললে, আচ্ছা বাবু, আমরা ছোঁড়ার রোয়াব ভাঙছি, ছোকরা, আপনারই ছেলে বলছে কিনা তাইতো ওর হাড়মাস এক করতে পারছি না, নয়তো দেখতেন। এই না বলে নন্দী-ভূঙ্গী সাক্ষোপাদদের নিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সেজে রে-রে-রে-রে করে গিয়ে গণেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। গামা আর গোবরের চাইতেও পালোয়ান নন্দী আর ভূঙ্গী গণেশের দুই পা বাগিয়ে ধরে কষে হেঁচকা মারলো। গণেশ তখন ‘তবে রে’ বলে জাপানী জুজুৎসুর কায়দায় মোক্ষম এক প্যাচ

ককে, ছটোকেই ল্যাঙ মেরে ফেললে পায়ের তলায়, ফেলে ছপায়ের মোচার মধ্যে ছটোকে ঠিক যেন কুনুপ দিয়ে এঁটে নিয়ে গেটের দরজা থেকে লোহার ছড়কোটা খসিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে ছুজনের অন্ধতালুতে জম্পেস করে ঠুকুনি দিতে লাগলো।'

ছেলেমেয়েরা কেউ-কেউ হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো। গিছু এবং আরো-ছ একজন হাসলো না, তারা চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে গালে হাত দিলো। আর মদন? সে তখন উল্লাসে উদ্ভাসিত চোখে তার শরীরের সমস্ত মাংস ফুলিয়ে ঝাঁড়িয়ে আছে, উদ্ভেদনায় তার কপালে নাকে আর নাকের নিচে ঘান বেরিয়ে গেছে।

বিপিনমাখু মদনের দিকে একটিবার নজর বুলিয়ে নিয়ে আরোও ঘোরালো ক'রে ফের শুরু করলেন ছেলেমেয়েদের গোলমাল খামিয়ে দিয়ে, 'খান্ খান্ বলছি। নন্দী আর ভুঙ্গীর যখন জিভ বেরিয়ে গেলো তখন গণেশ ফুটবলে কিক মারার মতো দুই কিক মেরে নন্দী ভুঙ্গীকে সেটোর করলো। বেচারীর পড়লো গিয়ে একদম দুমাইল দূরে যেখানে মহাদেব গায়ে জোর করার জন্যে হেঁইও-হেঁইও ক'রে বৈঠকি দিচ্ছে। নন্দী-ভুঙ্গীর অবস্থা দেখে মহাদেব ফায়ার হয়ে গিয়ে ছুজনকেই জুলফি ধ'রে টেনে তুলে অ্যাগসা ঝাঁকুনি মারলেন না, বাস, নন্দী-ভুঙ্গীর জ্ঞান বাপ-বাপ ক'রে ফিরে এলো। মহাদেব তাদের ব্লাডি সোয়াইন ব'লে গাল পাড়তে লাগলেন, বললেন, ইয়ারে শুয়োরেয়া, তোরী যদি ন্যায়মতে ঐ বাচ্ছা ধানিলকাটাকে শায়েস্তা করতে নাই পারলি তো তোরী কি অ্যামেরিকান ক্রি-স্টাইল কুস্তি ভুলে গেছিস। হুঁস, রক্ষা, পটি, ঘেস্তা, ঝাপড়, কামড়, ঝটকা—এ-সব কি বিলকুল ভুলে মেরে দিয়েচিস। নন্দী তখন কয়েক কলসী পচাই চকচক করে গিলে নিয়ে একটু সুস্থ হয়ে ভুঙ্গীকে এক হাজার কলকে গাঁজা সাজতে ব'লে মহাদেবকে বললো, আচ্ছা বাবু, আমাকে আর একটা চান্স দিন, দেখুন এবারে আনি কী করি। ব'লে সে আড়ালে গাঁজা টানতে গেলো। ততক্ষণে হাজার কয়েক কলকে সাজা হয়ে গেছে। ভুতেরা সবাই মিলে চোখমুখ লাল ক'রে গলা ফুলিয়ে এক-এক কলকে সবাই এক-এক মিনিটে সাবড়ে দিচ্ছে। টানের চোটে কলকে ঠাসঠাস করে ফেটে যাচ্ছে। ওফ, সে কী কলকে ফাটার শব্দ। সেই শব্দে ক্ষীরোদসমুদ্রে নারায়ণের শুম ভেঙে গেলো। অম্মা বেচারীর কোমরে বাত, রক্তা বসে-বসে তাঁর কোমরে কী-একটা কবিরাজী তেল মালিশ করে দিচ্ছিলো, তা সেই অবস্থাতেই বেচারী প্রলয় হচ্ছে ভেবে লুঙ্গি সামলাতে সামলাতে হাঁপাতে হাঁপাতে কৈলাসের দিকে রওনা হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র থেকে শুরু করে তেত্রিশ কোটি দেবতা যে যেখানে ছিলো সবার অবস্থাই তাই, সকলেই কৈলাসের দিকে ছুটতে শুরু করলো, আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই। নারদ তখন উর্বশীর বাড়িতে ডুইংক্রমে বসে চা খাচ্ছিলো, ঐ পেল্লায় শব্দ শুনে : 'একটু দেখে আসি তো কী ব্যাপার'—বলে চা-সিঙারা ফেলে ঢেঁকিতে চড়ে বসলো। ওদিকে লক্ষ লক্ষ ভুতপ্রেত নিয়ে নন্দী আর ভুঙ্গী তো ফের গণেশের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। গণেশ ওদের আসতে দেখে খেপে আগুন হয়ে যাচ্ছেতাই করে ধমকি-ধামকি দিচ্ছিলো। এখন হয়েছে কি, ওদের মধ্যে ভুঙ্গী তখন সবে একটু-আধটু লেখাপড়া ক'রে সামান্য কিছু পণ্ডিত হয়েছে। কী ক'রে তা জানিস নে বুঝি? আরে আমাদের বিদ্যাসাগর স্বর্গে গিয়ে তো একটা টোল খুলেছিলেন, সেই টোলে তো ইন্দ্র থেকে শুরু

করে অনেকেই ভতি হয়েছিলো, তা প্রথম আশু পরীক্ষার ভূমীই হয়েছিলো কাস্ট । গণেশের গালাগাল শুনে নন্দীর ঠেলা খেয়ে ভূমী এগিয়ে গেলো গণেশের কাছে, গিয়ে বিষ্ণুসাগরী ভাষায় শুরু করলো, 'অরে ছুরাশ্বন্ ! তুই শৃগাল হইয়া সিংহের আসন গ্রহণপূর্বক শিবের প্রতিম্বন্দী হইতেছিস । রে মূখ ! যাবৎকাল আমাদিগের পরাক্রম অবগত না হইবি, তাবৎকাল তুই গর্জন কর ; এক্ষণেই অস্বদীয় পরাক্রম অল্পভব করিয়া মরিবি ।' যাহাতক এই-পর্যন্ত বলা, গণেশ লাফ দিয়ে প'ড়ে ভূমীর গালে ঠাস করে এক চড় মারলো । নন্দী অমনি পেছন থেকে কুস্তির দো দস্তি ঢাক প্যাচ কষিয়ে গণেশকে কাৎ করে মাটিতে ফেললো । কিন্তু গণেশ চোখের পলকেই উঠে প'ড়ে মৈমনসিংহের বিখ্যাত জ্ঞানাই কৈলাস বাঘার কায়দায় দস্তি প্যাচেরই ঘোরে পেছনে চলে গিয়ে নন্দীকে এক কালাজং কষে উপুড় করে ফেললো, ফেলে শুরু করলো দমাদম কিল, যাকে বলে ভাদ্রমাসের তাল । অম্মা ঐ দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেললেন । তুন্দিল নামে এক ভূত দিশেহারার মতো অম্মার কাছে গিয়ে বললো : 'দাহ, দেখছো কী, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কেঁদে কী হবে, যাও দাহ আনাদের নন্দীদাকে বাঁচাও এইবেলা, ওর যে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে আছে ।' অম্মা না তাই শুনে : 'আহা হা করো কী করো কী'—বলতে বলতে হু-হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে গণেশের কাছে গেলেন । কিন্তু গণেশের তো তখন আর বুড়োওড়ো জ্ঞান নেই, অম্মাকে দেখেই সে নন্দীকে ছেড়ে দিয়ে বাঁ হাতে অম্মার দাঁড়িটা বাগিয়ে ধ'রে দরজার সেই লোহার হড়কোটা ফের টেনে নিলে । হড়কো দেখেই অম্মা ভেউভেউ করে কেঁদে উঠলেন, বললেন : 'বাবাজী, আমি তো তোমার বন্ধু হিসেবে এসেছি, বাবাজী আমি তো তোমার শত্রু নই, তার ওপর বাবাজী আমি বুড়ো-হাবড়া, আমার প্রতি বাবাজী কেন এই ব্যাভার, বাবাজী গো !' গণেশ তখন অম্মাকে এক রদা মেরে দূরে সরিয়ে দিলে । বাস সে কী হৈটৈ শুরু হয়ে গেলো । ত্রিভুবন অস্থির । স্বর্গ মর্ত্য পাতাল টলমল টলমল করতে লাগলো । নারায়ণ আর শিব তখন তাঁদের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরী হচ্ছেন গণেশের বারোটা বাজিয়ে দেবার জন্যে । তাই না দেখে নারদ করলো কি, শুম্র দিয়ে চেঁকি চেপে সে ভেতরে উমার কাছে চলে গিয়ে চুপিচুপি সব রিপোর্ট করে দিলো । উমা তো তাই শুনে অগ্নি-অবতার হলেন । কী, এত বড়ো অনাচার, হুধের বাছা গণেশ, তাকে খুন করার জন্যে তার বাপেরই এমন হীন চক্রান্ত ! আচ্ছাঃ, উমা অমনি নিজের তেজ থেকে ছটো শক্তি তৈরী করলেন । তার একটা হচ্ছে রাক্ষসী, নাম তার মহামুখী । গণেশকে হের করার জন্যে সে কৃষ্ণপর্বতের মতো ভীষণ একটা হাঁ ক'রে গণেশের বাঁ পাশে গিয়ে দাঁড়ালো । আর একটা শক্তির নাম অপরা, অসংখ্য তার হাত, উমা তার মধ্যে বিদ্যুৎ চুকিয়ে দিলেন, এ সি কারেন্ট, ছুঁলেই মৃত্যু, সে গিয়ে দাঁড়ালো গণেশের ডাইনে । ওদিকে নন্দী-ভূমীর সলেমিরা অবস্থা দেখে মহাদেবের কনাগার-ইন-চীফ ষণ্মুখ তার সমস্ত পণ্টন নিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গণেশের ওপর । পণ্টন মানে আর্মড ভূতপ্রেত আর কি, তা তাদের মধ্যে যেগুলো বেশ মোটা-মোটা নখরকাণ্ডি সেগুলোকে মহামুখী কানে ধরে-ধরে টেনে নিয়ে তার বিরাট হাঁয়ের মধ্যে ফেলে কোঁৎ-কোঁৎ করে গিলে ফেলতে লাগলো । আর যেগুলো রোগা-রোগা, খেতে ভালো না, সেগুলোর ব্যবস্থা অপরা করলো, হাত

বাড়িয়ে বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিতে লাগলো, অমনি সব-কটা অক্সা পেয়ে গিয়ে অপরাধ গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রইলো। দেখতে-দেখতে সেখানে পাড়া-বেপাড়ার সমস্ত দেবতা এসে হাজির হলো। দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব কেউ আর বাকি নেই আসতে। সবাই খরখরিয়ে কাঁপছে ভয়ে। গেলান গেলান চিৎকার উঠেছে আকাশে-বাতাসে। রক্তা, মেনকা, উর্বশী, তিলোত্তমা ইত্যাদিরাও যে যার জানলা ছেড়ে বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে রগড় দেখতে। হ্যাঁ, ওদিকে ষণ্মুখের সঙ্গে গণেশের দারুণ যুদ্ধ হচ্ছে। ষণ্মুখকে যদি বলিস হাংগারির কিং কং, তো গণেশকে বলতে হবে আমাদের হামিদ পালোয়ান। গণেশ শেষ অস্ত্র ষণ্মুখকে কাঁচি মেরে ধ'রে ধোবীপাট কষে এক আছাড়েই ওর দফা গয়া করে দিলো।'

ছেলেমেয়েরা মুহূর্মুহ হাততালি দিচ্ছিলো চিৎকার করছিলো। আবার একটা উল্লাসের সঙ্গে হাততালি পড়লো। মদন তো : 'বাক আপ বাক আপ গণেশ'—ব'লেই এবার চোঁচিয়ে উঠলো।

বিপিনমায়ু দম নিয়ে ফের বলতে শুরু করলেন, 'নারায়ণ তখন বললেন শিবের কানে-কানে, ও দাদা, ঐ যে মহামুখী আর অপরা, ও-দুটোকে তো গায়ের জোরে কিছু করা যাবে না, নেয়েছেলে যে, ও-দুটোকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে। তা আমি তো এই ভোলানোর বিদ্যেয় ওস্তাদ। ঝাঝো দাদা আমি কী করি। ব'লে নারায়ণ চমৎকার জামাই-জামাই চেহারা ক'রে ওদের কাছে গিয়ে হাসতে লাগলেন। ব্যস, মহামুখী আর অপরা দুজনেই গ'লে জল। অমন চেহারা দেখলে নাথার ঠিক থাকে। দুজনেই তখন গণেশের কথা ভুলে গিয়ে সেই ছদ্মবেশী নারায়ণকে ধরবার জন্যে এগিয়ে গেলো। নারায়ণ অমনি দে ছুট, আর তাঁর পেছন-পেছন ওরাও ছুটতে লাগলো। মহাদেব তখন স্রোযোগ বুঝে ত্রিশূল উঁচিয়ে গণেশের দিকে ধেয়ে গেলেন। গণেশ গদার এক ঘাইয়ে সে ত্রিশূল ভেঙে তেত্রিশ খণ্ডে পরিণত করলো। 'বটে?'—ব'লে শিব মালসাট মেরে তখন তাঁর পিনাক ধনুকে বাণ চড়ালেন। গণেশ তাই না দেখে বাহ্নাফোঁট ঠুঁকে লাফিয়ে পড়লো শিবের ওপর, শিবের জটা খাবলা মেরে ধ'রে কুস্তির শোয়ারি আর ঢাক মেরে মেরে শিবের পাঁচ-পাঁচটা হাত ভেঙে ফেললো। ওদিকে নারায়ণ তখন মহামুখী আর অপরা'কে এক ভুল রাস্তা ধরিয়ে দিয়ে সুদর্শন চক্র নিয়ে ফিরে এসেছেন সেখানে। গণেশ তার মস্ত গদা দিয়ে সেই সাক্ষাতিক সুদর্শনকে অনেক কষ্টে ঠেকাতে লাগলো। কিন্তু শিব তখন করেছে কি, কোথেকে তার একটা ত্রিশূল নিয়ে এসে কাপুরুষের মতো পেছন থেকে গণেশের গলাটা কেটে ফেললো।'

ব'লে বিপিনমায়ু থামলেন। ছেলেমেয়েরা সব বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

বিপিনমায়ু গভীর গলায় ফের শুরু করলেন, 'এদিকে নারদ তার ডিউটি ভোলেনি। সে সঙ্গেসঙ্গেই চোঁকি চেপে উমার কাছে গিয়ে সব বলে দিয়েছে। আর সে-খবর শুনে, উমার যা অবস্থাটা হলো সে তো বুঝতেই পারিস। রাগেহুঃখে কাঁপতে লাগলেন তিনি। আর তার ফলে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সব কাঁপতে লাগলো, হাহাকার উঠলো আকাশে-বাতাসে। যায় যায়, সব বুঝি যায়, আর কিছুই বুঝি বাঁচানো যাবে না উমার

কোপ থেকে । ভ্রম্মা আট চোখে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলেন । নারায়ণ যে কোথায় গিয়ে লুকিয়ে রইলেন তখন—লক্ষ্মা তাঁকে খুঁজে-খুঁজে হয়রান হতে লাগলেন । শিবের কোমর গেছে গণেশের গদায়, সেই ভাঙা কোমরে তাঁর সাহসে কুললো না উনার কাছে যান তাঁকে শাস্ত করিতে । দেবরাজ ইন্দ্র, যমরাজ ইত্যাদিরা নেংটি ইঁহরের মতো দোড়োদোড়ি করতে লাগলেন । চতুর্দিকে কেবল 'গেলান গেলান' আর 'বাঁচাও বাঁচাও' রব । তাহ'লে কে এখন উমাকে সামলাতে যাবে ? স্রষ্টিকে রক্ষা করতে তো হবে । কে যাবে কে যাবে ? শেষ পর্যন্ত উর্বশীর বকাবকিতে নারদই ফের গেলো উনার কাছে, তার সঙ্গে গেলেন কয়েকজন গোবেচারী ঋষি, সবাই গিয়ে সেই করালবদনী মহাপ্রলয়-রূপিণী দুর্গার পায়ের তলায় পড়লেন । তাঁর পায়ে মাথা ঠুকতে ঠুকতে সবাই সমস্বরে বলতে লাগলেন, 'হে মাতঃ জগদম্বে, তুমিই তো আশ্রয় প্রকৃতি, তোমার আশ্রয় মহিমা তোমার হাজারো গুণ সে কি সহস্র মুখেও বলে শেষ করবার ? তোমার যে কত নাম । এক-একটা নামে তোমার এক-একটা গুণ বোঝা যায় । তোমার নাম অপর্যা, গিরিজা, ভবানী, পরমাণু বোমা, ভদ্রা, চণ্ডিকা, কাত্যায়নী, পেনিসিলিন, মহাকালী, মহামায়া, জগদ্ধাত্রী—আর তো সপ্তসপ্ত কিছু মনে পড়ছে না হেই মা জগদম্বে । তোমার ঐ মারকুটে মূর্তি দেখে আমাদের বুদ্ধিবুদ্ধি সব গুলিয়ে গিয়েছে, আমরা নিজেদের নাম ভুলে গিয়েছি । ও মা গো, তুমি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের জমিদারনী, শিব থেকে শুরু ক'রে কেঁচোটি পর্যন্ত সকলেই তো মাগো আমরা তোমার প্রজা, তবে কেন মা তোমার এই মূর্তি ?'

'বিপিনমায়ু থামলেন ।

'তারপর ? তারপর ?'—ছেলেমেয়েরা অধীর হয়ে উঠলো ।

বিপিনমায়ু বললেন, 'উমা তো এই-সব শুনে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিক ক'রে হেসে ফেললেন । নারদ অমনি উনার পায়ে ফের মাথাটা ঠুকে ব'লে উঠলো : 'ব্যস ব্যস একবার হেসে ফেললে রাগ প'চে যায় । ওমা তোমার রাগ প'চে গিয়েছে, আর রাগ করা চলবে না তোমার এ-যাত্রা ।' উমা তখন নিজের রাগের ওপর রাগ ক'রে বললেন : 'কিন্তু আমার গণেশের কী হবে ? শিবকে বলা গিয়ে গণেশকে বাঁচিয়ে না দিলে আমি তাঁর মজা বুঝিয়ে ছাড়ব ।' এই কথা ? নারদ তখন গিয়ে সমাচার নিবেদন করলো মহাদেবের কাছে । মহাদেব বললেন, 'এই কথা ? যাও একটা মুণ্ড নিয়ে এসো তারপর দেখছি ।' যম তাই শুনে এক ছুটে চ'লে গেলো উত্তর দিকে, একটা একদাঁতওয়ালা হাতী খুঁজছিলো, এক কোপে সেইটেরই মুণ্ডটা খসিয়ে নিয়ে যম চ'লে এলো । উমা ফের বেগে গিয়ে বললেন, 'এ যে হাতীর মাথা ।' দেবরাজ ইন্দ্র থেকে শুরু ক'রে তেত্রিশ কোটি দেবতা সমস্বরে ব'লে উঠলেন, 'তাতে কী' হয়েছে, হাতীর মাথা হোক না, ঐ হাতীর মাথাতেই গণেশের বুদ্ধি সকলের চে বেশি হবে, সকলের আগে ওর সম্মান, সকলের আগে ওর পূজা । যা ছেলে একখানা বাপস, ওর ডাক শুনছে গণেশ, আমরা কয়েকটা পোশাকী নামও ঠিক করেছি ওর জন্যে : গজানন, লম্বোদর, গণপতি—আপাতত এই রইলো, পরে হাতে-বড়ির সময় আরো কয়েকটা দেওয়া যাবে ।'

বিপিনমায়ু চূপ হলেন ।

‘তারপর তারপর ?’

‘আরো তারপর ? তারপর সেই হাতীর মাথাটাই ছুড়ে দেয়া হ’লো গণেশের ধড়টার সঙ্গে । মহাদেব গায়ে হাত বুলিয়ে ছেলের দেহে ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠা করলেন । চোখ কচলে গণেশ উঠে বসলো । সবাই আনন্দে নাচতে লাগলো । পাড়ায় পাড়ায় মাইক লাগিয়ে প্রামোফোনে সিনেমার গান বাজতে লাগলো । তা সে তো হ’লো, আমাদের থিয়েটারে এখন কে তাহ’লে সাজবে গণেশ ? মদন যখন রাজী হচ্ছে না, তখন অন্য কাউকেই—’

মদন একটা লাফ দিলো ।

গিহু চোখ পাকিয়ে বললো, ‘কেন, এখন কেন । না বিপিনমায়ু, ওকে হতে দিও না গণেশ । একের মস্তকের বুদ্ধি । কোন্ সাহসে তুই গণেশ সাজতে চাস !’

‘একশোবার সাজব’—ব’লে মদন গিহুর পিঠে একটি ভাদ্রমাসের তাল ফেলে ছুটে পালালো ।

গিহু মহিষমর্দিনী মূর্তিতে তাকে ভাঙা করলো ।

ব্যাঙ-মাষ্টার

মিহির মুখোপাধ্যায়

শহরের সবাই একডাকে চেনে, খাতির করে একনামেই ডাকে—‘ব্যাঙ-মাষ্টার’। কিন্তু বক্সী-ব্যাঙ-পাটির মালিক হরিপদ বক্সী হেসে হেসে বলে—“আনি আর কিসের ব্যাঙ-মাষ্টার, সে ছিল বটে গ্রেট ইষ্টার্ন সার্কাসের গার্ডন সাহেব। খাঁটি বিলিতি সাহেব। ইয়া লম্বা, ইয়া মোটা, মস্ত ভুঁড়ি। পাকা আপেলের মতো কুলোকুলো গাল। ছাঁদরেল গৌক আর মোটা জুলফির নিচে কতকুতে কটা চোখ। এত মোটা যে ষাড়ে-গর্দানে এক হয়ে গেছে। আমরা তাই আড়ালে বলতুম—গর্দান-সাহেব। সবসময় লাল জল টেনে চোখ দুটো লাল করে রাখত। কিন্তু বাজাতো চমৎকার। আহা! অমন বাজনা আর শুনিনি। কর্নেটে ফুঁ দিলেই বুকের মধ্যে গুরুগুরু করে উঠত।”

একটু দম নেয় হরিপদ বক্সী। উঠোনের পাশে বুড়ো বকুলগাছের আঁকাবাঁকা ডাল-পাতার ফাঁকে ফাঁকে কয়েক ফালি আকাশ। সেদিকে তাকিয়ে একটু সময় কি-যেন ভাবে। তারপর যেন নিজেকে শুনিয়েই বলে—“কত কষ্ট করে বাজনা শিখেছি, এই গার্ডন সাহেবকেই কত ভোয়াজ করেছি, তার ছুতো বুরুশ করেছি, কোট-প্যান্ট নিজের হাতে ইস্ত্রি করেছি, গাঁটের পয়সা খরচ করে বোতল বোতল লাল জল খাইয়েছি, তার উপর মুখটি বুঁজে শুনতাম—ড্যান, সোয়াইন, ব্রাস্কেল কত নতুন নতুন বিলিতি গালাগালি আবার যখন ভাবত আমরা ইংরিজি গাল বুঝতে পারছি না তখন ভাঙাভাঙা হিন্দীতে গাল দিত, ভারী মিষ্টি শোনাত। আমরা পেছনে হাসাহাসি করতুম। সামনে ঠাঁড়িয়ে হাসব—ওরে বাপরে!” রাধা শুনে খিলখিল করে হাসে, হাসতে হাসতে বলে—“জ্যাঠামণি, তোমার সেই যাত্রার দলে সখা সাজ্জার গল্পটা বল না।”

—“আচ্ছা বলব বলব, তার আগে তোর বাপের পকেট থেকে দুটো বিড়ি আন দিকিনি।”

রাধা তার আপন ভাইঝি নয়। বন্ধু নিশিকান্তর মেয়ে। নিশিকান্ত দাস ব্যবসাদার মানুষ। নানাধরনের ব্যবসা। *পান-সুপুরী চালান দেয়, মাছ ভরা পুকুর কিংবা নারকেলের বাগান জমা নেয়, ইদানীং শহরে সাইকেল-রিক্সার বাড়-বাড়ন্ত দেখে ছ’জন মিস্ত্রি রেখে একটা ছোটখাট কারখানা খুলেছে। ভাঙা রিকসা মেরামত করে; টায়ার-টিউব খারাপ হলে বদলে দেয়। ঠাকুরদার আমলের এই পুরনো একতলা দালানের একটা পাশ ভাড়া দিয়েছে হরিপদকে। স্বামী-স্ত্রী ছ’জন থাকে। হরিপদের একমাত্র মেয়ে কুসুম এখন শবুর বাড়ি। সামনের নেড়া উঠোনে বুড়ো বকুলগাছের গায়ে বক্সী-ব্যাঙ-পাটির বানানভুলেভরা বিবর্ণ সাইনবোর্ড ঝোলে—“বিবাহ, উপনয়ন, পূজা-পার্বন, সভা-শোভাযাত্রা প্রভৃতি নানা উৎসব উপলক্ষে আমরা কাবুলি পাইপার ব্যাঙ, হিন্দুস্থান ঝাশানাল ব্যাঙ, মাদ্রাজী ব্যাগপাইপ, হাইল্যাণ্ডার পাইপ ব্যাঙ, নহবৎ শানাই প্রভৃতি সমস্ত সরবরাহ করিয়া থাকি।”

আ-কার, ই-কারের কিছু গুণগোল আছে, রোদে-জলে কয়েকটা অক্ষর উঠে গেছে আর শহরে লোকেরাও জানে নহবৎ শানাই কথাটা শুধু লেখাই রয়েছে, আসলে শানাই বাজনদার লক্ষণ মুচি সেবছর কলেরায় মারা যাবার পর থেকে শানাই সরবরাহ বন্ধ।

মাদ্রাজী ব্যাগ পাইপেরও ওই অবস্থা। ব্যাগ পাইপ বাজাত বুড়ো নেপালী দিলবাহাদুর। গ্রেট ইষ্টার্ন সার্কাসের জীবনেই হরিপদর সঙ্গে জানাশোনা। সার্কাসের দল ছেড়ে হু'জনে একসঙ্গেই এ-শহরে এলো, একসঙ্গে ছিলও কিছুদিন। তারপর কি-যেন হল, সব ছেড়েছুড়ে নিজের দেশ নেপালে চলে গেল। পুরনো ব্যাগপাইপটাও হু'জরে কেটেকুটে শেষ করেছে, ওটা আর বাজে না। বাজাবার লোকও নেই, না থাকুক, হরিপদ একাই একশ, কত পুরনো মানুষ গেল, নতুন মানুষ এল, কত ভাঙাগড়া ওঠা-পড়ার দোলনায় ছলে বক্সী-ব্যাঙ-পাটির বয়স দশবছর পার হল।

দশবছর আগে একমাথা টাক আর একবুক কফ-কাশি নিয়ে অনেকদিন পরে যখন নিজের জন্মস্থান এই শহরে ফিরে এসেছিল, তখন কতটুকু-বা সম্বল ছিল।

নিজের কর্ণেট আর দিলবাহাদুরের ব্যাগপাইপ। হু'জনের কিছু জমানো টাকা। নিশিকান্তর বাড়ির দুটো ঘর বরাবরই ভাড়া থাকত। সার্কাসের দল নানা জায়গায় ঘুরতো, হরিপদও সেই সঙ্গে। মাসে মাসে টাকা পাঠাতো। বছরে এক আধবার ছুটি নিয়ে দেখে যেতো। একটানা উনিশবছর সার্কাসের দলে। এই উনিশ বছরে বোনের বিয়ে হল, নিজে বিয়ে করল, বুড়ো বাপ মারা গেল, কুসুমের জন্ম, বুড়ি মা মরল।

তারপর দেশে ফিরল যখন সেই দশবছর আগে, কুসুমের তখন বয়স ছিল দশবছর আর রাধার পাঁচ। এই দশবছরে মাথার বাকি ক'টা চুলও সাদা হয়ে গেল, আগের মত আর দম পায় না। সে-সব দিনের এখন কিই-বা আছে।

সেই ঝলমলে আলোর মালা-গাঁথা গ্রেট ইষ্টার্ন সার্কাসের রাত্রি।

ব্যাঙের তালে তালে চারটে হাতি শুড় দোলাত, তাদের গলার ঘণ্টা বাজত।

হু'টা শাদা ঘোড়া ঘাড় বেকিয়ে ব্যাঙের তালে তালে আসরে চুকতো।

গর্জন সাহেব ব্যাঙ-পাটির সামনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে সমস্ত বাজানাগুলোকে একছন্দে, একতালে চালাতেন। নানাধরনের বাজনা, কত বিচিত্র নাম—স্ক্রাক্সোফোন, ক্লারিওনেট, ট্রম্বন, কর্ণেটই ছিল চারপাঁচটা, দুটো বড় বড় ড্রাম বাজতো, কেটল-ড্রাম কয়েকটা। সেই দলের একপাশে সাবধানে কর্ণেটে কুঁ দিত পঁচিশবছর আগের হরিপদ বক্সী। শাদা টিউনিক আর কালো প্যাণ্টের জমকালো পোশাক। অনেক উঁচুতে ট্রাম্পিঞ্জের খেলায় দারুণ উত্তেজনা, রঙ-মাখা-মুখ ক্লাউনের কন্ঠায় হাসির ফোয়ারা আর সিংহের গর্জনে আতংক কোতুক। হাজার চোখের দৃষ্টি আনন্দ বিশ্বয় আর ভয়ের নেশায় মাতাল হয়ে যেতো। কি সব দিন ছিল! আর আজকাল। হুর হুর!

রাধা দুটো বিড়ি এনে দিল। বিড়িতে একটা টান দিয়ে হরিপদ বললো—“হুর হুর, বিড়িতেও ঝাঁজ নেই। তোর বাপ এসব বিড়ি কোথেকে আনে রে, রাধিমা! সম্ভার বিড়ি কিনে তোর বিয়ের জন্তে পয়সা জমাচ্ছে, না রে।”

—“খ্যাৎ কি যে বলো তুনি জ্যাঠামনি !”

জ্যাঠামনি একটু হেসে আবার বললো—“সে-সব দিনে আমরা গর্ডন সাহেবের চুরুট চুরি করে খেতুম, যেমন গন্ধ তেমনি ঝাঁজ ।”

কে যেন ডাকুল বাইরে । “বক্সীদা’ আছ নাকি !”

“স্বাঞ্ তো রাধিমা, গৌর ডাকছে বোধহয় ।”—হরিপদ বাইরে তাকাল । গৌরহরি ক্লারিওনেট বাজায় । টুকটাক খোঁজখবর নিয়ে আসে, কোন বাড়ি বিয়ে কোণায় পৈতে, কার ছেলের মুখে ভাত ।

বোশেখ মাস শুরু হল । এখন থেকে বিয়েবাড়ির বায়না আসবে ।

এদিকে বোশেখ, জষ্টি, আষাঢ়, শ্রাবণ আর ওদিকে অশ্বিন, মাঘ আর ফাল্গুন এই কটা মাসই বিয়ের ধুমধাম । চন্ডির মাসটা তো বসে বসেই কাটল । যদিও মুখে-ভাতের তারিখ বছরের বারোমাসেই এক আধটা থাকে । কিন্তু ছেলেমেয়ের মুখে ভাতে কটা লোকেই বা ধুনাধাম করে, ব্যাঙ-পাটির বায়না দেয় । অবিশি আশ্বিনের বিজয়া দশমী থেকে সেই মাসের শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন পর্যন্ত প্রতিমা নিরঞ্জন শোভাযাত্রা চলে আর শোভাযাত্রার শোভা বাড়াবার জন্যে সবাইকেই আসতে হয় বক্সী-ব্যাঙ-পাটির সাইনবোর্ড ঝোলানো এই বুড়ো বকুলগাছের ছায়ায় ।

গৌরহরি খবর দিল—কালীপুরের চৌধুরীদের মেয়ের বিয়ে । পাকা কথা বলতে কাল-পরশু লোক আসবে ।

হরিপদ তখনো কুসকুস করে বিড়ি ফুঁকছে । কেমন নিরাসক্ত ভাব । গৌরহরি পিটপিট করে তাকাল । বক্সীদা’র এ-ভাবটা তার অজানা নয় । বাইরের কেউ বায়নাপত্তরে এলে তো কথাই নেই, এমন কি দলের লোকেরাও দেনা-পাওনার কথা ওঠালে অমনি মুখের ভাব করে বিড়ি ফুঁকবে, কিংবা অন্যদিকে চোখ রেখে ঝড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটবে । এ-ভাবেরও ওষুধ আছে । গৌরহরি জামার নিচে ফতুয়ার পকেট থেকে পানের ডিবে বার করে সামনে ধরল । একসঙ্গে দুটো খিলি নিতে নিতে হরিপদ বললো—“খরচপত্তর কেমন হবে বুঝলে কিছু ।”

“তা ভালোই হবে, চৌধুরীদের অবস্থা মল নয়, এককালে মস্ত জমিদারী ছিল । এখন অবিশি ভাগাভাগি হয়ে পড়তির মুখে আগের জমজমাট ভাব নেই । তাহলেও দেবে খোবে ভাল ।”

“কাজ হচ্ছে কবে ?”

“এ মাসের সত্তরই ।”

“তা হলেই তো মুন্সিল ।”—হরিপদ চোখেমুখে ব্যাজার ভাব ফুটিয়ে পিক ফেলতে একবার বাইরে গেল । তারপর ফিরে এসে আবার ছেঁড়া শতরঞ্জির উপর চুপ করে বসল । রাধা হুঁকাপ চা নিয়ে এল ।

“এহে তুই চা আনবি বুঝলে পানটা আর মুখে দিতাম না । একঘটি জল নিয়ে আয় তো মা, মুখটা ধুয়ে ফেলি ।”

গৌরহরির ভাল লাগছিল না । অসহিষ্ণুভাবে বলল—“মুন্সিলের কথাটাতো ভাঙলে না বক্সীদা । তোমার মনোগত ইচ্ছেটা কি ?”

হরিপদ একটু হাসল—“বলছিলাম বিষ্টি-বাদলার দিন এলো, এখন গাঁয়ের দিকে বায়না-পত্নীর নিতে গেলে একটু ভেবে-চিন্তে দেখতে হবে তো।”

“বিষ্টি কোথায় দেখলে তুমি ! বোশেখ মাসের আদ্যেকও গেল না, কাট-ফাটা রোদ্দুর, বিষ্টির ‘ব-ও’ নেই, আর তুমি বলছ ‘কিনা’—গৌরহরি পিরিছে চা ঢেলে গাল ফুলিয়ে কঁু দিতে লাগল। হরিপদ বহুদর্শীর হাসি হেসে বলল—“মনে আছে, সেবারে মাধবপাশার মিস্ত্রিরদের মেয়ের বিয়ের কথা। সেও তো এই বোশেখ মাসেই ছিল। শালার খাকতে দিল পাঠশালার মধ্যে। মাঝরাতে ঘরের চাল উড়ে গেল, চাদিকে জল ঝেঁঝে। বার নাম কালবোশেখী’—”

কথার মধ্যে অক্ষয় আর সাতকড়ি এল। অক্ষয়ের বয়স হয়েছে, বড় ড়াম বাজায়। সাতকড়ি বাজায় কেট্‌ল্‌-ড়াম। হুটো কেট্‌ল্‌-ড়ানের আরেকটা বাজায় অবিনাশ, আর হরিপদ যাকে বলে বিলিতি কত্তাল, সেই পেতলের ঝাঁজ বাজায় বলাই।

বলাই আর অবিনাশ এলেই বক্সী-ব্যাঙ-পাটির পুরো দল হাজির হয়।

“কটা বাজল গোরদা”—সাতকড়ি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে স্টিজেস করল।

গৌরহরি পকেট থেকে তার বাপের আমলের রূপোর চেন-বাঁধা ঘড়িটা বার করে বলল—“চারটে বেজে পাঁচ। এবার উঠতে হয় বকসীদা’।”

হরিপদ চায়ের কাপ খালি করে বললো—“বলাই আর ওবিনাশ এলো না এখনো।”

“বলাই বোধহয় আসতে পারবে না।” খবরটা দিল অক্ষয়।

“এই সেরেছে, ছোঁড়াকে নিয়ে আর পারা গেল না। তাহলে কত্তাল বাজাবে কে ? রমাকান্তকে ডাক, ও রাধিমা’ তোর দাদাকে ডেকে দেতো।”

বকসী-ব্যাঙ-পাটির একটা বাঁধা কাজ আছে। রোজ সন্ধ্যাবেলা দীপালী-ছায়া-মন্দিরের সামনে হাজিরা দিতে হয়। দীপালী-ছায়া-মন্দির সিনেমা হল।

বেলা দশটার সময় একটা খার্ড-ক্লাশ ঘোড়ার গাড়ী চেপে বক্সী-ব্যাঙ-পাটি শহরের বড় বড় কয়েকটা রাস্তা ঘুরে বেড়ায়। সিনেমার ছাপানো ছাণ্ডবিল বিলি করে। তারপর সন্ধ্যা ছ’টা আর রাত্রি ন’টার শো শুরু হবার আগে মিনিট দশেক ধরে হলের সামনে ব্যাঙ বাজে। সপ্তাহে দু’দিন—শনি আর রবিবার ম্যাটিনী শো বেলা তিনটের সময়। সে সময় বাজাবার ক্ষেত্রে কিছু উপরি-পাওনাও আছে। সবশুদ্ধ মাসের শেষে গোটা পঞ্চাশেক টাকা বক্সী-ব্যাঙ-পাটির বাঁধা রোজগার। ভালো লাগে না হরিপদের এসব ছ্যাচ্ছা কাজ। রোজ সেই একঘেয়ে সস্তা হিন্দীগানের সুর বাজাতে হয়। গর্জন সাহেবের কাছে এত কষ্ট করে এত যত্নে বাজনা শিখল কি এই কাজ করার ক্ষেত্রে। সাহেবের প্রিয় গান সেই গভীর সুরের খাঁটি বিলিতি বাজনা কেউ শুনতে চায় না। ফরমায়েস করে অমুক ছবির অমুক গানটা বাজাও তো। বড় খারাপ লাগে, হুস্তোর ছাই বলে সব ছেঁড়েছুড়ে চলে আসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পেটের জালা বড় জালা।

রমাকান্ত এলো। বড় বড় চুল, নুজির মতো করে কাপড় পরা, গায়ে গেঞ্জী।

“ডাকছিলে জ্যাঠামণি।”

“হ্যাঁ বাবা ! আজ আবার বলাই আসেনি, জানোই তো ছেলেটা পেটরোগা, প্রায়ই এমনি কানাই করে । তোমাকে আজ ঝাঁজ বাজাতে হবে ।”

প্রথমটা রাজী হয়নি রমাকান্ত, এসব কাজ তার বাতে পোষায় না, নেহাৎ জ্যাঠামণি ধরে পড়ায় ব্যাজার মুখে রাজী হল । মাঝে মাঝে এক-আধদিন এ-রকম কালতু কাজ করে দিতে হয় ।

মাথায় লাল শালুর পাগড়ী, গায়ে আধময়লা টিউনিক, ঘননীল প্যাণ্ট, হুঁপাশে কোমর থেকে পায়ের গোড়ালী ছুঁয়ে একটা রূপোলী ডোরা । জুতোর ব্যাপারে মিল নেই, যার যেরকম ।

গৌরহরির পাম্প-সু । হরিপদর লাল রঙের ক্যান্ডিসের জুতো, রমাকান্তর কাবুলি, অক্ষয়ের ছেঁড়া স্কাউল আর হুঁজনের খালি পা । জানা কাপড়ও যে সকলের গায়ে ঠিক মাপে মিলেছে তা'নয় । সেজেগুজে বক্সী ব্যাঙপাটি বাজাতে চান্দ্রো । বিকেল তখন পাঁচটা ।

কয়েকটা দিন পরেই কাশীপুরের লোক এলো বায়না পস্তরের কথা বলতে । চৌধুরীদের মেয়ের বিয়ে, জাঁকজমক মন্দ হবে না ।

হরিপদ তেমনি উদাস মুখে ফুসফুস করে বিড়ি ফুঁকল । ঝড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটল । কাশীপুরের লোক হুজুন ছেঁড়া শতরঞ্জির পাশে একটা মাদুরের উপর বসে ছিল । গৌরহরি একপাশে বসে মধ্যস্থ মাদুরের মত একটা ছোটো কথার গিঁট দিয়ে দর টানাটানির দড়িটা কখনো একটু শক্ত কখনো একটু আলগা করে দিল । শেষ অবধি রফা হল তিরিশ টাকায় । যাতায়াত ভাড়া পাঁচটাকা তার ওপর ভুরিভোজন । বাজাতে হবে বিয়ের রাত্তিরে, খালের ঘাট থেকে যখন বর উঠবে । আর পরের দিন বাসি বিয়ের সময় খানিকটা বাজিয়ে ছপুরের খাওয়া সেরে চলে আসবে বক্সী-ব্যাঙ-পাটি । তিরিশ টাকায় ওর বেশি সময় খাকা যায় না । নেহাৎ চৌধুরীরা লোক পাঠিয়েছে, না-হলে এই মাটি ফাটা রোদ্দুর, চাদিকে যে-রকম অস্বস্তি বিস্ময় লেগেছে, তারপর ঝড় ঝুট্ট হতে কতক্ষণ । কিন্তু চটে গেলেন দীপালী-ছায়া-মন্দিরের ম্যানেজার সহদেব সিমলাই—“এই তোমার বিয়ের বায়না শুরু হল । এখন কয়েকমাস এই চলবে । শহরের মধ্যে হুঁ এক জায়গায় বাজাতে যাও, আপত্তি করি না । কিন্তু কোথায় সেই কাশীপুর—পাঁচমাইল দূরে । আমার কতি হয় ওতে—”

হরিপদ জবাব দিল—“তা আমি কি করব, আপনি যা মাইনে দেন তাতে তো আর পেট ভরে না । বাইরের কাজ আশায় নিতেই হবে ।”

—“ওর বেশি মাইনে দেবার কমতা নেই আমার । তোমার যদি না পোষায় তো আমি .কি করতে পারি । কিন্তু তুমি যদি না আস, তাহলে মাইনে কাটব আমি, হুঁদিনের মাইনে কাটব । হ্যাঁ পটাপট বলে রাখাই ভাল ।” সহদেব সিমলাই রাগে গরগর করতে লাগলেন ।

হরিপদ একটু চমকাল । প্রতিবছরই এই নিয়ে ষিট্ মিট্ হয় । শহরের মধ্যে কোথাও বায়না হলে অবিশিষ্ট ম্যানেজারবাবু আপত্তি করেন না । কাছেপিঠে কোথাও বিয়ে হলে, সন্ধ্যা বেলা সিনেমা হলের সামনে হুঁচার মিনিট বাজিয়ে বর ওঠানোর সময়

ঠিক হাজির হওয়া যায়। তারপর পৌনে নটার সময় গৌরহরিকে বিয়ে বাড়ি রেখে বলাই আর সাতকড়িকে নিয়ে এসে কিছুক্ষণের জন্যে বাজিয়ে গেছে। অনেকবারই এরকম করে দু'দিকের হাজিরা বজায় রেখেছে হরিপদ। কোনোদিক থেকেই আপত্তি ওঠেনি। ছোট জায়গা, ছোট শহরের সবেধন নীলমণি বক্সী ব্যাও পার্টির ব্যাও মাষ্টারের সুবিধে মতই কাজ চলেছে। কেউ কিছু মনে করেনি, মনে করার কথাও ওঠেনি। কিন্তু শহরের বাইরে দূরে কোথাও গেলে দীপালী-ছায়া-মন্দিরের ক্ষতি হয়। ম্যানেজারবাবু যদিও অনেকবার গজ্গজ্জ করেছেন কিন্তু মাইনেকাটার কথা এই প্রথম। প্রথমটা একটু চমকে গেলেও হরিপদ খুব অবাক হল না। সিনেমা ভালই চলছে। দিনদিন উন্নতি হচ্ছে। ম্যানেজারও তাই মেজাজ দেখাচ্ছে। কিন্তু বক্সী ব্যাও পার্টির মালিক কারো তোয়াক্কা রাখে না।

একটু কড়া সুরেই জবাব দিল—“বেশ কাটুন আপনি মাইনে, আমি আসব না দু'দিন।”

কিন্তু ব্যাপারটা যে কতদূর গড়াতে পারে, হরিপদ ঠিক আন্দাজ করতে পারেনি।

পরেরদিন ওরা কান্দিপুর থেকে ফিরল নোকায়। দলের মধ্যে শুধু গৌরহরি সাইকেল চালিয়ে আগে চলে এসেছে। ক্লারিওনেট বাঁশীটার বাক্স পেছনের কেব্রিয়ারে বেঁধে নিয়েছিল। বাকি সবাই অন্য বাজনাগুলো নিয়ে কোট-প্যান্ট পোশাক-পাগড়ী টিনের ভোরঙ্গ ছটোতে তুলে ধীরেস্থানে একটা বড় নোকো ভাড়া করে এসেছে। নতুন বাজারের ঘাটে যখন নোকো পৌঁছল, তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। সারি সারি দোকানে একটা ছটো সন্ধ্যার বাতি জ্বলে উঠেছে।

হরিপদ নোকো থেকে নামতে-না-নামতেই গৌরহরি এসে খবর দিল—“বক্সীদা ওদিকের কাণ্ড শুনেছো। সিমলাইবাবু তোমাকে জবাব দিয়েছেন। দীপালী-ছায়া মন্দিরে নতুন লোক আসবে। যদিও লোক না আসে, ব্যাও-পার্টি ছাড়াই কাজ চলবে।”

হরিপদ এতটা আশংকা করেনি। বলতে গেলে এরকমটা ভাবেইনি সে। ম্যানেজারবাবু ওরকম খিটমিট তো অনেকবারই করেছেন। মাইনে কাটবেন বলেছেন। কিন্তু একেবারে জবাব দিয়ে দেয়া—

বাড়ি ফিরতে রাধাও ওই কথা বলল—“জ্যাঠামণি তোমার নাকি কাজ গেছে।”

—“একটু দম নিতে দে'মা।”—হরিপদ জামা খুলতে খুলতে জবাব দিল—“এই তো সব ঘরে পা দিলাম।” একটু দম ফেলে হাত-পাখার হাওয়া খেতে খেতে বলল—“ওঃ ভারী বয়ে গেছে আমার, ওসব বাঁধা মাইনের গোলামী গেছে না হাঁক ঝেঁড়ে বেঁচেছি।”

সন্ধ্যা উৎরে গেছে। বকুলগাছের পাতার কঁকে কঁকে কয়েকটা তারা। খানিকবাদে রমাকান্ত এলো। হরিপদ তখন হাতমুখ ধুয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে চায়ের আশায় বসে ছিল। জ্যাঠামণির গভীর মুখ দেখে রমাকান্ত তাকে সোজাসুজি কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেল না। পাশের ঘরে গিয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে রাধাকে ডেকে — বলল—“দেখলি রাধা, কি কাণ্ড হল। আসছে মাস থেকে আমার গেট

কিপারের কাজ হবে, সিমলাইবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা সব ঠিক হয়েছিল। এখন জ্যাঠামণি ছুঁম করে কাজ ছেড়ে দিল, চাকরী হবার তো আশাই নেই। আগে যে মাঝে মাঝে বিনেপয়সায় সিনেমা দেখতুম—তাও বন্ধ।”

রাধা মিনমিন করে কি জবাব দিল এতদূর থেকে হরিপদ ঠিক শুনতে পেল না। ও-ঘর থেকে বেরিয়ে রমাকান্ত তার পাশ দিয়েই ভেতরে গিয়ে ডাকল—“জেঠিমা কি করছ?”

হরিপদের বউ নিতান্ত নিরীহ ধাতের মানুষ। বাইরের লোকেরা তাকে চোখে দেখা দূরে থাকুক উঁচুগলার কথাও শোনেনি কখনো। কোনোসময় বাড়ি না থাকলে কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাইরের লোকের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্‌ করে কিছু বলে। রাধা সামনে দাঁড়িয়ে জেঠিমার জবাবিতে আলাপ করে।

তার কাছে বিশেষ সুবিধে হবে না জেনেও রমাকান্ত কিছুক্ষণ গুজুগুজু করে চলে গেল। বেশ জোরে জোরেই পা ফেলে জ্যাঠামণির পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। খানিকবাদে রাধা চা নিয়ে এল। অন্ধকার দাওয়ার ছেঁড়া শতরঞ্চি বিছিয়ে হরিপদ বসে ছিল। অন্তর্দিন এ-সময়টা দীপালী-ছায়া-মন্দিরের আলো ভিড় গান গোলমালের মধ্যে কাটে। হরিপদ চ'য়ের কাপটা তুলে নিয়ে একটু হেসে বলল—“তোরা দাদা বুঝি মেজাজ দেখিয়ে গেল।”

রাধাও একটু হাসল—“দাদার কথা ছেড়ে দাও, ওর নাকি কাজ হবার কথা ছিল—” হরিপদ কথাটা কেড়ে নিয়ে বলল—“হ্যাঁ কাজ হবার কথা ছিল না আরো কিছু। ম্যানেজারবাবু একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন বটে। ছরছর, ও চাকরী করে কি হবে। আমি কতদিন ওকে বলেছি বাজনাটা শেখ। আমার সঙ্গে থেকে কাজকন্সো শিখে নে, এই ব্যাও-পার্টি তুইই চালাবি। আমি আর কদিন। তোরা ছাড়া আমার কেইবা আছে বল। তোরা কুমুদির ছেলেরা কি আর এই কাজ করতে আসবে। তাদের কত জমি-জায়গা। তা ওকি আমার কথা কানে তোলে, না গেরাছি করে। কত কষ্ট করে বাজনা শিখেছি। এসব কাকে দিয়ে যাব।”

গর্জন সাহেবের কাছে শেখা সেই বিলিতি সুর। আহা! অমন বাজনা কেউ শুনতে চায় না, বোঝেও না ছাই কিছু, আজকালকার ছেলেরা যা হয়েছে। সব সস্তা হিন্দী সুর শোনার জন্যে পাগল।”

—“তোমার সেই বিলিতি গানটা একটু শোনাও না, জ্যাঠামণি।”

—“আচ্ছা শোনার তোকে, কেউতো শুনতে চায় না, তুইই শুধু মাঝেমাঝে বলিস।”—জ্যাঠামণি একটু স্নেহের হাসি হাসল।

—“কদিন তো বলেছ, আজই শোনাও না।”—রাধার আবদার শুনে ~~এই~~ ভেবে আবার বলল—“আচ্ছা, বাজনাটা নামিয়ে আন ওই তাকের উপর আছে।”

রাধা কাঠের বাক্সটা নামিয়ে আনল। ক্লকডায় জড়ানো বীণাটা বার করে অনেক যত্নে ধুলো ঝাড়ল। ঘরের ভেতর লঠন জ্বলছে—বাইরে বিষণ্ণ হালুদ আলো। আকাশে কুমুদপক্ষের অন্ধকার। কর্ণেট তুলে হরিপদ ঠোঁটে ঠেকাল। অনেকদিন বাজানো হয় না, গর্জন সাহেবের সেই প্রিয় সুর।

চোখ বুজে যেন ভাবার চেষ্টা করল—গর্ভন সাহেবের সেই চেহারা, গ্রেট ইষ্টার্ন সার্কাসের সেই রাত্রি। ব্যাণ্ড-পার্টির সামনে দাঁড়িয়ে সাহেব যেন হাত নেড়ে নেড়ে তাল দিচ্ছেন। তাঁর ঘামে-ভেজা লালমুখ যেন আরো লাল হয়েছে, ঝাঁকড়া ভুরুর নিচে কটা চোখের দৃষ্টি যেন আরো তীব্র হয়েছে।

এমনসময় নিশিকান্ত এলো। সারাদিনের পরিশ্রম-ক্রান্ত। দুইহাতে নানান সওদা।

—“এইগুলো ধরতো রাধা।”—নিশিকান্ত দাওয়ায় উঠে বলল—“বাক্সাছিলে নাকি হরিদা।”

—“এই এমনি একটু দেখছিলাম।” হরিপদ কর্ণেট নামাল, রাধার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল—“আজ থাক রাধিমা’, আর একদিন শোনাব, কেমন।” বাপের হাত থেকে জিনিসগুলো নিতে নিতে রাধা সহজেই সায় দিল। বাবা অনেক জিনিস এনেছে। বেশ বড় একটা ইলিশ মাছ।

—“ও বাবা! আমও এনেছ দেখি।”—এক ঝলক খুশির হাসি ছড়িয়ে রাধা ভেতরে চলে গেল। নিশিকান্ত তার পেছন পেছন যেতে যেতে বললো—“আমি আসছি হরিদা’, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।”

কি কথা বলবে নিশিকান্ত। হয়তো এসে ধীরে স্নেহে বসবে, একটা বিড়ি ধরাবে তারপর ইনিয়ে-বিনিয়ে নানান ভনিতা করে বলবে, কাজ ছেড়ে ভালো করোনি।

একটা ছোটো নয়, পাঁচ দশকে পঞ্চাশটা টাকা। মাস গেলে কোথায় পাবে। যাও, ম্যানেজারবাবুকে গিয়ে ধরো, ভালো করে বুঝিয়ে বলো। যা হবার হয়ে গেছে। একটা অন্তায় না-হয় করেই ফেলেছ, এখন—

কিন্তু তা’ সে পারবে না। হরিপদ বক্সী কাউকে খোশামোদ করার ধার ধারে না। খোশামোদ করেছিল গর্ভন সাহেবকে, করেছিল গ্রেট ইষ্টার্ন সার্কাসের ম্যানেজার প্যাটেল সাহেবকে। সে-সব দিনও নেই, সেরকম মানুষও নেই। কোথায় প্যাটেল-সাহেব আর কোথায় সহদেব সিমলাই। ছুর ছুর। বাজনাটা বাক্সে বন্ধ করে হরিপদ আবার দেয়াল ঠেস দিয়ে বসে রইল। অন্ধকার কক্ষপঙ্কের আকাশ। বকুলগাছের পাতার কঁাকে কঁাকে কয়েকটা তারার আলো।

সিনেমার কাজ গেলেও বক্সী-ব্যাণ্ড-পার্টি কিন্তু বেকার বসে রইল না। আবার একটা বিয়ের বায়না নিয়ে গেল রহমৎপুর।

ফিরল দু’দিন পরে। উৎসাহী রমাকান্তর মুখে খবর পেল হরিপদ। দীপালী-ছাত্র-মন্দির নতুন লোক এনেছে। অল্পবয়স। নাম সুধন্ত পাল।

“প্রাণ লোক, জ্যাঠামণি। যেমন চেহারা, তেমনি কথাবার্তা। আমার সঙ্গে খুব ভাব জমে গেছে।”—রমাকান্ত খুশিতে ডগমগ।

হরিপদ ভালমন্দ কিছু বললো না, শুধু জিজ্ঞেস করল—“দেশ কোথায়?”

“ঘশোরে ওর কাকার কাছে থাকত, বাপ-মা কেউ নেই।”

পরের দিন। বেলা দশটার সময় ইয়াসিন মিঞার খার্ড-ক্রাশ ঘোড়ার-গাড়ী থেকে

শহরের রাস্তায় ছাণ্ডবিল বিলি হচ্ছিল, হরিপদ বুড়ো বকুলগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে শুনতে পেল নতুন ছেলেটি ঘোড়ার গাড়ীর ভেতরে বসে কর্ণেট বাজাচ্ছে। আর গাড়ীর ওপর ইয়াসিন মিক্রার পেছনে বসে একটি কালোমত ছেলে একটিমাত্র কেটল-ড্রামের গায়ে লাঠি ঠুকছে। গাড়ীটা চলে যাবার পরই সাতকড়ি আর বলাইর সঙ্গে রমাকান্তর হাত-হাতির অবস্থা। অক্ষয় নাঝে পড়ে থানিয়ে দিল। কিন্তু রমাকান্ত তখনো ফুঁসছে—
“ওরা আমার বন্ধুকে টিটকিরি দেবে কেন।”

বলাই আর সাতকড়ি নাকি হাততালি দিয়ে হেসেছিল। রমাকান্ত গজগজ করতে করতে চলে গেল। একটু দূরে যেতেই অক্ষয় মুচকি হেসে বললো—“ওকে কি আর কর্ণেট বাজানো বলে, ওতো ভেঁপু বাজাচ্ছিল। ছোটছেলেরা নারকেল পাতার ভেঁপু বাজায় দেখিসনি।” সাতকড়ি আর বলাই হো হো করে হাসল। উঠোনের দড়িতে কাপড় শুকুতে দিতে এসে রাধাও মুখে আঁচল দিয়ে হাসল। হাসল না হরিপদ। বকুলগাছের ছায়ায় কেমন খমখমে মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

হুপুরবেলা রাধা ঠাটার সুরে বলেছিল—“দাদা তোর বন্ধু নাকি ভেঁপু বাজায়, ও নাকি বাজাতেই জানে না, এমন বন্ধু জোটালি কোথেকে।”

রমাকান্ত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজাচুলে চিরুণী দিচ্ছিল। রাধার হাসি-হাসি মুখের ওপর চিরুণীটাই ছুঁড়ে মারলো। তারপর তুমুল কাণ্ড।

রাধা কাঁদোকাঁদো মুখ করে এঘরে এসে বললো—“দেখলে জ্যাঠামণি, আমার মুখে অভাবড় চিরুণীটা নে রেছে, যদি চোখে লাগত।”

“আমার বন্ধুকে বলবি কেন?”—রমাকান্ত দরজার কাছে এসে কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই চলে গেল।

রাধা চেষ্টা করে জবাব দিল—“একশ’বার বলব, হাজার বার বলব—আমুক বাবা বাড়িতে মজা টের পাবে’খন।”

হরিপদের হুপুরের ভাতঘুমটা ছুটে গেল। শুয়ে শুয়েই জিজ্ঞেস করল—“তোর বাবা কোথায় গেছে রে রাধিমা? কাল থেকে দেখছি না।”

“বাবা তো পিরোজপুর গেছে কাল বিকেলে।”—রাধার সুর একটু নরম হল একটু যেন লজ্জার আভাস।

হরিপদ অতটা বুঝল না, আবার জিজ্ঞেস করল—“হঠাৎ পিরোজপুরে কি কাজ?”

“জানিনা তো।”—রাধা অগ্নদিকে মুখ ফিরিয়ে কোনোরকমে জবাব দিয়ে চলে গেল।

জানা গেল পরেরদিন। নিশিকান্ত ফিরল হুপুরে। ভাত খাওয়ার পর হরিপদের ঘরে এসে ব্রিডি ধরিয়ে বসল।

“হল না কিছু হরিদা, যে জন্তো গিয়েছিলাম পিরোজপুর। শুধু যাতায়াতের পরস্যা কটাই দণ্ড।”

হরিপদ জমাখরঁচের খাতায় কি একটা হিসেব দেখছিল। চোখ না-তুলেই জিজ্ঞেস করল—“কি জন্তো গিয়েছিলে?”

“রাধার একটা সমল এসেছিল। ছেলেটি মন্দ নয়, কিন্তু ব্যাটারদের যা খাঁই।”

নিশিকান্তর জবাব শুনে হরিপদ এবার মুখ তুলল—“তুমি যে একেবারে খেপে গেলে দেখছি।”

“খেপব না বলো কি। মেয়ের বয়স পনেরো ছেড়ে ষোল হতে চললো।”

মাঝে মাঝে হাঁস হয় নিশিকান্তর। ব্যবসা-পত্তর নিয়ে মত্ত থাকে মানুষটা। মাঝে মাঝে রাধার-মা তাদা দিলে কয়েকটা দিন খুব উঠে পড়ে লাগে। তারপর আবার গা চিলে দেয়। অল্প কাজ নিয়ে মাতে।

দেনা-পাওনা, মেয়ের রূপওণ আর ছেলের বাড়িঘর—এই তিনটি জিনিসকে কিছুতেই মেলাতে পারছে না নিশিকান্ত। তিন-তিনটে মেয়ে পার করে এখন এই ছোটমেয়ের বেলায় কিছুতেই পছন্দসই পাত্তর জুটছে না।

হরিপদ বিষয় হেসে বলল—“রাধিমা চলে যাবে। ভাবতেও খারাপ লাগে, কিন্তু মেয়ে হয়ে জন্মেছে যখন—”

নিশিকান্ত বাইরের দিকে চোখ রেখে জবাব দিল—“আমিও তো তাই ভাবছি, তিনটে মেয়েকে দূরে দূরে বিয়ে দিয়েছি, এবার এমন একটি ছেলে খুঁজছি যে আমার কাছে থাকবে, আমার ব্যবসা-পত্তর দেখবে। নিজের ছেলে তো আর মানুষ হল না, এখন যদি একটি ভাল বুদ্ধিমান ছেলে পাই, রাধার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমার কাছেই রেখে দেব।”

“ওতো ঘর-জামাই থাকা”—হরিপদ বললো—“আজকালকার ছেলেরা কি ঘরজামাই হয়ে থাকতে চাইবে।”

“খুঁজছি তো যদি পাই সেরকম একটি ছেলে, তুমিও একটু খোঁজ খবরে থেকে। হরিদা।”

“সে আর তোমায় বলতে হবে না, রাধিমার জন্মে—”

— “তা’ কি আর আমি জানি না”—নিশিকান্ত হাসতে হাসতে বললো—“রাধার-মা বলে আগের জন্মে ও নাকি তোমার নিজের মেয়ে ছিল।”

“ভুল বলেছে, মেয়ে নয় মা, আগের জন্মে নয়, এই জন্মেই আমার মা ছিল। মনে নেই, মাঘমাসে আমার মা মারা গেল, পরের অজ্ঞানেই রাধিমা জন্মাল।’ আমার মা-ই আবার ফিরে এসেছে, ছেলেকে ফেলে বেশিদূর যেতে পারেনি।” হরিপদ কেমন গভীর তৃপ্তি আর বিশ্বাসের চোখে অন্ততভাবে হাসতে লাগল।

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ গেল। ভাদ্রের প্রথমে শহর জুড়ে মহা হৈটচ। গণ্যমান্য এক দেশনেতা আসবেন। এই ছোট শহর নয়, বাংলা দেশ নয়—সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তাঁর নাম। শহরের বড়বড় রাস্তায় তোরণ তৈরী হল। উদ্ভোক্তারা লোক পাঠালেন হরিপদের কাছে। মত্ত মিছিল করে নিয়ে আসা হবে স্টেশন থেকে। আগে আগে বক্সী-ব্যাও-পাঁট ব্যাও বাজিয়ে আসবে। ভাদ্রমাসটা তো প্রায় বসে বসেই কাটে। একটা নতুন ধরনের বায়না পেয়ে হরিপদ উৎসাহে উত্তেজনা চঞ্চল হয়ে উঠল।

“বুঝলে অক্ষয় বাজনাগুলো নেজে-ষসে একটু চক্চকে করে রাখো, গৌরহরিকে খবর দাও, ঐদিন যেন আবার কোথাও না যায়।” তারপর রাধাকে ডেকে বললো—“রাধিমা আমাদের পোশাক-টোশাকগুলো ধুয়ে-মুছে ইঙ্গি করতে হবে। ইঙ্গি করার

কাজটা না-হয় বলাই করবে, তুই শুধু আলতো সাবান দিয়ে ধুয়ে দিবি। ছেঁড়া জায়গাগুলো দেখে-টেখে একটু-আধটু সেলাই করে রাখবি। আর শোন কিছু পুরনো তেঁতুল এনে অক্ষয়দাকে দিবি। পেতলের বাজনা, একটু তেঁতুল লাগালে বেশ চকচকে হবে।”

রাধা খুব খুশি। শুধু রাধা নয়, সমস্ত শহরই খুশি। সাইকেল-রিক্সা চেপে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বাঁড়ুয্যোবাবু এলেন। হরিপদ ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এল। রাস্তার পাশের কারখানা-ঘর থেকে নিশিকান্ত ছুটে এল।

বাঁড়ুয্যোবাবু বললেন—“ওহে ব্যাঙ-মাস্টার। ভালভাবে বাজাতে হবে কিন্তু, টাকা যা চাও দেব। তবে একটা কথা, ওসব সিনেমার গান-টান চলবে না।”

না বাবু ভাল ভাল বিলিতি গান আমার জানা আছে।

“উঁহ বিলিতি গানও চলবে না। স্বদেশী গান বাজাতে হবে, রবিঠাকুরের জন-গণ-মন-অধিনায়ক বাজাতে পারবে?”

“আজ্ঞে খুব পারব, পারব না কেন।”—হরিপদ মনের ভাব মনেই চেপে রাখল।

বাঁড়ুয্যোবাবু আরও কিছু আদেশ উপদেশ দিয়ে বিদায় নিলেন।

সত্যিই দিনকাল যেন বদলে যাচ্ছে। বিলিতি গান শোনার মানুষ আর নেই। একদিকে হিন্দীসুরের আসর আর একদিকে স্বদেশী গানের আদর। খাঁটি বিলিতি সুর শুনবে কে? স্বদেশী গান মন্দ নয়, ছোটবেলা মুকুন্দদাসের যাত্রার দলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অনেক স্বদেশী গান শুনেছে, নিজেরও গেয়েছে। কিন্তু সেই সাদা-মাটা স্বদেশী সুর কি কর্ণেট-ক্লারিওনেটের জন্তে। বিলিতি বাজনায় ওসব সুর কেমন যেন খাপছাড়া মনে হয়।

উষেগ-উৎসাহের কয়েকটা দিন পরে সেই দিন এলো। কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়েছে রাস্তার দুইপাশে। জমিদার নন্দীবাবুদের একজোড়া শাদা ঘোড়ায় টানা খোলা ফিটনে অতিথি এলেন। আগে আগে লাল শালুর পাগড়ী আর লাল টিউনিক পরা বক্সী-ব্যাঙ-পার্টী। অনেকদিন পরে হাজার হাজার উৎসুক চোখের সামনে কর্ণেট বাজালো হরিপদ বক্সী। সেই গ্রেট ইষ্টার্ন সার্কাসের দিনগুলি ছেড়ে চলে আসার পর এত মানুষ, এত ভিড়, এত আগ্রহ-আকাংখার মুখ আর দেখেনি।

বিকেলে সম্বর্ধনা সভা। শহরের সদর রাস্তার পাশে দীপালী-ছায়া-মন্দির। সেখানেই সভা। হাজার হাজার লোক হলের ভেতরে, বাইরে।

রাস্তায় চলাচল বন্ধ। হরিপদ যায়নি। বিকেলে ব্যাঙ বাজাবার বায়না নেই। গোরহরি এসে খবর দিল—“বক্সীদা মিটিঙ্ হলনা।”

• “কেন রে”—হরিপদের চোখেমুখে উষেগ।

“হবে কি করে। যা ভিড়। ওইটুকু সিনেমা হলে অত লোক ধরে নাকি। হল ভর্তি হয়ে রাস্তায় লোক ধৈধৈ। যাকে বলে জন-সমুদ্র, খালি গলায় চেঁচিয়ে কখনো এত লোকের সভা করা যায়। কেউ কারো কথা শুনছে না, হৈহৈ, গোলমাল। ভেতরের লোক বাইরে আসতে চায়, বাইরের লোক ভেতরে যেতে চায়—মহাগুণ্ডগোল।

সিমলাই মশাই, বাঁড়ুয্যেবাবু সকলে হাত জোড় করে ছুটোছুটি করলেন, গোলমাল থামাতে বললেন—কার কথা কে শোনে ! শেষ অক্ষি মিটিঙ্ হল না ।”

রাধাও গিয়েছিল সেজেগুজে, দাদার সঙ্গে । ফিরে এলো হাস্তে হাস্তেই, পানের রসে ঠোঁট লাল—“দেখলে না জ্যাঠামনি, কি ভিড়, কি ভিড় !”

হরিপদ হাসল—“তুই চুকতে পেরেছিলি ।”

“হ্যাঁ দাদার সেই বন্ধু, ঐ যে ভেঁপু বাজায়”—রাধা আবার একটু হাসল, চোখমুখ ঘুরিয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলল—“সে-ই তো কোনোরকমে ঠেলেঠেলে আমাদের জায়গায় দিয়ে এল । বেচারী ঘেনে-টেমে অস্থির, যা ভিড়, গরম, গোলমাল, বাব্বা !”

“তা’হলে ছেলেটা তোর জন্যে যথেষ্ট করেছে বল ।”—হরিপদ ঠোঁট টিপে হাসল ।

“যাও, তুমি যেন কি জ্যাঠামনি”—রাধা হুহু ধমক দিয়ে ডুক কুচকে তাকালো ।

গৌহরি হো হো করে হাসল—“তা করবে না । আমাদের রাধাকে খাতির করে সুধু পাল ধন্য হয়ে গেছে ।”

রাধা তার দিকে চোখ পাকিয়ে কি একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ হেসে ফেলল—“তোমাদের সেই ম্যানেজারবাবুকে দেখলান, দাদা দেখিয়ে দিল, কালো, মোটা, মাথায় টাক, চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে গলা ভেঙে গেছে, চারধারে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে । বেচারীর যা অবস্থা ।”

সত্যিই, সহদেব সিমলাইর খুব করুণ অবস্থা । এত চোঁচিয়ে হাত-পা নেড়ে অস্বরোধ-উপরোধ করেও মানুষগুলোকে কথা শোনানো গেল না । সব পরিশ্রম পণ্ড । সম্মানিত অতিথি বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন । বাঁড়ুয্যেবাবু কপাল চাপড়াচ্ছেন রাগে, হুঃখের কঁদে ফেলার মত অবস্থা । এত হুঃখের মধ্যেও ম্যানেজারবাবুর মাথায় একটা নতুন ভাবনা এলো, একটা নতুন সত্য তিনি যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেলেন । শহরের অবস্থা আর আগের মত নেই । মানুষ বাড়ছে, দোকানপাট গাড়ী-ষোড়া সব বাড়তির পথে । এক-একটা সভায় হাজার হাজার লোক জনে । পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরুর জন্মদিনের সভায়ও দেখেছেন, খালি গলায় গান গেয়ে আনন্দিত করে সকলকে শোনানো যায় না । নেহাৎ একটা পুণ্যদিন বলে শ্রোতার যতটা সম্ভব ধৈর্য ধরে চুপ করে থাকে । কিন্তু নতুন কোনো নার্সিসাদা নেতা এলে সকলেই তাকে একটুবার চোখে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে । তাই বাইরের লোক ভেতরে যেতে চায় ভেতরের লোক গরমে ঘেনে বাইরে আসতে চায় । তার ফলে যা হবার তাই হল । ভাবতে ভাবতে একটা নতুন বুদ্ধি খেলে গেল । মাইক্রোফোন আনতে হবে । কলকাতায় বড় বড় সভায় মাইক্রোফোনে গান আনন্দিত, বক্তৃতা হয় । এই ছোট শহরে এখনো সে জিনিস আসেনি । সহদেব সিমলাই আনবেন । কথা বলা ছবির জন্যে ছোট একটা এম্পলিফায়ার আছে অবিশিষ্ট, কিন্তু সেটাও মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায় । ছবির পর্দায় নায়ক-নায়িকা ঠোঁট নাড়ে, হাত-পা নাড়ে, কথা নেই । দর্শকরা হৈহৈ করে । ছবি বন্ধ করে আলো জলে ওঠে, খানিকবাদে আবার শুরু হয় । দীপালী-ছায়া-মন্দিরের ওসব গা-সওয়া হয়ে গেছে ।

এ-রকম করে ভাদ্র মাসটাও কেটে গেল। এবার আশ্বিনের মাঝামাঝি পুজো। পুজোর কটাদিন জমিদার নন্দীবাবুদের বাড়ি বক্সী-ব্যাও-পার্টির বাঁধা কাজ। পাঁচদিনে একশোটাকা। তার উপর দু'বেলা লুচি-পোলাও-মাংস, একখানা করে নতুন খুতী। মহাধুমধাম হয়। পুজোর পাঁচদিন—ষষ্ঠি থেকে দশমী হরিপদ দলের সবাইকে নিয়ে ওখানেই থাকে। দশবছরের পুরনো নিয়ম।

বিজয়া দশমীর পরের দিন বাড়ি এলো হরিপদ। রাধা আর রমাকান্ত এসে পায়ের ধুলো নিল। ধান-দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে হরিপদ বললো—“কড়াপাকের সন্দেশ এনেছি না,” নন্দীবাবুদের বাড়ি থেকে দিয়েছে।” ভেতরের দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকল—“কৈ গো রমাকে, রাধিমা'কে সন্দেশ দাও।” ঋণিকবাদে নিশিকান্ত এলো। কোলাকুলির পালা শেষ করে, কড়াপাকের সন্দেশ চিবুতে চিবুতে বলল—“একটা সুখবর আছে বক্সীদা। রাধার একটা সম্মত ঠিক করেছে।”

—“ঠিক করেছেো মানে কি।”—হরিপদ একটু অবাক চোখে তাকালো।

—“ওই কথাবার্তা একরকম হয়েছে। ছেলেটি দেখতে শুনতে ভাল। আমি যেমনটি চাই, ঠিক তেমনি। রাধার মায়েরও খুব পছন্দ।”—নিশিকান্ত জল খেয়ে মুখ মুছে, দাঁত দিয়ে বিড়ি চেপে ধরে কথা বলছিল, পকেট থেকে দিশলাই নিতে নিতে বললো—“দাবি-দাওয়া কিছু নেই, বাপ-মা, ভাইবোন নেই, ঘরের ছেলের মত থাকবে। এ-বাড়িতে না থাকুক কাছাকাছি বাড়ি ভাড়া করে থাকতে পারবে।”—একটু গলা নানিয়ে বললো—“তারপর রাধারও পছন্দ হয়েছে, আজকালকার ছেলেমেয়ে তো।”

নিশিকান্ত একটু রহস্যের হাসি হাসল।

হরিপদের মনে একটা সন্দেহ উঁকিঝুকি দিচ্ছিল, জিজ্ঞেস করল—“ছেলেটির নাম কি? দেশ কোথায়?”

—“ওদের দেশ হ'ল ষশোর, লঙ্কীপাশা। ওর কাকার দোকান আছে লক্ষ্মীপাশার বাজারে, তুমি চিনবে বোধহয়, ছেলেটি বাঁশী বাজায়, ওই দীপালী হলে কাজ করে। নাম সুধনু—সুধনু পাল, ওর কাকার নাম বিহারী পাল।”

একটু সময় গুম মেরে রইল হরিপদ, তারপর মাথা নেড়ে বললো—“না, না, এ হয় না, কি যে বলো নিশিকান্ত। ছেলেটার বাপ-মা নেই, চাল চুলোর ঠিক-ঠিকানা নেই, এমন ছেলের হাতে কি কেউ মেয়ে দেয়। কেন আমাদের মেয়ে কি বানের জলে ভেসে এসেছে।”

নিশিকান্ত একটু যেন ক্ষুণ্ণ হ'ল—“চাল-চুলো নেই বলছ কেন, দেশে বসতবাড়ি আছে, দু'চার বিষে খেনো জমি আছে। ওর কাকা এসেছিল সপ্তমীপুজোর দিন, কথাবার্তা ওনে আমার তো ভালই লাগলো। রাধাকে দেখেও তার পছন্দ হয়েছে। অবিশি কোনো ঘটনা করে মেরে দেখাইনি। আমার সঙ্গে বসে কথা বলছিল। রাধা এসে এককাপ চা দিয়ে গেল ব্যস। ওকে দেখে ভারী খুশি।”

—“তা-হলেও ভেবে দেখতে হবে তো। লক্ষ কথা না হলে বিয়ে হয় না। এত ভাড়াছড়ো কিসের।”

—“তাড়াছড়োর কথা বলছি না। সবদিক ভেবেই বলছি। দাবি-দাওয়া কিছু নেই, ছেলেটি দেখতে শুনতে ভাল, চট্ করে এমন সম্মদ আমি কোথায় পাব।”

হরিপদ তবুও ধুয়ো ধরে আছে—“আরো ছ’চারটে খোঁজখবর নাও। সত্যি কথা বলতে কি, এ সম্মদটা আমার খুব মনে লাগছে না।”

নিশিকান্ত এবার একটু বিরক্তির সুরে বললো “তোমার মনে লাগছে না কেন বুঝলাম না। এদিন তো খোঁজ-খবর নিলাম, আমি একা মানুষ ব্যবসা-পত্তর দেখব না এই করে বেড়াব। তোমাদের তো কদিন বলেছি একটা খোঁজখবর এনে দাও, কেউ কান দাওনি।” একটু যেন রাগ করেই উঠে গেল নিশিকান্ত। ছপুরবেলা কুসুমের-মা ভাতের খালা এগিয়ে দিতে দিতে বললো—“আজ বছরের দিনটায় নিশিঠাকুরপোর সঙ্গে কথা কাটাকাটি না করলেই পারতে।” হরিপদ জবাব দিল—“আমি তো কথা কাটাকাটি কিছু করিনি। শুধু বলেছি এ সম্মদটা আমার ভাল লাগছে না।”

—“তা বলার কি দরকার। ওদের মেয়ে ওরা যদি ভাল মনে করে। আর ছেলেটি তো ভালই শুনেছি, একটি পয়সাও নগদ চায় না। কোনো বাঁই নেই। আর এসব বিয়ে-খা’র ব্যাপারে আমাদের কিছু না বলাই ভাল। খরচ-পত্তর তারাই করবে। ভাল-মন্দ তারাই বুঝবে। অন্য লোকের কথা বলার কি দরকার। হাজার হোক আমরা তো বাইরের লোক।” হরিপদ এবার ব্যাপারটা অশ্রুভাবে ভাবলো। ছপুরে শুয়ে শুয়ে বিড়ি কুঁকতে কুঁকতে ভাবতে লাগল। কুসুমের-মা ঠিক কথাই বললো। নিশিকান্ত তো তার কোনো আত্মীয় নয়। বাড়িওয়াল ভাড়াটের সম্পর্ক। মাসের শেষে ভাড়া নিয়ে রসিদ লিখে দেয়। হরিপদ রসিদ নিতে না-চাইলেও নিশিকান্তই জোর গছিয়ে দেয়। ব্যবসাদার মানুষ, এসব ব্যাপারে তার হিসেব-পত্তর পরিষ্কার। খুব সাবধানী লোক, সব দিক ভেবেচিন্তেই কাজে হাত দেয় সে। এমন লোকের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে উপদেশ দিতে যাওয়া বোকামী ছাড়া কিছু নয়। তবু কেমন যেন লাগে। এতকাল পাশাপাশি কাছাকাছি থেকে একটা আত্মীয়তার আকর্ষণ ঘন্মেছে, বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়েছে। রাধাও জ্যাঠামনিঅন্ত প্রাণ। জ্যাঠামনির স্মৃতি জামা-কাপড় গাড়ু-গামছা, পান-বিড়ি-চা—সব রাধার হাতে হাতে। মেয়েটা বিয়ে হয়ে পরের ঘরে চলে যাবে—ভাবতেও ধরাপ লাগে কিন্তু মেয়েকে কাছাকাছি রাখবে বলেইতো নিশিকান্ত এখানে কথাবার্তা বলেছে। দেখতে গেলে রাধাও এমন কিছু আহাঁ নরি সুল্লরী নয়। স্ত্রীমলা রঙ, স্বাস্থ্য ভাল চোখমুখের চেহারা মন্দ নয়। তারপর নিশিকান্ত একটু কপণ মানুষ। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে অনেক খরচ হয়েছে, এখন এই ছোট মেয়ের বেলায় যেমন-তেমন করে দিতে পারলে দায় মুক্ত। সব দিক দিয়ে ভাবলে, আপত্তি করার কোনো হেতু নেই। কিন্তু কেন যেমন মন খুলে লাগ দৈয়া যাচ্ছে না, কোথায় যেন একটা ক্ষোভ জমা হয়ে আছে।

সারা ছপুর ভেবে ভেবে হরিপদ কিছু ঠিক করতে পারল না। বিকেলবেলা যখন গৌরহরি এলো, তাকেও ওই কথা বললো।

গৌরহরি একটু ভেবে জবাব দিল—“আসল কথা কি জান ছেলেটা এমনিতে ভাল

কিন্তু বড় দেমাক, অহংকার, সেইজন্যই তোমাকে মনে লাগছে না। না'হলে ভেবে দেখ' এ শহরে একমাত্র ব্যাঙ-পাটির মালিক তুমি, প্রবীন লোক, ভাল বাজাও, শহরের সবাই চেনে অথচ ছেলেটা এখানে এসেছে পাঁচমাসের ওপর কিন্তু এর মধ্যে একদিন এসে তোমাকে একটা নমস্কার করা দূরে থাকুক, চোখের দেখাও দেখতে এলো না। ওদিকে শুনি রমাকান্তর সঙ্গে নাকি খুব গলাগলি—একে দেমাক ছাড়া আর কি বলব।'

ঠিক—ঠিক বলেছে গৌরহরি। এতক্ষণে যেন যুক্তি খুঁজে পেল হরিপদ। ছেলেটার বড় দেমাক। অহংকার। রমাকান্তর যেমন উদ্ধত স্বভাব ও ছেলেটাও বোধহয় তেমনি, না-হলে ওদের এমন মিল হবে কেন।

রাধা ছ'কাপ চা নিয়ে এল। হরিপদ বললো—'এই যে রাধিমা! তোর বাবা তোর বিয়ের কথা বলছিল, আমি না-করে দিয়েছি। চালচুলো কিছু নেই এসব ছেলের সঙ্গে—আচ্ছা তোর ইচ্ছেটা কি।' কথার শেষে একটু হাসল হরিপদ। রাধা কিন্তু হাসল না। গম্ভীর মুখেই জবাব দিল—'আমি কি জানি।' চায়ের কাপ নানিয়ে রেখে যেমন এসেছিল, তেমনি বেরিয়ে গেল।

কৈ রাধা তো আগের মত হাসল না। তবে কি ভুল হল। নিশিকান্ত বলেছিল—রাধার নাকি পছন্দ হয়েছে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের কথা। কিছুই বলা যায় না। গৌরহরিও লক্ষ্য করেছে। চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বললো—'এসব ব্যাপারে বাইরের লোকের না-ধাকাই ভাল। কথায় বলে জন্ম-মিত্য-বিয়ে, বিধাতাকে নিয়ে। এসব হচ্ছে গুরুদায়িত্বের ব্যাপার। যার ছেলেমেয়ে ভাল মন্দ সে বুঝবে। গৌরহরি বুদ্ধিমান লোক। ঠিক কথাই বলেছে। রাধিমা মুখভার করে ঘুরবে, হয়তো ভাববে জ্যাঠামণির জন্তেই বিয়ে আটকে রইল। নিশিকান্তকে ডেকে বলে দেয়াই ভাল, তুমি যা ভাল বোঝ, কর। আমার কোনো আপত্তি নেই।

কিন্তু বলি-বলি করেও বলা হল না। কোথায় যেন আটকে রইল। লক্ষ্মীপুছো গেল, কালীপুছো গেল। কালীপুছোয় খুব ধুমধাম হয় শহরে। পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারী পুছো। বনেদী বড়লোকের বাড়িতে প্রতিবছরে পুরনো পুছো। নানা জায়গা থেকে নানা লোক আসে বক্সী-ব্যাঙ-পাটিকে বায়নার টাকা গছাবার জন্তে। হরিপদ অন্তরিক্কে চোখ রেখে কুস্কুস্ করে বিড়ি কৈঁকে, খড়কে দিয়ে দাঁতি বোঁটে আর গৌরহরি মাছ খেলবার মত একটু একটু করে কথার সুতো ছাড়ে। এই কটা দিন কাত্তের ভিড়ে কথা বলার কুরসৎ হল না। কালীপুছোর ছ'দিন পরে নিশিকান্ত নিজেই এলো। 'হরিদা, লক্ষ্মীপাণা থেকে সুধন্তর কাকা বিহারী পাল চিঠি দিয়েছে। বিয়ের দিন ঠিক করতে চায়, সম্ভব হলে অম্মাণের পাঁচ কি ছয় তারিখ। কি জবাব দিই' বলো তো।, মনে মনে খুশি হল হরিপদ। পাকা কথা দেবার আগে তার মত নিতে এসেছে। একটু হেসে বললো—'আমি আর কি বলব, তুমি যা ভাল বোঝ কর। যদি এর মধ্যে যোগাড়-যস্তর করে উঠতে পার, তবে ওই তারিখই লিখে দাও।'

নিশিকান্ত অবাক চোখে তাকাল, এত সহজে ব্যাপারটা নিটে যাবে আশা করেনি সে। 'তাহলে তোমার অমত নেই।'

'তোমরা সকলে যখন ছেলেটিকে ভাল বলছ, আমার আর অমত হবে কেন।'

‘ছেলেটি ভালই, আলাপ করলে তুমিও খুশি হবে।’—নিশিকান্ত উঠতে উঠতে বললো—‘তাহলে ওই কথাই লিখে দি। আর কটা দিনই বা আছে। আমারও এদিকে ওড়িয়ে নিতে হবে তো। কিছুনা-কিছুনা করেও দেখবে এক কাঁড়ি টাকা বেরিয়ে যাবে।’

হরিপদ একটু হাসল। নিশিকান্ত মানুষ মন্দ নয় কিন্তু একটু কিপটে স্বভাব। কাটিক মাসের কটা দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। মোটামুটি ব্যবস্থা সব করে ফেলেছে নিশিকান্ত। রাধার-মার পুরনো কিছু গয়না ভেঙে নতুন করে গড়তে দিয়েছে, দান-সামগ্রীর বাসন-পত্তর কিনেছে। আত্মীয়-স্বজনদের খবর দিয়েছে। ছ’চারজন ইতিমধ্যেই এসে গেছে।

অম্রাণের প্রথম দিন। হেমন্তের সকাল। এ বছর শীত যেন একটু এগিয়ে এসেছে। শেষরাতে কাঁথা টেনে ঘন হয়ে শুতে হয়। ভোরের রোদ্দুরটা ভাল লাগে।

হরিপদ আর গৌরহরি ঘরে বসে কথা বলছিল। অম্রাণের পাঁচ-ছয় পরপর ছুটো বিয়ের দিন।

হরিপদ বলছিল—‘উঁহ, সে হয় না গৌর। পাঁচ তারিখে রাধিমার বিয়ে, ওইদিন আমি কোনো বায়না নেব না।’

গৌরহরি মাথা চুলকে বললো—‘তা তো ঠিকই বক্সীদা, কিন্তু পরের দিনের বায়না যদি আসে। সেদিনও তো বিয়ের তারিখ।’

হরিপদ বাধা দিল—‘সে দিন হবে বাসি বিয়ে, মেয়েটা পরের ঘরে চলে যাবে, মন মেজাজ কেমন থাকবে কে জানে।’

তবুও কি যেন বলতে যাচ্ছিল গৌরহরি। হস্তদস্ত হয়ে নিশিকান্ত ঘরে ঢুকল।

‘সক্কোনাশ হয়েছে হরিদা’—ধপ করে মাহুরের উপর বসে পড়ল—‘সুধম্মর চাকরী গেছে। সহদেববাবু মাইনে-পত্তর মিটিয়ে বিদায় করে দিয়েছেন।’

হরিপদ হতবাক। গৌরহরি জিজ্ঞেস করল—‘কেন কি হয়েছিল?’

‘হবে আর কি, আমার মাথা আর মুণ্ডু’—নিশিকান্ত অস্থিরভাবে বললো—‘সহদেববাবু নতুন কল এনেছেন, ওর নাম কি—মাইক—মাইক—’

গৌরহরি জুড়ে দিল—‘মাইক্রোফোন।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাইক্রোফোন, সিনেমা হলের দোতলায় বারান্দায় মস্ত একটা চোঙার মত বসিয়েছে। ওতে কলের গান বাজবে। অনেকদূর থেকে শোনাবে। আর ব্যাও বাজাতে হবে না। তাই ব্যাও পার্টি ভুলে দিয়েছে। সুধম্ম বলছে, বিয়ে করবে না, সম্ভব হলে মাঘ ফাস্তনে করবে। এখন দেশে ফিরে কাকার সঙ্গে কথা বলে আমাকে চিঠি লিখে জানাবে। এদিকে সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে আছে আমার তো বুদ্ধিভুন্ধি লোপ পাচ্ছে।’—নিশিকান্তের মুখখানা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। একটু চুপ থেকে আবার বললো—‘আজই বিকেলে চলে যাবে বলছে। আমি অনেক বুদ্ধিয়ে সজিয়ে কারখানা ঘরে এনে বসিয়ে রেখেছি, এখন কি করি বলোত।’

হরিপদ ফাঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল—‘ম্যান্নেজারবাবু একি কাও করলেন। ব্যাও পার্টি ভুলে দিলেন।’

গৌরহরি বলল—‘বক্সী দা, খুব খারাপ দিন আসছে। আমি পষ্ট দেখতে

পাচ্ছি এরপর থেকে বিয়েবাড়িই বলো আর পুজোর বাড়িই বলো, সব জায়গায় ওই নাইক্‌রোফোনে কলের গান বাজবে। দিনি সানাই-ঢাক-ঢোল কেউ শুনবে না আর ব্যাঙ-পাটির বায়না দিতেও কেউ আসবে না।’

হরিপদ মাথা নেড়ে বললো—‘না, না, এতো ভালো কথা নয়। কই সুখস্থ কোথায় চলো আমি তাকে বুঝিয়ে বলছি।’

সামনের উঠোনটুকু পেরিয়ে গলি-রাস্তার গায়ে কারখানা-ঘর। তিনজনে গিয়ে ঢুকল। নানা যন্ত্রপাতি রিক্সার ভাঙা টুকরো। একপাশে বেকির উপর সুখস্থ বসে আছে। পায়ের কাছে একটা টিনের স্ট্রকেশ, শতরঞ্জী জড়ানো ছোট বিছানা। পাশে গালে হাত দিয়ে রমাকান্ত বসে ছিল। সুখস্থ ওদের দেখে উঠে দাড়াল। কাছাকাছি এই প্রথম দেখা। কঁোকড়া চুল, ফরসা রঙ, নীলগাট, ধুতি-স্ট্রাওল। বেশ দেখতে ছেলোটি। হরিপদ সাধনার সুরে বোঝাল—‘তোমার ভয়টা কিসের বাবা! চাকরী গেছে তাতে হয়েছে কি! তুমি আমার সঙ্গে বাজাবে। গৌরহরি আছে, অক্ষয় আছে, অবিনাশ আছে, তুমিও থাকবে। কত জায়গা থেকে বায়না আসে আমাদের, ভাল বাজাতে পারলে ভাত-কাপড়ের ভাবনা থাকবে না। আমি তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। কোনো ওজর-আপত্তি শুনব না। ওই পাঁচ তারিখেই আমার রাধিমার বিয়ে হবে। না ওহে নিশিকান্ত ওসব ভাবনা-টাবনা তুলে রাখো, হরিপদ বক্সী বৈঁচে থাকতে।’

অজ্ঞানের পাঁচ তারিখেই সন্ধ্যার লগ্নে নিয়ে হল। সামনের উঠোনে সামিয়ানার নিচে বক্সী-ব্যাঙ-পাটির লোকেরা খেতে বসেছে। গৌরহরি, অবিনাশ, অক্ষয়, সাতকড়ি, বলাই। পেটোম্যাক্সের আলো জ্বলছে। রাত প্রায় দশটা। বুড়ো বকুলগাছের পাতার কাঁকে দশমীর চাঁদ। অন্ন অন্ন কুয়াশা। কর্ণেট হাতে নিয়ে হরিপদ এসে দাওয়ার ওপর বসল। একটু হেসে বলল—‘আজ আমি একাই বাজাই, তোমরা শোনো।’

গৌরহরি মাছের কাঁটা চিবুতে চিবুতে মুখ তুললো—‘সেই ভালো বক্সীদা, আজ তুমি বাজাও আমরা শুনি।’

দালানের উত্তরদিকের ঘরে বাসর বসেছে। সুখস্থর সামনে একটা হারমোনিয়াম ঠেলে দিয়ে মেয়েরা সাধাসাধি করছে।

প্রদীপের আলোয় অন্ন ঘোমটার কাঁকে মাঝে মাঝে রাধার মুখখানা স্পষ্ট হচ্ছে। ছোট কপাল চুলে-সিঁহুরে মাখামাখি। ঘামে-ভেজা মুখখানা কেমন তেল-তেলে দেখাচ্ছে। কতবার কত জায়গায় কত মেয়ের বাসর দেখেছে হরিপদ। কিন্তু আজ একটু অন্তরকম। আজতো সে বায়না নিয়ে বাজাতে বসেনি। আজ যেমন খুশি, যতক্ষণ খুশি বাজাবে—সারারাত বসে বাজাবে। গর্ডন সাহেবের কাছে শেখা সেই গভীর সুরের বিলিতি গান—‘মুন লাইট্ অন দি রিভার কলোরেডো’—কোন অজানা দেশের অচেনা রাত্রির নদী কলোরেডো। বয়ে চলেছে অবিভ্রাম ধারায়। প্রাণ কনিয়ন গিরিখাতের আকাশে কুয়াশায় ঘোমটা পরা দশমীর চাঁদ উঠেছে। আলো পড়েছে কলোরেডো নদীর জলে। দুইতীরে কঠিন পাথরের হৃদয় যেন মুগ্ধ বিশ্বয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখছে লক্ষ ঢেউয়ের মুঠিতে জ্যোৎস্নার প্রদীপ জ্বলে গানের নদী ভেসে চলেছে দূর দিগন্তলীন সমুদ্রের পথে।

গান্ধী-মানসে পাশ্চাত্য প্রভাব

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

কোনো মানুষই ইতিহাসের গতি-প্রবাহের উল্লেখ অবস্থিত নন ; তা তিনি 'মহাত্মা', 'পুরুষোত্তম' যাই হোন না কেন। পরিবার, পরিবেশ, সামাজিক জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক সংগঠন, ঐতিহ্য, পূর্বসূরীদের চিন্তাধারা, যুগ-সঞ্চিত ভাবসম্পদ সব কিছুই মানুষের সামগ্রিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। গান্ধীজী-ও এর ব্যতিক্রম নন। গান্ধীজী নিজেও একথা স্বীকার করেছেন। পূর্বসূরীদের নিকট তাঁর ঋণ প্রকাশ্যে স্বীকার করতে তিনি আদর্শেই কুণ্ঠাবোধ করেননি। আর এখানেই বোধ হয় তাঁর মহত্বের অন্যতম কারণ নিহিত।

একথা অনস্বীকার্য যে গুজরাটের জৈন পরিবেশ, বৈষ্ণব পরিবার, রামায়ণ, মহাভারত, পাতঞ্জলির যোগসূত্র ১, হরিশ্চন্দ্র নাটকাভিনয়, প্রহ্লাদ-এর গল্প, সন্তকবি নরসিং মেটার (পঞ্চদশ শতাব্দী) ভক্তিমূলক বৈষ্ণব ভজন, রায়চাঁদভাই ২ এবং সর্বোপরি গীতা গান্ধী-মানসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু এটাই সব নয়। গান্ধীজী শুধু ভারতীয়ই নন, ভৌগোলিক গণ্ডিতে আবদ্ধ নন তিনি। ঐতিহ্যবাদী ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের ভাবধারা তাঁর কাছে সমাদরনীয়। যা কিছু তাঁর হৃদয়ে শান্তি আনতে পারে, জিজ্ঞাসু মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে তাই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য। জর্জ ক্যাটলিন-এর ভাষায় : 'in the tone of his ideas, (Gandhiji) is deeply under Western influence ; he is as much broker of thought of the West to the East as of the East to the West.' ৩

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, যে গীতা ছিল তাঁর জীবনের জীবিতরকারূপ, 'the book per excellence for the knowledge of truth'. তা তিনি প্রথম অধ্যয়ন করেন ভারতভূমিতে নয় ; ইংলণ্ডে ছাত্রাবস্থায় ইংরেজ থিওলজিস্টদের আশুকুল্যে স্ত্রার এডউইন আর্নল্ডের গীতার অনুবাদ দি সং সেলেকটিয়াল পাঠ করেন। স্ত্রার আর্নল্ড রচিত বুদ্ধদেবের জীবনী The Light of Asia-র সঙ্গ্রেও এই সময় তিনি পরিচিত হন।

(১) গান্ধীজী ১৯০৩ সালে জোহনসবার্গে পাতঞ্জলির যোগসূত্র অধ্যয়ন করেন।

(২) বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ কবি ব্যবসায়ী রায়চাঁদ ভাই বা রাজচন্দ্র ছিলেন একজন জৈন সংস্কারক। ইংলণ্ড থেকে দেশে ফিরে গান্ধীজী তাঁর সংস্পর্শে আসেন। গান্ধীজীর উপদেষ্টা ও বন্ধুরূপে তিনি গান্ধীজীর জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নে তিনি গান্ধীজীকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। 'গান্ধীজীর আত্মজীবনী' ১নং খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম অধ্যায় এবং ৩২৩ এবং ৪৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ডঃ জে, এন, ফারকুহার Modern Religious Movements বই-এ (পৃঃ ৩২৭-২৮) রাজচন্দ্রের মতামত কি ধরনের ছিল তা উল্লেখ করেছেন।

(৩) George Catlin : In the Path of Mahatma Gandhi, p 176,

যোগ, তৈনশাস্ত্র, বেদান্ত, স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী প্রভৃতির সঙ্গেও একই সূত্রে পরিচয়।

গান্ধী-মানসকে পাশ্চাত্য মনুষীদের রচনাবলী কিভাবে প্রভাবিত করেছিল তা আলোচনা করার মধ্যেই বর্তমান প্রবন্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে।

‘সত্য’, ‘অহিংসা’ প্রভৃতির প্রথম মন্ত্র-উদ্গাতা গান্ধীজী নন। তিনি নিজেও সেকথা বহু জায়গায় বলেছেন। উপনিষদ, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম, তাওবাদ, ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম প্রভৃতিতে অহিংসার (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ অর্থে) মর্মবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু একথা প্রতিবাদের আশংকা না করেই বলা চলতে পারে গান্ধীজীই প্রথম ‘অহিংসা’কে ব্যাপ্ত করে দিতে চেয়েছিলেন সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, ‘অহিংসা’কে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তার ঋণিত মূর্তিতে নয়, সামগ্রিক সত্যায়। ধুলোমাটির এই পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের সম্ভাবন প্রচেষ্টায় ‘অহিংসা’কে বাস্তবে রূপায়নের জন্যে আত্মবিশ্বাস সাধনাও করে গেছেন। আর এইখানেই গান্ধীজীর বিশিষ্টতা। বাল্য-কৈশোর জীবনের ঘটনাবলী ও তাত্ক্ষণিক পরিবেশ নিঃসংশয়ে তাঁর পরবর্তী জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল কিন্তু পাশ্চাত্যের অবদানও কোন অংশে কম নয়। রেভারেণ্ড জোসেফ ডোক^১ গান্ধীজীকে তাঁর সত্যপ্রহের প্রেরণাস্থল কোথায় জিজ্ঞাসা করলে গান্ধীজী বলেন : I remember, how one verse of a Gujarati poem, which I learned at School as a child, clung to me.....Then came the Sermon On the Mount.....It was the new Testament which really awakened me.....The Bhagavad Gita deepened the impression, and Tolstoy's The Kingdom of God is Within You gave it permanent form. ২ সারমন অন দি মাউন্ট গান্ধী-মানসকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল তা গান্ধী-জীবনীর ছাত্র মাত্রই জানেন। “What the Sermon describes in a graphic manner the Bhagavad Gita reduces to a Scientific formula.....Today supposing I was deprived of the Gita and forgot all its contents but had a copy of the Sermon, I should derive the same joy from it as I do from the Gita.”

টলস্টয় এবং রাষ্ট্রিন-এর খ্রীষ্টধর্মের ভাষ্য এবং ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে তার প্রয়োগ গান্ধীজীকে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ৩

(১) গান্ধীজী সম্পর্কে রেভারেণ্ড ডোকই ১৯০৯ সালে প্রথম বই লেখেন। এম, কে, গান্ধী : এ্যান ইণ্ডিয়ান ইন সাউথ আফ্রিকা। ঐ একই বছরে হেনরি পোলক-এর গান্ধীজী সম্পর্কে একটি পুস্তিকা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়। গান্ধীজী তাঁর মনে ধর্মজিজ্ঞাসা জাগ্রত করার সহায়ক ব্যক্তিক্রমে রেভারেণ্ড ডোকএর নিকট ঋণ স্বীকার করেছেন। রেভারেণ্ড ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

(২) B. S. Sharma : Gandhi as a Political Thinker, পৃ: ৮ হইতে উদ্ধৃত।

(৩) D. M. Datta : The Philosophy of Mahatma Gandhi, পৃ: ১৩।

‘আত্মজীবনী’তে গান্ধীজী বলেছেন : Three moderns have left a deep impress on my life and captivated me. Rai Chand Bhai by his living contact ; Tolstoy by his book, The Kingdom of God is Within You ; and Ruskin by his Unto This Last.” খোরো-ও তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রকাশিত Etienne de La Boetie রচিত Of Voluntary Servitude প্রবন্ধ খোরো, টলস্টয় প্রমুখ অনেককেই প্রভাবিত করে ।^১ উক্ত প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হচ্ছে : জনসাধারণের বশতা স্বীকারের উপরই শাসকশ্রেণীর প্রভুত্ব নির্ভরশীল । এই আধিপত্য যতটা না দৈহিক, তার চেয়ে বেশি তা নৈতিক । “It rests less on violence than on respect, that is, on the belief in the right to govern of those in power.”^২

টলস্টয়, রাস্কিন এবং খোরো গান্ধী মানসের উপর কী পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে গান্ধীজীর ঐক্যমত এবং মতপার্থক্যই বা কী পরিমাণ তা আলোচনা করার আগে আমরা আর একজন ফরাসী সমাজসংস্কারক সম্পর্কে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো । ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে Anselm Bellegarigue কিছু পরিমাণে গান্ধী টেকনিকের সদৃশ টেকনিক প্রয়োগ করেছিলেন ।^৩ তিনি বিশ্বাস করতেন যে সকল গভর্নমেন্ট হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই কারণে তা অশুভ । তিনি theory of calm প্রচার করেছিলেন । এই ভাবের মূল বক্তব্য হচ্ছে : abstention and inertia ও দ্বারা জনসাধারণ যদি শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা না করে তবে গভর্নমেন্ট তার শক্তি থেকে বিচ্যুত হবে ।

উপরে উল্লিখিত টলস্টয়এর The Kingdom of God is Within You বইএ Quaker সম্প্রদায় ৪ এবং অন্যান্যদের আমেরিকায় nonresistance নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে দীর্ঘ পত্রাবলী এবং বিস্তারিত বিবরণী উল্লিখিত হয়েছে । গান্ধীজী টলস্টয় মারফত পরোক্ষ এই আমেরিকান ষ্ট্রাষ্টোনদের দ্বারাও প্রভাবিত হন ।^৫

কিন্তু গান্ধীজী প্রত্যক্ষতঃ আমেরিকান সমাজসংস্কারক হেনরি ডেভিড থোরোর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন । রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে অসহযোগ সম্পর্কে থোরোর

(১) Bart de Light ; The Conquest of Violence পৃ: ১০৫ ।

(২) G. N. Dhawan : The Political Philosophy of Mahatma Gandhi পৃ: ৩১ ।

(৩) B. de Light পূর্বোক্ত বই, পৃ: ১০৯-১০ ।

(৪) ১৬৬০ সালে জর্জ ফক্স Quaker Society of Friends প্রতিষ্ঠা করেন । ফক্স, বার্কলে এবং উইলিয়াম পেন সপ্তদশ শতাব্দীতে Quaker Pacifism এর মুখপাত্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন । উৎসাহী পাঠকদের A. C. F. Beales এর History of Peace পৃ: ৩১ এবং C. M. Case এর Non-Violent Coercion পৃ: ৯২-৯৩ এবং পৃ: ৯৭-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে ।

(৫) D. M. Datta : The Philosophy of Mahatma Gandhi পৃ: ১৪ ।

Civil Disobedience প্রবন্ধ গান্ধীজীর মতামতকে বিশ্বাসের একটা দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়াতে সাহায্য করে। গান্ধীজী থোরো সম্পর্কে বলেছেন : Thoreau furnished me through his essay on the Duty of Civil Disobedience with a scientific confirmation of what I was doing in South Africa. ১ আমেরিকান এ্যানাকিস্ট থোরো দাসপ্রথার প্রতিবাদস্বরূপ ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করেন। ১৮৪৯ সালে একটি বক্তৃতায় তিনি . সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। একথা স্মরণ রাখা দরকার যে যদিও থোরো গান্ধীজীর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাহলেও এটা ঠিক যে গান্ধীজী থোরোর রচনা পড়ার পর সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স এর ধারণায় আসেননি। থোরো রচিত প্রবন্ধটি পড়ার আগেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় শাসকশক্তির প্রতিরোধে আন্দোলন পরিচালনা করেন। তখন সেই আন্দোলন Passive Resistance নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজ পাঠকদের নিকট সেই আন্দোলনের মর্ম ব্যাখ্যার সুবিধার্থে তিনি থোরোর Civil Disobedience কথাটি ব্যবহার করেন। কিন্তু তিনি দেখেন যে উক্ত আন্দোলনের মর্ম ব্যাখ্যায় সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্সও সার্থক শব্দ-চয়ন নয়। তখন তিনি Civil Resistance ২ কথাটি চয়ন করেন। সত্যাপ্রহ কথাটি পরবর্তীকালের।

থোরোর থিয়োরীর মূল বক্তব্য হচ্ছে : কল্যাণপথাভিমুখী হলে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যত বেশি সম্ভব সহযোগিতা, আর অশুভ-সৃষ্টিকারী হলে অসহযোগিতা। দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে থোরো কেবলমাত্র নিরুপদ্রব প্যাশিভ প্রতিরোধের বাণী প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, আমেরিকান গভর্নমেন্ট-এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের কায়সিকতা ঘোষণা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। শুভ ও মঙ্গলের প্রতি মানুষের প্রস্তুতি সহজাত ও স্বাভাবিক—একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। সমস্ত অবস্থাতেই বিবেককে প্রধান স্থান দেওয়া প্রয়োজন—এ কথা তিনি বলে গেছেন। এ্যানাকিস্ট থোরোর পরিকল্পিত আদর্শ সমাজে কোনো গভর্নমেন্ট-এরই স্থান নেই। গান্ধীজীকেও philosophical anarchist বলা হয়ে থাকে। গান্ধীজী-পরিকল্পিত আদর্শ ব্যবস্থায় '.....every one is his own ruler. He rules himself in such a manner that he is never a hindrance to his neighbour..... But the ideal is never fully realised in his life. Hence the classical statement of Thoreau that that Government is best which governs the least. ৩ এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে র্যালফ ওয়াডো এয়ারসন-এর বন্ধু থোরো তাঁর বন্ধুর মতই

(১) B. S. Sharma : Gandhi as a Political Thinker পৃ: ৯ হইতে উদ্ধৃত।

(২) Gandhiji's letter to Kodandaras, Sept. 10, 1935. শ্রী জি এন দাওয়ান-এর The Political Philosophy of Mahatma Gandhi পৃ: ৩২-এ উল্লিখিত।

(৩) N. K. Bose : Selections from Gandhi পৃ: ৪১।

ভাগবৎগীতা এবং উপনিষদ দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন।^১ গান্ধীজী এমারসন-এর রচনাবলীর সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন।^২

রাস্কিন-এর *Unto this Last* গান্ধী-মানসের উপর কি বিপুল প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিল তা গান্ধীজীর ‘আত্মজীবনী’ পড়লেই বোঝা যায়। তিনি উক্ত বইটি হোহানস্‌বার্গ থেকে ডারবান যাবার পথে ২৪ ঘণ্টা ট্রেনে অবস্থানকালে পড়েছিলেন। ‘আত্মজীবনী-তে’ *The Magic Spell of a Book* অধ্যায়ে^৩ তিনি বলেছেন : “The train reached there in the evening. I could not get any sleep that night. I determined to change my life in accordance with the ideals of the book……I translated it later into Gujarati, entitling it *Sarvodaya*. গান্ধী-মানসের উপর রাস্কিন-এর প্রভাব কি পরিমাণ, তা উপরের উদ্ধৃতি থেকেই স্পষ্ট। গান্ধী পত্রিকায়িত ‘সর্বোদয়’-এর অমুদ্রাণনা রাস্কিন-এর আনটু দিস লাস্ট থেকেই প্রত্যক্ষতঃ ও মূলতঃ তা বোধ হয় আর বলতে হবে না। গান্ধীজী রাস্কিন-এর কাছ থেকেই কায়িক পরিশ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ করেছেন বললে বোধ হয় অত্যাঙ্গী হবে না। উপরি-উক্ত অধ্যায়ের শেষে গান্ধীজী *Unto This Last*-এর শিক্ষার মর্মার্থ বলতে গিয়ে বলেছেন :

(১) ব্যক্তির মঙ্গল সমষ্টির মঙ্গলের মধ্যেই নিহিত।

(২) একজন উকীলের কাজ এবং একজন নাপিতের কাজের মূল্য সমান কারণ প্রত্যেকেই নিজের কাজ করে জীবিকার্জনের অধিকার আছে।

(৩) শ্রমজীবীর জীবন অর্থাৎ চাষীর ও হাতে কাজ করে খায় এমন শিল্পীর জীবনই আকাঙ্ক্ষিত জীবন।

গান্ধী-দর্শন এবং রাস্কিন-এর মতের মধ্যে সাদৃশ্যও যেমন আছে, মতপার্থক্যও তেমনি আছে। উভয়েই ভাবের (স্পিরিট) প্রভু এবং মানবপ্রকৃতির মহত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। বুদ্ধি অপেক্ষা চরিত্রই উভয়ের কাছে বেশি সমাদরযোগ্য। হু’জনেই রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতিকে নৈতিকতা দিয়ে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন; উভয়েই নিছক রাজনৈতিক সংস্কারের চেয়ে সামাজিক পুনরুজ্জীবনের উপর জোর দিয়েছেন বেশি। যন্ত্র শক্তির আবির্ভাব যে মানুষের ইতিহাসে একটা বিরাট সম্ভাবনার স্বর্ণহার খুলে দিয়েছে (ঐতিহাসিক অগ্রগতির দিক থেকে) এ-কথা স্বীকার করতে হু’জনেই ছিলেন নারাজ। লোভদানবের সৃষ্ট ব্যভিচার বলে হু’জনেই যন্ত্রবিমুখতার জীবনদর্শন প্রচার করে গেছেন। যন্ত্র যদি একান্তই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় তবে এ-হু’জনের মতে যাতে করে তা মানুষকে শৃঙ্খলিত না-করে তার মুক্তিপথের সহায়ক হতে পারে সেইমত তা প্রয়োগ করতে হবে। হু’জনেই বেশ জোর দিয়ে বলেছেন, ক্যাপিটালিস্টকে তার কর্মচারীদের সম্বন্ধে পিতৃমূলভ মনোভাবের অধিকারী হতে হবে। (গান্ধীজীর ত্রাসরক্ষক তত্ত্ব (Theory of Trusteeship) এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।)

(১) D. M. Datta : The Philosophy of Mahatma Gandhi পৃ: ১৪।

(২) George Catlin : In the Path of Mahatma Gandhi. পৃ: ১৯৯।

(৩) M. K. Gandhi : Autobiography, Part IV, Chapter XVIII

গান্ধীজী যদিও রাষ্ট্র-এর নিকট তাঁর ধর্মের কথা জানিয়েছেন কিন্তু এ-কথা মনে করলে ভুল হবে যে গান্ধীজী সমস্ত ব্যাপারেই রাষ্ট্রকে নিবিচারে গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত, তাঁদের মতটুকুও কম উল্লেখযোগ্য নয়। কার্লাইল-শিষ্ট রাষ্ট্র তাঁর গুরু মতই জনসাধারণের উপর আদৌ কোনো শ্রদ্ধা পোষণ করতেন না। কার্লাইল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারকে 'Horsehood, Doghood, ditto' এই চোখে দেখতেন। কার্লাইল-এর মত রাষ্ট্রও বিজ্ঞতমের শাসনেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।^১ রাষ্ট্র গণতন্ত্রে আদৌ আস্থাশীল ছিলেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল 'in the eternal superiority of some men to others, sometimes even of one man to all others' এবং সেই কারণেই "The advisability of appointing such persons or person to guide, to lead or on occasions even to compel and subdue, their inferiors according to their own better knowledge and wiser will."^২ নীতিগতভাবে রাষ্ট্র অহিংসায় বিশ্বাসী নন। কিন্তু প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধপরায়ণতার তিনি বিপক্ষে। শ্রমিকেরা যাতে সমরাস্ত্র উৎপাদনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত না করে তার জন্য তিনি আবেদন জানিয়ে গেছেন। আর একটি ব্যাপারেও রাষ্ট্র-এর সঙ্গে গান্ধীজীর মত-পার্থক্য লক্ষণীয়। রাষ্ট্র সমাজজীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের গতি প্রসারেরও সমর্থক ছিলেন।^৩

গান্ধীজী রাষ্ট্র অপেক্ষা টলস্টয়-এর অধিকতর সমীপবর্তী এ-মন্তব্য বোধহয় করা যেতে পারে। টলস্টয়-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে গান্ধীজী নিজেকে বলেছেন : 'a devoted admirer who owes much in life to him. টলস্টয়-এর The Kingdom of God is Within You পড়ার পর তাঁর মন থেকে বিধা সংশয় প্রশ্ন সব কিছুই নিরসন ঘটলো এবং অহিংসা মত্রে তাঁর দীক্ষাগ্রহণ সম্পূর্ণ হলো। বর্তমান যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হিসেবে টলস্টয় Sermon on the Mount এর শিক্ষাকে প্রয়োগ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। টলস্টয় দর্শনকে Christian Anarchism নামে অভিহিত করা হয়। টলস্টয় এবং গান্ধীজীর মতবাদগত সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে রবার্ট বর্ল বলেছেন : The resemblance between the two men is greatest, or perhaps Tolstoy's influence has been strongest, in their condemnation of European & Occidental civilisation. ৪

(১) প্রাগগো আণ্ডার-গ্রাডুয়েটদের একবার তিনি বলেন, You have no business with politics than you have with the ratcatching; but I hate all liberalism as I do Beelzebub, with Carlyle I stand, we two now alone in England, For God and the Queen" (The Works of Ruskin, lib. ed. Vol XXXIV, pp 548-49)

(২) আর্নেস্ট বার্কার কতক Political Thought from Spencer to Today. পৃ: ১৯৩ তে উদ্ধৃত।

(২) R. H. Wilenski : John Ruskin, pp 296-93

(৩) Romain Rolland : Mahatma Gandhi, p 36

অর্জ ক্যাটলিনও একই সুরে বলেছেন : Gandhi's reaction against "civilisation" *scil* "Western Civilisation", it may be suspected owes more to Tolstoy than to Edward Carpenter or J. J. Rousseau. Much in the impassioned Russian, the baron turned peasant or *moujik*, perfectly appealed to him,"^১

খ্রীষ্টান সভ্যতার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ দেখে টলস্টয়-এর এ প্রতীতি জন্মেছিল যে হিংস্র শক্তিই এই সভ্যতার মূল স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে টলস্টয়-এর তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে ২ ; রাষ্ট্র-পরিচালনার বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা, আইন আদালত, পুলিশ-মিলিটারী, ব্যক্তিসম্পত্তি এবং ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর সোচ্চার প্রতিবাদ ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস এবং টলস্টয়সাহিত্যের প্রতিটি ছাত্তরেরই অতি পরিচিত। এমন কি, তিনি রাষ্ট্রপরিচালিত স্কুলেরও বিরুদ্ধে ছিলেন। তার কারণ এ-সবই তাঁর কল্পিত প্রেমধর্মের বিরোধী। বলপ্রয়োগ, ট্যাক্স প্রদান এবং বাধ্যতামূলক সামরিক কর্মের বিরুদ্ধতা করে গেছেন তিনি বারে বারে। সংগঠিত সমাজের পরিবর্তে স্বচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত সমাজ রচনার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। যদিও তিনি তাঁর পরিকল্পিত আদর্শ সমাজের ছক কিছু দিয়ে যাননি। গান্ধীজীও টলস্টয়-এর মত তাঁর পরিকল্পিত রানরাজ্যের কোনো সূনিদিষ্ট ছক রেখে যান নি।^৩

উপরের অনুচ্ছেদে বর্ণিত টলস্টয়ীয় সহযোগিতা আসবে প্রেম, অপ্রতিরোধ এবং অসহযোগের মারফত। টলস্টয় ব্যক্তির নৈতিক পুনরুজ্জীবনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। 'কায়িক পরিশ্রম করে বাঁচো', 'জমিতে ফিরে যাও'—এই সব নীতি টলস্টয়ও প্রচার করে গেছেন। রেভারেণ্ড ডোক গান্ধীজীকে টলস্টয়শিষ্ট বলে অভিহিত করেছেন।^৪ গান্ধীজীর নিষেধ স্বীকৃতির কথাও আমরা আগে উল্লেখ করেছি।

'সত্য' ও 'অহিংসা'র এই দুই মন্ত্রগুরু মধ্য মতসাদৃশ্য যথেষ্ট পরিমাণেই বর্তমান। উভয়েই বর্তমান সভ্যতাকে শোষণ ও হিংসাপ্রিত সভ্যতা বলে আখ্যাত

(১) In the Path of Mahatma Gandhi p 247

(২) টলস্টয়-এর ভাষায় "the words, a *Christian State* resemble the words *hot ice*. The thing is either not a state using violence or it is not christian," Quoted by Milford Q. Sibley : American Political Science Review, June, 1943 খ্রী জি, এন, থাওয়ারাল-এর পূর্বোল্লিখিত বই থেকে উদ্ধৃত উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে।

(৩) "I have purposely refrained from dealing with the nature of Government in a society based on non-violence...when society is deliberately constructed in accordance with the law of nonviolence, its structure will be different in material particulars from what it is today. But I cannot say in advance what the Government based wholly on nonviolence will be like." (হরিজন, ফেব্রুয়ারী ১১, ১৯৩৯ পৃ: ৮)

(৪) জে, জে, ডোক-এর পূর্বোল্লিখিত বই, পৃ: ৩।

করেছেন। লোভতন্ত্র ও অশুভশক্তির বিরুদ্ধে সাধনমার্গও (মিনস্) যে অহিংস হওয়া প্রয়োজন এই নীতির ওপর তাঁরা হুঁজনেই বিশেষ জোর দিয়ে গেছেন। উভয়েই ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিরপেক্ষ মিনস্-কেই তাঁদের চিন্তায় যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছেন। সমাজ পুনরুজ্জীবনের পথে ব্যক্তির নৈতিক পুনরুজ্জীবনই যে মুখ্য, এ-কথাটা তাঁরা বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বোধের অভাব উভয়ের মধ্যেই বর্তমান। অতিশয় সরল জীবনযাত্রা, কায়িক পরিশ্রমের আরফত জীবিকা অর্জন, প্রায় সম্যাসী-অস্বাচারীমূলভ কোনার্ঘ অমুসরণে এইসব উপদেশ হুঁজনের মধ্যেই পাওয়া যায়।

কিন্তু গান্ধীজী বোলয়ানা টলস্টয়পত্নী একথা বলাও বোধহয় ঠিক হবে না। গান্ধীজী টলস্টয় অপেক্ষা অনেক বেশি মাটির কাছাকাছি মানুষ, বাস্তববোধ তাঁর অনেক বেশি প্রখর, সামাজিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য আরও অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর প্রয়োজনের যোজনোপযোগী কর্মপন্থা গ্রহণে তিনি যত বেশি দক্ষ, টলস্টয় তত নন। তার কারণও হুঁজনের বাস্তব পরিবেশ ও মানসিকতার মধ্যে নিহিত। ‘অহিংসা’ সম্পর্কেও হুঁজনের ধারণা সম্পূর্ণ এক নয়। টলস্টয় হিংসা বা শক্তিপ্রয়োগের সমস্তপ্রকার রূপেরই বিরোধী কিন্তু গান্ধীজী যেখানে সহিংস কর্মের অমুষ্ঠাতা ব্যক্তির অভিপ্রায় অমুসন্ধান করে রায় দেন, কাজটা অহিংস না সহিংস। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গান্ধীজীর মতে এমন-কি প্রাণিহত্যাও অহিংস হতে পারে।^১ জীবনধারণ ও জীবনযাত্রায় নির্বৃণ্ড অহিংসার স্থান নেই—তাই টলস্টয়কে জীবনবিমুখ হতে হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজী, অপরপক্ষে, ভালো-মন্দ মনোমানো মানুষের জীবন থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেননি, গীতার নিকাম ধর্মের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে তাঁর ধ্যানধারণাকে অবলম্বন করে (এই প্রবন্ধ গান্ধীদর্শন সম্পর্কে আলোচনার স্থান নয় বলে সে-সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা হলো না) হুঁজিত মানবতার মাঝে এসে ঝাঁড়িয়েছিলেন। টলস্টয় এবং গান্ধীর তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে জর্জ ক্যাটলিন বলছেন : “...It is Thomas Mann who suggests that Count Tolstoy was not perhaps really quite sincere, when he reacted against the luxury of civilization, in his pacifism and asceticism. He covertly pompered a very sensual nature instead of reshaping it with Christian singlemindedness.....He had odd reservations. However this may be, with Gandhi the integrity, the “natural christianity” is complete. And thereby he comes nearer than Tolstoy ever did to the great tradition of monk, and *Sannyasin*, in both West and East. Whereas Tolstoy reacts towards primitive life, Gandhi reacts towards the simple life—which is very different indeed.” (পূর্বোক্তিত গ্রন্থ, পৃ: ২৪৭) মন্তব্যটিতে মতান্তরের অবকাশ থাকলেও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

এ কথা ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানেন, শিল্প-বিপ্লবের পরবর্তী যুগে ধনতন্ত্রের

শোষণের বিরুদ্ধে যুরোপীয় মানবতাবাদের একটি ধারা কার্নাইল-রাঙ্কিন প্রমুখদের প্রতিবাদের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে। টলস্টয়বাদ সেই ঐতিহ্যের অঙ্গগরণকারী। লোভতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁদের সতেজ প্রতিবাদ উত্তরশুরীদের অঙ্গপ্রাণিত করেছে। কিন্তু এ-কথা বললেও অনৈতিহাসিকতার দায়ে অভিযুক্ত হতে হবে না যে, তাঁদের ইতিহাসের যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত এবং বৈজ্ঞানিক সামাজ্যবোধের অভাবের ফলে তাঁরা নিপীড়িত মানবতার শোষণমুক্তি আন্দোলনের যাত্রাপথে সীমাহীন বিশ্বাস্তির স্রষ্টি করে গেছেন। এঁদের চিন্তাধারা গান্ধীমানসকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক-দ্যান-ধারণা, সমাজের সমুদয়গতি কিছুই গান্ধীজীকে তাঁর 'শান্ত' সিদ্ধান্ত থেকে চ্যুত করতে পারেনি আর সেইটাই বোধহয় গান্ধী-মতবাদের ট্র্যাজেডি।

ফ্রি স্টাইল ফুটবল প্রতিযোগিতা

বিবিসন ঘোষ

‘চলুন খেলা দেখে আসি।’

বন্ধু ধনঞ্জয় বোসের প্রস্তাব শুনে চমকে গেলাম। আপত্তি জানিয়ে বলি—

‘খেলা আমি দেখি না কখনও—দেখতে ভালও লাগে না।’

বন্ধুবর সহকর্মী—আমাদের দৈনিক বার্তাবহের ক্রীড়া সাংবাদিক। তাঁর ধারণা খেলা দেখার চেয়ে আনন্দদায়ক জিনিস সারা পৃথিবীতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না আর।

‘খুব ভাল খেলা আছে আজ। বেঙ্গল সকার ক্লাবের সঙ্গে ইউনাইটেড স্পোর্টিং ক্লাবের খিলিং খেলা।’ বন্ধুবর আমাকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করলেন। প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলি আমি—

‘ফুটবল খেলা আমি বরদাস্তাই করতে পারি না। যুগ্মপ্রাণ একটা গোলাকার বস্তুর পিছনে ডঙ্কন হুঁয়েক হাফপ্যান্টপরা লোকের খানাখা ছোটোছুটি আর কাড়াকাড়ি, থেকে থেকে ভেড়ে গিয়ে গোলাকৃতি বস্তুটায় ঠেসে লাগি মারা—এর মধ্যে আনন্দ পাবার মত কিছু থাকতে পারে, এইটাই আমার কাছে পরম অবিদ্যাস্থ বলে মনে হয়। আমার মতে ফুটবল খেলা দেখে সময় নষ্ট করার থেকে বড়বাজার বা বাগবাজারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ষাঁড়ের লড়াই দেখা অনেক ভাল। ঐতিহ্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলেও ফুটবল খেলার থেকে ষাঁড়ের লড়াই অনেক বেশি ভারতীয়।’

বন্ধু কিন্তু নাছোড়বান্দা; আমাকে নিয়ে যাবেনই। তিনি জানালেন যে খেলার মাঠ থেকে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর পক্ষ থেকে বাংলায় যে ধারাবিবরণী রিলে করে রেডিও শ্রোতাদের শোনান হবে তিনি এইবার তার ভার পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে গেলে মাঠের বেতারমঞ্চ থেকে খেলা দেখবার সুযোগ পাব আমি—এই আশ্বাসও তিনি দিলেন। বন্ধুবর ধনঞ্জয়কে চটোতে চাই না। কারণ সময়ে অসময়ে টাকাটা সিকেটা ধার পাই তাঁর কাছে। কাজেই প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হ’তে হ’ল তাঁর প্রস্তাবে। লোকে শুনি উপরোধে গোটা চেকিই গিলে ফেলে। আর সামান্য একটা খেলা কোনরকমে গিলতে পারবো না আমি? এই ভেবে সাহসনা দিলাম নিজেকে।

বধাসময়ে হাজির হ’লাম মাঠে। সাদা আর সবুজ গ্যালারীতে লোক আর ধুরছে না। বন্ধুবরের কল্যাণে আমার অবস্থা কোন অসুবিধাই হ’ল না। তাঁর সাহায্যকারী হিসাবে স্থান পেলাম বেতারমঞ্চে।

হঠাৎ বিপুল জয়ধ্বনি। গ্রাউণ্ডের দিকে তাকিয়ে দেখি খেলোয়াড়রা মাঠে নামছেন। আমি বন্ধুবরকে কি একটা প্রশ্ন করতে যেতেই ঠোঁটে আছুল ঠেকিয়ে তিনি চুপ করতে বললেন। তারপর ইঙ্গিতে তাঁর সমুখের মাইকটা দেখিয়ে দিলেন। বুঝলাম, মাইক চালু হয়ে গেছে—এখন যদি কোন প্রশ্ন করি তবে সেটা রেডিও সেটের

সামনে খাড়া হাজার হাজার শ্রোতাকেই করা হয়ে যাবে। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁরা আমার প্রস্তাবনে বিদ্ধ হবেন। চুপ করে গেলাম তাই।

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বন্ধুবর তাঁর বেতার-বর্ণনা আরম্ভ করলেন—

‘অন্যতম দুর্ধর্ষ দুটি দল, ইউনাইটেড স্পোর্টিং ক্লাব আর বেঙ্গল সকার ক্লাবের খেলা দেখতে আজ আমরা যারা এখানে এসেছি তাদের সামনে পড়ে রয়েছে সবুজ ভীণাকীর্ণ স্তামল গড়ের মাঠ। তার একদিকে দেখা যাচ্ছে আকাশচুম্বী মনুমেন্ট আর একদিকে দেখা যাচ্ছে মনোরম রাজভবন। আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ। তবু সূর্য ঢাকা পড়েনি। সুন্দর একটি বিকাল। রৌদ্রে ঝলমল বিকাল।

‘ঐ যে আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি—খেলোয়াড়রা একে একে মাঠে নামছেন। মাঠে নেমে আনার বান দিকের পোষ্টের সামনে যারা স্থান নিচ্ছেন তাঁরা হ’লেন ইউনাইটেড স্পোর্টিং-এর খেলোয়াড়। একে একে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ঐ দেখুন, ঐ দলের ক্যাপ্টেন গায়গন্তি বোস—তাঁর বেষ্টে লম্বুভার চেহারা নিয়ে ছুটে মাঝ প্রাউণ্ডে চলে এলেন। উনি ঔর দলের সেন্টার ফরওয়ার্ড হিসাবে আজ খেলবেন।

‘তাঁর পিছনে পিছনে কালো, কৌকড়ান চুল, বেষ্টে মতন যিনি ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন তিনি সেন্টার-হাফ চাকলা ঘোষ। ঔর বাম পাশে স্থান নিচ্ছেন নির্দাড়িগৌক চুরুটমুখে যজ্ঞসেন চক্রবর্তী—আর ডান পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন বোকা বোকা চেহারার অবোধ ব্যানাজি। ঐ যে আরও ক’জন দৌড়ে নামছেন মাঠে।—ঐ এলেন নিরুত্তাপ মুখে বয়স্ক একান্ত বোস—বেষ্টে হালকা চেহারা।

‘কুলব্যাক হলধর বোসকে এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি তাঁর বিরাট দাঁড়িভরা হাসি হাসি মুখ—তাতে অলস্ত চুরুট। শেষে নামছেন বিখ্যাত গোলকীপার সন্মিলিত মৈত্র। এঁরও মুখে দেখছি চুরুট—চোখে চশমা।

‘একটা ভিনিস দেখে আশ্চর্য হচ্ছি—আশ্চর্য হচ্ছি ইউনাইটেড স্পোর্টিং দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে চুরুটের আধিক্য দেখে। হনলুলুতে উনিশশো সাতচল্লিশ সালের ১৩ই জুন তারিখে সুজরাষ্ট্র বনাম এশিয়ার যে আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা হয় তার কথা মনে পড়ছে এ প্রসঙ্গে। এই চুরুটের আধিক্যর দিক থেকে খেলা দুটি অবশ্যই এক জাতের।’

কিছুক্ষণ দম নিয়ে আবার শুরু করলেন বন্ধুবর—‘ওদিকে দেখুন, আমার ডান দিকের গোলপোষ্টের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন বেঙ্গল সকার ক্লাবের ক্যাপ্টেন বর্ধন রায়। চোকো মুখ, দীর্ঘ দেহ বর্ধন রায় আজ নিজেদের দলের গোলরক্ষা করবেন।

‘ওই দেখুন চিন্তিতমুখ সংখ্যা সেন ব্যাকের জগ্ন নির্ধারিত জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছেন। হাফ-ব্যাক মিশকালো রঙ দাঁতালো কালু মুখুচ্ছে তাঁর স্বস্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি হাসছেন—বোধহয় নিজেদের দলের স্বয় নিশ্চিত মনে করেই হাসছেন। হাসলে এঁকে কি সুন্দর দেখায়—মাঠ যেন আলো হয়ে ওঠে।

‘ওই যে কোঁচান খুতি আর পাঞ্জাবী পরে নামলেন চলচল সিংহী। কাদা বাঁচিয়ে ক্রমালে মুখ মুছতে মুছতে উনি স্থান গ্রহণ করছেন। সেন্টারে এসে দাঁড়ালেন এবার

নিঃস্বার্থ রায়—আর তাঁর ঠিক পিছনে আমরা দেখতে পাচ্ছি গদাই লঙ্করকে । তিনি তাঁর কাইজারী গোঁফ নেড়ে পান খাচ্ছেন আর পিক ফেলছেন ।

‘খেলা আরম্ভের সময় হ’য়ে এলো । আর দু’নিমিট বাকি আছে আরম্ভ হ’তে । এই সময়টুকুর মধ্যে আপনাদের কাছে আজকের খেলা সম্পর্কে একটু ‘বিশেষ কথা’ বলে রাখি । আজ যে খেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তা খেলা হবে ফ্রি স্টাইল চণ্ডে । অর্থাৎ সাধারণভাবে যাকে আমরা ফাউল বলে জানি তা এ খেলায় ফাউল হিসাবে গণ্য হবে না । প্রাণহানির আশঙ্কা না দেখা দেওয়া পর্যন্ত রেফারী কোন হস্তপদ চালনাকেই ফাউল বলে প্রাঙ্ক করবেন না । ইচ্ছা করলে প্রাণহানির আশঙ্কাকেও তিনি অপ্রাঙ্ক করতে পারেন । ফ্রি স্টাইল সিস্টেমে ল্যাং মারাও বৈধ । এই ফ্রি স্টাইল সিস্টেমকে এখন পৃথিবীর বহু জায়গায়ই ফুটবল খেলার শ্রেষ্ঠ নিয়ম বলে মনে করা হয় এবং আজকাল আনেরিকায়, বিশেষ করে তার দক্ষিণাঞ্চলে আর দক্ষিণ আফ্রিকায় এই সিস্টেম সরকারী ভাবে চালু হয়ে গেছে ।

‘ঐ দেখুন কালো চশমা পরা একটি লোক মাঠের কিনারা ঘেঁসে দৌড়াচ্ছেন—হাতে একটা বড় ডাণ্ডার আগায় একটি ছোট পতাকা লাগান । দেখেই বোঝা যায় উনি লাইসেন্সমান । দাঁড়ান, উনি এদিকে এসে না পৌঁছান পর্যন্ত ঠিক চিনতে পারছি না ওঁকে । হ্যাঁ, হ্যাঁ—এইবার ঠিক চিনেছি । উনি বিখ্যাত লাইসেন্সমান অমূল্য ঘোষ । যে কোন বড়দের খেলা ওঁকে ছাড়া কল্পনাও করা যায় না ।

‘মাঠ প্রস্তুত । আর আধ নিমিট দেবী খেলা আরম্ভ হবার । ঐ বোতল বগলে নামছেন রেফারী । আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ খেলায় রেফারীংএর দায়িত্ব নিয়েছেন প্রলয়ঙ্কর ব্যানার্জি । এঁর আর নতুন করে পরিচয় আপনাদের কাছে দেব না । এঁর বোতল বগলে চেহারার সঙ্গে আপনাদের প্রায় সকলেরই পরিচয় আছে মনে হয় ।

‘রেফারী বোতলে মুখ ঠেকিয়ে চুমুক দিলেন । ছবার চুমুক দিয়ে ষড়ি দেখছেন । এইবার—এইবার—এইবার এই বাঁশিতে কুঁ দিলেন তিনি । খেলা শুরু হয়ে গেল । ঐ দেখুন গোলের দিকে এগিয়ে আসা বলটিকে তীব্র গতিতে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন সংখ্যা সেন । বল এখন নিঃস্বার্থ রায়ের পায়ে । নিঃস্বার্থ রায় পাশ করলেন । উনি ভুল করেছেন । বল গিয়ে পড়েছে ইউনাইটেড স্পোর্টিংএর যজ্ঞসেন চক্রবর্তীর পায়ে ।

‘এখন গায়েগতির পায়ে বল । গায়েগতি ছুটছেন—গায়েগতির পায়ে বল । গায়েগতি নিঃস্বার্থ রায়কে কাটিয়েছেন । না, না, পারলেন না গায়েগতি । নিঃস্বার্থ রায়ের ল্যাং খেয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছেন । এখন বল পেয়েছেন গদাই লঙ্কর । গদাই লঙ্কর লম্বা পাশ করেছেন চলচল সিংহীকে । সিংহী এগিয়েছেন । ইনি এখন ইউনাইটেড স্পোর্টিংএর গোলের কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা করছেন ।—ঐ বাঃ উনি কোঁচা সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন । বল চলে গেল হলধর বোসের কাছে ।’

বন্ধুবরের ধারাবিবরণী অবিশ্রান্তভাবে চলতে থাকলো । কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বন্ধু খুব চোঁচিয়ে উঠলেন, ‘চিমটি কাটছে—চিমটি কাটছে ।’

সচকিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম কেউ সত্যি তাঁকে চিমটি কাটছে কি না । সেদিকে কোনো কিছু না-দেখে মাঠের দিকে ফেরালাম চোখ । দেখি বামদিকের

খেলোয়াড়রা পরস্পর পরস্পরকে চিমটি কাটতে লেগেছেন পাইকারী হারে। বন্ধুর আর্ডনাদের অর্থ পরিকার হল।

বন্ধুর বিবরণীর ধারা চলতে থাকলো—

‘এখন দেখছি ইউনাইটেড স্পোর্টিংএর খেলোয়াড়রা একে অপরকে ঘন ঘন চিমটি কাটছেন। এই চিমটি কাটার প্রথাটা ইউনাইটেড স্পোর্টিং ক্লাবের একেবারে নিষিদ্ধ। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর যে সব শ্রোতা ধারাবিবরণী শুনছেন তাঁরা শুনে আশ্চর্য হবেন যে এখন অন্য কোনো ক্লাব এই চিমটি কাটার প্রথা তাঁদের ক্লাবে আর প্রবর্তন করতে পারেন না। পারেন না—কারণ এতে ইউনাইটেড স্পোর্টিংএর পেটেন্ট রাইট। আইনমতে এ প্রথা তাঁদের নিষিদ্ধ। স্বপক্ষের সকলকে গরম ও উত্তেজিত রাখবার উপায় হিসাবে এঁরা প্রথাটির সৃষ্টি করেছিলেন একদিন। কিন্তু আমার মনে হয় যে এখন এই চিমটি কাটার অভ্যাসটা এই দলের সকলের মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।’

‘দেখুন, দেখুন—বেঙ্গল সকারের গোলকীপার বর্ধন রায় গোল ছেড়ে এগিয়ে আসছেন। ভীমবেগে বল নিয়ে এগিয়ে আসছেন তিনি। ঐ তিনি ল্যাং নেরেছেন অবোধ ব্যানাজিকে—অবোধ ব্যানাজি মাটিতে শুয়ে পড়েছেন। দেখছি—চাকল্য ঘোষের মাথায় মুঠোঘাত করছেন উনি। চাকল্য বসে পড়েছেন। অপ্রতিহতগতিতে এগোচ্ছেন বর্ধন রায়। ঐ বল—সঙ্গে বর্ধন রায়। একটা ভীষণ উত্তেজনাকর মুহূর্ত। ইউনাইটেড স্পোর্টিংএর গোল ছেড়ে এগিয়ে এসেছেন সম্মিলিত মৈত্র। বর্ধন রায়—ঐ বর্ধন রায় ছোড়াপায়ের লাথির আঘাতে শুইয়ে দিলেন সম্মিলিত মৈত্রকে। গোলের সামনে আর কেউ নেই। বর্ধন রায় চুকতে চাইছেন বল নিয়ে গোলের মধ্যে। ইউনাইটেড স্পোর্টিংএর খেলোয়াড়রা ছুটে আসছেন তাঁর পিছনে পিছনে। আর ঠেকানো গেল না—গেল না—গোল। গোল। বর্ধন রায় নিজের প্রচেষ্টায় পথ করে এগিয়ে এসে আজকের খেলার প্রথম গোল করবার সম্মান অর্জন করেছেন। পরিণত বয়সেও বর্ধন রায়ের এই ক্রীড়া-ভঙ্গী সত্যিই মুগ্ধকর। সাবাস বর্ধন রায়।’

‘আহত সম্মিলিত মৈত্রকে কয়েকজন চাংদোলা করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে, উনি আর আজ খেলাতে যোগদান করতে পারবেন না।’

‘আবার শুরু হয়েছে খেলা। কালু মুখুজ্যে আর নিঃস্বার্থ রায় পরস্পর বল আদান প্রদান করতে করতে এগিয়ে আসছেন। কেউ ঠেকাতে পারছেন না তাঁদের। হাফ লাইন অতিক্রম করলেন তাঁরা। অবোধ ব্যানাজি কালু মুখুজ্যের গুঁতোয় কঁকোচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছি, এই ফ্রি ষ্টাইল কুটবল খেলায় বেঙ্গল সকার ক্লাব ক্রমেই কোনঠাসা করে ফেলছে ইউনাইটেড স্পোর্টিংকে। বল এখন বেশির ভাগ সময়ই ইউনাইটেড স্পোর্টিং ক্লাবের সীমানার মধ্যে থাকছে। সম্মিলিত মৈত্রের বদলী হিসাবে এখন ইউনাইটেড স্পোর্টিংএর গোলে দাঁড়িয়েছেন এসে একান্ত বোল। ‘কালু মুখুজ্যের সট ইনি কোনোরকমে ফিরিয়ে দিলেন। বল এসেছে হলধর বোসের পায়ে। কিন্তু সট করার আগেই তাঁর কাছ থেকে সবলে বল কেড়ে নিয়েছেন নিঃস্বার্থ রায়। দেখা যাচ্ছে, দৈহিক যোগ্যতায় বেঙ্গল সকারের খেলোয়াড়রা ইউনাইটেড স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়দের থেকে অনেক অনেকগুণ শ্রেষ্ঠ। ফ্রি ষ্টাইল কুটবল খেলার দিক

দিয়ে বিচার করতে গেলে বেঙ্গল সকার ক্লাবের এই শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

‘ঐ আবার নিঃস্বার্থ রায় একান্ত বোসকে লক্ষ্য করে বল মেরেছেন। স্থির লক্ষ্যের অভাবে অল্পের জন্য এবার বল চলে গেল বারের উপর দিয়ে। চিমটি কেটে বহু সময় অপব্যয় করার জন্য এদিকের খেলোয়াড়দের অবস্থা এত বেশি খারাপ হ’য়ে পড়েছে। আমার মনে হয়, চিমটি প্রথাটা এখন ইউনাইটেড স্পোর্টিং-এর খেলোয়াড়দের একাধতা আর ক্ষিপ্ততা হ্রাস করে দিচ্ছে। প্রথা ভাল কি মন্দ সে বিচার না করেও একথা বোধহয় বলতে পারি আমরা। বল বাম দিক থেকে যেন আর নড়তে চাইছে না। বেঙ্গল সকারের খেলোয়াড়দের পায়ে পায়েই ঘুরছে বল।

‘একি হল। ছেঁকা দিচ্ছেন, ছেঁকা দিচ্ছেন এঁরা। মারমুখী বেঙ্গল সকারের ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ডদের এঁরা ছেঁকা দিচ্ছেন। যন্ত্রসেন আর হনধর তাঁদের মুখের জলন্ত চুরুট দিয়ে ছেঁকা দিচ্ছেন। ফ্রি ষ্টাইলের সুযোগ নিয়ে ছেঁকার সাহায্যে ক্রুখে দিয়েছেন এঁরা বেঙ্গল সকারের তীব্র আক্রমণের ধারা। ল্যাং আর মুষ্টিযোগের পালটা হিসাবে আন্তর্দলীয় চিমটি প্রথা কার্যকরী না হওয়ায় এখন নূতন পন্থায় প্রতিরোধ করতে শুরু করেছেন ইউনাইটেড স্পোর্টিং ক্লাব।’

হাফ টাইমের হাইস্কল বাজল। বন্ধুবারের ধারাবাহিক ধারাবিবরণী কিছুক্ষণের জন্যে শুরু হ’ল।

আমার পাশে এসে বন্ধু প্রশ্ন করলেন, ‘কেমন লাগছে?’ আমি বললাম, ‘এই ফ্রি ষ্টাইল ফুটবলের মধ্যে ফুটবল বাদ দিয়ে ফ্রিষ্টাইলটা আমার বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে। আমার মনে হয়, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার অনুকরণে পৃথিবীর সর্বত্রই এই ফ্রি ষ্টাইল সিস্টেমে ফুটবল খেলা চালু হওয়া দরকার। ফুটবল খেলা আজকাল প্রায় নিবীৰ্যদের খেলা হ’য়ে দাঁড়িয়েছে। নূতন প্রথায় তাকে নূতন করে চলে সাজতে না পারলে শীর্ষ গীরই এর অপয্যুত্যা হবে।’

যথারীতি বিরতির পর আবার শুরু হ’ল খেলা। চললো ধারাবিবরণী। ধনঞ্জয় কখনও মধ্যমে কখনও পঞ্চমে কখনও বা নিখাদে স্বর তুলে চালিয়ে যেতে লাগলেন তাঁর অবিরাম ঘোষণা। খেলাটারও মোড় ঘুরে গেছে দেখলাম। শুধু বক্সিং আর লাঠি নয়, কুস্তির প্যাচও খেলোয়াড়রা লাগাতে লাগলেন। যখন কেউ অন্য দলের খেলোয়াড়ের গলা টিপে ধরছিলেন তখন খালি রেফারী তাঁদের দুজনকে আলাদা করে দিচ্ছিলেন। এমনিতে না পেরে উঠলে বগল থেকে বোতলটা টেনে নিয়ে তার বাড়ি দিচ্ছিলেন। খুব জমে উঠলো খেলা।

ঘোষক বন্ধু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তার ক্রত স্বর মুদারা ছাড়িয়ে তন্দ্রায় উঠে গেল—

‘গোল খাওয়ার পর থেকে ইউনাইটেড স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়রা যেন মরিয়া হ’য়ে উঠেছেন। মকর খেয়েও তাঁরা দমছেন না। বিরতির পর থেকেই গোল শোধ দেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। বল গিয়ে পড়েছে চাকলা ঘোষের পায়। লম্বা সটের সাহায্যে চাকলা সুন্দর ভাবে বলটি দিয়েছেন গারেগতির কাছে। ছুটছেন

গায়েগতি—তার ফুটিংএর মত হাতা শরীর নিয়ে তিড়িবিড়িয়ে ছুটে চলেছেন। তিনি কাটিয়ে নিলেন গদাই লঙ্করকে—আবার ছুটেছেন পাইপাই করে। তার গামনে এবার সংখ্যা সেন। তাঁকেও কাটিয়ে নিলেন দেখছি। এখন গোলমুখে তিনি বেঙ্গল সকার ক্লাবের পক্ষে যথেষ্ট বিপক্ষনক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। গোলে একা বর্ধন রায় আর তাঁর মাত্র হাত দশেক দূরে বল নিয়ে গায়েগতি! চেষ্টায়ে উঠেছেন বর্ধন রায়। হাত নেড়ে তিনি কি বলছেন গায়েগতিকে। হ্যাঁ শুনতে পেয়েছি। তিনি খালি খালি অহুরোধ জানাচ্ছেন গায়েগতিকে। বলছেন : গোল দিসনি গতি, লক্ষ্মীটি। গোল দিলে ভাল হবে না কিন্তু। গায়েগতি ভেংচে উত্তর দিলেন। শুনলাম উত্তর দিলেন : মাইরি আর কি! বলেই তিনি সট করেছেন গোলে। অপূর্ব সট! বর্ধন রায় গোলে হু'হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন অসহায় ভাবে—আর বল বুলেটের মত তাঁর পাশ দিয়ে গোলে চুকে পড়লো। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার বার মিনিটের মধ্যেই গোল শোধ দিয়ে দিলেন ইউনাইটেড স্পোর্টিং। খেলার ফল এখন সমান সমান।

‘এদিকে মাঠের অবস্থা খুবই উত্তেজনায। সবুজ গ্যালারীর অধিকাংশ লোক প্রাণপণে চেষ্টাচ্ছেন আর নাচছেন। তাঁদের নৃত্য দেখে স্বভাবতঃই আমার বাঙলার একেবারে নিম্নস্থ নাচ রায়বংশে নৃত্যের কথা মনে পড়ছে।

‘আমার সামনেই চশমায় চোখচাকা লাইনম্যান অমূল্য ঘোষ রেফারীকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে গোলটা অফসাইডের অজুহাতে অগ্রাহ্য হওয়া উচিত। ইউনাইটেড স্পোর্টিং-এর ঘন ছয় খেলোয়াড় রেফারীকে ঘিরে তারস্বরে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন লাইনসম্যান ঘোষের বক্তব্যের। চাকল্য ঘোষকে খুবই উত্তেজিত দেখছি যেন।

‘এবার বেঙ্গল সকারের খেলোয়াড়রাও ঘিরে ধরেছেন রেফারীকে। দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বচসা শুরু হয়ে গেলো। হঠাৎ কানু মুখুজে গায়েগতির পিছন থেকে অতকিতে গায়েগতিকে খুব ছোর এক গাঁট্টা মেরেছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি গায়েগতি লাফাচ্ছেন আর মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। একি হল! দর্শকরা দলে দলে মাঠে চুকে পড়ছেন যে! সাদা গ্যালারী, সবুজ গ্যালারী—সব দিক থেকেই মার মার পক্ষে ছাতা জুতো উচিয়ে তেড়ে আসছে লোক। হু'দলের সমর্থকদের মধ্যেও আরম্ভ হয়ে গেল ক্রি টাইল লড়াই। এই পাইকারী মারামারির সঙ্গে তুলনীয় একমাত্র সেই উনিশশো ছে'চল্লিশ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা।

‘প্রচুর ইঁট বর্ষণ হচ্ছে। পতাকা দণ্ড দিয়ে একা অমূল্য ঘোষ তিনজন প্রতিপক্ষকে ঠেদাচ্ছেন। বুল দাঙ্গাটা হচ্ছে আমাদের বেতার মঞ্চের খুব কাছেই।

‘এবার আপনাদের কাছ থেকে আমায় বিদায় নিতে হচ্ছে। বিদায় নিচ্ছি কারণ আমার মঞ্চ এখন ছোট বড় নাঝারি, নানা আকারের ইঁট পাথর আর জুতো এসে পড়ছে। আশঙ্কা হচ্ছে যে এখন সরে পড়তে না পারলে এর পরে আর প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবো না। ক্রি টাইল ফুটবল প্রতিযোগিতার ধারাবিবরণী পরিবেশন করা এইবারের মত এইখানেই শেষ হ'ল। পালালাম। যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। জয় হিন্দ।’

আমায় একলা রেখে বন্ধুবর গাঁ করে সরে পড়লেন মঞ্চ থেকে। একা আমার উপরে চলতে থাকলো লোষ্ট্রাঘাত আর পাছকাপ্রহার। মূল মারামারিটা সরতে সরতে একেবারে মঞ্চের সামনে এসে পড়লো। দেখি, গায়েগতিকের বুদ্ধের মধ্যে জাপটে ধরে পিশে ফেলবার জন্যে বর্ধন রায় ছুঁহাত কিং কংএর ভঙ্গীতে বাড়িয়ে গায়েগতির নাগাল পাবার চেষ্টা করছেন। খর্বদেহ গায়েগতি পাঁকাল নাছের মত পিছলে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছেন আলিঙ্গন থেকে—আর চট করে বর্ধন রায়ের পিছনে চলে গিয়ে মারছেন তাঁকে দুই কিক্।

কিছুতেই আর গায়েগতিকে ছাড় করতে না পেরে বর্ধন রায় ছুটে চলে গেলেন মাঠের সীমানার বাইরে। সেখানে একটা গাছে বাঁধা সবুজপুষ্ট রাম ছাগল বসে বসে ঘাস চিবুচ্ছিল। গলার দড়ি ধরে টানতে টানতে সেটাকে নিয়ে এলেন মাঠে বর্ধন রায়। কী আশ্চর্য পাঁঠা! লে পাঁঠা, লে লে, বলে কুকুরের মত করে লেলিয়ে দিতেই সেটা গায়েগতির উপর ভেড়ে এলো সজোরে। শিংএর গুঁতো খেয়ে গায়েগতি চিংপাত হয়ে পড়লেন। ছাগলটা মহা উৎসাহে অগ্নদের গুঁতোতে ছুটলো।

আমার ঠিক সামনে লাইসম্যান অমূল্য ঘোষ। দেখে মনে হ'ল তিনি খুবই রেগে গিয়েছেন। চাকল্য ঘোষকে লক্ষ্য করে তিনি তাঁর পতাকাদণ্ডটা দিয়ে এক বা বসালেন। চাকল্য হারিয়ে চাকল্য ঘোষ মাথা ছুঁহাত দিয়ে ধরে মাঠে বসে পড়লেন। তৃপ্তির হাসি হেসে অমূল্য ইউনাইটেড ক্লাবের অন্য একজনের উপর পতাকাদণ্ড ব্যবহার করবার চেষ্টা করতে থাকলেন। হঠাৎ দেখি টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছেন চাকল্য ঘোষ। তিনি পাঞ্জাবীর পকেট থেকে টেনে বার করলেন মরক্কো বাঁধান মোটা একটা বই। ধীরে ধীরে অগ্নমন অমূল্য ঘোষের পিছনে হাজির হয়ে ছুঁহাতে বইটা ভুলে প্রাণপণ শক্তিতে তা আছড়ালেন অমূল্য ঘোষের ঠিক ব্রহ্মতালুতে। আঁক—শব্দ করে অমূল্য ঘোষ ভূমি শয্যা নিলেন। বইটাও ছিটকে পড়লো বেতার মঞ্চের ঠিক সামনে। মলাটের উপর বইটার নাম বড় বড় অক্ষরে লেখা—এখান থেকেই পড়া যায় বেশ। পড়লাম—‘গান্ধীজীর পত্রাবলী’।

যুদ্ধটা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠতে থাকলো। গদাই লঙ্করকে তাঁর গোঁফের অর্ধেক আর হলধর বোসকে তাঁর দাড়ির তিন চতুর্থাংশ হারাতে হ'ল। বর্ধন রায়ের পোষা পাঁঠার তেজালো চুঁতে কাত হলেন একান্ত বোস, অবোধ ব্যানাজি আর আরও কয়জন। যজ্ঞসেন ইঁট মেরে কালু মুখুন্ডের একটা উঁচু দাঁত পেড়ে ফেললেন। যুদ্ধের তীব্রতা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকলো। বুঝলাম, আমার মঞ্চবাস আর মোটেই নিরাপদ নয়।

• কোন পথ দিয়ে পালালে অক্ষত কলেবরে, সজ্ঞানে মাঠের বাইরে পৌঁছাতে পারবো তাই ঠাওর করার আশ্রয় চেষ্টা করছি এমন সময় আমার সমুখ দিকের দর্শক গ্যালারীর থেকে মিঠে গানের আওয়াজ ভেসে এলো। কীর্তনের সুর। তাকিয়ে দেখি—খোল করতাল সহযোগে গাইতে গাইতে একদল লোক মাঠে নামছেন। তাঁদের একজনের হাতে একটা পোষ্টার। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—শত শত পুষ্প—শত শত পথ।

তারা কীর্তন গাইতে গাইতে ঘুরতে থাকলেন মাঠের মধ্যে । কী আশ্চর্য ! যেখান দিয়ে তারা গান গেয়ে যান সেইখানেই থেমে যায় মুগ্ধ । এ যেন কোন মন্ত্রের শক্তিতে ঘটছে মনে হ'ল । ক্রমেই তারা এগিয়ে এলেন বেতার মঞ্চের দিকে । মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে জোরে জোরে গাইতে লাগলেন । কীর্তনের পদ কি ছিল তা বলতে পারবো না কিন্তু কীর্তনের ধূয়াটা পরিকার শুনতে পেলাম । বার বার নেচে নেচে সকলে মিলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ধূয়াটা গাইছিলেন তারা—কেরল কেরল বোল, কেরল কেরল বোল, কেরল কেরল বোল !

মাটিতে গায়েগতিকে চিৎ করে ফেলে তাঁর উপর চেপে বসেছিলেন বর্ধন রায় । গানের ধূয়ার আওয়াছ কানে যেতে তিনি সম্মোহিত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন গায়েগতিকে ছেড়ে । বর্ধন রায়ের খামচে ধরা কানটাও ছেড়ে দিলেন গায়েগতি । সব যোদ্ধাই কয়েক মিনিটের মধ্যে মুগ্ধত্যাগ করে শান্তমূর্তি ধারণ করলেন । বর্ধন রায় দাঁড়িয়ে উঠে গায়েগতির করমর্দন করে বললেন, 'ভেরী ভেরী সরি, মশলা খাবি ?' চিস্তিত মুখে গায়েগতি বললেন—'দাঁড়া ভেবে দেখি ।' মাঠের কোলাহল একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল ।

দৈবের কপায় প্রাণটা বেঁচে গেছে দেখে নিজের ভাগ্যের তারিফ করতে করতে ফিরে এলাম বাড়ী । তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে । অর্ধাঙ্গিনী রণমূর্তিতে তেড়ে এসে বললেন, 'এতক্ষণ কোথায় থাকা হয়েছিল শুনি । চাল কিনে না আনলে রাতের পিণ্ডি যে চড়বে না সে খেয়াল আছে ?' বলি আড্ডা দিয়ে বেড়ালেই কি থিদে মিটবে ?

আমি, স্থিত হেসে আমার সাধ্যমত সুর করে গাইলাম—

'কেরল কেরল বোল, কেরল কেরল বোল ।'

ধলভূম

প্রবন্ধ চট্টোপাধ্যায়

বিহারে সিংভূম জিলায় ধলভূম একটি মহকুমা। ধলভূমের আয়তন ১১৬০ বর্গ মাইল। সিংভূমে আরও দুইটি মহকুমা আছে—একটি হইল চাঁইবাঙ্গা বা সিংভূম সদর, অপরটির নাম সেরাইকেলা। বিহারের অপর্যাপ্ত অংশের সহিত ধলভূমের সংযোগ হইল উত্তরে মানভূম দিয়া, পশ্চিমে সেরাইকেলা আর ঈশ্বর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত চাঁইবাঙ্গা মহকুমা দিয়া।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এখনকার ভ্রাতৃ পূর্বেও সিংভূম এককভাবে বিহারের একটি সম্পূর্ণ জিলা হইলেও, তাহার দুইটি অঞ্চল চাঁইবাঙ্গা এবং ধলভূমের পরস্পরের সহিত পূর্বে বিহারের মধ্য দিয়া সরাসরি কোন সংযোগ ছিল না; মাঝখানে পড়িত সেরাইকেলা এবং তৎসংলগ্ন খারসোয়ান, এই দুইটি দেশীয় রাজ্য। দুইটি অঞ্চল ভৌগোলিক হিসাবে একেবারে অসংলগ্ন হইলেও কেবল তাহাদের দুইটিকে লইয়া একটি জিলা গঠনের একরূপ উদ্ভট দৃষ্টান্ত আর আছে কিনা সন্দেহ। স্বাধীনতা লাভের পর সেরাইকেলা আর খারসোয়ানকে মিলাইয়া সেরাইকেলা মহকুমা করিয়া বিহারে ঢুকান হইলে তবেই চাঁইবাঙ্গা সেরাইকেলা আর ধলভূম পাশাপাশি এই তিন মহকুমা দিয়া সিংভূমের বিধাবিভক্ত আকার বর্তমান মানচিত্রে একীভূত করিতে পারা গিয়াছে।

সিংভূম জিলা বিহারের ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত। বর্তমানে বিহারের বিভাগ হইলেও ছোটনাগপুর বরাবরই তাহা ছিল না। ১৯১২ সনে বিহার, ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যা লইয়া এক পৃথক প্রদেশ গঠিত হয়,—তৎপূর্বে বর্তমান বিহার রাজ্যের সমগ্র আয়তন বাঙ্গলাদেশের সহিত একত্র ছিল। ইংরাজ আমলের সেই বিরাট একত্রিত মিশ্রিত প্রদেশে বিহারের এমন কোন স্বতন্ত্র সংজ্ঞা বা অস্তিত্ব ছিল না যাহার দ্বারা বলা যাইতে পারে যে তৎকালে ছোটনাগপুর বিহার নামক কোন স্থানের অন্তর্গত ছিল। বরঞ্চ সমগ্র স্বহৃৎ প্রদেশকে বাঙ্গলাদেশ বলিয়াই ধরা হইত—প্রদেশের শাসনকর্তাকে বলা হইত লেফ্টেন্যান্ট গভর্নর অব বেঙ্গল বিহার কথাটির উল্লেখ তাহাতে ছিল না। এই হিসাবে ছোটনাগপুরকে তখন বিহারের বিভাগ না-বলিয়া প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গলার বিভাগ বলা যাইতে পারিত।

১৯১২ সনে পৃথক প্রদেশ গঠিত হইবার পরেও, ইংরাজ আমলে বরাবর—বর্তমানে যাহা বিহার রাজ্য, তাহাকে বিহার ও ছোটনাগপুর নামে অভিহিত করিয়া ছোটনাগপুরের একটি পৃথক সংজ্ঞা ও অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ছোটনাগপুর আর বিহারে প্রকৃতপক্ষে এক অঞ্চল অস্তিত্ব নাই—অনিবার্য ভাবে ছোটনাগপুর বিহারের অংশ নহে,—তাহা আসল বিহার নহে।

বর্তমান ছোটনাগপুর বিভাগের পূর্বাঞ্চল মানভূম ও ধলভূমের সহিত বিহারের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ আরও ক্ষীণ—১৯১০ সন পর্যন্ত মানভূম ও ধলভূমের আইন আদালত বাঁকুড়া জিলার এলাকায় ছিল।

সুবর্ণরেখা নদীর উপত্যকাভূমি ধলভূম। উত্তরে তাহার পর্বতশ্রেণী, দক্ষিণে তাহার ক্রক টিলা বা ক্ষুদ্র গিরিকন্দর খচিত উচ্চভূমি—মাঝখান দিয়া বাঙ্গলাদেশেরই সমতলভূমি প্রসারিত হইয়া ধলভূমের সমভূমি গঠন করিয়াছে। এই সমভূমি পশ্চিমে অতি ধীরে উন্নত হইয়া ক্রমে ছোটনাগপুর মালভূমি বা প্লেটোতে মিশিয়া গিয়াছে। ধলভূমের বাহিরে টাইবাসা হইতে এই উচ্চভূমি উত্তরোত্তর প্রখর হইয়া উঠিয়াছে—দেশভূমিকে তখন আর বাঙ্গলাদেশের সমতট বলিয়া আখ্যাত করিবার উপায় নাই।

অকস্ফোর্ড প্রাকৃতিক মানচিত্রেও তাই সুবর্ণরেখার দুইকূলে ধলভূম সমভূমিকে, এমন-কি জামসেদপুর ছাড়াইয়া সেরাইকেলার এক বৃহৎ অংশকে পার্শ্ববর্তী মেদিনীপুরের সহিত একরঙে চিত্রিত করিয়া দেখান হইয়াছে।

অতএব, মানভূম লইয়া বিহারের ছোটনাগপুর বিভাগ আর কেবল হাজারীবাগ, রাঁচী, পালামৌ লইয়া প্রকৃতিগঠিত ছোটনাগপুর অধিত্যকা এক নহে—কুটনীতির স্বার্থে ধলভূম এক্ষণে বিহারের ছোটনাগপুর বিভাগের ভিতর পড়িলেও স্বাভাবিক নিয়মে তাহা ছোটনাগপুর মালভূমির কিংবা অধিত্যকার অন্তর্গত নহে।

ধলভূম প্রভুতরূপে খনিজ এবং বনসম্পদের অধিকারী। কর্ষণযোগ্য জমিও সেখানে সুপ্রচুর, লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি সেখানে অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছে—আবাদ করিলেই হয়। স্থানীয় আবহাওয়া এবং জলবায়ুও ধলভূমে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর।

ধলভূমে গ্রাম্যজীবিকা প্রধানত চাষআবাদের উপরেই নির্ভর করে। তাহার পল্লীসমৃদ্ধির সম্ভাবনা পার্শ্ববর্তী মেদিনীপুর এবং মানভূম জিলার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিহারের পূর্বসীমান্তবর্তী স্থানগুলির আর্থিক উন্নতির জন্য বিহার গভর্নমেন্ট বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করে নাই, বিশেষত মানভূম ও ধলভূমের গ্রাম্যঅঞ্চল অল্পমত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ আছে। এই সব জায়গা প্রধানত নদী উপত্যকার দেশ—দেশের শিল্পগঠনের জন্য চাই নদী-নিয়ন্ত্রণ, নদনদীর উপর বিরাট বাধের পরিকল্পনা। ইহা ছাড়া এখানে আর্থিক উন্নতি সম্ভব নহে; এখন স্থানীয় নদী-নিয়ন্ত্রণ ব্যয়সাধ্যও বটে, বৃহৎ স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষ না হইলে এ-পরিকল্পনা ফলপ্রসূ নহে—আবার ইহাতে বিহারের সমগ্রভাবে তেমন উপকার নাই উপকৃত হইবে বিহারের পূর্বসীমানায় অবস্থিত কয়েকটি অঞ্চল মাত্র। আর মুখ্যত উপকৃত হইবে কে? পশ্চিমবঙ্গ, কারণ পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ নদীরই উৎসস্থান বিহারের ভিতরে, কাজেই উৎসস্থলে নদী নিয়ন্ত্রিত হইলে বন্যাপ্লাবন আবার অপরপক্ষে সাময়িক জলাভাব, এই দুইপ্রকার বিপর্যয় হইতেই পশ্চিমবঙ্গ বহুলাংশে বাঁচিয়া যায়। আসল লাভ হইবে পশ্চিমবঙ্গের, এই সম্ভাবনায় বিহার গভর্নমেন্টকে ব্যয়সাধ্য কোন পরিকল্পনায় নামায় কাহার সাধ্য।

ধলভূমের অধিবাসীরা যে উপভাষায় কথা বলে, সেই উপভাষাতেই কথা বলে উত্তরপশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমের সাধারণ মানুষ।

ধলভূমে বাংলা সাল ও পঞ্জিকা প্রচলিত এবং পাল পার্বণ উৎসবাদিও মেদিনীপুর এবং মানভূমে যে-রকম হয় অবিকল সেইরকম। ছট, ফাগুয়া, রামনবমী, মহাবীর

ঝাণ্ডা প্রভৃতি উৎসবের নানগন্ধও এখানে নাই ; পরিবর্তে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, মনসাপূজা, টুঙ্গপূজা, হরিনাম সংকীর্তন, পৌষপার্বণ প্রভৃতি বাঙ্গলাদেশের ও বাঙ্গালী সংস্কৃতিরই পরিচয় বহন করে। পল্লীগীতি, লোকনৃত্য, যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা, রাখাক্ষের বিরহ ও মিলন লীলা-বিষয়ক সংকীর্তন সকলই হুবহু বাঙ্গলাদেশের প্রতিচ্ছবি। লোকাচার এবং ঐতিহ্যের দিক দিয়া—যে-দিক দিয়াই দেখা যাক না কেন, ধলভূমে বাঙ্গালী ভাবেরই অবিসংবাদী আধিপত্য। বিবাহ-পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গলাদেশের—সেই শঙ্খধ্বনি আর উলুধ্বনিমুখরিত বিবাহপ্রদ্বন, জীয়াচার, কুশণ্ডিকা—যেমন বাঙ্গলাদেশের হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহে সচরাচর দেখা যায় ;—হিন্দুস্থানীদের ন্যায় ঢোল বাজানোর আধিক্য এখানে নাই।

বিশেষ করিয়া মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা এবং সারা মানভূমের সহিত ধলভূমবাসিগণের আত্মীয়তা।

আত্মারে পরিচ্ছদে, শুচি-অশুচি বিচারে সমগ্র ধলভূমবাসীদের মধ্যে বাঙ্গালীরানা অত্যন্ত স্পষ্ট। সে-দেশের রন্ধনের বিশেষত্ব, সেখানে পুরুষদের ভিতর ধুতী পরার রকম, নারীদের কেশবিহীন, সাতী পরার প্রণালী, পরস্পরের মধ্যে অভিবাদনের কায়দা—সবেতেই একটি-বিশিষ্ট বাঙ্গালীয়ানার ছাপ রহিয়াছে। দিবস শেষে গৃহস্থবধু তুলসীতলায় ধূনা সহকারে সাক্ষ্যপ্রদীপ জ্বালাইয়া প্রণাম করিতেছে এ চিত্র বাঙ্গলাদেশের ন্যায় ধলভূমেরও বৈশিষ্ট্য। তুলসীদাসের রামায়ণের পরিবর্তে সেখানে কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরামদাসের মহাভারত সমাদৃত। জাতিতে ও বংশে, আচারে-ব্যবহারে, ভাষায়-সংস্কৃতিতে, অশনে-ব্যসনে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রাপদ্ধতিতে প্রকৃত বিহারের সহিত ধলভূমের কোন মিল নাই ত বটেই—সিংভূমের অপর মহকুমা চাঁইবাঙ্গা হইতেও ধলভূমের যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, ইহা পূর্বে সরকারীভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। ১

এ প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দেখান হইয়াছে যে ধলভূম চাঁইবাঙ্গা লইয়া জিলা গঠন প্রথম হইতে অস্বাভাবিক হইয়াছিল।

ধলভূমের অধিবাসীরা হিন্দুস্থানীদিগের চাইতে বাঙ্গালীদের সহিত ঢের বেশি ঘনিষ্ঠ ; হিন্দী অপেক্ষা বাঙ্গলাভাষাই তাহাদের শীঘ্র এবং সহজে আয়ত্ত হয়। নরনারী নিবিশেষে তাহারা অন্তঃস্থদিগের সহিত বাঙ্গলাভাষায় কথা বলিতেই অভ্যস্ত। বাঙ্গলা ভাষাই তাহাদের অন্ততম দ্বিতীয় ভাষা। রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের নিকট যখন ধলভূমের প্রতিনিধিবর্গ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তখন তাহাদের মধ্যে সাঁওতালী সদস্তগণ এইকথাই প্রমাণিত করিয়াছিলেন। তাহারা সাঁওতালী ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি বাহির করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে সকল পুস্তকই বাংলা অক্ষরে লিখিত এবং সে-সমস্ততে টীকা টিপ্পনি ব্যাখ্যাও সব বাংলা ভাষায়।

ধলভূম প্রতিনিধিদের স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে, ধলভূমের অধিবাসীরা বাঙ্গলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার এবং পূজাপার্বণ উৎসবদিগের বেশির ভাগ গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে আবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে বাঙ্গলাদেশের দায়ভাগ আইন স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

আদিবাসিগণের ভিতর সাঁওতাল ও ভূমিজগণ বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালীদের

চালচলন বহু পরিমাণে স্বকীয় করিয়া ফেলিয়াছে। কিছু বৎসর এইপ্রকার চলিলে সাধারণ বাঙ্গালী আর ইহাদের ভিতর বিশেষ কিছু প্রভেদ থাকিবে না।

ধলভূমের আর এক শ্রেণীর অধিবাসী কুমী অথবা কুমীকত্রিয়দের সম্বন্ধে বহু অবাঙ্গালীর এক সংস্কার আছে—তাহা তাহাদের মাহাতো পদবী হইতে উদ্ভূত। ইহারা মনে করেন, যেহেতু মাহাতো—তাহারা মূলত হিন্দুস্থানী হইবেই, বাঙ্গালী হইতেই পারে না। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

কুমী সম্প্রদায় কেবল ধলভূম মানভূমে নহে, সারা ভারতে ছড়াইয়া রহিয়াছে। উহাদের সংখ্যা অন্যান্য ৫ কোটি। যেমন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসম্প্রদায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বসবাস করে, সেইরূপ কুমীরাও বাঙ্গালী, বিহারী, মারাঠী হইয়াও জাতিতে কুমী। বীরভূম, মেদিনীপুর এমন কি বাঙ্গলাদেশের একেবারে ভিতরের জিলাগুলিতেও কুমীকত্রিয় কম নাই। ধলভূমের কুমীরা বিহারী কুমী নহে। পাটনা, গয়া ইত্যাদি স্থানেও কুমী মাহাতো আছে—তাহারাই প্রকৃত বিহারী কুমী। তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, রাঁচি হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থানের কুমী হইতেও ধলভূমের কুমীরা স্পষ্টত বহুল পরিমাণে ভিন্ন যেমন বাঙ্গালী কায়স্থ, পাণ্ডাবী কায়স্থ ও বিহারের কায়স্থ (লালা কায়স্থ)—ইহারা পরস্পরে এক নহে।

বিহারে কিন্তু গত ১৯৫১ সনের লোক গণনায় ধলভূমের কুমীগণকে কুমালী ভাষায় কথা কহে, এই মিথ্যা অজুহাতে হিন্দীভাষীর পর্যায়ে দেখান হইয়াছে। কুমালী ভাষা নাকি অনেকটা হিন্দীভাষার অনুরূপ এবং কুমালীভাষাভাষীগণ নাকি হিন্দীভাষী বলিয়া পরিগণিত হইতে আগ্রহশীল। ধলভূমের কুমীগণের সম্বন্ধে ইত্যাকার ধারণা যে কতদূর অসত্য—অধিক কথার প্রয়োজন নাই—তাহা কুমী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকসেবক দলের শ্রীভদ্রহরি মাহাতোর দিল্লীতে লোকসভার নির্বাচন হইতে বুঝা যায়। শ্রীভদ্রহরি মাহাতো দক্ষিণ মানভূম ও ধলভূম লোকসভা নির্বাচনী কেন্দ্র হইতে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হন ১৯৫২ সনে, অর্থাৎ ১৯৫১ সনের সেন্সাস গ্রহণের পরে। ইনি বাংলা ভাষাভাষী এবং বাংলা ভাষার ক্ষুদ্র বিহার গভর্নমেন্টের অধীনে মানভূম ধলভূমে বাঙ্গালী-দের শ্রাব্য অধিকার সাব্যস্তের জন্য, বাংলা টুন্স গানে মানভূমে বাঙ্গালীর লোকাচার বজায় রাখিয়া তাহার আশ্চর্য্যজনক উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ইহার নির্বাচনবরণ ও ত্যাগস্বীকার সর্বজনবিদিত।

বাঙ্গলাদেশের অন্যান্য স্থানের শ্রায় ধলভূমেও ভূমিব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত ছিল। ধলভূমের ভূমিব্যবস্থায় বঙ্গদেশীয় বৈশিষ্ট্য একমাত্র ইহাই নহে। ১৯০৪ সন হইতে ১৯০৭ সন অবধি বিহারসরকার ধলভূমে ভূমির পরিমাণ, ভূস্বত্ব, রাজস্ব এবং জমিদারকে দেয় খাজনা ইত্যাদি বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতে এক ব্যাপক ভূমিজরীপ এবং স্বত্ব লিপিবদ্ধর কার্য করাইয়াছিলেন। তাহাতে জমির স্বত্বের যে তালিকা ও লিখিত পরিমাণ বিভিন্ন মানচিত্রসহকারে প্রস্তুত হইয়াছিল, সে-সমস্তই বাংলাভাষায় বাংলাঅক্ষরে লিখিত। ভূমিস্বত্বের আনুপূর্বিক বিবরণ অথবা পরচা ধলভূমে বাংলাভাষাতেই লিখিত হয়। যে-সমস্ত দলিলপত্র সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে তাহা সমস্তই বাংলায়। ধলভূমে দলিলপত্র সাধারণতঃ বাংলাভাষাতেই

লিখিত হয় ; সনদ, পত্নী আদি সমস্তই বাংলাভাষাতে । বনসংরক্ষণের জন্য বিহারে যে-আইন আছে, তদনুসারে নোটিশ কিংবা বিজ্ঞপ্তি ১৯৪৮ সন অবধি বাংলা ভাষাতেই হইয়া আসিয়াছে । সম্প্রতি বিহারসরকার এ-বিষয়ে অনেকটা অবহিত এবং তৎপর হইয়াছে এবং বাংলাভাষার চলন নানাভাবে বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে । ধলভূমে আদালতে বাংলাভাষাই ছিল আদালতের ভাষা । ১৯৩৪ সন অবধি বাংলা ভাষার আধিপত্য ছিল সেখানে অবিসংবাদিত ; অন্য ভাষার স্থান সেখানে ছিল না । ১৯৩৪ সনে বিকল্প হিসাবে হিন্দী ভাষা সেখানে স্থান পাইল, কিন্তু সে-বিকল্পের ব্যবহার অল্পকালেই হইত । ১৯৪৮ সন হইতে হঠাৎ জোর করিয়া বিহার সরকার ধলভূমে আদালতের ভাষা হইতে বাংলাকে স্থানচ্যুত করিল । আদালতের কার্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিষেধ হইয়া গেল । বহু চেষ্টাতেও কিন্তু বাংলাভাষাকে সরকারী কার্যকলাপ হইতে একেবারে বাদ দিতে পারা যায় নাই—১৯৫১-৫২ সনে একমাত্র জামশেদপুর বাদে, ধলভূম নির্বাচনমণ্ডলীর তালিকা (ভোটারস্ লিষ্ট) সরকার কর্তৃক বাংলাভাষায় প্রকাশ করিতে হইয়াছে ।

বাঙ্গালীঅধিবাসীর সংখ্যাধিক্য ধলভূমে কিন্তু বেশি দিন থাকিবে কিনা সন্দেহ— ভাষাগতপ্রদেশ আন্দোলন প্রতিহত করিবার জন্য বিহার সরকার বহুদিন হইতেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে । বাঙ্গালীবিদ্বেষ প্রচারে উৎসাহদানের অন্ত নাই । রাশি রাশি সরকারী ও বেসরকারী অর্থ বিহারীদের মধ্যে প্রাদেশিকতা এবং বঙ্গ ও উড়িষ্যা বিদ্বেষ বন্ধমূল করিয়া দিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে । শত শত দৃষ্টান্ত আছে যে, বিহারের কংগ্রেসী সরকার বাঙ্গালীদের প্রতি ভীতিমূলক আদেশ ও নির্দেশ জাহির করিয়াছে, এমন কি গুণাধীর প্রশ্রয় দিয়াছে । উপস্থিত এমন একটি উত্তেজনাময় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে যে আশঙ্কা হয় যে বিহার বাংলা অঞ্চল প্রদেশান্তর আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর বাকি যে-সকল বাঙ্গালীঅঞ্চল বিহারে থাকিবে, তাহাদের আর রক্ষা নাই । বিহারী স্বিতস্বাধীদের প্ররোচনায় এবং বিহারের কংগ্রেসী সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনের ফলে অসহায় পাইয়া বাঙ্গালীদের প্রতি মুখ দেহাতীরা উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত হইয়া হিংসারূপ কার্যকলাপ অবধি বাদ দিবে না ; গুণাধীর অত্যাচারে হতাশ হইয়া হয়ত ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীরা ধলভূমের বাস উঠাইতে বাধ্য হইবে ।

একেই ত ১৯৫১ সনের লোক গণনায় অন্তায় করিয়া, বিহারের দক্ষিণে ও পূর্বে সীমান্ত অঞ্চলে অবিহারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম করিয়া দেখান হইয়াছে যাহাতে বিহারের সীমান্তঅঞ্চলগুলি অবিহারী অধ্যুষিত হইয়াও বিহারে বজায় থাকে ; তাহার পর অত্যাচার ও অবিচারে ধলভূম হইতে যদি বহু বাঙ্গালী বিদায় লয়, তখন সত্যিই বিহার সরকারের ও সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন বিহারী নেতৃবর্গের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে । অনায়াসে তাহারা পরবর্তী আদমশুমারীতে প্রচার করিয়া দিবে যে ধলভূমে বঙ্গভাষীর সংখ্যা নিতান্তই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর এবং ইহার ফলে ধলভূম কায়েমীভাবে বিহারে রহিয়া যাইবে । বিহার অঞ্চল প্রদেশান্তর বিল আলোচনার শেষে পণ্ডিত পন্থ যে-স্পর্কায় লোকসভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে বিহার হইতে দেশাংশ

কর্তন ভাবীকালে আর কখনই করা হইবে না ; তাহা ভবিষ্যতের এই সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়া কিনা কে জানে ।

ইহা প্রায় সর্বজনবিদিত যে বিগত সেন্সাসে বিহার সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত বিহারসীমান্তের পরিসংখ্যা গ্রহণযোগ্য বা স্বীকারযোগ্য নহে । সেন্সাসের বহু সংখ্যক স্লিপ পাটনা সরকারী দপ্তরে হারাইয়া গেল ; তাহাদের পরিবর্তে বিহার সরকার যাহার উপর নির্ভর করিয়াছে তাহা বিহারীদের সুবিধাশ্রয়ী করণা, প্রকৃত তথ্য নহে । অতএব সঠিক বিবরণ অবগত হইবার পক্ষে কেবল ১৯৫১ সনের সেন্সাস যথেষ্ট নহে ; তাহাকে আগেকার সেন্সাস হইতে আহৃত মালমশলা দ্বারা যাচাই করিয়া লওয়া দরকার । পূর্বেকার সেন্সাস সকলের ভিতর আবার ১৯৪১ সনের সেন্সাসে ভাষা অনুযায়ী লোকসংখ্যার বিবরণ নাই ।

১৯৩১ সনের লোকগণনা অনুযায়ী ধলভূমে মোট লোকসংখ্যা ছিল ৩,৯৪,৫৯৫ ; মাতৃভাষা যাহাদের বাংলা তাহাদের সংখ্যা ১,৪১,১০৫ (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৫.৭), হিন্দীভাষীর সংখ্যা ৪৯,৬২৪ (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২.৭) এবং আদিবাসীদের মোট সংখ্যা ছিল ১,৪১,০১০ (অর্থাৎ বাদ্দালীদের চাইতে ৯৫ জন কম) । আদিবাসীদিগের মধ্যে আবার ৬৪,০১০ ব্যক্তির অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে শতকরা ৪৬ জনের নিজ নিজ মাতৃভাষা ছাড়া শতকরা ৪০ জনের অর্থাৎ ১৭,৪৭৭ জনের দ্বিতীয় ভাষা ছিল বাংলা এবং হিন্দীভাষীদের মধ্যেও ধলভূমে ২,৬৯৪ জন তাহাদের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল । ধলভূমের বাদ্দালীদের সংখ্যার সহিত বাংলা যাহাদের দ্বিতীয় ভাষা ছিল তাহাদের সংখ্যা যোগ করিলে বাংলাভাষা ব্যবহারকম ফলত বাংলাভাষীদের মোট সংখ্যা দাঁড়াইত ২,২৫,৬৯০ অর্থাৎ ধলভূমবাসিগণের মোট সংখ্যার শতকরা অনূ্যন ৫৭ জন । আদিবাসীরা খুব কম লোকেই হিন্দি জানিত—সাঁওতাল ও ভূমিজদিগের মধ্যে সব ধরিয়া ১০০ জনও হিন্দি জানিত কিনা সন্দেহ ; বরং সাঁওতাল ও ভূমিজগণের মধ্যে কিছু কম ৭০০০ জনের দ্বিতীয় ভাষা ওড়িয়া ভাষা বলা যাইতে পারিত ।

১৯৫১ সনে বিস্তর কোশলে হিসাবে কারচুপি সবেও ধলভূমে বাদ্দালীদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১,৮৫,৮৩২ অর্থাৎ মোট লোকসংখ্যার (৬,০৪,০৭০) শতকরা ৩০.৮ জন । হিন্দিভাষীর সংখ্যা অনেক বাড়াইয়া দেখান হইয়াছে । ১,২৫,১০৮ ; তাহা হইলেও তাহা বড় জোর শতকরা ২১.৩ জন । ওড়িাদের সংখ্যা হইয়াছে ১,২৮,৪৯২—শতকরা ২.১.৩ । সাঁওতালীরা প্রায় সকলেই বাংলা বলে—তাহাদের সংখ্যা করা হইয়াছে ১,০৫,৫৮৬ অর্থাৎ শতকরা ১৭.৪ । বিহার সরকার দ্বারা ১৯৫৪ সনে প্রকাশিত ‘ফ্যাক্টস্ এণ্ড ফিগারস্ এবাবুট বিহার’ দ্রষ্টব্য ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে যেমন ১৯৩১ সনে বাংলাভাষীদিগকে অবিসংবাদিত রূপে ধলভূমে সংখ্যাগুরু বলা যাইত—এখন বিহার সরকারের কুটচক্রে প্রস্তুত সেন্সাসে যদি তাহা বলা নাও যায়, তথাপি ইহা অতি স্পষ্ট যে ধলভূমে বাদ্দালীর সংখ্যা যত অল্প কোনো ভাষাভাষীর সংখ্যা তত নহে ।

ধলভূমের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে প্রসিদ্ধ জামসেদপুর শহর স্থাপিত । জামসেদপুর

শহরের মোট জনসংখ্যা ১,৯৪,৯৯০ ; তাহার মধ্যে খাঁটি বাঙ্গালীর সংখ্যা ৫৪,৭৬২ । যাহারা হিন্দিভাষী তাহাদের মধ্যে বিস্তর লোক জামসেদপুরে অস্থায়ী বাসিন্দা মাত্র ; ইহা ছাড়া তাহারা সকলে যে বিহারী তাহাও নহে—অধিকাংশই উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি হইতে আগিয়াছে । এই সব কথা না-ধরিয়াও সমগ্র হিসাবে হিন্দিভাষীদের সংখ্যা জামসেদপুরে ৪২,২৪০—তাহার বেশি নহে । হিন্দিভাষীদের ভিতর হইতে খাঁটি বিহারী হিন্দুস্থানীদের খুঁজিয়া বাহির করিলে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩,২৪০ অর্থাৎ জামসেদপুরের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮ আটজন মাত্র । ১৯৫১ সনের সেন্সাস অনুসারে জামসেদপুর টাউন কমিটি রিপোর্ট দ্রষ্টব্য ।

দেখা যাইতেছে, জামসেদপুরেও বাঙ্গালীদের সংখ্যা যে কোনও অন্য সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা হইতে অধিক । আর যদি বাংলাভাষী ভূমি ও যুগাদের বাঙ্গালীদের অন্তর্গত করিয়া হিসাব করা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীদের সংখ্যা অনায়াসে শতকরা ৩৭ জনে দাঁড়ায় ।

জামসেদপুরে বাঙ্গালীর সংখ্যাধিক্য সেখানে স্কুলপাঠী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বিশ্লেষণ করিলে বেশ উপলব্ধি হয় । ১৯৫৩-৫৪ সনে হিন্দীর মাধ্যমে সেখানে শিক্ষা পাইত ১০,০৬৪ জন ছাত্রছাত্রী এবং ইহাদের মধ্যে আবার স্বাভাবিক হিন্দীভাষী ছাড়া গুজরাটী, মাজোরাড়ী, পঞ্জাবী ইত্যাদি উত্তর পশ্চিম ভারতের অনেকে ছিল ; অপরপক্ষে বাংলা মাধ্যম ভদ্রদেশীয় ব্যবস্থায় বাঙ্গালী ছাড়া আর কাহারো সম্ভব নহে—এক্ষেত্রে সেখানে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ১২,৫০০ ।

১৯৩১ সনে কিন্তু জামসেদপুরে হিন্দীভাষীদের সংখ্যা-প্রাচুর্য ছিল । জামসেদপুরে জনসংখ্যা তখন ৯২,৪৫৯ ; তাহার মধ্যে হিন্দীভাষী ছিল ৪২,৭৮৭ বাঙ্গালীদের সংখ্যা যেখানে, ১৮,৭১৭ । পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা ১৯৫২ সনের আগষ্ট মাসে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৫ সনের ডিসেম্বর মাসে কেন-যে জামসেদপুর শহরটি বিহারকে ছাড়িয়া দিয়া কেবল বিহারের অন্যান্য বাঙ্গালীপ্রধান সীমান্তঅঞ্চল দাবী করিয়াছিল, এই তথ্য হইতে তাহার ঋনিকটা যৌক্তিকতা পাওয়া যায় ।

১৯৩১ এর সেন্সাস অনুযায়ী জামসেদপুর বাদ দিলে ধলভূমের অবস্থা দেখায় এইরূপ :

মোট জনসংখ্যা	হিন্দীভাষী	বাঙ্গালী	সাঁওতালী	ওড়িয়া
৩,১০,৮৫৭	১২,৯০২	১,২৩,৩৩৭	৯৬,৫৫৫	৩৫,৮৪৯
হো	যুগরী	ভূমি		
৬,৮৫১	৬,৭৫৬	২২,৫২১		

১৯৫১ সনে শতকরা হিসাবে পরিসংখ্যা নিম্নরূপ :

হিন্দীভাষী ৪.১, বাঙ্গালী ৩৯.৬, ওড়িয়া ১১.৫, হো ২.২ ।

১৯৩১ সনে জামসেদপুরে হিন্দুস্থানীদের যে-সংখ্যাধিক্য, সে-সংখ্যাধিক্য কি স্থায়ী হিন্দুস্থানী বাসিন্দাদের ? তাহা নহে,—জামসেদপুরে শিল্পসংস্থানসমূহে কর্মের

জন্ম একটি বৃহৎ অস্থায়ী লোকের ভিড় জামসেদপুরে বসবাস করে। বহু লোক যাইতেছে, বহুলোক আসিতেছে, এইরূপ চলমান জনতার মধ্যে ১৯৩১ সনে হিন্দুস্থানীর সংখ্যাই সর্বাধিক বেশি ছিল। সেই হিন্দুস্থানীরা যে কেবল বিহার হইতেই আসিয়াছিল এমন নহে; তাহারা সর্বত্র হইতে আসিয়াছিল—তাহাদের মধ্যে উত্তর এবং মধ্য প্রদেশের লোক অগণিত সংখ্যায় ত ছিলই, পঞ্জাবী ও রাজস্থানীরাও সেই হিন্দুস্থানী-দিগের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তাহার পর, যাহারা তাহাদের মধ্যেও অবিহারীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশি ছিল,—অবিহারী, কারণ মূলত তাহারাও বিহারের বাহিরে অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগন্তুক মাত্র এবং বিহারের চলতি কোন ভাষাই—কি মৈথিলী, কি ভোজপুরী অথবা কি মগধী, কোনটিই তাহাদের নিজস্ব নহে।

এইমাত্র বলিয়াছি যে জামসেদপুরে হিন্দুস্থানী জনসংখ্যার একটি অতি বৃহৎ ভাগ অস্থায়ী। সমগ্র অস্থায়ী জনসংখ্যার ভিতরে যে হিন্দুস্থানীরাই বেশি তাহা নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি হইতে বুঝা যায় :

১৯৫১ সনের সেন্সাস
সিংভূমে আগন্তুক জনসংখ্যা।

পার্ববর্তী প্রদেশ	মোট সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
বাংলাদেশ হইতে	২৭২৫৩	১৩১৫১	১৪১০২
উত্তরপ্রদেশ "	১২৫৪৩	৮৮০০	৩৭৪৩
মধ্যপ্রদেশ "	১৭৯৭৭	৮৮২০	৯১৫৭
উড়িষ্যা "	৩১০৮৩	১৫৬৭৩	১৫৪১০
দূরবর্তী প্রদেশ			
পঞ্জাব হইতে	৮৫১১	৫২৩৮	৩২৭৭
রাজস্থান "	২৭৭২	২০৫১	৭২১
অন্ধ্রা " "	৩০৫০৬	১৮২৪৫	১২২৬১
বাংলাভাষী সীমান্ত অঞ্চল বাদে বিহারের অন্যান্য স্থান হইতে	২৬৫৮৫	১৪৯৫২	৮৬২৮

দেখা যাতেছে যে বাংলা এবং উড়িষ্যা হইতে স্ত্রীপুরুষ প্রায় সমান অনুপাতে আসিয়াছে। অপরপক্ষে উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, রাজস্থান হইতে আগন্তুকসমূহ, যাহারা প্রায়শই হিন্দীভাষী বলিয়া কথিত ও পরিগণিত হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প। যাহারা পরিবার লইয়া কোন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আসে, তাহারা পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণকে সঙ্গে লইয়া আসে। আর যাহারা কেবল মাত্র কিছু উপার্জনের তাগিদে আসে, তাহারা সাময়িকভাবে থাকিয়া, কিছু উপার্জন করিয়া বৎসর বৎসর বা নিয়মিত সময়ে তাহাদের নিজ প্রাণে ফিরিয়া যায়, ছুটি এবং বিশ্রামের সময় স্থায়ী প্রদেশে কাটায়। নিজ নিজ পরিবারকে কর্মস্থানে আনিবার যথেষ্ট প্রয়োজন তাহাদের নাই। যখন একেবারে অবসর গ্রহণ করিবার সময় আসে তখন উপাধিত

অর্থসামগ্রী লইয়া শেষবারের মত তাহারা স্বপ্নামে ফিরিয়া যায়। ইহারা হইল অস্থায়ী জনসমষ্টি, ইহাদের মন পড়িয়া আছে যে সকল গ্রাম ও প্রদেশ তাহারা ছাড়িয়া আসিয়াছে এবং যেখানে তাহারা আবার ফিরিয়া যাইবে, সেইস্থানের প্রতি। উপরিলিখিত অল্প সমূহ হইতে বুঝা যাইতেছে যে বাকলা এবং উড়িষ্যা হইতে তাহারা সিংভূমে আসিয়াছে, তাহাদিগকে অস্থায়ী জনমণ্ডলী তালিকায় ঠেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে না—স্রীলোকের সংখ্যা তাহাদের মধ্যে এক বড় অংশ—স্রীপরিবার লইয়া সাধারণত তাহারা সিংভূমে বসবাস করিতে আসিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। অপরপক্ষে হিন্দিভাষীর দলে স্রীলোকের সংখ্যা অনুপাতে অল্প,— ইহারাই অস্থায়ী জনমণ্ডলী। মধ্যপ্রদেশ হইতে আসে বেশীর ভাগ আদিবাসী— তাহারা স্রী কন্যা লইয়া আসে স্থায়ীভাবে থাকিবার জন্য—কিন্তু তাহাদের হিন্দিভাষী বলা যায় না।

বিহারের সেন্সাসে বিভিন্ন ভাষাভাষীদিগের গণনার সময় কিন্তু অস্থায়ী সাময়িক-ভাবে আগত জনসমূহ নিবিচারে গণনার অন্তর্গত হইয়াছিল (বিহার সেন্সাস ১৯৫১, দ্বিতীয় খণ্ড, টেবুলস) ১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য—হইয়া তাহারা নিজ নিজ ভাষাভাষীদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে বহু ক্ষেত্রে ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছে।

বিদেশে বা নিজ প্রদেশের বাহিরে অস্থায়ী বা ভাসমান জনগণের সাধারণত এমন কোনও স্বার্থসম্বন্ধ থাকে না যাহার জন্য তাহারা তাহাদের সাময়িক বাসস্থান যে প্রদেশে সেই প্রদেশের কল্যাণের নিমিত্ত উদ্গ্রীব বা উৎকণ্ঠিত থাকিবে। আমরা জানি শ্রীহট্ট ভারতে থাকিবে কি পাকিস্তানভুক্ত হইবে ইহা নির্ধারণের জন্য যখন ১৯৪৭ সনে শ্রীহটে গণভোটের আয়োজন হয়, তখন চা-বাগানসমূহের শ্রমিকগণকে ভোটের অধিকার দেওয়া হয় নাই কেবল এই কারণে যে, শ্রীহটে তাহারা ছিল অস্থায়ী অধিবাসী। অন্ততঃ কোন দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সময় তাহার অস্থায়ী অধিবাসীদিগকে গণনার মধ্যে ধরা হয় নাই, এইরূপ দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নহে। একটি দৃষ্টান্ত হইল যে রাজ্য পুনর্গঠন সমিতি যখন ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের সীমান্ত অঞ্চল সম্বন্ধে বিচার করিতেছিলেন, তখন সেখানকার ভাসমান জনতাকে একেবারে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন নাই। তবে কি জামসেদপুরের বেলায় পৃথক নিয়ম খাটিবে—জামসেদপুর শহরে হিন্দিভাষীরা যতই অস্থায়ী ও ভাসমান হউক না কেন—তাহাদের সংখ্যা গণনায় স্থায়ী জনমণ্ডলীর সহিত এক করিয়া সেখানকার বাঙ্গালীগণকে সংখ্যালঘু প্রতিপন্নের প্রয়াস করিতে হইবে?

একথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা অতি স্পষ্ট যে বিহারের বিগত সেন্সাসে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের যে সংখ্যা নির্ণয় হইয়াছে তাহা অবিহারিগণের দাবী ভুল করিবার জন্য একটি অপকৌশল মাত্র। সেন্সাসে যাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা আমরা যদি কিছু বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তাহা হইলে সেন্সাসে মিথ্যাচারের বহর যে কতখানি সে বিষয়ে কিছু ধারণা হইবে। রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির নিকট পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির স্মারকলিপিতে এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা রহিয়াছে।

১৯৩১ হইতে ১৯৫১ সনের মধ্যে :

সিংভূমের হিন্দিভাষিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি		
১১২৭৩ হইতে ২১৫৭৮৮ অর্ধাৎ	...	১২৪৫১৫
১৯৫১ সনে সিংভূমের সমগ্র জনসংখ্যা	...	১৪৮০৮১৬
ইহাদের মধ্যে সিংভূমে যাহাদের জন্ম	...	১২৮৮৪০৩
বাকি সিংভূমে আগন্তুক	...	১৯২৪১৩
বাদ, আগন্তুকদের মধ্যে—		
যাহারা বিদেশী, ভারতের বাহির হইতে আগত	...	২৬১৫৯
যাহাদের মাতৃভাষা বাংলা	...	৩৭০২৪
যাহাদের মাতৃভাষা ওড়িয়া	...	৩১০৮৩
যাহারা দাক্ষিণাত্যের লোক	...	১৩৭৯৮
		১০৮০৬৪
বাকি	...	৮৪৩৪৯

এই ৮৪৩৪৯ আগন্তুককে হিন্দিভাষী বলিয়া ধরিলে যে-সব হিন্দিভাষী বরাবর সিংভূমেই ছিল—সিংভূমে অনাগন্তুক হিন্দিভাষীর সংখ্যাবৃদ্ধি এইরূপ ঠাঁড়ায় :

সিংভূমে হিন্দিভাষিগণ

উপরোক্ত মোট সংখ্যা বৃদ্ধি	...	১২৪৫১৫
বাদ আগন্তুক	...	৮৪৩৪৯
বাকি অনাগন্তুকদের সংখ্যা বৃদ্ধি	...	৩৭০৪৭

অর্থাৎ ১৯৩১ সনে যে হিন্দিভাষীর সংখ্যা ১১২৭৩ ছিল, ২০ বৎসরে শতকরা ৪০.৯ হারে তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে এই সময়ে সমগ্র বিহারের জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ২৯এর বেশি নহে। ১৯৫১ সেন্সাস অনাগন্তুক মানে অবশ্যই যে স্থায়ী বাসিন্দা তাহা নহে ; অনাগন্তুক মানে সেন্সাসে হিসাবে অনাগন্তুক। ১৯৫১ সনের আগের আদমশুমারী ১৯৪১ সনে হইয়াছিল, যাহারা ১৯৪১ সনের পূর্বে সিংভূমে আসিয়া থাকিয়াছে—১৯৫১ সনে সিংভূমে বাসকালে তাহারাই অনাগন্তুকের পর্যায়ে গণ্য হইয়াছে। বহুসংখ্যক হিন্দিভাষী যদিও তাহারাই অনাগন্তুক, কেবল উপার্জনের আশায় পরিবারবিহীন হইয়া অস্থায়ীভাবে সিংভূমে বাস করিতেছে ; বৎসর বৎসর তাহারা নিজ নিজ জন্মস্থানে গমন করে। এতদ্ব্যতীত, বিশেষত যখন সিংভূমে হিন্দিভাষীদের মধ্যে জীলোকের সংখ্যা তুলনায় অতি অল্প, ২০ বৎসরে শতকরা ৪০.৯এর গুণ্য এত উচ্চহারে তাহাদের বংশবৃদ্ধি কিরূপে হইতে পারে ? স্বাগত্বকলমে কারসাজী ছাড়া ইহা সম্ভবে না। সিংভূমে হিন্দিভাষীদের সংখ্যা অসম্ভব রূপে ফাঁপাইয়া তোলা হইয়াছে—হয়ত মিথ্যা করিয়া বহু আদিবাসী হিন্দিভাষীরূপে গণিত হইয়াছে, কারণ সিংভূমে ১৯৫১ সনের সেন্সাসে আবার আদিবাসীর সংখ্যা অস্বাভাবিক নামিয়া গিয়াছে।

[৩৯০ পৃষ্ঠায় দেখুন]

আজকে রাতে

জীবনানন্দ দাশ

আজকে রাতে তোমায় আমার কাছে পেলো কথা
বলা যেত ; চারিদিকে হিঙ্গল শিরীষ নক্ষত্র হাস হাওয়ার প্রাস্তর ।
কিন্তু যেই নিট নিয়মে ভাবনা আবেগ ভাব
বিস্তৃত হয় বিষয় ও তার যুক্তির ভিতর ;—

আমিও সেই ফলাফলের ভিতরে থেকে গিয়ে
দেখেছি ভারত লণ্ডন রোম নিউইয়র্ক চীন
আজকে রাতের ইতিহাস ও যুত ম্যানথ সব
নিবিড় নিয়নাধীন ।

কোথায় তুমি রয়েছ কোন্ পাশার দান হাতে :
কি কাজ খুঁজে ; —সকল অহুশীলন ভালো নয় ;
গভীরভাবে ভেনেছি যেসব সকালবিকাল নদী নক্ষত্রকে
ভারি ভিতর প্রবীণ গল্প নিহিত হয়ে রয় ।

রচনাকাল : ১৯৪৫

[অশোকানন্দ দাশের সৌজন্যে]

দায়

প্রমোদ মিত্র

যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
নাগরিক। যক্ষ ও যক্ষিণী,
কঠিন শিলার গায়
স্তম্ভ লিপি বিলুপ্ত ভাষার,
সেখানে অনেক পলি জমে আছে
গাঢ় বিশ্বস্তির ;
বহু শতাব্দীর ঝুটি রোদ
ধুয়ে মুছে দিয়ে গেছে নগর উল্লাস ।

ক্রান্তপদ কোনো পর্ষটক
দূর গ্রামে আতিথ্য প্রত্যাশী
হয়ত ওখানে এসে
দৈবাৎ পেতেও পারে
ভাঙা এক টুকরো শিলালিপি,
শিলীভূত কামনার যত
উরসের অংশ কোনো মূর্ত অঙ্গরার ।

হয়ত প্রলুক হয়ে
স্বস্তিকার পরতে পরতে
এক একটি ভাঁজ খুলে তব্বয় উৎসাহে
নিমজ্জিত হতে চাবে একান্ত উৎসুক
প্রাণপ্রোঞ্জে লুপ্ত শতাব্দীর,
অকস্মাৎ চোখ ভুলে চায় যদি তবু
শব্দের তরঙ্গে ঘেরা দূর গ্রাম
পড়বে নাকি চোখে ;
সরোবরে ষট নিয়ে চলেছে যে জনপদবধু
আকাশ মুখর করে উড়ে যায় যে কটা শালিখ,
সে-মুহুর্তে আদিগন্ত প্রসারিত জীবনের মেলা—
সমস্ত অতীত তার ভগ্নাংশেরও দিতে পারে দায় ?

জার্নাল

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

। এক ।

পাহাড়ে মন্দির-স্মৃতি ছিল ।
নদীর ধীরে তাই হইনি নাবিক ।
নিঃসঙ্গতা যতো ব্যথা দিক
হোক তবু অবভেদী, প্রবতা-আসীন ।
নর্তকী, তোমার জন্মদিন
মনে আছে, ভুলি নাই তিল-ও ।

। দুই ।

ভুলে যাই যখন তোমাকে
শুধু ব্যর্থ আকুলতা থাকে
রক্তের ভেতর ।
কোনো জলে মিটেনা পিপাসা—
তুচ্ছ ভালোবাসা—
সময়ে কলঙ্ক করে ভর ।
আশা নেই, তবু স্মৃতি থাক—
বসন্ত যে ছিল মনে রাখুক বৈশাখ ।

। তিন ।

নিকষ তোমার মূর্তি রাখে ।
কী এমন ইতিহাস আছে
যা তোমার গায়ে মেখে আনব তোমাকে
আমার কথার ধুব কাছে ?
নেই স্মর যাতে তুমি রক্ত ছুঁয়ে যাবে ।
মৃত্যু হয়ে আছে তুমি মৃত্যুর স্বভাবে ।

উল্লাস

সরোজিনী নাইডু

হৃদয়, হে মোর হৃদয় ! আজিকে কুণ্ডে ও প্রান্তরে
বসন্ত জাগে ওই,
বিচিত্র সুরঝঙ্কারে আজ কোকিল ঘোষণা করে
প্রণয় হয়েছে জয়ী ।
জ্বাখো উজ্জ্বল নদী-ঝর্ণায় আলোকের ঝলকানি
সংগীতময় ধারা
নৃত্য-উছল ময়ূর দেহের চিত্রিত শোভাখানি,—
ছন্দে আপন-হারা ।

জীবনের এই অতি-অপরূপ সংগীতময় কণে
কী লাভ বিষাদ স্মরি'
হৃদয় ! এখন আনন্দময় ঋতু এল মাঠে বনে
নিয়ে কুল-মঞ্জরী ।
পাখীর গানের আনন্দটুকু, ঝর্ণার উল্লাস
কণ্ঠে জাগুক আজ,
সমুখে থাকুক অনেক অশ্রু, বেদনার হাহতান,
এখন যে ঋতুরাজ ।

অনুবাদ : অজিত দত্ত

যন্ত্রণায় দগ্ধ
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যন্ত্রণায় দগ্ধ বুক তার
অথচ শিশু সেখানে মুখ রাখে ।
করুণা করো । কঠিন বুক তার

যেন দিঘির শীতল চিস্তার
শির হয় । মধ্যরাতে তাকে
মস্ত আলো-ঝড়ের কুয়াশার

অগ্নেমের নরকে নিয়ে আর
যেও না । সে-যে শিশুর তৃষ্ণাকে
পাথর স্তনে দিয়েছে গঙ্গার

নিবিড় কোমলতার বিস্তার
স্বপ্ন, সাধ । নিশির বৈশাখে
ও'তলু ভূমি ক'রো না অঙ্গার ।

হঠাৎ ছুটি

জ্যোতির্ময় গদ্যোপাখ্যান

বাইরে আকাশ বুঝি মেঘে ভেঙে পড়ে
ঝিরঝিরে ঝুটিও ঝরে
রাস্তার থেকে লোক সরে ।

শ্রামলীর সারা পিঠে ধোলা কালোচুল
খুশির ভারেই নাকি কঁপে কঁপে ওঠে
আজ আর হবে না ইস্কুল

হঠাৎ স্কুলের ছুটি হবে—
টের কেউ পেয়েছিল আগে ?
সবাই বেঞ্চিতে বসে বাইরের দিকে চেয়েছিলো
শ্রামলী কি বেঁচে গেলো তবে !
এমন বর্ষার দিনে কার ভালো লাগে
পড়া না-পারার অপমান ?
(শ্রামলীর মনে হয় যত্নের সমান)
তাই বুঝি ছুটি পেয়েছিলো ।

বাইরে এমন খুশি ঝুটি আর জলে
ভেঙে কি থম্‌থমে হাওয়া ।
এ-ছপুর্নে সবকিছু যাক রসাতলে
কী ভালো হঠাৎ ছুটি-পাওয়া ।

এখন লাগে না ভালো বাড়ি
কি হবে বাড়িতে ছুটে সাত্‌ তাড়াতাড়ি ?
শ্রামলী পায় না ভেবে কি-করে কি-করে—
বাড়িতে এখন মা তো খিলএঁটে ঘরে
যুমেতে বেহঁস—আর ছোড়দি ? সে জানে
বারান্দার পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে সমানে—

গল্প করে একটানা এমনি হুপুরে—
ও বাড়ির অশোকাদি ভারি গোপ্পুড়ে :
শ্যামলী হঠাৎ হেসে ফেলে,
এতো কথা কোথা থেকে পায়
শুধু চুল বেঁধে নেবে মাঝে মাঝে পিঠে খুলে গেলে
তারপরে গল্প জুড়ে কোথায় হারায় ।

কেন তার আজ মনে হয়
নিরুদ্দেশ হয়ে-যাওয়া মন্দ কিছু নয়
এ-হুপুরে রেলচড়ে কোনো এক ছোট ইষ্টিশানে
নেমে পড়ে, তারপর ? তারপর, শুধু ভয়-ভয়
তার চেয়ে চের ভালো ফিরে-যাওয়া নোড়ের দোকানে
ওখানেই অরুণারা জমিয়েছে ভিড় নিশ্চয় ।

সহসা অবাক লাগে তার
রাস্তার ও-ফুটে দেখে ছোড়দি অশোকাদি আর
আর কারা—কারা সব দলবল নিয়ে
সামনে চলেছে এগিয়ে...

শ্যামলী চৈঁচিয়ে ওঠে—অশোকাদি—ও অশোকাদি
: কানে ওরা কালো নাকি ?
ইচ্ছে করে গলাছেড়ে কাঁদি ।

না, ওই শুনতে পেয়ে ছোড়দি পড়েছে কাঁড়িয়ে—
: সত্যি বাবা তুই ধন্টি মেয়ে ।
সারাদিন ইঙ্কুল পালিয়ে—
শ্যামলী চৈঁচিয়ে ওঠে ছোড়দির কথা চাপা দিয়ে
: বিশ্বাস না হয় তুমি
দেখে এসো ইঙ্কুলে গিয়ে ।

থেকে থেকে দিলো জোরে হাওয়া
শ্যামলীর চারিদিক কথা করে ওঠে সংগীতে
এমন অভকিতে
কি ভালো হঠাৎ ছুটি-পাওয়া ।

স্বপ্ন আর স্বপ্ন

গোবিন্দ চক্রবর্তী

এ ছোট পালঙ্কখানি

যেন কোন রহস্যের জাহাজ,
ছড়ানো-ছিটানো বই, চারিদিকে, স্মৃখে ও আগে—
মাঝখানে আমি শোওয়া
আর ভাল লাগে
খোলা জানালার পথে—নক্ষত্রের অক্ষুট আওয়াজ ।

কাছে আসে, কাছে আসে, নক্ষত্রেরা কাছে আসে
হৃদয় গল্পের তরে যেন—
বিস্ময়কর বাতাস প্রশ্ন করে শুধু : ‘কেন ?’
শাশিতে যবে মুখ—হিংসায়, ঘৃণায়—
‘পৃথিবীর লোক কেন অহেতুক স্বর্গে যেতে চায় ?’

কেমনে বোঝাই তাকে

—তারারা স্বর্গের কেউ নয় ।

পৃথিবীর অবসাদ সময়-সময়
কাটাতে কণেক হয় স্বপ্নের খানিক দরকার—
সেই স্বপ্ন দিতে পারে, দিতে পারে ধার
অকূল রহস্য ঘেরা
শুধু এই নক্ষত্রেরা—
আর কেউ—কেউ নয় আর ।

যারা শুধু দেয় আর নেয় না ফেরৎ ।

সায় দেয় তাই এ হৃদয় :
অসুত কিছুও স্বপ্ন যদি সত্য হয়—
স্বপ্নেই আকীর্ণ কর তবে এই পৃথিবীর পথ,
নয় শুধু ধুলো-ধোয়া-বালি ;
রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, রাজনৈতিক মতামত—
তারও কান্ধে কিছু কিছু নয় দিয়ে রেখে
লাল-নীল, নীল-লাল স্বপ্নের দেয়ালী ।

অনেক, অনেক স্বপ্ন ঘনে আছে
 আজো ইতিহাসে ।
 ইতিহাস যত তবু, হিরণ্ময় আভা তার হাসে—
 যে-স্বপ্ন দিয়েছে দেখা
 একদিন দ্রষ্টা আর ঋষিদের ধ্যানে ।
 যা-কিছু, যা কিছু সব—মানুষেরি, মানুষেরি
 অমের কল্যাণে ।

জোয়ারের বেলা

সত্যাত্ত ঘোষ

‘এক্ষুনি গঙ্গায় জোয়ার আসবে’—
 এই কথা বলতে বলতে আমরা ছ’জনে
 গলির রাস্তাটা পেরিয়ে এনুম ।

লাল সুরকীর রাস্তাটা এতো যে এবড়ো খেবড়ো—
 এইমাত্র আমাদের ছ’জনে গেলুম ভুলে ।
 রাস্তার ধারের দোতলা বাড়িটা, ও-ধারের কয়লার গোলা,
 উঁচু পাঁচিল দেওয়া মিলের সীমানা—
 আর তার ঠিক সামনেই এই গলির রাস্তাটা
 এবড়ো খেবড়ো লাল সুরকীর—
 আমাদের কারুর নজরে পড়লো না,

কেননা, এইত’ এক্ষুনি গঙ্গায় জোয়ার আসবে

ভালোবাসার কথা

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

আমাদের ভালোবাসার কথাটা আজ বলব । কেমন করে
জীবনের অরণ্যে এসে পৌঁছালাম, তা' মনে নেই । মনে নেই,
কী বলতে বলতে আমরা ছ'জনে এখানে জড়ো হয়েছিলাম ;
তারপর কোথায় যেন বসলাম । কতক্ষণ কেটে গেল ।
কতদিন কেটে গেল । মনে হয়, কতক্ষণ আর ।

সে-রাত কেটে গেল । তারপর আমরা ছ'জনে কোথায় যেন
গেলাম । সেটা নদীর ধারের মতো অবিকল দেখতে,
সে বলল । কিন্তু আমার যেন মনে হল, সেটা নদীর
স্বতছায়া, ধু ধু বালুচর । একসময় নদী এখানে বইত ।
কতদিন ধরে বইত আর গান গাইত । মনে হয়, কতক্ষণ আর ।

নদী যেন আমাদের নিয়তি । আমাদের ভালোবাসার
কথা জানত শুধু কাল । আমাদের মনে মোহ এনে দিয়েছিল
অরণ্য । জীবনের কথা ভেবেছিলাম, ভাবতে পারিনি তার
কথা, সে অরণ্যের কথা ভেবেছিল ভুলতে পারেনি নদীর
কথা । কালের কোলে দুটি শিশু নিদ্রিত অবস্থায়
স্বপ্নে ছিল, তা' শুধু জানত নিয়তি ।

দিন যায় যায় । সে বলল, ঘরে ফেরা যাক । আমি
বললাম, ঘরে নয় বাইরে । ক্রান্ত শিশুর মতো হাই-তোলা
ছুটি তার নিদ্রালু চোখে দিনের রক্তিম অবসন্নতা । আমি
কী করব । আমি ভেবেছিলাম আমাদের অমরতার
পরিধি বাড়বে কিছুটা দিনে, কিছুটা অন্ধকারে । সে
দেখেছিল অরণ্যের অটলতা সরিয়ে অমোঘ নিয়তির
মতো অবিকল নদী । আমি কিছু বললাম না । কাল
আমাদের কথাটা জানে, আমাদের ভালোবাসার কথা ।

একাক্ষিকা

দেবকুমার মৈত্র

পাতা ঝরার দিন আসছে আবার। শরত। আকাশ নীল হয়ে উঠবে। ঝকঝকে গাঢ় নীল। পেরঁজা তুলোর মতো সাদা চাপচাপ মেঘ উড়বে নীল দিগন্তে। তারপর সেই শরতও যাবে ফুরিয়ে। হিমের চাবুক হাতে নিয়ে আসবে শীত। নির্দয় নির্ভুর অত্যাচারী শীত। হিমের চাবুক চালাবে এলোমেলো। পাতার সাজ ফেলে দিয়ে কাঙাল সাজবে গাছেরা। নীল আকাশ ধূসর হয়ে যাবে।

কিন্তু সে তো সুদূরের কথা। এখন, এই শেষ বর্ষার দিনে, সেকথা ভাববার কোনো মানেই হয় না। তবু কুইন ভাবে। ভাবতে ভালো লাগে তার। সারা দিনমান অলস হয়ে বসে থাকে ছাড়া কাজ নেই, আর, অলস মন মানেই স্বপ্নবিলাস, অর্থহীন চিন্তার বুদ্ধিতে আকর্ষিত ডুবে থাকে।

বাইরে এখন হালকা রোদ ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ভেতর দিয়ে উঁকি দিয়েছে। চাঁপা রঙের রোদ। এই একটু আগেও সমস্ত আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন ছিলো, ঝুটি হচ্ছিলো থেকে থেকেই। ঝুটি থেমে অবশেষে যে রোদ উঠেছে একটু এইটুকুতেই খুশি কুইন। গত পনেরদিন ধরে সারা দিনরাত ঝুটি হয়েছে এমনই। কখনো মুমলধারে, কখনো ঝিরঝির ঝিরঝির। ফলে, সে বেরুতে পারেনি ঘর ছেড়ে। অবিশিষ্ট ইচ্ছে করলে যে বেরুতে পারতো না তা নয়। পারতো। কিন্তু তাতে লাভ হতো না কিছুই। ভিজে পোশাকে, হতাশ মনে বাড়ি ফিরতে হতো। তাছাড়া, মনে মনে হাঁপিয়ে উঠেছিলো কুইন, এই গ্রানিময় কাদাপথে হাঁটতে হাঁটতে। এই পনেরদিন বিশ্রাম তার শরীর এবং মনের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলো। এবং পনেরদিন বিশ্রামে তার শরীর এবং মন দুইই আবার কিছুটা তাজা হয়েছে। অবিশিষ্ট একথাও সত্যি যে সাত আটদিন চুপচাপ ঘরে বসে থাকবার পর থেকেই কুইন অধৈর্য হয়ে উঠেছিলো, আর ভালো লাগছিলো না, বেরুতে চাইছিল আবার। রোজ রোজ বেরুতেও যেমন ভালো লাগে না, গা ঘিন ঘিন করে, তেমনি রোজ রোজ অলস হয়ে বসে থাকতেও বিজী লাগে। পথ, পথের মানুষ, হাতছানি দেয়। এই জীবনের একটা নেশা আছে, আছে মাদকতা, সেই নেশা অকেছো থাকতে দিতে চায় না। পথে বেরিয়ে লোকজনের ভিড়ে অত্যন্ত সচেতন হয়ে ঘুরতে রোমাঞ্চিত লাগে, তারপর টিকটিকির পোকা ধরবার মতো মানুষ ধরা, পুরুষ মানুষ, সেই বা কম কি। কুইনের একেক সময় মনে পড়ে তার আগেকার জীবনের কথা, বড়বাজারে যখন মাঝে মাঝে মুরগি বিক্রী করতে বসতো সে। এখন তার নিজের অবস্থা অনেকটা ওই মুরগির মতো। পরখ ক'রে পছন্দ হলে তবে লোকে কিনবে। লোকগুলো কাছে এসে ঘুরঘুর করে, আড়চোখে চেয়ে চেয়ে পরখ করতে থাকে, তারপর দরদামে বনলে সাময়িকভাবে কেনে তাকে, তাদেরকে। সেইসময়কার মানসিক অবস্থাটা কম উত্তেজক নয় :- শিকার বড়শিতে গাঁধবে কি না। এই ভরা

সৃষ্টিতে পনেরদিন বাধা হয়ে ঘরে আটকে থেকে তাই অর্ধর্য হয়ে উঠেছিলো কুইন।
হে ঈশ্বর, অনেক হয়েছে, এবার বিরতি দাও, সৃষ্টি থামুক, অন্তত কয়েকদিনের
অন্তর। পনেরদিন বাদে, আজ, ভগবান তার প্রার্থনা শুনেছেন। সৃষ্টি সত্যিই
থামেছে। আকাশের কালো মেঘ কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। মনে হয় আর সৃষ্টি
হবে না আজকে।

দূরে, উত্তরদিকে, স্থল ছুটি হওয়ার ঘণ্টা পড়লো ঢং ঢং। অর্ধাং বেলা সাড়ে
চারটে। বিকেল। কুইন উঠে দাঁড়ালো। মুখহাত ধুয়ে, সাবান মেখে, পরিষ্কার
ছিনছাম হতে হবে তাকে। আর দেরী করা যায় না।

সকালে কল থেকে তিন বালতি জল তুলে রেখেছিলো। এক বালতি সেই
জল আর সাবান তোললে নিয়ে এ্যাপ্রিকট গাছটার তলায় গেলো কুইন। প্রথমে
মুখ থেকে গলা অবধি রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে সাবান মাখলো, তার হাতের আঙুল এবং তালু
স্মরণ হয়ে গেলো একরাশ ফেনায়, ছিটে ছিটে জল দিয়ে পরিষ্কার করলো রোমকুপে
জমে থাকা ময়লা। তারপর যখন সে কাপড় তুলে হাঁটু থেকে পায়ের পাতা অবধি
সাবান ঘষছিলো, সেই সময়, হঠাৎ তার চোখে পড়লো রাস্তার ওপারের বাঙালী বাড়ির
জানালাটা থেকে স্তম্ভ নয়নে চেয়ে আছে সে-বাড়ির মালিক, প্রৌঢ় ভদ্রলোক।
কুইনের হঠাৎ খেয়াল চাপলো একটু মজা করবে। কাপড় আরও একটু তুললো সে।
তার উন্মুক্ত, নিটোল, মোনের মতো সুপুটে জংবা দেখা যাচ্ছিলো স্পষ্ট। মনোযোগ
দিয়ে হাঁটু থেকে পায়ের পাতা অবধি তখনো সাবান ঘষছিলো কুইন। তার কাপড়
যে একটু বেশি উঠে গেছে যেন তা লক্ষ্যই করেনি। আড়চোখে চেয়ে ছুতিনবার
দেখলো কুইন। ভদ্রলোক জানালার সামনে অস্থিরপদে পায়চারী করছে। আর
তীব্র লোলুপদৃষ্টিতে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে, বাম যেমন মাংসের দিকে তাকায়,
কুইনের উন্মুক্ত জংবার দিকে। এটা কিছু নতুন নয় বা আশ্চর্যও নয়। কুইন
জানে ওই ভদ্রলোকের স্ত্রী আছে, ছেলেপুলে আছে এবং ভদ্রলোকটির বয়েস চল্লিশ
পেরিয়ে গেছে।

ঠিক সন্ধ্যার মুখে প্রচুর প্রসাধন এবং লিপস্টিকে নিজেকে একগুচ্ছ রক্তলাল
রডোডেনড্রনের মতো সাজিয়ে কুইন বেরলো ঘর থেকে। পথে। শিকারের সন্ধানে।
একটি লোককে গের্গে তুলবেই আজ। আজ কোনো লোক না পেলে কাল থেকে,
কাল থেকেই বা কেন, আজ রাত থেকেই অনাহার।

প্রথমে সে গেলো পুলিশবাজার। এই একটা জায়গা যেখানে সবসময়েই কিছু
না কিছু লোক থাকেই। সন্ধ্যার মুখে একেবারে ভিড়। বেশির ভাগই অফিসের
বাবু, সারাদিনের খাটুনির পর এখানে এসে জমে। তার ওপর এখন মাংসের প্রথম।
এবং এই জায়গাতেই শহরের অধিকাংশ মণিহারি এবং কাপড়ের দোকান। পুলিশ-
বাজারের মোড় থেকে বিজু সিনেমা—এই পথটা কুইন বোধহয় বার দশ ঘুরলো।
দিক থেকে ওদিক। স্বথাই। না, তার কপাল মন্দ। তা না-হলে কেউ তার
দিকে ফিরে তাকায় না। বিশেষ করে যখন সকলের পকেটেই কিছু টাকা আছে।
এবং আজকেই তার সবচাইতে বেশি টাকার প্রয়োজন। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে

ধরলো কুইন। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর সে গেলো বাস স্টেশনের সামনেটাতে। খার্ডটাইম বাস আসবার সময় হয়ে গেছে। এইসময় ওই জায়গাটাও মানুষজনে ভ্রমভ্রমাট থাকে। একে একে বাস এলো। একটার পর একটা। লোকজনের হৈ হৈ, কুলিদের চিৎকার, ব্যস্ততা। আবার ধীরে ধীরে থিতুয়ে গেলো সব। কুইন তাকিয়ে দেখলো, ভিড় ফাঁকা। কেউই আর নেই প্রায়। আন্তে আন্তে সেখান থেকে সরে চলে এলো সে। তার চোখ ফেটে স্বল এসে পড়লো।

তখন ক্রান্ত লগ্ন পায়ে কুইন চললো বড়বাজারের দিকে। শেষ চেষ্টা। ওখানেও যদি কিছু না-পায় বাড়ি ফিরবে। ফিরতেই হবে। তারপরও ঘোরার আর কোনো অর্থ হয় না। বেশিদূর সে আসেনি, শনিবাড়ির কাছে পৌঁছে কুইনের মনে হলো কে যেন তার পিছু নিয়েছে। সে দাঁড়ালো। আশায় আনন্দে উত্তেজনায় তার বুক ধকধক করছিলো। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো লোকটাকে। বিলোল ইঙ্গিতে আমন্ত্রণ জানালো। লোকটি এসে দাঁড়ালো, তার একেবারে গায়ের কাছে।

বড়বাজারের দিক থেকে রক্তচোখে একটি বাস এসে গৌগৌ শব্দে ছুটে গেলো তাদের পাশ কাটিয়ে। তারপর নৈঃশব্দ্য! শুধু অনেকদূরে একটি কি দুটি ঘেউঘেউ ডাক কুকুরের অস্পষ্ট চিৎকার। আর সব নিশ্চুপ। রাস্তার ধারের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। নিভে গেছে আলো।

স্ট্রীটলাইটের মিটমিটে আলোর নিচে সরে এসে কুইন তার ছোট হাতখড়িটার দিকে তাকালো। না, রাত খুব বেশি হয়নি। আটটা। লোকটিকে ইসারা ক'রে কুইন এগিয়ে গেলো। ঝানিকটা পথ এগিয়ে পেছন ফিরে চাইলো আবার : পিছু পিছু লোকটি আসছেই। কুইন আশ্বস্ত হলো এবার। শিকার বিঁধেছে। ধামলো। কোনো লোকজন নেই কাছাকাছি। লোকটি এগিয়ে এলো।

‘তোমার সঙ্গে যেতে পারি?’

একমুহূর্ত চুপ ক'রে রইলো কুইন। একবার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখলো লোকটিকে। একেবারে কচি, কমবয়সী যুবক। উজ্জললোক। বোধহয় বাঙালী। অসমীয়াও হতে পারে। হ্যাঁ, একে বিশ্বাস করা যায়। পরস্যা ঠকাবে না এ।

‘কোথায় যাবে?’

‘যেখানে তুমি যেতে চাও।’

আকাশে মেঘ আর তারার লুকোচুরি খেলা। মেঘেরা আসছে, চুপিচুপি, তারাদের ছুঁয়ে দিয়ে হালকা হাওয়ায় গা ভাসিয়ে আবার উড়ে চলে যাচ্ছে। মিটমিট হাসি তারার দল অবাক চোখে চেয়ে শুধু দেখছে মেঘেদের খেলা। এক কোণায় বুড়ি চাঁদ, সে-ও হাসিতে উজ্জল হয়ে উঠছে থেকে থেকে। শিরশির শিরশির হাওয়ায় কাঁপছে পাইনের ঝোপগুলি, রাস্তার ধারে।

‘চলো, কোনো রেস্টোরাঁয় যাই।’

রেস্টোরাঁ। হ্যাঁ, রেস্টোরাঁই ভালো। ছেলেটি ভাবলো। কোটের ভেতর দিকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চকচকে নোটগুলির অস্তিত্ব অনুভব করলো একবার।

‘আমার কোনো আপত্তি নেই।’

তীরবেগে একটি উলকা ছুটে গেলো নাক্ষত্রাকাশ থেকে দিগন্তের দিকে। জলন্ত আলোর রেখাটি নিভে ছাই হয়ে গেলো মুহূর্তেই। উলকাপাত নাকি দেখতে নেই, ছেলেটি ভাবলো, অমঙ্গল হয়। কিসের অমঙ্গল, কার? যে দেখে তার। না, ওসব মতো বাজে কুসংস্কার, আমি মানি না। মনে মনে বললো সে, নিছকেই।

‘আমার জানাশোনা একটা চীনে রেস্টোর’ আছে। ওখানে ভালো খাবার পাবে, এবং নির্জন কেবিনও। ইউ ক্যান হ্যাভ ড্রিক্স অলসো।’

‘আমি মদ খাই না।’

‘তাই নাকি?’

‘হ্যাঁ।’

কুইন চুপ করে গেলো। তার হাসি পাচ্ছিলো। ছেলেটি এমনভাবে বললো যে সে মদ খায় না, অনেকটা নীতিবাগিশের মতো শোনালো তার গলার স্বর। অথচ, মেয়েমানুষে আপত্তি নেই। এইরকমই হয়। প্রথম প্রথম এইরকম ভয়, নীতিবোধ এবং বিবেক সকলেরই থাকে। হ্যাঁ, হলপ করে বলতে পারে কুইন যে, এই ছেলে আসল প্রথম তার মতো মেয়ের সাথে পথে বেরিয়েছে। কেমন সংকুচিত, ভীত, চকিত তার চলা বলা। মনেমনে ইচ্ছে আছে ষোল আনা, ওদিকে তার বিবেক এবং বুদ্ধিবৃত্তি তাকে বাধা দিচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে। তারপর একদিন এমন আসবে যখন সব কিছুতেই অভ্যস্ত হয়ে যাবে এই ছেলেটিও। মদ, মেয়েমানুষ। তখন আর তার কথায় চালচলনে জড়তা বা আড়ষ্টতা কিছুই থাকবে না। তখন সে-ই হুকুম দেবে এবং তার মতো মেয়েরা হুকুম তামিল করবে। এই নিয়ম। এই হয়।

রাস্তাটা একটি বাক নিয়েছে। বাকের মুখে কতোগুলি লোক। শুটলা করছিলো। আর একটি বাস্ এলো। তীব্র হেডলাইট জ্বালিয়ে। চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে চলে গেলো সগর্জনে।

‘আমি আগে আগে যাই, তুমি পেছনে পেছনে এসো।’ হঠাৎ ঝাঁড়িয়ে গিয়ে কুইন বললো। ছেলেটি বললো, ‘কেন?’

‘তুমি একেবারে ছেলেমানুষ।’ হেসে উঠলো কুইন।

ছেলেটি বিব্রত বোধ করলো এবার, ‘কেন?’

কুইনের কেমন যেন মায়া হচ্ছিলো ছেলেটির ওপর তার এই অনভিজ্ঞ কথাবার্তা শুনে। তার সাথে আসার দরুণ ছেলেটির যেন তার সমাজে ছুঁয়া না রটে। এই ধরনের একটা হালকা চিন্তা কুইনের মনে ওলটপালট করছিলো। প্রথমদিনই তার সাথে পথে বেরিয়ে যদি এই ছেলেটি ছুঁয়া কেনে সমাজে তাহলে পরে আর কোনোদিনই হয়তো তার মতো মেয়েদের ধারেকাছে আসবে না। সেটা তার লোকসান, তাদের লোকসান। আসলে কুইনের অবচেতন মনে এইরকম একটি চিন্তা ছিলো।

বললো, ‘তুমি বড় বোকা। আমার সাথে এই প্রকাশ্য রাস্তায় যদি তোমার কোনো চেনাজানা লোক তোমাকে দেখে কি ভাববে সে? দুদিন বাদে নিশ্চয় আর কান পাততে পারবে না।’

এই প্রস্তাবে ছেলেটিরও পুরো মত ছিলো। সে নিজেও অনেকক্ষণ থেকে এই কথাই ভাবছিলো। ভাবছিলো কুইনকে বলবে। কিন্তু বলতে পারেনি। বিধা এবং লক্ষা বোধ করেছে। কুইন তাকে ভীক এবং কাপুরুষ ভাবতে পারে। এখন কুইন নিজে থেকেই সে-কথা বলায় ছেলেটি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

বললো, 'বেশ' তাহলে তুমি আগে আগেই যাও।'

দশবারো গজ আগে আগে কুইন, তার পেছনে ছেলেটি হাঁটতে হাঁটতে বড়-বাজারের মোড় পর্যন্ত এলো, তারপর বাঁয়ে বেকে তারা এগোলো ছাপিড্যালি বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে। ছেলেটির বুকের ভেতর কেমন যেন টিপ টিপ করছিলো। ছ'কান আগুন গরম। একবার ভাবলো : ফিরে যাই। দাঁড়ালো। এক মিনিট। ফিরতে পারলো না। কি একটা যেন তাকে টেনে নিয়ে গেলো কুইনের পিছু পিছু। রেস্টোরান্টার সামনে পৌঁছে কুইন একবার তার দিকে ঘুরে চাইলো, তারপর ইসারা ক'রে চুকে গেলো ভেতরে। ছেলেটি আরও একবার ভাবলো, ফিরে যাই, ফিরে যাওয়াই ভালো। এখনও সময় আছে।

হয়তো সে ফিরেই আসতো। কিন্তু তার আগেই কুইন বেরিয়ে এলো।

'বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভেতরে এসো।'

'যাচ্ছি।'

যতো অস্বস্তি উত্তেজনা বোধ করছিলো বাইরে। পর্দাঢাকা কেবিনের নির্জনে বসে অনেক সহজ হয়ে এলো ছেলেটি।

বললো, 'কি খাবে?'

'তুমি যা খাওয়াবে।'

'এখানে কি পাওয়া যায় আমি জানি না।'

'সবই পাবে।'

'কোনটা তোমার পছন্দ।'

'ফাউল কারি, ব্রেড্, এবং এক পেগ রান্।'

'তাহলে তাই অর্ডার দাও।'

'আর তোমার স্নেহ?'

'শুধু এক কাপ চা।'

'সে কি, শুধু এক কাপ চা।'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আমার ক্ষিদে নেই।'

'সত্যিই ক্ষিদে নেই?'

'সত্যিই।'

কিছু সময় মাথা নিচু ক'রে বসে থেকে কুইন বললো, 'কিন্তু ক্ষিদেয় আমার পেট জলে যাচ্ছে। সকাল থেকে প্রায় কিছুই খাইনি।'

ছেলেটি বলতে চায়নি, তবু মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো, 'কেন?'

প্রায় অশ্রুট স্বরে কুইন বললো, 'ঘরে কিছু ছিলো না। টাকাও ফুরিয়ে গেছিলো।
কি পনেরদিন বেরুতে পারিনি একেবারে।'

তখন ছেলোট মুখ ভুলে তাকিয়ে দেখলো : যদিও পেইন্ট করেছে যথেষ্ট,
লিপস্টিকে লাল লোভনীয় করেছে ঠোঁট দুটিকে, তবু, অত্যাচার আর অনশনের ছাপ
স্পষ্ট, ক্লান্তি, অসীম ক্লান্তি আর হতাশা মেয়েটির মুখে চোখে।

যতোকণ কুইন খাচ্ছিলো ছেলোট একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো তার দিকে। কি
সুধার্ত, ব্যগ্র, এক একটি প্রাস, কতোদিন যেন খাওয়া জোটেনি। একমনে মাথা
নিচু ক'রে খেয়ে যাচ্ছে। সামনের মাংসের প্লেট এবং রুটির টুকরো ছাড়া ভুলে গেছে
পৃথিবীর আর সবকিছু। খাওয়া শেষ ক'রে একটা তৃপ্তির উদ্গার তুললো, রুমাল দিয়ে
মুখ মুছে তাকালো ছেলোটের দিকে।

'একটা সিগারেট খাওয়াবে?'

নিঃশব্দে প্যাকেট এগিয়ে দিলো ছেলোট।

'থ্যাংক ইউ।'

'নো মেনশন্ প্রিজ্।'

সেগারেট ধরিয়ে রান্‌এর গেলাসে সোডা মেশালো কুইন। একরাশ বুদবুদে ভরে
গেলো গেলাস। ধীরে ধীরে আবার সরে গেলো বুদবুদের রাশ। সোডা আর রান্‌
মিশে ভারি সুন্দর একটা রং তৈরি হয়েছে। চুমুকে চুমুকে কুইন নিঃশেষ করলো
গেলাস।

হা হা হাসতে হাসতে কয়েকজন এসে চুকলো রেস্টোরাঁতে। সেই সময়।
পর্দাটা অল্প সরিয়ে উঁকি দিলো ছেলোট। দুটি খাসিয়া মেয়ে আর একটি পাঞ্জাবী ছেলে।
ছেলোট বন্ধ মাতাল। টলেটলে চলে পড়ছে মেয়েগুলির গায়ে। আর মেয়ে দুটি
হাসছে। খিলখিল খিলখিল ইতর হাসি। হাসছে ছেলোটও। হা হা হা হা।

'লিয়ং।'

দৌড়ে এলো দোকানের চীনে মালিক।

'জী।'

'গানা লাগাও।'

ব্যস্ত ব্যস্ত হয়ে ছুটে গিয়ে ইলেকট্রিক গ্রামোফোনএ ছটি রেকর্ড চাপিয়ে দিলো
সে। পরমুহুর্তেই উত্তাল শব্দঝঞ্ঝারে ভরে গেলো গোটা রেস্টোরাঁ। রক্ এ্যাণ্ড রোল্।
হোয়েন ইউ হোন্ড্ মাই হ্যাণ্ড্।

ইয়েস্, আই আন্ডারস্ট্যাণ্ড্.....

গান লাগিয়ে দিয়ে তখনুনি ফিরে এলো চীনেটা।

'হুইকি হায়?'

'হায়।'

'ছে পেগ, ইয়ে দো ছুকরিকো লিয়ে এক এক পেগ, আউর হামকো লিয়ে চার
পেগ। সমঝা?'

‘সমঝা ।’

‘আউর ফাউল কারি তিন প্রেট্ ।’

‘জী ।’

‘ও ডালিং, ইউ আর সো সুইট্ ।’

একটি মেয়ে পাঞ্জাবী ছেলেটির গায়ে ঢলে পড়তে পড়তে বললো । বলেই আবার হেসে উঠলো । সেই খিলখিল খিলখিল ইতর হাসি । হেসে উঠলো পাঞ্জাবী ছেলেটিও । হা হা হা হা । তারপর একটি মেয়েকে জড়িয়ে ধরে সশব্দে চুমু খেলো তার ঠোঁটে, ওই খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই । অন্য মেয়েটি ফাট! কাঁসির আওয়াজের মতো গলায় চিৎকার ক’রে উঠলো, ‘হেই, কিস্ মি, কিস্ মি অলসো ।’

ছেলেটি হেসে পাঁজা কোলা ক’রে তাকে তুলে নিলো বুকের কাছে । তারপর সশব্দে চুমু খেতে লাগলো তার ঠোঁটে, গালে, কপালে, চোখে, গলায়, ঘাড়ে ।

তার সমস্ত শরীরে পাক দিয়ে উঠেছিলো গা-বমি-বমি একটা অনুভূতি । এরকম জায়গায় এই ছেলেটির এই প্রথম আসা । আগেকার কোনো অভিজ্ঞতা ছিলো না । পর্দাটা ফেলে দিয়েছিলো সে সঙ্গে সঙ্গে । চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে কুইন চোখ মুদে বসে ছিলো । চুপচাপ । ভরপেট খাবারের পর রাম্‌এর একটা সুন্দর আমেজ তার মস্তিষ্কে কাজ করছিলো । ঝিমঝিম ঝিমঝিম । তার দিকে ছেলেটি তাকালো আর একবার । কুইন চোখ খুললো ।

‘আর এক পেগ রাম্‌এর অর্ডার দাও, প্লিজ্ ।’ ছুচোখে মিনতি নিয়ে সে বললো ।

অতএব আরও এক পেগ রাম্‌ এলো । সোডা মিশিয়ে সবটা এক সাথে ঢক্‌ঢক্‌ ক’রে গিলে ফেললো কুইন ।

‘আর একটা সিগারেট খাওয়াও ।’

আবার নিঃশব্দে ছেলেটি তার প্যাকেট এগিয়ে দিলো ।

‘থ্যাংক ইউ ।’

‘নো মেনশন, প্লিজ্ ।’

ছেলেটি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দেখে কুইন হাসলো । সরে এলো তার গায়ের কাছে । একটা হাত তুলে দিলো তার পিঠের ওপর, মুখটা এগিয়ে নিয়ে গেলো তার মুখের কাছে । ছেলেটি লাজুক, এবং একটু ভয়ও পাচ্ছে নিজে থেকে অগ্রসর হতে, এটা কুইন বুঝতে পেরেছিলো আগেই । ওর সেই লজ্জা ভাঙিয়ে দেবার জন্যে কুইন নিজেই অগ্রসর হলো । প্রথম কয়েকবার এরকম লজ্জা থাকাটাই স্বাভাবিক । আস্তে আস্তে চলে যাবে । কিন্তু ছেলেটির এই লাজুকলাজুক হাবভাব, সত্যি কথা বলতে কি, এইটাই কুইনের বেশি ভালো লাগছিলো । এ লাইনের পাকা লোকের মতো ছেলেটি নিজেই যদি কোনো ভনিতা না ক’রে দাবী ক’রে বসতো তার দেহ তাহলেও অবিশিষ্ট কুইন আপত্তি করতো না । আপত্তি করবার প্রশ্নই আসে না । কিছু সময়েই অন্যে তাদের দেহকে উপভোগ করবার জন্যেই লোকে কুইনদের কাছে আসে । বিনিময়ে টাকা দেয় । এই কুইনদের জীবিকা । তবু, এই লজ্জা ভাঙানোর খেলা,

এই আদর ক'রে চুমু খাওয়া, যেমনটি নববিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিংবা যুবক-যুবতী যখন তারা পরস্পরকে ভালোবাসে তাদের বেলায় ঘটে, তার একটা আলাদা মাধুর্য আছে।

কিন্তু কুইন অত্যন্ত অবাক হলো যখন ছেলেটি তার হাত পিঠ থেকে নামিয়ে দিলো, মুখটি ধরে ঘুরিয়ে দিলো, এবং বললো, 'আমি ও জিনিগ চাইনে।'

কুইন বললো, 'ভয় পেয়োনা, আমার কোনো রোগ নেই।'

'তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

'তুমি এতো লাজুক কেন?'

'আমি লাজুক নই মোটে।'

'লাজুক নও?'

'না।'

'তবে লজ্জা পাচ্ছে কেন?'

'লজ্জা পেলে নিশ্চয়ই তোমার সাথে আসতাম না। আসলে আমি ও জিনিগ চাইনে।'

'তাহলে আমার সাথে এলে কেন?'

'এমনি।'

'এমনি?'

'এমনি।'

'কিন্তু তুমি আমার জন্তে টাকা খরচ করেছে।'

'করেছি।'

'তবে?'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ছেলেটি বললো, 'এসো আমরা গল্প করি।'

হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো কুইন। ছেলেটির চোখের দিকে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললো, 'তুমি আমার সাথে গল্প করে সময় কাটানোর জন্তেই কি এসেছো?'

ছেলেটি কোনো জবাব দিলো না।

'তুমি গল্প করেই আমাকে টাকা দেবে?'

'টাকা?'

'ইয়েস্, মানি, আই নীড্ মানি, দিস্ ইজ্ মাই প্রফেসন্।'

'কতটাকা?'

'দশটাকা।'

'দেবো।'

'দাও।'

পকেট থেকে টাকা বার করে ছেলেটি তাকে দিলো। টাকাটা নিয়ে ব্যাগের ভেতর রাখলো কুইন।

'বয়।'

'জী।'

‘রাম্, আউর এক পেগ ।’

আবার রাম্ এলো ।

বয় চলে ঘাবার পর ছেলেটি বললো, ‘তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?’

‘কেন ?’

‘এতো মদ খাও কি জন্মে ?’

একটুকু চুপ করে থেকে কুইন বললো, ‘আই লাইক টু গেট ড্রাক্ । ইয়েস, টু গেট্ ড্রাক্ ।’

ছেলেটি চুপ ক’রে রইলো ।

রাম্‌এর গেলাস নিঃশেষ ক’রে কুইন উঠে দাঁড়ালো । ছেলেটির এই মেয়েলীপনায় সে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো । বললো, ‘লেট মি গো ।’

‘এতো তাড়াতাড়ি ?’

‘তোমার সাথে বসে থেকে লাভ কি ? আই ওয়ান্ট্ এ ম্যান্, এ স্ট্রং ম্যান্ ।’

‘কিন্তু আমি তোমাকে টাকা দিয়েছি ।’

‘তা দিয়েছো ।’

কুইন বসে পড়লো ।

ছেলেটির কেমন যেন জেদ চেপে গেলো । যেতে দেবে না । তাকে ওইখানে অমনভাবেই বসিয়ে রাখবে । অনেক টাকা খরচ করেছে সে আজ এই মেয়েটির পেছনে । তাকে বসিয়ে রাখবার অধিকার তার আছে । ভাবলো ।

বললো, ‘আমি যতোক্ষণ থাকবো তোমাকেও থাকতেই হবে । অনেক টাকা খরচ করেছি আমি শুধু তোমারই জন্মে ।’

কুইনের চোখ দুটো পলকের জন্মে জলে উঠেই নিভে গেলো ।

বললো, ‘হ্যাঁ, তুমি যতোক্ষণ চাও আমি থাকবো ।’

তারপর আর কথা নেই ।

সেই পাগাবী ছেলেটি এবং খাসিয়া মেয়ে দুটি চলে গেছে কিছু আগে । গানও থেমে গেছে । অতএব সমস্ত রেস্টোরঁটাতেই একটা স্তব্ধ নীরবতা । শুধু মাঝে মাঝে দুএকটা কাপ-প্লেটের ঝুন্ ঝুন্ আওয়াজ । চীনে মালিক কাউন্টারে বসে সারাদিনের বিক্রীর হিসেব করছিলো । ড্রয়ার থেকে বার ক’রে রেজকি গুনছিলো, তারপর সাজিয়ে রাখছিলো থাকে থাকে । খুচরো পয়সা নাড়াচাড়ার একটা স্বহু আওয়াজ কেবিনের ভেতর বসেও শুনতে পাচ্ছিলো স্পষ্ট ।

কুইনকে জোর ক’রে বসিয়ে রেখে কেমন যেন একটা নির্ভুর আনন্দ পাচ্ছিলো ছেলেটি । একটি মেয়ে, যে-হেতু তার জন্মে কিছু টাকা খরচ করেছে সে, তার কথা শুনতে বাধ্য । শুনতেই হবে । ইচ্ছে না-থাকলেও ।

ইতিমধ্যে কুইনেরও কেমন যেন রোখ চেপে গেছে ছেলেটির এই ঝুন্‌কে । সততার মুখোশ সে ভেঙে দেবেই । আবার সে সরে ঘন হয়ে বসলো ছেলেটির গায়ের কাছে, বুক দিয়ে আলতো চাপ দিলো তার কাঁধে, একটা হাত তুলে দিলো তার পিঠের ওপর, মুখটা এগিয়ে নিয়ে গেলো তার একেবারে ঠোঁটের কাছে ।

‘আমি ও জিনিস চাইনে, বলেছি তো একবার।’

‘তুমি এতো ভয় পাচ্ছে কেন।’

‘তোমার মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে।’

‘আমার কোনো রোগ নেই, সত্যি বলছি।’

‘ধাকলেও আমার কিছু যায় আসে না।’

যদিও বলেছিলো আসলে কিন্তু সেই ভয়টাই ছেলেটিকে বাধা দিচ্ছিলো বারবার। রোগ। এদের কথায় বিশ্বাস করা যায় না। করা উচিত নয়। করেনি। রোগ ধাকলেও এরা বলবেই : নেই। কোঁকের মাথায় সে এই মেয়েটির পিছু নিয়েছিলো এবং সাথে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে না-এলেই ভালো করতো। তবু, এই মেয়েটিকে নিয়ে বসে থাকা কুখ্যাত এক রেস্টোরাঁর এই কেবিনের নির্জনে, মেয়েটির কথাবার্তা আচরণ, এবং নিজের নীতিবাগিনা অভিনয়, এগুলো তার মন লাগছিলো না। দৈনন্দিনের রুটিনবাধা জীবনে একটুখানি বৈচিত্র্য। সবটাই যেন একটি অবিশ্বাস্য নাটক। যে নাটকে নায়ক সে আর নায়িকা এই মেয়েটি।

‘তুমি একটি অপদার্থ, ভীকু।’

বলে ছেলেটির পিঠ থেকে হাত নামিয়ে নিলো কুইন। রক্তাধিক্যে তার সমস্ত মুখ লাল হয়ে গেছিলো। চোখ দুটোও লালচে, গালে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘান, ফুরিত নাক। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিলো, জোরে জোরে, শব্দে। মনে মনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলো কুইন, ছেলেটির এইরকম অদ্ভুত ব্যবহারে। এবং ফুর। অথচ এই ছেলেটিই যদি অল্পরকম কিছু করতো, অগ্ন্যান্ত লোকেরা এইক্ষেত্রে যা-করে, তাহলেও সে খুশি হতে পারতো না।

‘আমাকে এভাবে বসিয়ে রেখে কি আনন্দ পাচ্ছে তুমি?’

‘কিছু না।’

রেস্টোরাঁর বড় দেয়াল ঘড়িতে চংচং ক’রে রাত দশটা বাজলো। দশটা। অনেক রাত হয়ে গেছে। এবার উঠতে হবে। আর দেরী করলে কৈফিয়ত দিতে হবে বাড়িতে : এতো রাত হলো কেন, কোথায় গেছে, ইত্যাদি। হ্যাঁ, উঠবো, আর কয়েকমিনিট বাদেই। ভাবলো ছেলেটি।

‘তোমার নামই জিজ্ঞাসা করিনি এতোক্ষণ।’ বললো সে।

‘নাম?’ কুইন স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো তার মুখের দিকে, ‘নাম দিয়ে কি দরকার তোমার? তুমি নিশ্চই একটা নামকে চাও না। আমি একটি রক্তমাংসের মেয়েমানুষ, এই কি যথেষ্ট নয়?’

‘আমাকে ভুল বুঝো না।’ ছেলেটি বললো, ‘কয়েকটা টাকা দিয়ে’ তোমার দেহটা লুটে নিয়ে গেলেই কি তুমি বেশি খুশি হতে?’

ওটা অবিশিষ্ট কথার কথা। ছেলেটি নিজেও তা জানে। নইলে লোকে কেন এসব মেয়েদের কাছে আসে, সে-ই বা এসেছে কেন? এই প্রথমবার বলেই সে সাহস ক’রে উঠতে পারছে না, মনের কোণে কোণে লুকিয়ে থাকা ভয়গুলি মাথা চাড়া

দিয়ে উঠছে। আর সে ভাবছে ওটা বুঝি তার বিবেক, সং বুদ্ধি। তবে, যেকারণেই হোক না কেন, কুইনের বেশ ভালো লাগে ছেলেটির কথাগুলি, বেশ নতুন মনে হয়। এরকম কথা অন্তত তাকে অন্য কেউ বলেনি, কোনোদিনই।

‘আমার নাম সত্যিই জানতে চাও?’

‘চাই।’

‘কুইন নংত্রি।’

তারপর আবার নীরবতা। হুজনেই চুপ। ছেলেটি ভাবে, এরপর কি জিজ্ঞাসা করবে। কি একটা যেন কথা তার মনে হয়েছিলো কিছু আগে। এখন হারিয়ে গেছে। মনে করতে পারছে না আর। কিছুতেই।

‘চলো, ওঠা যাক।’

‘চলো।’

হুজনে পথে বেরুলো। চারদিক নিঃশব্দ নিম্নম। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে একটি খালি বাস গ্যারাজের দিকে চলে গেলো। এদিকে ওদিকে কয়েকটি পথকুকুর ঘুরছে শুধু। নোড়ের স্ট্রীটলাইটটা ফিউজ হয়ে গেছে। একরাশ অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। আকাশে এখনও টুকরো মেঘের আনাগোনা।

‘তুমি কোথায় যাবে?’ ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলো।

‘জাইআও, তুমি?’

‘রিয়াসমুখিয়া।’

‘চলো তাহলে একসাথেই যাই।’

হুজনে একসাথে হাঁটতে থাকে। এখন আর কোনো ভয় বা লজ্জা নেই ছেলেটির মনে। এতোরাতে এই খাসিয়া মেয়েটির সাথে তাকে ঘুরতে চেনাজানা কোনো লোকের হঠাৎ দেখে ফেলবার সম্ভাবনা খুবই কম।

‘তুমি কি রোজই এইরকম বেরোও?’ যদিও জানে, তবু জিজ্ঞাসা করে ছেলেটি। এ শুধু কথার জন্তেই কথা বলা। কেন না, হুজনে পাশাপাশি হাঁটা নিঃশব্দে, একটিও কথা না বলে, বিশেষ ক’রে রাস্তায় যখন অন্য জনপ্রাণী নেই, অত্যন্ত অস্বস্তিকর। কেমন যেন বিকী লাগে।

‘প্রায়ই।’

‘রোজই তোমার সাথে লোক থাকে?’

এই ছেলেমানুষী প্রশ্নে কুইনের হাসি পায়। বলে, ‘হ্যাঁ, প্রায়ই থাকে।’

তারপর ছেলেটি আর কথা খুঁজে পায় না। কিছুক্ষণ চুপ ক’রে থাকে। হঠাৎ একসময় জিজ্ঞাসা করে, ‘আচ্ছা, এখন তোমার বয়েস কতো?’

‘ষয়েস?’

‘হ্যাঁ।’

‘ছাব্বিশ।’

‘ছাব্বিশ?’

‘ছাব্বিশ।’

ছেলেটির বোধহয় বিশ্বাস হলো না। বললো, ‘দেখলে কিন্তু আরও বেশি মনে হয়।’
‘তা হয়।’ কুইন বললো, ‘চেহারার আর দোষ কি—’ তারপর খেমে গেলো।
কি একটা বলতে গিয়ে।

আবার চুপচাপ। দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। কুইনের হাইহিল জুতো
খুটখুট শব্দ তোলে। খুটখুট খুটখুট খুটখুট। ছেলেটির তো ক্রেপসোল, কোনো শব্দ
ছিলো না।

‘কতোদিন তুমি এপথে এসেছো?’

ছেলেটি ভিজ্ঞাসা করে। এই কথাটা জানবার জন্যে অনেকক্ষণ থেকেই সে
মনে মনে অদম্য একটা কৌতূহল অনুভব করছিলো। এতোক্ষণ ভিজ্ঞাসা করতে
পারেনি। কেমন একটা সংকোচ বোধ করেছে।

‘তা প্রায় দশবছর হবে।’ নিলিগু স্বরে কুইন জবাব দিলো।

দশবছর। ছেলেটি মনে মনে হিসেব করতে থাকে : দশবছরে তিন হাজার
ছশো পঞ্চাশ দিন, তার মধ্যে রোজ না হলেও প্রায় প্রতিদিনই একজন না একজন
অপরিচিত পুরুষকে দেহ দিয়েছে এই মেয়ে। ভাবতেই সে শিউরে ওঠে।

তখন বলে, ‘কিন্তু এভাবে আর কতোদিন চালাবে?’

কুইন প্রথমে কোনো কথা বলে না। চুপচাপ হাঁটতে থাকে। তারপর ফিসফিস
ক’রে যেন নিজেকেই বলছে, বলে, ‘হ্যাঁ, আরও একটা বছর, অন্তত একটা বছর,
আমাকে চালাতেই হবে, যতোদিন না আমার ছোটবোনের বয়েস ষোলো পুরো হয়।’
একটু খেমে বিজ্ঞীভাবে হেসে ওঠে তারপর, ‘সে তখন প্রচুর উপার্জন করবে, কি বলো।’

ছেলেটি আবার শিউরে ওঠে। তার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে
যায়। বলে, ‘ছোটবোনেরও সর্বনাশ করতে চাও?’

‘এছাড়া উপায় নেই আর।’ বিষম এবং নম্রস্বরে কুইন বললো, ‘আমিও আরম্ভ
করেছিলাম ষোল বছর বয়সেই, আমার বড়বোনের বাজার চলে যাবার পর।’

ছেলেটি চুপ ক’রে রইলো। জবাব দিলো না। দিতে পারলো না।
জবাব নেই।

অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও সরকারী উৎপাদন নীতি

মণি গুহ

জনসংখ্যার অতিরিক্ততা কথাটি আপেক্ষিক। সরকারের উৎপাদন ও বণ্টননীতির উপরই জনসংখ্যার স্বল্পতা বা অতিরিক্ততা প্রধানত নির্ভরশীল। এ কথা খুবই সত্য, আমাদের দেশে জনসংখ্যা মর্যাদাত্মক ভাবে “অতিরিক্ত”। এই অতিরিক্ততার কারণ, উৎপাদন ক্ষেত্রে জন-বিচ্ছাসের বে-বন্দোবস্ত ও বিশৃঙ্খলা। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শিল্প-প্রধান দেশে শিল্পের উপর “প্রয়োজনাতিরিক্ত” চাপের ফলে জনসংখ্যার আপেক্ষিক অতিরিক্ততার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কৃষি-প্রধান দেশে জনসংখ্যার অতিরিক্ততা সৃষ্টি হয় জমির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপের ফলে। যন্ত্রশিল্পে দেশকে পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর রাখবার নীতি অমুসৃত হওয়ার ফলেই জমির উপর জনসংখ্যার এই অত্যধিক চাপ সৃষ্টি হয়। ইংরেজ কর্তৃক ভারতবর্ষ দখল হবার আগে ভারতবর্ষে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৮ জন এবং শহরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কুটির ও অন্যান্য হস্তশিল্পের প্রসারের সাথে সাথে ক্রমশ ক্রমশ কৃষি আয়ের উপর লোকের সংখ্যা কমে আসছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক নীতি অমুসৃত হওয়ার ফলে ভারতবর্ষে শতকরা ৭০ জন লোক কৃষি-আয়ের উপর নির্ভরশীল দাঁড়ালো। বাংলা সরকার প্রকাশিত “ওয়েষ্ট বেঙ্গল টু-ডে” পুস্তকে বলা হয়েছে : “গত ৩০ বছরের হিসেবে দেখা যায়, কৃষিজীবীরা কৃষি ছাড়া তাদের উপার্জনের অন্য ব্যবস্থাগুলো থেকে কেবলই বঞ্চিত হচ্ছে। আবার অপরদিকে অকৃষি-জীবীরা কৃষির উপর বেশি বেশি নির্ভরশীল হচ্ছে।” এ থেকে বোঝা যায়, একদিকে কৃষিজীবীর আয় ক্রমশই কমে আসছে, অন্যদিকে জমির উপর চাপ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঔপনিবেশিক উৎপাদননীতি অমুসৃত এই বেদনাদায়ক ও বিষময় পরিণতির অবসানের জন্যে যে কোনো জাতীয় সরকারের উৎপাদননীতি একরূপভাবে অমুসৃত হওয়া প্রয়োজন যার ফলে জমির উপর থেকে জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ কমে আসে এবং কৃষিজীবীর আয় বৃদ্ধি পেয়ে তেজী আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি হয়। জমির উপর থেকে জনসংখ্যার চাপ কমানোর এবং উৎপাদনক্ষেত্রে জনবিচ্ছাসের সুসম বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয়তার কথা কংগ্রেস সরকারও স্বীকার করে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কৃষক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে গত ৩রা এপ্রিল (১৯৫৫) বলেছেন : “ভূমিসমস্যা বিবেচনার সময় জনসংখ্যার কথাও স্মরণ রাখতে হবে, যদিও কৃষিজমির পরিমাণ নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু জমির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যাও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং জমির উপর অত্যন্ত বেশি চাপ পড়েছে। এই চাপ কমানোর জন্যে বিকল্প কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।”

জমির উপর জনসংখ্যার চাপের ব্যাপকতা ও গভীরতা যদি আমরা বুঝতে পারি, তবেই উৎপাদনক্ষেত্রে সুসম জন-বিচ্ছাস ও বিকল্প কর্ম-সংস্থানের গুরুত্ব বোঝা যাবে। সরকারী উৎপাদননীতি এদিকে কতটা কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করেছে, তাও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ভারতবর্ষের মোট ৩৫, ৬৬, ০০০০০ লোকের মধ্যে ২৪, ৯১০০, ০০০ লোক অর্থাৎ শতকরা ৬৯.৮ জন লোক কৃষি-আয়ের উপর নির্ভরশীল। গ্রামের এই জনসংখ্যার ২৮.৫ জন নিজের সংস্থান নিজে করে; ৫৯.০ জন বেকার এবং ১২.৫ জন স্বল্প উপার্জনশীল, তাই পরিবারের অন্যান্য লোকের উপর নির্ভরশীল। সমগ্র ভারতবর্ষে ১ কোটি ৮০ লক্ষ পরিবার কৃষি-মজুর। প্রতি পরিবারে পাঁচজন করে লোক হিসেবে হিসেব করলে ৯ কোটি লোক জমিহীন কৃষক। সামগ্রিক হিসাবে গ্রামাঞ্চলের শতকরা প্রায় ৬৫ জন বেকার। ভারতবর্ষে মোট কৃষণযোগ্য জমি আছে ৪২ কোটি ৪০ লক্ষ একর। এ-জমির শতকরা ৬৩ ভাগ আবাদী, ১৪ ভাগ অনাবাদী এবং ২৩ ভাগ পতিত। গ্রামবাসীদের গড়-পড়তা মাথাপিছু মোট কৃষণযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ১.২ একর। সরকারী হিসেব মত নিম্নতম জমির পরিমাণ (ইকনমিক হোল্ডিং) ৫ একরেরও বেশি হওয়া প্রয়োজন। গ্রামবাসীদের মাথাপিছু গড়-পড়তা মাসিক আয় ৯।০ আনা। অথচ সমগ্র ভারতবাসীর (কৃষকদের সহ) মাথাপিছু গড়-পড়তা আয় ২৩.৮/০ (জাতীয় আয়ের হিসেবে)। অসম বণ্টন-ব্যবস্থায় মাথাপিছু গড়পড়তা আয়ের হিসেব উল্লেখ যদিও বিভ্রান্তিকর; তবুও কৃষকদের মাথাপিছু গড়-পড়তা আয়ের সাথে সমগ্র ভারতবাসীর গড়-পড়তা আয় তুলনা করলে দেখা যায় অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় কৃষক শ্রেণীর দারিদ্র্য কত বেশি গভীর ও ব্যাপক। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ও সমর্থিত নিখিল ভারত খাদি ও গ্রামোন্মোচন বোর্ডের পরিকল্পনা দপ্তরের এক হিসেবে দেখা যায়, মাথাপিছু গড়-পড়তা মাসিক আয় ৫০ টাকা হলে রীতিমতো খেয়ে পরে বাঁচবার মতো অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। (“ফর হেলদি এণ্ড রিফ্রেনেবল লিভিং কণ্ডিশন”)। এর উপর আছে, “সন্তানের দৈনিক খরচ বংশ বংশ ধরি” ৯৬০ কোটি টাকা ঋণ, বকেয়া খাজনা আর মহাজনের সুদের বোঝা।

এই হচ্ছে ভারতবর্ষের কৃষকদের অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক এক নিখুঁত চিত্র। এই অবস্থা নিরসনের জন্যে কংগ্রেস সরকার তার উৎপাদননীতি পাঁচটি পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালনা করছেন। (১) পুরাতন ভূমি-সম্পর্কের পরিবর্তন; (২) পতিত জমির পুনরুদ্ধার সাধন; (৩) সেচ, বাঁধ ও সারের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করণ; (৪) কুটার ও কারু-শিল্পের সম্প্রসারণ এবং কুটারশিল্পের বৈজ্ঞানিককরণ; এবং (৫) পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম-নিয়ন্ত্রণ।

সরকারী উৎপাদননীতির দফাওয়ারী বিস্তৃত আলোচনা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। জন-সংখ্যার অতিরিক্ততার সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে মতটুকু প্রাসঙ্গিক ততটুকুই এখানে আলোচ্য।

“সামাজিক সুবিচারের” কথা চিন্তা করে প্রত্যেকে সর্বাধিক কি পরিমাণ জমির মালিকানা রাখতে পারবে, কংগ্রেস সরকার তার একটা সীমা নির্দেশ করে দিয়েছেন। এই সর্বাধিক জমির পরিমাণ এক এক রাজ্য সরকারের এক এক রকম। গড়পড়তা এই সর্বাধিক জমির পরিমাণ ৩০ একর হবে। সমগ্র ভারতবর্ষে ছোট বড় সর্বপ্রকারের মধ্যমবৃত্তভোগীদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু কোনো ক্রমেই এই সংখ্যা ২৫ লক্ষের কম নয়। (এক বাংলা দেশেই জমিদার ও ছোট বড় মধ্যমবৃত্ত ভোগীদের

সংখ্যা ৫ লক্ষ) । যদি ২৫ লক্ষ লোক ৩০ একর করে জমির মালিক থাকে, তবে জমিদারী দখলের পর কংগ্রেস সরকারের হাতে উদ্ধৃত্ত জমি থাকবে ৩৪ কোটি ৯০ লক্ষ একর । (অনাবাদী ও পতিত জমিও এর মধ্যে ধরা হয়েছে) । মাথাপিছু যদি ২ একর করেও জমি কৃষকদের দেওয়া হয় তবে ১৭ কোটি ৪৫ লক্ষ লোকের যা হোক কিছু একটা সংস্থান হয় । কৃষিক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার পর দেখা যায় আরও ৭ কোটি ২১ লক্ষ লোকের জন্যে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । (খামার করবার উদ্দেশ্যে খাস জমি রাখবার যে-অবিকার দেওয়া হয়েছে তা এ-হিসেবের মধ্যে ধরা হয়নি । তবুও বর্ণাদারী প্রথা বজায় রাখবার কুফল বোঝা যাবে কেবলমাত্র বাংলা দেশের জোৎদারদের আয়ের অঙ্ক থেকেই । বাংলা দেশের জোৎদারেরা নীট্ মুনাফা করে বৎসরে ২৯ কোটি টাকা আর জমিদারেরা আর করে মাত্র ৯ কোটি টাকা । জমিদারী অবসান করে বর্ণাদারীকে বাঁচিয়ে রাখলে জাতীয় উৎপাদনের কোনোই সুরাহা হয় না) । সমস্যা শুধু এখানেই নয় । জমিদারী দখলের পর যে-জমি উদ্ধৃত্ত হয়ে কংগ্রেস সরকারের হাতে আসবে তা স্বভাবতই বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে । কিন্তু ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকেরা নিশ্চয়ই উদ্ধৃত্ত জমির পরিকল্পনামুযায়ী ছড়িয়ে নেই, দ্বিতীয়ত জীবনতো আর অন্ধ নয় এবং অন্ধের মতো যান্ত্রিক ছক-কাটা নিয়মে পরিচালিতও হয় না । জীবন পরিচালিত হয় সমাজের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত উৎপাদনের সাথে সংগ্রাম করেই । তবুও এ-অন্ধ সমস্যার গভীরতা বুঝতে আমাদের সাহায্য করে । এ-হিসেব অনুযায়ী দেখা যায়, খুব কমপক্ষে ৭ কোটি লোক জমির উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করেছে । এই ৭ কোটি লোকের বিকল্প কর্মসংস্থান এক্ষুনি প্রয়োজন । ইতিমধ্যে ১৯৬১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫ কোটি হবে । তাই জনবিশ্বাসের যে-কোনো পরিকল্পনায় এই বর্ধিত সংখ্যাকেও হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে ।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, সরকারী নীতি মারফিক মধ্য-স্বত্বের বিলোপসাধন এবং উদ্ধৃত্ত জমি নগদ মূল্যে বিক্রয়ের পথ অনুসরণ করেও জনসংখ্যার অতিরিক্ততার সমস্যার সমাধান হয় না । এককথায় বর্তমানে তা হলে সমস্যা দাঁড়াচ্ছে, খুব কম করে ১২ কোটি লোককে জমি থেকে সরিয়ে এনে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা । এ কাজ খুবই কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ । এর উপর আছে শিল্প ও অস্ত্রান্ত্র ক্ষেত্রে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক বেকারের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি । তাছাড়া, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৮ লক্ষ, অর্থাৎ ১৯৬১ সালে এই সংখ্যা ১ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে । তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১৯৬১ সাল পর্যন্ত মোট ১৭ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবার সমস্যা আমাদের সন্মুখে আছে । দ্বিতীয় পক্ষ বাষিকী পরিকল্পনায়, ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করবার প্রতিজ্ঞা আছে । তবুও প্রায় ১৬ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছ-পাঁচ বৎসরের মধ্যে করা কোনো সরকার হারাই সম্ভব নয় । কাজেই, সরকারী উৎপাদননীতি একরূপ এক পথে পরিচালিত হওয়া দরকার, যে-পথের লক্ষ্য থাকবে ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন এবং কৃষিতে শৈল্পিক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করে যত শীঘ্র সম্ভব এই বিরাট জনসংখ্যার বিকল্প কর্মসংস্থান ও সুষ্ঠু জন-বিশ্বাসের বাস্তব ভিত্তি সৃষ্টি করা ; এবং একই সাথে এই মুহূর্তে কৃষিতে জন-বিশ্বাসের

এরূপ ব্যবস্থা করা যার ফলে অধিকাংশ কৃষক খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে পারে, কিছুটা সম্পন্ন হয়।

কি সে পথ? সে পথ জমি থেকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সম্পূর্ণ অবসান। জমির সর্বাধিক পরিমাণ নিদিষ্ট করে, মালিকানা নয়, যারা নিজেরা চাষ না-করে চাষের গোটা জমিতেই সর্ব সময়ের জন্য 'জন' খাটায় বা জমি বর্গা দেয় সেই ধরনের পরিবারের প্রয়োজনমত জমি রেখে আর বাকী সব জমিই উদ্ধৃত বলে ঘোষণা করা। উদ্ধৃত জমি নগদ মূল্যে বিক্রয় নয়, বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে বিতরণ এবং কৃষককে বিনা শর্তে জমির মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত করা। নির্ধারিত রাজস্ব বা খাজনা আদায় নয়, পরিবারের প্রয়োজনের পর উৎপন্নশস্যের একাংশ থেকে আয়ের আনুপাতিক ভূমি-কর নেওয়া এবং অক্ষমদের নিকট থেকে কিছু না-নেওয়া। সমস্ত ঋণ ও বকেয়া খাজনার মকুবী, সুদখোরী ও বন্ধকী ব্যবস্থার অবসান এবং জমি হস্তান্তর আইনের কঠোর সংকোচন। এই হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থা অবসানের সুনিশ্চিত পথ। মধ্যস্থত প্রথার বিলোপসাধন করে বর্গাদারী জীইয়ে রাখলে এবং সুদখোরী ও বন্ধকীর অবসান না-ঘটিয়ে এবং জমি হস্তান্তর আইন সংকোচন না-করলে অধিকাংশ কৃষকের চরমতম দারিদ্র্যের বিনিময়ে ক্ষুদ্র একদল সম্পন্ন কৃষক সৃষ্টি হতে পারে। জমিদারদের চাইতেও যে জোতদার বর্গাদারের নীট মুনাফা অর্থাৎ নীট শোষণের মাত্রা অনেক গুণ বেশি, এ আমরা পূর্বেই দেখেছি। এতে করে না-কমবে জমির উপর থেকে জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ আর না-সৃষ্টি হবে আভ্যন্তরীণ তেজী বাজার। ফলে, দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার কুটির-শিল্প ও গুরু শিল্পের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

অবশ্য কংগ্রেস সরকার বলবেন, তাদের বিরোট সেচ ও বাঁধ পরিকল্পনা দিয়ে, পতিত জমির উদ্ধার সাধন করে এবং অনাবাদী জমি আবাদ করিয়ে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে দেশের দারিদ্র্য দূর করবেন। কিন্তু কৃষি-ক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকারের উৎপাদন নীতি ও পরিকল্পনা সামন্ততান্ত্রিক কায়েমী স্বার্থের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জমিদারীর অবসানের পথে যেমন কংগ্রেস সরকার সামন্ততন্ত্রের সাথে আপোস করে বর্গাদারী, সুদখোরী প্রভৃতি “সামাজিক সুবিচারের” জন্তেই জীইয়ে রেখেছেন, ঠিক উৎপাদন পরিকল্পনাও একই ভাবে তারা আপোস করেছেন এই স্বার্থের সাথে। বিরোট-বিরোট বাঁধ সেচ পরিকল্পনা দিয়ে এবং পতিত ও অনাবাদী জমি পুনরুদ্ধার করে কৃষি ক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকার কি পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করবার পরিকল্পনা নিয়েছেন? স্বাধীন ভারতের সেক্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, ভারতবর্ষে একর প্রতি গড় পড়তা উৎপাদন হয় ৪৮০ পাউণ্ড এবং সমস্ত প্রকার চেষ্টা করে ১৯৬১ সালে কংগ্রেস সরকার একর প্রতি গড়-পড়তা উৎপাদন কমতা বৃদ্ধি করতে পারবেন ৫৫০ পাউণ্ড পর্যন্ত। এই বর্ধিত উৎপাদনও সম্ভব হয়ে উঠবে কিনা সে-বিষয়েও কোনো সুনিশ্চিততা সেক্সাস রিপোর্ট দিতে পারেনি, কারণ জমিতে “উৎপাদনের ক্রম-ক্ষীয়মানতা”র (ল অব ডিমিনিশিং রিটার্ন) কথা তো ভুলে গেলে চলবে না। সেক্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে একর প্রতি ৫৫০ পাউণ্ড উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে বর্তমান উৎপাদনের উপর আর মাত্র ২৪০ লক্ষ টনের বেশি উৎপাদন নাকি অসম্ভব। “.....আমরা হিসেব করে

দেখেছি, বছরে মাত্র ২৪০ লক্ষ টন কৃষি-জাত পণ্যের উৎপাদন আমরা বাড়াতে পারি। এই বর্ধিত উৎপাদন সম্ভব হবে : এক ষষ্ঠমাংশ, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে আর আরেকটা, সেচ ব্যবস্থার সাহায্য ব্যতিরেকে একরপ্রতি ফসল বাড়িয়ে। এই বর্ধিত উৎপাদনও আনাদের ১৯৭১ সালের প্রয়োজনের চাইতে অনেক কম হবে। বর্তমানের ঘাটতি এবং ১৯৬৯ সালের দিকে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যে ৪৫ কোটি হবে তাদের বর্ধিত চাহিদা এই বর্ধিত উৎপাদন কোনোরকমে মেটাতে সক্ষম হবে।” (সেক্সাস অব ইণ্ডিয়া-১৯৫১, ভলুম ১, পর্ব ঐ পৃ: ২০৬)। সেক্সাস রিপোর্ট এই সাথে আরও বলেছে, যতরকমভাবেই জমিতে উৎপাদনের উৎকর্ষতা আনা হোক না কেন কোনো ক্রমেই একর প্রতি ৫৫৩ পাউণ্ড ফসল ফলানো নাকি সম্ভব নয়।

অন্যান্য দেশের গড়-পড়তা একরপ্রতি উৎপন্ন ফসলের সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে ভারতবর্ষ কত পেছনে পড়ে আছে।

একরপ্রতি গড়পড়তা উৎপন্ন ফসল (১৯৪৯) পাঃ হিঃ

দেশ	গম	ধান	ভুট্টা জনার ইত্যাদি
আর্জেন্টিনা	১০০৮	১৭৪৮	৯১০
অষ্ট্রেলিয়া	১০০৪	৪২২০	১৪৭২
ইজিপ্ট	১৭৪৮	৩৫৩৩	১৭৭৫
ফ্রান্স	১৭০৪	২৬৩২	৫৭১
ভারতবর্ষ	৫৪৮	১০৩২	৫৬০
জাপান	১৫৩৪	৩৪৬২	১১১৬

আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া ও ইজিপ্ট (১৯৪৯ সালে) এই তিনটি দেশই সাম্রাজ্যবাদী গোপ্পির অর্থনীতিক নীতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করেই তাদের উৎপাদননীতি নির্ধারণ করে। ফ্রান্স ও জাপান যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতিপূরণ করেও এতদূর এগিয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের এই অবস্থা কেন? তার প্রধান কারণ, বৃহদাকারে শৈল্পিক ভিত্তিতে কৃষি-পণ্য উৎপাদনের কোনো প্রয়াসই সরকারী উৎপাদননীতিতে স্থান পায়নি। অথচ ভূমি-সম্পর্কই কেবলমাত্র পরিবর্তন করা হলে কৃষি-পণ্যোৎপাদনের যে কি বিপুল ও ব্যাপক সম্ভাবনা ভারতবর্ষের আছে তা বোঝা যাবে সরকারী “অধিক শস্য ফলাও” আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে জনকয়েক কৃষকের একর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ থেকেই। ১৯৫১-৫২ সালে কৃষক জয়পাল চন্দ্র প্রতি একর জমিতে ৭৩৫ মন আনু ফলিয়ে সরকার থেকে “কৃষি পণ্ডিত” উপাধি পেয়েছেন। নিজামাবাদ (তেলেঙ্গানা) জেলার আহমদ বীন মহম্মদ গাউস ১৯৫৩ সালে ১০, ২৪৪ পাউণ্ড ধান প্রতি একরে ফলিয়ে হায়দরাবাদের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। “অধিক শস্য

ফলাও' অল্পসংখ্যকী কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় (পৃ: ৩৯) নিম্নলিখিত উৎপাদন রেকর্ড স্থাপন করেছে।

প্রতিযোগিতায় উচ্চতম উৎপাদন : একরপ্রতি উৎপাদন (মন হি:)

রাজ্য	ধান	গম	আম
মাদ্রাজ	১৪৬	—	—
পশ্চিমবঙ্গ	৬০	৪৩	৬২২
উত্তরপ্রদেশ	৬৬	৫৯	৭২৬
বোম্বাই	৮২	৩৩	—
হায়দ্রাবাদ	৯৪	—	—
কুর্গ	১০১	—	—
বিক্রাপ্রদেশ	—	৪৫	—
বিহার	৯০	৪৬	৪১১

কাজেই, কৃষি-পণ্যোৎপাদনের বৃদ্ধি প্রধানত ও মূলত বিরাট বিরাট বাঁধ ও সেচ-পরিকল্পনা কার্যকরী করার উপর নির্ভর করে না। কৃষি-পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি মূলত নির্ভর করে ভূমি-সম্পর্ক পরিবর্তনের ধরনের উপর।

দ্বিতীয়ত সেচ ও বাঁধ পরিকল্পনা যদিও কৃষি-পণ্যের উৎপাদন খানিকটা বৃদ্ধি করেছে এবং খাদ্যসমস্যার খানিকটা আপাত সমাধান করেছে কিন্তু কৃষিসংকট এবং জমির উপর থেকে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ কমানোর দিক থেকে এ-সমাধান একেবারেই স্থায়ী নয়। আজকের দিনে প্রতিটি দেশ যখন যন্ত্রশিল্পের ভিত্তিতে অগ্রসরমান তখন খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে ভারতবর্ষের মতো একটি বিরাট দেশ না-হতে পারে সমৃদ্ধিশালী আর না-হতে পারে আত্মনির্ভরশীল। বিরাট বিরাট সেচ ও বাঁধ পরিকল্পনা, একান্তপ্রয়োজনীয় হলেও, আজকের দিনে পুনরুৎপাদনের ও নতুন পুঁজি সৃষ্টির মূল ভিত্তি নয়। ইংরেজ কর্তৃক ভারতবর্ষ অধিকৃত হওয়ার আগে সেচ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বসে ছিল এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ মনোযোগের সাথে সেচ-ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ করতেন বলেই মধ্যযুগীয় জঘন্য শোষণের মধ্যেও ভারত শস্য-স্খামলা সোনার ভারত ছিল। কারণ তৎকালীন সেচ-ব্যবস্থা ও বাঁধ প্রভৃতি ছিল কৃষি-পণ্য পুনরুৎপাদনের অন্যতম মূলভিত্তি। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যাপক পুনরুৎপাদনের (এক্সটেনডেড প্রোডাকশন) মূলভিত্তি গুরুশিল্পের মাধ্যমে নতুন নতুন পুঁজির সৃষ্টি ও বিনিয়োগ। পশ্চাদপদ, অনগ্রসর কৃষি-প্রধান দেশে ক্রম-বর্ধমান আমদানীর মূল্য চুকিয়ে দেবার ক্ষেত্রে যে ক্রম-বর্ধমান রপ্তানীর প্রয়োজন হবে, তার ফলেই দেশের উৎপাদনের

বারো আনা হবে ব্যয়িত। একপ অবস্থায় কৃষি-পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কি দেশ সম্মুখীন হতে পারে? তাই আজকের দিনে বিরাট বিরাট সেচ ও বীধ পরিকল্পনাকে নূতন পুঁজি সৃষ্টির উপায় হিসেবে ব্যবহার না-করে কৃষি-পণ্যের পুনরুৎপাদনের প্রচুর সহায়তা করলেও শেষ পর্যন্ত লাভের চাইতে লোকসানের আশঙ্কাই বেশি। রাষ্ট্রসংঘ ভারতবর্ষের ১৯৫৩-৫৪ সালের উৎপাদন ও বাণিজ্য সম্বন্ধে এক বিবরণী দিতে গিয়ে বলেছে : “বিশ্বের বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতের নিজস্ব অবদান হচ্ছে শস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি।” কিন্তু এর ফলে ৫৩-৫৪ সালে আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যে ভারতবর্ষ কতটুকু লাভবান হয়েছে? “১৯৫৪ সালের প্রথম ১১ মাসে ভারতে বাণিজ্য ঘাটতির প্রকৃত পরিমাণ ছিল ৩৫.৯৮ কোটি টাকা। অন্যদিকে ঐ বৎসরেই বাণিজ্যিক ভারসাম্যে আসল ঘাটতি ছিল ২৪.৯৫ কোটি টাকা।”

(লোকসভার ২৭২ নং প্রশ্নের উত্তরে : ১৭।৩।৫৫)

বিরাট বিরাট সেচ ও বীধ পরিকল্পনার চতুঃপার্শ্বে যদি কৃষিকে শৈল্পিক ভিত্তি দেওয়ার জন্তে যন্ত্রশিল্প গড়ে না ওঠে এবং জন-বিদ্যুতের সাহায্যে যদি কৃষি না করা যায়, তবে একদিকে যেমন সেচ ও বীধ পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য অপরদিকে কুটির শিল্পের বৈদ্যুতিক করণের কার্যকারিতাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। যে-পরিকল্পনায় কৃষকের সমস্কার সমাধান নেই এবং তেজী আভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টির প্রয়াস নেই, সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তবুও একথা মনে রাখা প্রয়োজন, কংগ্রেস সরকারের বিরাট বিরাট সেচ ও বীধ পরিকল্পনা তাদের ইচ্ছা ও অনিচ্ছার বাইরেই কৃষিতে শৈল্পিক ভিত্তির বাস্তব ভিত্তি সৃষ্টি করেছে। এর আক্রমণ রোধক্ষমতা কারো নেই।

কংগ্রেস সরকার জানে, এসব বিরাট বিরাট পরিকল্পনায় জমি থেকে জনসংখ্যার চাপ কমানো যাবে না। তাই এতসব পরিকল্পনা সত্ত্বেও তারা উৎপাদনের শেষ সীমা (৫৫৩ পাউণ্ড) ও জনসংখ্যার শেষ-সীমা (৪৫ কোটি) বেঁধে দিয়েছেন। একে কার্যকরী করবার জন্তেই কংগ্রেস সরকারের পরিবার-পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। প্রথমে কংগ্রেস সরকার ক্যানিউটের জলোচ্ছ্বাস শুরু করে দেবার মতোই উৎপাদন ও জনসংখ্যার অগ্রগতিকে শুরু করে দিতে চাইছেন। কিন্তু ক্যানিউটের আদেশও যেমন কার্যকরী হয়নি, তেমনি কংগ্রেস সরকারের আদেশও কার্যকরী হচ্ছে না বলেই তারা প্রক্রাসটিসের নৃশংস পথ ধরেছেন, অনাগতের আগমনের সমস্ত সম্ভাবনার পথ রোধ করে দাও—বন্ধা কর জননী ও জন্মভূমিকে।

স্বতন্ত্র ধনতন্ত্রের স্বপ্নানে কংগ্রেস সরকার শব সাধনায় মগ্ন। এই সাধনা জীবনের জয়গানে মুখরিত হয়ে ওঠে না। স্বজনশীল নিখুঁত মাল্লুকে ক্যাপালিকের হাড়ি-কাঠে বলিদানই এর বিশেষত্ব। তাই তো সেল্যাস কমিশনার মিঃ এ আর গোপাল-স্বামী বলেছেন : “এমনভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যাতে করে স্বতন্ত্র হারের চাইতে জন্মের হার কোনো প্রকারেই বেশি না-হয় এবং এইভাবেই জনসংখ্যা ৪৫ কোটি হবার আগেই যেন আমরা জনসংখ্যাকে যথাসাধ্য সমাবস্থায় একজায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি। (ঐ পৃ: ২১৬)

সম্রাট সাজাহান

শিশিরকুমার দাশ

এ গাঁয়ে তিনদিন কাটাবার পর তোমাকে দাহুর কাছে যেতেই হবে।

প্রথমদিন রাখহরি মণ্ডল রায়পাড়ার দালানে বসে খাজনা সম্বন্ধে কথা বলবে।
ষষ্ঠবে, আহা বেচারী পাগল হয়ে গেল—শোকের ছুঁখে।

অমন পাগল ত' কত হয়। তুমি আস্তে আস্তে চলে যাবে আমগাছিয়ার মাঠে
কপাটিখেলা দেখতে। দেখা হবে শেখ রহিমুদ্দীনের সঙ্গে। লম্বা সেলাম করে সে
হাসবে দাড়িনেড়ে—গাছপাকা কালোজান খাওয়াবে বেছে বেছে, আর বলবে : শীতকালে
যদি আস বাপু খেজুরের রস যা হয়ঠে—

সমাসন্ন শীতের সকালের আমগাছিয়ার মাঠ স্বপ্নের মতো ভেসে উঠবে ছুঁচোখে—
কাপড় গুটিয়ে, আস্তে আস্তে গাছে উঠছে রহিমুদ্দীন—ভাঁড় নিয়ে নামছে—চোখে
ভূপ্তি তার।

সন্ধ্যা হবে। রহিমুদ্দীন এগিয়ে দেবে ভাঙা পুলটা পর্যন্ত। শুধু নো খালটাকে
বাঁদিকে কেলে তুমি এগিয়ে যাবে ধুলিডোবা পথ দিয়ে—ঝাউগাছের ধারে তখন জোনাকী
অলবে—বাতাসে ভেসে আসবে দূর থেকে শাঁখের শব্দ। আর তুমি যখন হঠাৎ সেই
জোনাকীগুলোকে ধরতে যাবে, তারা উড়ে যাবে, উড়ে গিয়ে বসবে ঝুমকোলতার
ডালে। ছুটে গিয়ে দেখবে একটা পোড়ো হাঁটের পাঁজা। আগে বোধ হয় বাড়ি ছিল,
কিংবা মন্দির। এসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ শুনবে বাড়ির চাকরের গলা : ও বাবা,
তুমি ত' বেশ, সন্ধ্যা পর্যন্ত অচেনা জায়গায় এই পোড়ো মন্দিরে ঘুরছ। চল, শিগগির।

পরের দিন তুমি জ্যাঠামশাইকে ভিজ্ঞাসা করবেই : ঐ পোড়া মন্দিরটা কার।
স্বপ্নভাবী জ্যাঠামশাই একটু হাসবেন। ওটা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। তারপর বলবেন : ওটা
একটা ডাকাতির। কিছুটা হিংস্র হয়ে উঠবেন হয়ত : ডাকাতি ক'রে কি প্রচুর টাকা
অমিয়েছিল তার শাস্তি।

দাহু যে ডাকাত ছিল এ-কথাটা শোনার পর থেকে তোমাকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়তে
হবে পথে। সেদিনের ডাকাত আত্ম পাগল। মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটবে তুমি—ধানের
জলা—আল দেওয়া মাঝে মাঝে—সেখানে বারবার হাঁচট খাবে তুমি—তবুও দিগন্ত
পর্যন্ত হাঁটতে চাইবে। হাওয়া ভীষণ তীব্র হয়ে বইবে চারপাশে। রাঙা সূর্য পশ্চিম
থেকে আলো ছড়াবে তোমার মুখে। দূর থেকে ঝিল্লীর শব্দ ভেসে আসবে কানে। তুমি
নিজেকে জানো না কখন তুমি হাটখোলা ছাড়িয়ে রঙপটির শ্মশানে পৌঁছেছ। হাওয়াই
তোমাকে বলে দেবে : এইখানে দাহুর আস্তানা ছিল। ডাকাতি হত। গা তোমার
যদি শিউরে ওঠে একটা সিগারেট ধরিও। তারপরে তাকিয়ে দেখ ছুঁচারটে মাথা
এখনও মিলবে। এমন সময় ওপাশের শিমুলগাছ থেকে চারটে বাহুড় হঠাৎ ডানা ঝটপট
করে উড়ে যাবে।

তুমিও এবার পেছনে ফিরবে। সেই মরাখালের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাবে ঝাউগাছটার কাছে, যেখানে জোনাকী জ্বলে, পোড়ো ইঁটের স্তুপের ধারে দাঁড়িয়ে দেখবে এইখানে দাছুর টাকা ভাগ হত। লুঠের মাল ভাগ হত। বেশিক্ষণ তুমি ভাবতে পারবে না, কারণ জ্যাঠামশাই আবার হয়ত চাকর পাঠিয়ে দেবেন।

পরের দিন জ্যাঠামশাই তোমায় সাধুকাকার বাড়িতে পাঠাবেন। দুদিন গাঁয়ে এসেছো সাধুকাকার সঙ্গে দেখা না করলে তিনি ভাববেন কি? তুমি গিয়ে প্রণাম করবে। সাধুকাকা নানা কথা বলবেন। এমন সময় সাধুকা'র ছেলে চুকবে : এই যে অমলদা। তুমি ত' এখন কিছুদিন আছ, তা তুমিই সাজাহানের রোলটা করনা কেন?

তুমি কিঞ্চিৎ বিব্রত হবে, বলবে, আমি—আমি কি—আমি কি করে— সাজাহান ইত্যাদি। তাছাড়া অভিনয় ত' আমি করি না। ইতিমধ্যে সাধুকা'র মেয়ে কাজল নারকেলের নাড়ু আর নারকেলের পুর-দেওয়া ছুধেসেদ্ধ পিঠে নিয়ে চুকবে। সে বলবে : হ্যাঁ, অভিনয় কর না। গেলবারের আগেরবার ক'লকাতায় মাসির বাড়িতে তোমাদের বৈকুণ্ঠের খাতা করেছিলে, তুমিই ত' বৈকুণ্ঠ ছিলে।

তুমি ল'য়ের ছাত্র। কিন্তু কিছুতেই বোঝাতে পারবে না যে প্রিন্সিডেন্স সবক্ষেত্রে খাটে না। কিন্তু সাধুকাকাই তোমাকে আশ্বাস দেবেন : ভয় নেই, ওরা প্রতি বছরই সাজাহান করে, মানে করার চেষ্টা করে। কাজেই তোমাকে যে সত্যি সত্যিই অভিনয় করতে হবে এমন নয়।

তুমি আশ্বস্ত হয়ে একটা নারকেল নাড়ু মুখে দেবে, অজান্তে তোমার চোখটা এদিক ওদিক করবে, কাজল তখন অবিশিষ্ট আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখবে এবং যে যুহুর্তে তুমি তা জানতে পারবে তখনই গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করবে সাধুকাকাকে : এখন এখানে ধানের মণ কত।

সাধুকাকা অভিজ্ঞ লোক কিন্তু তিনি কেন জানি না এ-কথাটা শুনতে পাবেন না, তখনও তিনি অভিনয়ের কথা বলছেন, হঠাৎ তোমার কান খাড়া হয়ে উঠবে, তিনি বলছেন দাছুর সম্বন্ধে : আঃ অভিনয় বটে, সারা মাঠটা কেঁপে উঠত : আমাকে কারাগারে আবদ্ধ করেছ—পিতৃদ্রোহী—শৃঙ্খলিত সিংহের গর্জন শুনতে পারছ না— জাহানারা। একি—একি তুমি কে—মমতাজ—কেন এলে—যাও—যাও।

এর পর হঠাৎ কাজল চুকবে ঘরে। এবং তুমি বোকার মত একটা প্রশ্ন করবে : দাছু কি ভালো অভিনয় করতেন? ডাকাত এসে খুলল খিয়েটারের দল। —কমলীলা। মনসামঙ্গল গান। অবশেষে কর্ণাজু'ন—আর সাজাহান।

সাধুকাকার চোখ দিয়ে জল পড়ছে দেখে তুমি কথাটা ঘোরাতে চেষ্টা করবে, বলবে : সাধুকাকা ওই ইঁটের পোড়া জায়গাটা কি?

সাধুকাকা এইবার শূন্যে তাকিয়ে জবাব দেবেন : সম্রাট সাজাহানের তাজমহল।

দাছুর সঙ্গে দেখা যখন করতেই চাও তখন জ্যাঠামশাইর ঘোড়ায় চেপেই বেও।

উদয়পুর গাঁ ছাড়িয়ে ওই যে রাস্তা ওখান দিয়েই যাও, সোজা, সামনে একটা আমগাছ, সরু রাস্তা, ওখানেই ঘোড়াকে ছেড়ে দিও । দোতারা বাড়ি । গিঁড়ি দিয়ে উঠে যেও । ঘরের মধ্যে দাছ বসে আছেন ! ঘরে ঢুকেই দেখবে ছোটো ছবি : রাণা প্রতাপ দেওয়ালে ঝুলছে—আর সাজাহান চৌকীর উপর বসে আছে । প্রণাম করলেই দাছ বলবেন : এস, এস, বোস—কে রে জাহানারা !

মামীনা এসে বলবেন : ও যে অমল—মুখুজো বাড়ির—

দাছ হেসে বলবেন : ওহো তাইত, তাইত, অমল—সে এত বড় হয়েছে । দেত' আমার চশমাটা, চশমা পরে দাছ তোমার দিকে তাকিয়ে দেখবেন, বাঃ বাঃ বাঃ হিমাংস্তুর ছেলে এত ডাগর হয়েছে । বারে বারে—চুলে বাহার—চোখে চশমা—পকেটে কিরে—কলম । হাতে ঘড়ি নাকি রে । তুমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠবে ।

দাছর সঙ্গে কথা জমে উঠবে । কেমন করে যে জমে যাবে সেটাই আশ্চর্য ।

দাছ বলবেন : ছি ছি ভাই শরীরটা এমন রোগা করলে ত' চলবে না । দেখেছ আমাকে । লড়—লড়বি আয় পাগু । দেখছিস আমার হাত । এখনও পারি—এখনও পারিরে ।

ওই যে সড়কি দেখছিস, ওটা ছুঁড়তাম, মরা নদীটার ওপারে গিয়ে পড়ত ।

দাছ বলে চলবেন : ওই যে রাস্তা ওখানেই ত' বসে থাকতাম । তারপরে বাছাধনদের দেখে নিতাম । হোঃ হোঃ ! তুমি আন্তরিক হয়ে জিজ্ঞাসা করবে : দাছ, তুমি ডাকাতি করতে কেন ?

হো হো তোর বাপ অ্যাঙ্কুয়েট—তুই এম এ পাশ করলি । আমার বাপকে জমিদার মারল, আমি মারলাম জমিদারকে । হো হো । ডাকাত কি আর এমনিই হলাম ।

সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে তুমি তোমার ডায়েরিতে লিখবে :

মানুষের জীবনে কত গোপন ব্যথা সঞ্চিত আছে তাহা আমরা জানি না বলিয়াই এমন করিয়া মানুষকে ভুল বুঝি । কোন রুক্ষ বালুকার অন্তরালে কোন ফস্তুত বহিয়া চলিয়াছে তাহা যদি আমরা জানিতাম তবে পৃথিবী এমন করুণ হইত না । মানুষকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতে পারিতাম না । মানুষকে ডাকাত বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়া নিশ্চিন্তে খাইয়া দাইয়া ঘুমাইতে পারিতাম না । আজ স্থান সন্ধ্যার ছায়ায় দাছর দিকে তাকাইয়া যেন একটি পর্দা উঠিয়া গেল, আমার চোখের সামনে এক আশ্চর্য আলোক স্তাসিয়া উঠিল । স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম পিতৃমাতৃহীন এক বালকের করুণ বেদনা । একদিন কোন এক ডাকাতির দল তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায় । তারপর সেই দলের হিংস্র বৃত্তি তাঁহারও রক্তের মধ্যে মিশিয়া তাঁহাকেও ডাকাত করিয়া ভুলে । কতজনের কত ক্ষতিই হইয়াছে কিন্তু তাঁহার নিজের ক্ষতি । হয়নাই কি । তিলে তিলে আপনার বংশের ঐতিহ্যকে তিনি পার্শ্ববিকর্তার হস্তে সমর্পণ করিলেন—রাঙপুরের শ্মশানে কত কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে, ভিটগড়ের খালের পাড়ের কাশবনে, রামচকের নিভৃত ভগ্ন মন্দিরের অন্তরালে জীবন বাড়িয়া উঠিতেছিল—এমন সময় কেন যে যমুনার সহিত তাঁহার দেখা হইল তাহা রসিক বিধাতা ছাড়া কেহই জানে না ।

ভাদ্রমাসের এক বিকালবেলায় যমুনা হাট হইতে বাড়ি কিরিতেছিল। দাছ তাহার ঝুড়ি হইতে একটি বাতাবী লইয়া দাম দিতে চাহিলেন। সে হাসিয়া কহিল : তোমার দাম লুব না। সেই হাসির বিহ্বৎ দাছর বুকের প্রাচীর চিরিয়া মনের দরজায় ধাক্কা দিল। যমুনা জীবনে যাহা দিয়াছে তাহার দাম লইবে না। দাছ এই বলিয়া আজ কাঁদিয়াছিলেন।

সমস্ত বিকেল তোমার মন উদাস হয়ে থাকবে। চেনা গানটা গাইবার চেষ্টা করে দেখবে কথাগুলো ভুলে গেছ। ভাঁজবার চেষ্টা করলেই দেখবে সুরটাও বেতানা হয়ে যাচ্ছে। তাই আজও ঘোড়ায় চেপে দাছর কাছে যাবে। আজ দাছ বারান্দায় থাকবেন, চোখে চশমা থাকবে, এই সময়টা তিনি দেবীচৌধুরাণী পড়েন। ভবানী পাঠক তাঁর প্রিয় লোক। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে তিনি তাকিয়ে দেখবেন। তুমি যেই ওপরে যাবে ভারী খুশি হয়ে বলবেন : বাঃ বাঃ ভারী সুন্দর ঘোড়া কিনেছিস ত' দাদা। জানিস আমাকে আর এরা ঘোড়ায় চড়তে দেয় না, কেন রে। তুই একটু বলবি সুবোধকে। সুবোধ দাছর বড় ছেলে এখন ভালো ইকুলে পড়ায়।

ওই যে আমার আস্তাবল। ওখানে আমার ঝলুকা ছিল। আঃ কি স্বাস্থ্য বাছার। উদয়পুর থেকে সাক্ষাপাশ আঠার ক্রোশ রাস্তা ঝড়ের বেগে চলত। সন্ধ্যাবেলা ওই লালমাটির পথে ধুলো উড়িয়ে ছুটতো যেন রাজপুতুর। তোর আইমা বকত অত জোরে ঘোড়া ছোটোও কেন। আমি হেসে বলতাম : তা নাহলে কি তোমাকে নিয়ে পালাতে পারতাম। তোর আইমাকে তো দেখিসনি। আহা তোকে দেখলে বড় আনন্দ হত তার। হিমাংগু বড় ভালোবাসত তাকে।

তুমি হেসে বললে : দাছ তুমি আইমাকে নিয়ে পালিয়েছিলে বুঝি।

: আরে বাবা। না হলে রকে আছে পুলিশে ধরে পাঠিয়ে দিত—

মামীমা চুকে বলবেন : অমল, তোমার সঙ্গে এখনও আক্ষেবাজে বকছেনত' উনি। জানো ওঁর ধারণা উনি নাকি আগে ডাকাত ছিলেন, সেইসব গল্প বছর খানেক হল যাকে পান তাঁকে বলেন। ওসব শুনোনা।

: বোমা ত জানেন না—জীবনের শেষে এসেছি—নিজের কথা যদি না বলি—যাক্গে।

এ গাঁয়ে এলাম কতদিন হল। তারপর সুবোধ হল, তারপর, তারপর থেকেই বন্দী আমি, আমার দুর্গে আমি বন্দী, প্রহরী—প্রহরী ছুটে এস—আমার তরবারী দাও—ভেঙে চুরমার করেদি।

• : উনি আবার প্রলাপ বকছেন—চলে এস অমল।

: ওরা ভাবে প্রলাপ। জাহানারা—আর একটু কাছে এস—এই অন্ন রন্ধপিতার বুকে হাত দিয়ে দেখ—জ্বলছে—আগুন জ্বলছে। একদিন এই চোখে ছিল আকাশের কামনা। বাহতে ছিল সমুদ্রের শক্তি। মনে ছিল বাতাসের বেগ—আর আজ আমি বন্দী—আমার কারাগারে বন্দী। যমুনা—

নামীমা এসে দাছকে তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেন—বাইরে থেকে তাল দিবে দেবেন। তুমি শুনতে পাবে তখন গর্জন উঠবে : মোহম্মদ আমি তোমার পিতামহ, পিতার আদেশে আমার তুমি বন্দী করেছ, আমি তোমার পিতার পিতা—পিতামহ ; আমাকে অজ্ঞাগারে যেতে দাও—আমার দুর্গের গ্রহরীরা তোরা কোথায় ?

হুদিন বিকেলে তুমি যেতে পারবে না। কারণ তোমাকে শাজাহানের রিহার্সাল দিতে হবে, কারণ তোমাকে কাজল সন্ধ্যাবেলায় নিমন্ত্রণ করবে। সন্ধ্যাবেলায় নিমন্ত্রণে দেখবে কাজল তোমার দিকে তাকিয়ে হাসবে, কথা বলবে না কিছুতেই। কাজলের বোদি তোমাকে বলবে : হ্যাঁ গো ঠাকুরপো, তোমার নাকি বিয়ে।

ব্যাপারটা তুমি সম্পূর্ণ না জানার ভান করে বলবে : বল কি বোদি।

বোদি বলবেন : মেয়েটি কেমন। দেখ আবার খাঁদা বোঁচা যেন না হয়—তোমার মত টুকটুকে, বেশ ছোট্টমেয়ে, পায়ে ছুপুর দিয়ে দেবে ঝুমুর ঝুমুর শব্দ হবে।

এত কথা শুনে তুমি নিশ্চয়ই ঘাবড়ে যাবে, ব্যাপারটা যে এতদূর চলেছে কি করে জানবে। তখন সত্যি সত্যি জানবার ইচ্ছে হবে : ব্যাপার কি বোদি—বাবা কাকা কি করছেন এমন হৈচৈ। থাকে তাকে বিয়ে করলেই হল।

বোদি হেসে বলবেন হয়ত : থাকে চাও তাকেই।

তুমি কিছু বলতে চাইবে হয়ত কিন্তু বোদি বলবেন, বুঝেছি-বুঝেছি।

পরের দিন দাছর কাছে যাবে। গিয়ে দেখবে কাজল বসে আছে। কি দাছ হুদিন ছিলে কোথায় ?

চোক গিলে বলবে : রিহার্সাল দিচ্ছিলাম। কাজলের তীব্র কটাক্ষ বিধবে।

দাছ উৎসাহিত হয়ে উঠবেন : রিহার্সাল। বাবা বা। আমি প্রথম যাত্রা করতাম। জগাইএর ডুমিকা, নিত্যানন্দকে মারলাম কলসীর কানা। দুর্খোধন করেছি : বিনামুদ্রা নাহি দিব সূচ্যত্র মেদিনী। তোর বাবা সেবার হল শ্রীকৃষ্ণ। আঃ দারুণ জমেছিল : অন্তায় অন্তায় কহে সবে।

কিন্তু ক্ষত্রিয় আমি

বাহুবলে বলী তাই ধর্মবলে নহি

ধর্মাবল দুর্বলের—ক্ষমা ক্ষমা করে সবে

ভিখারী পাওব দল—রাজা দুর্খোধন কতু ধর্মে নাহি ডরে।

কিন্তু দারুণ হত শাজাহান।

আমাকে অজ্ঞাগারে যেতে দাও মহম্মদ। মুন্সের জয়ধ্বনি আমার হৃৎপিণ্ডকে ছিঁড়ে দিচ্ছে—আমার দুর্গের প্রাচীর ভেঙে কোন জলস্রোত এগিয়ে আসছে—আমার স্তরবারী দাও গ্রহরী—গ্রহরী।

হ্যাঁ—তোমরা কি নাটক করছ অমল।

তুমি উৎসাহিত হয়ে বলবে : আজ্ঞে শাজাহান। আমিই শাজাহানের ডুমিকায়।

দাছ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন : তুমি, তুমি করবে—বলকি।

কাজল বলবে : খুব ভাল করে ।

দাছ ক্ষিপ্ত হয়ে বলবে : না, না । বাংলায় একটা বই আছে—সাজাহান । আমার । শুধু আমার ।

বাবা স্বেবোধ—তুটো টাকা দিবি আমার—তাজমহলটা একটু সারাবো । ও চলে যাচ্ছে—উলুক ঔরংজীব । আমি তোমাদের পরোয়া করিনা—দারার মুণ্ড তুমি কেটে এনেছ—তোমার মুণ্ড খসিয়ে দেব জানো—কত কোটি টাকা খরচ করে তাজমহল গড়েছি—কত টুঁটি টিপে মেরেছি । কি পাগলামি করছি—বটে । আনাকে বন্ধ করে দিচ্ছে—না—না—আনাকে বন্ধ করোনা—জাহানারা যমুনা—কাজল—অনল আনাকে যে মেরে ফেলছে ।

কাজল দাছর মাথায় হাত দিয়ে বলবে—না না—কই কিছু হয়নি ।

দাছ নিঃশ্বাস ফেলে বলবে : যাক—হয়নি ত । আমি ভাবলাম বুঝি কিছু হল । হ্যাঁ তা বলছিলেন—তাজমহল—না ! হ্যাঁ অনেকদিন ধরে করেছি । যমুনা আজো ঘুনিয়ে আছে ওখানে ।

রাত্রিতে ডায়েরীতে তুমি লিখবে : যমুনার প্রেম আবার তাঁহাকে ধীরেধীরে মানুষের স্তরে ফিরাইয়া আনিল । কিন্তু সে যে কোনো দাম লয় নাই—তাই তাঁহাকে দাম দিতে হইল সারাজীবন ধরিয়া । এক দুর্যোগ রাত্রির অন্ধকারে ঘোড়ায় চড়িয়া কয়েকশত মাইল পার হইয়া যমুনাকে লইয়া তিনি কুঁড়ে বাঁধিলেন । আর ডাকাতি করিব না—সতী নারীর গাত্র পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন । তারপর যাত্রায় থিয়েটারে দিন কাটিতে লাগিল । কিন্তু মানুষের মনের অন্তরালে কোন কোতুকী বসিয়া আছেন । তিনি কেনন করিয়া যমুনার প্রতি দ্রব্ধ একটি ব্যঙ্গের হাসি হাসিলেন । যে মেয়ে একদিন ঘর ছাড়িয়া, কুল ছাড়িয়া, পরিচিত মানুষের সঙ্গ ছাড়িয়া প্রেমের আকর্ষণে ভাসিয়া আসিয়াছিল—তাঁহাকে দাছর সন্দেহকাতর মন একদিন নিষ্পিষ্ট করিয়া দিল । ভুল করিয়া, ভুল বুঝিয়া, ইয়াগো হানিফের চক্রান্তে একদিন যমুনাকে দুইহাতে তাহার জীবনের সমস্ত দাম মিটাইয়া দিলেন । যে হাত এতদিন অসংখ্য মানুষ হত্যায় কলঙ্কিত হইয়াছিল—সেই হাতের রক্তলিপ্ত চর্মে নারীহত্যার কলঙ্ক জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিল । তাহার পর হানিফের স্বত দেহটা রাওপুরের শ্মশানে ফেলিয়া দিয়াছিল—আর তাঁহার যমুনাকে ডাকাতির সমস্ত উপার্জনের ধন দিয়া একটি আশ্চর্য মন্দিরের তলায় চাপা দিয়াছিলেন । যমুনা আগুনে পুড়িয়া গেল, সেই মন্দির রহিল । আজ সন্ধ্যায় যখন বারান্দায় বসিয়া ছিলাম তখন শুক্ল পক্ষীর চাঁদ উঠিয়াছে । আলোয় দিগন্তরাল ভাসিয়া যাইতেছে । আর দাছ সেই ভাঙ্গা মন্দিরের দিকে তাকাইয়া কাঁদিতেন—জীবন দিয়া তাহার জীবনের দাম মিটাইতে হইবে । সুদূরে ঝাউগাছে ছোনাকীগুলি জ্বলিতেছে—তাঁহারা যেন যমুনার স্নিগ্ধ হাসি । তাঁহারা বলিতেছে—ক্ষমা করিলাম, ক্ষমা করিলাম । প্রেমের তীর্থে তুমিও একদিন আমারই পাশে চলিয়া আসিও ।

বাড়ি ফেরার পথে কাজল বলবে : চল একটু বেড়িয়ে আসি

তুমি বলবে : ভাল লাগছে না । কোথা যাবে ।

কাজল বলবে : তাজমহলে ।

ছোট গল্পের ভূমিকা

শুরুদাস ভট্টাচার্য

ছোট গল্প কথাসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সমৃদ্ধ শাখা। এতে আছে গল্পের ঝঙ্কুতা, ব্যঙ্গনার দীপ্তি, মনের বিরাট আকাশের একটি ছোট নক্ষত্রের ততোধিক ছোট একটি আলোঝিকিমিকি কথা। তার আশ্রিত শানিত তীক্ষ্ণ অথচ মনকাড়ানিয়া বাচনভঙ্গি ; পরিণতিতে নাটকীয় চমৎকৃতি। পড়ে বোধ হবে—‘শেষ হয়েও হইল না শেষ।’ ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাম্প্রতিককালে ছোটগল্পের আরও বিবর্তন হয়েছে ; অলংকারশাস্ত্রের সংজ্ঞা ভিড়িয়ে নবনব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তার মিষ্টিমধুর রূপ ক্রমেই গাঢ়তর হয়ে উঠছে। কিন্তু এসব কথা আপাতত ভুলে গিয়ে শুধু যদি মনে রাখি, ছোটগল্প হবে ছোট কথা—মানুষের জীবনের ও মননের সাগরছেঁচা একটি নিটোল মুক্তো—তাহলে দেখা যাবে, সাহিত্যের অণুবস্থায় কাব্যসংগীতের পাশাপাশি ছোট গল্পও একটি আসন দখল করে বসে আছে। বড়ো কথা, বিরাট আখ্যানের আবির্ভাব অনেক পরে, এসব ছোট ছোট কথাকাহিনীকে ছোড়াতালি দিয়ে অথবা আদর্শের সোনালী স্রোতায় গাঁথি গাঁথি।

সৃষ্টির সেই আদিম যুগে, যখন ধীরে ধীরে ঠাণ্ডাহয়েআসা পৃথিবীর বুকে কুটল উদ্ভিদ জাগল প্রাণী এল মানুষ, তখন জীবনসংগ্রামই ছিল একমুখ সাধা ও সাধন, উপলক্ষ ও লক্ষ্য। চারপাশের প্রতিকূল ও হিংস্র প্রকৃতির মাঝ দিয়ে বন্ধুর পথে শুরু হয়েছিল বন্ধুবিহীন একক পদক্ষেপ। সবকিছুই তখন অজানা ও নামনাজানা। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভীতি ও প্রীতি, পরিবেশ ও নিজেদের সম্বন্ধে বিস্ময় ও কোতূহল, আর ‘প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত’-কর অবস্থা আদিম মানুষকে ক্রমে ক্রমে ঝাঁক বাঁধতে শেখালো, সমাজ সম্পর্কে মোটামুটি এক ধরনের নিয়মকানুন অনুসরণে বাধ্য করল, প্রেরণা দিল যাহুবিপ্লবশ্রমী কতকগুলি বিচিত্র ও সচিত্র অনুষ্ঠানের প্রয়োজনায়। মাঠে ফসল চাই, গাছে ফল চাই, বনে পশু চাই, ঘরে শিশু চাই—এই আদিম ও অস্তিত্ব চাওয়ার তাগিদে শুরু হল পাওয়ার আরাধনা তথা নিজের সাধনা—নাচগান অভিনয়ের মাধ্যমে। সহজ ও সুস্বভাবে বেঁচে থাকার মানবিক আকাংক্ষায় আদি মানুষের দল ছবি আঁকল, কবিতা গাঁথল, গান বাঁধল, নাচ আনল ; তৈরী করল কথা অর্থাৎ গল্প। অবসর-বিনোদন নয়, কল্পনার রঙীন তুলি বুলিয়ে আনলীলা নয়, বিস্ময় আনন্দবিধান বা সৌন্দর্যবোধনাও নয়—কুলিশ কঠিন কঠোর জীবনসংগ্রাম।

প্রাথমিক মানুষের মনে গল্প এসেছে অজানা প্রকৃতির ক্রোধকে জয় করতে, নাজানা দুনিয়ার রহস্য ভেদ করতে, অমিত্র পরিবেশকে করায়ত্ত করতে ; বুঝতে চিনতে শাস্ত করতে। মানুষের নিজের অজ্ঞাতসারে তাতে বেজে উঠেছে গান, স্বরিত হয়েছে কাব্য, কুটে উঠেছে ছবি, অশ্লীলিত হয়েছে কল্পনাস্বপ্ন। তারপর—তার

অনেকদিন পরে দেহ পেয়েছে অবসর, মনে ছেগেছে ভাব, মানুষ শুনেছে গল্প গল্পেরই জন্মে—মাঠের বা ঘরের ফসল ফলানোর যাহুবিষ্টাস্বরূপে নয়। আর আরব্য রজনীর শাহাজাদীর স্বামীর মত সাগ্রহে শুধিয়েছে—‘তারপর’ ?

ইতিহাসের সেই প্রথম পাতার যুগে, পৃথিবীর অরূপণ বাসরে নবীন আগন্তুক মানুষের জৈবিক সমস্তা ছিল সৃষ্টির—কর্ষণ ও প্রজননের সম্বন্ধিত। শস্য-শিত্ত-পশুর সংখ্যাগত ও গুণগত শ্রীরক্ষার অন্তরিতপেক বাসনা ছিল তার চিত্তের স্বায়ী রস। তাই প্রথম মানুষের প্রথম গল্প—সৃষ্টিপালা।

। একদা এক সুন্দর প্রভাতে প্রথম পুরুষ ঘুম থেকে ছেগে উঠলেন জলের ওপর। দেখলেন, কোথাও কেউ নেই, সংগীবিহীন শব্দবিহীন বিরাট শূন্য। দোসরের জন্মে হাহাকার জাগল চিত্তে। হংকার দিয়ে উঠলেন তিনি : তা থেকে জাত হল তাঁর বাহন এক পাখী। তার পিঠে চড়ে প্রভু সারা দুনিয়া ঘুরলেন। কোথাও পেলেন না বসবার মত একমুঠো ঠাই। তখন মনস্থ করলেন জলের অতল তল থেকে মাটির পৃথিবীকে তুলে আনার। ডাক দিলেন কচ্ছপকে কাঁকড়াকে কেঁচোকে। একক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল ; একত্রিকা প্রয়াসে ও প্রভুর ইচ্ছায় পৃথিবী উঠল জলের ওপর। প্রভু একটি পদ্মপাতা ফেলে দিলেন ; পৃথিবীকে তার ওপর থিতু করে কপালের ঘাম মুছল কচ্ছপ কাঁকড়া কেঁচো ইত্যাদি। পদ্মাসনা পৃথিবীর ওপর পদ্মাসনে ধ্যানে বসলেন আদিদেবতা। তাঁর দেহ থেকে জন্ম নিলেন আদিদেবী প্রভুণী। আলাপ-আকাংক্ষা-আশ্রেষ। উভয়ের মিলনে সৃষ্টি হল তিন দুনিয়া আর যা-কিছু সব। প্রভু ধূলোমাটির সংগে জল মিশিয়ে তৈরী করলেন দুটি মানব—আদিম নর ও আদিম নারী। তারা ঘর করতে জানে না, ফসল ফলাতে জানে না, ঝগড়া করতে জানে না। দেবতা দিলেন তাদের দু হাঁড়ি হাঁড়িয়া, একটু নির্জনতা, একটি রাত্রি। পানাস্তে চোখ বুজে এল দুজনের, মাঝে একটি কাঠের গুঁড়ির সীমান্ত। ভোর হল, চোখ মেলল প্রথম নরনারী। দেখল, কাঠের গুঁড়িটি বহদুরে একপাশে লক্ষ্যনত ; দেখল, সেই গতকালের পৃথিবী আজ সাজ বদলে সপ্তফোটা কুল। প্রভু তদন্তে এসে খুশি হয়ে দুজনকে দিলেন বীজধান, গম-তুলোর বীজ, কামনা করলেন অনাগত নবজাতকের দীর্ঘ পরমায়ু। প্রথম মানবমানবী ঘর বাঁধল, চাষ করল, সংসার পাতল ; রইল দুজনে মিলে বহুবচনের অপেক্ষায়।

ফুটে উঠল একটি ছোট গল্পের রূপ ও রেখা। তার মানচিত্র নিশ্চয়ই নিখুঁত নয়। কিন্তু মানচিত্র সীমানা-সম্বন্ধিত। দেখা ও শোনার জগৎ কথা কয়ে উঠল ; হল কাহিনী। মিশরের প্যাপিরায়ে বাইবেলে কোরানে বেদে আদিম উপকথায় এই জাতীয় আখ্যানের ইতরবিশেষ রূপায়ণ দেখা দিল। প্রাথমিক কথাচিত্র এগুলি।

কিন্তু শুধু সৃষ্টিপালা নয়। সমগ্র গোষ্ঠীর জীবনকাহিনীর একআধটি অধ্যায় নিয়েও গল্প রচনা হয়েছে। সেকালের মানুষ দেবতার স্তবপাঠ করেছে, প্রমথ-প্রমথিনীর সম্পর্কে কথামালা রচনা করেছে ; তার মধ্যে দিয়ে ভাষারূপ পেয়েছে সমাজজীবনের আলোআঁধি। বিভিন্ন দেশের প্রাগৈতিহাসিক উপকথায় দেব ও মানব পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। বাইবেলের আবেল ও কেইনের কাহিনী, মিশরের

গিলগেমিসের রূপকথা, গ্রীসরোমের উপাখ্যান, আমাদের যম-নচিকেতা ইত্যাদি কাহিনী উল্লেখ্য।

সংসারজীবন থেকেও সেকালীন গল্পের উপাখ্যান এরকম আহত হয়েছে। মিশরের প্যাপিরাসের ওপর অঙ্কিত বহু কাহিনী যরের কথা। তার একটি গল্প আমাদের বেহলা-লখিম্বরের লৌহবাসররাত্রির কথার সঙ্গে ছব্বহ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বাইবেল তো কথামালা; অন্যান্য প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রও। বেদের পুরুষ-উর্বশী, উপনিষদের শ্বেতকেতু-উদালক কাহিনী এক একটি ছোট গল্প। যরোয়া পরিবেশে ছোট ছোট ঘোণাকীর দীপ্ত সমারোহ।

মানুষের জীবন আদির কেন্দ্রবিন্দু থেকে ক্রমেই সরে আসতে থাকে। উৎপাদনের নতুন-নতুন উপায় ও হাতিয়ার আবিষ্কারের সংগে সংগে জীবনের সমাজের মানসের বাসাবদল হতে থাকে; পালাবদল হয় সংস্কৃতির। ছোটগল্পের আসর বড়ো হয়, ভিড় বাড়ে। কথাসরিৎসাগর হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র আরব্যরজনী, টেল্, সাগা। ট্রিশপ্‌স্ ফেব্‌ল্‌স্-এর মত এখানেও গল্পগুলি ছোট ছোট; কিন্তু তাদের পরস্পর যুক্ত করার বড়ো করার একটি মনোভাব দেখা দিয়েছে। কাহিনীগুলি হয় চীনা বাক্স, নয় ফুলের মালা। একটি গল্পের মধ্যে আরেকটি গল্প, অথবা একটি গল্পঅন্তে আর একটি। এইভাবে প্রবাহিত প্রবাহের আয়াতন বাড়ে, কিন্তু সবমিলে একটি বড়ো গল্প বা উপন্যাস হয়ে ওঠে না। স্বতন্ত্র এক-একটি ছোট গল্পই থেকে যায়। কথাসরিৎসাগরে গল্প গাঁথা হয়েছে গল্পের খাতিরে; বিষ্ণুশর্মার কাহিনীর উদ্দেশ্য শিক্ষাদান; শাহজাদীর লক্ষ্য শুৎসুক্য জাগানো। সকলের শেষে আছে প্রোতার সেই চিরন্তন প্রশ্নচিহ্নটি। শাহজাদী খামেন বাদশাহ বলেন, ‘তারপর?’ বিষ্ণুশর্মার কথকতার বিরতি রাজপুত্রদের সমস্বর ভিজ্জাসা, ‘কথমেতৎ?’ আগ্রহ জাগিয়ে রাখার এই মনোহারী ও আকর্ষণীশক্তি আছে বলেই এগুলি গল্প। আর ছোটগল্প। সেকালে এই আগ্রহকে নেভাতে আর একটি গল্প কাঁদা হত, একালে ঐ আগ্রহের ভিজ্জাসু দাপটুকু জালিয়ে দেওয়াই গল্পকারের মুখ্য কর্তব্য।

অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির কাঁধে ভর করে সমাজ এগিয়ে চলে আরও সামনে। উন্নততর উৎপাদন-কৌশল ও সম্বন্ধ এনে দেয় ঐশ্বর্য ও অবকাশ। সাহিত্যশিল্প হয় মেদবহলা। কিন্তু গল্পের মধ্যে গল্প বলার রেওয়াজ লোপ পায় না; (লেখন-দক্ষতার জোড়াতালি অনেক সময়ে চোখে পড়ে না)। বৌদ্ধ জাতক, মেটামরফাসিস্, দেকামেরন, কাদম্বরী-দশরূপক ইত্যাদি।

আমাদের সুবিপুল পুরাণ-সমুদ্রে ছোটগল্পের অজস্র দ্বীপপুঞ্জ। ধর্মভাষ্যের পাশে নানাকথার সমাবেশ এতে—সৃষ্টিপালা, দৈবমাহাত্ম্য, মানবজীবনের দু-একটি পরিচ্ছেদ। কথারসের প্রাণকারানো শক্তি এদের ভিতটা নেই, যতটা আছে অধারসাধনার সূক্ষ্ম ইঙ্গার। আখ্যানগুলি বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অসমঞ্জস অসংলগ্ন, অসংস্কৃতও অনেকক্ষেত্রে। পুরাণকথার মহাকাব্যের বিস্তৃতি নেই, উপনিষদের হিরকসৌন্দর্য নেই, রূপক কাহিনীর চমৎকারিত্ব নেই। পঠনপাঠনে ভক্তি হয়ত জাগায়, রসাপ্তুত করে না। তবু সাগ্রহ করে তোলার পক্ষে মনোহারী ও কৌতুহলপ্রদ।

॥ স্বকাসুর নামে এক দৈত্য অলৌকিক ক্ষমতালভের বাসনায় দুশ্চর তপস্শায় রত হল। বছ বছরের কঠোর আরাধনার পর তুষ্ট শিব দেখা দিলেন—স্বকাসুর। বর প্রার্থনা কর। স্বকাসুর করজোড়—দেবাদিদেব। আমাকে বর দিন, আমি যার মাথায় হাত দেব সে সংগে সংগে ভস্ম হয়ে যাবে। তথাস্ত্ব। বলে শিব সচল হন। স্বক তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে—প্রভু, একটু দাঁড়ান। কেন? ফিরে আসেন শিব। বাঃ। আপনি যে বর দিলেন, তা ঠিক কিনা যাচাই করে দেখতে হবে তো। চমকে ওঠেন শিব—কি বলছ স্বক? আমার দেওয়া বর...?—আপনার ওপর দিয়েই পরীক্ষা করব আগে; ধারে কাছে তো কেউ নেই—চতুর হাসি বকের। এ্যা ভ্রত স্থান ত্যাগ করে ছুটতে থাকেন শিব। পেছনে স্বকাসুর চলে তাড়া করে। মর্ত্য পাতাল স্বর্গ—কোথাও রেহাই নেই থামা নেই আশ্রয় নেই। অবশেষে বিষ্ণু এগিয়ে এলেন—ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি। শিবকে ঘরে রেখে তিনি ছদ্মবেশে এসে দাঁড়ালেন পথের ওপর। ক্ষণপরেই স্বক এসে পড়ে হস্হস্হ করতে করতে। বিষ্ণু তাকে ধামান—কি ব্যাপার, এমন ছোটোছুটি কেন? স্বক বলে ক্লান্তকণ্ঠে—শিব আমাকে বর দিয়েছেন, যার মাথায় হাত দেব সে তখনই ভস্ম হয়ে যাবে। কিন্তু সত্যি কিনা পরীক্ষা করার লোক চাইতো। তাই তাঁকে খুঁজছি ত্রিভুবনে। অথচ তিনি—কিন্তু শিব কেন?—হাতের কাছে তিনি ছাড়া আর কে আছেন?—কেন, তুমি নিজেই তো রয়েছে—বিন্দুমাত্র ভাববার অবসর না দিয়ে বিষ্ণু বলে যান—এভাবে কষ্ট না করে তুমি নিজের মাথায় হাত দিয়েই তো দেখতে পারো বর সত্যি কি না। ঠিক, ঠিক। আনন্দে লাফিয়ে ওঠে স্বকাসুর, এবং একটুও না ভেবেচিন্তে চট্ করে হাতটা তুলে দেয় নিজের মাথায়। ঝিলিক দিয়ে ওঠে লালনীল আগুন, কালো-কালো ধোঁয়া, পড়ে থাকে শুধু ছাই।

ইতিহাসদর্শনের আলোকবিন্দুকে বাঙলাদেশের সাহিত্যের ভূমিতে সরিয়ে আনলে দেখি, সেখানেও ঘুরেফিরে একই-লীলা। এখানকার ছোটগল্প যখন আদিম শৈশবের গভী পার হল, তখন দৈবকথাগুলি মোটামুটি সংহত রূপ লাভ করেছে। প্রথমে লোকমুখে, তারপর দেবকথায়। শেষে পাঁচালীর আসরে আখ্যানগুলি প্রসারিত হয়েছে।

॥ আদিদেব নিরঞ্জন। আত্মাদেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে। তিনজনেই অন্ধ, রত হলেন নিভৃত তপস্শায়। পুত্রদের পরীক্ষা করতে নিরঞ্জন শবদেহরূপে ভেসে গেলেন তাঁদের কাছে। বিষ্ণু চোখকাননাক বন্ধ করে উঠে গেলেন; ব্রহ্মা মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চতুর্মুখ হলেন; একমাত্র শিব চিনতে পারলেন আদিপিতাকে। সেই শবদেহ কাঁধে নিয়ে তিনি নাচতে লাগলেন। নিরঞ্জন আয়প্রকাশ করলেন ও খুশি হয়ে শিবকে দিলেন দৃষ্টিশক্তি। শিব অল্প দুই ভাইয়ের দৃষ্টিশক্তি প্রার্থনা করলেন। • নিরঞ্জন শিবের সংগে বিবাহ দিলেন আত্মাদেবীর, নিজে করলেন দেহত্যাগ। ব্রহ্মা বিষ্ণুর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ পেরিয়ে শিব-শিবানী মনের সুখে ঘর পাতলেন। উজ্জ্বল উঠল সুখসৌভাগ্য আশাআনন্দ। একজন ভিক্ষা করে আনেন, আরজন তাই দিয়ে সংসার চালান। পেট হয়ত ভরে না, কিন্তু মন ভরে থাকে দুঃখনের। আলো জলে ওঠে গৃহে ও হৃদয়ে। তারপর একদিন—কিন্তু সে আর এক কাহিনী।

এই পাঁচালীকথার কাছেকাছে পাই ব্রতকথাকে; যার এক-একটি আখ্যান

এক-একটি ছোট গল্প। যার প্রতিটি গল্পে জীবনের আকস্মিক উত্থানপতন। শুনতে শুনতে মনের ভাবগুলি বিচলিত বিলোলিত হয়ে ওঠে। এখানে স্বর্গমর্ত এপাড়া ওপাড়া। দেবতা মানুষ প্রতিবেশী আত্মীয়। বামুন-বামনি শরীরে স্বর্গে যান রথে চেপে জনতার প্রণাম নিতে নিতে। শান্তিরসে গল্পের ইতি, প্রস্তুতি নেয়। তা হোক, তবু এর মধ্যে আছে আকস্মিকের বিস্ময়বোধ। কথারসের মনোময় স্পন্দরতা।

রূপকথা ছোট গল্পের রূপময় কথা। স্বর্গ ও দেবদেবীর ভূমিকা এখানে অপ্রধান, ধর্মসাধনা এর অ-সাধ্য। এ হল অলৌকিকের দেশ, অসম্ভবের স্বর্গ, অসম্ভবের ঠাস বহুনি। তবু প্রাগাধুনিক ছোট গল্পের সবার সেরা এই রূপকথা, কেমারী টেলস্। বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিবাদী মন এর সিংহাসনের সামনে এসে প্রস্তুত অবিবাসের ডানা স্বেচ্ছায় গুটিয়ে ফেলে, লোকঅলোকের সীমারেখা ভুলে যায়, মনে নেয় কবিকের মানসিক স্বপ্নাভিসারকে। মন উড়ে চলে রাজপুত্র কোটালপুত্রের সংগে সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ব্যংগমাব্যংগমীর দেশে, সেখান থেকে নামনাজানা দূর দিগন্তের রাক্ষসরীপের উদ্দেশ্যে। পথে বাজে ডংকা, শংকা শিহরায় মনে। চকিতে ঘুম থেকে জেগে ওঠে রাজকন্যা, মাঝপথ থেকে হরিতে ফিরে আসে দৈত্যের দল, রাজপুত্র খাপ থেকে তলোয়ার টেনে নেয়। একটি নিঃসংগ ভোমরার মধ্যে সাতশো রাক্ষসের প্রাণ ভয়ে শিউরে ওঠে। যুদ্ধ বাধে, যুদ্ধ শেষ হয়। উখালপাখাল করে সচকিত শ্রোতার হৃদয়সরোবরের চেউ। রাজপুত্র উদ্ধার করে আনে ঘুমন্তপুরীর ঘুমন্ত পুরীকে, কুঁচবরণ কন্যা তার নেষবরণ চুল। গল্পে দাঁড়ি পড়ে সুধরসে, কিন্তু শ্রোতার মনে নয়। সে তখনও চলেছে নতুনতর অভিযানের অভিসারে। শংখমালা মধুমালা কী কংকাবতীর দেশে। যেমন চলে আজও—রবীন্দ্রনাথ কিংবা মোপাসাঁ কি মন অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোট গল্পের পাঠশেবে।

মংগলযাত্রা নাট্যগীতি পাঁচালীর সমবায় ছোটছোট কবিতা ও কথিকা মিলে হল বড়ো আখ্যানকাব্য, নাম তার মংগলকাব্য। তার মধ্যে বিরাতের আভাস সঙ্কেত রইল সমবেত ছোট গল্পের ইশারা। সে ক্যান্টারবেরি টেলস্ নয়। তবু তার আখ্যানিকাগুলি মালার ফুল, সব মিলে একগুচ্ছ সুবক সর্বত্র হয়ে উঠতে পারেনি। সেই আনলের কোষকাব্য সঙ্কটকর্ণায়ত্তের গল্পিকা দিয়ে যার শুরু, আঠারো-উনিশ শতকের পাঁচালী—কবিগানের অসংলগ্ন কথিকা দিয়ে তার সারা। মাঝের বেলা কাটল শুধু কথা চুনি চুনি মালা গাঁথার।

ইতিমধ্যে ইতিহাস সরে এল আরও কাছে প্রাচীরের সীমান্ত পেরিয়ে আধুনিকের সীমানায়। ভারত মহাসাগরের বুকে জাগল আলোড়ন; নতুন চেউ এসে আছে পড়ল স্ববির সমাজতটে। বদলে যেতে লাগল তার চেহারা—সদরে অন্দরে। অনেক গেল, অনেক এল। বসল আধুনিককালের ও সত্যকার ছোটগল্পের নিটোল আসর। সে গল্প আমাদের বহুবার শোনা, শুনবও আরো অনেকবার। আর বারেবারেই মন বলবে—কথমেতৎ? এ্যাও দেন? তারপর?

খালাসথানা

সুবোধমোহন ঘোষ

খানিক সোয়াস্তি ।

পালা-বাথার আর এক ধাপ শেষ হল । তবু যন্ত্রণা । সারা গর্ভদেশ জুড়ে । ওঁই ওঁই করছে । যেন কঠিন কুণ্ডলির বেঠেন হঠাৎ চিলে করে দিল বিরাট এক অঙ্গগর । প্রসারিত হতে হতে আবার সঙ্কুচিত হওয়া । আচমকা এক খিল-খুরা ব্যথা—জুড়িয়ে আসতে আসতে ঘিন ঘিন, ওঁই ওঁই ।

তারপর সোয়াস্তি । তাও ঘড়ির কাঁটা ধরে নয় ।

ঘাঁটিতে আরো শক্ত পাহারা বসাবার চেটায় মেতে রইল হেনা । ঠেঁট কামড়ে রইল । দাঁতে দাঁতে চেপে রইল ।

এই ওষ্ঠ পুরুষের লোভের বস্তু । না, এই ওষ্ঠ না । কোঁপরা-ওষ্ঠা নারকোলের মত এখন এ বিশ্বাদ, জ্বালো । তবু এই বিশ্বাদেও স্বাদ আছে, মধুর স্রষ্টার স্বাদ, অপূর্ব তার স্বাণ—হায়, কোনোকালে তার সন্ধান পাবে না পুরুষ । এ কস্তুরীর স্বাদ পেয়ে কোনোদিন ধন্য হবে না ।

ক্ষণিক সোয়াস্তির আরানে চোখ বুজে রইল হেনা । ননের কবাট বন্ধ । তবু চুইয়ে চুইয়ে আলো আসছে ।

কখন শেষ হয়ে গেছে ভিজিটিং আওয়ার । রাত আটটা । এই সন্ধ্যারাত্রে ডানা মেলে ধরেছে নিশুতি রাত । শেষ হয়ে গেছে প্রস্তুতিদের আহারপর্ব । শারীরিক অসুস্থতায় অনেকেই তন্দ্রাতুর । ঘুমিয়ে নিচ্ছে কেউ কেউ । স্বেচ্ছাঘুম । গল্প জুড়বে রাতহুপুরে উঠে । কি রাতের সেই নিরিবিলি সময়ে খিদের ঘুম দিয়ে আনা মুখরোচক খাবারগুলো খাবে । দীর্ঘ অরুচির দিনে উদ্ভূতের ছাই জ্বিভের তার ফিরিয়ে দিয়েছিল—এসব এখন থেকে ভুলবার পালা ।

স্তিমিত হলধর । হ্রস্ব আর দীর্ঘ-লয়ের শ্বাসপ্রবাহ । মাঝে মাঝে দমকা কাতরানি ।

ড্যাপসা আঁসটে গন্ধ বেড়ে বেড়ে ধমকে ধমকে পাক ধেরে চলেছে ।

‘স্বেসায়েব, তোমার সায়েব কোথায় ?’ উমা এগিয়ে আসে হেনার পাশে এক প্রস্তুতির কাছে ।

অস্তুতদশিনী পোয়াতিটি । প্রকাণ্ড পেট । ঘাঘরার মত একটা সায়াশ একটা বডিস । বাস । একবার এপাশ ফেরে, একবার ওপাশ । আর কাঁঠ হয়ে যায় হেনা । বুঝি চেপ্টে গেল । একটি শালিক আর কদাকার এক মহিষজননী । ঝুটা খানেক আগে এসেছে । বাংলা বোঝে না । কোন দেশে বাড়ি ?

চোখ টেনে শক্তদল বলে, ‘ওর সায়েব নেই ।’

‘পেটটা তো দশনঘর কুটবলের মত ।’ উমা হাসে ।

স্বেচ্ছাঘুম অনেকের ভেঙ্গে যায় । হাসির স্বাতানো কুলঝুরি উসকে উসকে ওঠে ।

শতদল বলে, 'ও আগে হিজড়ে ছিল। কখন আস্তে আস্তে মেয়েমানুষ হয়ে গেল ও নিজেও টের পায়নি।'

আবার হাসি। বেশি হাসে প্রোচা পোয়াতিরা।

লখিয়া যুকে পড়ে কি লক্ষ্য করে, তারপর আন্ধারে নাকে গলায় বলে, 'ওমা, এর যে গোঁফ আছে গো-দিদিমনি—'

ভাইভ! টেবিলল্যাম্পের ছম্হমে আলোয় ঠিক ঠাওর পাওয়া যায়নি।

নাক সিটকে উমা বলে, 'আমি একে প্রসব করাতে পারব না।'

শতদল এবার দাবড়ানি দেয়, 'ওগো মেম সায়েব, তোমার সায়েব কোথায়? খাতায় লিখব কি ছাই—'

পিট পিট করে তাকিয়ে থাকে মহিষজননী। কোনো জবাব নেই, মুখ যেন সেলাই করা।

'মাগো মা—মাগো-ও-ও-ও—' ব্যথা খাওয়া ঘর থেকে বুকভাঙা আর্তনাদ।

শতদল দৌড়ে আসে, 'এতো চীৎকার কিসের শুনি? তুমি কী প্রথম পোয়াতী?'

মুখ মচকায় শতদল। ভ্রু তোলে উঁচিয়ে। ছোরা যেন।

চীৎকার থামে না। নলের ভেতর থেকে বিদীর্ণ হতে গিয়ে যেন আটকে গেছে গুলিটা। তারই ঝাঁকুনি আর যন্ত্রণার কাঁপুনি। 'মাগো-ও-ও-ও—'

'পাছায় ছুঁচ ফুটিয়ে দেব।'

কোনো কথা কানে গেল না প্রোচা পোয়াতিটির। কাতরানি বেড়ে চলে। দেহের যন্ত্রণা সইবার একটা বয়স আছে। সে বয়স পেড়িয়ে এলেও প্রকৃতির খেলা এখনো শেষ হয়নি। শেষ হবে কবে। প্রাণ যায় যাক—ভগবান, ব্যথার হাত থেকে রেহাই দাও : 'মাগো—গেলুম—'

'দেব ছুঁচ ফুটিয়ে? খান বলছি। ডাক্তারমার ঘুম ভেঙ্গে যাবে।'

শতদলের রাগ জল হয়ে যায় উমার ডাকে।

'দেখবে এস শতদলদি—'

দেখে শতদল হেসে খুন। নাক ডাকছে মহিষজননীর।

কয়েক মিনিট দেখল মজাটা শতদল। একবার চোখ ঝোরালো হেনার দিকে। ঠোঁট কাঁষড়ে আছে হেনা। মুখ নীলবর্ণ। আবছায়া দৃষ্টি।

'ওগো মেমসায়েব, এটা ঘরবাড়ী নয়—খালাসখানা—'

বডিস ধরে টান দিতে গিয়ে শতদল চমকায়, 'ওমা, এতখানি লাসের এতটুকুন মাই!'

আবার হাসি। মুচমুচে নিমকি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়।

উমা বলে দাঁতে নখ কাটতে কাটতে, 'কালই ওকে বিদেয় করব, ব্যথা খাওয়া না ছাই—'

রাত বাড়ে।

শহরতলীর দাতব্য ম্যাটারনিটি হাউস। খান পঁচিশ বেড। স্থানাভাবে

মেজেতে ব্যবস্থা। লোক বেড়েই চলেছে শহরতলীতে। বেড বাড়েনি। যেন শুয়োরের বাচ্ছা বিয়োবার খোঁয়াড়।

ডানপাশে ভিনদেশী মোটা মেয়েমানুষটা, বাঁপাশে পোয়াতিটি খুব চেনা। একদা তোলা কাজ করেছিল, তখন চাকরী ছিল স্বামীর। তার বাড়ীর একদা-খি-এর পাশাপাশি শুয়ে আছে সে। কি যেন্না! মুখ ফিরিয়েও রেহাই নেই হেনার। নাক-ডাকা তপ্ত নিশ্বাস এখনি আছড়ে পড়বে মুখের ওপর। তবু যদি একজন মনের মত সঙ্গী পাওয়া যেত এখানে। গল্প করার সময় নয়, চোখে চোখে ভরসা পাওয়া যেত।

অজান্তে গর্ভদেশে হাত উঠে আসে। কুঁকড়ে যাচ্ছে, হুমড়ে যাচ্ছে। বন্ধুকের গুলিছোটোর মত বিদীর্ণ হয়ে প্রসারিত হতে চাইছে। তবু শক্ত দুই ঠোঁট ইস্পাতের চাদরের মত। কিছুতেই হারাবে না সে শালীনতা। নার্স, ধাইদি, জমাদারনীদেব নোংরা রসিকতার খোরাক জোগাবে না। কবে থেকে নোংরা হতে শুরু হল মানুষের মন এই শুচিশূত্র রহস্য ঘিরে। আদিম অনন্ত বিস্ময়ে কবে থেকে পীক জমতে শুরু হল।

রাত কত? গেটের সামনে অশথ গাছে পেরঁচা ডাকে। ছমছম অন্ধকার জানলার বাইরে। এই মজা-হাজা পৃথিবীর ছয়ার খুলছে কে পা টিপে টিপে। একান্ত নিভৃত, নিঃসঙ্গ, নিবিড় রহস্যাবৃত।

কত আশা সেই নতুন আগন্তুকটির। কত বুকভরা আশা। হায়, ক-কোঁটা দুধ পাবে মাই-এ। এবার কোনো তব্বির হয়নি দেহের। হয়ত এনিমিয়ায় ভুগতে হবে। তাই থেকে ঘুসঘুস জ্বর, স্মৃতিকা। কোথায় যেন পাওয়া যায় স্মৃতিকার মাদুলি। অব্যর্থ, সারবেই।

সেই নামজাদা প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপত্র : প্রচুর দুধ খাবে টাটকা ফল আর সজ্জি। হালকা কাজ আর খোলা হাওয়া।

ওসব কোন পৃথিবীতে পাওয়া যায়? ওরা কোন যুগের মানুষ?

না, ঠাইই হয়নি ওখানে। সে কপাল থাকা চাই।

নিরুপায় হয়ে পাশ ফেরে হেনা। কখনো জুড়িয়ে জুড়িয়ে ব্যথা আসছে, কখনো দমকে দমকে। প্রার্থনার ভঙ্গিতে জোড়হাত করে হেনা। গাল বেয়ে অশ্রু গড়ায়।

এক দলাপাকানো ঝিমুনির মধ্যে রাত কাটল।

সকালে চোখ মেলতে হেনা অবাক : * পদ্মরাণী।

দিদি যে—

দুধনে সলজ্জ হাসল। পাশাপাশি বেড নয়। তবু পুরানো বন্ধুকে পেয়ে দু'জনেই খুশি। গতবছর এখানে আলাপ হয়েছিল পদ্মরাণীর সঙ্গে। দু'জনে হাতে হাত দিয়ে শপথ করেছিল : আর না, যে-কটি আছে বেঁচে বর্তে থাক।

কিন্তু—

বাড়ীর গল্প করে পদ্মরাণী। এর মধ্যে তিনবার বাড়ী পালটেছে তারা। আগে তিরিশটাকা ভাড়া দিতে হত। এখন বার টাকা। আগে মাথার ওপর পাকা ছাদ ছিল, এখন টিন। তিনদিনের ছুটি নিয়ে কোলের বাচ্ছাকে আগলে আছে স্বামী।

বেশ খুশ মেজাজ পদ্মরাণীর। আশ্চর্য, খাবার ঘণ্টায় তার মেজাজ গেল বিগড়ে।

‘সকাল-বিকেল ডাক্তার-মা তো ভাতের ব্যবস্থা দিয়েছেন। আমার তো এখন কিছু হয়নি।’

‘না, পাউরুটি।’

‘বেশ তাই। এই খেয়ে সারাদিন থাকা যায়?’

‘পোয়াতী বেড়ে চলেছে—’

‘মাথা পিছু একটা বরাদ্দ আছে তো?’

‘তোমার কাছে সেই হিসেব দিতে বসি আমি! যতসব—’

‘যত সব কী?’ পদ্মরাণীর চোখ দু’টো ঝুকতি ওজনের পাল্লার মত। মুচকি হেসে শতদল রাগ চেপে, ‘রাই বিনোদিনী গো—’

খাবার নিয়ে ঝগড়া করতে হেনা কুণ্ঠিত হয়। লজ্জা করে। হেনা দেখে এক বছরে অনেক বদলে গেছে পদ্মরাণী। এই নিয়ে দু-বিয়েন হবে তার। এখনো নতুন সংসারী। এরি মধ্যে বড় খুঁতখুঁতে হয়ে পড়েছে। সে সরসতা নেই। উবে গেছে প্রথম পোয়াতীর ভাবানুভূতি। ভালো করে লক্ষ্য করে সে পদ্মরাণীকে। মুখের চামড়ায় বাদামী রং ধরেছে।

পদ্মরাণী নাছোড়। বিকেলেও খুনসুটি বাঁধাল। খামতে চায় না। আর আর প্রস্তুতির হকচকিয়ে যায়।

‘এই দেখুন, জাতাগোলা চা আর এই পাউরুটির টুকরো।’

হেসে হেনা বলে, ‘এ তো নতুন নয়।’

‘আপনি কি বলতে চান ওপরওয়ালা আমাদের এই বরাদ্দ করে দিয়েছে? আমরা কি শুয়োর বিয়োতে এসেছি। আবার গালভরা কত কথা : ‘জাতির সম্পদ—’ হাত নাড়ে, মুখ নাড়ে পদ্মরাণী।

ভর্ক হেনার ভালো লাগে না। চুপ করে থাকে। মাথা হেঁট করে থাকে।

বিলিয়ে দেয় পদ্মরাণী চা-পাউরুটি।

মিছামিছি খুঁচিয়ে তুলল পদ্মরাণী। বাড়ির কথা ভাবছিল হেনা। ছেলেমেয়ে কেমন করে সামলাচ্ছে স্বামী কে জানে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাই বা কী। গতবছর চাকরী ছিল। ননদকে আনতে পেরেছিল। এবার নিজেদের পেট চলা দায়। মেজাজও তিরিক্ষে হয়ে উঠছে স্বামীর দিন দিন। সাংসারিক ধৈর্যের ধার দিয়ে যায় না। চড়াপড় খাচ্ছে বাচ্চাগুলো।

‘চঃ...চঃ...। বাইরে ঘণ্টা পড়ছে।’

চারটে বাজল। ভিজিটিং আওয়ার।

অনেক রঙবেরঙ প্রজাপতি চুকলো হলঘরে। অনেক ফুলের গন্ধ।

সামনের বেড়ে এক প্রোচা। তার বেড ঘিরে ছেলেমেয়ে, জামাই, স্বামী।

‘এই দেখ তোমার ক্ষুদে শালা—’ চলচলে হাসে প্রোচাটি।

জামাইয়ের মুখ আরক্ত হয়। স্ত্রীর দিকে তাকায়।

‘শুধু হাতে ছেলের মুখ দেখতে পাবে না তুমি—’ স্বামীকে চোখ মটকায়।

‘এনেছি, গো এনেছি—’

‘বাবাকে ঠকাবে তুমি না।’ বিবাহিতা নেয়েটি হেসে ওঠে। নিচি প্রাণবন্ত হাসি।

হেনার বাঁপাশ খালি। ভোরের দিকে কল্যা প্রসব করেছে ঝিটি। হলঘরের কোণের দিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে তাকে। বাবরী-ছাঁটা এক ছোকরা অনর্গল বকছে। বয়সের কাঁক অনেকখানি।

একটা চাপা গুমরানি আসছে পাশ থেকে। মুখে হাত চাপা দিয়ে অসহ যন্ত্রণাকে ঠেলে রাখছে মহিষছননী। একবার চোখাচোখি হল হেনার সঙ্গে।

‘তোমার বাড়ি কোথায়?’ শুধালো হেনা।

ঘাড় নাড়ল বিদেশিনী। কি বুঝল কে জানে।

না, আর আসবে না স্বামী। কোলের বাচ্চাটাকে যদি নিয়ে আসত। আসবার সময় কি কান্না। বায়না—সেও যাবে মায়ের সঙ্গে। বাপের এক ধমকে ককিয়ে গেল। পাড়ার পাতানো মাসীমাকে নিয়ে সে রিকসায় চেপেছিল। পেছন ফিরে তাকায়নি। দুর্গা, দুর্গা। যে আসছে যেন ভালোভাবে আসে। স্বাগত। এখন পেছনে তাকানো নয়।

বেডে বেডে চোখ ঘোরায় হেনা। পুবকোণে নেয়েটির বেডে পদ্মরাণী। মুখে খই ফুটেছে। নেয়েটি চুপ, ধমধমে মুখ। ওর কপালে সিঁদুর নেই। ভারী স্ত্রী চেহারা। একাই এসেছিল। ব্যাঙ-খোঁচা করেছে ওকে নার্স, ধাইদি, জমাদারনী, ডাক্তার-মা। বোবার শত্রু নেই। ওর সঙ্গে পদ্মরাণীর মাখানাখি। মনে মনে থু থু করে হেনা। আর সে আমল দেবে না পদ্মরাণীকে। অনেক ছোট হয়ে গেছে তার নজর।

ঘণ্টা বাজে। ভিজিটিং আওয়ার খতম। কাঁকা হয়ে গেল হলঘর। সিঁড়িতে একটানা শব্দ।

কেমন এক অবসাদ। ব্যথা একেবারেই জুড়িয়ে গেছে। কিংবা ব্যথা খেয়ে খেয়ে সহনশীলতায় পলি পড়ছে। ঘুম আসছে। স্বস্তির ঘুম নয়।

সন্ধ্যা নামল। আর লাফ দিল হঠাৎ ব্যথাটা। তোলপাড় করছে গর্ভদেশ। আরো তীব্র, আরো নির্ধম আক্রমণ। একবার বাঁপাশ, একবার ডানপাশে খাবা এসে পড়ছে। ছ-পাশ থেকে সাঁড়াশির আক্রমণ চলেছে যোনিদেশে। উচ্চ শ্বাসপ্রবাহ প্রচণ্ডবেগে ধাক্কা দিচ্ছে গর্ভমূলে। পট পট করে ছিঁড়ে যাচ্ছে বত্রিশ নাড়ীর পাক। কেন্দ্রে এসে গেছে ব্যথা। ক’টা ধাপ পেরুলেই—

বাতি নিবে গেল হলঘরে। শুধু উমা আর শতদলের টেবিলে বাতিটা জ্বলছে। স্বল্প আলোয় দেয়ালে দেয়ালে কিছুতকিমাকার ছায়া পড়েছে। লোহার খাট। প্রস্তুতিদের চাদরঢাকা নানাভঙ্গিমা, মেজে-পাতা গদিগুলো।

ঠিক নোকোর মত। অনেক ঘুমঘুম যাত্রী নোকায়। ভয় ভয় করে হেনার। সব ছায়াই। তবু তাকানো যায় না। সেই অদৃশ্য জগতের ছায়া যেন ওগুলো। ওখান থেকে পাড়ি জমিয়েছে মানুষ কোন অনাদি কাল থেকে।

‘কৈ শতদলদি, আজ যে কেস আসছে না একটাও?’ সোয়েটার বুনতে বুনতে উমা মুখ তেলো।

‘রোখো, কাল অমাবস্তা। হাত-খালি পাবে না।’ একটা রহস্য সিরিজের পাতা ওলটায় শতদল।

‘শুনছ উমা-মা—’ হলঘরের মাঝ থেকে ডাক আসে।

উমা সামনে এসে দাঁড়ায়।

‘মাইয়ের হুধ বন্ধ হওয়ার কোনো ওষুধ আছে নাকি মা? একঘর ছেলেপুলে, মেয়েজামাই। এ বয়সে আবার কাঁচা নাড়ীর তহির করতে হবে—’

‘মুসুরডাল বাটা লাগান।’

‘সেতো আমিও জানি মা। চুপি চুপি খেয়ে ফেলার মত কোনো ওষুধ নেই?

উমা তাকিয়ে থাকে। নিটোল দেহের বাঁধুনি। তেমনি রং। কত বয়স? দেখলে শ্রদ্ধা জাগে। মনের বাঁধুনি এত আলাগা কেন।

‘ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া—’ চাপ চাপ অদ্ভুত কান্না।

‘কার ছেলে কাঁদে গো?’ উমা ব্যস্ত হয়।

কোন সাদা নেই কারো।

হলঘরের মধ্যে আওয়াজ না। আসছে বার থেকে। দ্রুত পায়ে বারান্দায় আসে উমা। হাই তুলে পাতা ওলটায় শতদল।

প্রসবঘরে টেবিলের নিচে টব থেকে আসছে আওয়াজটা। টেনে বের করল উমা টবটা।

লখিয়া পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, ‘সর দিদিমণি দেখি, তুমি আর হাত দিও না টবে।’

টব থেকে একটা মাংসপিণ্ড বেরল।

‘কী ব্যাপার লখিয়া?’ উমার হুঁচোখে শাসন আর ধমক।

ধতমত খেয়ে যায় লখিয়া, ‘হয়ে কোনো সাদা ছিল না। নড়েও না, কাঁদেও না। একেবারে সবুজবর্ণ। কোনো আশা নেই দেখে টবেই রাখল শতদলদি—সকালে গাড়ী এসে নিয়ে যাবে—’

মাংসপিণ্ডটা ধুক ধুক গলায় ককায়। হলঘরে নিয়ে এল উমা।

‘এই শতদলদি, কি কাণ্ড তোমার বল দেখি—’

ভুড়ি বাজিয়ে হাই তুলল শতদল, ‘মরায় তো বেরিয়েছিল, তাই টবে কেলে দিয়েছিলুম।’

‘পোয়াতি জানে?’

‘না। অজ্ঞান হয়ে আছে। সেলাইয়ের কেস।’

গরম জলের ভাপে সৈঁকতে সৈঁকতে নাড়া দিতে লাগল উমা। ‘আহা কাঁছক, জীবনের সাদা আত্মক সমস্ত কোষ বেয়ে।’

শেষ রাত থেকে কেস আসতে শুরু হল। হয়ত এসে গেছে অমাবস্তার কোটাল। বিকট আর্তনাদে যে প্রোটাটি নুটোপুটি খাচ্ছিল, একটি কন্ঠা ভুমিষ্ঠ হল তার।

ভোরের দিকে হেনা বলল, ‘আমায় টেবিলে নিয়ে চলুন।’

জড়িয়ে জড়িয়ে বলল বেহাশের মত।

বারান্দা পেরিয়ে প্রসবঘরে যেতে যেতে এক পলক দুটি পড়ল তার সিঁড়িতে । মাঝ সিঁড়িতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মহিষজননী । ঘাঘরা রক্তাক্ত । দুই উরুর কাঁকে এক রক্তপিণ্ড । টলতে টলতে বাধকনে গেছল । ছুটে এসে জাপটে ধরে আছে তাকে এক জমাদারনী ।

লখিয়ার কাঁধে ভর দিয়ে প্রসবঘরে এল হেনা । নেতিয়ে পড়ল টেবিলে ।

‘ঠিক হয়ে শোও বাছা ।...কৈ কোঁৎ দাও ।’

‘দিচ্ছি তো ।’ গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না ।

‘আরো জোরে—বাচ্চা বেরুবে কেমন করে—ভেতরেই হামলে উঠবে যে—’

গোঁড়ানি, চাপা । তারপর সশব্দ ।

‘কৈ ? তুমি তো পুরানো পোয়াতি গো ?’

‘আর পারছি না—’ যন্ত্রণার দাপটে হেনা শক্ত করে মুঠো, হাঁপায়, কুৎসিত ভাবে বাঁকায় মুখ ।

‘আরো জোরে—আরো—’ ধমকে উঠল শতদল ।

একটানা গোঁড়ানি । কথা বলার শক্তি নেই আর ।

‘টবটা সরিয়ে আন লখিয়া ।’

টেবিলের পায়ের দিকটা গোল করে কাটা । তার নিচে টব । ফুল, রক্ত ওতে পড়বে । ছাঁৎ করে ওঠে হেনার বুক । কেবলি মনে হচ্ছে একটা মরা বাচ্চা আছে ওর মধ্যে । এখনি সে ককিয়ে উঠবে । আড়ষ্ট, শক্ত হয়ে যার সর্বশরীর ।

‘ওকি, শরীর চিলে কর—জোরে কোঁৎ দাও বাছা—হ্যাঁ, এখনি জোরে—এই তো লক্ষ্মীমেরে—পাটা আর একটু—হ্যাঁ ঠিক—’

ভলপেট জুড়ে কাঁকড়ার দাঁড়ার মত শতদলের হাত ।

‘লাখিয়া, ঠিক ধরে রাখ পা-ছুটো ।’

‘মাগো—’ ডুকরে ওঠে হেনা । ভেঙেচুরে যায় মুখের পেশী ।

‘কাদবে না—খবরদার—ভেতরে ছিঁড়ে যাবে—খুব রক্ত ডাঙবে—’

‘মাগো—’ অসহ, অসহ । কান্না, কান্না । আর হাঁশ ছিল না ।

কে যেন কথা বলছে আর এক ভগত থেকে । ঠিক চিনতে পারছে না । চেনা চেনা গলা । তলিয়ে যাচ্ছে পাণ্ডুর অবসাদে । জল গড়িয়ে এল চোখ বেয়ে, ঠোঁট নাড়ল, খানিকটা ঘোলাশব্দ বেরিয়ে এল । সেই চেনা গলায় কে ডাকব । কে ? স্মৃতির অর্গল রুদ্ধ...

চোখ মেলল সে রাতে । তার মুখের ওপর পদ্মরাগী খুঁকে পড়েছে । ছেলে হয়েছে । রক্তশ্রাব হয়েছে প্রচুর । তিনটে এমপিউল কিনে দিয়ে গেছে স্বামী । কখন গড়িয়ে গেছে নিকেল, কখন সন্ধ্যা নেবেছে ।

আবার রাত্রি ।

হলঘরের দৃশ্যপট বদলে গেছে ইতিমধ্যে । অনেক কচি পোয়াতি । প্রৌঢ়াদের অনেকের ছুটি হয়ে গেছে ।

ব্যথাখাওয়া ঘর থেকে ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। নিয়ম, বিদ্যুটে আওয়াজ না করে ব্যথার ভীততা বুঝে ঘণ্টা বাজানো।

শতদলের কাংস গলা : 'খামকা ঘণ্টা বাজাও কেন বলদিকি ? দেবী আছে, আনি বলছি এখনো দেবী আছে তোমার—'

'ও দিদি, ছেলে যে মাই টানে না—'

'টানবে, টানবে—বাবাঃ—পেট থেকে পড়তে না পড়তেই—'

কতক্ষণ সাড়াশব্দ নেই।

ফিক ফিক করে হাসছে উমা, শতদল। আট পাউণ্ডের কালো কুচকুচে এক বাচ্চা মহিষজ্ঞানীর পাশে। গভীর অপত্যস্নেহে একটি চুমা খেয়েছে। - অমনি হাসির লীলা ঝরেছে।

আবার ক্ষীণ ঘণ্টাধ্বনি ব্যথাখাওয়া ঘর থেকে।

উমা ছুটে এল।

'শীগগীর শতদলদি—'

খাট থেকে গড়িয়ে গেছে পোয়াতি মেঝেতে। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেছল ঘণ্টা লগ্নমুহুর্তে। স্তীত যোনিদেশ থেকে একটি টুকটুকে পা বেরিয়ে পড়েছে।

হলঘরে একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ।

শতদল দৌড়ে আসে ব্যথাখাওয়া ঘর থেকে। দিশেহারা হয়ে চেঁচায়, 'আমি জানতুম, জানতুম শয়তানী একটা কাও বাঁধাবে—'

পুবকোণের স্ত্রী নেয়েটি উপুড় হয়ে আছে মেঝেতে। খাটে দাঁড়িয়ে খাঁড়া লাক দিয়েছে। থই থই রক্ত।

ব্যস্ততা, ছুটোছুটি, হাঁকডাক।

আপিস-ঘর থেকে উমার কাঁপা গলা এসেছে, 'হালো—পুলিশস্টেশন—শীগগীর আসুন—গিরিয়াস কেস—'

টলতে টলতে ডাক্তার-মা এলেন হলঘরে। দ্রুত বেরিয়ে এসেছেন কোয়ার্টার থেকে। হলঘরে চুকতে আর পা সরে না।

হেনার চোখে অবসাদ আর ধুম। গভীর বেদনায় পাশ ফিরল সে।

পদ্মরাগীর দৃষ্টি অপলক। রক্তে ভেসে যাওয়া মেঝের দিকে তাকানো যায় না। তবু তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে। মুখে হাত চাপা দেয়। ক্রমশে পারে না আবেগের বন্ড।

'কে ? চুপচুপ—' বাঘিনীর মত তেড়ে আসে শতদল।

সকালে ডাগর চোখ মেলল হেনা। বাচ্চার দিকে চোখ পড়তে ভীরবিক্রম হল চোখছটো। কাতরে উঠল। সারাদেহে লাললাল ডিমডিম ফুটকি। মশার কামড়। মশা আর সম্ভবত শিশুর লড়াই চলেছে সারা রাত ধরে। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করে হেনার।

'ও ধাইদি—'

'কি বলছ ?' কাছের এসে দাঁড়ালো ধাইদি।

‘দেখ দেখি বাচ্চার অবস্থা ?’ কঠিন চোখে তাকায় হেনা।

‘ওরে বাপরে ! খালাসথানায় এসে মশারীর বায়না !’ বাঁকা হাসে ধাইদি।

ছপাশের বেড থেকে ছোটো বাচ্চাকে বগলদাবায় চেপে স্নানের ঘরে চলল ধাইদি।

বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে হেনা। সবে একদিন কেটেছে প্রসবের পর। নিয়ম মত আরো দুদিন থেকে যেতে পারে সে। বিনা খরচে দুর্বল নাড়ীকে আর একটু আরাম দিতে পারত। কি উনার পিঠ চুলকে ডাক্তার-মার অল্পগ্রহ লাভ করে যদি ন’-টা দিন কাটিয়ে যেতে পারত—বাড়ি গিয়ে আর আঁতুড়ের পসরা সাজিয়ে বসতে হত না।

ঘুরে এসে হেনার বাচ্চাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল ধাইদি।

পাশে পদ্মরাণী এসে দাঁড়াল। মুখ পাংশু। শিনধিনে ব্যথার মুখ খুলছে তার। বসে গেছে চোখমুখ।

হেনা বলল, ‘আজই চলে যাব ভাই।’

বিমর্ষ হয়ে পদ্মরাণী বলল, ‘আনিও যাব দিদি। ওরা নিচে নামিয়ে দিচ্ছে, ব্যথা খেতে হয় নিচে বসে খাও। ঐ দুর্গন্ধ, পচা, আঁসটে—টিকতে পারব না।’

‘ফিরে গিয়ে শিঁচুনি খাবেন তো ?’

‘কপাল দিদি।’

‘এখন যাবেন না। সঙ্ক করা ছাড়া—।’

‘আর দুর্গন্ধ, এই গদিটার দিকে চেয়ে দেখুন তো।’

‘ভয়ানক হিংসুক দিদি ওই শতদল। একহাত নেবে সে আমাকে। আমার ভয় সেইখানে। বলছে তোমার পালক ব্যথা—মাস গোনা ভুল হয়েছে।’

ধপ করে শব্দ হয়। ধাইদি শুয়ে দিয়ে গেল বাচ্চাকে।

‘ও ধাইদি, এ যে মেয়ে, আমার তো ছেলে—’

‘ইঃ। মেয়ে বিইয়ে ছেলের বায়না।’

‘আমার ছেলে।’ উঠে বসে হেনা গলা চিরে যায়। সিংহীর মত জ্বলে চোখের তারা।

দক্ষিণ কোণের বেড থেকে এক প্রোচার খনখনে গলা ভেসে এল, ‘কেমন ধারা কাজ তোমার ও ধাইদি, চোখের মাথা খেয়ে বসে আছ—আমার তো মেয়ে, কার ছেলে গছিয়ে গেলে—’

ধাইদি একগাল হেসে, ‘রাগ কোর না মাঠাকরণ, ভুলচুক মানবেরই হয়।’

খনখনে গলা ভেংচি কাটল, ‘সোহাগিনী আমার, যেন খেলার পুতুল, পালটা পালটি হলে ক্ষতি নেই। বলি, টিকিট লাগাওনি কেন ? চাকরী খেয়ে দেব। চেন আমার স্বামীকে ?’

স্বামীর পরিচয় দেয় প্রোচাটি। এ অঞ্চলের নামজাদা সমাজসেবী।

ধাইদি হাসে, বাচ্চাকে কোলে নিয়ে হাসে, ‘আগে বলতে হয় মা।’ গলা খাটো করে বলে, ‘ভালো মাছ দোব আজ, বুঝলে মা—’

মুখ চাওয়া চাওয়া করে হেনা পদ্মরাণী ।

‘তুমি এখনো নিচে নামোনি ?’ শতদল সামনে এসে দাঁড়ালো ।

হেনা ওকালতি করল, ‘ওকে নিচে নামাচ্ছেন কেন ?’

‘ওর পালকব্যথা ।’

‘মুখচোখ দেখেও তো বুঝতে পারেন ।’

‘এইবার শিখতে হবে তোমার কাছে ।’

ঠোঁট কানড়ে পদ্মরাণী বলল, ‘কেন তর্ক করছেন দিদি ।’ তারপর শতদলের চোখে চোখ রেখে বলল, ‘চলে যাব আজ ।’

‘গরীবদের এ খালাসখানায় ভেবেচিন্তে আসতে হয় ।’ ঝটকা নেরে মুখ ঘুরিয়ে শতদল চলে গেল ।

বেলা দশটায় প্রস্তুতিদের দেখতে এলেন ডাক্তার-মা । হেনার বেডের পাশে এসে দাঁড়ালেন ।

‘কেমন আছ ?’

‘আমায় ছুটি দিন ডাক্তার-মা ।’

‘তোমার ইচ্ছায় নাকি ?’

‘আমি থাকব না ।’

‘বেশ, বাড়ি থেকে লোক এলে পাঠিয়ে দিও ।’

‘একটা ইনজেকসান আমার দিয়েছিলেন, আর ছুটো ।’

মধুর হাসির চেউ উঠল ডাক্তার-মার চাকালো মাংসালো মুখে, ‘বোকা মেয়ে, তুমি তো অজ্ঞান হয়ে ছিলে, পাকাগিল্লী হতে পারবে তুমি—’

আর তর্ক জুড়ল না হেনা । বাড়ি থেকে এবেলা কেউ আসবে না । সকালে দরোয়ানের জিন্মায় ডাব পাঠিয়ে দিয়েছে স্বামী । তার সঙ্গে একটা চিরকুট : ক-টা ইনজেকসান তাকে দেওয়া হয়েছে যেন জেনে রাখে ।

ছেলেটার দিকে চাওয়া যায় না । আরো ফুটে উঠেছে মশার কামড় । কাল রাত্রে ঝটনা একটু একটু করে বলেছে পদ্মরাণী । কেমন ছটফট করে ভেতরটা । একদণ্ড থাকতে ইচ্ছা হয় না এখানে ।

বিকলে স্বামী এলে হেনা বলল, ‘ডাক্তার-মার কাছে একবারটি যাও ।’

স্বামী-স্ত্রীতে চোখাচোখি হল । হেনা বুঝল স্বামী বিধাশ্রুত । শাস্ত গলায় বলল, ‘সইটা করে এস ।’

কি বলবেন ডাক্তার-মা হেনার জানা আছে : আপনার রিস্কে নিয়ে যান, এরপর আশাদের কোন দায়িত্ব নেই । বলবেন ভারি কষ্ট গলায় ।

হেনা দেখল ভিজে বেড়ালটির মত স্বামী সিঁড়ি ভাঙছে ।

মিনিট পনেরো পরে ফিরে এল । হাতে সেই পরিচিত ছাড়পত্র :

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে, তোমার সন্তান, যাহার জন্ম অল্প রেজিষ্টারী করা হইল, তাহার জন্মদিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে ১৮৮০ সালের বেঙ্গল টীকা দিবার আইনানুসারে তাহাকে টীকা দিবে...যত্বপি তোমার নিজ বাটিতে তোমার সন্তানকে

টীকা দিবার ইচ্ছা কর, তাহা হইলে টীকাকার তথায় যাইয়া বিনাধরচায় তোমার সম্মানকে টীকা দিবে—যদি সময়ে টীকাকারকে খবর দেওয়া হয়। টীকা দিবার পর বেঙ্গল ভেকগিনেনগন আইন অনুযায়ী একটি সার্টিফিকেট রাখিয়া দিবে...

ওপরে প্রস্তুতির নাম : হেনা সরকার। সময় ৬-২৫ এ, এন্। তারিখ ১০-৪-৫৫।
ওজন পাঁচ পাউণ্ড।

কিন্তু ছ-মাস পরে টীকা নেবার জন্তে ছ-মাস ধরে বেঁচে থাকে ক-টা বাচ্চা? বেড়ে বেড়ে সেই গল্প করে গেছে টীকাকার মিসেস রোজ। ক-টা দিন বাড়ি বাড়ি ঘুরে হাসিমুখে ফিরতে পেরেছে—বলতে বলতে গলা ধরে এসেছে।

তার নয়লা খাটো গাউন, খুঁড়খুঁড়ে শিরাবহল চেহারা দেখলে প্রথমটা বিরূপ হয়ে ওঠে মন। তারপর হৃদয়তা জমতে দেবী হয় না।

‘ছ-মাস বাদে যেন বাচ্চাদের গিয়ে দেখতে পাই—সাবধান মা-রা—ছেলে মানুষ করাও একটা শিল্পকাজ—জীবনশিল্পী হবে তোমরা—’

তখন মমতা ভরে ওঠে মিসেস রোজের প্রতি।

বাচ্চা নিয়ে নিচে নেমে এল হেনা। টলতে টলতে, ছলতে ছলতে।

রিকসায় উঠতে যাবে, পাশেই পদ্মরাণী। হেনার মনে হল অসীম ধৈর্যে ব্যথাকে চাপতে শিখেছে পদ্মরাণী। বয়সে তার চেয়ে ছোট, কিন্তু অভিজ্ঞতায় পাকা ধানের মতই।

‘আসি ভাই।’

‘আমিও যাব দিদি।’

‘আপনি যাবেন না—আজকালের মধ্যে—ক-ঘণ্টার মধ্যে চোখমুখের চেহারা বদলে গেছে আপনার—ক-টা দিন সহ্য করে যান—’

অনুনের ভেঙ্গে পড়ে পদ্মরাণীর স্বামী, ‘দেখুন, আপনি যদি বুঝিয়ে পারেন, আমি তো হার মেনেছি—’

পদ্মরাণী নাছোড়। সে থাকবে না, কিছুতেই থাকবে না।

আর ঝাড়িয়ে থাকা যায় না। পা টলে। ওদের পেছনে কেলে হেনার রিকসা ছোটে।

একটি অসমাপ্ত কবিতা

দিনেশ দাস

আমার এ ভীৰু মন অন্ধকারে ঘোরে
ছায়ার মতই নিভুতে ।
দিনের সোনার দীপে চোখ ঝলসায়,
তাই তো আমার মন ঘোরে ফেरे নিযুতি রাত্ৰিতে

সত্যতার মণি-দীপ জ্বলে ।
আমার আহত মন পথ হেঁটে চলে
নক্ষত্ৰের ছায়ায় ছায়ায় বাৰেবাৰে,
কালো ভারী স্বপ্নের মতই ঘন
অন্ধকার হ'তে আরো গাঢ় অন্ধকারে ।

লড়াই

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

ভাবনাগুলো মোষের শিং—
গুঁতোর চোটে
ছটফটাই,—অন্ধকার
সঙ্গী ছোটে ।

চারদিকেই কড়া পাঁচিল,
কোনোখানেই
একটুখানি বাঁকা সড়ক—
সুবিধে নেই ।

তৃণহীন পায়ের মাটি—
ইট-পাথর,
অস্ত্রুত এ-পৃথিবীর
সব খবর ।

টিকে থাক—অমাহুযিক ;
যান কি গম
সোনার দাম, রেহাই নেই
না নিলে যম ।

কোরিয়া বা ইজিপ্ট-এ
যুদ্ধ তাই •
কিছুই নয়, বেঁচে থাকাই
সেরা লড়াই ।

সিঁড়িভাঙা

গোপাল ভৌমিক

সিঁড়িগুলি এক ।
তুমিও মাড়াও আমিও ।
ভাঙবার কিছু ভিন্নতা আছে
সে কথা যদিও জানিও
সাম্বনা কিছু পাইনাকো খুঁজে
পশ্চাতে যদি পড়ি
বলি তার পা-ই ফস্কাবে
হাঁটবে যে তড়িঘড়ি ।
তাও যদি যায় টিকে
হয়ে নিরুপায়
করি হায় হায়
মনে হয় সব ফিকে

বিদায় জানিয়ে বুদ্ধির জ্যামিতিকে
খুঁজি বিড়ালের ভাগ্যে ছেঁড়ে কি সিঁকে ।
দোষী করে সেই ভাগ্যপতিকে
প্রতিজ্ঞা করি খাড়া—
উটপাখী হয়ে মুখ গুঁজে ভাবি
বালিঝড়ে দিকহারা
হলেও আমার স্বভাৱ হবে না কেনো—
ভাঙি যদি সিঁড়ি যেন তেন প্রকারেণ
একদিন এর শেষ হবে নিশ্চয়,
একদা জীবনে খুঁজে পাবো প্রত্যয় ।

একটি মৃত্যু

বিশ্ব বন্দোপাধ্যায়

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ
শিশিরবসন্তো পুনরায়াতঃ ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যাযুঃ
তবু,
একটি মৃত্যুকে মনে হয় ।

সুদীর্ঘ প্রবাস থেকে ফিরে এসে বন্ধু দোর খুলি ।
নানাবিধ বস্তুতার সাথে নিলে বিশেষ
অকেছো জিনিস যতোগুলি
কোটো, টিন, কাগজের খাপ, খাম, ইত্যন্তত জমে-থাকা ধুলি
দিব্যি মিতালি করে এখানে ওখানে ;
ফেলে-যাওয়া অকেছোরা নিরাসক্ত চোখ দু'টি বার বার টানে—
পরিভ্রান্ত পাণ্ডুলিপি যেন কোনো অকৃতী কবির ।
চার দেয়ালের মাঝে বহুদিন থেকে অন্তরীণ
বন্ধ হাওয়া সমাধিতে হয়েছে স্থবির ;
প্রেতপদচারণায় মৃত্যু ঘোরে সারা ঘরময় ।
বহুদিন আগেকার একটি মৃত্যুকে মনে হয় ।

ভাষালে খেমেছে কাঁটা, ঘরে বুঝি ন'রে আছে কয়েদী সময়
ভাপু সা গন্ধ তার এই যে পেলান
স্থির পেণ্ডুলাম ।
প্রভাত বাইরে আত্মো জন্ম আছে শ্রোত
প্রচুর প্রবাহ ঠিকই দেশে কালে ঘটায় অস্বয়
সেখানে তো মরেনি সময় ।
সকালের রোদে রোদে বাইরে যদিচ খেলা চলেছে আবীর
সে-আবীর মেখে নেয় প্রভাত আপন মনে শুনে কার সুর ?
দেহ মন হলো ভরপুর
সূর্য-খুঁজে-পাওয়া ডাল রক্ত-করবীর ।
সবই কিছু আছে ঠিক তবু তারি মাঝখানে যেন
অলক্ষিতে কতো কিছু হয়ে গেছে কয় ।
বহুদিন আগেকার একটি মৃত্যুকে মনে হয় ।

আগের দিনের মতো সকালের রোদ এসে
 মুখ ঝাঝে এই আয়নায়
 ডেসিং টেবলে বসে হয়তো সে স্বপ্নের ফিতে দিয়ে আঁজে
 বাঁকা চোখে চেয়ে-চেয়ে বিহুণী বানায় ।
 কাস্ত দেহ ঢেলে দিয়ে কোচের কোলে
 দেখি ছ'টি রুলি-হাত পূর্বের জানলাটি খোলে
 দেয়ালেরা খুঁকে প'ড়ে ফিস্ফাস কতো কথা কয়—
 তবু সেই কবেকার একটি স্বভাকে মনে হয় ।

দিনরপি রজনী গায়ঃ প্রাতঃ
 শিশিরবসন্তো পুনরায়াতঃ ।
 কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যাযুঃ
 তবু,
 একটি স্বভাকে মনে হয় ।

একটি চীনা কবিতা

লি পো

নীল পর্দার মতো এক সারি পাহাড়
 আকাশমুখী ।
 নীল পর্দার গায়ে কোনো কিছু লেখা নেই ।
 তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাই আমি, মেঘ পাশে ঠেলে
 এবং একটি সরু রাস্তা খুঁজি ।
 এখানে বসন্ত আসে, উষ্ণ কুল ওই দেখা যায়,
 একটি সবুজ গোরু ভয়ে আছে কুলের মাঝে
 আর সাদা সারস বিমায় বসে পাইনের মাথায় ।
 পাহাড়ের নিচের হ্রদ থেকে গোধূলির আলো উঠে আসে
 তারপর পাহাড়ের চূড়ায় মিশে যায় ঠাণ্ডা কুয়াশার সাথে ।

অনুবাদ : ফকরুজ্জামান চৌধুরী

গৃহস্থের খোকা হোক

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আঁচালে বিশ্বাস আসে অল্পমত বস্তুতায় দিন
কেবল কাটেনি মাঠে, ধানবুনে চিংড়ি হাঁটুতলে
কঁচোর উৎকোচে মুগ্ধ, আবগারি আপিসের বাবু
নিয়মিত পাখোয়াজী। আহা, কাম্য রসের কীৰ্ত্তন
আবাদী গৃহীর ঘরে, সোনা দানা হীরকে ধবলে
নিতান্তই লক্ষ্মীবাধা, চোরছাঁচোড় কুম্ভাও শ্যালক
হুহাতে পোহায় তাপ, মরামাছে হবিষ্কায় শোক
শেষ করে আশুশ্রদ্ধ, অগ্রদানী ভ্রাম্মণের ঘরে
পাঠায় উচ্ছিষ্ট মাংস, সরাভতি বিষাক্ত তণ্ডুল,
ধানপাড় শাড়ি ছটো। ধানবুনে চিংড়ি একা নড়ে
বাদার সবুজ জলে, মেখে ভারি হল শূন্যকুল।

না তোর হবনা বিদ্য অভিশপ্ত নক্ষত্রের মা—
অন্ডায় মাটির গন্ধে, মত্ত কর গৃহস্থের ঘারে।
গতজন্মে ভালোবেসে মন্দবেসে হই বৃহন্নলা,
পংকজ কাকের মত, ভাঙাতালে চোলকের ঘা ;
চোখে জল চাকতে নাচি দিনছপুর পাহাড়ের পারে
নির্বোধ অশোকদৃষ্ট, বুকের অপেক্ষা ক্ষমা বেশি,
পরিশ্রমী পায়ে জমে অলংকার পুরুষের পেশী।

না আঁচালে অবিশ্বাস ? আনি তোর আনন্দের উষা
হুহাতে এনেছি জন্ম, তাল ভাঙা বুতো ভুলি শোক
দেখিস না আমায় স্বামি, স্বেচ্ছাতিৰ্গত তোর খোকা হোক।

কোনো এক রাগিণীর ছায়া

রানেন্দ্র দেশমুখা

নদীজলে চেউ ভুলে আমার জাহাজ বুঝি চলে,
হে চেতনা, কোথায় মোহনা ?
খালাসীরা বেগুনও মাপ কেল জলের গভীরে,
তবু পথ কেমন অচেনা ।
কী এক রহস্য দিয়ে ঝাঁক ও বিচিত্র নদীটির
কে ঘিরে রেখেছে এই গ্রহে ?

কে আশ্রয়ে পিছু ডাকে, কার ঘরে কুটে আছে কুল,
বলো বলো, তুমি কি নিভুল ?
চলেছি সমুদ্রে ছুটে, তবে কেন হাতছানি দাও,
দাঁড়িয়ে বটের মূলে তুমি কেন তটকে রাঙাও,
হে মন-রাঙানো নারী, আমিই সারেঙ,
তরঙ্গিত আমারি জাহাজ ।

কেন জানি মনে হয়, রমণীরা বালিহাঁস ঝাঁক,
ভাদের ডানার রঙে ঝিলমিল আকাশের অণু,
তটে তারা বসে থাকে—থাক ।
আমি এক উলিসিস, ছুটে চলি মোহনার দিকে ।
হে চেতনা,
বহীপের কাছে এসে বালিহাঁসে আসক্তি এনোনা ।

বড়ই অবাক লাগে, মাঝে মাঝে শুনি যবে সুর
গভীর ত্রাত্তির কোলে নূপুরের কোমল ধৈবতে
চেউ চক্রবাক কঁাদে জলে জলে ছলাৎ ছলাৎ,
অশ্রুটি স্মৃতির তটে কোনো এক রাগিণীর ছায়া,
কে যেন শুধায় এসে, 'ভালোবাসা চাও কি-না চাও ?
আমাকে নেবেই যদি নাও ।'

হারিয়ে আদেশ নেই, আমি এক সৈনিক সারেঙ,
জলের সিঁড়িতে বসে পাতালের দিকে চেয়ে চেয়ে
একদণ্ড শুনি আমি দীর্ঘশ্বাস বয় কোথা থেকে ।
নিভার রেশমী চুলে ময়ূরের নেষক পেখনে
পথে-দেখা রমণীরা মুঠো মুঠো কেনা হয়ে যায়,
ধু ধু করা জলের কারার ।

সংলাপ

মানস রায়চৌধুরী

নিজেকে হারাও তুমি লক্ষবার জীবনের ভিড়ে,
তোমার দুর্বল কণ্ঠ ডুবে যায় আকাশ-কাপানো চিংকারে,
হার মানে ক্ষুণ্ণ সুর। অন্তরের নির্জন নিবিড়ে
রুদ্ধ রুদ্ধ উন্মত্ততা নঠবেদী ভাঙ্গে ছারেখারে।

এই দৃশ্য চিরস্তন, সময়ের দৃশ্যপটে ফোটে একই ছবি।
ভয়ঙ্কর দানবতা প্রত্যাহ তোমার আঙিনায়
ফুল হেঁড়ে, কুঁড়ি দলে, স্বভূত তার আসন বিছায়
দিগন্তে নীলিমা মোছে অতর্কিতে ঝরে যায় রক্তিম করবী।

অথচ ইচ্ছার ফুলে গাছ ভরে নিয়ত অন্তরে,
কেবলি বসন্তে নয়, শ্রাবণে আশ্বিনে বারোমাস
উত্তল হাওয়ার স্পর্শে দোলা লাগে বিষম মন্ত্রে
রাত্রে দেখি ছিন্নভিন্ন অন্ধকারে তারার বিকাস।

ভিমিরে ঢেকেছে সত্তা কতোবার, কখন অকালে
কুয়াশায় লুপ্ত দিক। স্নেহেছি এ সংসারের জটিল দুর্গমে
হৃদয়ের ঞ্জবপদে সুর ছেড়ে বহুবার, তালে
বেলেনা বিস্তার। তবু আশা রাখি ফিরবে সে সনে।

ভ্রমণলিপির ছিন্ন অংশ

উৎপলকুমার বসু

আগ্নিনে চলেছি কোন দূরান্তের পাহাড়ে বিদেশী
সহসা কাঁপায় ঘন অরণ্যের স্বক লতা বাহ
চূর্ণভ সিঁথির মত একটি জলের স্রোত পাথরে পাথরে
অবগাহনের বেলা কেমন নীরব শব্দহীন হয়ে গেল...

কি জানাবে অন্য দেশ ? স্বপ্ন মাটিতে লুটানো নথি ।
দেশান্তরে কাকে খুঁজি ? কাকে প্রেম অসুখে বহন করে ?
ফিরে এসো—বারংবার রুদ্ধ কপাটের ঘর হাওয়ায় উত্তাল
কে রয়েছে অন্তরালে ? মুখ অলক্ষ্যে দেখার ছলে
ঘরে আসি । আবার জালায় দাহ । চলো অন্য দেশে চলো ।

দিকচক্রবাল ছুঁয়ে ফিরে এলো অগ্রপ্রানী পাখি
বলে এক দেশ এক মাটি কেবল বাস্তবির ঋতু ফোটার সেখানে
পুষ্পময় ভালোবাসা ।

ফান্তনে চলেছি তাই দূরান্তের পাহাড়ে বিদেশী
হৃৎ থেকে পুষ্পের আনন্দিত উপত্যকাভূমি একদা দেখাবে কেউ ।
আকাঙ্ক্ষা স্নেহের তাপে ব্যপ্ত হ'ল.....

জাহাজ ডুবির পর

গৌর পাল

মঞ্জুদি, হুপুরে রোজ রিক্তশাখা গাছটার দিকে
একা চেয়ে থাকি ; ছায়ারা যখন আরো দীর্ঘ হয়
হাঁসপাতালের দেয়ালে ; তোমরা যেন সেই ফিকে
স্মৃতির মতোন কখন যে আসো যাও ! সে সময়
মুক দেয়ালেরা সব কথা কয়ে ওঠে , অবশেষে
মঞ্জুদি বিশ্বাস কর, কারা যেন চুপিসাড়ে এসে
সন্ধ্যার ছায়ার মতো আমাকেও গ্রাস করে নেয় ;
তবু আমি বেঁচে থাকি, হৃদয়ের শেষ প্রার্থনায়
স্থির উচ্চারণে স্পষ্ট করে বলি, যাবো না, যাবো না ।

শীতের বিষণ্ণ হাওয়া সবে শূন্য রোগীর বিছানা
টেবিলে ওষুধপত্র স্তূপাকার কমলা আঙুর
একদা কে যেন হেসে দিয়েছিল কিছু তাজা ফুল
সুকনো পাপড়িগুলো শুধু তার নিয়মেরি ভুল
যে ভুলে মুখর ছিল, মনে পড়ে কতনা হুপুর ।

তোমরা বোঝ কি কেউ, জেনেছ কি কেন আমি আমি
স্মৃতির বিবর্ণ চিত্র—যন্ত্রণার তুলিতে রেখায়
মিথ্যেই রঙিন করি । —বলোতো মঞ্জুদি যে জাহাজ
ডুবে গেছে, তাকে কি কখনো আর ফিরে পাওয়া যায় ।

আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য কবির মত—চাঁইবাসা মহকুমাতে বাদালীর সংখ্যাবৃদ্ধি। বাংলাদেশ কখনও চাঁইবাসা অর্থাৎ সিংভূমের সদরকে বাংলাভাষী বলিয়া দাবী করে নাই, অতএব সেখানে বাদালীঅধিবাসীর সংখ্যা ৬৪১২ হইতে পাঁচওণ বাড়াইয়া ৩০২৭০ করিলেও বিহারের অসুবিধা নাই কিন্তু ধলভূমকে বাংলাদেশ নিজস্ব বলিয়া দাবী করে কিনা,—ধলভূমের ঐতিহ্য বাংলাদেশেরই ঐতিহ্য কিনা, কাজেই লোকগণনায় ধলভূমে বাদালীর সংখ্যা যাহাতে বেশি না দেখান হয় এই বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছে। এই অভিসন্ধির ফলে সেঙ্গাস অনুসারে বাদালীর সংখ্যা ধলভূমে শতকরা ২১জন অর্থাৎ বড়জোর এক পঞ্চমাংশের বেশি বাড়ে নাই।

অপর দিকে চাঁইবাসা ও সেরাইকেলার প্রতি উড়িয়ার দাবী ষড়নেরও চমৎকার ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে হইয়া গিয়াছে; সিংভূমে সদর এবং সেরাইকেলার ওড়িয়াভাষী জনসংখ্যা ক্রমশঃই নাকি কমিয়া যাইতেছে। অন্তত বিহারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত সেঙ্গাসে সেরাইকেলা আর চাঁইবাসায় ওড়িয়াভাষীর সংখ্যা যে-ভাবে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা লক্ষ্যণীয়। চাঁইবাসা ও সেরাইকেলার প্রতি উড়িয়ার দাবী আছে, সেখানে উৎকল ভাষাভাষী কমিয়া গেল ধলভূমে যাহার প্রতি উড়িয়ার নজর আদৌ নাই, সেইখানে ওড়িয়াভাষীগণ আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিতভাবে সংখ্যায় বাড়িয়া ধলভূমের বাদালীদের সংখ্যা প্রায় সমান হইতে চলিল—বিহার সেঙ্গাস কর্তৃপক্ষের এই ভেদ প্রদর্শনের বিলক্ষণ একটি উদ্দেশ্য আছে; সে উদ্দেশ্য হইল সিংভূমের ভিন্ন ভিন্ন যে যে মহকুমায় বাদালী ও ওড়িয়ার পরস্পর নিবিরোধী পৃথক পৃথক দাবী আছে তাহাদের মধ্যে জট পাকাইয়া গওগোল সৃষ্টি করিয়া আশ্বরে ছুইয়ের দাবীকেই পরস্পর বিরোধী, এবং ফলে দুর্বল ও অস্বাধীন প্রতিপন্ন করা।

বিহারের ১৯৫১ সনের সেঙ্গাস ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে এমনই অপকৌশলজনিত প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণ যে সেই আদমশুমারীর বৎসর হইতে ছয় বৎসর হইয়া গেল, তবু আজিও বিহার সরকার তাহাদের সেঙ্গাসের বিবরণীর অংশ বা ধানবাদ ব্যতিরেকে পূর্ব সীমান্তবর্তী জিলাগুলির আনুপূর্বিক তথ্যাংশ প্রকাশ করিতে সাহস করে নাই অথবা বিহারের বাহিরে সাধারণে প্রচারার্থে পাঠায় নাই।

বাংলাদেশের দাবীর প্রতি বিরূপতা সত্ত্বেও রাজ্যপুনর্গঠন সমিতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে ধলভূমে বাদালীরই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সংখ্যক জনসমষ্টি। কিন্তু তাঁহারা বলিলেন—বৃহৎ সংখ্যক জনসমষ্টি হইলে কি হইবে, আজ যাহা বৃহত্তম কাল হয়ত তাহা বৃহত্তম রহিবে না। (রাজ্য কমিশন সমিতি রিপোর্ট, প্যারাগ্রাফ ১৫, দ্রষ্টব্য)। বিশেষত আধুনিক দ্রুতগতির যুগে যখন যানবাহনাদির সুবিধার জন্ত দেশের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে লোকজনের চলাচল খুব বাড়িয়াছে, তখন সীমান্তের গ্রামসমূহের জনসমাজের গঠন অল্প কিছুদিনের ভিতরেই পরিবর্তিত হইয়া যাইলে আশ্চর্যের কিছু নাই। ইহা সকলেরই কাম্য যে আমাদের ভারতবর্ষ শিল্প ও যানবাহন ব্যবস্থার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া তাহার স্থিতিশীল সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার চিত্রাবসান ঘটাইয়া গতিশীল সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করুক। কিন্তু ইহাতে সীমান্তের গ্রামে আজ যাহারা, ধর্ম্ম বাদালীরা, বৃহত্তম সংখ্যক—কাল যদি তাঁহারা বৃহত্তম

না থাকিয়া মাত্র একটি বৃহৎ দলে পর্যবসিত হন গতিশীল ভারতে কর্মব্যাপদেশে কিছু হিন্দিভাষিগণের সেই সব সীমান্ত অঞ্চলে আগমন এবং অবস্থান কিংবা কিছু বাংলাভাষীর প্রস্থানের কারণে এইরূপ পরিবর্তন ত ঘটতেই পারে তখন কি ভাষাগত প্রদেশের মূল সূত্র অনুসারে আবার প্রাদেশিক সীমানার রদ বদল করিতে হইবে? এই রকম নিয়ম করিলে ত মুহূর্ত্ত প্রাদেশিক সীমানা সকলের পরিবর্তনের প্রয়োজন হইবে— ভারতে দৃঢ়স্থায়ী প্রদেশ বা রাজ্য বলিয়া কিছু থাকিবে না। রাজ্য শাসনের সৌকর্যের জন্য রাজ্যের সীমানা স্থায়ী হওয়া দরকার—তাহার ঘন ঘন পরিবর্তনে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। যদি বৃহত্তমসংখ্যক জনতার ইচ্ছা অনুসারে রাজ্য বিভাগ করিতে হয়, তাহা হইলে সংখ্যালঘুদের বিদেশী-বলিয়া পরিগণিত করিবার মনোভাব জনসাধারণের মনে জাগরুক হইবে—তাহারা ত কিছুকাল বাদে দলে ভারি হইয়া একটি জনবহুল সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া পার্শ্ববর্তী প্রদেশে যুক্ত হইবার জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারে। ফলে এই হইবে যে জাতি কিম্বা সম্প্রদায়গত হিসাবে সংখ্যালঘুকে কেহ বিশ্বাস করিবে না। তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখিবে এবং এই প্রকারে জনসাধারণের ভিতরে সুদৃঢ়ভাবে সম্প্রদায় অথবা জাতিগত ব্যবধান গড়িয়া উঠিবে।

মনে রাখিতে হইবে যে বৃহত্তম লোকসমষ্টি হইলেও, তাহা সমগ্র প্রজা সাধারণের সংখ্যা ধরিলে সংখ্যাগুরু নাও হইতে পারে। অল্পাংশ সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা একক করিলে যত হয়, বৃহত্তম সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা তদপেক্ষা কম হইতে পারে। রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির যুক্তিগুলি এইসব ক্ষেত্রেই বিচার্য। কারণ যেখানে কোন একটি ভাষাভাষী জাতির সংখ্যা এতবেশি যে অন্য সকলের সংখ্যা একত্র করিলেও তাহাদের সমান হয় না, সেখানে গতিশীল সমাজে জনগণের অবিরত আগমন নির্গমন হইলেও সংখ্যাগুরু জাতিকে ক্রমে সংখ্যায় ছাড়াইয়া যাওয়ার আশা অন্য কোন জাতির পক্ষে সাধারণতঃ সুদূর পরাহত। অন্ততঃ ইতিহাসের কালগণনাতেও এমন অবস্থায় সংখ্যাগুরু অল্প সময়ের মধ্যে সংখ্যালঘু হয় না। কিন্তু সমস্যা হইতেছে সেইখানে সংখ্যাগুরু যেখানে মাত্র আপেক্ষিক, অর্থাৎ যেখানে সংখ্যাগুরু জাতি সংখ্যায় এতবেশি নহে যে অল্পাংশ সম্প্রদায় সকলে মিলিলেও তদপেক্ষা সংখ্যায় কম হইবে। এমন অবস্থায় সংখ্যাগুরু জাতি অল্পাংশদের মধ্যে একটি বৃহত্তম সম্প্রদায় মাত্র এবং এক্ষেত্রে ১৫ কি ২০ বৎসরের মধ্যে অন্য একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রথমোক্ত বৃহত্তম সম্প্রদায় হইতে বৃহত্তর হইয়া উঠা অসম্ভব নহে—বিশেষতঃ গতিশীল সমাজে যখন অবিরান বিভিন্ন লোকজনের যাতায়াত চলিতেছে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা বদলাইয়া যাইতেছে।

এই যুক্তির মধ্যে ভাবিবার আছে, ইহা সত্য। কিন্তু চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রদেশ গঠনে ভারতবর্ষের রূপ যে অধুনা বদলাইয়া যাইতেছে তাহার অন্তর্নিহিত কারণ এই যুক্তিবাদীরা অনুসন্ধান করেন নাই। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন ব্যবস্থায় দাবী ইহা নহে যে প্রতিপ্রদেশের সীমানা কয়েক বৎসর অন্তর তাহার বিভিন্ন ভাষাভাষীদের পারস্পরিক আনুপাতিক সংখ্যা অনুসারে পুননির্ধারিত কিংবা পুনর্বিবেচিত হইবে। আমাদের ভারত কয়েকটি বিশেষ জাতি লইয়া গঠিত। ঐতিহ্যের নিজস্ব ভাষা ও

সংস্কৃতি আছে। ইংরেজ শাসন যেরূপ এই জাতিগুলিকে এলোমেলোভাবে পাঁচনিশালী করিয়া রাখিয়া—মারাঠিকে গুজরাটের সহিত, তেলেগুভাষীকে তামিল ভাষীর সহিত একা-
কার করিয়া, ওড়িয়াকে বিহারী হিন্দুস্থানীর সঙ্গে, বাঙ্গালীকে বিহারীর সঙ্গে একই স্থানীয়
শাসনতন্ত্রে রাখিয়া তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক সত্তা অস্বীকার করিয়াছিল, সেইরূপ আবার
সকল জাতির উপরেই তাহাদের সদৃশ প্রভুত্ব বিস্তার করার ফলে তাহাদের
সকলের ভিতর স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার একটি প্রেরণা আসিয়া গিয়াছিল। ইহারই
ফলে এই সকল জাতির স্বাধীনতার জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে সম্মিলিত অভিযান এবং শেষে
সমগ্র ভারতকে লইয়া একটি সংহত রাষ্ট্র গঠন। মুসলমানেরা সম্প্রদায় হিসাবে ইংরাজ-
দের বিরুদ্ধে যোগ দেয় নাই, তাহারা পাকিস্তান করিয়া ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া
আছে; কিন্তু বাকী ভারতবাসী যাহারা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল, মিলিত
কার্যকলাপ হেতু এক সার্বভৌমত্বের স্পৃহা তাহাদের মনে স্বতঃই দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে।
কিন্তু কোন জাতিই ইহার মধ্যে স্বীয় পৃথক সত্তার কথা ভুলিয়া যাইতে পারে না।
প্রতিটি জাতির ভিতরে স্বীয় সত্তার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্য সেই বৈশিষ্ট্যের প্রতীক হিসাবে
পৃথক একটি স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পাইবার বাসনা থাকিবেই। এই আকাঙ্ক্ষা মিটিলেই
ভারতীয় জাতি সকলের নিজেদের মধ্যে কলহবিদ্বেষের আর বিশেষ কারণ থাকে না।
মিলিতভাবে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধতায় যে একতার বীজ প্রতি জাতির মানসে অঙ্কুরিত
হইয়াছিল, পারস্পারিক বিবাদের আবহাওয়ায় তাহা পুষ্ট হইবে কী প্রকারে? প্রতি
জাতিতে যদি স্বায়ত্ত শাসনের কাঠামো দেওয়া হয়, তাহা হইলে পারস্পারিক সৌহার্দ্য
স্থাপিত হইবে পরস্পরের সহিত—অকুঠায় মেলামেশার পর হয়ত এমন কাল আসিবে যে
স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি জাতির পৃথক অস্তিত্ব ও সত্তার অবলুপ্তি ঘটিবে; তখনই
ভারত মহাজাতি গঠনের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবে।

তাই বলিতেছিলাম যে, ভারতের সংহত রাষ্ট্রের সদৃশ হিসাবে প্রতিটি জাতির
পৃথক সত্তা ও শাসনতন্ত্রের এলাকা এক্তিয়ার লইয়া এখন যে আমাদের চিন্তা, তাহা কেবল
ইংরাজ যে আমাদের ভারতের জাতিগত রাজনীতিকে এলোমেলো বিশৃংখলরূপে রাখিয়া
গিয়াছে তাহাই আবার সুসংস্কৃত করিবার জন্য। ঘর গুছাইতে গিয়া ঘরের মধ্যে কাহারো
রহিল, তাহাদের চিনিয়া লইয়া তাহাদের স্বাভাবিক পৃথক সত্তা ও গুণগুলিকে স্বীকৃতি
দেওয়া, এই মাত্র। ইহা হইতে এই বুঝায় না যে, তাহাদের স্বাভাবিক গুণগুলি ভবিষ্যতেও
বরাবর তাহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিবে। অতএব আজ যে-কারণে জাতি ও ভাষা
অনুসারে ভারতে প্রদেশ বিভাগ চাহিতেছি ভবিষ্যতে সে কারণ না থাকিতেও পারে।
ভারতে বিভিন্ন জাতিগুলির ভিতর সম্প্রীতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক জাতিয়তাবোধ
অন্তর্ধান করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং জাতি ও ভাষাভাষীর সংখ্যা
অনুসরণ করিয়া চিরকালই যে প্রাদেশিক সীমানা বদলাইবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত কিংবা
প্রকট থাকিবে, ইহা কোন কথা নহে। ইংরাজ চলিয়া যাইবার পরে ভারতবাসী
তাহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রধান ভাষাভাষী জাতি সকলকে যথাযোগ্য দিয়া সন্তুষ্ট
করিয়া দেশ একবার সুবিস্তৃত করিলে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া সহজ হইবে,
ক্রমে জনসাধারণের পরিবর্তিত মনে থাকিবে বিভিন্ন জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভারতীয়

মহাজাতিতে একেবারে বিলীন হইয়া গেলে প্রাদেশিক বা রাজ্যসীমানা পুনর্বর্গটনের চাহিদা কোনও কারণেই দ্বিতীয়বার আর উঠিবে না—ভাষাগত প্রদেশ ব্যবস্থার সমর্থক-দিগের অভিপ্রায় ইহা ছাড়া আর কিছু নহে।

অর্থাৎ, ভারতের গতিশীল সমাজে লোকজনের বাসস্থান পরিবর্তনের কারণে প্রাদেশিক সীমানায় সমাজের ভাষাগত গঠন বদলাইয়া যাওয়ার সম্ভবনা আছে, সত্য। কিন্তু তাহা সময় সাপেক্ষ, ততদিনে ভারতের জনসমাজে ভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে হৃদয়ের তীব্রতা আর থাকিবে না, সাধারণ নিয়মেই রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা জনিত সন্তোষ এবং একসঙ্গে অনেকদিন থাকার জন্য মৈত্রীর কারণে ভারতে বিভিন্ন জাতিরা তখন তাহাদেরই মধ্য হইতে গঠিত বিরাট এক ভারতীয় মহাজাতির ভিতরে আত্মবিলিপ্তির পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া যাইবে—হাইই ত প্রত্যাশিত। সে বিভেদও থাকিবে না এবং বিভেদ ও প্রাদেশিক জাতীয়তাবোধজনিত রাজ্যসীমানা অদলবদলের তাগিদ ও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্যাও, থাকিবে না বা বহুল পরিমাণে লুপ্ত হইবে। এ সমস্যা আধুনিক কালের, বর্তমানের সমস্যা, ইহার সুসমাধানে ভবিষ্যতে ইহার রেশ মাত্র থাকিবে না।

তবে অবশ্য সুসমাধান চাই। ভবিষ্যতে সর্বপ্রকার মঙ্গল সম্ভব ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার যদি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বিভিন্নভাষী জাতিগুলির প্রতি সমঝদরভাবে একটি ঋণানিষ্ঠ এবং পক্ষপাতশূন্য নীতি অনুসরণ করে। তাহা না করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি হইয়াছে লোকের স্বাভাবিক জাতিগত আকাঙ্ক্ষাকে বাধা দিতে গিয়া সেই আকাঙ্ক্ষাকে বরং তীব্রতর করিয়া বিপথচালিত করা এবং ফলে অবশ্যত্বাবীভাবে সাধারণ মানুষের মনে তাহার সহিত বৃহত্তর দেশ তথা ভারতের সম্বন্ধচেতনাকে স্তিমিত করা, অথবা কোন কোন প্রদেশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়া প্রদেশে প্রদেশে, জাতিতে জাতিতে প্রাদেশিকতা উদ্ধাইয়া দিয়া বৃহত্তর দেশের প্রতি জনগণের অমুরাগকে খর্ব করা। বিশেষতঃ মারাঠী গুজরাটী সমস্যা এবং উড়িষ্যা ও বাঙ্গলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিচারবিবেচনা যাহা হইয়াছে, তাহাতে এই সরকার যে দেশের ভাবী ও স্থায়ী মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া স্থিতস্বার্থের তুষ্টিবিধানের জন্য উৎসুক, নিরপেক্ষ বক্তৃত্যেরই নিকট তাহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালীরা মাত্র আপেক্ষিক সংখ্যাগুরু ধলভূমে, সেখানে তাহাদের নিবৃত্ত সংখ্যাধিক্য নাই, এই উক্তির জবাবে বলিব যে কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা ও শুভইচ্ছা থাকিলে ইহার জন্য ধলভূমের বাঙ্গলায় আসা আটকাইত না। দেশের রাজনৈতিক মানচিত্র এমন এক বস্তু নহে যে ঘন ঘন তাহার পরিবর্তন হইতে পারে। স্বাধীনতার প্রারম্ভের যুগে ভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের আকাঙ্ক্ষার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যে ব্যবস্থা করা হইত, ভবিষ্যতে কোন ভাষাভাষীর সংখ্যা পরিবর্তন হইলেও সর্বসম্মতি ব্যতিরেকে সে ব্যবস্থা বদলাইবার কোন প্রয়োজন ঘটিত বলিয়া মনে করি না। অতএব যথেষ্টভাবে সংখ্যাগুরু নহে—পরে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে গতিশীল সমাজে নুতন জনসমাগমে সংখ্যাগুরু নাও থাকিতে পারে ইত্যাদি যুক্তি বা অজুহাতের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই।

আর যদিই বা দেশ বিভাজনের জন্য বাঙ্গালীর অনাপেক্ষিক ও নিবৃত্ত সংখ্যাধিক্য থাকা বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে ধলভূমে যে অংশে বাঙ্গালিগণ সংখ্যায় নিবৃত্তভাবে

অধিক অস্তিত্ত সে অংশ ত বাঙ্গলায় যুক্ত হইতে পারিত । মাদ্রাজ এবং কেরলায় জিলা ভাদিয়া তাহার ক্ষুদ্রাংশ একপ্রদেশ হইতে বিযুক্ত হইয়া অপর প্রদেশে সংযুক্ত হইতে পারে, ধলভূমের বেলাতেও তাহার যে অংশে বাঙ্গালীর অবিসংবাদী আধিক্য রহিয়াছে তাহা বাঙ্গলার বলিয়া নিদিষ্ট হইতে পারিত ।

ইহা ছাড়া স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বাংলাদেশের দাবী শুধুই ভাষাগত সংখ্যাগুরুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে । স্বাধীনতার প্রাক্কাল হইতে দেশবিভাগের ফলে বাংলাদেশের উপর দিয়া ঝড় চলিয়াছে । তাহার দুইতৃতীয়াংশ ভূমি পাকিস্তানের কবলে গিয়াছে ; পাকিস্তান হইতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী আসিবার ফলে বাকী পশ্চিমাংশের আর্থিক সংস্থান বিপর্যস্ত ও প্রায়বিক্ষস্ত হইয়া যাইতেছে । পশ্চিমবঙ্গে জনবসতির ঘনত্ব পৃথিবীতে সর্বত্রই উপমানের পর্যায়ভুক্ত হইয়া উঠিয়াছে—এই অবস্থায় ইহাই ত স্বাভাবিক যে ধলভূমের শ্রায় প্রচুর অনাবাদী ভূমি সংবলিত বিহারের সীমান্তবর্তী বাঙ্গালীঅধ্যুষিত জনবিরল অঞ্চলসমূহ বিহার স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাহার ভারতের প্রতি, ভারতীয়দের প্রতি অনুরাগের স্বাক্ষরেই, ভারতের একটি বিড়ম্বিত বিপদগ্রস্ত অংশের প্রয়োজনার্থ ছাড়িয়া দিবে । পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতের অংশ নহে ? বাঙ্গালীরা কি ভারতীয় নহে ? তাহাদের সাহায্য করিতে বিহার সরকারের তথা ভারত সরকারের এ দুর্য্যবস্থা কেন, এত অনিচ্ছা, এত কপণতা কেন ? ধলভূমাদি বিহারের সীমান্ত অঞ্চল বাঙ্গলাদেশে আসিলে বিহারের কী এমন ক্ষতি, বিহারের সমগ্র আয়তনের তুলনায় বাঙ্গলাভাষী সীমান্ত আয়তন বেশি হইলে নয়ভাগের একভাগ হইবে ।

ধলভূমের উপর বাঙ্গলার দাবী শুধু ভাষার অনুরোধে নহে কৃষ্টি ও সভ্যতার অনুরোধে, অশনবসন, রীতিনীতির সমতার অনুরোধে, উৎসব, শিল্প ও জনগণের স্বভাবের ঐক্যের অনুরোধে । নাম করণ, সাল গণনা, সাধারণ মানুষের আকৃতি প্রকৃতি সকলই ধলভূমবাসিগণের বাঙ্গালীত্বের পরিচয় দেয় । ধলভূমের আদিবাসীদের অধিকাংশেরই মাতৃভাষা ছাড়া অপর ভাষা বাংলা বাঙ্গালীদের সঙ্গে সহজেই এবং স্বভাবতঃই আদিবাসীদের যে সহানুভূতি গড়িয়া উঠিয়াছে সেরূপ আর কোন জাতি কোন সম্প্রদায়ের সহিত আদিবাসীদের হয় নাই । আদিবাসীদের ধরিয়া গণনা করিলে ধলভূমে বাঙ্গলাভাষীদের নিশ্চিত সংখ্যাধিক্য হয়, ইহাও অবিধানযোগ্য । অপরূপ সফলে মিলিয়া ধলভূমে যে সংখ্যা বাঙ্গলাভাষীরা এখানে তাহাকেও অন্যায়সে ছাড়াইয়া যায় । ভৌগোলিক দিক দিয়াও ধলভূম বাঙ্গলাদেশের—ইহা বাঙ্গলাদেশের সমভূমির পশ্চিমে বিস্তৃত মাত্র । এই সকল যুক্তি, সকল সত্য ভাসিয়া যাইবে—বাঙ্গলা মাতৃভাষা সংবলিত জনগণের ধলভূমে তথাকথিত নির্য্যত সংখ্যাগুরু নাই,—পুংখিগত তত্ত্বের শুধু এই অমুহাতে ?

1. NOTES ON LANGUAGES BY CENSUS SUPERINTENDENT, CENSUS OF INDIA 1931, VOLUME VII ON BIHAR AND ORISSA, PAGE 240.

অগ্রণী

॥ দশম বর্ষ, কার্তিক, ১৩৬৪ ॥

জংশন

বীরেন্দ্র নিংগী

জল ছিটানোর ছড় ছড় শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেলেও ঠিক উঠতে ইচ্ছে করে না প্রথমটা। মুখের উপর কাপড়টা আরো একটু তুলে দেয় পক্ষা। চোখ বুঁজে থাকবার চেষ্টা করে খানিকক্ষণ। নিষ্টি ঠাণ্ডা বাতাসের রেশ কাপড়ের ভেতর দিয়ে গায়ে এসে লাগে। একটু একটু শির শির করে গা। মিঠে মিঠে আরাম। মিশ্র একটা কলরব কানের ভেতর চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসে। সঙ্গজাগা যাত্রীদের কলরব, বাচ্চাদের চ্যাচানি, ফরাস আর ভিস্তিওয়ালাদের প্রভাতী চীৎকার, সব মিলিয়ে আধোজাগাচেতনায় যুহু আঘাত করে। মুখের উপরে পাতলা ঘুম জড়ানো আবেশের পর্দা কাঁপতে থাকে। তারপর হঠাৎ কোনো ইঞ্জিনের কর্কশ হুইল বেজে ওঠে। আধোঘুমের পাতলা পর্দাটা ছিঁড়ে যায়। মুখের কাপড়টা ফেলে দিয়ে পক্ষা চোখ নেল তাকায়।

জংশনে ভোর হয়েছে। প্ল্যাটফর্মের উপর তাজা রোদ্দুর এসে পড়েছে। ভিস্তিওয়ালারা জল ছিটাচ্ছে ছড়ছড় করে। যেন রোদ্দুরকেই ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বিছানাপত্রের গুটিয়ে যাত্রীরা যে-যার মত বেঁধেছেঁদে নিচ্ছে। কলের পাড়ে একগাদা লোকের ভিড়। কেউ জল নিয়ে ঝাঁড়িয়ে আছে, কেউ ভাশ দিয়ে ঝাঁত মাজছে ওরই মধ্যে। লোটার জল ভতি করে কয়েকজন প্ল্যাটফর্মের কিনার ঘেঁসে কুলকুচো করে মুখ ধুচ্ছে। কেটেদাসের স্টলে উলুনে আঁচ পড়েছে সকালের কিস্তিতে। কয়লার ধোঁয়া এখনো চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরোচ্ছে সেডের এপাশ-ওপাশ দিয়ে। একটা লুপ্ত ব্যস্ততা। মনে হয় যেন জংশনটা সপ্ত সপ্ত ঘুম থেকে কাজে লাগবার জন্যে উদ্ভোগ করছে।

পক্ষা চট করে উঠে পড়ে। গায়ের কাপড়টা ভাঁজ করে কবলটির মধ্যে রেখে গুটিয়ে ছোট করে ফেলে। তারপর কেটেদাসের স্টলে গিয়ে কাপপ্রেটের আলমারীর তলায় ঢুকিয়ে রাখে। মুখ ধোওয়ার খুব তাড়াহড়ো নেই তার। যাত্রীদের ঝামেলাটা আরো কমুক তারপর একসময় গিয়ে চোখেমুখে ছোটো ঝাপটা দিয়ে এলেই হবে। এখন বরং পেটে এক কাপ চা পড়া দরকার। খোঁয়ারিটা ভাদে তাহলে।

গুটি গুটি কেটেদাসের উলুনের পাড়ে গিয়ে ঝাঁড়ায় পক্ষা। শোঁ শোঁ শব্দই বেরুচ্ছে না এখনো কোৎলী থেকে। মাথা ঢুলকে কেটেদাসকে বলে, দে ভাইয়া পাখাটা, চট করে ধরিয়ে দি উলুন।

শালা চা বাগাবার মতলব, না ? কেটেদাস খিঁচিয়ে ওঠে ।

হেঁ হেঁ । ময়লা অসমান দাঁত বের করে বাইশবছরের শক্তসমর্থ চেহারার পক্ষা একটা দুর্বল রোগাছেলের মত হাসে । আঙুল দিয়ে ডলে ডলে চোখের পিঁচুটি তুলে ফেলে খানিকটা কিছু করবার মত না পেয়ে । তারপর বাধ্য কুকুরের মত কেটেদাসের পাশে দাঁড়িয়ে বুকের লোম খস খস করে চুলকাতে থাকে ।

লে, লে । জোরে হাওয়া কর । কয়লার গুঁড়ো মাখা ময়লা হাত পাখাটা ফেলে দেয় কেটেদাস ওর দিকে । খন্দেরের ভিড় জমতে শুরু করেছে । এক কাপ চায়ের জন্তে আর খ্যাক খ্যাক করবার সময় নেই । জোরে জোরে পক্ষা হাওয়া করতে থাকে । উহুনটা ধরে উঠেছে । শোঁ শোঁ শব্দ বেরুচ্ছে কোৎলী থেকে । খন্দেরদের চা পরিবেশন শুরু করে কেটে ।

এঁটো কাপ কিছু কিছু বালতির জলে চুবিয়ে ধুয়ে দেয় পক্ষা । লোভার্ত চোখে তাকায় কখন ওকেও চা দেবে কেটে । তারপর চা পেনে একপাশে উবু হয়ে বসে তারিয়ে তারিয়ে খায় । আঃ, শীত-সকালের রোদের মতই মিষ্টি চা । শরীরটা বেশ চাঙ্গা চাঙ্গা লাগে ।

ইয়ার্ডের ওধারে ভাঙ্গা মালগাড়ীগুলোর আড়াল থেকে নিত্যকর্ম সেরে আসতে না আসতে প্র্যাটফর্ম কাঁপিয়ে ডাউন প্যাসেঞ্জার এসে দাঁড়ায় । পক্ষাও সাথে সাথে ঝাঁকানি দিয়ে নিজেকে তৈরী করে নেয় । দিন শুরু হল তার ।

জংশন স্টেশন । অনেকক্ষণ গাড়ী দাঁড়াবে এখানে । ছড়ছড় করে একগাদা যাত্রী নেমে পড়ে এ-কামরা ও-কামরা থেকে । কেউ মগ, কেউ বোতল, কেউ গ্রাস হাতে নিয়ে । মুখ হাত ধুয়ে সবাই কিছুটা করে জল নিয়ে আসবে নিজের নিজের লোকের জন্তে ।

প্র্যাটফর্ম সরগরম হয়ে আছে । যারা নামবার, কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে বা নিজেরাই টানতে টানতে হৈহল্লা করে নেয়ে যায় । ওভারব্রীজ পেরিয়ে কেউ ওধারের প্র্যাটফর্মে যাবে । ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেন ধরবার জন্তে । কেউ বা একেবারে ব্রীজ পেরিয়ে শহরের রাস্তায় গিয়ে নামবে । ডাউনে যাবার যাত্রীরা ওদিকে ঠেলাঠেলি শুরু করে দেয় । মাথায় কাচের কেস দেওয়া খুবারের বাক্স নিয়ে ফেরিওয়ালারা হাঁকতে হাঁকতে প্র্যাটফর্মের এধার থেকে ওধার ছুটোছুটি করে । চাই খাবার, এই প্রম সিঙ্গাড়া, পান বিড়ি বিড়ি পান । গলার সাথে পান বিড়ি সিগ্রেটের ট্রে ফিতে দিয়ে ঝুলিয়ে হেঁকে যায় নানান সুরে । বিচিত্র বিনিময় কলরবে স্টেশন ভরে ওঠে ।

আর পক্ষা এ কামরা থেকে ও কামরার দিকে দৃষ্টি রেখে একঘেয়ে সুরে ভিন্কে চাইতে চাইতে প্র্যাটফর্মের উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করে । এক আধ পয়সা হাতে পড়ে । বেশির ভাগই মুখ ফিরিয়ে নেয় । তা নিক ।

চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে চেষ্টা করে ওঠে ।—আহা হা, করেন কি, করেন কি । টিফিন কেব্রিয়ারের বাটি খুলে ছ'একটা লুচি মুখে তুলেই এক মাঝবয়েসী ভদ্রলোক কাঁচাপাকা গোঁফের নিচে মুখটা বিকৃত করে জানালায় ঝড় গলিয়ে খাবার ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন । ব্যাপারটি পক্ষার

চোখে পড়তেই শশব্যস্ত হয়ে একলাফে এগিয়ে আসে। বলে—আমাকে দিয়ে দিন আছে। ফেলে দেবেন মিছিমিছি।

ভদ্রলোক একবার বিরক্তমুখে ওর দিকে তাকিয়ে তারপর ওর প্রসারিত হাতের উপরে টিফিন কেরিয়ারের বাটিট! উপড় করে তেলে দেন খানিকটা আনুর চর্চরি শুদ্ধ। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গপাগপ বেতে থাকে পক্ষা। শক্ত হয়ে গেছে লুচিগুলো। তা হোক। কাঁচালংকাগুলোও ওই সাপে আরানে ধেয়ে নিয়ে কলের দিকে চলে যায়। সকালের সমস্তটা আজ দিব্যি মিটে গেল। শালার কপালে থাকলে মারে কে।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ে। শেষ মুহূর্তের একটা ব্যস্ততা ট্রেনের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত চারিয়ে যায়। কিছু দোভাদোড়ি, চাঁচামেচি। গার্ডের সবুজ ক্যাপের ইসারা। তারপর কিছু কালো ধোয়ার উল্লীর্ণ করে আস্তে আস্তে ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম কাঁকা করে দিয়ে চলে যায়। যেন সিনেমার ছবির মত হস করে একটা দৃশ্য পাণ্টে যায়। ওয়েটিংরুমে এখন আর লোক নেই। প্ল্যাটফর্মে ছ'একজন লোক। ফিরিওয়ালারা তাদের বাস, ট্রে সব নামিয়ে রেখে এবটু বিশ্রাম করছে। ঝিমিয়ে পড়েছে খানিকক্ষণের জন্যে জংশন। কিন্তু কতক্ষণ আর; আর একটু পরেই এ-ছবি আবার পাণ্টে যাবে। গমগম করে উঠবে স্টেশন। ছড়ানো বাজারের খোসার মত মানুষ জমে উঠবে, প্ল্যাটফর্মে ওয়েটিংরুমে।

তৃপ্তির সাথে বিড়ি বের করে এতক্ষণে একটি ধরায় পক্ষা। তারপর একটি লোহার ধামে ঠেস দিয়ে বসে জুং করে টানতে থাকে।

লোকে বলে জংশনপোকা। পোকার মতই কিলবিল করে ঘুরে বেড়ায় পক্ষা জংশনে। বছর দশেক যখন, তখন মামার বাড়ি থেকে একদিন কেটে পড়েছিল। গাঁয়ের কাছাকাছি গঞ্জে মামার একটি চায়ের দোকান ছিল। সেখানে খাটতে হত পক্ষাকে। বেধড়ক পেটাত মামা তার মা-মরা ভাগ্নেকে আর যতটা পারে খাবার কম দিয়ে একটা অপোগণ্ড পোষার খরচাটা কমাবার চেষ্টা করত। ভালো লাগত না পক্ষার। সুযোগ বুঝে একদিন তাই কেটে পড়ল। এদিকওদিক ঘুরল কিছুক্ষণ। তারপর এসে জুটল জংশনে। এখন এই জংশনই প্রায় ওর ঘরবাড়ি বনে গিয়েছে। শুধু তাই নয় এই ওয়েটিংরুম, প্ল্যাটফর্ম, লাইনের জাল, সিগন্যালপোস্ট, লোকোশেড, কুলি, ভিস্তিওয়ালার, খাবারওয়ালার এরা সব যেমন স্টেশনের এক একটা অঙ্গ, পক্ষাও যেন তেমনি একটা কিছু। রাত্রে মিষ্টি স্বপ্ন দেখে সকালে জেগে গেলে যেমন আবছা আবছা ছবিগুলো একটু আধটু মনে পড়ে আর অনেকক্ষণ ধরে সুন্দর একটা মন কেমন করা ভাবে গা গুলোতে থাকে, তেমনি মাঝে মাঝে পক্ষার ভাসাভাসা মনে হয়, এখানে সব কিছুই যেন সচল। শুধু চলছে, সব সময়েই যেন চলছে স্টেশনটা।

আর এখানে থেকে থেকে পক্ষাও যেন জংশন স্টেশনের মতই সচল হয়ে গেছে।

প্রথমটা লক্ষ্য করেনি পক্ষা। কিন্তু একদিন পরেই নজরে পড়ল। জংশনে আর একটা আদমী এসে জুটেছে। একটা মেয়ে ভাগীদার।

টেনের কামরার পাশে হেঁটে হেঁটে করণ মুখ করে ভিক্ষে করছিল পঞ্চা। মাঝখানে দিনকর রুটি ফিরি করেছে। বড় খাটুনি ও'কাছে। তা ছাড়া এক কাজ আর কদিন ভালো লাগে? সুতরাং ছেড়ে ছুড়ে আবার ভিক্ষে নেমেছে। চুলে তেল দেয়নি কয়েকদিন ধরে। চেহারাটা চেঁচা করে খানিকটা করণ করণ করে তুলেছে। ভিক্ষে করাটাই সুবিধের কাজ। কম খাটুনি। তাছাড়া নেহাৎ কমও হয় না একেবারে। কুড়িয়ে বাড়িয়ে তা আনা আঠেকের কাছাকাছি হয় প্রায়ই।

নাকিসুরে কাঁছনি গাইতে গাইতে হাত বাড়িয়ে একটা কামরার সামনে নিষ্ফল চেঁচা শেষ করে আর একটার পাশে এসে দাঁড়াল পঞ্চা। আর যে পারি না। ও বাবা, বড় খিদে। একটা পয়সা বাবা। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠার কাছাকাছি অঞ্চ একঘেয়ে একটা সুর করে চেঁচিয়ে উঠল। কামরার ভেতর থেকে একজন অল্পবয়সী বৌ কাপড়ের আড়ালে সম্ভরণে ব্লাউজের বোতাম খুলে কোলের বাচ্চার মুখে দুধ গুঞ্জে দিতে দিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। আর সাথে সাথে পঞ্চার পাশ থেকে একটা তীক্ষ্ণ মেয়েলী কান্নার স্বর উছলে উঠে কামরাটাকে যেন প্রাবিত করে দিল।—ও বাবাগো মাগো। বড় খিদে। মরে গেলাম যে মা। বাবা। একটা পয়সা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পঞ্চা। এ আবার কে? কোথেকে ছুটল আপদটা? বছর উম্মিশবিশেকের এক মেয়ে। ফোলাফোলা অঞ্চ খসখসে মুখ। ধুলোয় আর ময়লায় ভাতি একরাশ রুম্ম কঁোকড়া চুল। ছেঁড়া নয়লা কাপড় পরনে।

অ কুঁচকে খসখসে গলায় পঞ্চা বলল—এদিকে ভিড়েছিগ কেন? ভাগ্ ভাগ্। বলে ছেঁড়া কাপড়ের আড়ালে উঁকিনারা ওর দেহের উপর চোখ বুলিয়ে নিল। নিতেই মনে পড়ল, কালকেও যেন দেখেছিল একে স্টেশনে।

মেয়েটা দাঁত বের করে কঁোস করে উঠল বিড়ালীর মত, তুই যানা। হোঁৎকা মরা কোখাকার। বলেই আবার নাকীকান্নার সুরে চেঁচিয়ে উঠল—একটা পয়সা দেবে না মা। ও মা? খিদেয় যে মরে গেলাম। বাবাগো।

তির্ধক চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে কামরার দরজায় দাঁড়ানো একটা প্যাণ্ট পরা লোক দুটো পয়সা ওর হাতে ফেলে দিল। মুখ ঘুরিয়ে মেয়েটা এবারে পঞ্চার দিকে তাকাল। একটু ধরো তীক্ষ্ণ হাসিনাখা দৃষ্টি ফুটে উঠল ওর চোখে। তারপর হেলতে দুলতে চলে গেল গামনের দিকে।

শালী নাগী। খান্কা। দাঁতের উপর দাঁত রেখে উচ্চারণ করল পঞ্চা অক্ষুটে। তারপর করণ সুরে আবার চেঁচিয়ে উঠল—একটা পয়সা বাবা। আর যে পারি না। ও বাবা বড় খিদে।

কে মেয়েটা? কালকে দেখেছিল বটে, কিন্তু অতো খুয়াল করেনি। ই্যা মনে পড়ছে। কেটেদাসের দোকানে এসে একবার চা কিনে নিয়ে গিয়েছিল। কেটেদাস একটু রসিকতাও যেন করেছিল তখন।

টেনটা ছেড়ে চলে গেল একটা ক্ষণিক কোলাহলের ঝড় তুলে। তারপর ভংগনটা একটু জুড়িয়ে গেল ক্ষণকালের মধ্যে। শান্ত হকাররা এখানে ওখানে ছিটকে

পড়েছে। ছপুয়ের বাতাস পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাঁকা প্ল্যাটফর্মের ওপরে।
তীব্র রোদ্দুরে টাটিয়ে উঠছে টিনের শেড। কাগজের টুকরো, চোঙা, শালপাতা
এখানে ওখানে উড়ে যাচ্ছে উত্তপ্ত বাতাসের ধাক্কায়।

শালার বেশি পয়সা হয়নি। নানুর ছ'পয়সা। ওই নাগীটাই সব ভেস্তে
দিল। এদিক ওদিক তাকাল। এই যে! শেডের নিচে পান বিড়িওয়ালা ভজুর
কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে মেয়েটা। কি যেন বলাবলি করছে ছুঁতনে। মাঝে
মাঝে হেসে উঠছে।

হন হন করে এগিয়ে এল পক্ষা। মেয়েটার একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল।
হাসা হচ্ছে খুব দাঁত বের করে। নারে এক খাপড় মুখে। রুচ গলায় ডাকল, এই,
খুব যে বাগড়া দিতে গিয়েছিলে তখন, এ্যা?

মেয়েটা ষাড় কাত করে ওর দিকে তাকাল। একটু মিষ্টি হাসল হঠাৎ।
কি বলো?

এদিকে আনার সাথে টক্কর দিতে এলে মেরে লাট বানিয়ে দেবো না?
এস্টেশনে আর থাকতে হবে না তোকে। গরগর করে উঠল পক্ষা।

খামতো শালা। ভজু এক ধমক মেরে উঠল পক্ষাকে। তাড়াবে। ও:
কি তাড়ানেওয়ালারে।

জ্বাখোতো? অভিযোগের ক্ষীণ সুরে মেয়েটা ভজুকে উদ্দেশ্য করে বলল।

একটু দূরে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল পক্ষা। বুকটা খস খস
করে চুলকতে লাগল। একটা বিড়ি নিয়ে টানছে মেয়েটা। কাশছে মাঝে মাঝে আর
ঝিলঝিলিয়ে হাসছে। শালা ভজুটাতো আচ্ছা শয়তান।

অকারণেই চোঁচিয়ে উঠল পক্ষা।—এই ভজু ছ'পয়সার বিড়ি দেতো। ছুঁটো
পয়সা ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে।

লবাবের বাচ্চা, উঠে নিয়ে যা।

বিড়ি নিয়ে জোরে জোরে টানতে লাগল পক্ষা। কিন্তু মেয়েটা আর ওর দিকে
তাকাল না একবারও। বোকার মত পর পর ছ'ছুটো বিড়ি ধ্বংস করে শেষ পর্যন্ত
উঠে পড়ল ওখান থেকে। ষাড় ফিরিয়ে দেখল। হঁ, এখনো ছুঁতনে হাসাহাসি
হচ্ছে। আচ্ছা।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে একসময়ে কেটেদাগের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল।
বেশ ভালো করে একটা ভাঁড়ে চা দেতো কেটেদা। পয়সা দিচ্ছি।

আগে ষাড় পয়সা। বলে কেটেদাগ হাত পাতল। তারপর ভাঁড়ে করে
একটা চা এগিয়ে দিল। হু আছুল দিয়ে গরম ভাঁড়ের ওপর দিক ধরে কোনরকমে
সামলাতে সামলাতে চলে গেল পক্ষা ওভারব্রীজের কাছে। বসে বসে ছ'পা ছড়িয়ে
দিয়ে যেখানে চুল শুকাচ্ছিল মেয়েটা। সামনে ভাঁড়টা রেখে পক্ষা মুখ কুটে
বসল, এই নে।

অবাক বিষ্ময়ে মেয়েটি তাকাল ওর দিকে। রুক্ষ চুলের রাশির ভেতর থেকে
মুখখানা তীব্র বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল। তীব্র স্বরে বলে উঠল, কি মতলব?

চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল পঞ্চা একটু। তারপর চোঁক গিলে বলল, মতলব আবার কি? বলছি যে চা খেলে শরীরটা বেশ জুয়া লাগবে।

ঠোঁট ছটো কুঁচকে গেল মেয়েটির। একটা বিজ্রপের বিদ্যুৎ চমকে উঠল কঠে। কেটে কেটে বলল, তুই কি আমার ভাতার উঠে এলি যে এত দরদ! মরণ!

ওঃ, ভজুর বিড়ি নিতে পারে হেসে হেসে, গা ঘেঁষে গড়িয়ে পড়ে, আর আমার আনা চা নিতেই যত আপত্তি। একমুহুর্তে কঠিন আক্রোশে ফুলে উঠল—ওঃ, আমি ছাড়া আর সবাই বুঝি তোর ভাতার? ওই ভজু, ওরা সবাই? ওদের কাছে তাই বুঝি অনায়াসে হাত পাততে পারিস?

হো হো করে হেসে উঠল মেয়েটি। অপাঙ্গে একবার তাকাল পঞ্চার দিকে। রাগ হয়ে গেল বুঝি মরদের?

হবে না? শালার চামারটার ফুটুনি নেই এক কড়ার, আর বিড়ি দিয়ে তোর সাথে ভাব জমাতে চায়?

এই নাও, খেলাম। হল তো? আলগোছে ভাঁড়টা হাতে তুলে নিল মেয়েটি। ঠোঁটের কাছে তুলে স্ফুৎ করে চুমুক লাগাল। তারপর চোখ তুলে বলল, যাও। এখন ভাগোতো।

বিমূঢ় পায়ে সরে এল পঞ্চা। বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আর একটু বেশিক্ষণ যদি থাকে যেত ওর কাছে।

মেয়ে। একটা শক্তসমর্থ দেহ। পঞ্চার রক্তে আগুন জলছিল। নিজেকে ভয়ানক দুর্বল আর বোকা বোকা মনে হচ্ছিল। আর বুকের মধ্যে কত যুগের সঞ্চিত আদিম ব্যথা মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছিল। তার জীবনের প্র্যাটফর্মে কোন এক নুতন ট্রেন এসে লেগেছে।

সারারাত জেগে কাটালো পঞ্চা।

নাম মতি। মতি না বুটো মুক্তা? ঠিক বোঝা যায় না।

বুঝি এ স্টেশনের পাকা বাসিন্দা হয়ে গেল মেয়েটা। নড়বার নাম নেই। দিব্যি ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে, এর ওর সাথে মকরা করছে যখন খুশি। আর মাঝরাতের আলোঅন্ধকারে কোথায় কখন নিঃশব্দ পদসঙ্কারে নিলিয়ে যাচ্ছে, কে জানে?

- আর শুধু পঞ্চার ছটফটানি বাড়ছে।

ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সে, কি চায়। কখনো বেশ হাসিখুশি হয়েই আলাপ করে পঞ্চার সাথে, আবার তার একটু পরেই হয়তো ভয়ংকর গম্ভীর হয়ে গেল। কথাই বলল না পঞ্চার সাথে। বলতে এলেও খেঁকিয়ে তাড়িয়ে দিল। মাঝে মাঝেই বিড়িটা বা খাবারটা যা যখন জোটে, দিয়ে আসে পঞ্চা ওকে। নিতে কোনো কার্পণ্য নেই মতির। কার্পণ্য শুধু ওর কাছ ঘেঁষে আসতে। মাঝে পঞ্চা একবার চেষ্টা করেছে ওর কাছ ঘেঁষতে। কিন্তু খেঁকিয়ে উঠেছে মতি। তারপরেই হেসে উঠে বলেছে, একটা বাসন্তেল জোগাড় করে আনিস তো?

একটা ভালো দেখে বাসন্তেল জোগাড় করে দিতে হবে মতিকে। পয়সার

দরকার কিছু। কিন্তু দিয়েই বা কি হবে? আবার হয়তো একদিন পরেই সেই ঋণাত্মক শুরু হয়ে যাবে মতির। আশ্চর্য। আর সবার সাথে তো তেমন বাধে না ওর। শুধু পক্ষার সাথেই যতো ঝগড়া। বিচ্ছিন্নি লাগে। যতো রক্ত টগবগ করে ওর জন্তে, কাছে যেতে ইচ্ছে করে ওর, ততো এই বাধার জন্তে খারাপ লাগে।

একটা ভালো শাড়ি পরেছে আজ মতি। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করেছে। রুম্ম চুলে তেল পড়েছে। কার কাছ থেকে পেল? কাঠের চিকুণী দিয়ে চুল আঁচড়ে নিয়েছে। ছ'কানের ওপর দিয়ে লতিয়ে এসে পড়ে বাড়ির নিচে নেনে গেছে চুল।

ছ'ছবার ঘুরে গেল পক্ষা। তারপর গা ঘেষে সাহস করে কাছে এসে দাঁড়াল। শাড়িটা কার কাছ থেকে বাগাল। আর তেল? আরও লোককে বলেছে বুঝি মাগী?

একরাশ কথা ছড়মুড় করে বুক ঠেলে উঠে আসছিল। খেই হারিয়ে ফেলে শুধু জিজ্ঞেস করল পক্ষা, ট্রেন এলো। গেলিনা যে ভিক্ষে করতে?

চোখ তুলে তাকাল মতি। ধক করে জলে উঠল চোখ দুটো।—কেন, ভিক্ষেয় যাই না-যাই, তোর অতো তাগাদা কিসের?

তাওতো বটে। তোর ভিক্ষের কি দরকার। কতজন সেধে দিতে আসবে। মুখ থেকে কথাগুলো টপটপ করে বেরিয়ে এল। ইঞ্জিনের আলতো ধাক্কায় উঁচু থেকে কাটা বগীগুলো যেমন অনায়াসে গড়গড় করে গড়িয়ে যায় তেমনি।

দেয়ই তো। তাতে তোর কি রে মুখপোড়া? তোরও নোলায় জল এসেছে নাকি? মুখ ঝামটে উঠল মতি। যেন মারতে আসবে।

বেতাহত কুকুরের মত পালিয়ে এল পক্ষা। নাঃ তেল একটা কিনতেই হবে। সন্ধ্যা নামল। আলোয় ঝলমলে স্টেশন হেসে উঠল। কেটেদাসের দোকানে গিয়ে বসল পক্ষা। চা খেল। আড্ডা মারার চেষ্টা করল। তারপর আচমকাই অসমাপ্ত আড্ডার মাঝখান থেকে উঠে পড়ল। প্র্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ খানিকক্ষণ। সাপের মত আঁকাবাঁকা হয়ে ট্রেন এল। চোখে দৈত্যের মত আলো জ্বলে। তারপর ছেড়ে চলে গেল, প্র্যাটফর্মের বুকে যুঁহু কম্পন তুলে। সার্টিংএর শব্দ ভেসে ভেসে এল দূর থেকে। স্টেশনের ওপারের শহরে আলোর বাহার, সাইকেল রিক্সার ঘনঘন যাতায়াত। রাস্তার ধারের দোকানগুলোর সামনে ঝরিন্দারের ভিড়। একটা কর্মব্যস্ত খুশি জগতের এক টুকরো ছবি যেন।

রাত্রি ক্রমশ ধমধমে হয়ে উঠল। পঞ্চমীর সরু চাঁদের ক্যাকাশে আলো ছড়িয়ে পড়ল লাইনের জালের উপর, ইয়ার্ডে রাখা গাড়ীগুলোর গায়ে। অস্পষ্ট স্বপ্নের গায়ে আধময়লা চাদর ছড়িয়ে দিয়েছে যেন কেউ। ঠাণ্ডা মিষ্টি বাতাস উঠল। ঝির ঝির করে বয়ে এল ইয়ার্ড পার হয়ে। চোখ বুঁজে চিৎপাৎ হয়ে পড়ে রইল পক্ষা অনেকক্ষণ। এই বাতাসে যদি শরীরটা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়।

তারপর কি ভেবে চোখ খুলল। বাড়ি ফিরিয়ে তাকাল মতি যেখানে শুয়ে আছে সেই দিকে। আর তাকিয়েই চোখদুটো যেন উৎকট বিশ্বয়ে স্থির হয়ে গেল। একটা মানুষ পা টিপে টিপে মতির দিকে চলেছে। ভদ্র লোকের মতই মনে হয়।

চোখে গগলস। ঝাঁকড়া চুল। গায়ে পাতলা পাঞ্জাবী। হাতাছুটো একটু গুটিয়ে উপরদিকে উঠানো। শরীরের মধ্যে কিলবিল করে উঠল পঙ্কার। চোখছুটো যেন কিছুতেই বন্ধ করতে পারচে না।

লোকটি খমকে দাঁড়াল মতির সামনে। কি যেন বলল। তারপর ধীর পায়ে প্র্যাটফর্মের শেষ প্রান্তের দিকে চলে গেল। আর আশ্চর্য। মতি উঠে দাঁড়াল। সেই কালো শাড়ী পরা মোহিনীর বেণে। উঠে মানুষটা যে দিকে গেছে সেই দিকেই যেতে লাগল।

পঙ্কার বুকের মধ্যে ঢাক বাজছিল। রক্তের মধ্যে অসহ্য একটা ক্যাপা মানুষ যেন দাপাদাপি করছিল। কি সাহস! স্টেশনের বুকের উপরে পর্যন্ত ব্যবসা এগিয়ে আনতে ভয় পায় না মতি। কি করবে সে! দৌড়ে গিয়ে লোকটার টুঁটি টিপে ধরবে?

ওর তীক্ষ্ণ চোখের সামনে ওরা ছুজনে প্র্যাটফর্ম ছেড়ে নামল। লাইনের জালের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলে গেল। তারপর অস্পষ্ট চাঁদের আলো ছহাতে ঠেলে ঠেলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চোখ জ্বালা করছিল পঙ্কার। শুধু বারবার হাতের মুঠিছুটো পাকাচ্ছিল আর খুলছিল। ওরা অনেকক্ষণ হল গেছে। ওরা সারারাত থাকবে ওই রকম চাঁদের আলোয় ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে।

কথাটা মনের মধ্যে পাক খেয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই অকস্মাৎ যেন স্পিরিটের মত পঙ্কার দেহমন দপ করে জ্বলে উঠল। একটা হৃদয় সাহস আর কামনায় সমস্ত মাংসপেশীগুলো টানটান হয়ে উঠল।

গম ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল পঙ্কা। যদিকে ওরা ছুজনে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, প্র্যাটফর্মের সেই দিকে পা বাড়াল। তারপর প্র্যাটফর্মের শেষপ্রান্তের চালু অংশ চেয়ে পয়েন্টসএর তারের সামনে এসে দাঁড়াল।

লম্বা সারে আলো চলে গেছে ইয়ার্ড পর্যন্ত। তার ওপারে কেবিনটি দাঁড়িয়ে আছে ঝাপসা আলোয় ভুতের মত। গাদা গাদা গাড়ী ভিড় করে জুড়ে আছে সাইডিংএর লাইনগুলো। চাঁদটা এখনো মৃধার ওপরে উঠে আসেনি। গাড়ীগুলোর ডানপাশে লম্বা ছায়ার লাইন।

সেই ছায়ার ভিতর থেকে কে যেন উঠে এল। প্রথ পায়ের এগিয়ে আসতে লাগল পঙ্কার দিকে।

বুকের মধ্যে মোচড়াচ্ছিল পঙ্কার। বর্ষাখোঁচা সাপের মত একটা আকুলি বিকুলি ভাব মনের মধ্যে পাক খাচ্ছিল। কি প্রথ পায়ের এগিয়ে আসছে মতি! ছ'খা এগিয়ে গেল পঙ্কা সামনের দিকে। একটু আগেই যে মেয়েটা এই দিকে এনেছে কোন নাম-না-জানা মানুষকে, সেই মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বড় আপনীর বলে মনে হচ্ছিল। এক্ষুণি যদি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারে। ও' একটু বিশ্রাম পাক। পঙ্কার বুকে মাথা হেলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকুক যতক্ষণ খুশি।

কে? শুকনো ফিসফিসে গলায় হঠাৎ চৈচিয়ে উঠল মতি। আঁৎকে উঠছে

বুঝি। সেই পাতাকাটা চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। অম্পটে আলোতেও বেশ ধরা যাচ্ছিল। বুকের কাছে একগাদা কাপড় জড়ো করা।

হুপা এগিয়ে পক্ষা ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। অম্পটে অন্ধকারের পটভূমিকায় ছুটি ছায়াবৃত্ত মূর্তি। যেন জীবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। হুজনে হুজনের দিকে তাকাল। অন্ধকারেও পক্ষার চোখ জ্বলছিল। কামানের অগ্নিশিখার মত

সেই চোখের দিকে তাকিয়ে ক্রান্ত কণ্ঠে মতি বলল, কি। কি চাই?

চাই? তোকে। কাঁপা কাঁপা গলায় পক্ষা যেন সুর করে গেয়ে উঠল। আদিম জীবন থেকে বয়ে আসা অনাদিকালের গান। ঘনরাত্রির রহস্যময়তার একটা পুরুষের চিরস্তন গলা শুনে কেঁপে উঠল মতি। ছটপট করল একটু। ফ্যাকাশে অন্ধকারের নিচে কালো চোখ তুলে পক্ষার দিকে তাকিয়ে কি দেখতে পেল। কে জানে? তারপর নিজের মাথাটা ওর বুকে হেলিয়ে দিল।

একরাশ চেউ এসে যেন আছড়ে পড়ল শুকনো চড়ায়। আর সেই চেউয়ে ছোটো খড়কুটো একসাথে জড়িয়ে ভেসে গেল। ছোটো সবল হাতে পক্ষা সাপটে জড়িয়ে ধড়ল মতিকে তার বুকে। ওর দেহটাকে যেন পিষে ছমড়ে মুচড়ে মিলিয়ে দেবে নিজের বুকের সাথে। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, চল মতি আমরা ঘর বাঁধি।

উঃ, ছাড়ো। কোথায়?

কেন, ভাঙ্গা মালগাড়ী আছে না? ওপাশে?

আধোঅন্ধকারের মধ্যে ছুটি সনাতন মানবমানবী হেঁটে চলল। লাইফের জালের মধ্য দিয়ে। তারপর ইয়ার্ডের একপ্রান্তে ভাঙ্গা গাড়ীর ভিড়ে একটার সামনে এসে দাঁড়াল। একটু হেলে দাঁড়িয়ে আছে একটা বগী। খোলা দরজা। তার উপরে উঠে হাত ধরে টেনে তুলল মতিকে। হুহাতে জড়িয়ে ধরল বুকে। বলল— আমাদের ঘর।

কোথায় যেন ট্রেনের তীব্র বাঁশী বেজে উঠল।

আঠা আঠা গলায় ঢোক গিলে পক্ষা বলল, শাঁখ বাজছে রে।

মরণ আর কি। বলে অন্ধকারের মধ্যেই হেসে মতি ওর বুকে এলিয়ে দিল নিজের গা।

ঠিক তখন ভাঙ্গা মালগাড়ীর মাথার ওপরে চাঁদটা ওঁড়ি মেরে উঠে আসছিল।

পোড়া কয়লার স্তূপের উপর উপর হয়ে পড়ে ছিল পক্ষা। হুহাতে ছাইয়ের গাদা হাঁটকে কয়লার টুকরো তুলছিল ঝড়ির মধ্যে। আশ পাশ থেকে মিশ্র কলরব উঠছিল। একগাদা ছেলেমেয়ের ভিড়। সবাই প্রাণপণে কয়লা বাছছে।

এঞ্জিনের কয়লা গাদা। বাঁধানো একটা চৌবাচ্চার মত জায়গার মধ্যে এঞ্জিনের পোড়া কয়লাগুলো ফেলে দেওয়া হয়। তারপর সেটা ভাঙি হয়ে গেলে পাশে তুলে স্তূপ করে রাখা হয়। ছাইয়ের মধ্যে জ্বালাবার মত কয়লা প্রচুর মিশে থাকে। পয়েন্টসম্যান, কুলি, গ্যাংম্যানের ছেলেমেয়ে আর আশপাশের ভিখিরীর দল এসে ছমড়ি খেয়ে পড়ে সকাল হতে না হতে। কাড়াকাড়ি মারামারি করে কয়লা বাছছে। তারপর

ঝুড়ি ভাঙি করে রেলওয়ে কোয়ার্টারের বাবুদের ঘরে ঘরে বিক্রী করে আসে। কখনো বা শহরের রেস্টুরেন্ট বা মিষ্টির দোকানগুলিতে। সেখানে একটু বেশি দর মেলে।

পাশে ঝুড়ি। দু'হাত দিয়ে বেছে বেছে বড় বড় কয়লার টুকরো বের করছিল পঞ্চা আর টপাটপ ঝুড়িটার মধ্যে ফেলছিল। এ ঝুড়িটা মদন পালের দোকানে দিতে হবে। ব্যাটার কাছে আগের এক ঝুড়ির দান বাকী আছে। বলেছে, আর এক ঝুড়ি দিলে তবে একসাথে দাম শোধ করে দেবে।

পয়সাটা এখন ঠিকমত দিলে হয়। না হলে ওর দোকান থেকেই পুরী কিনে কিনে উসুল করে নিতে হবে। মাগীটা আবার সকালবেলা হাপিতোস করে বসে থাকে। পেটে কিছু না পড়লে মেজাজ বিগড়ে যায়। রানীর মেজাজ আর কি।

মদন পালের দোকানে কয়লা বুঝিয়ে দিয়ে অনেক ঝগড়া করে শেষ পর্যন্ত পয়সা আদায় করল পঞ্চা। খানছয়েক পুরীও জোগাড় করল সস্তায়। তারপর ফিরে চলল নিজের ডেরায়। ধোয়ায় আচ্ছন্ন ইয়ার্ডের গাড়ীগুলোর কখনো পাশ দিয়ে কখনো তলা দিয়ে। রোদ্দুর উঠেছে অনেকখানি। গাড়ীর গায়ে এসে পড়ে ঝকঝক করছে। একটা গাড়ী ধোয়া হয়েছে স্তম্ভ স্তম্ভ। ঝলে চারপাশ ভিজে আছে।

এগিয়ে ঘুরে ফিরে লাইনের জাল গাড়ীর সার পার হয়ে শেষ পর্যন্ত লাইনের প্রান্তদেশে এসে পৌঁছল পঞ্চা। ওদের ডেরায়। মরচে-ধরা ওয়াগনটা একটু কাত হয়ে আছে লাইনের উপর। একপাশের চাকাছুটো খানিকটা পুঁতে গেছে মাটির মধ্যে। লাইন থেকে বেরিয়ে।

ওয়াগনের কাছে এসে উঁকি মারল পঞ্চা। বাঃ, পাটপাট হয়ে এক কোণায় দিবা স্তরে আছে এখনো মতি।

ইঁটের উপর পা রেখে ওয়াগনের মধ্যে উঠে পড়ল পঞ্চা। খাবারের ঠোঙাটা একপাশে রাখল। হাড়িকুড়ির ধার ঘেঁসে। কিছু কয়লা, হাড়ি, মালসা, মগ, হাতা সব এককোণে জড়ো করে রাখা। ধোয়ায় ধোয়ায় ওয়াগনের ছাদ কালো হয়ে গেছে। একটা কড়ির খালা উপর করা রয়েছে উল্লুনের পাশে। কাল রাতে ঝিচুড়ি খাওয়ার পর মাছা হয়নি এখনো। চড় চড় করছে শুকনো এঁটো। টক টক গন্ধ বেরুচ্ছে।

কি করছে মতি এই সারাটা সকাল ধরে? বাসনও ধুতে পারেনি? আশ্চর্য হয়ে গেল পঞ্চা। তাকিয়ে রইল ঘুমন্ত মেয়েটার মুখের দিকে। তারপর এগিয়ে গিয়ে ঝড় হাতে ওর পিঠে একটা ধাক্কা মারল—এই মাগী, ওহু ওহু।

চোখ কচলে আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে বসল মতি।

কালকন্ড না-সেরে সাতসকালেই হারামজাদী ঘুম লাগিয়েছে স্থাখোনা? বিরক্ত কণ্ঠে ঝাঁজিয়ে উঠল পঞ্চা।

ঘুমবো না তো কি বসে বসে তোর নাম জপ করবো? মতিও মুখ ঝামটে উঠল। কাঁধের উপর থেকে কাপড়টা খসে পড়ে গেল সেই ঝামটায়। স্ত্রডোল অনাবৃত স্তন ঝক ঝক করে উঠল, হুঁ, বসে বসে খেয়ে শরীরে বেশ মাংস লেগেছে। ভালোই দেখতে হয়েছে এখন শালী।

পোড়া বিড়ির একটা টুকরো খুঁজে ধরালো পঞ্চা। তেঁতো তেঁতো বিড়িটায় জ্বোরে ছোটো টান ঘেরে ফেলে দিল দরজা দিয়ে বাইরে। তারপর সরে এল মতির কাছে।—নে, খেয়ে নে আগে, পুরীগুলো বেশ গরম গরম আছে। বলে একবার ওর বুক আর একবার খাবারের ঠোঙাটার দিকে লোভার্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

খাচ্ছিলে বাপু। বলে নড়েচড়ে একটু সরে বসল মতি। তারপর শালপাতার ঠোঙাটা খুলে মুখোমুখি হয়ে বসল দুজনে। পুরীগুলো বেশ ভালোই আছে। ঘাঁটের সাথে ভুলে মুখে পুরে আরামে চিবুতে লাগল পঞ্চা। তারপর অবরুদ্ধ গলার নিজের ভাগ থেকে আধখানা পুরী ছিঁড়ে মতির দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, নে, খা।

মাথায় মাথার একটু বাসতেল এখনো জোগার করতে পারলি না? পঞ্চার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল মতি।

বাসতেলের আবার কি দরকার?

কি দরকার? ঝাকা। মাথায় একটু তেল না পড়লে ভালো লাগে কখনো?

এইতো বাপু বেশ লাগছে।

না। না। এঁটো হাতেই পঞ্চার গলাটা জড়িয়ে ধড়ল মতি। আছরে গলায় বলল, মাইরি, আজ তেল আনবি, কেমন?

গলার উপর মতির হাতটা পড়ে কেমন যেন চুলবুল করছে। ওর দিকে তাকাল। ঠোঁটে এখনো তরকারী লেগে রয়েছে। জিভ বের করে ঘুরিয়ে চেটে চেটে খাচ্ছে। তেল চুকচুক করছে মুখখানা।

কিছু ভিক্ষে করে আর কিছু কয়লা বিক্রী করে শেষ পর্যন্ত একটা ফুলেল তেল কিনেই ফেলল পঞ্চা। খোসবুটা ভালোই লাগবে। মতির চুলের মধ্যে নাক গুঁজলে ভরপুর গন্ধে বেশ আরামই লাগবে তার।

কিন্তু মতির তেলের দরকার যে অল্পকিছুর জন্তে, তা বিকেলেই জানা যায়। বিকেলের একটু আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল পঞ্চা। এদিক ওদিক থেকে হুঁচার পয়সা কামাই করবার মতলবে। বাইরে বাজারে ঘুরছিল। যদি কারু পকেট থেকে কিছু হাতানো যায়। কিন্তু লোকগুলো সব যেন বেশি চালাক হয়ে গেছে। পকেটে থাকেই-না তেমন কিছু। আর থাকলেও এমন সাবধান হয়ে চলে যে পঞ্চার মত অপেশাদার লোকের তাদের কাছে ঘেঁষা সাধ্য নয়। শেষ পর্যন্ত অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে দোকান থেকে দুখানা হামাম সাবান বাগয়ে বিক্রী করে দিল পঞ্চা ছ আনায়। যাক, শালা তবুতো কিছু হয়েছে। স্টেশন থেকে একটু চা খেয়ে তারপর ফেরা যাবে ভেরায় নিশ্চিন্তে।

কিন্তু কেটেদাসের দোকানে পা দিয়েই মেজাজ বিগড়ে গেল। দোকানের সামনে ঠ্যাং জ্বলে বসে রসিয়ে রসিয়ে গল্প করছে মতি আর তারিয়ে তারিয়ে চায়ের ভাড়ে চুমুক মারছে মাঝে মাঝে। মাথায় পঞ্চার কিনে-দেওয়া তেল পরিপাটি করে মেখে পাটিপাতা করে চুল বেঁধেছে। তলে চুকচুক করছে। উঃ, অনেকটা তেল মেখেছে একদিনেই।

পক্ষাকৈ দেখেই ঠোঁট টিপে হাসল মতি। কেটেদাসের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার ভাতার এসেছে গো।

ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল পক্ষা। কেটেদাসের দিকে তাকিয়ে শুধু একটু কান্নার মত হাসল। যেন খুব একটা রসিকতার কথা শুনেছে। তারপর মতির দিকে তাকিয়ে শুকনো মুখে বলল, চল, যাবি না এবার ?

খামোতো বাপু। বসো একটু। একটু চা-ই না হয় খাও। অতো ভাড়াটা কিসের ? কি বলো কেটে মিতে ? বলে একটু সামনের দিকে ঝুকে হেসে উঠল মতি। কেটেদাসও সাথে সাথে।—বস শালা। চা খা। পয়সা দিস কিন্তু। যে মাগ পুষতে পারে, সে পয়সাও দিতে পারে। নাকি মিতেনী ?

যেন কিছুই আর করার নেই, কিছু বলারও নেই, এমনভাবে খপ করে বসে পড়ল পক্ষা। আর বসতে বসতে মনে হল, কেটেদাস আবার কবে থেকে মতির মিতে হল ? আজ থেকে না অনেক দিন আগে থেকেই। ভাবতে ভাবতে গুয় হয়ে গেল পক্ষা।

শালা কথা বলে না, স্তাখো। এক ভাঁড় চা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে কেটেদাস বিপজ্জ্বর গলায় বলল, মাগ রেখে কি লাট বনে গেছিস নাকি রে ? কথাটা শুনে একটু লজ্জা পেল পক্ষা। আর লজ্জা পাওয়ার জন্মেই সাথে সাথে চড়াং করে রাগ হয়ে গেল, যে রাগটা এতক্ষণ ধরে করি করি করেও করতে পারছিল না। সব শালা হারামি। ওই কেটেদাস, মতি, সবই।

চোঁচোঁ করে চায়ে চুমুক মেরেই ঝট করে উঠে দাঁড়াল। সত্বে জোগাড় করা ছ'আনা থেকে চায়ের দান ঝড়াং করে ফেলে দিল কেটেদাসের সামনে। তারপর কড়া সুরে প্রায় ধমকের কণ্ঠে বলে উঠল মতিকে, ওঠ, কাজ আছে।

মতি একবার ওর মুখের দিকে তাকাল। তারপর কি ভেবে শুড় শুড় করে ওর পিছু পিছুই রওনা হল শেষ পর্যন্ত।

ওয়াগনে চুকেই পক্ষা ফেটে পড়ল, বলি কেটেদাসের সাথে অত খাতির কিসের, এ্যা ?

খাতির আবার কি ?

তবে যে গিয়েছিলি চলাতে ওর কাছে ?

গিয়েছিলাম তো স্টেশনে ভিক্ষে করতে।

ভিক্ষে করতে না খন্দের বাগাতে ? গস্তীরভাবে কথাটা বলে ছেঁড়া কাঁধার উপর চিৎপাং হয়ে শুয়ে পড়ল পক্ষা। আমাকে দিয়ে সখ মিটেছে না বুঝি ?

বাজে কথা বলিস না ? মতি এবারে ধমকে উঠল, দেখতে পাস না ভিক্ষে করি না পিরীত করি।

হঁ দেখতে একবার পেলে টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলে দেব না ?

ক্লান্ত চোখে মতি তাকালো পক্ষার দিকে। ওরে আমার টুঁটি ছিঁড়নেওয়ানো রে। ফের যদি মুখে আনিস এমন কথা তো তোর মুখে বাঁ পায়ের লাখি মেরে চলে যাব না। নচ্ছার মিলে। রাগ দেখানো হচ্ছে। সোয়ামীগিরি ফলানো, না

কি আমার চিরকালে ভাতার রে যে ওর জন্মে আমার রোজগার পর্যন্ত নষ্ট করতে হবে ?

ঝট করে উঠে বসল পঞ্চা। ওর রাগকুঞ্চিত মুখের দিকে তাকাল। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অকস্মাৎ বুকের মধ্যে কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। গায়ের মধ্যে ঝুলানো ভাব হতে লাগল একটা। অস্বচ্ছ চোখের সামনে মনে হতে লাগল যেন কোনো সিনেমার দেখা অপক্লপ সুন্দরী বসে আছে। তারপরেই একটানে সজোরে মতিকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিল। দুই কঠিন বাহুতে ওকে পিষতে পিষতে ঝড়ঝড়ে গলায় বলল, যাতো একবার দেখি, কেমন করে যাস ?

ছাড়ো তো। উঃ, বলে আঁকুপাকু করে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে শেষ পর্যন্ত ঝিল ঝিল করে হেসে উঠল মতি, কত রক্তও জানো বাপু।

জংশনে বসন্ত এল। হাওয়ায় মিষ্টি উষ্ণতার আনন্দ ধরল। কোথা থেকে খ্যাপাটে বাতাস ছুটে এল। প্ল্যাটফর্মের বুকের উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে গেল, সব কিছু এলোমেলো করে দিয়ে।

মতির মনেও বসন্তের রং ধরেছে। ডেরায় পাত্তাই পাওয়া যায় না বেশির ভাগ সময়। ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, কোথায় কে জানে ? পরিপাটি করে তেল মাখে, চুল বাঁধে। একটা গন্ধ সাবান পর্যন্ত জুটিয়ে এনেছে কার কাছ থেকে যেন। পঞ্চা লোভ করে মাখতে গিয়েছিল। খেঁকিয়ে হাটিয়ে দিয়েছে। বিকেল হলেই ফিটফাট হয়ে সাজে মতি। মাঝে মাঝে গুনগুন করে গানও করে। গ্রীষ্মের আগমনচঞ্চল পাখীর মত বুঝি ডানা ঝাপটায়।

মতির কি একটুও টান হয়নি পঞ্চার উপর, এ কমায়ে ? শুধু কাটি কাটি ভাব কেন তবে ? পঞ্চার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ওকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতে। জীবনে দুদিনের জন্মে এসেছে। চিরদিনের জন্মে কড়ার করে তো আসেনি মতি। আজ চলে গেলেই বা কি করবে সে ? একজন যাবে, আর একজন আসবে।

ভাবে, তবু মনটা কেন যে পোড়ায়। ওর দেহের কানায় চুমুক দিয়ে যে নেশা ধরেছে পঞ্চার। তার ঘোর এখনো কাটিয়ে উঠতে পারল না সে। হাতের মুঠোয় সব সময়ে পাবার জন্মে মনটা এখনো বড় নিশপিশ করে।

ফাটনের অব্যবহিত রোদ্রে আকাশ ভরে গেছে। হালকা ধোঁয়ায় স্টেশনের চারপাশ আচ্ছন্ন। একটা লম্বা আলসে সকালটা যেন বিশ্রাম করছে। কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করে না এমন সুন্দর সকালে। নিশ্চিতই খুশিতে গা মেলে বসে থাকতে ইচ্ছে করে শুধু।

এক কলসী জল নিয়ে এসে ওয়াগনের মধ্যে রাখল পঞ্চা। এই সাতসকালেই মতি কোথায় বেরিয়ে গেছে। পঞ্চাও ওয়াগন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। একচোট আড্ডাই মেরে আসবে সে। আকাশটা কি হালকা নীল। রোদ্দুরে ঝক ঝক করছে। চামড়ার উপর রোদ্দুর পড়ে কেমন শিরশির করছে গা।

রেললাইন পার হয়ে একেবারে ঘরে এসে পড়ল। পকেট থেকে একটা

বিড়ি বের করে ধরাল। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে ভালো করে তাকাতেই নজর পড়ল এপারের ছাইয়ের গাদার পাশে কেমন শুয়ে আছে মতি।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পক্ষা। কপালের উপর বাঁ হাত তুলে ডুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ছাইয়ের গাদাটার দিকে। ঠিক, মতিই শুয়ে আছে বটে।

এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াল। মুখের উপর হাত আড় করে রোদ্দুর আড়াল দিয়ে শুয়ে আছে। ফাস্তনের প্রভাতী রোদ্দ্রে ওর শরীর যেন স্নান করছে। কালো তাক্সা দেহের উপর তাক্সা রোদ্দুর এসে পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে।

গুন গুন করে গান গাইছে মতি। মুগ্ধ বিষ্ময়ে কান পেতে গুনতে লাগল পক্ষা। ভাঙ্গা ভাঙ্গা মনকেমনকরা গলা।—আমার মন মানে না লো গই, আগি ঘরে আর রইতে পারি না।

মুখ তুলে একবার আকাশের দিকে তাকালো পক্ষা। ছোট ছ'এক টুকরো মেঘ আকাশের মাঝখানে আটকে আছে। কোন্ দিকে যাবে ঠিক করতে না পেরেই যেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে এক জায়গায়। অনেক উঁচুতে ছটো চিল অলসগতিতে পাক খাচ্ছে। ট্রেনের ইঞ্জিনের গন্তীর শব্দ উঠল ইয়ার্ড কাঁপিয়ে। বোধহয় এখুনি গাড়ী ছাড়বে।

সব যেন ছটপট করছে। ছুটে চলে যেতে চাইছে নিজের কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে। অনেকদিন পরে পক্ষার মনটাও কেমন যেন ছটফট করে ওঠে। বাম্পাচ্ছন্ন চোখে মতির দিকে তাকায়। আহা ওর মনে কি যেন এক দুঃখ চাপা আছে। ওকে বুকের মধ্যে সাপটে নিয়ে সেই দুঃখটাকে যদি মুছিয়ে দেওয়া যেত।

বুহু গলায় ডাকে, এই মতি, কি করছিস?

মুখের উপর থেকে হাতখানা সরিয়ে নেয় মতি। চোখ খুলে তাকায়। কোন শূন্য লোকে যেন সে দৃষ্টি হারিয়ে গেছে।

এই মতি। আবার ডাকে পক্ষা।

এতক্ষণে যেন সন্মিত ফিরে পায় মতি। উঠে বসে। কাপড় ঠিকঠাক করতে থাকে।

করছিলি কি? পক্ষা জিজ্ঞেস করে।

কিছু না। একলা ভালো লাগছিল না। তাই এসে বসে ছিলাম। ক্লান্ত গলায় মতি উত্তর দেয়।

চল্। এখন ফিরে যাই।

নিঃশব্দে হুজনে ডেরায় ফিরে আসে। কেউ কথা বলে না একটাও। শুধু মতির মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সন্মোহে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে পক্ষা।

তারপর বলে, সিনেমা দেখতে যাবি আজ? বাজারে একটা আধুলি কুড়িয়ে পেয়েছি। বলে মতিকে ছেড়ে দিয়ে একটা চকচকে আধুলি বের করে দু'আঙুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায়।—শালার এক বাজার করতে আসা লোকের পকেট থেকে টুপ

করে পড়ে গিয়েছিল। আমিও তকতকে ছিলাম। যেই দেখেছি, অমনি তুলে নিয়ে সটকে পড়েছি।

হাই তোলে মতি। বলে, বেশ তো ?

মনটা এতক্ষণে বেশ খুশি খুশি লাগে পক্ষার। অনেক লোকের মধ্যে নিজে পাশে বসিয়ে একটা মেয়েকে নিয়ে সিনেমা দেখার দৃষ্টিটা করনা করেও আগেভাগে খানিকটা আনন্দ পায়। কিন্তু আরো আনা কয়েক পয়সা দরকার। টিকেট কাটতে পয়সা লাগবে। তারপর এটা ওটা খরচা আছে। অথচ খটাখাটনি করতে আজ আর একদম ইচ্ছে করছে না।

টেনের সামনে গিয়ে কিছুক্ষণ হাতপাতে পক্ষা। আনা দুয়ের বেশি জোটে না। নাঃ, কেটেদাসকেই ডজাতে হবে। দোকানে গিয়ে বসে ধীরে স্নেহে। খোঁজ-খবর করে এর ওর। না বলতেই নিজে এগিয়ে চায়ের কাপ খদ্দেরের কাছে পৌঁছে যায়। একটা বিড়ি এগিয়ে যায় কেটকে। দিয়ে নিজেও একটা ধরায়। হো হো করে হাসে মাঝে মাঝে কেটেদাসের কথায়। মতি সম্বন্ধে রসালো মন্তব্য অমান বদনে শোনে। এমন কি কেটেদাসকে উদ্ধে দিয়ে নিজেই মাঝে মাঝে হুঁচকারে ছাড়ে। তারপর বলে, দে তো আনাচারেক পয়সা। বড় কাজ পড়ে গেছে।

ভেড়ে ওঠে কেটেদাস, শালা মাগ পুষবি তুই আর পয়সা জোগবো আমি, না ? তারপর বিক্রপভরা গলায় বলে, আমার কাছে ওকে পাঠিয়ে দিস রাতে। ওর হাতেই পয়সা দিয়ে দেব।

হেঁ হেঁ, কি যে বলে কেটেদা। বলে মাড়ি পর্যন্ত ময়লা দাঁত বের করে হাসে পক্ষা। কেটেদাসের কুলো কুলো গালে ঠাস করে চড় লাগাতে ইচ্ছে করে। আস্ত বেজম্মা একটা শালা।

শেষ পর্যন্ত অনেক ভেল দিয়ে পয়সাটা বাগায় পক্ষা। মনে মনে কবে গাল দিয়ে আর একমুহূর্তও দাঁড়িয়ে না-থেকে হনহন করে চলে যায় দোকান ছেড়ে।

সন্ধ্যার শোভে বাজারের সিনেমা হলে গিয়ে পৌঁছায় ওরা দুজনে। উদাস উদাস ভাব দেখালেও মতি মাথায় আজ বেশ খানিকটা ভেল মেখেছে। গন্ধে ভুর ভুর করে চারপাশ। কপালে একটা খয়েরের টিপ পরে আর গায়ে জড়িয়ে নেয় কালো শাড়ীখানা। আটগাট চেহারার ছিমছাম এই মেয়েটির সাথে যেতে যেতে বেশ ভালোই লাগে পক্ষার। খুশির আবেগে একটা পান কিনে যায় মতিকে আর নিজে একটা এক পয়সা দামের সিগারেটই ধরিয়ে বসে।

ছানা টিকেট কিনে নিয়ে আসে ঠেলাঠেলি করে। তারপর অনেক লোকের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বড় বড় কাগজে ছাপা সিনেমার পোষ্টার দেখতে দেখতে আর লাউড স্পীকারে উঁচু গলার গান শুনতে শুনতে একসময় হলে চুকে সঙ্গীর্ণ গায়ে গায়ে বোঁবা টিনের চেয়ারে এসে বসে। গেটের মাথায় মাথায় কাঁচের মধ্যে লাল আলোয় 'বাহির' কথাটা জ্বলতে থাকে। সেই দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ষাড় ফিরিয়ে খুশিভরা চোখে মতিকে বলে, অনেক লোক হয়েছে, না ? বইখানা খুব ভালো হবে, কি বলিস ?

উত্তরে মতি তার পাশের চেয়ারের লোকটার দিকে একটু আস্তে ঘেঁষে গিয়ে মাথা নেড়ে বলে, হঁ। তারপর অপাঙ্গে ঘাড় ঠিক না-ফিরিয়েই লোকটাকে দেখে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকায় পক্ষার দিকে। আর বেল বাজার সাথে সাথে হলের আলো নিভে গিয়ে চলমান ছবি কুটে ওঠে।

অনেক নাচ আর গানওয়ালা হিন্দী ছবি। খুব গান গায় আর ঠেলাগাড়ি ঠেলে এমন এক সুন্দর চেহারার ছেলের সাথে এক বড় লোকের মেয়ের মোটরের ধাক্কা লাগল। তারপর থেকেই হুজনে খুবমহকম। আর কি গান সাথে। আহা, আহা। কিন্তু এক বদমাস বড় বাদ সাধছে। মেয়েটাকে আগে বিয়ে করবে ঠিক করেছিল। এখন এইসব দেখে খুব ক্ষেপে গেছে। কি করবে শালা, কচু করবে? মনে মনে পক্ষা বলে। রীতিমত উত্তেজনা বোধ করে। ওই মেয়েটার সাথে ঠেলা গাড়িওয়ালার বিয়ে হতেই হবে শেষ পর্যন্ত। দেখতে দেখতে মশগুল হয়ে যায়। বিড়ি খাবার জন্যে মনটা আঁকপাক করতে থাকে। ইন্টারভ্যাল হতে না হতেই উঠে পড়ে মতিকে বলে, পান খাবি। বলে আর কোনোদিক না-তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। বিড়ি ধরিয়ে হাসহাস করে টানতে থাকে। তারপর একটা পান কিনে নিয়েই ছুটে চলে আসে ভেতরে। বই আরম্ভ হয়ে যায়নিতো?

ভেতরে ঢুকে হাঁফ ছাড়ে। নাঃ। রেকর্ডে গান বাজছে। অনেকেই উঠে গেছে। শুধু মতির বাঁ-পাশের এক পাতলা পাঞ্জাবী পরা লোক ছাড়া।

শো ভান্ডলে উঠে পড়ে ওরা। ভিড়ের মধ্যে ঠাসাঠাসি ধাক্কাধাক্কি করে আশপাশের লোকসকল ওরা বেরিয়ে আসে। পাঞ্জাবী পরা লোকটার বুক ঘেঁসে দরজা পার হতে হতে মতি বলে, কী ভিড়? তারপর একবার অক্ষুটে উঃ করে উঠেই চুপ করে যায়।

রাত প্রায় সাড়ে আটটার কিছু বেশি হবে। হলের বাইরেটা আলোয় ঝলমল করছে। শো ভান্ডার ভিড় আর নুতন দর্শনার্থীর ভিড়ে বেশ জনকালো দেখায় তল্লাসটা। লাউডস্পীকারে এই মাত্র দেখা ছবিটার গান বাজতে থাকে।

খুশি মনে পক্ষা রাস্তায় এসে ওঠে। হালকা হাওয়া উঠেছে। বসন্তের বাতাস বুঝি। আকাশে ঝাঁক ঝাঁক তারা। ধুলো উড়িয়ে সাইকেল রিক্সাগুলো পঁক পঁক শব্দ করতে করতে এঁকে বেঁকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। পক্ষারা হেঁটেই যাবে।

রাস্তার ধার ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে পক্ষা বলে, বেশ সুন্দর বই কিন্তু, না। ছেলেটা আর মেয়েটার শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়ে যাওয়ায় পক্ষা বেদম খুশি হয়ে হাততালি দিয়েছে হলঘরে বসে।

হঁ, বলে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকটা একবার দেখে নিয়েই মতি ধীরে স্তব্ধ হাঁটতে আরম্ভ করে। কেমন যেন চনমনে আর উজ্জল দেখায় ওর মুখটা।

শেষটা কিন্তু খুব জব্বর দিয়েছে। চাকরটা কি সুন্দর মুখভঙ্গী করছিল জিভ বের করে। যখন ছেলেটা মেয়েটার দিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছিল। হাসি পেয়ে যায় পক্ষার ভাবতে গিয়ে। খুক খুক করে হাসতে থাকে। তারপর মতির দিকে চোখ পড়তেই বিস্ময়ের সুরে বলে, তোর বুঝি ভালো লাগেনি? এমন উসখুস করছিস যে?

মতি হঠাৎ হেসে উঠবার চেষ্টা করে, তোর হাসি দেখে উসখুস করছিলাম।

তাই বল্। বলে এবারে বেশ জোরেই হেসে ওঠে পক্ষা। প্রথম ফাঙ্কনের মিষ্টি বাতাস মুখের উপর দিয়ে আলগোছে বয়ে চলে যায়।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে মতি হঠাৎ ধনকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দ্রব্য উত্তেজিত গলায় বলে, আমাকে বুঝি ডাকল, না ?

অবাক চোখে পক্ষা তাকায়, কে অবার তাকে ডাকবে ?

নাগো। সিনেমা দেখতে গিয়ে এক পুরনো দেশের লোক দেখলাম যে আছ। বলেই পিছন ফিরে তাকায়। হ্যাঁ, সত্যিই একজন লোক আসছে। গায়ে পাতলা পাঞ্জাবী। কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকে। পক্ষা হাঁ করে লোকটার মুখের দিকে তাকায়।

মতি বলে তুই একটু এগো। আমি মানুষটার সাথে ছোটো কথা বলে আসি। অনিচ্ছাসহেও পক্ষাকে এগোতে হয়। কে লোকটা ? একটা বিড়ি ধরিয়ে চিস্তিত মুখে ভাবে। হঠাৎ জনে পড়ে। পাশাপাশি গা ঘেঁসে ওরা দুজনে-আসছে। সিনেমা দেখতে যাবার সময় যেমন সে আর মতি পাশাপাশি হেঁটে গিয়েছিল।

আধুলিটার জন্মে এতক্ষণে বড় আপসোস হতে থাকে পক্ষার। না এলেই হত শালার সিনেমা দেখতে। আধ আধখানা টাকা। সোজা ব্যাপার ? লোকটার সামনে গিয়ে হাত পাতবে ? মতি আছে বলে কিছু দিয়েও দিতে পারে হয়তো।

কিন্তু তার আগেই পাশের একটা গলি দিয়ে লোকটা ভেতরে চলে যায়। আর সারাদিন পরে এতক্ষণে হাসতে হাসতে মতি এগিয়ে আসে। বকবক করে অনেক কথা বলতে থাকে। তার নাকি দেশের লোক। ব্যবসা করে এখানে। মতিদের একসময় খুব দেখত ইত্যাদি। বলে আর গা হুলিয়ে হুলিয়ে হাঁটে।

এখনো কি আর কম দেখবে ? পক্ষা বলে।

একটা নন খারাপ খারাপ করা ভাব নিয়ে ফিরে আসে ডেরায়।

খুব চুলবুল করছে নাগী। শীগগিরই নিশ্চয় শিকলি কেটে উড়ে যাবে। যায় যাবে। চিরদিন থাকার জন্মে তো আর আসেনি। শুধু মনটা খচখচ করে এই ভেবে যে ওকে বুঝি এখনো সম্পূর্ণ উপভোগ করে উঠতে পারল না। ফাঙ্কনের হাওয়া পক্ষার মনেও তাই অস্থিরতা আনে। আর রাতে উন্মত্ত আবেগে মতিকে যতটুকু পারে নিংড়ে নিতে চায়। বোঁটা থেকে খসে পড়বার জন্মে উন্মত্ত পাতার মত তার সম্পর্কটাও যেম মতির সাথে প্রায় শেষ হয়ে আসছে। এখন টুপ করে খসে পড়লেই হল।

যাক। কে কার ভোয়াকা রাখে। ঘুরে বেড়ায় পক্ষা। পরস্যাটয়স কিছু জোঁগাড় হলে স্টেশন থেকেই কোনো কোনোদিন খাওয়াদাওয়া সেরে আসে। মতি ভতর্কণ হয়তো আড্ডা মারছে এখানে ওখানে। শুধু রাতে মাথা গোঁজবার জায়গাটিতে ঠিক আসা চাই। পক্ষাও তাকে তাকে থাকে। এলেই ওকে বুকের মধ্যে হেঁ। নেবে ছিনিয়ে নেয়। আন্নেবে আদরে বিপর্যস্ত করে তোলে। মতি হয়তো ঠাস ঠাস করে মারে ওকে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। তারপর নিশ্চিন্তে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে পক্ষা।। তৃপ্তির গভীর নিদ্রা।

রাতে একআধদিন মতি বলে, খাওয়াদাওয়ার একটা জোগার করলি না ? খিদে লাগেনি তোর ?

মুড়ি ঝেয়েছি। বলে জবাব দেয় পঞ্চা।—ইচ্ছে নেই খাওয়ার। তুই বরং কিছু খা যদি ইচ্ছে হয়।

আমারও খিদে নেই। মতি বলে।—খুব খাইয়েছে কেঁদাস। কেক, বিস্কুট একগাদা। তা তো নিজে চোখেই দেখেছে সে। কেঁদাস হেসে ডাকে আজকাল মতিকে। রসিয়ে রসিয়ে গল্প করে। চা খাওয়ায়।

কেঁদাস ওকে দেখে চোখ মটকায়, কি রে, মতি কি বলে ?

বলবে আবার কি ? কেটে পড়বার তাল খুঁজছে। বলে সামনে বিড়ি ধরায়।

তাই নাকি ? আহা হা রে। তালুর নিচে জিভ লাগিয়ে কৃত্রিম শোকশূচক আক্ষেপ করে কেঁদে।

দূর। কাটে কাটবে। ছুনিয়ায় কি আর মতি ছাড়া মেয়ে নেই। এক যাবে, আর এক আসবে। বাস্।

তবু যেন মনের কোথায় ঝঁচঝঁচ করে। কাঁটার মত একটা সূক্ষ্ম ব্যথা। মাঝে মাঝে মতির ওপর রাগ হয়ে যায় প্রচণ্ড। সব বেইমান এই ছুনিয়ায়। এতদিন যে বসে বসে খাইয়ে মতির চেহারাটায় জেল্লা ধরাল সে, তার খানিক শোধ করা উচিত ওর। কোকিলের মত বড়সড়টি হয়ে উড়ে যাবে দিব্যি, আর তার ভাগ্যে কাকি ? বাঃ রে ছুনিয়া।

সাজগোছের দিকে মতির আগের চাইতে মনোযোগ বেড়েছে। পরিপাটি করে সাজে, টিপ পরে, পান ঝেয়ে ঠোঁট লালও করে। তারপর বেরিয়ে পড়ে।

ছুদিন ওর পিছু পিছু সন্ধ্যায় খাওয়া করেছিল সে। কিন্তু কোথা দিয়ে যে ভেগে যায় মতি। যেন দেখতে না দেখতে অদৃশ্য হয়ে যায়। অনেক খুঁজেও ধরা যায় না, কোথায় গেল।

চা খেতে খেতে কিন্তু একদিন হঠাৎ নজরে পড়ে গেল। ট্রেনে ভিক্ষে করে, আনাতিনেক পয়সা জোগাড় হয়েছিল। মতিকে একটা পয়সারও জ্বিনিস দেবে না এর মধ্যে থেকে, ভাবতে ভাবতে একটা চা নিয়ে বসেছিল কেঁদাসের দোকানে। প্র্যাটফর্মগুলো আলোয় ঝলমল করছে। সন্ধ্যা-রাতের ব্যস্ততা স্টেশনে। একটা লোকাল ট্রেন ছাড়ব ছাড়ব করছে। আপ মেলট্রেনটারও আসবার সময় হয়ে এসেছে। যাত্রীরা ব্যস্ত হয়ে ছুই নং প্র্যাটফর্মের ধার ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। মালপত্র, বোঁচকারুচকি সমেত।

হঠাৎ ওভারব্রিজের কাছ দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে মতি। ছলং করে ওঠে ওর বুকের মধ্যে একরাশ রক্ত। আজ দেখতেই হবে, শালী যায় কোথায়। চোঁ চোঁ করে শরবতের মত চা-টুকু ঝেয়ে নিয়েই ভাঁড়টা ফেলে দেয় ছুঁড়ে উণ্টো দিকে। তারপর বড় বড় পা চালায় ওভারব্রিজের দিকে।

সেই প্রথম যেদিন তার কাছে মতি ধরা দিল, অবিকল সেইরকম করে শাড়ি পরেছে। শুধু তাই নয়, সেদিনের সেই শাড়িখানাও বুঝি। দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে

সামনের দিকে। মাজার দোলানি এতদূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে। উঠছে নামছে ললিত ভঙ্গিতে। ওর মুখটা দেখতে পেলেন যেন ভালো হত। কালো শাড়িটা বড় ভালো মানায় কিন্তু মতিকে। মুখখানা বেশ নরম নরম লাগে দেখতে।

পক্ষা ছোরে ছোরে পা ফেলে।

প্র্যাটফর্মের চালু অংশটা বেয়ে নেমে যায় মতি চোখের সামনে। আধো অন্ধকারের মধ্যে আবছা একটা চলমান মূর্তির রেখা পক্ষার চোখে ভাসতে থাকে। রেললাইনের জাল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে পক্ষা হাঁটতে থাকে সন্তর্পণে। সারবন্দী মালগাড়ীর রাস্তা এসে পৌঁছয়। তারপর ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। চনমনে চোখে চারদিক তাকায়। কোথায় গেল মতি? গাড়ীর তলা দিয়ে ভেগে পড়ল নাকি? বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে পক্ষা। সেই তার প্রথম দিনের মত মতি কি আজও এই লাইনের জালের মধ্যে মিশে গিয়ে তাকে কঁাকি দেবে? গাড়ীর তলা উঁকি মারে পক্ষা, এদিক ওদিক স্তাখে। একটু এগিয়ে যায়, তারপর আবার পিছিয়ে এসে দাঁড়ায়।

দাঁতের উপর দাঁত রেখে কটমট করে পক্ষা। শালী হারামজাদী! লক্ষা লাগে নিছের উপর। একটা মেয়ের কাছে হেরে গেল। দিব্যি সটকে পড়লো তার চোখে ধুলো দিয়ে। নাঃ।

পকেট হাতড়ে শেষ বিড়িটা বের করে ধরায়। ছোরে ছোরে টানতে থাকে। ফিরে যাবে? না, এখানে অপেক্ষা করে দেখবে খানিকক্ষণ?

একটু দূরে ট্রেনের ছইল্লের শব্দ শোনা যায়। ধারে ধীরে সাপের মত হিস হিস করতে করতে ট্রেনখানা এগিয়ে আসে। সেই লোকালটা বুঝি অংশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তার আলোকিত কামড়াগুলো সটসট করে চলে যায় চোখের সামনে দিয়ে। দরজার পাশের মূর্তিগুলো দেখতে না দেখতে অতিক্রম করে যায় আর পরের কামরাখানার একই রকমের মূর্তিগুলো ভেসে উঠতে থাকে।

বিড়িতে ছোরে টান দিতে দিতে অল্পমনস্কের মত অপম্রসমান ট্রেনখানার দিকে তাকিয়ে থাকে সে। এক সময় শেষ কামরাটা ঘটঘটাং শব্দ তুলে চলে যায়। তারপর অকস্মাৎ চোখের সামনে অনেকটা জায়গা কঁাকা হয়ে যায়। চোখ দুটো আশ্রয় হারিয়ে আছড়ে পড়ে ওপারে দাঁড়ানো মালগাড়ীটার ওপর।

সত্যিই হঠাৎ যেন কঁাকা হয়ে গেছে মনের খানিকটা। বিড়িটা পুড়পুড় করে পুড়তে পুড়তে তাগায় এসে ঠেকেছে। তেতো লাগছে। আর না টেনে ফেলে দেয় লাইনের মধ্যে ছুঁড়ে। তারপর ছ'পা এগোয়।

কি ভেবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে আবার। আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায়। কাটাকাটা মেঘ, খানিকটা চাঁদের আলো; ইঞ্জিনের ধোঁয়ার মত আকাশে যেন ছোট ছোট হয়ে আটকে আছে মেঘগুলো। কিন্তু চাঁদটা কোথায়? বাড় ফিরিয়ে আকাশের এদিক-ওদিক তাকায়। পশ্চিম আকাশের দিকে চাঁদটা অনেকটা হেলে পড়েছে। ইয়ার্ডের আলো গুলো উঁচু দিকে অনেকদূর অবধি উঠে গেছে। এখানে ওখানে ইঞ্জিনের গভীর ডাক।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে ভুলে যায়, মতি বলে কোনো মেয়ের খোঁজে

এসেছে এখানে। কেমন যেন হালকা ঝাড়াঝাপটা লাগতে থাকে নিজেকে। ইঞ্জিনের গভীর ডাকে মনটা চনমন করে ওঠে। ইঞ্জিন ডাকছে, স্টেশন ডাকছে, আলোগুলো পর্ষন্ত যেন চোখের ইশারা করছে।

অকস্মাৎ চমকে ওঠে ও। একটু দূরে আধো অন্ধকারের মধ্যে ছোটো মানুষের আবিষ্কার মূর্তি। পর্দার বুকে কালো ছবির মত যেন ভাসছে। মাথার মধ্যে রক্ত চন করে ওঠে। ঝাপসা চোখে আবার তাকায় ওই দিকে। তারপর পা বাড়ায়। দাঁড়িয়ে আছে ওরা। একজন যেন পিছন ফিরল। হ্যাঁ, চলে যাচ্ছে। গায়ে যেন পাঞ্জাবী, না? হাওয়ায় নিচের অংশটা উড়ছে।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় সে। আর গল্লেহ নেই। মালগাড়ীর আড়ালে পড়ে যায় সেই আধোপরিচিত মানুষটি। আর দেখা যায় না।

সেই কালো শাড়িটা সেদিনের মতই এলোমেলো হয়ে রয়েছে মতির গায়ে। চুলগুলোও বুঝি কাপড়টার মতই এলোমেলো। বুক উঠছে নামছে।

একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় সে। আর মতি সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে। যেন ভুত দেখেছে সামনে এমনি ভাবে তাকায়। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

খুব কাছে এসে স্থির দৃষ্টিতে পক্ষা তাকায় ওর দিকে। ওই চুল, ওই বুক, আর ওই শাড়ীর দিকে। তারপর ওর মুঠোকরা হাতের দিকে নজর পড়ে।

কত পেলি! অত্যন্ত নিস্পৃহ সাদা গলায় জিজ্ঞেস করে পক্ষা। যেন পথচলাত কোনো হাটুরেকে জিজ্ঞেস করছে তার ছাগল বেচার দাম। মস্তচালিতের মত ডান হাতের মুঠোটা খুলে ভুলে ধরে মতি তার সামনে। ঘামে ভেজা তালুর মধ্যে একখানা আশু ছ'টাকার নোট।

ছ'টাকা! চোখ বড় বড় করে তাকায় পক্ষা। এক্ষুনি এই মেয়েটা যে দেহ দিয়ে এসেছে, তার বদলে আশু একটা ছ'টাকার নোট পেয়েছে ভেবে আশ্চর্য হয়ে যায়। তার ওই চেনা দেহটার এত দাম। ডান হাতটা খপ করে চেপে ধরে।

আঃ ছেড়ে দাও আমাকে। রাগ আর কান্নায় মেশানো স্বরে মতি কঁকিয়ে ওঠে। হ্যাঁ, ছেড়েই দেবে পক্ষা। জোর করে কেন আটকে রাখতে যাবে।

হাতগানা মুচড়ে নোটটা ছিনিয়ে নিয়ে সজোরে একটা চড় কষিয়ে দেয় মতির গালে।—যাঃ, ভাগ। তারপর মুখ ফিরিয়েই হন হন করে একলা হাঁটা দেয় স্টেশনের দিকে।

দূর থেকে ট্রেনের তীব্র হুইস্‌ল ভেসে আসে। কোনো নতুন ট্রেন আবার স্টেশনে আসছে বুঝি।

বেতার-বিগ্রহ

শৈলেশ বসু

কিছুদিন আমি একটা রেডিওর দোকানে কাজ করেছিলাম। অপার সারকুলার রোডে আমার এক বন্ধুর দোকানে। ইচ্ছে ছিল, বেতার-বিজ্ঞানটা ভালো ক'রে শিখে নেবো, যদিও নানাকারণে শেষ পর্যন্ত সেটা হয়ে ওঠেনি। প্রায় শিক্ষানবিশ হয়েই চুকেছিলাম। আমার কাজ ছিল ব্লু-প্রিন্ট দেখে দেখে লোক্যাল আর অল-ওয়েভ সেট কানেক্ট করা। মেরামতের কাজ সাধারণত আমাকে করতে হ'ত না, কেন না বেতারের কারিকুরি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান তখনও খুব গভীর হয়নি। তবু সে-সময়ে যে-কটা সেট আমাকে সারাতে হয়েছিল, তার মধ্যে একটার কথা এখনও বেশ মনে আছে। বেতারবংশের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান সেট। সেই ক্ষুদ্রেই এই কাহিনীটা শুনেছিলাম।

সেদিন সকাল থেকেই খুব ঝাটুনি গেছলো। একটা সেট তৈরী শেষ ক'রে বিকেলের দিকে একটু বিশ্রামের অবকাশ পেলুম। সব চেয়ারে হেলান দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছি, এমন সময় বন্ধুর ভাই একটা দামী বিলিতি সেট এনে আমার সামনে টেবিলের ওপর রাখলো। বললে, আর সবাই ব্যস্ত আছে আপনি এটা একটু দেখে দেবেন ত।

এমনিতেই আমি মেরামতের কাজ বিশেষ নিতে চাই না, তারওপর সারাদিন একটানা পরিশ্রম করেছি। তাই ক্রান্তভাবে বললুম, আজ থাক না, তাড়া কিসের, কালকে দেখলেও ত চলবে।

সে ব্যস্তভাবে বললে, না-না, বামুনদির সেট। আজকেই চাই।

মুখে বললুম, বেশ রেখে যাও, কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠলুম। বামুনদি কে কোথাকার মহারানী এলেন, তাঁর জন্তে এখন আমার আবার খেটে মরতে হবে। আজকেই চাই! যেন একদিন রেডিও না থাকলে তাঁর মুন হবে না। বিরক্তি অবিশ্রি প্রকাশ করলুম না। হাজার হোক, বন্ধুর ভাইও দোকানের একজন স্বত্বাধিকারী— আমার অন্ততম মনিব। একটা নিশ্বাস ফেলে সেটটা কাছে টেনে নিলুম। দেখলুম, বাজছে এখনও, তবে অতি ক্ষীণ সুরে। খুলেই দেখতে হবে। আমার য় বিস্তে তাতে ক্ষুদ্র কিছু গোলযোগ ঘটে থাকলে সেটটা খোলাই শুধু পণ্ড্রম হবে।

ক্যাবিনেটের ঢাকনাটা খুলেই কিন্তু আমি আঁৎকে উঠলুম, একি! এয়ে রাত্তিমত মরচে ধ'রে গ্যাচে দেখচি। কতকালের সেট?

বন্ধুর ভাই উত্তর দিল, আমাদের দোকান থেকেই কেনা। এখনও তিনবছর পেরোয়নি। তাছাড়া, মাসচারেক আগে সারিয়ে দিয়েচি।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, তবে মরচে ধরলো কি ক'রে?

সে বৃহৎসে বললে, রোজ দু'তিনবার গজাঘল ঝড়লে মরচে ধরার আর অপরাধ কি।

আমার বন্ধু একটু দূরেই একটা বেয়াড়া সেট সারাবার চেষ্টা করছিল। মুখ না তুলে সেখান থেকেই সে চেষ্টায়ে বললে, শুধু মরচেই দেখলি, ফুল বিলিপতুর পাসনি ?

তার কথা শুনে ক্যাবিনেটটা একটু বঁকিয়ে ধরতেই সত্যিগতাই ভেতর থেকে শুকনো ফুলের পাপড়ি আর বেলপাতার টুকরো ঝরে পড়লো। আমি ফ্যানফ্যান করে সেইদিকে চেয়ে রইলুম।

আমার গঙ্গারাম অবস্থা দেখে বন্ধু তার জায়গা ছেড়ে উঠে এলো। ক্যাবিনেটটা ভালো করে খুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সে ঘাড় নেড়ে বললে, নাঃ, বামুনদি আজকাল সাবধান হয়ে গ্যাচে। সিঁহুরের দাগটাগগুলো ভালো করে পুঁচে দিয়েচে দেখচি। ফুল বেলপাতাও খুব কম। না-জানা থাকলে হয়ত লক্ষ্যই পড়ত না।

তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে অধৈর্যস্বরে বললে, তুই যে হাঁ করেই রইলি ?

আমি চোক গিলে বললুম, বুঝতে পাচ্ছি না।

এতে না বোঝবার কি আছে ? ফুল বেলপাতা দিয়ে লোকে কি করে ?

আমি আস্তে আস্তে বললুম, পূজো করে।

বন্ধু অমায়িকভাবে বললে, তাই-ই। বামুনদি সেটটাকে পূজো করে।

আমার বুদ্ধি যেন আরও গুলিয়ে গেল, আবার বললুম, পূজো করে মানে ?

বন্ধু একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, কে জানে—কি মানে।

আলোচনাটা আর বেশিদূর এগোল না। পাড়ারই ছোটো তেরো চোদ্দ বছরের ছেলে সেটটা নিয়ে এসেছিল। তারা প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর এসে তাগাদা দিতে লাগলো। অগত্যা সেটটাকে নিয়ে বসলুম। সারাতে সত্যিই বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। মরচেধরা পার্টগুলো পার্টে দিতেই দিবা বাজতে লাগলো। টিউনিংয়ে সামান্য একটু গোলযোগ আছে মনে হ'ল, কিন্তু ছেলেছোটোর তাগাদায় সেটা নিয়ে গবেষণা করার সময় পেলুম না। একবার উত্থাপ্ত হয়ে বললুম, অত ভাড়া কিসের তোমাদের ?

ছ'জনেই সমস্বরে ব'লে উঠলো, বারে, পাঁচটার সময় মোহনবাগানের খেলা আছে না।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, তোমাদের পাড়ায় কি আর রেডিও নেই ?

একটা ছেলে বালকোচিত দস্তুর সঙ্গে উত্তর দিল, সে আপনি বুঝবেন না।

সত্যিই বুঝলুম না। স্পষ্টই বামুনদির সঙ্গে তাদের কোন আত্মীয়তা নেই।

পরের সেটের জন্যে তাদের উৎসাহটা সত্যিই অস্বাভাবিক ঠেকলো।

ছেলেছোটাকে বিদায় করে বন্ধুর কাছে সেটটার ইতিহাস শুনলুম। বামুনদির সেট শুনে অবহেলায় ঠোঁট কুচকেছিলাম, অথচ টালাপাড়ার এটা একটা বিখ্যাত সেট। পাড়ায় আরো অনেকের বাড়িতেই রেডিও আছে, তবু বামুনদির সেট না হলে পাড়ার ছেলেদের খেলার খবর শোনা হয় না, পাড়ার মেয়েদের অশ্লুরোধের আসরের গান শোনা হয় না। বামুনদির বাড়িতেই পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের আড্ডা। এই ছেলেমেয়েরাই প্রথম বামুনদির বিশ্বয়কর পাগলামি আবিষ্কার করেছিল। কি কারণে তাদের সন্দেহ জেগেছিল কে জানে। তারা আড়াল থেকে বামুনদির ওপর গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছিল। আড়াল থেকে বামুনদির কাণ্ড দেখে তাদের চোখ বিষ্ময়ে বিফারিত হয়ে

গেছলো। তারা দেখেছিল, সকলে ঘর থেকে চ'লে যাবার পর বামুনদি গোবরজল দিয়ে সারা সেটটাকে মুছে শুদ্ধ ক'রে নেয় তারপর গরদের ধান প'রে সেটটাকে পুছো করতে বসে।

ছেলেমেয়েদের মুখে এ-কথা শুনে বড়রা অবিশিষ্ট ধমকে উঠেছিল, কেউ-ই তাদের কথা বিশ্বাস করেনি। বামুনদিকে সোজাসুজি প্রশ্ন করলে সেও হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, দূর, আমি কি পাগল নাকি! কিন্তু তবু চারমাস অন্তর পার্টসে মরচে ধ'রে সেটটা অচল হয়, ক্যাবিনেটের এখানে ওখানে সিঁহরের দাগ লেগে থাকে, ভেতর থেকে ফুলের পাপড়ি আর বেলপাতা ঝ'রে পড়ে।

সেটটা প্রথমবার সারাতে গিয়ে আমার বন্ধুই প্রমাণ পেয়েছিল, ছেলেমেয়েদের কথা সত্যি। কিন্তু ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য যে পাড়ার মধ্যে প্রচার ক'রে তারা নিজেদের হাস্যাম্পদ করতে চায়নি। আমি নেহাৎ অন্যপাড়ায় থাকি; তাই কথাটা আমাকে বলতে বিধা করেনি।

ক্রমশ প্রশ্ন ক'রে ক'রে বামুনদির সম্বন্ধে অনেক কথাই আমি জেনে নিলুম। বুঝলুম, এই রেডিও সেটটা কেনার পেছনেই আসল রহস্যের চাবিকাঠি লুকানো আছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন শেষ হ'য়ে গেছে। বিদেশ থেকে আবার নানারকমের রেডিওসেটের আমদানী শুরু হয়েছে। প্রত্যেক কোম্পানীই ক্যাবিনেটের জলুস দেখিয়ে আর কনসেসনের মায়াজাল ছড়িয়ে ঋণিদ্ধার কঁাদে ফেলবার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন বাড়ির ছেলেমেয়েদের মুখে সেই কথা শুনে বামুনদিরও একটা রেডিও-কেনার সখ হয়েছে।

সেদিন রাত্তিরে পানেরবাটা হাতে নিয়ে বামুনদি বুড়োর ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মেঝের একটু পরিষ্কার জায়গা বেছে পা ছড়িয়ে ব'সে পান খেতে-খেতে বামুনদি বলল, ওগো, আমায় একটা রেডিও কিনে দেবে?

বুড়ো চোখ বুঁজে খাটে শুয়ে ছিল, উত্তর দিল না। বামুনদি জানে, সে এখনও সুমোয়নি। কোনদিনই বুড়ো এত চটপট সুমোয় না, শুধু ছিন্ মেরে প'ড়ে থেকে পরিপূর্ণভাবে নেশাটা উপভোগ করে। পাছে সুমিয়ে পড়লে কষ্টাঙ্কিত নেশার আশ্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়, তাই সে অনেক রাত্তির অবধি ঘরের আলো জ্বলে রেখে দেয়।

বামুনদি আর একটু গলা চড়িয়ে বলল, ওগো শুনছো?

বুড়ো এবার চোখ পিটপিট ক'রে বলল, কি?

আমায় একটা রেডিও কিনে দেবে?

রেডিও কি করবে? বুড়োর দস্তহীন মুখের জড়ানো-জড়ানো অস্পষ্ট কথা জ্বলো ক'রে না শুনলে বোঝা যায় না।

এতবার বলবার পর এই উত্তর শুনে বামুনদি ভেড়ে উঠলো, করবো আবার কি, বুনো দোষ!

বুড়ো সঙ্গে-সঙ্গে প্রশ্ন করলো, কেন, খুশুচি কি হ'ল?

বামুনদি জানে, বুড়ো রসিকতা করছে না। নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে গেলেই নেশার জড়তা কেটে যাবে; তাই বুড়ো যা'ননে আসে তাই বলে ফেলে।

গলার স্বরটা খুব মোলায়েম ক'রে বামুনদি বলল, লক্ষ্মীটি, কিনে দাও না। মিত্তিরবাড়ির ছেলেরা বলছিল, রেডিওর দাম অনেক কমে গ্যাচে। আমাদের ভাড়াটেরাও একটা কিনেচে, শুনতে পাচ্ছে না ?

শুনতে বুড়ো খুবই পাচ্ছে। ক'দিন ধ'রেই একেবারে জালাতন ক'রে মারছে। রাত্তির হলেই রেডিওটা বাড়িয়ে দেয়। বেতার-কর্তৃপক্ষও এমন বেয়াড়া যে, রাত্তিরবেলা যখন ভদ্রলোকেরা একটু নেশা করে, ঠিক সেই সময়েই ওস্তাদী গানের আসরের ব্যবস্থা করেছে। আচম্কা রেডিওটা বাড়াতেই এমন সব উৎকট আওয়াজ বেরোতে থাকে যে মাথায় খুন চেপে যায়।

বুড়ো বলল, ভেতরদিকের জানালাটা বন্ধ ক'রে দাও।

বামুনদি আবদেরে সুরে বলল, তা' দিচ্ছি। কিন্তু আমায় টাকা দেবে ত ?

টাকা! বুড়ো যেন আকাশ থেকে পড়লো, আমার টাকা কোথায়? বাড়ি ভাড়ার টাকাটা অকি তুমি পাও।

কথাটা অবিশ্টি ঠিক। বাড়িটা বামুনদির নামেই; সুতরাং ভাড়ার টাকাটা সে-ই পায়। তা' ছাড়া মিত্তির বাড়ি থেকেও সে পনেরো টাকা পায়। কিন্তু সেই টাকা করপোরেশনের ট্যাক্স, ইলেকট্রিকের বিল এবং বুড়ো-বুড়ির খাওয়া-পরাতেই খরচ হয়ে যায়। রেডিও-কেনার মত পর্যাপ্ত টাকা ত দূরের কথা, মাসে-মাসে সামান্য কিছুও বামুনদি জমাতে পারে না।

বামুনদি উঠে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে বললে, আর তোমার টাকা নেই ?

বুড়োর নেশাচ্ছন্ন চোখে ধূর্তামি ফুটে উঠলো। বললে, কোথায় আছে ?

কোথায় আছে জানলে আর চাইব কেন ? বামুনদি তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজেও বুড়োর গোপন অর্থ-ভাণ্ডারের সন্ধান পায়নি। বামুনদি অমুনয়ভরা সুরে বলল, কোথায় আছে তা আমি জানতে চাই না। লক্ষ্মীটি, কখনও কিছু তোমার কাছে চাইনি, আমায় শ-চারেক টাকা দাও না।

জালাতন করো না, ব'লে বুড়ো ভাড়াভাড়ি ও-পাশ ফিরে গেলো। কয়েকবার ডেকেও আর তার সাড়া পাওয়া গেল না।

বামুনদি ক্ষুব্ধভাবে উঠে দাঁড়ালো। একতালার ভাড়াটেরা রেডিওটা জোর ক'রে দিয়েছে। তার আওয়াজ যেন বামুনদির কানে বিক্রপ বর্ষণ করতে লাগলো। সে একবার দাঁতে-দাঁত চেপে তার কঙ্কুষ স্বামীর শায়িত নিশ্চল মূর্তির দিকে তাকালো। তারপর নিশ্বাস ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বেরোবার আগে ভেতর দিকের জানালাটা সশব্দে বন্ধ ক'রে দিল। খাটের ওপর বুড়ো ক্ষণিকের জন্যে শিউরে উঠলো।

বামুনদিকে এ-পাড়ার সকলেই চেনে। পাড়ার ছেলে-বুড়ো সকলেরই সে বামুনদি। বামুদির সৌখান মানুষ। হাতে বালা, নাকের নাকছাবি, গলায় সাড়ে সাত ভরি হার। বয়েস পঞ্চাশ পেরোলে কি হবে, এখনও কুঁচিয়ে শাড়ী প'রে ফুল-পাতা-আঁকা ব্লাউজ গায়ে প্রায় টাক-পড়া চুলে এ্যালবার্ট কেটে (নিম্নুকেরা বলে, পাউডার নেখে—কথাটা ঠিক নয়, বামুনদির রং এমনতেই ধব্ধবে ফর্সা) বাটা-কোম্পানীর বাধক্রম লিপার পায়ে দিয়ে বামুনদি কাজে যায়। তার হাতে থাকে সাবেকী আমলের

রূপোর পানের বাটা (রূপণ বুড়োর কিনে-দেওয়া নয়, বাপের বাড়ি থেকে আনা) । বামুনদি মিত্রির বাড়িতে একবেলা রান্না করে । এককালে তার রান্নার হাত ভালো ছিল, এখন কাজে বড় কঁকি দেয় । গাভটার আগে কোনদিন কাজে যায় না, নানা ছলে-ছুতোয় প্রায়ই কানাই করে । মিত্রির বাড়ির বউদের রোজই উলুনে আগুন দিয়ে নতে হয়—তারা গজ্জগজ্জ করে । তারপর রান্না আরম্ভ ক'রে বামুনদি কাজ বত না করে, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি বক্ বক্ করে আর অনবরত পান খায় । কিন্তু সে মিত্রির-গিন্নীর পেয়ারের লোক—তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে কোন ফল হয় না । মিত্রিরগিন্নী যার-তার হাতে খায় না । বামুনদির জাত সম্বন্ধে যখন বিন্দুমাত্র সম্প্রদায়ের অবকাশ নেই, তখন আজকের দিনে কলকাতা শহরে তার চেয়ে ভালো রাঁধুনী কোথায় পাওয়া যাবে ? মিত্রিরগিন্নী মুখে তাই বললেও আসল কারণ অবশ্য তা' নয় । বামুনদির আত্মসম্মানবোধ বড় উজ্জ—শত অভাবে প'ড়েও সে কারুর কাছে হাত পাতে না । মিত্রিরগিন্নী তাই পরোক্ষভাবে তাকে কিছু অর্থ-সাহায্য করে । রান্না করাটা অল্পহাত । বউরাও তা' জানে এবং নাঝে-নাঝে গজ্জগজ্জ করলেও বামুনদিকে তারা অপছন্দ করে না ।

আর বামুনদিকে অপছন্দ কে-ই বা করে ! সব বাড়িতে তার অবাধ গতিবিধি । মিত্রির বাড়ি থেকে সে যা' ভাত-তরকারী নিয়ে আসে, তা'তে বুড়ো-বুড়ী ছ'জনেরই সকালের খাওয়া হয়ে যায় । তাকে শুধু একবেলা বাড়িতে রান্না করতে হয় । ছ'জনের রান্না করতে সময় বেশি লাগে না । দিনের বাকী সময়টা সে এ-বাড়িতে চাল ঝেড়ে, ও-বাড়িতে গম ঝেড়ে কাটায় । তা' ছাড়া সে খুব ভালো মুড়ি ভাজতে পারে ; সে-জন্মেও অনেক বাড়িতে তার ডাক পড়ে । এ-সব কাজের জন্মে সে পরিশ্রমিক নিতে চায় না । তাই কেউ-বা জোর ক'রে চাল দিয়ে গম দিয়ে সাহায্য ক'রে ; কেউ-বা সিনেমা দেখায় । বামুনদি অবিশ্রাম বক্ বক্ করলেও মুখিষ্ঠিরের অভিলাষ তার ওপর ফেলেনি । পরনিন্দা পরচর্চা সে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে, এক বাড়ির কথা কখনও আর এক বাড়িতে প্রচার করে না । তার এই গুণের জন্মে পাড়ার লোকেরা তাকে শ্রদ্ধা করে, অতি গোপন পারিবারিক কলহকাহিনীও নিশ্চিত মনে তার কাছে প্রকাশ ক'রে পরামর্শ নেয় ।

বড়রা বামুনদিকে শ্রদ্ধা করে আর ছোটরা ভালবাসে । বামুনদির ঘরেই পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের আড্ডা । যতক্ষণ বুড়ো বাড়িতে না থাকে ; ততক্ষণ বামুনদির এইসব অসমবয়সী বন্ধুরা তার ঘর সরগরন ক'রে তোলে ; কিন্তু বুড়োকে তারা ভয় করে । বুড়ো বাড়ি ফেরার সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন কোন্ দিক দিয়ে পালায় ঠিক ঠিকানা থাকে না ।

বামুনদির বুড়োটিও কম বিখ্যাত নয় । খাওয়ার আগে কেউ কখনও ভুলেও এই হাড়-কঙ্কুষের নান করে না । শুধু এ-পাড়ার নয়, আশপাশের পাড়ার অনেকে এমনকি আপনিও হয়ত বুড়োকে দেখেছেন । আপনি যদি কোনদিন এ-পাড়ার অন্নদা পালের রেঠুরেটে চা খেতে বসেন ত একটু পরেই কানের কাছে শুনে পাবেন এক অস্পষ্ট মিনিতি । ফোকলা মুখের জড়িত কথা, প্রথমটা বুঝতে পারবেন

না। ভালো ক'রে শুনলে বুঝবেন, বুড়ো বলছে, আমার ছ'টো পয়সা দেবেন—মুড়ি কিনে খাবো। এবার হয়ত ভালো ক'রে বুড়োর দিকে চেয়ে দেখবেন। পরনে ময়লা কাপড়, ময়লা গাট (বামুনদির দোষ নয়, বুড়োর জামাকাপড়র পরিষ্কার রাখা এক সমস্তার ব্যাপার), ময়লা কোট, ময়লা কেডস্, কিন্তু কোনটাই ছেঁড়া নয়। চোখের কোণে পিচুটি, সজল নির্বোধ চাহনী, ভোবড়ানো গাল, ঠোঁট দুটো অনবরত নড়ছে, তাই কথা বোঝা শক্ত হয়। পয়সা দিলেই ত ঝাট চুকে গেল। না দিলে বুড়ো কিছুতেই নড়বে না। নাছোড়বান্দার মত বলবে, তবে একটা পয়সা দিন। ধমক দিন, গালাগালি দিন, বুড়ো নির্বোধের মত ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকবে। এ-অবস্থায় বিরক্ত হয়ে বুড়োর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে অনেকেই পয়সা দেয়। বামুনদি বুড়োর হাতে একটা পয়সাও দেয় না। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, বুড়ো রোজ এইভাবে ভিক্ষে ক'রে ক'রে ঠিক আফিম কেনার পয়সা সংগ্রহ করে। তারপর নেশা ধরলে সন্ধ্যা থেকে মিস্ত্রিবাড়ির রকের এককোণে চুপাটি ক'রে বসে থাকে। তখন সে ঘোর শব্দ বা চীৎকার সহ করতে পারে না। প্রবীণদের হুকুমে ছেলে-ছোকরারা কেউ তাকে বিরক্ত করে না। আগে পাড়ার ছেলেরা তার পেছনে ভীষণ লাগত। একবার কালীপুজোর সময় একটি দশ-বারো বছরের ছেলে বুড়োর কানের কাছে বোমা ফাটিয়েছিল। বুড়ো ভেড়ে গিয়ে এত জোরে ছেলেটির গলা টিপে ধরেছিল যে আর একটু হলেই তার দম আটকে যেত। শেষে বড়রা গিয়ে ছেলেটিকে উদ্ধার করেছিল। বুড়ো হাঁপাতে-হাঁপাতে বলেছিল, পটকা ফাটার আর জায়গা পাস না।

একটা ছেলে টিপ্পনি কেটেছিল, পটকা কেন হবে, নগদ আটআনা দামের বোমা।

আটআনা দামের বোমা। বুড়ো খিচিয়ে উঠেছিল, আর আমার যে নগদ-ন-আনা দামের নেশাটা ছুটে গেল।

সেই থেকে বুড়োকে আর কেড বাঁটায় না। সে আপন মনে বসে থাকে, শীলদের বাড়িতে চংচং ক'রে ন'টা বাজার ঘণ্টা দিলে গুটি গুটি উঠে বাড়ি যায়।

বুড়োর অবস্থা কিন্তু চিরকাল এ-রকম ছিল না। এককালে সে ভালো চাকরি করতো—সি, পি, ডবলুসির ওভারসিয়র ছিল। পাড়ার প্রবীণরা বলেন, বুড়ো যথেষ্ট উপরি রোজগার করতো। সেই সময়েই বামুনদির নামে বাড়িটা কিনেছিল। বামুনদি কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি যে একদিন তাকে পরের বাড়িতে দাস্তবৃত্তি করতে বেরোতে হবে। একটি মাত্র ছেলে ছিল তাদের। বাপের অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেয়ে ছেলেটি অল্প বয়েসেই ব'কে গেছলো—একেবারে আন্ত মর্কট হয়ে উঠেছিল। বামুনদি অনেক চেষ্টা ক'রেও তাকে শোধরাতে পারেনি। বুড়োর একটা বাতিল ছিল। প্রথম জীবনে একবার ব্যাঙ্ক ফেল ক'রে তার অনেক টাকা মারা গিয়েছিলো। সেই থেকে সে কিছুতেই ব্যাঙ্ক টাকা রাখতে চাইত না—বাড়িতেই একটা নিজস্ব ক্যাশ বান্ধে টাকা জমাত। গুণধর ছেলেটি একদিন সেই ব্যাঙ্ক ভেঙে সমস্ত টাকা আর পাড়ার এক ঘরের মেয়েকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়।

এরপর থেকেই বুড়োর পরিবর্তন আরম্ভ হয়। দুব নেওয়ার অপরাধে সি, পি,

ডবলু, ডির চাকরী গেছলো। কিন্তু সে স্বাধীনভাবে কাজ ক'রেও যথেষ্ট উপার্জন করতো। ছেলেটা বাস ভেঙে টাকা নিয়ে পালাবার পর থেকে সে যে কোথায় তার সন্ধিত অর্থ রাখত, বামুনদিও তা টের পায়নি। কপণ সে চিরকালই ছিল, কিন্তু ছেলেটা পালাবার পর থেকে সে হাড় কঞ্জুষ হয়ে উঠলো। আঙুল দিয়ে আর তার একটা পয়সাও গলতে চাইত না। তবু বুড়ো তখনও কাজকর্ম করত—কোনরকমে সংসার চলছিল। হঠাৎ একদিন বুড়ো ডবল নিমোনিয়ায় শয্যাশয়ী হ'ল। বামুনদি মহা মুক্তিলে পড়লো, বুড়োর সন্ধিত অর্থ কোথায় আছে সে জানে না। শেষে নিজের গয়না বিক্রি ক'রে অনেক কষ্টে সে বুড়োকে বাঁচিয়ে তুললো। বুড়ো সুস্থ হ'ল, কিন্তু কি রকম যেন হয়ে গেল। কাজকর্ম করে না, দিনরাত চুপ ক'রে ব'সে থাকে, পাঁচবার ডাকলে একবার সাড়া দেয়। টাকা চাইলে পরে বলে, টাকা! আমি কোথায় পাবো? সেই ছুটো মাস বামুনদির হৃৎস্পন্দনের মত কেটেছিল। অর্কহারে অনাহারে তার দুর্দশা একেবারে চরমে উঠেছিল। কিন্তু বামুনদির মর্ষাদা-বোধ এত তীব্র ছিল যে সে কারুর অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতে চায়নি। শেষে মিত্রির গিন্নীই তাকে উদ্ধার করেন। একতলার ভাড়াটে জোগাড় ক'রে দেন, আর বামুনদিকে তাঁর বাড়িতে রাখুণীর কাজ দেন।

তবু পাড়ার লোকে বিশ্বাস করে আর বামুনদি নিশ্চিত জানে, কোন গুপ্ত স্থানে বুড়োর প্রচুর টাকা আছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই প্রথম ঘরখানা বামুনদির। ফিটফাট সাজানো। আসবাবগুলো সব নতুন। দেয়ালে নানা দেব দেবীর আর নেনসাহেবদের ছবি। জানালায় ছিটের পর্দা। অতিথি-সম্মান এলে বসতে দেবার মত ঘর বটে। তার পাশের ঘরটা বুড়োর। বুড়ো নিজেও যেমনি নোংরা ঘরখানাও তেমনি ক'রে রেখেছে। তার সারাজীবনে যা-যা জিনিসের প্রয়োজন হয়েছে, সব-কিছুর ভগ্নাবশেষ ঘরের মধ্যে সুপীকৃত হয়ে আছে। ঘরে পা বাড়াবার জয়গা নেই। ভাঙা টেবিল, ভাঙা আলমারী, ভাঙা তোরঙ্গ। এমনকি যে ক্যাশ বাসটা ভেঙে ছেলে টাকা নিয়ে পালিয়েছিল, সেটাও এখনও সেই অবস্থাতেই প'ড়ে আছে। বুড়োর এককালে পড়াশোনার সব ছিল। তারই নিদর্শন স্বরূপ এক আলমারী বই, উই ধ'রে পোকায় কেটে সেগুলোর যে কি অবস্থা হয়ে আছে, ভগবান জানেন। তা'ছাড়া আছে বাঁটহীন হাতুড়ি, মরচে-ধরা কাটারি কন্নাত ছবি প্রাস জু-ডাইভার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি। এককোণে ফুটো টিন, ভাঙা শিশি, ভাঙা ক্লাস একগাদা জড় করা আছে। ছেঁড়া জুতোগুলো পর্ষন্ত বুড়ো সযত্নে জিনিসে রেখে দিয়েছে। দেয়ালে তাকেটে বুড়ের জানাকাপড় থাকে, সেই সঙ্গে আছে একটা পুরানো কৈশট ছাট। ঐ-ছাটটা মাখায় দিয়ে বুড়ো ওভারসিয়ারি করেছে। ওটা যেন তার কর্মজীবনের প্রতীক—ভাই এখনও বোধ হয় মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এখনও রোজ সে সযত্নে ছাটটাকে ঝেড়েঝুড়ে রাখে, যদিও কখনও মাখায় দেয় না।

বামুনদি অনেকবার ঘরটা পরিকার করতে চেয়েছে। কিন্তু ভাঙা জিনিসগুলো-ফেলে দেবার কথা বললেই বুড়ো খেঁকিয়ে মারতে আসে। বামুনদির স্থির বিশ্বাস, এই আবর্জনাশূন্যের ভেতরই কোথাও বুড়োর গুপ্তধন লুকানো আছে।

বামুনদি পরপর কয়েকদিন রাত্তিরবেলা বুড়োকে রেডিও কিনে দেবার জন্যে অনেক অল্পনয়-বিনয় করলো, কিন্তু বুড়ো আর কথা কানেই নেয় না। ওগো সুনচো বলে চোখ বুজেই ও-পাশ ফিরে শোয়। বুড়োর অবহেলায় বামুনদিরও ক্রমশ রোখ বেড়ে চললো।

এদিকে মিত্তির বাড়ির ছেলেমেয়েদের মারফৎ বামুনদির রেডিও কেনার খবর পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ছেলে বুড়ো সকলেই দেখা হলে প্রশ্ন করে, বামুনদি, রেডিও কি হ'ল? সেদিন সকালে ভাড়াটেদের আঁকা-আঁকা বউটা পর্যন্ত চোখ পিটপিট ক'রে বলল, বামুনদি, আপনার রেডিও কবে আসবে? বামুনদির ইচ্ছে হ'ল, বউটার টেবো-টেবো গালে ঠাস করে এক চড় লাগিয়ে দেয়। অনেক কষ্টে আব্বসংবরণ করে সে বললে, এলেই দেখতে পাবে। হ্যাঁ, দেখাতেই হবে। ওরা কিনেছে একটা সস্তা দিশী লোক্যাল সেট। একটা বিলিভী অল ওয়েভ সেট না কিনলে বামুনদির মান থাকে না।

একদিন সকালে মাথা-ধরার অমুহাতে বামুনদি মিত্তির বাড়ি কাছে গেল না। সেদিন রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে ঘুরে এসে বুড়ো নিজের ঘরে চুকেই আতঁচীংকার করে উঠলো, এ কি!

বামুনদি ছুটে এসে জিগ্যেস করলো, কি, হ'ল কি?

আবার ঘর কে এ-রকম কল্লো?

বুড়োর ঘর থেকে সমস্ত আবর্জনা দূর হয়ে গেছে। ঘরখানা একেবারে স্বকথাক করছে।

বামুনদি উত্তর দিল, কে আবার করবে—আমি করিচি। মিত্তির গিন্নী বেড়াতে আসবে বলেচে। ওই ঘর বাইরের লোককে দেখানো যায়?

বুড়ো যেন টলছে মনে হল। কোনরকমে বললে, জিনিসগুলো কি কল্লো?

কিছু ও-পাশের ছোটঘরটায় রেখিচি আরসব টান ঘেরে মাঠে ফেলে দিইচি।

বুড়ো এগিয়ে এসে বামুনদির হাত চেপে ধরে ভাঙাগলায় বলে, টুপীটা...টুপীটা কোথায়?

সে এত ঘোরে হাত চেপে ধরেছিল যে বামুনদি স্বপ্নায় চীংকার করে উঠলো, উঃ, ছাড়ো-ছাড়ো।

আগে বলো কোথায়?

মাঠে ফেলে দিইচি।

বুড়ো বামুনদির হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটতে-ছুটতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

পাশের মাঠটা এতদিন কাঁকা পড়ে ছিল। পাড়ার লোকে সেখানেই সব আবর্জনা ফেলত। সম্প্রতি মাঠে বাড়ি উঠবে বলে কঁড়ি-বুগা-ইটের স্তুপ জমা হয়েছে। তারই একধারে বুড়োর ঘরের জঞ্জালগুলো পড়ে আছে। একটা ভিথিরীর ছেলে বুড়োর হাটট মাথায় দিয়ে ভাঙা জিনিসগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখছে।

বুড়ো হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, এই, টুপীটা দে।

ছেলেটা সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল, ইস, দোব কেন?

ওটা আমার ।

ভাগ ! তোমার বললেই হল । আমি কুড়িয়ে পেয়েছি ।

চার আনা পয়সা দোব ।

ছেলেটার চোখে লোভের আলো জ্বলে উঠলো । তবু বললে, না, দোব না ।

বুড়ো চোঁচিয়ে উঠলো, এক টাকা দোব ।

ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ে সন্দিগ্ধচোখে চেয়ে বললে, আগে টাকা দেখাও ।

বুড়ো পকেটে হাত দিয়ে টাকা বার করবার ভান করে পায়ে-পায়ে কাছে এগিয়ে গেল । তারপর হঠাৎ ছোঁ মেরে ছেলেটার মাথা থেকে ছাটটা কেড়ে নিয়ে হুহাত বুকে চেপে ধরে পালাতে গেল । কিন্তু ভাড়াভাড়িতে দেখতে না পেয়ে ইঁটে হোঁচট খেয়ে একটা লোহার বিনের ওপর মুখ ধুবড়ে পড়লো । মাথা ফেটে চোঁচির হয়ে গেল । পা-ছুটো একবার নড়লো, তারপর স্থির হয়ে রইলো । ছেলেটা এদিক ওদিক চেয়ে দেখলো, কেউ কোথাও নেই । ভিখিরীর ছেলে—ধুর্ভানিতে সেও কম যায় না । সম্ভবপূর্ণে এগিয়ে গিয়ে বুড়োর শিথিল হাত থেকে ছাটটা উঠে দেখলো, ভেতরে অন্তরের একধারে একটুখানি কাটা আছে । সেখানে হাত চুকিয়ে দেখলো, কিন্তু কিছুই পেল না । হতাশার ভঙ্গী করে সে ছাটটা ছুড়ে ফেলে দিল ।

বামুনদি যাথাগাধ্য ঘট করে বুড়োর শ্রাদ্ধ করলো । পাড়ার লোকেরা সকলেই তাকে সাহায্য করলো । বুড়োর হুতিনজন দূর-সম্পর্কের ভাইপো গন্ধে-গন্ধে এসে হাজির হয়েছিল । বুড়ো কিছুই রেখে যায়নি দেখে নৌখিক সহানুভূতি দেখিয়ে তারা একে-একে সরে পড়লো ।

শ্রাদ্ধের দিন দশেক পরে হঠাৎ বামুনদির ঘরে নিষ্টিগ্নরে রেডিও বেজে উঠলো । পাড়ার ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে ছুটে এসে দেখলো, বামুনদি সত্যিসত্যিই একটা চমৎকার বিলিভী রেডির-সেট কিনেছে । সেটটার গায়ে পাঁচশ পঁচানব্বই টাকার প্রাইস-ট্যাগ্‌টা তখনও লাগানো রয়েছে ।

কিছুটা শুনে, আর কিছুটা কল্পনা দিয়ে কঁাক ভরিয়ে এই কাহিনী আঁচি গ'ড়ে তুলেছি । তবে বনে হয়, সত্যের বিশেষ আলাপ করিনি । বামুনদি বেঁচে থাকলে হয়ত একবার যাচাই ক'রে নিতে পারতুম । হ্যাটের মধ্যে টাকা লুকিয়ে রাখাটা কষ্ট করনা ব'লে মনে হতে পারে । কিন্তু এ-কল্পনা শুধু আমার নয়, পাড়ার অনেকে এমন কি পুলিশ পর্যন্ত তাই সন্দেহ করেছিল । ভিখিরীর ছেলেটা পালাতে গেলনি, পাড়ার ছেলেরা তাকে ধ'রে ফেলেছিল । পুলিশের ধারণা, ওই ছেলেটাই ছাটের অন্তরের ভেতর থেকে টাকা বার করে নিয়েছে । কিন্তু সে-টাকা সে পাচার করলো কোথায় এবং কি করে, সেইটাই তারা বুঝতে পারেনি । অনেক জেরা করে মারধোর ক'রে একমাগ ধরে ছেলেটাকে হাজতে আটকে রেখেও কোন ফল হয়নি । শেষ পর্যন্ত প্রামাণ্যভাবে পুলিশ ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়েছিল ।

বামুনদি অবশ্য গুপ্তধনের কথা কখনও স্বীকার করেনি । সে বলত, বুড়ো নিজে থেকে তাকে রেডিও কেনবার টাকা দিয়ে গেছলো ।

বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেম-নিরীক্ষা

সুশীল মুখোপাধ্যায়

মানুষের অন্তর্নিহিত হৃদয়াবেগ বিভিন্ন অবস্থার চিন্তাধারায় পরিণত রূপ লাভ করে প্রকাশোপযোগী বাক্য, অলঙ্কার, ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে। এমনি যুগুর্ভে জন্ম হয় কবিতার। কখনো আনন্দ আবার কখনো-বা দুঃখবাদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে হৃদয় নিঃসৃত গভীর এক আসক্তির অভিব্যক্তি ঘটে। অন্তরের এই উদগ্র অনুভূতি একমাত্র পরমপুরুষের উদ্দেশে প্রেমরূপে প্রতিপন্ন হয়ে সখ্য, দাস্ত, বাৎসল্য, ভক্তি, প্রণয় প্রভৃতি পাঁচটি ভাবধারায় বৈষ্ণব কবিতাকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছে। বৈষ্ণবধর্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমপত্রে রূপায়িত করে শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ের মধ্যে আরাধ্য ও আরাধক সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছে। এই প্রেম আরাধনা বৈষ্ণব কবিদের বিভিন্ন কবিতায় উপরোক্ত ভাবধারা প্রকাশে অক্ষয় হয়ে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ হিসেবে।

মধ্যযুগীয় বাঙালী কবি রচিত বিভিন্ন রকম কবিতার মধ্যে একমাত্র বৈষ্ণব কবিতাতেই মৌলিক কবিত্ব, অভিনব স্বকীয় কল্পনাপ্রণবতা এবং রচনা ও বর্ণনা নৈপুণ্যের অভিনব স্বাক্ষর বিদ্যমান। রাধাকৃষ্ণ লীলা মাধ্যমে বৈষ্ণব সাধকগণ মানব হৃদয়ের সখ্য, বাৎসল্য, ভক্তি প্রেম প্রভৃতি কমনীয় স্বভিগুলি প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছেন। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁদের কবিতার মাধ্যমে ভগবৎ প্রেমই প্রচার করেছেন। এর ফলে মানবমনের চিন্তাধারাতেও এক অমূল্য পরির্তন সাধিত হয়েছে। বৈষ্ণবকবিগণ পাখিবপ্রেমের মধ্যেই ভগবৎপ্রেমের সন্ধান পেয়েছেন। সন্তানের প্রতি কাণায় কাণায় উপচে পড়া মাতৃহৃদয়ের অপার স্নেহ কৃষ্ণ আরাধনায় পর্ষবসিত হয়েছে। মানুষ মা যশোদা ক্ষুদ্র কৃষ্ণশিশুটির ক্ষুদ্র প্রাণসর্বস্ব চেলে দিয়ে তাকে বুকে টেনে নিতে চেয়েছে। সেই অপত্যস্নেহ সাধানার রূপ নিয়ে দুর্দাম গতিতে ছুটে ছলেছিল সর্বশক্তিমানের উদ্দেশে। এমনি করে সখ্য, দাস্ত প্রভৃতিও কোন এক মহৎ অনুভূতিতেই বৈষ্ণব কবিতায় বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীরাধিকা ও কৃষ্ণ হৃদয়ের নিগূঢ় প্রণয়-প্রেম বর্ণনাপ্রকাশে বৈষ্ণব কবিতা অধিকতর গৌরবময় হয়ে উঠেছে। পরস্পরের আত্মনিবেদন হৃদয়সর্বস্বকে স্পর্শ করেও আধ্যাত্মিক প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে ছুটে চলেছিল তা ঐশ্বরিক চেতনায় মিশ্রিত হতে।

সাধারণ পাখিব অনুভূতি সেই অপাখিব ঐশ্বরীকরূপকে স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছিল। পবিত্র প্রেমের সেই সার্থক রূপই বিকশিত হয়েছে বৈষ্ণব কবিতার ছত্রে ছত্রে।

রাধাকৃষ্ণলীলার গোড়া থেকে শেষ অবধি ব্যপ্ত হয়ে রয়েছে এক প্রেম প্রকাশ। শ্রীরাধিকার একমেবহিতীয়ম্ এর উদ্দেশে সক্রিয় আরাধনা। শ্রীরাধিকার এই আরাধনা, পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ, মান, পুনর্মিলন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পর্ষবসিত হয়ে বর্ণনামাধ্যমে বৈষ্ণব কবিতাকে মধুরতর করে তুলেছে।

শ্রীরাধিকার যৌবন কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময়। এই যৌবনকে কুসুমিত করে তুলেছিল তাঁর পূর্বরাগ-লীলা। তখন তিনি পরেছিলেন যোগিনী বেশ। কদম্বতলা চোখে পড়লেই কৃষ্ণরূপ তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠতো। যমুনা স্রোতের কৃষ্ণ সৌন্দর্যে ভরপুর হয়ে উঠতো তাঁর মন। পৃথিবীর বস্তু সমস্ত তাঁর কাছে তখন তুচ্ছ বলেই মনে হ'ত। এই ভাবান্তরই শ্রীমতীর পূর্বরাগ। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস তার কবিতার মাধ্যমে শ্রীমতী রাধার সেই যোগিনী রূপ সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে পেরেছে। তাই :

এলাইয়া বেণী কুলের গাঁধনি
দেখরে খসায়ে তুলি।
হসিত বয়ানে চাহে নেষ পানে
কি কহে হ'হাত তুলি।

চুল ও মেঘের কৃষ্ণবর্ণে শ্রীরাধিকার চোখে ভেসে উঠতো শুধু কৃষ্ণরূপ। তখনই তাঁর ঠোঁটছটি হ'ত হাসিতে ভরপুর।

এরপরই শ্রীরাধা হয়েছেন অভিসারিণী। পার্থিব জগৎ তাঁর কাছে তখন অনিত্য বলেই মনে হ'ত। কঠিন যোগসাধনাকে জীবনের একমাত্র গঙ্গিনীরূপে বেছে নিয়ে তিনি পথ চলতে শুরু করলেন। অঙ্গনে কণ্টক বিছিয়ে দিয়ে তার উপর দিয়ে তিনি চলাফেরা অভ্যাস করতে লাগলেন। পদ্মের পাপড়ির সমান কোমল পদতল তাঁর ক্ষত বিক্ষত। ছটি পায়ে অবিরাম রক্ত ঝরছে। তবুও তাঁর দৃষ্টি নেই সেদিকে। জল ঢালা পিচ্ছিল অঙ্গনে অনায়াস পদচালনকে জীবনের এক কঠিন সাধনা রূপে তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

কৃষ্ণ লাভের জন্য তখন তাঁর প্রাণে একান্ত বাসনা। এই বাসনা পূরণের জন্যই কঠিন পরীক্ষার ভিতর দিয়ে নিজেকে চালাতে তিনি বিধা বোধ করেন নি। সোনালী কামনার রঙে কৃষ্ণ হৃদয়কে জয় করে নেয়ার এক হৃদয় অমুভূতি তাঁর সারাটি প্রাণ জুড়ে আসন পেতে বসেছিল। হৃর্গম্য পথের দুঃখকে তাই তিনি অমানবদনে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। শ্রীরাধিকার সেই প্রেমাভিসারিণী রূপই বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস তুলে ধরেছে তার কবিতায় :

কণ্টক গাড়ি কমল সমপদতল মস্তুর চীর হি খাঁপি।
গাগরী বারি চারি করি পিছল চল তাহে অঙ্গুলী চাপি।

এই হচ্ছে বৈষ্ণবী শ্রীরাধিকার প্রেমাভিসার। এখানেই হয়েছে—পরমাত্মার উদ্দেশ্যে জীবাত্মার অভিসার পথে গমন। আধ্যাত্মিকতার সংগে কাব্যিক বস্তুর মিলনে বৈষ্ণব কবিতা এখানেই সার্বক রূপ লাভ করেছে।

সহসা একদিন বাণরীর তানে শ্রীরাধার ধ্যান ভেঙে গেল। এখানেই সমাপ্তি ঘটলো তাঁর অভিসার-পর্বের। প্রেমের চেউ দোলনে ছলে উঠলো তাঁর মনপ্রাণ। সে চেউএর গতি দুর্বার। বিস্মৃত ধারায় বুঝি তা মিশ্রিত হ'তে চায় অতল আনন্দ সাগরে আর সেখানেই শুরু হবে তার লীলা খেলা। শ্রীমতীর যাত্রা শুরু হ'ল নতুন পথে। আলুলায়িত বেণী তাঁর হয়ে উঠলো ঘন কৃষ্ণবর্ণ। সুকোমল দেহ হতে অঙ্গ স্থলিত হতে লাগলো। তপস্বাক্ষীণ দেহ তাঁর হয়ে উঠলো চঞ্চল। আকুল প্রাণে

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা কালোবরণের নামে অভিভূত হয়ে পড়লো। চণ্ডীদাস শ্রীরাধার সেই কৃষ্ণবিলনপ্রয়াসী রূপই কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে :

সই কেবা শুনাইল শ্রাম নাম ।

কানের ভিতর দিয়া গরমে পশিল গো

আকুল করিল মনপ্রাণ ।

শ্রাম নাম শুনে শ্রীরাধা হয়ে উঠলেন চঞ্চল । পবিত্র প্রেমের ঢেউ মনের হৃকুলকে ছাপিয়ে তুললো । এমনি অবস্থার কাহিনী নিয়ে রচিত বৈষ্ণব কবিতা এক অপূর্ব স্বাদ রেখে গেছে বাংলা সাহিত্যে । চণ্ডীদাসের রচনা এখানেই স্বার্থকতা লাভ করেছে ।

এর পরবর্তী অধ্যায়ে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ প্রেম তন্ময়তা । কৃষ্ণ প্রেমে আবহুহারী হয়ে কী এক অপরূপ নৃত্য তাঁর চোখে দেখা দিল । কালো যমুনার ঘলে, কালো তমাল সাথে, কালো কুন্তলে সর্বত্র ঐ এক শ্রামরূপ । দীর্ঘদিনের ক্ষমানো অশ্রুজলে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ অভিষেক করে ধন্য হলেন । হৃদয়মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করে শ্রীমতীর জীবন সার্থক হ'ল । বুঝিবা এতদিনে কৃষ্ণপুজারী রাধিকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ স্বপ্ন সত্যে পরিণত হ'ল । বৈষ্ণব কবি বিষ্ণুপতির কবিতায় সেই ভাবাস্তর, বর্ণনার প্রস্থিতে আছো জীবন্ত রূপ নিয়ে বেঁচে রয়েছেন :

এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ ।

শুনাইতে মানবি স্বপন স্বরূপ ।

কিন্তু এই মহানিলনে ঘটলো বিরহ । শ্রীকৃষ্ণ মধুরায় প্রস্থান করলেন । কৃষ্ণবিরহ বেদনে কাতরা শ্রীরাধার স্বর্ণদেহ ভুলুষ্ঠিত হ'ল । চোখে মুখে পরিফুট হৃদয়উৎসারিত কমনীয় প্রেমাবেগ নিমেষে কোথায় বিলীয়মান হয়ে গেল । গৌরকান্তি মুখখানি তাঁর হয়ে উঠলো বিবর্ণ পাণ্ডুর । বৃন্দাবন নগরী থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শ্রীরাধা বুঝতে পেরেছেন, কালো আর বৃন্দাবনে নেই । কঠোর সাধনালব্ধ কৃষ্ণধন শ্রীমতীর চোখে এক মায়াকাল রচনা করে দিলে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল । ক্ষণিকের কৃষ্ণদর্শনে বুঝিবা শ্রীমতীর জীবন তাই ব্যর্থ । মানসিক আঘাতেই শ্রীরাধার এই ভাবাস্তর । পরক্ষণেই তাঁর মন অহুতাপে ভরে গেল । বুঝি এই ভাবাস্তরে শ্রীকৃষ্ণ দুঃখ পেলেন । কামনার রঙে সারাটি হৃদয় তাঁর রাঙিয়ে উঠলো । যে কৃষ্ণের আসন তাঁর হৃদয়ে, দূরে সরে গেলেও তিনি তুলতে পারেন না । আকাশের পূর্বও মাটির অকোমল পঙ্খের প্রিয়তম বলেই গণ্য । বৈষ্ণব কবি বিষ্ণুপতি শ্রীরাধার অন্তরের কথাগুলিই তার কবিতা মাধ্যমে প্রকাশ করেছে :

যো জন মন বাহে সো নহ দূর ।

কমলিনী বন্ধু হোয় ঝৈসে সুর ।

ভ্রুও শ্রীরাধিকার মন আবহু হতে চায় না । প্রতিটি মুহূর্তে সেই কালো রূপ অভাবের দীনতা তিনি উপলব্ধি করতে লাগলেন । শ্রীরাধিকার সেই অহুভূতি :

• ঐসন বচন কহয় সব কোয় ।

হমর হৃদয় পরভীত নহি হোয় ।

শ্রীরাধা শুধু দিন গুনছেন। একটিবার মাত্র কৃষ্ণরূপ দর্শনে জীবন-মন সার্থক করতে চান তিনি। কিন্তু একদিন দুদিন করে কতকালই না কেটে গেল। রাধিকার যে অন্তর কৃষ্ণরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, যে কৃষ্ণবেশে শ্রীকৃষ্ণ রূপের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল, সেগুলির রং একত্রে মিলে মিশে এক গভীর কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়েছে। কৃষ্ণাধানে বিভোর শ্রীরাধা তবুও ধৈর্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। কবি চণ্ডীদাসের কবিতায় শ্রীমতীর ধৈর্যের বাঁধ কোথাও-বা সহসা ভেঙে পড়ার পূর্বে সংকেত প্রকাশ পেয়েছে :

কাল ব'লে কান্দা গেল যধুপুরে—

সে কালের আর কত বাকী ?

করুণ ব্যথায় শ্রীরাধার মন অস্থির। এ-বিরহ তাঁর প্রাণকে অধীর করে তুলেছে। ক্ষোভ ও অপমান নিয়ে এ-পৃথিবীতে তাঁর আর বেঁচে থাকার সাধ নেই। এখানেই শ্রীরাধিকার মানের প্রকাশ ঘটেছে :

সায়রে ভেঁষব পরাণ।

আন জনমে হোয়ব কান।

কানু হোয়ব যব রাধা।

তব জানবক বিরহক বাধা।

কৃষ্ণপ্রেমবিরহে শ্রীরাধিকা সাগরের জলে প্রাণ বিসর্জন করে পরজন্মে কানু রূপে জন্ম নিতে চেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন রাধা হয়ে বিরহজ্বালা মর্মমর্মে অনুভব করতে পারবেন। শ্রীকৃষ্ণের অদৃষ্ট লুকোচুরির জন্তুই শ্রীরাধা বুঝি এক কঠিন প্রতিশোধ নেয়ার জন্তু সচেষ্ট হয়েছিলেন।

দীর্ঘকাল পর রাধাকৃষ্ণ পুনর্মিলন ঘটলো। এতকাল শ্রীমতী যাকে দেখেছেন বাইরের জগতে, আজ তাঁকে তিনি পেয়েছেন অন্তরের অন্তঃস্থলে। তাই তাঁকে মনের মানুষ করে নিতে চেয়েছেন শ্রীরাধা। জীবনের পরিবর্তে সমস্ত দুঃখ, সমস্ত অভিমানকে তিনি বিসর্জন করলেন নীল যমুনার জলে। হৃদয়সর্বস্বকে স্তায়রূপে সমর্পণ করে তিনি মিশে গেলেন স্তামাংগে। বিরহের মাধ্যমে দীর্ঘ কামনায় যাকে তিনি পেয়েছেন বাইরে-ভিতরে তাঁর রূপ এক।

চোখ খুললেই যেমন দর্শন হয় তাঁর প্রকাশ, চোখ বুজলেই তেমনি হৃদয়ের কোণে ভেসে ওঠে তাঁর মহিমা। সেই পূর্ণানন্দ রূপকে পেয়ে শ্রীমতীর কর্মণীর ভাবাবেগ ও প্রেমোচ্ছ্বাস সারা মনকে ছাপিয়ে তুললো। শ্রীমতীর জীবন মন তাই সার্থক :

আজু রজনী হাম

ভাগে পোহায়নু

পেখনু পিয়া-মুখ চন্দা।

জীবন যৌবন

সফল করি মাননু

দশদিশ ডেল নিরদন্দা।

শ্রীমতী তাই তাঁর গৃহকে গৃহ বলে মনে করতে পারছেন। প্রিয়তমকে কখনো তাঁর হাতের দর্পণ বলেই মনে হচ্ছে। কখনো বা তাঁকে তিনি কালো বেণীতে

ধরে ধরে সাধানো ফুলের মতই মনে করছেন। কখনো আঁখির কাজল, কখনো
অধরের ডান্ডুল, কখনো প্রাণের সুগন্ধচিত্র, কখনো গলার মালা আবার কখনো-বা
উঁকে উঁর দেহসর্বস্ব বা সংসারের সার বলেই মনে হচ্ছে। এখানে একটি জীবাত্মা
কোনো এক পরমাত্মার সংগে মিলিত হতে হৃদয় গতিতে ছুটে চলেছে সাধারণ পৃথিবী
হতে অনেক উর্ধ্বপথে। পাখির জগতে শ্রীরাধার স্মরণভাই তাই এক আধ্যাত্মিক
ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। বৈষ্ণব কবি বিষ্ণুপতির বর্ণনায় শ্রীরাধার সেই গভীর
আত্মাহুতি আছে। উচ্ছ্বস হয়ে রয়েছে বৈষ্ণবসাহিত্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় :

হাতক দর্পণ মাখক ফুল ।

নয়নক অশ্রু যুগল ডান্ডুল ।

হৃদয়ক সুগন্ধ গৌরব হার ।

দেহক সর্বস্ব গেহক সার ।

তবুও শ্রীরাধা পরিতৃপ্ত হতে পারছেন না। যে-প্রেম দেহকে বিশ্বস্তির পর্দার
আড়ালে রেখে আত্মাকে টেনে নিয়ে চলে পাখির জগৎ হতে উর্ধ্বস্তরে তার প্রকাশ
ভাষায় অব্যক্ত। তাকে চোখে দেখা যায় না,—যন্ত্রেই অনুভব করতে পারা যায়।
সুগ সুগ ধরে তা নতুনই থেকে যায়। শ্রীমতীর সেই ভাবাবেগ বৈষ্ণব কবিতার ছন্দে
ছন্দে পরিবেশিত হয়েছে :

স মি কি পুছসি অনুভব মোয় ।

সেই পিরীতি অশ্রু রাগ পঞ্চারিতে

তিলে তিলে নুতন হোয় ।

নিঃস্বার্থ প্রেমসাধনার মাধ্যমে জীবাত্মার সংগে পরমাত্মার মহামিলন করণই
বৈষ্ণব সাহিত্যের গুঢ় উদ্দেশ্য। অশ্রু কোনো শৈতিকবিতায় এই আধ্যাত্মবাদ চোখে
পড়ে না। জীবনের কঠোর অভিসাধনা হিসেবে এই বৈষ্ণব প্রেমসাধনা এ যুগের
মানুষের মনোভাবের পরিচায়ক নয়। এই ভাবপ্রকাশের পর কতই না যুগান্তর
দেখা দিয়েছে। এ-যুগের মানুষ নিজ সামর্থ্যেই শক্তিশালী। আধ্যাত্মবাদ পূর্ণ
বৈষ্ণব সাহিত্যের সত্যিকারের রস গ্রহণ করতে হলে সর্বপ্রকারে ত্যাগ করতে হবে মানুষের
মনকে। তবেই সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে বৈষ্ণব সাহিত্যে পরমাত্মিক
প্রেমগভীরতা।

আমি আর প্রত্যেকটি সকাল

মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

খুলে যায়

খুলে খুলে যায় আমার হৃদয়ের নীল-নেমলা দিগন্ত
নতুন নতুন মুখের যন্ত্রণার জন্ম উদ্বোধন ক'রে
মহাদেশ, মহাদেশ হয়ে ওঠে আমার
চেতনার দৈনিক স্বদেশ ।

আমার দিগন্ত খুঁজে ফেরা

উঃটর গাড়ির উত্তরাখণ্ডের সেই ধুলো থেকে
পুরীর সমুদ্রের উল্লসিত ফেনায়,
মৃষ্টিময় পার্বতী আসাম যেমন
রানীকৈতের পাহারের বন্ধু যৌবনও ভেমনিই
আমার হৃদয়-চেতনার সগন্ত শিরায়
রক্তের ভোয়ার গেয়ে ওঠে ;
মুখ আর ফেরাতে পারি না
চণ্ডীপাহাড়ের সেই সমস্ত গাছগুলি থেকে
হরিহারের স্নানার্থীদের বিজ্রত তলুত্ৰী
যাদের পাতায় পাতায় এনেছে বিমর্ষ হাওয়া,—
যেমন ফেরাতে পারি না আমি চোখ
পলতা-খড়দহের ট্রেনে ট্রেনে হাত বাড়ানো
মেয়ে-পুরুষের চোখের আর্ত বাঙানা থেকে, যারা
নতুন নতুন মুখের যন্ত্রণার জন্ম উদ্বোধন ক'রে
খুলে খুলে দেয় আমার হৃদয়ের দিগন্ত, আর

আমার চেতনার স্বদেশ-মহাদেশের

সংঘাতের অতৃপ্তির নিষ্ঠুর জ্বালায়

প্রত্যেকটি সকাল অলে ওঠে

সমস্ত নির্নিরে পাতায় পাতায় শব্দের প্রান্তরে

দুটি কবিতা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

। সম্ভবা ।

উঠানে তার লক্ষ্মীমন্ত

রোদের পলাশ একা

চাল বাছতে জল আনতে

বারেবারেই দেখা ।

দূরের মাঠে ধানের সোনা

পথ গিয়েছে সোজা

দিনমানে গেরস্থালীর

মনে মনে খোঁজা ।

পাখির বুকে কিসের কাঁপন

হাওয়ার দিকে টানে

পিঁজর খুলে আকাশ দেবে

একজনে তা জানে ॥

। আশ্বিন ।

শিরিষ ডালে সাদা বকের মেলা

দিঘির জলে ছায়া ভাঙার খেলা

বালির চরে মেঘলা হাওয়া চলে

ওপার ধুধু, তোমারই গান বলে ।

সমস্তদিন আকাশ ভাসা নীল

মন্দিরখানে আপন বকের মিল ।

এপার ওপার অবাক ছবি আঁকা

তোমার চোখে আমার ভুবন রাখা ॥ •

এক নারী

অমলকান্তি ঘোষ

সাতটি বছর আগে বারোতে পড়ল তাঁর নেয়ে ।
তারপর জ্বর হল, সেই জ্বর কখনো কমেনি ।
রোগের অলসন্ধে নেশার নতন স্মৃতি ডাকে ;
এ হৃদয় সঙ্গম যেন বেদনার শতবেগী
শিশুটি বিভোর হয়ে খেলা করে ঘরের মেঝেতে,
কেউ নেই তাঁকে দেখে ; কারণ, মা শায়িতা অসুখে
সহানুভূতির টানে আঁকা এই নারীর নীলিনা ।—
মানুষ প্রকৃতি হয়ে কথা বলে ছবিটির মুখে ।

বুড়ি ঠাকুমা

জ্যোৎস্না ভট্ট

বয়স হয়েছে ঢের আমাদের বুড়ি ঠাকুমা—
ভোমরা দেখেছ তাকে জলে ঝড়ে পরীদিয়া মাঠে ;
অনেক ঘুরেছে ঠিক । অবশেষে জীবনের ঘাটে
চড়া পড়ে গেছে ভেবে একেবারে যায়নিক' খেমে—
সকালের আলো নিয়ে এখনো চলার পথে নেমে
দেখেছি চলতে তাকে জনতার আগে আগে আর
হুটি বুকে জলজলে আঁকা দেখি শপথ বাঁচার ।

মাথাভরা পাকা চুল । কী কঠিন ভাব তবু মুখে—
অথচ মমতা যেন ঝরে পড়ে মাটি-মাঠ-ঘাসে
মনে হয় দাঁড়িয়েছি রোদমাখা হুপুর-আকাশে ;
গেছে বিটে পাপতাপ, জীবনেতে সবটুকু আলো
এখনো নিবিড় করে পৃথিবীকে কি যে বাসি ভালো
এখনো চলার পথে গান গাই ফের হাঁটি মুখে—
ঠাকুমার চোখে মুখে জলা আলো এ মাটির বুকে ।

শূন্যের প্রান্তরে

শিবশঙ্কু পাল

সমস্ত দিনটা গেছে ঘ্যান ঘেনে স্বপ্নের মতন
অবিরল হট্টগোলে এখানে সেখানে । কত কথা
বেপরোয়া বলে গেছি বলার বেজাদে ; অগণন
ভুল বকে হয়তো বা স্পষ্ট করি নিজের অজ্ঞতা ।
তবুও সমস্ত দিন সাহিত্য, গিনেমা, ছবি, গান
ইত্যাদি যে কোনটায় আমার যথেষ্ট অধিকার
রাস্তায় হাঁটার মতো স্বাভাবিক ভেবেছি । আগ্রাণ
কথার আনন্দে ভেসে আত্মহারা সারাদিন । আর

দিনের উপাঙ্গ এসে দেখি শুধু নরম বিছানা,
গেলাসে কুঁড়োর জল : ক্রান্তি আর সুনের আরাম ।
অশ্রান্ত কথার স্বপ্নি খেমে গেছে ; একটানা
ঝিঁঝির ডাকের মতো ঘোরাফেরা করে অবিরাম

একটা স্তব্ধতা এই চেতনার ছড়ানো প্রান্তরে
যেখানে কিছুই নেই, কিছুই থাকে না ; ভাবনার
সামান্য ভূগেরও চিহ্ন ফোটেনি কোথাও । অবসরে
যেটুকু সময় আছে সে তো মাত্র জমাট নিদ্রার ।

সীমান্ত

বন্দেব গুপ্ত

শত্রুর সীমানা হারালো । চোখ বেয়ে
ঘর্ষার গান । বাঁট-বাঁট-বাঁট হুঁ রে
যারা এসেছিল তারাও উধাও । চেয়ে চেয়ে
দেখলাম :
একখানা তাকার ঘর আছে মাথা নুয়ে ।

ব্যথা তবু আমাকেই দাও

গৌরীপদ দত্ত

আনি যেন স্তব্ধ অঙ্গি কণ্ঠ-লগ্ন বেদনা ডুবারে ।
অথবা হৃৎকণ্ঠ আনি সূর্য আর ধূসর আকাশ ।
অগ্নিদগ্ধ তবু দূরনিঃশেষে বিস্তৃত
ধুলার মেঘের মত বৈশাখের ঝড়ে ।

এ আঘাত সমুদ্রের অস্থলীন অমৃত আশ্বাস
রক্তাক্ত প্রতাপ দিয়ে লিখি তাই নিত্য ইতিহাস
আনি জানি এ-বেদনা প্রেরণার স্বতঃস্ফূর্ত গান ।
আনি জানি এই ব্যথা যুগান্তের স্পষ্টে পূর্ব ভাগ ।
অস্বিষ্টের তপশ্চর্যা, হৃৎকণ্ঠ তারই উদাত্ত আহ্বান ।
অথ নেবে হিরণ্ময় এ-যন্ত্রণা তাহারই প্রকাশ ।

তাই প্রতিদিন পথে লক্ষশূন্য চলার আবেশে
ছবি আঁকে অশ্রুপূর্ব রক্ত দ্বিপ্রহর
ক্লান্ত মুখে হেঁটে চলে জীবনের লক্ষ পদাতিক
পরিশ্রান্ত দেহভার বন তার আশ্চর্য দুর্ধর ।
স্পৃহিত চেতনা চায় আঘাতের অনেক অধিক ।

তারপর সোনালী সন্ধ্যায় এ রোদ বাতাস হয়
সারাদিন শ্বেদ আর অশ্রু অভিষেক
ছায়াপথ হয় পথ । আকাশের বুকে জ্যোতির্ময় ।
অতিকার গৈনিকের মত শহর ঘুরায় স্তব্ধ অন্ধকার বুকে ।
মন ঝুঁজে পায় তার দুর্বার স্পর্ধার উৎসমুখ ।

অনেক সহিছি ব্যথা—

ব্যথা তবু আমাকেই দাও ।

তিনটি কবিতা

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

। বলি : শোন ।

রাতের আকাশ ফের নিঃশব্দ চাঁদ এনে দেয় । এবার
তুমি আর কিরিয়ে দিও না । রাত, আকাশ, চাঁদ আর
নৈঃশব্দ যেন তোমাকে ঘিরে থাকে ।

এ-কথাটা যখন বলি : তুমি জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলে ।
তুমি যখন শোন : আমি রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম ।

দিন-রঙা ঝকঝকে নতুন শাড়িটা আকাশের বারান্দায়
কে যেন মেলে দিয়েছে । ওটা আমি তোমায় দিয়েছিলাম ।
তোমার ভারি পছন্দ হয়েছিল । আশ্চর্যতায় উজ্জল হয়ে
এ-কথাটা যখন বলি : তুমি জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলে ।
তুমি যখন শোন : আমি রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম ।

মুহুর্তের মিছিল কিন্তু একটানা । চৈতন্যের শুরুতে এর যাত্রা
শুরু হয়েছিল । আমাদের চৈতন্যে আমরা মগ্ন । শিশুরা
খেলায় মগ্ন, জীবন যৌবনে মগ্ন আর রাত দিনে ।
তখন নৈঃশব্দ রাতকে কাছে পেতে চায় ।

রাতের আকাশ নিঃশব্দে চাঁদ এনে দেয় । মুখটা কিরিয়ে
এ-কথাটা যখন বলি : তুমি জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলে ।
তুমি যখন শোন : আমি রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম ।

। সেই মুখের কাছে ।

সেই মুখের কাছে তার মুখ তুলে ধরল সে । তার হাত
সে আস্তে করে এগিয়ে দিল । আকাশটা যেন আস্তে
আস্তে কুঁড়ির মতো বুজে গেল ।

কোথায় আমি ! পৃথিবী চীৎকার করে উঠল ।

সকালের কাঁধে হাত রেখে যৌবনের পরিক্রমা শুরু ।
গোধূলির তটরেখায় নদীর এলায়িত প্রেত-কাকলি ।
পৃথিবীর দিকে তাকালেই সে যেন চীৎকার করে বলে
ওঠে : কোথায় ! কতদূর !

আকাশের মতো তার মুখ কী সুদূর ! সে কুঁড়িটা তুলে
ধরল তার মুখের কাছে । পৃথিবী তখন আস্তে আস্তে
ছড়িয়ে গেল অসংখ্যতায় । বিশালতায় ডুব দিল ব্যাপ্তির
দেহ ।

কোথায় আছি ! চীৎকার করে উঠল নিঃশব্দ ।

নিঃশব্দে তার হাত কী রকমভাবে নিশে গেল অন্ধকারে ।
আকাশ সুরভিত হয়ে উঠল আশ্চর্য কুঁড়ির মতো ।
আলগা পৃথিবী কিসের চাপে বসে গেল ।

সেই মুখের কাছে-থাকা তার মুখে একটি চাওয়ার
চীৎকার নিঃশব্দে অসংখ্য ইচ্ছার ছড়িয়ে গেল ।

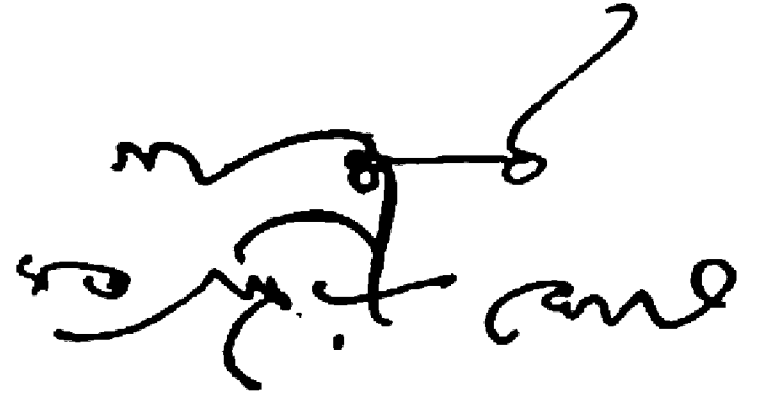
। গামনে, পিছনে ।

মাথার উপরে আকাশ
রাস্তায় চলমান ছায়া
হু'পাশে জলের উচ্ছ্বাস
মধ্যখানে নোকা

আকাশ হারিয়ে যায়
সমুদ্রে
নাটি ডুবে যায়
নোকায়
কখন রাস্তায় ছলতে ছলতে
অসংখ্য ছায়া
কখন চেউয়ের ফেনায় ফেনায়
অসংখ্য বুদবুদ নোকা
গামনে
পিছনে

মাথার উপরে জলন্ত সূর্য
রাস্তায় গলন্ত পিচ
হু'পাশে ঠিকরে-ওঠা বালির আয়না
মধ্যখানে পাথর নোকা

জলন্ত সূর্য চাপা পড়ে
বালির সমুদ্রে
সমুদ্র ডুবে যায়
পাথর নোকায়
তখন রাস্তায় কেঁপে কুলে ওঠে
অসংখ্য স্রোত
তখন ফেনায় ফেনায় ছিটকে যায়
স্রোতে অসংখ্য নোকা
গামনে
পিছনে ।



॥ ১৮ ॥

পঞ্চমবার বিয়ে করছেন ব'লে বাকুগীর বাবা সমাজের চক্ষে যত নিলনীয়ই হোন না কেন, অবনী আকাশের তারার দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে বনে-বনে তর্ক করতে লাগলো, বকুলের মতো মেয়ের পক্ষে এমন লোকই কি পরম কাম্য পরম বরণীয় পরম আদরের বস্তু নন? বাকুগীর বাবা বকুলকে বিয়ে করছেন ব'লে বকুল খুশিতে ডগমগ হচ্ছে না এ তো দেখাই যাচ্ছে, কিন্তু বকুল থেকে শুরু ক'রে এ-কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে যে এই বাকুগীর বাবাই বকুলের অনড় অচল জীবনটাকে মোটামুটি সচল ক'রে দিলেন? এর পরে বাকুগীর বাবার সঙ্গে বকুলের যদি পদে-পদেও ঝটিকাটি লাগে, অত্যাচারে অপমানের ভয়লোক যদি অতিষ্ঠও ক'রে তোলেন বকুলের জীবন, বকুল তো সে-সবের বিরুদ্ধে লড়াবারও একটা সুযোগ পাবে যে-সুযোগ একটা কিছু নিয়ে বেঁচে থাকবার পক্ষে বড়ো কন সুযোগ নয়।

'কী ভাবছো এত? কথা বলছো না যে?'—বাকুগী বললো।

অবনী চুপ ক'রেই রইলো।

ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষ রাত। তখন গোটা-আটকে হবে। কালীঘাটের কালীমন্দিরের পশ্চিমে আদিগঙ্গার বাঁধানো ঘাটনার পাশে ছড়ানে পাশাপাশি ব'লে আছে। কালীমন্দিরের চত্বরের বাইরে ভাড়া-নেওয়া এক সেবাইভের ঘরে তখন বকুলের বিয়ে হচ্ছে। বাকুগীর বাবা নিষ্ঠাবান হিন্দু, রেডিস্টি-করা 'খেটানী বিয়ে'-তে তাঁর আস্থা নেই, এর আগেকার বিয়েগুলোও তিনি বিস্ত্র হিন্দুতে নিদান-বিধান সমস্তই বজায় রেখে করেছেন, এবারও তাই হচ্ছে। ভদ্রলোকের শুধু আচার-ধর্মই নিষ্ঠা না, চক্ষুসজ্ঞাও আছে। তাই নিজের একবাড়ি ছেলেপুলে আর পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে শাঁখ বাড়িয়ে উলু দিয়ে পঞ্চমপক্ষের বরণ করার আরোজন তিনি করেননি, বিয়ের ব্যাপারটা সেরে নেবার ব্যবস্থা হয়েছে তাঁর চেনাঘানা সমাজের বাইরে, তাদের অগোচরে, বলতে গেলে প্রায় লুকিয়েই। মন্দিরের লাগাও ঐ ভাড়া-নেওয়া ঘরে বিয়ে-বাসীবিয়ে-কুলশয্যা সবই হবে; বউভাতের অস্থানটিও একদম বাদ যাবে না, বউভাতের দিন বাকুগীর বাবা বকুলের ভবিষ্যৎ জীবনের ভাত-কাপড়ের ভার নেবার সময় নেবার পর বকুল নববধূর সমস্ত ঘোমটা মাথায় নিয়ে নিজে-হাতে পরিবেশন ক'রে কয়েকজন লোককে খাওয়ানোর সুযোগও পাবে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে থাকবেন কালীমন্দিরের কয়েকজন সেবাইত আশ্রয়, বাকুগীর বাবার ঘন-হুই বন্ধু এবং অবনী-বাকুগী। তিন দিন পরে বাকুগীর বাবা শুধু বকুলকেই নয়, ঐ-সঙ্গে বকুলের না অম্বালা এবং বাকুগীকেও নিজের কাছে নিয়ে যাবেন। অতঃপর এরা সকলেই ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রয় পাবে, খেতে-পরতে পাবে।

এবং ভদ্রলোক এ-আশ্বাসও দিয়েছেন, বাকুগীর বিয়ের জন্যে তিনি তাঁর মাধ্যম্যায়ী খরচপত্রও করবেন। যা দিনকাল পড়েছে তাতে এ-বাকুগীরে এর চাইতে আর কী বেশী আশা করা যেতে পারে অবনী নিজেই প্রসন্ন করলো। অবিশিষ্ট তিনি দাবী করেছেন অবনীকে বিয়েটা করতে হবে হিন্দুসভে পুরুত ডাকিয়ে মগ্ন প'ড়ে। এ-দাবী যদি পাত্র হিসেবে অবনী মেনে নেয় তবেই পাত্রীর পিতা পিতার দায়িত্ব পালন করবেন, নচেৎ নয়। তা সে অন্তায় কী? অবনী নিজেই বললো, বাকুগীর বাবার মতো মানুষের পক্ষে এমন দাবীই তো স্বাভাবিক, স্ত্রায় আর নীতিসঙ্গত; তাহ'লে এই নিয়ে আমার মনের মধ্যে নালিশ উঠছে কেন, কেন ভাবছি এ ভদ্রলোকের অন্তায় ক্ষেদ, দায়িত্ব কীকি দেবার ফিকির, নীচতা সঙ্কীর্ণতার নামান্তর?

‘কথা না বললে আমি উঠে যাই’—বাকুগী বললো।

অবনী বাকুগীর হাত চেপে ধরলো। বললো, ‘আমাদের বিয়ের কথাই ভাবছিলাম বাকুগী, রাগ করো কেন।’

‘কী কথা’—অশ্রুটে বাকুগী জিগ্যেস করলো।

‘ভাবছিলাম আমরা তো রেজিস্ট্রি ক’রে সংক্ষেপে বিয়ের পাটটা সেরে ফেলব, তাতে আবার তোমার মন উঠবে কিনা। তোমার বাবার মতো তোমারও যদি মনে হয়, এমন বিয়ে বিয়েই নয়?’

‘তোমার না মনে হলেই হলো।’

‘তার মানে?’

‘কিছু মানে নেই। তুমি কি ঝগড়া ছাড়া আর কিছু জানো না?’

অবনী থমকে গেলো। বাকুগীর অভিযোগটা সহসা যেন এক সহস্রকণা সাপের মতো তাকে একই সঙ্গে সহস্র ছোবল মেরে নাগপাশ বন্ধনে হতচেতন ক’রে দিলো। সত্যিই কি আমি তাই? আসলে আমিই কি তবে এতই নিঃস্ব এতই দীন যে সংসারের সামান্যতম সম্পদও আমি ভোগ করতে জানি না? সামান্যতম ব্যাপারেও তাই আমার এত সন্দেহ, এত চুলচেরা বিশ্লেষণের প্রবণতা—যা নাকি অল্প দিক থেকে দেখতে গেলে চরম স্বার্থপরতা আর আত্মকেন্দ্রিকতার একটা চূড়ান্ত লক্ষণ? কোন-কিছুই মেনে নিতে না-পারা, কোন-কিছুই বিশ্বাস করতে না-পারা, কোন-কিছুকেই আঁকড়ে ধরার অক্ষমতা—আমি কি তাহ'লে শেষ পর্যন্ত সেই পর্যায়েই চ'লে গেলাম? সে তো তবে এক চরম নৈরাশ্র আর অন্ধকার আর বিকারের মধ্যে নিজেই ছেড়ে দেওয়া।

‘রাগ কোরো না’—অনুসারে ভেঙে পড়লো বাকুগীর গলা, ‘আমার ওপর রাগ ক’রে আমাকে আর শান্তি দিও না।’

চোখের সামনে পশ্চিম আকাশ। সেখানে ঠাঁদ ছিলো না। ছিলো অন্ধকার ঘুসর মহাশুদ্ধের বিস্তারের মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্রের সন্ধ্যা, দপদপিয়ে জ্বলছে সবাই, কী ওদের ভাষা, কী ওরা বলতে চায়? অবনী চোখ তুলে মাথার ওপর দেখলো শিকারী কালপুরুষ আশ্চর্য মহিমায় প্রকাণ্ড সত্তায় প্রদীপ্ত হয়ে আছে। নিচে প্রসারিত ক্ষীণ দুর্বল গঙ্গা, তার গতি তখন উত্তরে, কত অশ্রু কত অবাঞ্ছিতকে

দক্ষিণের দল ঠেলেঠেলে নিয়ে যাচ্ছে উত্তরে। ঘাটের এখানে-সেখানে কোমরজলে আবার কেউ-বা ওপরে দাঁড়িয়ে ঐ যে রিক্ত বুড়ুকু মানুষগুলি কুতালিপুটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেবতার করুণা ভিক্ষা করছে আর ধেকে-ধেকে ডুকরে চিৎকার ক'রে উঠছে মা-মা-রূপাময়ী মা ব'লে, তারা কি ঐক্যেই সকলেই উত্তরমুখী হয়ে আছে? অবনী ভাবতে লাগলো। ওপরের চেতনার ঘাটের দিক থেকে ভেসে আসছে কাঁসরঘণ্টার একটানা আওয়াজ। এপার-ওপার খেয়া-পারা পার হচ্ছে অবিরাম। পেছনে ছায়ামণ্ডপের পাশে চলছিলো কথকতা। অন্য পাশে আগাগোড়া সিঁদুরে লেপা প্রকাণ্ড পাথরের মূর্তি সাবিত্রী-সত্যবানের, কাছেই টুলে ব'সে জন-হুই লোক বিক্রি করছে সিঁদুর আর নোয়া, মেয়েরা গঙ্গাজলে শুদ্ধ আশ্রয় হয়ে সেই সিঁদুর আর নোয়া কিনে নিয়ে ঐ পাথরের সাবিত্রীর হাতে পরিয়ে দিচ্ছে নোয়া, গায়ে লেপে দিচ্ছে সিঁদুর।

‘তুমি কি সমস্ত জীবনই আমাকে এমনি ক'রে কষ্ট দেবে’—রুদ্ধ কান্নার আবেগে বাকুণীর মাথাটা ঝুঁকে এলো অবনীর কাঁধের ওপর।

‘কষ্ট ছাড়া আমি বোধ হয় কাউকেই কিছু দিতে পারি না।’

‘বক্তৃতা! কেবল বক্তৃতা!’

‘অন্তত একটি লোক তো আছে আমার বক্তৃতা শুনবার! সমস্ত জীবন ভরে।’

‘কে?’

‘তুমি?’

‘অহ! বয়ে গেছে আমার।’

‘বয়ে গেছে তো? বেশ, তা'লে বিদায় দিয়ে দাও, চুকেবুকে যাক।’

‘বিদায় তো তুমি চাওই আবার বড়ো-গলা করছো কী। নিতান্ত আমি ছাড়ব না তাই তো ছেড়ে যেতে পারো না। আমি আর বুঝিনে কিছু, না?’

‘ক্বীবা তাই কখনো হয়! তুমি আবার বোঝো না! তা, যখন বোঝোই আমি তোমাকে ছাড়তে চাই তা বুঝেও তুমি আমাকে ধ'রে রেখেছো কেন? তোমার তো তা নিয়ম নয়?’

একটি হাত বাকুণীর আলগাভাবে প'ড়ে ছিলো অবনীর পায়ের ওপর। এবার তা আন্তে আন্তে স'রে গেলো ত্রিয়মাণ সঙ্কোচে। অবনী দেখলো। কিন্তু আদর ক'রে সে হাতটি ফের টেনে নিলো না নিজের কাছে। বরং কিছুটা সময় সে এমনিই কেটে যেতে দিলো। ডুমুর আর বট শিকড় চালিয়ে চালিয়ে জীর্ণ ছায়ামণ্ডপটির দেয়ালের জুমাট খসিয়ে দিয়েছে, মস্ত মস্ত টিকটিকি আর গিরগিটি ঘুরে বেড়াচ্ছে নোন-খরা দেয়ালের গায়ে পোকামাকড়ের সঙ্কানে, ঘাটনার গ্যাসের ঘোলাটে আলোয় কী কদম্ব দেখাচ্ছে ওগুলোর কালো কুতকুতে চোখগুলো।

‘কী? উত্তর নেই যে!’—অবনী বললো নকল গাভীরে।

বাকুণী মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

‘বলো?’—অবনী ফের তাড়া দিলো।

‘কী বলব?’

‘ঐ যে প্রশ্ন করলাম ?’

‘উত্তর নেই।’

‘ঠিক বলেছে উত্তর নেই। কী ক’রে থাকবে ? প্রশ্নটার মধ্যেই ভুল আছে যে। ভুল প্রশ্নের উত্তর হয় না। আশা করি বুঝতে পারলে কথাটা ?’

‘আর বক্তৃতা দিতে হবে না চুপ ক’রে থাকো।’

‘বেশ, একটু পরেই আবার না ব’লে বসো—চুপ ক’রে আছে যে ?’

বাকুণী চিমটি কাটলো অবনীর পায়ে।

‘আচ্ছা সে তো হ’লো’—অবনী বললো, ‘কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে আমি কিন্তু সত্যিই তোমার বাবার আদার মানতে পারব না। বিয়ে ঐ রেজিস্ট্রি ক’রেই হবে। তুমি যে তোমার বাবার আশ্রয়ে চললে, বিয়ের ব্যাপারে তিনি যদি পরে গওগোল করেন ?’

‘গওগোল করার তুমিও নতুন একটা ছুতো পাবে। তোমার সুবিধেই।’

অবনীর মুখে এ-কথার প্রতিক্রিয়ায় রাগ দেখা গেলো না, বললো লম্বা মেজাজেই, ‘আমার সুবিধের জন্তে এত দুর্ভাবনায় পড়েছে কেন ! অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে নাকি আমাকে নিয়ে ? আর ভান্ লাগছে না ?’

‘বাঞ্ছা কথা বোলো না তো। চুপ করো।’

‘তুমি আনার বউ কবে হবে বাকুণী ?’

‘হয়েই তো আছি।’

‘আর পঁচিশ দিন।’

‘চব্বিশ। তোমার আগ্রহ কম তাই হিসেবে ভুল করলে।’

‘বিয়ের পরই আমরা কোন একটা জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসব, কেমন তো ? হনিমুন। বিলিতি বিয়েই যখন করছি সব-কিছুই বিলিতি মতেই হোক। পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। কোথায় যাওয়া যায় বলা তো ? অল্প খরচায়। তোমার তো ইন্সুল, হিন্দী, ট্রাইশনি—নানান কঁয়াকড়া আছে। ছুটি নিতে পারবে তো ?’

‘না।’

‘কী না ?’

‘ছুটি নেওয়া আর কী, নিলেই হ’লো। সেজন্তে আপত্তি না।’

‘তবে কী জন্তে ?’

‘ওসব বিবিয়ানা আমি ভালোবাসি না। বিয়ের পরই আমি-তুমি মুখোমুখি হয়ে চললেম সবাইকে ছেড়ে। ছি। বিয়ের পরই আমার অনেক কাজ। বেড়ানো তো দূরের কথা, মরবারও কুরসুৎ হবে না।’

‘কেন ? কী কাজ ?’

‘কী কাজ ! পুরুষ মানুষের অত মাথা ঘামানো কেন, সব বিষয়ে ?’

‘বলো বলো।’

‘না। তোমার সব কথার নিকেশ দিতে আমি পারব না।’

‘কী মুশকিল, বলো না।’

‘না ।’

‘না মানে ?’—অবনী অসহিষ্ণু হয়ে পড়লো, ‘বিয়ের আগেই আমাকে মানছে না, বিয়ের পরে দেখছি তুমি আমাকে গ্রাহ্যই করবে না !’

‘বিদেয় ক’রে দিও ।’

‘ওসব বাজে কথা ছাড়ো । বলো তো এখন কেন বললে ও-কথা ।’

‘বলেছি তো বলব না ।’

‘তার মানে ?’

‘বিয়ের আগেই আমার ওপর এত তর্ক করছে, বিয়ের পরে দেখছি কথায়-কথায় আমাকে উত্তম-মধ্যমও খেতে হবে আপনার হাতে ।’

‘হ্যাঁ তা খাবে, কথা না শুনলে ।’

‘তুমিও খাবে । আমিও ছাড়ব ভেবেছ ?’

‘চারদিকে লোকজন নয় তো একুনি একটা কানমলা খেতে ।’

‘তুমিও খেতে ।’

‘বড্ড যে সাহস বেড়েছে দেখছি ।’

‘বাড়ালেই বাড়ে ।’

‘আর পঁচিশটা দিন যেতে দাও—’

‘চক্ষিণ ।’

অবনী চোখ পাকালো বারুণীর দিকে ।

‘অহ । ইঁহরের গন্ত খুঁজতে হয় আমাকে ।’

অসহায়ের মতো অবনী তখন পেছনের বাজারের দিক থেকে ভেসে আসছিলো যে অখাস্ত ফিল্মী গানের আওয়াজ সেই গোলমালটা শুনতে লাগলো ।

বারুণী মিটমিট ক’রে খানিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো অবনীর মুখখানা । তারপর বললো, ‘রাগলে তোমার মুখখানা যা চমৎকার দেখায় না, ঠিক রামগুরুড়ের ছানার মতো ।’

‘তোমার কপাল খারাপ তাই তো এমন লোককে বিয়ে করতে হচ্ছে ।’

‘না আঁচালে বিশ্বাস নেই ।’

‘কীসের বিশ্বাস ?’

‘কীসের আবার ।’

‘কী আবোল তাবোল বকছে ।’

‘চুপ করো তো ! তখন থেকে কেবল ঝগড়াই করছে আমার সঙ্গে !’

অবনী এবার নিম্নে ক’রে চুপ করালো । চোখ ভুলে দেখতে লাগলো কালপুরুষের ডান পায়েয় নিচে আকাশের উজ্জ্বলতম তারা লুকক জলজল ক’রে অগছে একটি হীরের টুকরোর মতো ।

সময় গড়াতে লাগলো ।

বারুণী হঠাৎ একসময় ব’লে উঠলো, ‘ম্যাগ্ গোঃ, কী কাঁঠোটা বিয়ে ।’

অবনী কিছু না বুঝে তাকালো বারুণীর মুখের দিকে ।

বাকুণী জলের দিকে চোখ রেখে যেন আপন মনেই ব'লে যেতে লাগলো, 'কী বিক্রী নামলা-মকদোমার ভাষায় কাঠগড়ায় দাঁড়ানো খুনে আসামীদের মতো কী বাজে-বাজে সব প্রতিজ্ঞা করা ! ছিঃ ! বিয়ে না ছাই ! ঐজন্মেই বিয়ের সময় কৃত্তিকার মুখটা অত রুক্ষ দেখাচ্ছিলো। প্রসাদদা অবিশ্বি মুখটা হাসি-হাসি ক'রে রেখেছিলো, কিন্তু সে জোর করা হাসি, কী যে কষ্ট লাগছিলো না আমার। কেন বাপু, তারচে সত্যি সত্যি বিয়ে করলেই হয়, কী বা এমন খরচা। যত সব গোঁয়ারতুমি বাবুদের।'

অবনী হাঁ-হয়ে-গিয়ে অপলকে তাকিয়ে রইলো বাকুণীর মুখের দিকে।

'বৈধ পত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম !! ছি ছি ছি, আর ভাষা পায়নি খুঁজে। তারপর আবার এখানে সই দাও ওখানে সই দাও, সাক্ষীটাকি কারা আছে তারাও সকলে হাজারটা ক'রে সই দাও—যেন ফৌজদারী কোট-কাচারী শুরু হয়ে গেলো আর কি ! কী বিক্রী কী বিক্রী ! কেন যে মানুষ পারতপক্ষে ও-সব করতে যায়।'

'এ-সব আগে বলোনি কেন'—অবনী বললো।

'আগে বলোনি কেন !'—বাকুণী ভেংচিয়ে উঠলো, 'বললে যেন কত শুনতে ভুমি !'

'আমি শুনি আর নাই শুনি, তোমার বলা উচিত ছিলো।'

'অত রাগ দেখানো হচ্ছে কেন। রাগ করবার মতো এমন কিছু বলা হয়নি।'

'অর্থাৎ তুমি চাও তোমার বাবার মত অনুযায়ীই হোক বিয়েটা।'

'ছেলেমানষী কোরো না তো। বাবার সঙ্গে আমার কত সম্পর্ক সে যেন তোমার অজানা ! কিন্তু এমনি মন্দিরে এসে ঠিকঠাক খাঁটি বিয়ে করলেও তো শুনলাম বেশী খরচা নয় এমন কিছু। তোমার ঐ বিলিতি বিয়েতে যা খরচা এতেও তাইতেই হয়ে যায়। আমি তো আর বলছি না নহবৎ বসাও, হেন করো তেন করো, একেবারে দশ দিন ধ'রে হাজার দু-হাজারের ঘট্টা করো—যার যেমন সম্বল তার তো তাইতেই মন ওঠা উচিত। রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি, ঝাঝো না একটু ভেবে এটা হয় কিনা।'

'না হয় না'—অবনী শান্ত সহজভাবেই বললো এবার, 'রেজিষ্ট্রারের অফিসে বিয়ের নোটিস দেওয়া হয়ে গেছে ব'লে নয়, মাকেও বলা হয়েছে। মার প্রথমে সিভিল ম্যারেজে আপত্তি ছিলো, প্রসাদ অনেক কষ্টে তাঁর মত করিয়েছে, এখন যদি আমার অন্তরকন বলি তাহ'লে সবাই বলবে কী !'

বাকুণী চুপ ক'রে রইলো। দু-তিন বছরের একটা উলঙ্গ হাড়িসার বাচ্ছাকে ওপরের সিঁড়িতে বসিয়ে রেখে তার মা গঙ্গাঙ্গল নেবার ঘন্টে নিচে নেয়ে গিয়েছিলো, বাচ্ছাটা হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সিঁড়ি গড়িয়ে উর্টে যেতে যেতে তাড়স্বরে চিৎকার ক'রে উঠলো—বাকুণী ছুটে গিয়ে বাচ্ছাটাকে ধরলো। তার মা তাড়াতাড়ি এসে তাকে ধরতে বাকুণী ফিরে এসে বসলো অবনীর পাশে।

তখনো চুপচাপ হুজনেই।

'আজ কী তিথি ?'—অবশেষে অবনীই ফের মুখ ধুললো, 'অমাবস্যা নাকি।'

বাকুণী ঠোঁট বঁকিয়ে মুখ হুরিয়ে নিলো।

‘স্বাৰা ! নিৰ্ধাৎ অমাবস্তা ! ঘোর অমাবস্তা ! যা দেবী অবনীভূতেষু
অমাবস্তারূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ । যা দেবী—’

‘চুপ কৰো । বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথা বলো ।’

‘কী কাজের কথা ?’

‘দোপাটির চিঠির উত্তর দিয়েছে ?’

‘না ।’

‘কেন ?’

অবনী চুপ ক’রে রইলো ।

‘বলো না ।’

‘না খুব কাম্বাকাটি করছেন । অনর্থক দোপাটি এই কাণ্টা করলো । কেন,
ও যদি মুখ কুটে বলত এই লোককে আমি বিয়ে করতে চাই, আমরা কি তাতে বাধা
দিতাম ? কী দরকার ছিলো এমনি কেলেকারী ক’রে পালিয়ে যাবার ? পালিয়ে
গিয়ে কাশীতে গিয়ে বিয়ে করবার ? আমাদের সকলের মুখে চুনকালি দেবার কোন
দরকার ছিলো না ওর । ছোট ভাইবোনগুলি পর্যন্ত মুখ কালি ক’রে ঘুরে বেড়াচ্ছে
দিদির কাণ্ড দেখে ।’

‘তা সে তো যা হবার হ’য়ে গিয়েছে, এখন আর ও নিয়ে মন খারাপ ক’রে কী
লাভ । তোমাদের আশীৰ্বাদ চেয়ে পাঠিয়েছে, তোমরা আদর ক’রে ডাকলেই তোমাদের
প্রণাম করতে আসবে লিখেছে—শেষ পর্যন্ত খারাপ তো আর কিছু গড়ায়নি, ছোট বোন
না হয় একটা অপরাধ ক’রেই বসেছে, কিন্তু তার কি ক্ষমা নেই ?’

অবনীকে চুপচাপ দেখে বাকুণী অবনীর একটা হাত ধ’রে ফের বললো, ‘কেন
মিছে মন-খারাপ করছো । আমার তো মনে হয় -দোপাটির ও-ছাড়া কোন উপায়
ছিলো না । এখন তোমার মনে হচ্ছে, ও পালিয়ে না গিয়ে সব খুলে বললেই
তোমরাই বিয়ের ব্যবস্থা করতে, কিন্তু কী জানো অত-সব বলা যায়ও না, বললেও কেউ
বুঝতে চায় না । আর, সব কিছুই কি মানুষের নিজের হাতে ? আমরা একরকম
করতে চাই, অল্পরকম হয়ে যায় । কালকেই চিঠি দিও, কেনন ?’

‘দেখি ।’

‘আবার দেখি । দেখি-টেখি না । তোমরা এত নিষ্ঠুর কেন ? প্রাণে একটু
মায়াদয়া রাখলে এমন কী ক্ষতি তোমাদের ? পত্রপাঠ ওদের ফিরে আসতে লিখে
দাও । আমাদের বিয়ের তারিখটাও তো জানিয়ে দিতে পারো । লিখবে আমার
বিয়ের আগেই তোর আসা চাই । দোপাটির এত শখ দাদার বিয়ে নিয়ে—আমাকে
বৌদি পেয়ে তার সে-শখ মিটবে না জানি, তবু কী আর করা, আমার কিন্তু বিয়ের
সময় ওকে না পেলে মোটেই ভালো লাগবে না । বুঝলে ? দেবে তো কাল চিঠি ?
কী ? চুপ ক’রে থেকো না, বলো । বলো না ।’

‘দেব দেব ।’

‘মাধবদা অত ভালো বউ পেয়েছে, কৃত্তিকাকেও তো- আমার বেশ ভালোই
লাগে, মাঝখান থেকে তোমার বরাতটাই মন্দ । একদম ঠকে গেলে তুমি, তাই না ?’

‘হ্যাঁ তা তো বটেই। তবে এমন ঠকা ঠকতে মাধব আর প্রসাদ দুজনেই তো রাজী ছিলো। তাই না?’

‘বাজে কথা বোলো না তো। ভিলকে ভাল করা স্বভাব, সব কিছুতেই।’

‘তোমার মাসীর বিয়ে ওদিকে তো শেষ হয়ে গেলো বোধ হয়। অনেক রাত হয়ে গেছে, যাও তুমি এবার, আমি চলি।’

‘চলি মানে? খেয়ে যাবে না? না না সে হবে না, না খেয়ে চলে গেলে দি’মা রাগ করবে খুব। কেন, কী এত আপত্তি তোমার, সব তাতেই? এ-সব চলবে না ব’লে দিচ্ছি। মানুষের মধ্যে থাকতে গেলে সব দিক বজায় রেখে চলতে হয়—’

‘তোমার নীতিশিক্ষা দেবার বহর ক্রনশই দেখি বাড়ছে।’

‘অহ। তুমি যখন ঠাকুর্দাগিরি করো আমার ওপর, তখন কী?’

‘আমি তো তোমার বড়ো।’

‘আমিও তোমার বড়ো।’

‘তার মানে? দুজনেই দুজনের বড়ো?’

‘তাই। আমি যদি তোমার মত মতো চলি, তোমাকেও আমার মত মতো চলতে হবে। পাঁচজন না সাতজন লোক থাকে তার আর হাদ্যমা কী আছে। চলো আর দেবী না করাই ভালো।’

অবনী দেখলো তার চেনা তারাগুলি ইতিমধ্যে আরো খানিক পশ্চিমে নেমে এসেছে। একটু আগেও ছায়াপথ দেখা যাচ্ছিলো না, কিন্তু কখন যেন দূর শূন্যের ঐ পুণ্যতোয়া আকাশগঙ্গাও ভেসে উঠেছে, উজ্জ্বল সাদা বিরাট একটি শ্বেতপঙ্খের মালার মতো যেন বেটন ক’রে ধরেছে বিশ্বচরাচরকে। একটু দূরে সিঁড়ির ওপর ব’সে একটি লোক বহুক্ষণ পর্যন্ত উদাসী গলায় রানপ্রসাদী গাইছিলো, এইসময় সে মুখি ক্লান্ত হলো, চুপ করলো। একটা ঘেঁকো কুকুর বোধ করি তৃষ্ণার্ত হয়েছিলো, সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছিলো জলের দিকে। অবনী উঠলো। বারুণীর পিঠের দিকের আঁচলে একটা কালো ডেয়ো পিঁপড়ে বেয়ে-বেয়ে ওপরে উঠছিলো, অবনী টোকা মেরে সেটি ফেলে দেবার চেষ্টা করলো, পড়লো না, দু-আঙুলে টিপে ধ’রে সেটাকে ডুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে অবনী বললো, ‘চলো যাওয়া থাক।’

আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি

বাসন্তিকা ঘোষ

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিকে কত লোকে কত কি মনে করেন। কেউ সাহিত্যিক কেউ শাস্ত্রিক কেউ বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি। যিনি তাঁর লেখা যে-বিষয়ে যে-প্রবন্ধ পড়েছেন তিনি তাঁকে সে বিষয়ে পণ্ডিত মনে করেন। কিন্তু আমাদের কাছে এসবের কিছুই নন, তিনি ছিলেন আমাদের দাদু।

দাদুর কাছে আমি প্রায়ই যেতাম। দেখেছি আটটার সময় তাঁর অশ্লৈষিক আসতেন আর সাড়ে নটা পর্যন্ত কিয়ে নিত্রাবরণ ইশ্রাবরণ লেখাতে থাকতেন। বিকেল বেলা খবরের কাগজ আসতো। তিনি তখন মিনিট কুড়ি, ভাল রচনা থাকলে আরও খানিক সময় নিজে পড়তেন বা অপর কাউকে পড়তে বলতেন আর তার থেকে ছনিয়ার হালচাল বুঝে নিতেন। আড়াইটার থেকে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ছোট চিঠি লেখবার থাকলে লিখতেন, কিংবা প্রয়োজনীয় বই পড়তেন। হাতের টানা কিংবা অম্পষ্ট লেখা পড়তে তাঁর অসুবিধা হত। এই তিন সময় ভিন্ন তাঁর আর পড়াশুনার চর্চা থাকতো না।

দাদু অনিয়ম দেখতে পারতেন না। এই যে আনন্দবাজার ও যুগান্তরে যুক্তাক্ষর ভেঙ্গে ছাপা হচ্ছে, চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ বছর আগে দাদুই এই পথ দেখিয়েছেন। তাঁকে কত লোকে কত উপহাস করেছেন, কিন্তু দাদু টলেননি।

দণ্ড লিখতে আগে একটা পুটলী লিখতাম। এখন সচ্ছন্দে 'ণ' লিখে নিচে কিংবা পাশে 'ড' বসিয়ে দি। আগে অঙ্ক লিখতে গেলে 'ক'এর মাথায় কোথায় 'ঙ' শোয়াব ভাবতে হ'ত। এখন নির্ভাবনায় গোটা 'ঙ' লিখে 'ক' বসিয়ে দি। দাদু এতেও ভুট নন্। সংযুক্ত অক্ষরের একটা অক্ষর ছোটো করা হয়। এটাও একটা অনিয়ম। ছ'টো অক্ষরকেই সমান বড় রাখা যেতে পারে। পাশে পাশে বসালেই হ'ল। এতে উচ্চারণও শুদ্ধ হবে আর অক্ষরসংখ্যাও কমে যাবে। ১৩৫৫ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে দাদু বাংলার নবলিপি দেখিয়েছিলেন।

বর্তমানে নারীদের নাম নিয়ে এক অনিয়ম চলছে। ১৩৫৬ সালের বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে "ভারতের বিচার্য" নামক প্রবন্ধে দাদু নারী নামের অনিয়ম দেখিয়েছেন। আমি তাঁর মুখে শুনে লিখছি, আমাদের নামের দুই অংশ। প্রথম অংশ স্বীয় নাম, দ্বিতীয় অংশ কুলনাম। হরিহর দত্ত—কোন দত্ত? হরিহর-দত্ত। যত কুল নাম সব পুংলিঙ্গ। যত পুরুষের নাম সব পুংলিঙ্গ। কাজেই পুংলিঙ্গ শব্দের সঙ্গে পুংলিঙ্গ শব্দের যোগ ব্যাকরণ শুদ্ধ। নারী নাম স্ত্রীলিঙ্গ। পূর্বে কেউ দেবী বা দাসী লিখত। এখন সচ্ছন্দে কুলনাম লেখে। নমিতা ভট্টাচার্য, নমিতা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, ভট্টাচার্য শব্দ পুংলিঙ্গ। পুংলিঙ্গ শব্দে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ এ কেমন কথা? স্মরী বালক বলা চলে কি? শ্রীমতী ভট্টাচার্য কি রকম? কুলনাম স্ত্রীলিঙ্গ রূপ দিলেই আর কোন গোল থাকে না। জাতীয় স্বত্তি নামে নী ও আনী যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

যেমন—চাকরানী, ডাক্তারানী (স্ত্রী ডাক্তার)। কুলবাচক শব্দের পরে নী ও

আনো বসালে বধু বোঝায়। যেমন মুখুয়ানী, মজুমদারনী, সরকারনী ইত্যাদি। এইরূপ জীলিঙ্গ শব্দ গ্রামে বহু প্রচলিত আছে। কন্যা হলে ‘জা’ এবং বধু হলে ‘নী’। যেমন জীমতী করজা—করকুলজাতা; জীমতী গুহনী, গুহকুলবধু। এইরূপ বসু—বসুজ—বসুপুত্র; বসুজা—বসুকন্যা; বসুনী—বসুবধু।

একদিন আমার সঙ্গে দুই বন্ধু দাহুর কাছে গিয়েছিল। যেতেই দাহু জিজ্ঞাসা করলেন—“এরা কে?”

“আমার বন্ধু।”

তিনি অকুণ্ঠিত করে—“এরা যে নারী? বন্ধু কেমন করে?”

আমি বললাম “বান্ধবী।”

“বান্ধব কোথায়?” আমি হাল ছেড়ে দিলাম। তখন তিনি বুঝিয়ে দিলেন—

“শুধু তোমাদেরই ‘বন্ধু’ থাকে না। গ্রামের নারীদেরও ‘বন্ধু’ থাকে। কিন্তু তারা ‘বন্ধু’ বলে না, বলে মিতিন। যারা এক ক্রিয়া করে, এবং সে-ক্রিয়াহেতু সুখ দুঃখ পায় তারা মিত্র। গ্রামের পুরুষে পুরুষে মিত্র হয়, ‘বন্ধু’ নয়। তাদের মধ্যে মিত্রালী হয়। গাঁয়ে শুধু মিত্রিন নয়, নারীদের সই থাকে। শিবের গাভ্রনের সময় ‘সয়লা’ হ’ত। সেই সময় সই পাতানো হ’ত।”

আমরা ঠিক শব্দ ভুল করলে, দাহু অমনি ধরতেন। একদিন আমাদের মধ্যে কেউ কথায় কথায় বলল তাদের বাড়িতে এক অতিথি এসেছিলেন। দিনপনর ছিলেন। দাহু অমনি ধরেছেন, “তোমাদের বাড়ি কি অতিথিশালা? পনরদিন থাকে সে কেমন অতিথি?” আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না। তিনি বুঝিয়ে দিলেন। “বন্ধু বাড়িতে থাকতে পারেন। অতিথি একরাত্রির বেশি নয়। ছেলেবেলায় দেখেছি আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যার একটু আগে দুই, পাঁচ, দশ কখনও আরও বেশি অতিথি আসত। আমাদের বৈঠকখানার সম্মুখে খানিকটা কাঁকা জায়গা ছিল তারা সেখানে বসত। আর আমাদের বাড়ি হতে যে যা চায়, কেউ চালডাল, কেউ ময়দা, ধী, আরও কি সব চাহত, বাড়ি থেকে দেওয়া হ’ত। সে সময় আটা জানা ছিল না। বাড়িতে মালশা থাকত। বাইরের একটা চালায় কাঠ থাকত। তারা তিনখানা ইঁট দিয়ে চুল্লী করে নিম্বের নিম্বের রাখত খেত। কার কার সঙ্গে মোহার তাওয়া থাকত। কারও সঙ্গে শালগ্রাম থাকত। রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে সেইখানেই থাকত, কখন ভোর রাত্রে চলে যেত আমরা জানতাম না। আমরা ~~সেই~~ অতিথি বলতাম। ধনী ভূমিদারদের অতিথিশালা থাকত। অতিথি বিমুখ করার কোনো ছিল না। কেউ অতিথির পরিচয়ও চাইত না। তারা ভীর্ণবাজী। সেই হ’তে বাংলা কথায় আছে ‘অতিথি ফকির’। আমাদের দেশে কাউকে ভিখারী বলা হ’ত না। ভিখারী শব্দ অপমানজনক। সকলে অতিথি। আর যারা অতিথি নয় বাড়িতে আসে, থাকে, তাদের কেউ বন্ধু, কেউ কুটুম্ব, কেউ অভ্যাগত।”

একদিন আমি বলেছিলাম—“আমরা একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা বলি। কিন্তু কোথাও ‘টা’ কোথাও টে, কোথাও ‘টো’ হয় কেন?”

দাহু এর নিয়ম বলে দিলেন :

“আমাদের ভাষায় শব্দের মৌখিক উচ্চারণে নিয়ম আছে। কোন শব্দের ‘ই’র পরে ‘আ’ থাকলে, ‘আ’, স্থানে ‘এ’ এবং ‘উ’ পরে ‘আ’ থাকলে ‘ও’ হয়। যেমন—পিঠা পিঠে, ইচ্ছা ইচ্ছে, সুবিধা সুবিধে, খুড়া খুড়ো, ভুতা ভুতো ইত্যাদি। তেমনই তিনটা তিনটে, দুটা দুটো। আচ্ছা তোমরা কি বল ?

‘চারটা’ না ‘চারটে’ ?”

“চারটে।”

“চারটে” কেমন করে হয়, ই কোথায় ? পাঁচটে তো বল না পাঁচটা বল। অতএব নিশ্চয় শব্দটা চারি, চার নয়। চারি শব্দের ‘ই’ ঈষৎ উচ্চারিত হয়। যার কান আছে সেই ধরতে পারে। নব্যেরা এই ক্ষুদ্র ভেদ বিচার করে না কিন্তু ২৪ পরগণার বাইরে গেলেই এইরূপ উচ্চারণের ক্ষুদ্র ভেদ শুনতে পাওয়া যায়।

বাংলা ভাষা উচ্চারণের আর একটা নিয়ম আছে। শব্দের আশ্রয় বর্ণে ‘অ’ এবং পরে ‘ই’ থাকলে অকার ঈষৎ ওকার উচ্চারিত হয়। যেমন আমরা লিখি—হরি, পড়ি হোরি; লিখি রসিক পড়ি রোসিক; অভিরাম, ওভিরাম; অপিচ, ওপিচ। কিন্তু নিষেধার্থে ‘অ’ ওকার উচ্চারণ হয় না।—যেমন—অমিত, অবিনাশ। তোমরা সমাসের অন্তর্গত ‘অ’ প্রায়ই লোপ কর। কেউ কেউ বলে বিশ্বক, বলা উচিত বিশ্বক। জনসম্ম, জনসম্ম নয়। এমন খুঁটি নাটি আরও আছে। ফলে ঠাঁড়াচ্ছে আমরা যা বলি তা লিখি না, যা লিখি তা বলি না। কতলোক যে অতীতকে অতীত্ বলে অমৃত কে অমৃত্ করে, বাংলাভাষা না শেখার দোষ। আমাদের ভাষা দুভাগ করতে পারা যায়। লৈখিক ভাষা ও মৌখিক ভাষা। পূর্বে লৈখিক ভাষাকে সাধুভাষা বলা হত। বাংলা সাধুভাষা শেখা খুব সোজা, কিন্তু মৌখিক ভাষা তেমন সোজা নয়।”

দাছ যে কত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন জানি না। আর কত লিখেছেন তাও জানি না। কিন্তু এমন স্বচ্ছ ও সরল ভাষা আর কারুর রচনায় দেখা যায় না। বিশেষত তিনি মৌখিক ভাষায় যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা আমাদের খুবই ভাল লাগে। কিন্তু চিন্তা ও ভাব প্রকাশ করা সহজ নয়। একবার, দুবার, তিনবার পড়েও বুঝতে পারি না।

আমরা সন্ধ্যার আগে তাঁর কাছে যেতাম। আর তিনি কত রাতের কথা বলতেন। এখন তিনি বিজ্ঞানিধি নন—সবাইকীর দাছ। যে-দিনই তাঁর কাছে গেছি কিছু না শিখে বাড়ি ফিরিনি। তিনি একা একা থাকলে গুরুগম্ভীর বিষয় চিন্তা করতেন। আমরা গেলে তাঁর মনের বিশ্রাম হত, মনের বিনোদনও হত। এই সময় তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করতেন মাঝে মাঝে। আশ্চর্য, আগে দাছ কখনও কবিতা লেখেননি।

বৃত্তার পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দাছকে ডক্টরেট উপাধি দিয়েছেন। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় ইতিপূর্বেই তাঁকে তাদের ডক্টরেট করেছেন। কিন্তু দাছর কাছে বিজ্ঞানিধি উপাধিই সবচেয়ে প্রিয়। যেদিন পুরীর পণ্ডিতসভা তাঁকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন সেদিন থেকে তিনি আর সব স্বদেশী ও বিদেশী উপাধিরাশি ত্যাগ করে কেবলমাত্র বিজ্ঞানিধি উপাধি ধারণ করবেন বলে স্থির করেন। আর সেই থেকে তিনি বিজ্ঞানিধি হয়ে আছেন। সবাই বলতেন ‘আঁপনি বিজ্ঞান নিধি’। তিনি বলতেন “বিজ্ঞাই আমার নিধি।”

জ্বলে

সমীর রায়চৌধুরী

‘এক যে ছিল জ্বলে আর ছিলো তার জ্বলেনী’—ছোটবেলায় নেত্যা পিসির কোলে বাধা রেখে শীতের সন্ধ্যায় লেপের গহ্বরে, শুনতাম যে রূপকথা, অনেকক্ষণ চলতো সে গল্প, মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়তাম। ঘুম যখন ভাঙতো তখন গল্পের প্রায় শেষ। হু’একবার হাই তুলে নেত্যা পিসি বলতো, ‘তারপর তারা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগলো।’

...তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। রূপকথার মানুষদের আজ চোখের সাননে দেখি। এইতো, অবনেশ ইলুসে-জ্বলে। ইলিস মাছের আসা-যাওয়ার মতোই ওঠানামা করে তার ভাগ্যের পারা। ঐশ্বের ছপুয়ে জ্বলেনী বসে সাদলা জালের মেরামতিতে। গত শীতেই অবনেশ কথা দিয়েছে, এবার বরষায় ইলিস এলেই রূপোর মল গড়িয়ে দেবে। কিন্তু, ভরষা কই। প্রসব উন্মুখ ইলিসের ঝাঁক কখন কেনন আসবে তার ওপরই জ্বলেনীর রূপোর মল নির্ভর করছে। অবনেশের কথা দেওয়ায় কি আসে যায়।

লালগোলায় মাজবুর। পদ্মার চেউএর মতোই পদ্মার সাথে তার জীবনের ছন্দখানি বাঁধা। পোনার ডিম ধরা আর বেচাই তার সারা বছরের অবলম্বন। মাজিবুরের নিকট হতে ডিম কিনলেই হঠাৎ একমুঠো পদ্মার মাটি তুলে তড়াক করে ফেলে দেবে ডিমের হাঁড়িতে। কারণ দ্বিজঙ্গা করলে বলে, ‘তুক ওটা, খোদার লজ্জর থাকবে’। আনি ভেবে মরি এ্যালক্যালিনিটি না এ্যাসিডিটি, টারবিডিটি না টেম্পারেচার।

আর ছেরামপুরের কৈলেশ। তপসের তপস্বী। তপসে মাছের জীবনের ভেতরকার সুরটি কোথা হতে যেন শুনতে পেয়েছে। কেন, কি করে অতো তপসে ওঠে তার হাতে সে-কথা সে বোঝাতে পারে না। কিন্তু, কোলেবাজারের আড়তদারও তা’ জানে, তপসে মানেই কৈলেশএর দল।

নেদো তো চম্পিশেই বরঝরে। নোকার পাটাতনের মতো পাঁজর ক’খানা গোনা যায়। নদীর জল বরষার স্রোতে পথ হারিয়ে দূরে তীরের বিলে গিয়ে যেমন হাঁফিয়ে ওঠে, নেদোর বুকেও তেমন জল জমেছে। দুটো কথা বলতেই গলা শুখায়। জ্বলে ওঠা কাংলার মতো কিছুক্ষণ শুঁকবড় করেই ধোঁমে যায়। তবু ইঁটে-ভর-দেওয়া তেপায়া বাটে শুয়ে, তার খোঁজ নেওয়া চাই, ‘ছৈতো কুটো ইয়নি, ডিজিটা ঠিক আছে তো।’

কাঁধ নাচিয়ে, হাত ঘুরিয়ে হাঁড়ির জলে ছলাৎ ছলাৎ চেউ তুলে পোনার বীজ বিক্রী করতে আসে সব ঝালদায়। বাপপিতানো’র কাছে দীক্ষা নেওয়া এ তখন জ্বলে চেউ না তুললে ডিম বাঁচবে না। হাঁড়ির পোনা-শিশুগুলোকে নদীর গান শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখা।

ভারতের প্রধান প্রধান নদীগুলোর হু’তীরে, সমুদ্রতটবর্তী অঞ্চলে আর প্রণালী বা হ্রদগুলোর নিকটেই ছড়ানো এই মাজিবুর কৈলেশদের পাড়া। এরা বাস করে স্থলে কিন্তু, জলের সুরেই এদের জীবন ভরা। হয় তো জল আর জালের ভরষায় এদের জীবন চলে বলেই নাম এদের জ্বলে। সারা ভারতময় এরা প্রায় পাঁচ লাখ। পরিবারের সকলকে হিসেব করলে প্রায় আট লাখ। এদের ভবিষ্যতের ওপরেই

আমাদের কোটি কোটি রান্নাঘরের, ঝালুদে, কালিয়া বা বে-বাড়ীর ঝ্যাঁচড়া নির্ভর করছে। অথচ, নেত্যা পিসির গল্পের মতো শেষ নেই এ বাস্তবের। এক কেন, বহু জ্বলে আর জ্বেলনীকেই দেখলাম। কিন্তু ‘স্বপ্নে স্বচ্ছন্দে.....,’ নেত্যা পিসির মতো হাই ভুলে কারা যেন সে গল্পের এমন শেষ হতে দেয়নি।

এদের নোষানের সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার মাত্র। গড়ে সাতজন প্রতি একটি করে। অর্থাৎ, কারো ঝাল আছে ডিঙ্গি নেই, ডিঙ্গি আছে ঝাল নেই। কিংবা হয়তো কিছুই নেই, আছে শুধু হাতের বাত্ন আর মহাজনের ডরবা।

পশ্চিম বাংলায় এরা মোটামুটি চার সম্প্রদায় ভুক্ত। বালা, পাটনি, তিয়ার আর মালো। তিয়াররা মাঠে ধানও বোনে আর এক এক দলের অভিজ্ঞতা অমুযায়ী বখন বখন মাঠের ডরবা থাকে না তখন জ্বলে নামে। পাটনিরা হালের হালং হাড়ে হাড়ে বোঝে। তাছাড়া মাছের খবরও রাখে। মেঘের রঙে আকাশের ইসারা পায়, হাওয়ার সুরে মেঘের শ্বর শোনে। বালারা পালা দেয় সবক্ষেত্রেই। হাল, দাঁড়, ঝাল, ঝাল সবই এদের রপ্ত। কালবৈশাখার বিকেলেও আকাশের ভয়ে এরা বেপরোয়া। মালোরা হলো উপজাতি। মতামত হিন্দুয়ানী। বিষ্ণুপুজো করে আবার মৃতদেহের সমাধিও দেয়। জ্বেলগিরিই এদের পেশা। পাহাড়ী শ্রোতের স্বচ্ছ জ্বলে এদের বর্ষার নিশানা কখনও ভুল হয় না অবিশি, অর্জুনের মতো ভাগ্যে দ্রোপদী জ্বোটেনা।

যে জ্বল যত লোনা সে জ্বলে বাছুরা ঠিক সেই অমুপাতেই লোনা ঘাম ব্যায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। যেন অস্তরের যোগাযোগ। কিন্তু এতো যারা পরিশ্রমী, এমন যাদের গুণ তারা কেন সদা নিঃস্ব। নসিকির কুই আর সাতসিকির ট্যান্ডরা তবু কেন ধর নেওয়া এদের ধারা। নেত্যা পিসির মতো হাই ভুললো কারা।

এদের আছে ঢেউএর মতো উচ্ছ্বাস, ভীরের প্রতি অবজ্ঞা, ঘোয়ারে সে মস্ত যদিও ভাঁটায় সে মহাজনের করতলগত। মাছের খবরের সাথে সুগের খবর সে ঠিক রাখেনি। মহাজনের হাইতোলাতে পালে হাওয়া লাগে, যদিও বুনেরাঙের মতো ধরা পড়ে ডিঙ্গির সঞ্চয়। জনসাধারণের অবহেলা, সরকারী লাল ফিতের আড়ষ্টতা, মহাজনের দ্বিতীয় পক্ষের প্রেম সব এক জ্বোট হয়ে এদের এমনটিই করে রেখেছে।

মহারাজ শান্তনুর নাকি ভালো লেগেছিলো এক মৎস্তাগন্ধা ধীবরকন্ডাকে। বৃদ্ধ বয়সে জ্ঞানশক্তি লোপ পেয়েছিল কিনা সন্দেহ হয়—মেছোবাকারে গেলে অবিশি তাই মনে হয়। অবিশি, বোম্বাই শহরের ক্রফোর্ড মার্কেটের দ্বিতলে, বোম্বে সিঁকগাড়ী পরে ধোঁপায় বেলকুল গুঁজে বে মেয়েটি পমফ্রেট বেচতে বসে তার মতো ছিলো কিনা বলতে পারি না। এমনি অসামঞ্জস্যময় অবস্থা ভারতীয় জ্বলেদের। ক্রফোর্ড আর বৈঠকখানা বাজার যেন আকাশ-পাতাল তফাৎ।

কিন্তু, নেত্যা পিসির রূপকথাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে এই বেটনীকে গড়ে ভুলতে হবে সুগপোযোগী আর মজিবুর-নেদোদের স্বার্থমত ধাঁচে। মিটিয়ে ফেলতে হবে অসামঞ্জস্যতা। তবেই ফলবে লোনা জ্বলে সোনা। মৎস্ত বিকাশের যে কোনো যোজনাই হোক না কেন এদের উপেক্ষা করে বা লাল ফিতের শেকলে বাধন দিয়ে কিংবা আধুনিক ভুরো চমক দিয়ে তা’ সফলকাম হতে পারে না ॥

। গ্রন্থ-পরিচয় ।

দ্বিতীয় জন্ম : অসীম রায়, বাক, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা ; দাম : তিনটাকা ।

বাঙলা উপন্যাসে মনন ও বিশিষ্টভাবে নতুনদিক থেকে জীবনদর্শন গড়ে তোলার জন্য যদি কেউ এগিয়ে এসে থাকেন এবং যদি তিনি একালের নব্য বাস্তবতার থেকে উদ্ভূত কোনো কথা তুলে ধরতে চেয়ে থাকেন, এবং আমরা যদি সঠিকভাবে আরো একটু নৈব্যক্তিক যুক্তির শরণাপন্ন হই, তাহলে অসীম রায়কে আমরা পেতে পারি ।

মননের চর্চা বা নতুন দর্শন বলার বৌক থেকে যদি অসীম রায় কিছু বলতেন, সেটা বোধহয় মাত্র চমকানি হয়ে থাকত, আশপাশে তেমন অস্থিরতার ছটলা সৃষ্টি করতে পারতেন না । বা অস্থির ছটলার কথা আমরা জানতে পারতাম না । একটু মোটা কথায় বলতে গেলে বলতে হবে অসীম রায় জীবনকে এক নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতায় দেখাতে চেয়েছেন । অনেক চরিত্রের অরণ্যে হারিয়ে না-গিয়ে বা কেবলমাত্র একটি দৈর্ঘ্যতায় আবদ্ধ না থেকে তিনি যে কাহিনী দিয়েছেন, তা একটু অন্তর্ধরনের ।

সোনা কাহিনীর কথকের কলেজ জীবনের হারিয়ে-যাওয়া বন্ধু । কোনো এক গানের জলসায় তাকে নতুন করে তিনি পান । এবং অল্পসময়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠও হয়ে যান । তাঁর কাছেই জানতে পারা যায় সোনার জীবনের দারুণ মর্মান্তিক কাহিনী । কোনো রাজনৈতিক মিছিলে থাকায় পুলিশের গুলিতে তার কুসকুসটা জখম হয় । সেই থেকেই তার ডানদিকের কুসকুসটা ফাটা । কিন্তু অদ্ভুত তার বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা । ঐ ফাটা কুসকুস নিয়ে সে জীবনটাকে বাঁচার গনগনে ইচ্ছায় ডুবিয়ে দিতে চায় । একটা তোলপাড়করা বেঁচে থাকার ইচ্ছার অস্তিত্ব সে তার হাতে, মুখে আর কালো চওড়া বুকে সর্গর্বে জাহির করতে চায় । কঠিন রক্তশূন্য তথাকথিত বাণিজ্যিক বাস্তব তার কাছে হয় ও অস্বীকৃত । কথক তার এই জীবনদর্শন গ্রহণ করতে পারেন না । কলেজজীবনের আইডিয়াল তাঁর কাছে নিতান্ত বালশূলভ বলেই মনে হয় । এও তাঁর কাছে মনে হয় আসলে সোনা সেই তার পুরানো জীবনেই রয়ে গেছে । গুলিতে-ফাটা কুসকুস ও পোকায় কুরে কুরে-খাওয়া বুক নিয়ে যে-ব্যক্তি বেঁচে থাকে, সে বোধহয় এই বাস্তবটাকে ভয় করে এড়িয়েই চলতে চায় ।

সে চলুক কতি নেই । কিন্তু তার একাও টাল সামলাতে হয় এই সোনার মাকেই । যেখান থেকেই হোক তাঁকে সবসময় ব্যস্ত হতে হয় সোনার ওপরে কোনোরকমের আক্রমণ ঠেকাতে, ভাঙতে এবং তাকে নির্জীব করে দিতে । যেই হোক পার প্রাবেনা তাঁর জলন্ত ভয়ানক নিষ্ঠুর আক্রোশ থেকে । আরো আশ্চর্য লাগে মিস্ট্রকে । সে যেমন করেই হোক একটা জীবন ধারণের উপায় করে নেবে । অন্তকোনো রঙীন ঝুলি তার নেই, তারই মায়ের কাছ থেকে-পাওয়া মজোলীয় চোখে । কী ভয়ানক ঝকঝকে শাদা, প্রয়োজনের তাগিদে কী রকম নিষ্ঠুর নগ্ন । বোধহয় রমেনদার প্রভাবে এইরকম একটা অবস্থা তৈরী হতে পারে । রমেনদার জীবনে অন্তকোনো কথা নেই, ঝাকামি নেই—শ্রেফ টাকা আর টাকা । অন্য প্রয়োজনেও তার একই

রকমের বেআজ্রপনা। কথক সহ করতে পারেন না একে যেমন পারেন না মেঘদাদামণি সীতেশের তথাকথিত খ্রীষ্টীয় পাপ-পুণ্যের তথকথা। এরই মাঝে সকলকে সরিয়ে সোনা যেখানে থাকে, সেটা হোল একটা তুমুল লণ্ডভণ্ডের সংসারের দারুণ দারিদ্র্যের চৌহদ্দি পেরিয়ে, দমবন্ধ বাড়ির কাছে ফুরফুরে হাওয়া ছোট্ট পার্ককে পাওয়ার মতো কবিতার রাজ্যে। ওপরে আকাশ, আকাশে সজ্জিত মেঘ। কিসের প্রার্থনায় তার চিন্তারাজ্য তোলপাড় খায়। কথক সহ করতে পারেন না এই চিন্তাকে, এর এই অন্তায়রকমের তোলপাড়কে। যদিও একদিক থেকে দেখতে গেলে তিনি সোনার অকৃত্রিম বন্ধু। আর্থিক সাহায্য থেকে হয়তো অনেকখানি অন্তরিক্তেও যথেষ্ট সহানুভূতি ছিটিয়েছেন। কিন্তু কথক মানতে রাজী নন তার এই নতুন করে বাঁচার দ্বিতীয় পর্যায়কে। কেমন করে তিনি বুঝবেন সোনাদের।- সোনার চাকুরী নেওয়ার ফলে এই বিরোধ আরো তীব্র আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এবং সত্যিসত্যিই তিনি সোনাদের বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দেন। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তাঁর বাবার পরামর্শ মতো সমুদ্রে বেড়াতে যান। অবিশিষ্ট এর আগে বিয়ের কথা ওঠায় জটনকার ছবি দেখে তিনি একটা সায়ও বোধহয় দিয়েছিলেন।

সমুদ্রে তিনি ঘটনার ফেরে একবারে নিশ্চিত মরণের হাত থেকে রেহাই পান। সেই মরণে তাঁর একবারে সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা হয়। বেঁচে থাকার জন্ত নিদারুণ তীব্রতা সেই মরণ—চেউয়ে নাকানিচোবানি খেতে খেতে, তিনি অমুভব করলেন। মানুষ, অতীত স্মৃতি, সমুদ্র, বালি আর সেই চাঁদনির রাত সত্তার গভীরে মিলেমিশে যে ছবিটা তাঁর কাছে নিয়ে এল তা আদি ও অকৃত্রিম কথা, বাঁচতেই হবে। এরপরেও আরো একটা ঘটনা তাঁকে বোধহয় স্তম্ভিত করে দেয়, সেটা সোনার মায়ের চিঠিতে সোনার মৃত্যু সংবাদ ও তার জন্তে তাঁর প্রাপ্য অনন্তকালের অভিষাপ। কাহিনী এইখানেই শেষ।

এবারে কিছু প্রশ্নের কথা। প্রথমত যে-ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিকে আমরা উপন্যাস হিসাবে চিনি, একে তা বলব কিনা। মোরিয়াকের কোনো কোনো উপন্যাসের ধাঁচের সঙ্গে যদি কোনো সাদৃশ্য থেকে থাকে তা এখানে আলোচনা করা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করি।

দ্বিতীয়ত জায়গায় জায়গায় তাঁর শব্দযোজনা ও গভীর অর্থসৃষ্টি যেমন ইঙ্গিত অমুভূতির চরমরাজ্যে পৌঁছে দিতে পারে, আবার কোনো কোনো জায়গায় সেভাবে মোটেই পারে না। ঘটনাপ্রসঙ্গে সমুদ্রের বর্ণনা আশ্চর্যভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু নির্জনহৃপুরে মিল্লুর সঙ্গে যে কথাবার্তা হয় তা সত্যিই মেকী বলে মনে হয়। এই ধরনের লোকের মুখে এই কথাগুলি ঠিক মানায় না। আর একজায়গায় ভয়ানক চোখে লাগে—যেহেতু ইয়োৰোপীয় পারিবারিক সম্পর্কের ধারায় আমাদের মন প্রবাহিত নয়, সেইজন্তে ছেলে ও বাবার বন্ধুর মতো দরাজ কথাবার্তাকে বেশখানিকটা বানানো বলে মনে হয়। অন্তত ছবি দেখে মেয়ে বিচার করার সময়ে, তাঁর জীবনের কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনার অপ্রয়োজনীয় প্রকাশকে সত্যিই অপ্রকাশ করলে ভালো হত।

আরো একটা কথা। অসীম রায়-এর এই “অস্তিত্ববাদের” সাদৃশ্য যদি কেউ সার্তর-কামু (পরে সার্তরের সঙ্গে কামুর পার্থক্য) প্রবর্তিত অস্তিত্ববাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে থাকেন, তা অমুভাবে ভাবার যথেষ্ট যুক্তি আছে বলে মনে করলে নিশ্চয়ই ভুল করা হবে না বলেই ধারণা করা যায়।

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

চ্যাম্ কুড়্ কুড়্ : অনিয়ভূষণ চক্রবর্তী ও জ্যোতিভূষণ চাকী । প্রকাশক :
স্বমুদ্রণ, ১৩৬বি, আন্তোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫ । দাম এক টাকা আট আনা ।

কচি কচি মুখে হাসির ফুলঝুরি ঝরাবার জন্তে ছড়ায় আর ছবিতে ভরতি
বইখানি । ভূমিকায় বলা হয়েছে, “শিশুর কল্পনাকে জাগাবে এমন ছড়া এ বইতে
অনেক আছে । সে ছড়া পড়ে শিশুর মন চলে যাবে অনেক দূরে । নিজের চারপাশের
জগৎটাকে শিশুর ক্রমে ক্রমে ভালো করে চেনা উচিত । নীল আকাশ আলোয় আলো ।
আবার হঠাৎ মেঘে মেঘে কালো । তারপর ঝুটি ঝন্ঝন্, বিছাৎ ঝিকমিক আর কড়কড়
বাজ । কখনও আকাশে ঝড়, কখনও ঝিরঝিরে নিষ্টি হাওয়া । মাটিতে ফুল ফল
ফসল—সবুজে সাদায় সোনালিতে ঝলমল । তারই পাশে ঝল টলন্, চেউয়ের নাচ,
আলোর নাচ ।”

সত্যিই তাই । শিশুর মনোজগতে আছে কল্পনার এক আদিম উষা । ছড়া ও
ছবির প্রভাব সেখানে বড়ই নিবিড় । চারদিকের ধ্বনিময়, রূপময় জগতের সংগতি
বোঝাবার জন্তে এগুলির প্রয়োজন অনস্বীকার্য । ছড়া পড়তে পড়তে এবং ছবি দেখতে
দেখতে শিশু ক্রমেই পৃথিবীর অনেক অর্থ খুঁজে পায় । শুরু হয় ক্রমে ক্রমে কল্পনার
উন্মীলন ।

‘চ্যাম্ কুড় কুড়’ বইখানিতে সুন্দর সুন্দর ছড়া যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে
ঐশ্বর্যময় সাহার আঁকা অনেক মজার মজার ছবি । শুধু আনন্দই নয়, তার সঙ্গে শিক্ষণীয়
বিষয়ও পরিবেশন করা হয়েছে বইখানিতে । ঐরখীন্দ্র মৈত্রের আঁকা প্রচ্ছদপটও
সুন্দর ।

ছড়া ও ছবির এই বইটি থেকে নমুনা স্বরূপ দু’টি চমৎকার ছড়া উপহার দিচ্ছি ।

‘তোমার মুখটি যেন ফুল,
চারদিকে তার লতিয়ে-পড়া তুল ।
হওনা আমার খেলার সাথী,
খেলব মোরা দিবসরাতি ।’ (অনিয়ভূষণ চক্রবর্তীর রচনা)

‘একটি গাছ শুধু
একটি গাছ চাই
গল্প-ঝুমঝুম গাছ ।
সেখানে সারাদিন
ভোমরা গুন্গুন্
রাত্রে জোনাকির নাচ ।’ (জ্যোতিভূষণ চাকীর রচনা)

রামেন্দ্র দেশমুখা

ওগো শুনাছো ? : কাহিনী : পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় ; পরিচালনা ও সম্পাদনা : কমল গঙ্গোপাধ্যায়, সংগীতপরিচালনা : অনিল বাগচী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : বিধায়ক ভট্টাচার্য, আলোকচিত্রগ্রহণ : অনিল গুপ্ত, শব্দগ্রহণ : রূপেন পাল, ভূমিকায় : মঞ্জু দে, পদ্মা দেবী, শোভা সেন, সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, তুলসী চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে ।

নাম শুনেই কারো বুঝতে বাকী থাকে না যে এটি হাসির ছবি । হাসির ছবির সবচেয়ে বড়ো জিনিস হল কৌতুককর পরিস্থিতির সুসংলগ্ন প্রবাহে রসস্রষ্টার মাধ্যমে কাহিনীর একটানা গতিবেগ সৃষ্টি করা । তার জন্যে প্রয়োজন ঘোরালো কল্পনাশক্তি এবং তার সূচু প্রয়োগ । এ না করতে পারলে ছবির গতিহীন যায় থিনিয়ে—ফলে ছবির মুখ্য উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয় । এ ছবিতে তাই হয়েছে কতকটা ।

মূল কারণ কতকটা কাহিনীর দুর্বলতায়, কতকটা পরিচালনায় সূক্ষ্ম উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে ।

কাহিনীর গতি একটানা হাসির উপযোগী নয় । হাস্য-কৌতুকের সংগে সিরিয়াস ঘটনার বিশেষ হওয়ায় এবং সেই ঘটনা পরিবর্তন সিরিয়াসনেসের পর্যায়ে পড়ায় হাস্য-কৌতুক মাঝ থেকে একেবারে উধাও হয়ে গেছে অনেকগুণি স্থান জুড়ে । যেখানে হাসির নামগন্ধই অনুভূত হয় না । তাই এ ছবিতে বাঙলার নামকরা কমেডিয়ানদের একত্রিত করা সত্ত্বেও এটি একটি সত্যিকার হাসির ছবি হয়ে উঠতে পারে নি । তবু একথা বলা যায় যে গতানুগতিক হাসির বাজ্রে ছবির তালিকায় একে একেবারে ঠেলে ফেলা যায় না । কয়েকটি চরিত্রের সু-অভিনয়ে এবং কিছু সম্ভাব্য মজার ঘটনায় ছবিটির প্রতি দর্শকের যে কৌতুহল সৃষ্টি হয় তাই শেষ পর্যন্ত কাহিনীকে বাঁচিয়ে রাখে ।

গল্পাংশ মোটামুটি এই : শ্রী স্বামীর প্রতি হঠাৎ একদিন সন্দেহ হয়ে উঠলো । অফিসের একটি টাইপিষ্টার (মেয়ে) প্রতি সন্দেহ । মজার ব্যাপার স্বামীর সেই অফিসেই শ্রী একটি চাকরী পেল । এ অফিসে স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে চাকরী করা নিষিদ্ধ । স্বামী বড়বাবু, শ্রী মালিকের সেক্রেটারী । সুতরাং ব্যাপারটা কেম-মজার হোল বুঝুন । কেউ কারো পরিচয় দিতে পারলো না । দু'জনের মধ্যে অফিসের ব্যবহার অজানা লোকের মত । একদিন হোল কি—মালিক বাইরে বেড়াতে যাবেন কিছুদিনের জন্যে । যাবার আগে অফিসের সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন । মালিকের হুকুম—প্রত্যেক কর্মচারী যেন স্বামী-স্ত্রীতে আসে । নইলে চাকরী যাবার সমূহ সম্ভাবনা । এদিকে বড়বাবু মহোদর ও তার শ্রী সেক্রেটারী মলিতা কিন্তু মন কষাকষির

অন্তে একবাড়িতে থাকে না। থাকলে তাকে জী বলে পরিচয় দিলে তো চাকরী যাবে। সুতরাং উপায়? একটি মেয়েকে ভাড়া করে জী সাজিয়ে মালিকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত তাই নিয়ে এক তুমুল বিবাহ। মজাদার পরিস্থিতির উদ্ভব এবং সমস্ত কাঁস হয়ে যাওয়ার পর মালিক-এর মত বদলে যাওয়া অফিসের নিয়ম সম্বন্ধে। মধুরেণ সমাপয়েৎ আর কি।

ছবিটি ধৈর্য ধরে দেখার জন্যে যে ছ'টি চরিত্রের প্রধান আকর্ষণ, মনোহর আর ললিতা, এই ভূমিকাগুলিতে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও মঞ্জু দে। তারপরই উল্লেখ করতে হয় জহর গাঙ্গুলী, পদ্মা দেবী, শোভা সেন, ডান্নু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জহর রায় প্রভৃতির। অল্পকুমারের অভিনীত চরিত্রটি ঠিকমত চিত্রিত না-হওয়ায় অল্পকুমারকে ভাল লাগে না। লেডী টাইপিষ্টের ভূমিকাটিও অসংগতিপূর্ণ। সুমিতার অভিনয় প্রতিশ্রুতিপূর্ণ।

সংগীতাংশ প্রশংসনীয়। ফটোগ্রাফী ও শব্দগ্রহণ মন্দ নয়।

হারানো সুর : পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণ : অজয় কর, শব্দগ্রহণ : অতুল চাটার্জী, বাণী দত্ত, নুপেন পাল প্রভৃতি, শিল্পনির্দেশক : সুনীতি মিত্র, সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চাটার্জী, সংগীতপরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ভূমিকায় : উত্তম, সূচিত্রা, চন্দ্রাবতী, কাজরী গুহ, শ্রাবণী চৌধুরী, পাহাড়ী, উৎপল, দীপক এবং আরো অনেকে।

উত্তমকুমার প্রযোজিত 'আলোছায়া প্রোডাকশন্সের' হারানো সুর অজয় করকে পরিচালক হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাবার উজ্জ্বল নিদর্শন। 'হারানো সুর' একটি বিদেশী কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে রচিত হলেও বাঙালী সতী-সাক্ষী নারীর একটি চিরন্তন আদর্শ এর মধ্য রূপ পাওয়ায় বাঙালী দর্শকের কাছে বিশেষ এক আবেদন নিয়ে ছবিটি হাজির হয়েছে। এবং সেই আবেদনকে পরিস্ফুট করার কাজে ছায়াছবির আঙ্গিকগত দিক থেকে কলাকৌশলের কাজগুলি যথাসম্ভব নিষ্ঠার সংগেই যে পরিচালক সম্পাদন করেছেন সে-চিহ্ন ছবির মাঝে সুস্পষ্ট।

দুর্ঘটনায় স্মৃতিভ্রংশ অবস্থায় মানসিক হাসপাতালে অলকের সংগে ডাঃ রমার পরিচয় এবং ঘটনাপরম্পরায় দু'জনের মধ্যে প্রণয় এবং বিবাহ। বিবাহের পর আরেক দুর্ঘটনায় অলকের পূর্বস্মৃতি ফিরে পাওয়ার সংগে সংগে নতুন জীবননাট্যের শুরু। রমাকে অলকের একেবারে ভুলে যাওয়া এবং স্বামীকে ফিরে পাবার জন্যে রমার অলকের বাড়িতেই তার ভাগ্নীর গভর্নেন্স হয়ে চাকরী করতে এসে বাঙালী মেয়ের যে-ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের পরীক্ষা চলে সেটুকু বেশ নাটকীয় এবং সুন্দর। কিন্তু পরিশেষে অলকের মাতা কর্তৃক অপমানিত হয়ে রমার গৃহত্যাগের পর অলকের উদ্বাস্থ্যায় ছুটে যাওয়া—এ-পর্যন্ত স্বাভাবিকতা বজায় থাকলেও, শেষে আবার অলকের রমা সম্পর্কে স্মৃতি ফিরে পাওয়া স্বাভাবিকতার পর্যায়ে পড়ে না। গল্পের এই অংশটুকুর বুনন দুর্বল হলেও রমার স্বামী ফিরে পাওয়ার মধ্যে ধর্ম এবং সত্য

যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে—তাতেই বাঙালী দর্শকচিত্ত তৃপ্তিলাভ করে। গল্পের ক্রটি, দৃশ্যপটের ক্রটি (যেমন পলাশপুর ফুলফোটা গাছের তলায় প্রেমের দৃশ্যটি—পটসজ্জার কৃত্রিমতায় প্রকট) প্রভৃতি খুঁজতে গেলে অনেক খুঁত বার করা যাবে—কিন্তু বর্তমান সমালোচক তা থেকে বিরত থাকছেন এইজন্যে যে, এমন একটি অলৌক কাহিনীকে পরিচালক যে-ভাবে যে-গতিতে যে-ছন্দে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তার জন্যে যেটুকু বাহাহুরী প্রাপ্য তা সব ক্রটির উপর স্বীকার করতেই হবে। পরিচালকের প্রয়োগকৌশলগত নিষ্ঠা স্বীকার করে আর একটি ক্রটির মাত্র উল্লেখ করছি। সেটি হচ্ছে রমার পিতার চরিত্রটি। এই চরিত্রটির নিজস্ব সত্তা বলে কিছুই নেই। রমা চরিত্রটির প্রতি বেশী প্রাধান্য দিয়ে এই চরিত্রটিকে অত্যন্ত খর্ব করা হয়েছে, ফলে চরিত্রটি চিত্রনাট্যকারের হাতের পুতুলের মতই দেখা দিয়েছে সর্বত্র। এই চরিত্রটিও গল্পাংশকে কিয়ৎপরিমাণে দুর্বল করার জন্যে দায়ী। এবং সেজন্যই এর উল্লেখ।

দরকার হলে পরিচালককে চিত্রনাট্য পরিবর্তন করতে হয় বা করাতে হয়। কারণ সমস্ত চিত্রটাই একটা বৈজ্ঞানিক কৌশলের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করে। সেই কাজটাই হল চিত্রপরিচালনার প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আর 'এ্যাকসন এবং মুভমেন্ট' হল ছবির আসল জিনিস। সেই জিনিস পুরোপুরি বজায় রাখতে হলে সর্ববিষয়ে প্রয়োগনিপুণতায় সামঞ্জস্য আনা বিধেয়। ছবির সেই 'এ্যাকসন ও মুভমেন্ট' ব্যাহত হয়েছে চিত্রনাট্য সুসংহত না হওয়ায়। তা যদি না হোত তাহলে এই ছবিতেই পরিচালককে কীতিমান বলে ঘোষণা করা যেত। তা না করা গেলেও পরিচালককে এ-ছবির জন্যে প্রাপ্য সাধুবাদ জানাতে কোন কুঠাবোধ করছি না।

সুচিত্রা-উত্তমের অভিনয় এ-ছবির বিশেষ সম্পদ। সুচিত্রা তার আবেগকে সুসংহত করে এত স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন যা তার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয় বলে বিবেচিত হবে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। উত্তমের অভিনয়ও উৎকর্ষতায় উজ্জ্বল। দীপক ও কাজরী গুহের অভিনয় চরিত্রাঙ্গুগ। আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য অলকের ভাণ্ডীর চরিত্রে ছোট্ট মেয়ে শ্রাবণীর অপূর্ব সুন্দর অভিনয়।

গান আছে ছ'টি। ছ'টিই সুপ্রযুক্ত এবং সুগীত। অজয় করের ক্যামেরার কাজ তাঁর পূর্ব সুনাম বৃদ্ধি করার মত। শব্দগ্রহণও প্রশংসনীয়।

কিতনা বদল গ্যায়া ইনসান : প্রযোজনা : মর্ডার থিয়েটার্স, পরিচালনা : আই. এস. জোহর, সংগীতপরিচালনা : হেমন্তকুমার, ভূমিকায় : অজিত, কমলজিত, হরবংশলাল, গোপাল, আই. এম. জোহর, নজিনী জয়ন্ত, রীতা এবং আরো অনেকে।

গেঁজাকলারে তোলা রঙীন এই ছবিটির গল্পাংশ কোন একটি বিদেশী ছবির অনুকরণে রচিত এ কথা বলা যায়। সাধারণ আর পাঁচটা হিন্দী ছবির মত নাচ-গান হৈ-হুল্লোড় আছে কিনা যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলতে হবে,—নিশ্চয়ই আছে,

সাধারণ ছবির চেয়ে একটু বেশি মাত্রায়ই আছে এতে । এবং নাচ-গানই এ-ছবির একমাত্র মূলধন । একেবারে শালীনতাবঞ্চিত নাচ নয় এখানেই নাচগুলির বৈশিষ্ট্য । ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নাচ—ক্লাসিক থেকে লোকনৃত্য পর্যন্ত সব কিছুই পরিবেশিত হয়েছে এবং ছবিটি রঙীন হওয়ায় দৃশ্যসম্ভার এবং নৃত্যাংশ উপভোগ্য । যদিও ফটোগ্রাফিক দৃষ্টিকোণ অনেক জায়গায় দুর্বল এবং দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার টেকনিক সর্বদাই দর্শকচোখে পীড়াদায়ক । গান আছে সাত আটখানি কিন্তু ছ'একখানি ছাড়া অধিকাংশই নুতনত্ববিহীন, সুরসৃষ্টির দিক থেকে একথা অত্যন্ত দুঃখের সংগেই বলতে হচ্ছে । অভিনয়ে একমাত্র উল্লেখ্য নলিনী জয়ন্ত । পরিচালক নিজেও অবতীর্ণ হয়েছেন একটি ভূমিকায় কিন্তু ভবিষ্যত প্রতিশ্রুতির কোনো স্বাক্ষর রাখতে পারেননি ।

পরিচালককে এ-ছবিতে একটা জিনিস সম্পর্কে খুবই সচেতন দেখা গেল । নলিনী জয়ন্তকে শান্তির ভূমিকায় যে-অংশে ছলাকলাময়ীরূপে দেখানো হয়েছে এবং অন্যান্য সুন্দরীদের ঠমক-ঠামকের সুযোগ যেখানেই রয়েছে, সেখানে পরিচালক রীতিমত স্মার্ট যৌনআবেদন পরিবেশন করেছেন । নাচ-গান এবং যৌনআবেদনের উপর ভরসা করেই যে এ-ছবি তোলা হয়েছে, একথা একবাক্যে যেমন বলা যায়, তেমনি যে-দর্শকশ্রেণীর মুখ চেয়ে এ-ছবি তোলা, তারা অবশ্যই আনন্দ পাবে, এ গ্যারান্টিও নিঃসংশয়ে দেওয়া যায় ।

॥ চিত্রালাপী ॥

অগ্রণী

। দশম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ॥

বক্ষত্রেব জগ্ন

অশোক মৈত্র

গণেশ মাইতি আমার কাছে আসত। প্রথমে বুঝতাম না আমার মত একজন শহরে ভদ্র যুবকের কাছে এসে প্রত্যহ বিকেলে প্রায় বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে গণেশ মনের কি ক্ষুধা মেটায়। তার চেয়ে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর আড্ডায় সাদোপাদদের সঙ্গে বসে তাড়ি আর খিস্তির মধ্যে মনটাকে মজিয়ে রাখলেই তো পারে। কিন্তু একদিন যখন আবিকার করলাম মানুষ যতক্ষণ না তার মনের মূর্তবাসনাটির সঙ্গে একাত্ম হতে পারছে ততক্ষণ তার মনটা শূন্য হাহাকারে ভরা, সেইদিনই বুঝলাম গণেশ-চোখ গণেশ আর কোথাও না-গিয়ে, আমি যখন কাছ থেকে ফিরি আমারই অদূরে মাটির ওপর বসে চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে সামনের রাস্তাটার দিকে। আমি তখন সাহাজাদাপুর স্কুলের মাষ্টারমশাই, সব বি-এ পাশ ক'রে গিয়েছি। গণেশ মাইতির সঙ্গে যেমন করেই হোক একদিন আমার পরিচয় হয়ে যায়। প্রথম দর্শনেই ওকে আমার ঠিক অসুত নয় কেমন আশ্চর্য অস্বাভাবিক একটা চরিত্র মনে হয়েছিল। সেই স্তম্ভবর্ণ দীর্ঘ চেহারা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কপালে অসংখ্য বলিরেখার নিচে দুটি বলিষ্ঠ জ্বর অন্তরালে স্নান বিষণ্ণ দুটি চোখ। ওর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে চোখাচোখি হলেই নির্বোধের মত হাসত। হু'একটা কথা বিনিময়, তারপর আবার ওর দৃষ্টি মেলে ধরত অনেক দূরে। সামনের রাস্তা পার হয়ে মাঠ, তারপর সেই সুদূরপ্রসারী দিগন্ত। বইয়ের ওপর চোখ রেখে গণেশের সাংসারিক জীবনটার কথা ভাবতে চেষ্টা করি। কোনোদিন লোকটাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। নিশ্চয়ই ওর বউ ছেলে, এমন কি, নাতি-নাতনীও থাকে অসম্ভব নয়।

আচ্ছা গণেশ, বাড়িতে তোমার কে কে আছে।

ভেবেছিলাম গণেশ বোধহয় সংসারের কথায় মুগ্ধ হয়ে উঠবে। যে-লোকটাকে একেবারে কথা বলাতে পারিনি এইবার তার বকুনির জ্বালায় কিছুক্ষণের মত ক্লান্ত হয়ে পড়ব। কিন্তু অপেক্ষা করার পরও গণেশ কোনো কথা বলল না। আমি অবাক হয়ে বই থেকে মুখ তুলে ওর দিকে তাকলাম, দেখলাম যেমন থাকে ঠিক তেমনি চুপ করে বসে আছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সেই নির্বোধ হাসিটা

আর অন্তর্দিনের মত হাসল না। কেবল মাথা নামিয়ে বলল, ছিল, তারপর একটা কথা বলতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেল। যে কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেল তার আকারান্ত প্রথম অক্ষরটি আমার কানে বেজেছিল, তার থেকে পূর্ণ শব্দরূপটি হয় 'আছে'। আমি ভাবতে লাগলাম এই 'আছে' বলতে গিয়ে থেমে যাবার অর্থ কি! নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো একটা রহস্য আছে, আর কোনো রহস্যকে আড়াল করে আছে ঐ শ্যামবর্ণ দীর্ঘ দেহ, যাকে প্রথম সাক্ষাতেই আমার একটু আশ্চর্য মনে হয়েছিল, ঐ স্থান বিষয় চোখ যার দিকে তাকালে অনেক অনেক গভীরে তলিয়ে যাবার বাসনা জাগে মনে। সেদিন যখন সেই সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সাহায্যাদাপুরের আকাশে অতীতের আত্মারা একটি ছুটি করে ছেড়ে-যাওয়া পৃথিবীর দিকে স্থান চোখে উঁকি দিচ্ছে, সেই সুন্দর রহস্যময় পরিবেশের মধ্যেও আমি কিন্তু সেদিন গণেশের মনের কথা বাতাসে ছড়িয়ে দিতে পারিনি। পরে যেদিন পেরেছিলাম সেদিন উপলব্ধি করলাম আদিম আরও কতকগুলো প্রকৃতির মত প্রীতিও একটা সহজাত ভাব, শত শিক্ষা আর কুচির প্রাকারে নিজেদের ঘিরে রাখি না কেন মুখর হলে আমরা যাকে বলি একটা অশিক্ষিত কুচিহীন মানুষ তার হৃদয়ের সঞ্চেও আমার হৃদয়ের সংযোগটি গড়ে উঠতে পারে। সেই সম্বন্ধই আমার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল গণেশ মাইতির। তাই সে, অকপটে কিনা জানি না, তার জীবনের কতকগুলো ঘটনা আমায় বলেছিল, আর তারপর ওর চোখে দেখলাম জল। ওর মন এবং স্বাস্থ্য দুই-ই ভাঙতে ভাঙতে এমন জায়গায় এসে পৌঁচেছিল যেখান থেকে সেই ছোটোর মধ্যে একটাকেও আর নতুন করে পাবার কল্পনা ও করতে পারে না।

গণেশ আমাকে বলল, বাবু মনটা বড় উত্তলা হয়ে উঠেছিল তাই কথাগুলো আপনাকে বললাম।

আমি জানালাম, বেশ করেছ।

তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে গণেশ জিজ্ঞেস করল, আমি কি কোনো অশ্রায় করেছি বাবু? লঠনের আলোয় ওর চোখ দুটো করুণতায় টলটল করেছে।

না ভেবেই উত্তর দিলাম, না গণেশ তোমার কোনো অশ্রায় নেই। কিন্তু ঐ যে না বললাম, পরে ভেবে দেখেছি গণেশের দোষ বা আর একজনের ভুল কোথাও না কোথাও ছিল, তৃতীয় একটা শক্তি ওদের সেই ক্রটিগুলোকে নিয়ে এমন পাকা খেলোয়াড়ের মত চাল দিয়েছে যে ওদের দুটির জীবনের অধঃপতন একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সেই দুটি জীবন এক হয়ে চলতে শুরু করেছিল। গণেশের যখন সাতাশ বছর বয়েস তখন থেকে। একটু বেশি বয়েসেই গণেশ বিয়ে করে। নিম্বের সংসারে একটি গরু ছাড়া আর তৃতীয় প্রাণী ছিল না। সেখানে এল পরাণ হাজারার মেয়ে পারুল। তারও একটু বেশি বয়েসে বিয়ে হচ্ছে, সুন্দর স্ত্রীম দেহ, গায়ের ঘরে যে ঘিনিসটা দুর্লভ, চামড়ার সেই কাঁঠালিচাঁপার মত রঙ পারুলের ছিল। তাই তাকে বিয়ে করে আনবার আগে, কয়েকদিন পুকুর পারে সুপুরী গাছের ছায়ায় দেখে গণেশ মনে করেছিল নিশ্চয়ই ওর নাম হবে চাঁপা। পারুল

ওর ঘরে আসার পর বেশ সুখেই দিন কাটছিল। নিজের ছোট একখানা মুদীখানার দোকান আছে। গণেশ ভেবেছিল অমাসুখিক পরিশ্রম করে ও সেই দোকানটাকে এমন ঠাঁড় করাবে যাতে ভবিষ্যৎ জীবনটা ওরা দু'জনে কিম্বা আর যারা আসবে তাদের নিয়ে খুব সুখে কাটিয়ে দেবে। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে পা দিতেই কাঁটা বিধল গণেশের পায়ে। কানাসুখায় গণেশের কানে এল যে-মেয়েকে ও বিয়ে করে এনেছে, সেই পারুল, পারুলের কোনোদিন ছেলেপিলে হবে না। ওরা নাকি বোনেরা সব বাঁজা। পারুলের বড় বোনেরা, যাদের বিয়ে হয়েছে, তাদের নাকি এখনও কারও ছেলেপুলে হয়নি। কথাটা প্রথমে গণেশ হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। তখন যৌবনবতী মেয়ে পারুল, দুই বলিষ্ঠ হাতের মধ্যে তার নিটোল দেহটা রয়েছে। গণেশ কেন ভাবতে যাবে ভবিষ্যতের কথা, পারুল যখন ছেলের না হয়েছে, দেহ তার ঝরে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে পারুলকে বাঁধলে আগের মত তেমন আর সুখ হয় না। গণেশের সেই ছোট মুদীখানার দোকান থেকে পারুলের জন্মে কত দামী হেজলিন পাউডার আনতো। তার সঙ্গে ফুলেল তেল, আলতা। গণেশ পারুলের কথাবার্তা আর ব্যবহারে বেশবাসের মধ্যে এমন একটা জিনিস লক্ষ্য করত যা প্রামের আর কোনো মেয়ের মধ্যে ও দেখেছে কিনা সন্দেহ। পারুল ছিল বেশ সৌখিন। তার কাপড় পরা চুল বাঁধা থেকে আরম্ভ করে কথা বলা পর্যন্ত সব ছিল গণেশের কাছে লোভনীয়। কিন্তু সেই পারুলের প্রতিই মন-যে তার একদিন বিতৃষ্ণায় ভরে যাবে এ-কথা সে কি কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছিল। বিয়ের পর তখন বছর চারেক কেটে গেছে, সম্ভোগে একজনের দেহে এসেছে পরিপূর্ণতা, আর একজনের দেহের কাঠামোটা কেমন একটু একটু করে শিথিল হয়ে পড়ছে। আর কেমন যেন মনটায় আগের মত উৎসাহ নেই। চারিদিক তাকিয়ে, এমন কি পারুলের সেই ভারী পরিপুষ্ট দেহটার মাধ্যমে যেন আশ্রয় খুঁজে পায় না। তারপর একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করল গণেশ যে ওর এই অবচেতন অশান্তির মূলে আর কিছু নয়, আছে কেবল পিতৃহত্যার কামনা। কিছু জ্ঞানাল না গণেশ পারুলকে। কেবল লক্ষ্য করে যেতে লাগল, পারুলের কথায় বা ভাবে সে ধরনের কোনো ভাষা প্রকাশ পায় কিনা। কিন্তু দিনের পর দিন অপেক্ষা করে গণেশ, ওদের বাড়ির গরুটা একদিন গাভীর হয় তার পর বকুনা জন্মায়, কিন্তু পারুল নিবিকার। পারুলের এই নিলিপ্তি সহ্য করতে পারে না গণেশ, প্রথমে অভিমান তারপর পারুলের প্রতি অভিযোগ ক্রমে সঙ্করমান মেঘের মত গণেশের মনের আকাশটা যখন ছেয়ে ফেলে তখন সেই ভালবাসার গভীর নীল রঙটা কালো মেঘের অন্তরালে হারিয়ে গেছে। গভীর একটা দুঃখবোধ গণেশের মনটাকে দিন দিন ভারীকরাতে করে তোলে। পারুল হাটে যায়। মেলায় যায়। রথতলা থেকে রঙ বেরঙের কাঁচের চুড়ি কিনে আনে, তার সঙ্গে খোঁপায় দেবে প্লাষ্টিকের ফুল, আগে হলে গণেশ হাসত, ঠাট্টা মক্কা করত। কিন্তু এখন আর সে সব নয়, পারুলের এই ছলাকলা দেখতে দেখতে ওর একটা চোখ ছোট হয়ে আসে, মনে কেমন একধরনের বিতৃষ্ণা জাগে। কিন্তু কিছু বলে না পারুলকে। তার মানে বলতে

পারে না। কেমন একধরনের লজ্জা লজ্জা করে আর সংকোচ হয়, তাই ভীষণ গম্ভীর হয়ে যায়।

পারুল জিজ্ঞেস করে, মশাইকে এত গম্ভীর দেখি কেন।

গণেশ উত্তর দেয়, দিনকাল ভাল না, বাজার বড় মন্দা।

পারুল হেসে বলে, তোমার আদরের গাই বকনা বিয়ালো তা আনন্দ করলে না একটু ?

গণেশ ছোটো উন্মুক্ত চোখ তুলে তাকালো একবার পারুলের দিকে। পারুল বোধ হয় সে-দৃষ্টির অর্থ বুঝল না, ওর সেই একধরনের নির্লজ্জ হাসির চেউ তুলে ঘরের মধ্যে ঢুকল। সারা গা যেন অলে উঠল গণেশের।

পারুল তখন ঘরের মধ্যে থেকে বলছে, সতীন আমার বকনা বিইয়েছে, ভাবলাম তাকে নিয়েই মশগুল থাকবে, তা দেখছি সতীনেরে তুমি ভালবাস না, ভালবাস আমাকেই ? কি বল মাইতি মশাই।

মনে মনে ভাবল গণেশ, আঁটকুড়ো বিয়ে ক'রে এনেছিলাম, এখন হাড়েনাড়ে হুর্বোম্বাস গজিয়ে দিল।

গণেশের বন্ধুবান্ধব, দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনও প্রায় ঐ একই কথা বলে। তাদের ছ'একজনের যাদের গণেশের ব্যয়েসে বিয়ে হয়েছে, এখন তিন চার ছেলে 'মেয়ের বাপ, বলে, তখনই বলেছিলাম ওর বোনগুলোও ওরকম। ওর বড় ভগ্নিপতী নিতাইদার সঙ্গে মাটে দেখা হয় আর বলে, ভাই ঘরে গেলেও শান্তি পাব না। এখনও পর্যন্ত ছেলের মুখ দেখলাম না। আগে হলে এসব কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করত না গণেশ, এখন কিন্তু এসব শুনলে পরে মনটা ওর দারুণ ভেঙে যায়। চুপ চাপ শোনে আর চোখ ছোটো বিষম হয়ে ওঠে।

সেদিন হাট থেকে ফিরবার পথে গণেশ ভাঁটিখানায় ঢুকল। লাল চোখ না হলে, রক্ত বেশ টগবগ ক'রে না ফুটলে, সাদা চোখে বউকে কিছু যেন বলতে পারবে না বলে ওর মনে হয়। কেমন যেন নিজের অস্তিত্বেই পারুলকে গণেশ এতদিন সমীহ ক'রে এসেছে। পারুলের মধ্যে কোথায় কি একটা আছে সেটা যেন ওর ধরাছোঁয়ার বাইরে। কয়েক পাত্রে পেটে পড়লে সেই ভাবটা গণেশের মন থেকে অনেকখানি অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন ওর নিজেকে কেমন সুলতান মনে হল আর পারুল ওর বাদী। সেই টনটনে নেশা নিয়ে সেই আবস্থায় গণেশ যখন সেদিন বাড়ি ফিরল পারুল তখন গা ধুয়ে এসে ছোট আরাধনার সামনে বসেছে।

— এমন সময় গণেশ এসে পেছনের কপাট ছোটোয় ভর দিয়ে দাঁড়াল।

খানিকক্ষণ খোলা দৃষ্টি দিয়ে পারুলের সেই আবছা দেহটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হচ্ছে।

পারুল যেন চমকে উঠল। গণেশের মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে তাড়ির ভীষ কটু একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের মধ্যে। আর অমন জড়ানো কণ্ঠস্বর। তাড়ি খাওয়াটা গণেশের নতুন নয় কিন্তু এধরনের খাওয়াটা পারুলের মনে হল নতুন।

দ্বির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে পারুল জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে ? নাকে কাপড় চাপা দিয়েছিল পারুল।

ঘরের মধ্যে চুকে জানা ছাড়তে ছাড়তে গণেশ বলল, ঘরে ব'সে ওরকম ছিনালি-পনা চলবে না। করতে হয় রাস্তায় গিয়ে কর।

মুহুর্তে পারুলের মুখখানা রক্তশূন্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কোনো কথা নয়, সেই বিবর্ণ মুখে দুই চোখের দৃষ্টি দিয়ে অপলক চোখে চেয়ে রইল গণেশের দিকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকাল আয়নার মধ্যে। গণেশ, সেই টনটনে নেশার মাধ্যমে পারুলের আয়নাখানায় লাগি মারে। ওর হেডলিন পাউডারের কোটো ছড়িয়ে দেয় ঘরের মেঝেয়। কুৎসিৎ সব গালাগালি যা গণেশের মুখে পারুল কোনোদিন শোনেনি তাই তাকে বিধতে থাকে। পারুল কিন্তু একটি কথাও উচ্চারণ করে না। ওর মনে হয় গভীর একটা অন্ধকারের মধ্যে ও নেমে যাচ্ছে। ওর সৌখিন মন সেখানে কালো অন্ধকারের মধ্যে মৃতের মত বোঁবা হয়ে গেছে। দেখে, কেবল চেয়ে দেখে গণেশের পশুর মত ব্যবহার, দিনের পর দিন নির্ধাতন। তার চোখ দিয়ে নিঃশব্দে জল পড়ে। গণেশের এই পাশবিকতার মূল কোথায় অনুসন্ধান ক'রে যখন জানতে পারল তখন একদিন পারুল গণেশকে ডেকে শান্ত স্বরে বলল, তুমি আবার বিয়ে কর না কেন ? কথাটা শোনামাত্র প্রথমে বেশ খানিকটা চমকে উঠেছিল গণেশ, কিন্তু সে ভাব গোপন ক'রে জানিয়েছিল, তোমার অবস্থাটা তাহলে কি হবে, ভেবে দেখেছ।

পারুল খুব শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়, কেন আমি তাকে ছোট বোনের মত দেখব।

সমস্তটা যে ওখানেই শেষ হয়ে যায় না, গণেশ তা জানে। এত ভাল তার অবস্থা নয়, যে ভাত কাপড় দিয়ে দুই ঘরনীকেই সুখে রাখে। আর পারুল যেমন শান্ত স্বরে, ঈর্ষা ঘেঁষহীন ভাবে কথা কটা বলল গণেশকে, গণেশ কিন্তু সেরকম ভাবে নিতে পারল না। পারুল সেই চিরকালের খুঁকিটি সেজে থাকবে। আর ও তার সব যোগান দিয়ে যাবে সমস্ত জীবন ভোর ভাবতেই গণেশের মনটা তিক্ত হয়ে উঠল। খুব কড়া ক'রে জানাল পারুলকে, তোমাকে তাহলে বাপের বাড়ি থাকতে হবে। পারুল বোধহয় এ-কথাটা স্বপ্নেও আশা করেনি। স্বামী ঘর সংসার অন্য আর একজনের হাতে ছেড়ে দিয়ে থাকতে হবে গিয়ে বাপের বাড়ি। বাপের গলগ্রহ হ'য়ে, তাও কতদিনের জন্তে সেটা অনিশ্চিত, বোধহয় সারা জীবনটা, সে যে এক দুঃসহ অপমান। পারুলের মধ্যে সেই চিরন্তন নারীসত্তা এতক্ষণে যেন জেগে উঠল।

বলল, তার কি মানে আছে, আমি তো এখানেও থাকতে পারি।

গণেশ বুঝল পারুলের কোথায় যা লেগেছে। আর পারুলের ওপর ক'দিন ধ'রে খারাপ ব্যবহার করতে করতে এখন অভ্যাসই হয়ে গেছে যে এখন আর প্রয়োজন হয় না মাতাল হবার।

তাই পারুলকে সে বলল, অতশত জানিনে, তোমাকে যেতে হবে।

গণেশের এই অপমানকর কথায়, সেই পারুল যে এই ক'দিন ধ'রে অত্যাচারে

দেখল ও রথের মেলায় এসে পড়েছে। আগে হলে কি করত গণেশের এখন মনে হল। এই যে সার সার চুড়ির দোকান আলতা ফিড়ের দোকান রয়েছে গণেশ ওখানে গিয়ে দাঁড়াত। পারুলের হাতের রঙের সঙ্গে মানিয়ে কিনত গভীর রঙের চুরি। গণেশ দোকানগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে হাঁটতে লাগল। এই যে একটি মেয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে চুড়ি কিনছে। পারুলের কথা বার বার মনে পড়ছে গণেশের। অত শার্ণ না হলে অমনি চম্পকবরণ হাতের আড়ল ছিল পারুলের। চোখ দুটো প্রথমে কেমন জড়িয়ে এল, তারপর স্থির তীক্ষ্ণ। দাঁড়িয়ে পড়ল গণেশ।

মেলার পীপড় ভাজার ঘন গন্ধ আসছে। হেঁটে হাসির শব্দ। দোকানদারদের চীৎকার।

গণেশের হৃদপিণ্ডটা কেমন দলা পাকিয়ে যেন গলার কাছে উঠে আসছে। পারুল না? কিন্তু অত রোগা হয়ে গেছে? সেই চাঁপার মত রঙ কেমন স্নান। বিষয়। তবু বার বার দেখেও গণেশ নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কেমন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে বোকার মত চেয়ে রইল।

স্বানীকে দেখে পারুল ঘোমটা টানল। দোকানী একটা শাঁখা পারছিল সেই দিকে মুখটা ঘুরিয়ে চেয়ে রইল। লোকটার কি লক্ষ্মীছাড়ার মত চেহারা হয়েছে, ভাবল পারুল। স্নান মুখ, কোটরগত দুটি চোখ, অভবড় লম্বা চওড়া পুরুষ কেমন বুড়োর মত সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল পারুল।

তারপর অনেকবার ওদের দুজনের মেলার মধ্যে দেখা হল।

চোখোচোখি হল। চোখ মানিয়ে নিল পারুল। টাকড়া শুকিয়ে যাচ্ছে তার। গণেশ এখন নিজেকে অনেকটা বেশে আনতে পেরেছে বলে মনে হল। ভাবল এই সুযোগ, পারুলকে বেশ ছুঁখা শুনিয়ে দেয়া যায় না, যা পারুলের বেশ কিছুদিন মনে থাকবে। ও তো কিছুদিন পরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তবু কথা কটা থাকবে।

ফেরবার পথে পারুলের দলটাকে ও অহুসরণ করল। প্রথমে ভেবেছিল পারুলের সঙ্গিনীরা পারুলের বাড়ির আগেই সব কেটে পড়বে। কিছু দূরে দূরে থেকে গণেশ হাঁটে, অপেক্ষা করে, কিন্তু কেউ আর পারুলকে ছেড়ে সরে যায় না। গণেশের তখন মনে হল পারুল নিশ্চয়ই ওকে দেখে ভয় পেয়েছে, পারুল এখন ওকে ভয় পায়। গণেশের ঠোঁটের কোণে স্নান একটু হাসি ফুটে উঠল। সত্যিই পারুল বোধ হয় ওকে আর মাহুষ ভাবে না, জন্তু। গণেশ জন্তু! নিজেকেই গণেশের একটা কঠিন আঘাত করতে ইচ্ছে হল। সামনের পথটাতে পারুল আর নেই। চারদিকে আমবাগান, আর সেই আমবাগান পেরিয়ে তার বাড়ি। দূরে আর সব মেয়েগুলো ছড়িয়ে পড়ল।

নির্জন রাস্তা, পারে পায়ে ধুলো উড়ছে, সন্ধ্যা হয় হয়। ডানদিকে সেই আমবাগানটা, ও মাইতিমশাই, শুনছেন।

গণেশের আর পা উঠছে না। সেই আঘাত সঙ্ঘাত নির্জন পথের ওপর দাঁড়িয়ে কপালে তার ঘান ফুটে উঠল।

তাকিয়ে দেখল আমবাগানের ধারে একটা গাছের পাশে একটি নারী মূর্তি, পারুল।

স্বটি আসবে এখুনি, আকাশে এখনো তারা ওঠেনি। বড় বড় আমগাছগুলো বাতাসের মুখে ছলছে।

সেই নারীকণ্ঠের আহ্বান গণেশের মনের কোথায় কি একটা জিনিস যেন ছুঁয়ে গেল। অনেকদিন আগের সেই খুসর-হয়ে-যাওয়া ছবিগুলো আবার মনের সামনে ভিড় করে এল। মেঘের আড়ালে তারার মত যেন ছড়িয়ে ছিল।

কোনো অবচেতন সমতলের ওপর পা ফেলে ফেলে কখন গণেশ পারুলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিষ্পেষের বিষয় দুই চোখের দৃষ্টি তুলে দেখল পারুল ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সে চোখে, গণেশের মনে হল, জল।

এই ঘটনার মাস সাতেক পরে সাহাজাদ পুরের বাতাসে একটা ঋষির প্রচণ্ড বেগে ছড়িয়ে পড়ল। প্রথমে কানাকানি, পুকুরের ঘাটে, রাস্তা ঘরে, হাটে রাস্তায়। আর যে-ই শুনল, ভাবল মেয়েটার মনে মনে এত কুপ্রযুক্তিও ছিল। পারুলদের বাড়িতে তার দূরসম্পর্কের ভাইয়ের আসা যাওয়া ছিল। প্রতিবেশীরা বলল, ঘনিষ্ঠ হয়ে পারুলকে তার সঙ্গে মিশতে দেখেছে, সুতরাং এ কাজ তার, পারুল সম্ভব।

গণেশ মাইতির চোখ দুটো জলে উঠল। বুঝতে পারল, পারুলের চোখে সেদিনের সেই আঘাত সন্ধ্যায় চোখে কেন জল ফুটে উঠেছিল। তারপর সেই করুণ আহ্বান। পারুলের বাড়িতে, লোকচক্ষু থেকে আত্মগোপন করে রাত্রিবাগের অভিজ্ঞতা। পারুলের সেই দেহটাকে যে দীর্ঘ বিরহের পর বুকে চেপে ধরত এখন মনে হচ্ছে সাপের দেহ। তাই ঐ আকুল আহ্বান। গণেশ মাথায় করে নিক পরের ঔরসের সম্ভান, নিষ্পেষ বলে। ভাবতে গিয়ে গণেশ বিমুগ্ধ হয়ে গেল। সে-ই সম্ভান চেয়েছিল পারুলের কাছ থেকে, এ তারই প্রতিদান। এক দারুণ দুঃখে, নিদ্রাহীন নির্জন রাতে গণেশ বিকৃতভাবে হেসে উঠল। তাকে ঠকাতে চেয়েছিল পারুল, কিন্তু পারেনি, পারবে না।

কিন্তু কে কাকে ঠকাতে চেয়েছিল, সেইটাই প্রশ্ন।

আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পারুলকে যখন প্রশ্ন করা হল, যা, কে তোমার এমন অবস্থা করল ?

ক্ষণিকের জন্মে পারুলের আনত মুখে লজ্জার আভা ফুটে উঠল। তারপর স্বাভাবিক জড়তার সঙ্গে বলল, আমার স্বামী।

দুই চোখের লাজুক দৃষ্টি নিয়ে তাকালো একবার তার স্বামী গণেশ মাইতির দিকে। তারপর নামিয়ে নিল।

গণেশের ঠোঁটের কোলে তীব্র হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল। এইটেই ও আশা করেছিল। কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। কাকে দিয়ে সম্ভান করিয়ে নিয়েছ এখন তাকে নিয়ে টানাটানি।

সেই কথাটাই অকপটে হাকিমকে জানালো গণেশ।

প্রমাণিত হল পারুল চরিত্রহীন।

এ্যান্ডলেন্স এল, তার সঙ্গে স্টেচার। পারুল অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

এর কিছুদিন পরে এক রাতে বাগানের যে দরজা দিয়ে গণেশ পাকুলের ঘরে ঢুকত সেই দরজায় আঘাত পড়ল। ঘরের মধ্যে পাকুল রুক্ষ কেশ, শুয়ে ছিল, সামনে লঠনটা স্তিমিত হয়ে জলছে। ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। দরজায় আওয়াজ শুনতে বুকের মধ্যেটা কেঁপে উঠল। বুঝল একজন এসেছে। এতদিন নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে এসেছে। কিন্তু পাকুল দরজা খুলবে না, অসম্ভব। না কিছুতেই নয়, ইঁা ঠিক আছে। এতক্ষণে বেশ শান্ত আর নিলিপ্ত হয়ে গেছে। দরজার ওপর সেই প্রচণ্ড আঘাত এতক্ষণে শিথিল হয়ে থেমে গেছে। কেবল গভীর রাতে আমবাগান থেকে সোঁ সোঁ কান্নার স্বর ভেসে আসে।

হঠাৎ ছেলেমানুষের মত গণেশ হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল। তন্ময় হয়ে শুনছিলাম গণেশের ভারী ভাঙা ভাঙা কঠস্বর, কেমন স্পন্দনহীন নির্জনতার স্রষ্টি করেছিল। গণেশের কান্না শুনে চমকে উঠলাম।

গণেশ তখন বলছে, বাবু, খারাপ মেয়েমানুষ প্রমাণ হওয়াতে আমাকে আর টাকা দিতে হয়নি। কিন্তু কতবড় ক্ষতিটা আমার হয়ে গেল। পাকুল, পাকুল তো আর ভুল ক'রেছি স্বীকার করলেও ফিরে আসবে না। সে যে বড় অভিমানী ছিল।

বুঝলাম পাকুলের মৃত্যু হয়েছে।

গণেশ বলল, কিন্তু আর একজন আছে।

কে, আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

সে বাবু সামনে ঘোরে ফেরে, আর তা চোদ্দপনের বছর হল তো পাকুল মারা গেছে, কিন্তু বাবু সে সামনে ঘোরে ফেরে, আমি, আমি তাকে বলতে পারি না, চোখের জলে গলার স্বর আটকে আসছে গণেশের, আমি, আমি তোর বাবা।

আমার নিজের হৃদপিণ্ডটা কে যেন লোহার আঙুল দিয়ে চেপে ধরল। মনে হল গভীর অন্ধকারের মধ্যে নেমে যাচ্ছি আমি। বারান্দায় তখনও অন্ধকার। বুঝলাম কে একজন নিঃশব্দে কাঁদছে।

এমন সময় অন্ধকার বারান্দা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল। আমার ছোকরা চাকরটা লঠন এনে সামনের টেবিলে রাখল। গণেশের জলে ভেজা মুখখানা পরিকার ফুটে উঠেছে। চোখ দুটো তৃষ্ণার্ত, ঠোঁট দুটো কাঁপছে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার চাকরটার দিকে। আগের ও ওকে অমনি ভাবে চাকরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি। চাকরটা ওকে দেখলে হাসে, তাচ্ছিল্য করে। ও কিন্তু নীরব। ওর সেই চোখের তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি, আজ আমার মর্ম্মবলে গভীর আঘাত হানল। মুহূর্তে বিছানা চমকে রহস্তের দিগন্তটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। গণেশ এখানে আমার কাছে

— কেন আসে ?

তখন গণেশের সেই কথাগুলো আমার মনে পড়ল।

সে বাবু, সামনে ঘোরে ফেরে। আজ তা চোদ্দ পনের বছর হল তো পাকুল মারা গেছে। কিন্তু বাবু সে সামনে ঘোরে ফেরে। আমি তাকে বলতে পারি না, আমি, আমি তোর বাবা।

ছায়ানাটক

দেবকুমার মৈত্র

॥ জাহ্নুয়ারী, ১৯৫৬ ॥

॥ ১লা ॥

আমি একা। বাড়ির সকলেই আমাকে এড়িয়ে চলে। ছোড়দা, ছোটবোদি, ছোটবোন নমিতা, এমনকি মা-ও। বাবা তো শয্যাশায়ী। তাঁর কথা আলাদা। কিন্তু আমিও কি এড়িয়ে চলি না সকলকে? কেন? লজ্জা। লজ্জা বোধ করি আমি ছোড়দা ছোটবোদির সাথে কথা বলতে, মা'র দিকে চোখ তুলে তাকাতে। বাবার ঘরে ঢুকিই না পারতপক্ষে। একা একা শুয়ে থাকেন। চুপচাপ। অথর্ব অশক্ত হয়ে গেছেন শরীরে। আমি গিয়ে বসলে, দু'চারটে কথা বললে, খুশি হবেন যথেষ্ট। কিন্তু। আমি গিয়ে বসতে পারি না। কি-একটা যেন বাধা দেয়। ঠিক লজ্জা নয়, আবার হতাশাও নয়। জানি আমি গিয়ে বসলে বাবা এমন কোনো কথা বলবেন না যাতে আঘাত পাবো। ওসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবেন ঠিক। এমনকি অভাব অনটনের কথাও বলবেন না। বলবেন না তাঁর নিজের শারীরিক এবং মানসিক কষ্টের কথাও। বরঞ্চ আমি যাতে উৎসাহ পাই এমন সব কথাই বলবেন।

বলবেন, 'নতুন কিছু লিখলে নাকি?'

আমি হয়তো বলবো, 'লিখেছি।'

বাবা বলবেন, 'কিছু ব্যবস্থা করতে পারলে?'

আমি চুপ ক'রে থাকবো।

তখন বাবা বলবেন, 'ওর জন্তে ভেবো না, দিন আসবেই।' কিংবা হয়তো বলবেন, 'তোমার শরীর তো দেখছি বেশ খারাপ হয়ে গেছে।'

আমি বলবো, 'না, কই।'

'না না, অতো পরিশ্রম কোরো না।' বাবা বলবেন, 'রাত বেগে নাই-বা লিখলে।'

আমি জবাব দেবো না। আমার জন্তে বাবা উদ্বিগ্ন হচ্ছেন একথা ভেবে ভালোই লাগবে। তবু, এসব জানা সত্ত্বেও, বাবার বিছানার পাশে গিয়ে বসতে লজ্জা বোধ করি। তাঁর এই শেষবয়সের কষ্ট আর চোখ মেলে দেখা যায় না। কি মানুষ কি হয়ে গেছেন। চামড়ার আচ্ছাদনে ঢাকা একটি জীবন্ত কঙ্কাল। একটা একটা ক'রে দিন যাচ্ছে আর একটু একটু ক'রে স্বভাব দিকে এগিয়ে চলেছেন।
দ্রুতগতিতে।

॥ ৫ই ॥

দীপেনের সাথে অনেকদিন বাদে আজ আবার দেখা হয়েছিলো। এই গলির

মোড়ে যে চায়ের দোকানটা আছে, সেখানে বসে ছিলাম সন্ধ্যাবেলা। আমরা তিনজন। আমি, অরুণ, আর সলিল। তিন বেকার। ওই দোকানটা আমাদের বরাবরের আড্ডার জায়গা। হু আনার এক কাপ চা সামনে নিয়ে বসে অনেকক্ষণ সময় গলে কাটানো যায়। আগে দীপেনও আসতো। মাস তিনেক হলো ও একটা চাকরি পেয়েছে। শিয়ালদহ কোর্টে কেরানী। এখন আর আসতে পারে না দীপেন।

অরুণ বললো, ‘অন্তত রবিবারে রবিবারে তুই আসতে পারিস।’

দীপেন বললো, ‘দেখ, ছ’দিন খাটনির পর রোববারে আর বেরুতে ইচ্ছে করে না। চুপচাপ শুয়ে থাকি বাড়িতে।’

সলিল বললো, ‘বাক্সে কথা বলিস কেন, আমাদের আড্ডায় এলে তোকে কিছু খরচ করতে হতে পারে। এই ভয়েই আসিস না।’

দীপেন হেসে বললো, ‘ঠিকই বলেছিস। আসলে কি জানিস, বেকার অবস্থা থেকে অনেক খারাপ আছি এখন। বাড়িতে খাওয়া জুটুক আর না-জুটুক আগে আমার কোনো ভাবনা ছিলো না। কিন্তু এখন, যেহেতু আমি আর বেকার নই, যেহেতু আমিও রোজগার করি এখন, যেহেতু মাসের পয়লা তারিখে একশো ছটাকা আটআনা আসে আমার পকেটে, কাজে কাজেই সবকিছু ভাবনার, সবকিছু দায়দায়িত্বের অংশ আমাকেও নিতেই হয়। নিতে হচ্ছে।’

আমি বললাম, ‘ওসব কথা থাক। চার কাপ চায়ের অর্ডার দে। আর যদি সম্ভব হয় একটা ক’রে ভেজিটেবল চপ। ক্রিডেয় পেটের নাড়ী চোঁ চোঁ করছে।’

চা এবং ভেজিটেবল চপ খাইয়েছিলো দীপেন। একটা ক’রে সিগারেট।

তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম ওহে, ‘লেখা কেমন চলছে তোর?’

খানিকটা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে দীপেন বললো, ‘ভালো না।’

বললাম, ‘কেন?’

দীপেন চুপচাপ বসে রইলো কিছুক্ষণ। সিগারেটে জোরে জোরে টান দিলো বার কয়েক। চোখ দুটো কুঁচকে ছোট ক’রে তির্যক দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে। কেমন যেন একটা কৌতুকের আভাস কুটে উঠলো ওর মুখে।

বললো, ‘লেখা একেবারে ছেড়ে দেবো ভাবছি।’

‘সে কি।’

‘সত্যি কথা বলতে কি—’ একটু খেমে কি যেন ভাবলো দীপেন, ‘আমি পুরোপুরি সিনিক হয়ে গেছি দৃষ্টিভঙ্গীতে। মানুষের ওপর আস্থা নেই, জীবনের ওপর আস্থা নেই, আস্থা নেই আমার নিজের ওপর। সবকিছুই অর্থহীন মনে হয় আমার। অবিশ্টি ইচ্ছে করলে লিখতে পারি ‘প্রেমের গল্প, দয়ামায়া ভালাবাসা স্নেহের কাহিনী। কিন্তু কি লাভ ওসব লিখে। ওর সবটাই তো মিথ্যে। দয়ামায়াভালাবাসা স্নেহপ্রেমপ্রীতি সবই পণ্য। যদি উপযুক্ত দাম দিতে পারো তবেই পাবে। নতুবা নয়। একটু খুলে বলি, আমি যখন বেকার ছিলাম তখন বাড়িতে একরকম ব্যবহার পেতাম, এখন বেকার নই বলে—মাস গেলে পঁচাত্তরটা টাকা দিই বলে, আর একরকম ব্যবহার পাচ্ছি। যদিও সকলের মনেই ক্ষোভ

আছে : আরও বেশি টাকা কেন দিই না, কেন পনেরো টাকা সিগারেট খেয়ে ছাই করি। জীবনের নিচতলার কাদার গন্ধ ছাড়া, মানুষের অধঃপতন এবং নিচ হয়ে যাবার ইতিহাস ছাড়া আমি অন্য কিছুই জানি না।’

বললাম, ‘তবু—’

দীপেন বললো, ‘না, তবু নয়। নিচতলার কাদার গন্ধ আমি এতোই ভালো করে জানি, রাতদিন তার মধ্যে এতোই হাবুডুবু খাচ্ছি-যে ও-নিয়ে লিখতে আমার যেনা করে। মানুষ ইতর, মানুষ নিচ, মানুষ অমানুষ—জীবনের এই একটা ছাড়া দুটো রূপ আমি আরও দেখিনি।’

দীপেনের সাথে সম্পূর্ণ একমত না-হলেও আমিও কি অনেকাংশে ওরই মতো সিনিক নই? আমারও একেক সময় মনে হয় সবকিছু নিরর্থক, একেক সময় আমিও তো জীবনের ওপর, মানুষের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলি। কাদা আর পাঁকের দুর্গন্ধ ছাড়া জীবনের আর কিছু আমিও জানি না। আমারও সময় সময় মনে হয়, দয়ামায়াভালোবাসা প্রেমস্রীতিস্নেহ সবই পণ্য; মনেহয়, মানুষ মাত্রেরই স্বার্থপর, নিচ, অমানুষ, আর কোনোখানেই একছিটেও ভালো নেই।

॥ ৬ই ॥

নৈরাশ্য।

॥ ৭ই ॥

নৈরাশ্য।

॥ ৮ই ॥

নৈরাশ্য।

॥ ৯ই ॥

নৈরাশ্য।

॥ ১২ ॥

একেক সময় এতো বিমর্ষ বোধ করি কেন? কোনো কিছুই ভালো লাগে না। মনেহয় সবকিছুই অর্থহীন। হাসি গল্প গান আড্ডা। নিরর্থক। জোর ক’রে বেঁচে থাকা! নেহাত বেঁচে থাকতে হবে অথচ অন্য কিছু করবার নেই আর। আবার একেক সময় সবকিছুই ভালো লাগে। হঠাৎ। হাসি গল্প গান আড্ডা। সব যেন প্রাণময়, জীবন্ত, ছন্দোবদ্ধ। ভালো লাগে দূরের আকাশ, দুপুরের রোদ, আমার মনের নির্জনতা। ভালো লাগে ট্রামবাসের ব্যস্ত ঘর্ষর, মানুষের কোলাহল। ভালো লাগে অন্ধকার রাত, একঝাঁক তারাভরা আকাশ, চাঁদের মদির আলো। মনেহয় এই জন্মেই, এদের জন্মেই বেঁচে থাকা সার্থক, জীবন জীবন্ত।

॥ ১৮ই ॥

সুজাতা : ‘তোমার চেহারা এতো খারাপ হয়ে গেছে কেন, হঠাৎ?’

আমি : ‘তাই নাকি! হবে হয়তো।’

সুজাতা : ‘না, ঠাট্টা না। সত্যিই। আয়নায় কি একবারও নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখে না?’

আমি : ‘দেখি।’

সুজাতা : ‘তবে?’

আমি : ‘কি করবো, জোর ক’রে তো আর চেহারা ঠিক রাখা সম্ভব নয়।’

সুজাতা : ‘সারাদিন রোদে রোদে ঘোরা আর রেঙ্কুরেণ্টে আড্ডা জমাও।’

আমি : ‘তাহলে বাঁচবো কি-নিয়ে?’

সুজাতা : (জরুটি ক’রে) ‘কেন, যারা রোদে ঘোরে না বা রেঙ্কুরেণ্টে আড্ডা দেয় না তারা কি বেঁচে নেই?’

আমি : ‘আছে।’

সুজাতা : ‘তাহলে?’

আমি : ‘এখন ওকথা বাদ দাও। সকলেই তোমরা একটাই কথা শিখেছো, তুনি, বাবা, মা, বাড়ির সকলে, আর ভালো লাগে না শুনতে।’

সুজাতা : (ইষৎ ক্ষুণ্ণস্বরে) ‘বললে যদি তুনি বিরক্ত হও তাহলে আর বলবো না।’

আমি : ‘অমনি রাগ করলে?’

সুজাতা : ‘না, রাগ করিনি।’

আমি চলে আসছিলাম তারপরে। সুজাতা আমার সাথে বাইরের দরজা পর্যন্ত এলো। এদিক ওদিক একবার চোখ বুলিয়ে খুব স্বহৃদে বললো তারপর, ‘পরশুদিন বিকেলবেলা ওই পার্কে একবার এসো।’

‘ক’টার সময়?’

‘সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ’টার মধ্যে।’

॥ ২২শে ॥

বউবাজারের এক অবিখ্যাত নোংরা গলির মধ্যে সোম্যর ভাড়াটে বাড়ি। অন্ধকার গলিটায় স্বতপ্রায় ব্যক্তির নাভিস্বাসের মতো টিমটিম করে প্যাসের বাতি জ্বলছিলো। দরজা থেকে ভেতর বাড়ি অর্ধি একটা নোংরা সরু প্যাসেজ। চুনবালি ধ্বসে গেছে দেয়ালের। নোনাধরা ইঁট জায়গায় জায়গায় দাঁত বার করে আছে। ঠিক আমাদের বাড়িটার মতো।

সোম্য একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিলো। স্তিমিত লঠনের শিখাতে সে ঘরে আলো এবং অন্ধকার চোর চোর খেলছিলো যেন। ওদিকে একটি চৌকিতে শুয়ে ছিলেন সোম্যর বৃদ্ধ বাবা। থেকে থেকে কাশছিলেন আর ধুতু কেলছিলেন একটি মাটির গানলায়। আমাকে লক্ষ্য করেননি।

‘ইলেকট্রিক লাইট কি হলো তোমাদের?’ আমি প্রশ্ন করলাম।

‘বিল দিতে না-পারার জন্যে কেটে দিয়েছে কনেকসান।’ সোম্য জবাব দিলো।

‘কে রে খোকা?’ সোম্যর বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কার সাথে কথা বলছিস?’

‘আমার বন্ধু, অশোক ।’

আমার দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে তারপর সৌম্য বললো, ‘তুমি একটু বোসো, চা করতে বলে আসি ।’

শুকনো ভদ্রতা করলাম, ‘না-না, এখন আমার অনর্থক চায়ের হাঙ্গামার কি দরকার ?’

সৌম্য শুনলো না । আমাকে বসিয়ে রেখে ভেতরে গেলো ।

সৌম্যর বাবা কেশে যাচ্ছিলেন অবিরাম । আর খুঁত ফেলছিলেন মাটির গামলাটায় । কোনোরকমে কাশির বেগ সামলে আমার দিকে তাকালেন, চাকরি বাকরি পেয়েছে কোনো ?’

জবাব দিলাম না ।

‘কি-যে দিনকাল হয়েছে বাবা কিছুই বুঝি না । লেখাপড়া জানা ছেনেরা সব বেকার বসে আছে ।’

অপন মনেই বললেন তারপর হঠাৎ কাশির স্রোতে আটকে গেলো স্বর । মুখ নিচু করে অস্বস্ত ভঙ্গীতে কাশতে লাগলেন । মনে হলো কাশির দমকে ছিঁড়ে ছিটকে এখনই বেরিয়ে পড়বে হৃদপিণ্ডটা ।

সৌম্য ফিরে এসে বুঝলো আমি অস্বস্তি বোধ করছি ।

নিচু গলায় বললো, ‘চলো ভেতরের ঘরে গিয়ে বসি ।’

ভেতরের ঘরটিও বাইরের ঘরেরই দ্বিতীয় সংস্করণ ! আরো সংকীর্ণ । নিচু দরজা । ছোট্ট ঘুলিঘুলি ঘরের একদিকে, সেটি জানালা । ওইটুকু ঘরের অর্ধেক আবার ছেঁড়া লেপ তোশক তোরঙ্গ বাকসে বোঝাই । গুমোট গরম । এই শীতের দিনেও ।

সৌম্যর স্ত্রী চা নিয়ে এলো ।

ভদ্রমহিলা চলে যাবার পরপরই প্রথম কথাই বললো সৌম্য, ‘সেই টাকা দশটার ক্ষেত্রে এসেছে বুঝি । কিন্তু এখন তো দিতে পারবো না আমি ।’

প্রায় ছ’মাস আগে দশটা টাকা ধার দিয়েছিলাম ওকে, অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির বইটা পুরনো বইএর দোকানে বিক্রী করে । সে সময় ওই টাকা ক’টার এতো প্রয়োজন ছিলো ওর যে না দিয়ে পারিনি । ওকে সঙ্গে করে গিয়েছিলাম বইএর দোকানে । বারোটা টাকা পেয়েছিলাম বইএর দাম বারুদ । দুটাকা নিজে রেখে বাকিটা দিয়েছিলাম ওকে । এতোদিন চাইনি । কিন্তু এখন আমার নিজেরই দরকার অভ্যস্ত । সেই উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিলাম সৌম্যর বাড়ি টাকাটা চাইবো । কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই ও এমনভাবে কথাটা তুললো যে আমি আর চাইতে পারলাম না ।

বললাম, ‘ঠিক সেক্ষেত্রেই যে এসেছি তা নয় । তবে—’ ও কথার জবাবে এর বেশি কিছু বলতে পারিনি । বলা যায়ও না ।

সৌম্য হেসে উঠলো, ‘তবে পেলো ভালো হতো, এই তো ?’

টাকাটা দিতে না-পারার ক্ষেত্রে ও যতখানি লজ্জিত তার চাইতে অনেক বেশি অস্বস্তি বোধ হয়েছিলো আমার ওই ধরনের অপ্রিয় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে ।

বললাম, ‘তুমি কবিতা লেখোনা আদ্যকাল ?’

হঠাৎ বিক্রীই শোনালো কথাটা। আমি যে প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইছি লক্ষ্যায়, পরিষ্কার বোঝা গেলো।

কিন্তু অন্য প্রসঙ্গ পেয়ে সৌম্য বোধহয় স্বস্তি অনুভব করেছিলো মনে মনে।

জ্ঞান হেসে বললো, 'কবিতা? দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এই-যে ছবি এই তো মহাকাব্য।'

॥ ২৫শে ॥

সকাল হয়েছে আরও একবার। বিষয়। মেহূর। আকাশের নীল মুখ নুকিয়েছে ঘন মেঘের আড়ালে। সূর্য ওঠেনি। উঠেছে হয়তো মেঘের পর্দার ওপরে। চাপ চাপ মেঘ। ধূসর। আর হিম হিম ঠাণ্ডা বাতাসের ফিসফিস, গলির মোড়ের বকুল গাছটির পাতায় পাতায় ঝিরঝির ঝুটি নামছিলো। ইলসেণ্ডি।

কাকডাকা সকালে ধুম ভেঙেছিলো আমার। আর ধুম আসেনি। সাধারণত বেলা আটটার আগে আমি বিছানা ছেড়ে উঠি না। অতোকণ যে ঘুমোই তা নয়। শুয়ে থাকি অলস হয়ে। কাজকর্ম তো কিছুই নেই, উঠে করবো কি। আজও সেইরকম অলস হয়ে শুয়ে ছিলাম। ভোর রাত থেকে। একটু একটু ক'রে গলে গলে অন্ধকার কেটে গেলো।

ঘড়ির কাঁটা যখন পাঁচটার ঘর ছুঁই ছুঁই, সেই সময় আমার জানালার পাশে রাস্তার কলে একটি লোক এসেছিলো জ্ঞান করতে। উঁচু গলায় সুর ক'রে সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করছিলো সে। এই ঠাণ্ডা বিষয় সকালে, হিমহিম ঝুটির সকালে, গায়ে বরফশীতল জল ঢালতে বোধহয় কষ্ট হচ্ছিলো তার, চিৎকার ক'রে স্তোত্র আউড়ে সেই অস্বস্তি ভুলে থাকতে চেষ্টা করছিলো সে। আজ একটু দেরী হয়ে গিয়েছিলো ওর। অশ্রুদিন খুব সকালে আসে, জ্ঞান করে, চিৎকার ক'রে শ্লোক আওড়ায় এমনই। তখন গলিটা নিঝুম থাকে। হুধারে বাড়ির সার ধুমে নিমগ্ন। আকাশের জলজলে তারার প্রদীপ নিভেছে কেবল, অন্ধকার গলে গলে মিলিয়ে যাচ্ছে, ফিকে আলোর চিকণ আভা ছড়িয়ে পড়ছে নাগরিক আকাশে; গলির গ্যাসবাতিটা তখনও জ্বলে, শুধু কমে যায় তার জ্বলা, দূরের বড় রাস্তায় দু-একটা ঘুমভাঙা ট্রামের চকিত আওয়াজ ওঠে : শেঁ-ও-ও-ও, এমন সময় ও আসে জ্ঞান করতে। ছলছল শব্দে জল পড়ে গলির শূন্যতা ভরিয়ে। প্রভাতের নরম মুহূর্তে ভারি ভালো লাগে শব্দটা, আর তার সাথে ওর ভরাট গলার উদাত্ত শ্লোকের সুর। প্রীতবর্ষাশরতঃসমস্তশীতবসন্ত এ একেবারে ধরাবাঁধা নিয়ম। অনিবার্য। দিন শেষ হয়ে যেমন রাত হয়, আবার রাতের পর যেমন দিন, সেইরকম। নিয়মের সেই চক্রবৎ আবর্তনে প্রথম যতি পড়েছে আজ।

বিছানায় শুয়ে ধুমধুম চোখে আমি ওর কথাই ভেবেছি। ধুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ। ভোররাতে। হেঁড়া লেপটার ভেতর দিয়ে সব শীত ঢুকে পড়ছিলো। বিছানা থেকে উঠে একটি ধুতি নিয়ে হুঁচক করে লেপের ওপর পেতে শুয়ে পড়েছিলাম আবার। কিন্তু ধুম আসেনি। তজ্জা, পাতলা আঠার মতো লেগে ছিলো শুধু

চোখের পাতায়। ঘুমের মধুর আবেশও ছিলো আবার চেতনাও ছিলো সজাগ। সেই ভোর রাত থেকেই অমনভাবে শুয়ে ছিলান। জানালার খড়খড়ির কঁক দিয়ে একটু একটু করে নিস্তেজ আলোর টুকরো টুকছে ঘরের ভেতর। চোখ বন্ধ থাকলেও টের পেয়েছি। ঘরের পাশেই একটি নোটর গ্যারাজ। চার পাঁচটি ট্যান্ডি থাকে। ভোর হয়হয় এমন সময় শিখ ডাইভারগুলো এসে বার করছে গাড়ি। তাদের ছেঁড়া ছেঁড়া কথার রেণ ভেসে এসেছে কানে। ট্যান্ডি নিয়ে তারা চলে গেছে। তারপর আবার চুপচাপ। নিস্তব্ধতা। আনি একটু আশ্চর্যই হয়েছিলান। অন্তদিন শিখ ডাইভাররা যাবার পরপরই লোকটি আসে। কলতলায় বালতি রাখার একটা শব্দ ওঠে। মুখচোখে জল দেয়, দাঁত মাছে, আঙুল দিয়ে জিভ পরিকার করবার বিকট একটা আওয়াজ আসে, বালতিতে জল পড়বার ছরছর শব্দ, তারপর ভরাট উদাস্ত স্বরে আবৃত্তি। এ একেবারে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এতোটুকু এদিক ওদিক হয় না। চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে থেকে, ঘড়ি না-দেখেও, শুধুমাত্র ওই কয়টি শব্দ শুনে নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারি সময়। শিখ ডাইভারদের টুকরো টুকরো কথা শোনা যাচ্ছে : এখন সাড়ে চারটে থেকে পৌনে পাঁচটা ; গ্যারাজ ছেড়ে বেরিয়ে গেলো গাড়ি : পাঁচটা ; জানালার পাশে কলতলায় চং করে বালতি রাখার আওয়াজ হলো : পাঁচটা পনেরো ; আঙুল দিয়ে জিভ পরিকার করার বিকট একটা আওয়াজ আসছে—ষ ষ ষ : প্রায় সাড়ে পাঁচটা ; স্নান করতে করতে চিৎকার করে শ্লোক আবৃত্তি করছে লোকটি : পাঁচটা চল্লিশ ; পৌনে ছ'টা বাজবার আগেই স্নান সেরে চলে যায় ও। একে একে একটি দুটি করে নানা লোক এসে জমতে থাকে কলতলায়। বাসন মাজার ঘাস্ঘ্যাস্ ঝুঁটাং শব্দ আসে। মাসুখজনের কলকল। জলের জন্তো ঝগড়া, কথা কাটাকাটি। ইতিমধ্যে বাইরের রাস্তায় শিশুস্বর্ষের ছ'টার টুকরো মিঠে আলো উঁকিঝুঁকি দেয়। জানালার খড়খড়ি, ভেনাটিলেটারের শুলশুলি দিয়ে সুরু সুরু রেখার মতো আলো প্রবেশ করে ; আলোর পটভূমিতে দেখা যায় গুঁড়ো গুঁড়ো ক্ষুদ্র ধুলোবালি বাতাসে উড়ছে। আলোর একটা সুরু রেখা এসে আমার চোখের ওপর পড়ে : সাতটা। ঘড়ির কাঁটার মতো হ্রস্ব যান্ত্রিক নিয়মে বছরের ধর বছর ঐই ভাবেই সকাল হয় এ গলিতে।

উদ্ভাবিত আচ্ছন্ন মনে বেশ একটা লম্বা চিন্তা ফেনিয়ে ফেনিয়ে সময় কাটাচ্ছিলান, যে চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে অজানা অচেনা একটি লোক, যাকে চান্দ্র দেবিনি কোনোদিন, শুধু গলার আওয়াজ শুনেছি রোজ প্রত্যুষে। মদের গাঁজলার মতো চিন্তার ফেনিল ফেনা নিয়ে খেলা করতে ভালো লাগছিলো। নিষ্ক্রিয় অলস মনের শূন্যতা ভরিয়ে রাখছিলান অহেতুক চিন্তা দিয়ে। বেগে উঠলে, চোখ মেললে, ঘরের বাইরে বেরোলেই তো সমস্তার সমুদ্রচেউ, অভাব অনটনের কুটিল কঠিন বেদনাময় দিন। ওই যতোটুকু সময় একা একা, নিজের মনের কাছাকাছি, বাতাসে যখন শিশুস্বর্ষের মিঠে আলোর খেলা, ঘরের ভেতর আলোআঁধারের আবছায়া, জানালার খড়খড়ি দিয়ে লিকলিক সাপের মতো সুরু সুরু আলোর রেখাপথে গুঁড়ো গুঁড়ো ক্ষুদ্র ধুলোবালির নেচে নেচে বাতাসে ওড়া—সেই সময়টা জীবনের অন্তিম রুঢ় সমস্তার কথা মন থেকে

সরিয়ে, লম্বা বায়বীয় ভাবনার বুহুদে আকণ্ঠ ডুবে থাকতে ভালো লাগে। অক্লান্ত আশ্বস্তি পাই।

‘খটাখট্ খট্ খট্, খটাখট্ খট্ খট্।’ দরজায় কড়া হুটো শব্দ ঘোষণায় নড়ে উঠলো। সজোরে।

বিরক্তি বোধ করেছিলাম। না, এরা আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। কিছুতেই।

‘কে?’

‘দাদা, ওঠো চা হয়ে গেছে।’

আড়মোড়া ভেঙে চোখ খুলে তাকিয়ে জবাব দিয়েছিলাম, ‘উঠছি।’

ঘর থেকে বেরিয়ে মুখহাত ধুয়ে রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসেছিলাম তারপর। নির্দিষ্ট জায়গায় আমার চায়ের কাপটা ছিলো, প্লেট দিয়ে ঢাকা, আর পেতলের ছোট একটি রেকাবিতে হুটো রুটি এবং কিছু চিনি। রোজই এমন থাকে। সকলের চা জলখাবার পর্ব শেষ হয়ে গেলে আমি ঘুম থেকে উঠি। রুটির প্লেট এবং চায়ের কাপ টেনে নিয়েছিলাম। শুকনো রুটির খানিকটা মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে আলতোভাবে চা খেয়েছিলাম এক চোঁক : ঠাণ্ডা, বিশ্বাস, বালির মতো। কালচে হয়ে গিয়েছিলো চায়ের রং, সাদা হেঁড়া হেঁড়া সরের টুকরো ভাসছিলো।

রান্নাঘরের ভেতর উল্লুনের সামনে মা বসে ছিলেন। অন্তদিকে মুখ ঘুরিয়ে। আমি এসেছি যেন জানেন না। স্থিরদৃষ্টিতে অপলক তাকিয়ে রইলাম। হাসি পেলো আমার। হাসির সাথে হুঃখ। কাপপ্লেট নাড়াচাড়া করে টুংটাং শব্দ করলাম বারকয়েক। তবু মা তাকালেন না। পাথরের মূর্তি যেন। নিশ্চল।

কিছুক্ষণ সময় কাটালো অপেক্ষায়। যদি মা কোনো কথা বলেন।

আকাশের ঝিরঝির ঝড়ের মতো একটু একটুকরে সময় এগিয়ে যেতে লাগলো।

‘মা।’ নিজে থেকে মা কোন কথা বলবেন না বুঝতে পেরে অবশেষে আমিই ডাকলাম।

মুখ ঘুরিয়ে মা তাকালেন। আর আমি দেখলাম তাঁর চোখ হুটো কেশন যেন ভিজে ভিজে। বিষণ্ণ। করুণায় আর্দ্র। কয়েক মুহূর্ত নিপলক তাকিয়ে রইলাম চোখে চোখে। চায়ের কাপটা ঠেলে এগিয়ে দিলাম তারপর।

‘গরম করে দাও, ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে একেবারে।’

‘গরম করা চা খেতে নেই। লিভারের পক্ষে ক্ষতিকর।’ অত্যন্ত বৃহৎ স্বরে মা বললেন।

বললাম, ‘তা হোক।’

‘তার চাইতে আর এক কাপ চা করে দিই।’

ব্যাকুল ব্যঞ্জনে তাড়াতাড়ি বললাম, ‘না না মা, এই নিয়ে আবার পাঁচরকম কথা শুনতে হবে হয়তো।’

কাপপ্লেটে হাত দিয়েছিলেন মা। বিছাপ্পুন্টের মতো চমকে হাত সরিয়ে

নিলেন। মুখ থেকে স্নেহকোমল অভিব্যক্তি মুছে গেলো সাথে সাথে। স্বতঃ ছাগলের চোখের মতো নিখর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর। তাকিয়ে দেখলাম, কচুপাতার ওপর টলটলে শিশিরবিশ্মুর মতো ছ'কোঁটা জল না'র চোখের কোলে এসে জমেছে। মাটির দিকে মুখ নামিয়ে কাপের চা ধীরে ধীরে ঢেলে নিলেন। এ্যালুমিনিয়ামের একটি প্যানে, ডালের কড়াই উল্লুখ থেকে নামিয়ে প্যানটা বসিয়ে দিলেন; গরমে তেতে কিছুক্ষণের মধ্যেই চায়ের কালচে রংটা আরও গাঢ় হয়ে এলো, কেঁপে কেঁপে ধোঁয়া উঠতে লাগলো প্যান থেকে। গরম চা আবার কাপে ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন না।

স্বহৃদ নরম গলায় বললেন, 'বয়েস বাড়ছে দিন দিনই, এখনও বুদ্ধি হলো না তোমার।'

মার কথায় আমি চমকে উঠে বললাম, 'তুমিও কি আমার কথা বিশ্বাস করোনি।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে না বললেন, 'আমার বিশ্বাস করা না-করাতে কি আসে যায়।'

আমি কোন জবাব দিতে পারিনি প্রথমে। চায়ের কাপে নিঃশব্দে কয়েকটি চুমুক দিয়ে বলেছিলাম, 'সত্যিই টাকাটা আমার কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিলো।'

'জানি।'

'তবে?'

'তোমার আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিলো।'

তারপর এদিক-ওদিক উঁকি দিয়ে দেখে বলেছিলেন, 'এ সুযোগ ছোটবোনা ছাড়বে না তোমার জানা ছিলো, অথচ তুমি এখনও বুঝতে শিখলে না কিছুই। আর ওদেরই বা দোষ দিই কি করে? অভাবের সংসারে তুচ্ছাতুচ্ছ জিনিস নিয়েই মনোমালিন্য হয়।'

রান্নাঘরের কাছ থেকে উঠে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে লিখতে বসেছি। সকাল ন'টা বোধহয়। হাতের কাছে বড়ি নেই, গঠিক জানি না। আন্দাজ। কাল রাতের ঘটনাটা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম; একেবারে না ভুললেও সাময়িকভাবে সরিয়ে দিয়েছিলাম মন থেকে। এমন নেমেনেছুর সকালে, ঝিরঝির 'বৃষ্টির' সকালে, ভেবেছিলাম কবিতা লিখবো। কিন্তু না কালকের ঘটনার স্মৃতিতে নতুন করে ধোঁচা দিয়েছেন। অল্প কিছুতে মনোনিবেশ করা এখন অসম্ভব।

'আসলে ব্যাপারটা কিছুই নয়। অন্য যে-কোনো লোকের মনে হবে অতি-সাধারণ। তুচ্ছ। অথচ তার জন্মেই এতো অসম্ভাব।' মনোমালিন্য।

মাসের শেষে সংসার খরচের টাকা কুরিয়ে গিয়েছিলো। প্রতি মাসেই যাত্র। বাড়িতে একমাত্র উপার্জন করে ছোড়না। তার একাঁর উপার্জনে সংসার চলে। মাইনে পায় না দেড়েক টাকা। ওই টাকাতেই প্রতিপালন করতে হয় দশজন লোককে।

টাকা কুরিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তবু হয়তো মনোমালিন্য ঘটতো না। দেড় বছর আগে আমি বি-এস-সি পাশ করেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো চাকরি জোগাড় করতে পারিনি। যখন কলেজে পড়তাম তখনও এমন অভাব অনটন বারবারই দেখা দিয়েছে। তবু তার জন্যে মনোমালিন্য হয়নি। অসন্তোষ দেখা দেয়নি। তখন আশা ছিলো একটা সামনে : আমার পড়া শেষ হলেই সাংসারিক দৈন্য ঘুচবে, একটা না একটা কিছু চাকরি নিশ্চয়ই পাবো। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, দেড়বছর কেটে গেছে—কোনো কিছুই জোগাড় করতে পারিনি। পাশ করবার দেড় বছর বাদেও আমি বেকার, ছোড়দার রোজগারে তেমনই ভাগ বসিয়ে যাচ্ছি। অসন্তোষের কারণ সেইটেই। অভাবের সংসারে এই সত্যটাই তাদের নজরে পড়ে সর্বাগ্রে, ক্ষুব্ধ হয়। কেন, ছোড়দার একারই কি সব দায় দায়িত্ব। তাদের ধারণা চাকরির ব্যাপারে আমার গা নেই। আমি চেষ্টা করলেই হয়, কিন্তু করি না। একথা আমি কেমন ক'রে বোঝাবো যে চাকরি যেমন আপনা থেকেই উড়ে ধরে আসে না তেমন দোরে দোরে হন্তে হয়ে ঘুরলেই কিছু মেলে না। চেষ্টার তো কসুর করি না। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজ দেখি, কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত পাঠাই, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিস্ট্রি করে রেখেছি ; এর বেশি আমি আর কি করতে পারি। ইদানিং এমন একটা অবস্থা হয়েছে—যে বাড়ির কেউই প্রায় আমার সাথে কথা বলে না, সামনাসামনি পড়ে গেলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। আর, হ্যাঁ, নিজের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি নিজেও অস্বস্তি বোধ করি আমার অক্ষমতার জন্যে।

চুনবালি-ধবসা দেয়ালে একটি টিকটিকি নিথর হয়ে লেপ্টে আছে, কোথা থেকে উড়তে উড়তে একটি পোকা এসে বসলো তার সামনে, আর সেই পোকাটার দিকে তাকিয়ে টিকটিকির চোখ দুটো ঝকঝক ক'রে উঠছে লোভে, লিপ্সায়।...পা টিপে টিপে টিকটিকিটা এগিয়ে যাচ্ছে পোকাটার দিকে, সন্তর্পণে, ধীরে ধীরে। আমি লক্ষ্য করছি একদৃষ্টিতে, এক দুই তিন চার, এইবার, হঠাৎ, হ্যাঁ, হঠাতই লাফ দিলো টিকটিকিটা, পোকার উদ্দেশ্যে ; তবু ধরতে পারলো না। যেমন এসেছিলো পোকাটা তেমনই উড়ে পালিয়ে গেলো। নিশ্চিত স্বভূত এড়িয়ে। এই পোকাটার মতোই বারবার আমার হাত থেকে নিশ্চিত চাকরির সম্ভাবনা উড়ে চলে গেছে। কতোবার কতো চেষ্টা করেছি, সদর খিড়কি কোনো দরজাই বাকি রাখিনি, তোষামোদ উমেদারী। টিকটিকির ঞ্জবলক্ষ্য যেমন পোকা সেইরকম চাকরিকে ঞ্জবলক্ষ্য ক'রে এগিয়েছি, সন্তর্পণে, ধীরে ধীরে : এবার ধরবোই ; তবু প্রতিবারই উড়ে পালিয়েছে চাকরি। শেষপর্যন্ত কোনোবারই নাগাল পাইনি। নাগাল পাইনি এটাই শুধু দেখেছে বাড়ির সকলে, কিন্তু নাগাল পাবার জন্যে যে কতো চেষ্টা, কতোরকমভাবে চেষ্টা করেছি সেটা দৃষ্টিতে আসেনি। আর সেইজন্যেই মনে মনে কোভা' লেখাপড়া শিখেছি, বয়স হয়েছে, তবু এখনও ভাগ বসাবো অন্তের রোজগারে ? সংসারের তো এই অবস্থা, দশজন লোক, তাদের চারবেলা খাবার পরবার এবং মাথা লুকোবার আশ্রয়—সবকিছুর ভার ছোড়দার। কেন ? আমি কি মুখ তুলেও দেখি না, দেখতে পাই না এসব ?

আমি দেখি, দেখতে পাই সবই । কান্না পায় আমার সংসারের এই ছরবস্তার কথা স্মরণ করলে, আরও খারাপ লাগে নিজের কথা ভাবলে । সত্যিই আমি কিছু করছি না, করতে পারছি না । তা বলে চুপ ক'রে বসে থাকলেই কি সমাধান হবে সব সমস্যা ? না না না, আমি চুপ ক'রে বসে নেই । চেষ্টা করি, করছি, করেই চলেছি । তাই একথা নিয়ে যখন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে কেউ, তখন, শুধু তখনই, ফুক হই ।

কাল রাতে এই নিয়েই একটা বিজ্ঞি ঝগড়া হয়ে গেছে । অবশ্য কাল রাতের ঘটনাটার জন্তে দায়ী আমিই, একথা নিজের মনের কাছেও অস্বীকার করতে পারবো না । অতোটা অসাবধান হওয়া আমার উচিত হয়নি । কিছুটা সতর্ক থাকলে টাকা দশটা হারাতো না । আর টাকাটা না-হারালে এমন কাণ্ডও ঘটতো না মাসের শেষে, সংসার ধরচের টাকা কুরিয়ে গেছে, এবেলার চাল আছে তো ও-বেলার ডাল নেই এমন অবস্থা । পোষ্ট অফিসের সেভিংস এ্যাকাউন্ট থেকে আমাকে দশটা টাকা তুলে আনতে দিয়েছিলো ছোড়দা । শেষ সম্বল । ওই টাকা কটি তোলবার সাথে সাথেই ক্লোজ্ ড্ হয়ে গেছে ছোড়দার সেভিংস এ্যাকাউন্ট । সেভিংস বলতে আর কিছু নেই । জমার ঘর শূন্য ।

বেশ কিছুক্ষণ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে টাকাটা তুলেছিলাম আমি । নীল রঙের একটি ত্রিসিংহ মার্কা নোট, যার 'আশায় সংসার হাঁ ক'রে ছিলো । ওই টাকাটা পেলে তবে চাল কেনা হবে, চাল না হলে আজ সকালে হাঁড়ি চড়বে না উত্থনে । উপোস ।

কি ক'রে সে টাকাটা হারিয়েছিলো এখনও বুঝতে পারছি না আমি । এ পকেটে নেই, তাহলে হয়তো ও-পকেটে আছে, হাতড়ে হাতড়ে ও পকেট দেখলাম, নেই । হারিয়ে গেছে একথা হৃদয়ঙ্গম করতে দশ মিনিট সময় ব্যয় করতে হয়েছিলো আমাকে । তারপর । সারা ছপুর এ বন্ধুর বাড়ি থেকে সে-বন্ধুর বাড়ি পাগলের মতো ঘুরেছি । দশ টাকা, চকচকে কিংবা নোংরা একটি নীল ত্রিসিংহ মার্কা নোট, যেভাবেই হোক বিকেলের আগে আমার চাই । কিন্তু চাই বললেই সব ত্রিনিস পাওয়া যায় না, চাকরি চাই অথচ পাই না, ঠিক সেইরকম দশটা টাকাও পাইনি । ক্রান্ত প্লথ পায়ে অবসন্ন মনে বাড়ি ফিরেছিলাম রাত আটটার পর ।

সেই নিয়েই ঝগড়া । বিজ্ঞি কথা কাটাকাটি । ঝগড়া আমি করতাম না, নীরবে নভনেত্রে গালাগালি সহ্য ক'রে যেতাম, কেন না, দোষ আমারই । কিন্তু ছোটবোদি এমন একটা ইভর ইঙ্গিত করেছিলো এ-নিয়ে যে আমি চুপ ক'রে থাকতে পারিনি । ওদের ধারণা টাকাটা আসলে হারায়নি, বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফুতি ক'রে উড়িয়েছি আমি, হারানোর কথাটা মিছে, আমার বানানো ।

অঁভাব অনটনের সংসারে এরকম মনোমালিন্য ঘটা কিছুই বিচিত্র নয় । একথা আমিও বুঝি । তবু হৃৎপিণ্ড লাগে, বেদনা পাই, শুধু বেঁচে থাকার জন্তে আমাদের এই এই বিকট বিকৃতিময় দৈনন্দিনের কথা ভেবে ।

লিখতে আরম্ভ করেছিলাম সকালে । এর আগে পর্যন্ত লিখেছি । কোনো কিছুই ভালো লাগছিলো না । ভালো লাগছিলো না লিখতেও । আকাশের ঝিরঝিরে

যুট্টি থেমে গিয়েছিলো ইতিমধ্যেই। পাতলুন পরাই ছিলো, শাটটা পরে চাট পায়ে গলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলেন তারপর। উদ্দেশ্যহীনভাবে পথে পথে ঘুরেছি। পকেটে একটি পয়সাও ছিলো না অথচ সিগারেটের ধোয়ার নেশার জন্তে গলা খুসখুস করছিলো। অবশেষে বাধ্য হয়ে লক্ষ্মণরম ত্যাগ ক'রে নোড়ের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়েছি ধারে। কথা দিয়েছি বিকেলে পয়সা দেবো। বিকেল প্রায় হয়েই এলো। এখন চারটে বোধহয়। রাস্তার কলে জল এসে গেছে। বিব্রত বোধ করছি অত্যন্ত। সিগারেটের দাম জোগাড় করি কোথা থেকে? আজ বিকেলে যদি দোকানীকে পয়সা না-দিতে পারি তাহলে সে যে খুব কিছু একটা মনে করবে তা নয়, কাল, কিংবা পরশু দিলেও চলবে। তবু লজ্জাবোধ করছি। কারণ, আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম।

আজ সারাদিন আমাদের উপোস ক'রে থাকবার অশঙ্কা ছিলো। আশঙ্কা ছিলো। আশঙ্কা বলছি এই কারণে যে সত্যিই আমরা উপোস করে নেই। কি করে চাল জোগাড় হলো বা আদৌ জোগাড় হয়েছে কিনা আমি কিছুই জানতাম না। সকালে ঘুম থেকে উঠে ছোড়দাকে বাড়িতে দেখিনি। বেরিয়ে গিয়েছিলো। কোথায় গেছে জানতাম না। খোঁজও করিনি। ছোড়দা বাড়ি ফিরেছিলো এগারোটার সময়। শুনেছি। আজ তার অফিস যাওয়া হয়নি। আর, ছোড়দা যখন ফিরেছিলো তখন আবার আমি বাড়িতে ছিলাম না। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরছিলাম পথে পথে। বাড়ি ফিরেছি বারোটার পর। ফিরে দেখি সকলে স্নান খাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত। অবাক এবং আশ্চর্য বোধ হয়েছিলো। চাল জোগাড় হলো কোথা থেকে? যদি তো আজকাল ধারে আমাদের কোনো জিনিসই দেয় না। রহস্যটা পরিষ্কার হলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। শুনতে আর জানতে পেলাম সবই। মার শেষ কঙ্কনছোড়ার একটি স্ত্রাকরার দোকানে বিক্রী করে টাকার জোগাড় হয়েছে। বন্ধক না-রেখে বিক্রী করেছে ছোড়দা তার কারণ বন্ধকী কঙ্কন ছোড়ার মতো উদ্ভূত টাকার জোগাড় হবে না কোনোদিনই। মাঝ থেকে কম টাকার হাতছাড়া হয়ে যাবে জিনিসটা। আমি নিজেও ভেবে দেখেছি কথাটা সত্যি। ও-ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না।

যথারীতি স্নান করে ভাত খেয়েছি তারপর। পেট ভরেই খেয়েছি। যদিও খাবার সময় কেমন যেন নোনতা লাগছিলো সব কিছুই। রান্না করতে করতে মার চোখ থেকে ঝরঝর করে জল ঝরছিলো হয়তো। কিন্তু চোখের জলে এতো কি মুন থাকে?

খাবার সময় মা বলছিলেন, 'এভাবে, এমন উপায়ে আর কতোদিন চলবে?'

আমিও বললাম, 'তাই, এমনভাবে চিরকাল চলে না।'

॥ ২৬শে ॥

নৈরাশ্র।

॥ ২৭শে ॥

নৈরাশ্র।

গান্ধী-পথ কি অবৈজ্ঞানিক

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গান্ধীজী বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ । সমাজরচনার শেষ কথা তিনি বলে গিয়েছেন, এ-কথা মনে না-করলেও তাঁর কল্পিত সমাজব্যবস্থার রূপরেখার মধ্যে নিরপেক্ষ বাস্তববাদী বর্তমান যুগ-সমস্তার আধুনিকতম সমাধানের নির্দেশ দেখতে পাবেন । গান্ধীজীর পথ আধুনিকতম বলেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর উপর স্বাভাবিকভাবেই পূর্বসূরীদের যথেষ্ট প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় । রাজা হরিশ্চন্দ্রের জীবন, তুলসী রামায়ণ, গীতা-উপনিষদ প্রভৃতি গান্ধী-জীবনের উপর কী বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল সে-কথা গান্ধীজীর জীবনের সংগে যারা পুরিচিত তাঁরা জানেন । পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর 'গান্ধীমানসে পাশ্চাত্য প্রভাব' শীর্ষক সুনির্ধিত প্রবন্ধটিতে (অগ্রণী, ভাদ্র-আশ্বিন, '৬৪) উল্লেখ করেছেন । কিন্তু প্রবন্ধটির বিষয় বহির্ভূত হলেও এবং কোনো নমুনা করার পূর্বে বিশ্লেষণ করার যে-চিরাচরিত প্রথা আছে তা না করেও, লেখক প্রবন্ধটির উপসংহার এই বলে করেছেন যে, 'সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা, সমাজের সম্মুখগতি কিছুই গান্ধীজীকে তাঁর 'শাস্ত' সিদ্ধান্ত থেকে চ্যুত করতে পারেনি...।' প্রসঙ্গত লেখক এই কথাও উল্লেখ করেছেন যে, গান্ধীজী 'ইতিহাস ও বিজ্ঞান-নিরপেক্ষ মিনস্কে' যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছেন এবং 'ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বোধের অভাব' তাঁর মধ্যে ছিল । বর্তমান নিবন্ধে এই বিষয়েই আমরা অল্প-বিস্তর আলোচনা করব । বলা বাহুল্য গান্ধী-মতবাদের ভাঙ করার প্রয়োজন হয় না, দীর্ঘ জীবন ধরে তিনি নিজেই তার ভাঙ করে গিয়েছেন ।

একথা সত্য যে, গান্ধীজী নতুন কোন 'বাদ' সৃষ্টি করেছেন বলে দাবি করতেন না । সমাজ রচনার কোনো ফরমূলাও তিনি সৃষ্টি করেননি । তিনি জানতেন যে, মানবসমাজ কোনো স্থিরবস্তু নয় । যুগে যুগে নতুন নতুন সমস্যা মানুষের সমাজে দেখা দেয়, সেই সমস্যার সমাধান করে ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে যাওয়াই মানুষের ধর্ম, মানবসমাজের ধর্ম । মানবসভ্যতার ইতিহাস হল যুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস । ব্যক্তির বিকাশ ও বিবর্তনের লক্ষ্য হল • যুক্তিলাভ । উত্তেজনা ও ক্ষুধার বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত হতে হবে—এমনকি জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকেও মুক্তি (মোক্ষ) লাভ করতে হবে । মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার পরম লক্ষ্যও তাই । মানব ইতিহাসের এই গতি গান্ধীজী জানতেন, তাই কোনো 'বাদ' সৃষ্টি করে ইতিহাসকে তিনি সীমিত করতে চাননি । 'দিস ফার ও নো-ফারদার' বলে কোনো কথা গান্ধীমতবাদে নেই ; গান্ধীজী শুধু এইটুকুই দাবি করতেন যে, I have simply lived in my own way to apply the eternal truths to our daily life and problems. কিন্তু শাস্ত হলেই তা বিজ্ঞানসম্মত হবে না, এ-কথা মনে করার কোনো কারণ নেই । শাস্তের অর্থ প্রাচীন নয় । প্রাচীন কালক্রমে অবাস্তব হয়ে যেতে পারে কিন্তু মানুষ আর মানুষের সমাজ যদি শাস্ত হয় তবে মানুষের জীবনধারণের এবং

সমাজগঠনেরও কয়েকটি শাস্ত্র নীতি থাকা স্বাভাবিক। ‘শাস্ত্র নীতি’ সংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবকে সূচিত করে না, বরং তার অস্বীকৃতিই অবৈজ্ঞানিক ও অতিনিশ্চয়তায় (ডগমা) আচ্ছন্ন মনের প্রমাণ দেয়।

আসলে বিজ্ঞানসম্মত বলা হবে কাকে? বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের প্রারম্ভেও প্রকৃতির সমরূপতার (ইউনিফর্মিটি অব নেচার) উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই বিজ্ঞানী কোনো বিষয়ের অনুশীলন করেন। যা প্রমাণসাপেক্ষ, অনুশীলনের সমস্ত নিয়ম মেনে চলার পর যা স্বাভাবিক পরিণতি রূপে উপস্থিত হয়, বিজ্ঞানী তাকেই পরিণাম বলে স্বীকার করেন। আর এই পরিণামকে সত্য ও সন্দেহাতীত বলে মেনে নিলেও, অন্তিম পরিণাম বলে তিনি গণ্য করেন না। বিজ্ঞানে অতিনিশ্চয়তা নেই, রহস্যবাদ নেই, তাড়াতাড়ি ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় ‘ডবল প্রমোশনের’ সম্ভাবনা নেই। সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। শুধু তাই নয়, সমাজ রচনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে খণ্ডিত করা যায় না। বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগীয় পরীক্ষায় যা উত্তীর্ণ হয় সমাজবিজ্ঞানে তারই স্থান হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধানভান্ডার কলকে ধরা যায়। যন্ত্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চেকি অপেক্ষা ধানকল যথেষ্টই উন্নত। কিন্তু অর্থনীতি-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তা যদি কল্যাণকর না-হয় তবে সমাজে ধানকলের স্থান হতে পারে না। বস্তুত গান্ধীমতবাদে এই সামগ্রিক দৃষ্টিই আমরা দেখতে পাই। তাঁর কথায়— “শতভান্ডার আদিম পদ্ধতিগুলি, আদিম বলেই তাতে ফিরে যাবার কোনো পক্ষপাতিত্ব আমার নেই। আমি ফিরে যাবার কথা এইজন্যই বলি যে, গ্রামের লক্ষ লক্ষ অলস লোককে কাজ দেবার অন্য কোনো উপায় নেই।”

আদিম বলেই যেমন কোনো উৎপাদনের সাধনের গান্ধিজী পক্ষপাতী ছিলেন না তেমনি বর্তমান কুটীরশিল্পগুলিকে যেমনকার তেমনি রেখে দেবার মত অবাস্তব প্রস্তাবও তিনি করেননি। তার কথায়—I would welcome every improvement in the cottage machine. শুধু তাই নয়, সত্যকার কল্যাণ হলে তিনি would favour the use of the most elaborate machinery if thereby India's pauperism resulting idleness be avoided. তিনি জানতেন, “যন্ত্রের একটি স্থান আছে। যন্ত্র থাকার জন্যই এসেছে।” তাই বর্তমান যুগের অবদানকে অস্বীকার করে গরুর গাড়ীর যুগে ফিরে যাবার অবাস্তব করণা গান্ধিজী করেননি। প্রকৃত কল্যাণের দৃষ্টিতে কুটীরশিল্প ও বৃহৎ যন্ত্রের সুসম বিস্তারই প্রয়োজন। তাঁর কথায়—I do visualise electricity, ship-building, ironworks, machinemaking and the like existing side by side with village handicrafts. But the order of dependence will be reversed. Hitherto the industrialisation has been so planned as to destroy the villages and village crafts. In the state of future it will subserve the villages and their crafts.

উৎপাদনের সাধনের (মিনস্ অব প্রোডাকসন) দ্বারা সমাজের রূপ কিছু পরিমাণে নিরূপিত হয়, এ-কথা সত্য। সমাজে উৎপাদনের সেই সাধনগুলিই স্থান পাবার বোধ্য

যেগুলি মানুষের সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক প্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে না এবং যেগুলির প্রচলনে সমাজে বেকার সৃষ্টির বা দমননীতির উদ্ভব হয় না। কিন্তু অনেক সময় আমরা এই কথা ভুলে যাই এবং মনে করি যে, উৎপাদনের উদ্দেশ্য (ইনটেনসন অব প্রোডাক্টস) পরিবর্তন করলেই সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যাবে। তাই ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের জন্য সৃষ্ট উৎপাদনের সাধনগুলিকে জাতীয়করণের দ্বারা সমষ্টিগত লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করেই সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি। কিন্তু আসলে এ মরীচিকা মাত্র। গান্ধীজী বাস্তববাদী। তিনি জানতেন যে, সমাজ রচনায় উৎপাদনের সাধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। তিনি ভবিষ্যৎ সমাজের খুঁটিনাটির কথা না-বললেও তার একটি রূপরেখা আমাদের দিয়েছিলেন। সেই সমাজে শোষণ আর দমনের অবকাশ থাকবে না। আর শোষণ ও দমনের অবসান ঘটতে হলে অর্থনীতির এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। আর তাহলে স্বভাবতই সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে হবে। কেবল উৎপাদনের উদ্দেশ্য বদলালেই হবে না, উৎপাদনের যে-সাধনগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থ ও ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজন তাদেরও যতদূর সম্ভব বিলীন করতে হবে। এর আরও একটি কারণ আছে। সমাজ ধাপে ধাপে রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে—একের কল্যাণ থেকে অধিকতম সংখ্যক লোকের প্রভুততম কল্যাণের সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছে। সর্বমানবের কল্যাণ অর্থাৎ সর্বোদয়ই হল সমাজের পরবর্তী পদক্ষেপ। আর তার জন্য কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার অবসান অবশ্যসম্ভবী। সমাজের সম্মুখগতির দিকে লক্ষ্য রেখেই গান্ধীজী এই নির্দেশ করেছিলেন, আর এইখানেই তাঁর বিজ্ঞানের বাস্তব ধ্যানধারণার পরিচয়।

কিন্তু সমাজের সম্মুখগতির পরিচয় কী? সমাজদৃষ্টির পেছনে মানুষের যে-মনোবৃত্তি কাজ করেছে তার ক্রমবিকাশই হল সামাজিক প্রগতির লক্ষণ। যে-প্রবর্তনা একদিন মানুষকে সমাজরচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং যে-শক্তি মানুষকে সমাজে বিধৃত করে রেখেছে তার অগ্রগতির দ্বারাই সমাজের সম্মুখগতি সূচীত হয়। সমাজের অগ্রগতি পর্বতারোহণের মত। সে-পথে চড়াই আছে। উৎরাই-এর পথও যেমন অগ্রগতিকে সূচনা করে কিন্তু আরোহণের উচ্চতাকে নির্দেশ করে না, তেমনি সমাজ বিবর্তনের সাময়িক ঘটনাগুলি অগ্রগতির পদক্ষেপ হলেও কেবল তার দ্বারাই অগ্রগতির পরিমাপ হয় না। অর্থাৎ প্রগতি দৃশ্যমান কোনো জিনিস নয়, তা অসম্ভবনীয়। গান্ধীজী সমাজের এই অগ্রগতির কথাই বলেছেন, If we turn our eyes to the time of which history has any record down to our time, we shall find that man has been steadily progressing towards ahimsa. Our remote ancestors were cannibals. Then came a time when they were fed up with cannibalism and they began to live on chase. Next came a stage when man was ashamed of leading the life of a wandering hunter. He therefore took to agriculture and depended principally on mother earth for his food. Thus from being a nomad, he settled down to civilized stable life, founded villages towns, and from a member of a family he become member of a community and nation. All these are signs of a progressive

ahimsa and diminishing himsa. Had it been otherwise, the human species should have been extinct by now, even as many of the lower species have disappeared. অহিংসার বিকাশই যদি এতাবৎ ইতিহাসের গতি হয়ে থাকে তবে ভবিষ্যৎ প্রগতিও সেই পথেই হবে—If we believe that mankind has steadily progressed towards ahimsa, it follows that it has to progress towards it still further. Nothing in this world is static, everything is kenetic.

অহিংসার নাম শুনে অনেকেরই হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে উঠবে। কিন্তু একটু নিরঞ্জেপ মন নিয়ে যদি আমরা ভেবে দেখি তবে দেখব যে, বিজ্ঞানের যুগে অহিংসা ছাড়া পথ নেই। সম্পূর্ণ ভৌতিক দিক থেকে দেখলেও, জীবনধারণের, সেইজাত প্রযুক্তির তাড়না থেকেই আজ অহিংসাকে স্বীকার করতে হয়। আজকের যুগ বিজ্ঞানের। আর বিজ্ঞানের স্পর্শ সবদিকেই। ফলে হিংসা ও বিজ্ঞানের সন্মিলনে বিশ্বই আজ ধ্বংসের যুগে। তাই আজ হয় বিজ্ঞানকে ত্যাগ করে লাঠি আর তীর ধনুকের যুগে ফিরে যেতে হবে আর নয়ত বৈজ্ঞানিক হিংসাকে ত্যাগ করে অহিংসা বা শান্তিকে দ্রুত ব্যাপকতর করতে হবে। বস্তুত বিশ্বের সমস্ত দেশের আকাঙ্ক্ষাও তাই। কিন্তু লক্ষ্য ও পথ (মিন্স্) ভিন্ন হওয়ায় মানবসমাজ আজও বৈজ্ঞানিক হিংসার হাত থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তাই সমস্ত রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা শান্তি বা অহিংসা হলেও সব দেশেই যুদ্ধের প্রযুক্তি চলছে। বিশ্লেষণ করলে এর আরও একটা কারণ দেখা যায়। আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধান শান্তিপূর্ণ উপায়ে হোক, এ আজ প্রত্যেক দেশেরই আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু প্রত্যেক দেশেই আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির সমাধানের জন্যে শেষ উপায় হিসাবে হিংসা আজও স্বীকৃত হয়ে আছে। এই-যে অসংগতি তা সংস্কারাচ্ছন্ন মনের পরিচয় দেয়। বৃহত্তর সমস্যার সমাধানে যে-পথ গ্রহণীয়, সেই পথের অনুসরণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সমস্যার সমাধানে হওয়া উচিত, একথা বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন, বৈজ্ঞানিক মনেরই কথা।

বস্তুত গান্ধীমত্ববাদের শ্রেষ্ঠ অবদান হল লক্ষ্য ও পথের অভিন্নতা। There is no wall of separation between ends and means. পৃথিবীতে সমাজ রচনার এতাবৎ যত পরীক্ষা হয়েছে তাদের দুটি ভাগ করা যায়। একদল মানুষকে স্বাধীন রাখতে চেয়েছেন আর তার জন্যে সব মানুষের সুখকে বিসর্জন দিতেও তাঁরা প্রস্তুত। এই মতবাদ থেকেই অর্থনীতির ক্ষেত্রে লেজি ফেরার নীতির সৃষ্টি। আর একদল মানুষকে সুখী করতে চেয়েছেন আর তার জন্যে তাঁরা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এই মনোভাগ থেকেই দলবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের একনায়কত্ব মতবাদের উদ্ভব। কিন্তু সুখ ও স্বাধীনতা মানুষের জীবনে এত অঙ্গাদী ভাবে যুক্ত যে, একের অভাবে অপরটি পুষ্ট হতে পারে না। সেইজন্মে দু'এর সমন্বয় সাধন ও সমাজে দুটির উন্মীলন হওয়া প্রয়োজন। বঙ্গা বাহন্য, লক্ষ্য ও পথের একরূপতার হারাই তা সম্ভব। আর তা-ই বিজ্ঞানসম্মত পন্থা।

সাম্প্রতিককালের দুটি ঘটনাও এই কথার সাক্ষ্য দেয়। শোষণপীড়িত মানুষের কাছে প্রথম আশার বাণী শুনিরেছেন মাহাত্মা কার্ল মার্কস। তাঁরই আদর্শে

অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বহারার স্বাধীকার প্রতিষ্ঠায় প্রথম আন্দোলন করলেন মহান বিপ্লবী লেনিন। কার্ল মার্কস আশা করেছিলেন যে, সর্বহারার একনায়কত্বের ফলেই একদিন রাষ্ট্র আপনাপনি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। লেনিনের নেতৃত্বে সর্বহারার পক্ষ নিয়ে যারা সংগ্রাম করেছিলেন সেই দলেরই শাসন রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু গত চল্লিশ বছর ধরে রাশিয়ার ভাল-মন্দ যাই হয়ে থাকুক, রাষ্ট্রবিলুপ্তির সামান্যতম সম্ভাবনাও যে সেখানে দেখা যায়নি একথা কোন নিরপেক্ষ লোক আজ অস্বীকার করতে পারেন? রাষ্ট্রবিলুপ্তির একান্তই কোনো প্রয়োজন আছে কিনা, আজকের দিনে সাম্যবাদী আদর্শে সেই নিয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু অস্তিত্বে রাষ্ট্রবিলুপ্তিই যদি আদর্শ হয় তবে সমাজরচনার প্রাথমিক কর্মসূচীতেও তার সূত্রপাত হওয়া উচিত। গান্ধিজী সেই জিনিসই চেয়েছেন। আর এইটিই হল ইতিহাস ও বিজ্ঞানসাপেক্ষ মন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল হাঙ্গারীতে। স্থায় কোন দিকে ছিল তা বিচার করা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু হাঙ্গারীর ঘটনা থেকে একটি শিক্ষা আজ বিশ্ববাসীর হয়েছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোনো দল বা শ্রেণীর বিরুদ্ধে সহিংস বিপ্লবের দ্বারা সুফল লাভের সম্ভাবনা আজ আর নেই। পৃথিবী আজ বিবদমান দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল বা শ্রেণী বাইরের সমাদর্শী কোনো রাষ্ট্রের সাহায্য সহজেই লাভ করতে পারেন। আর তার ফলে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষুলিৎ অচিরে আন্তর্জাতিক বাড়াবানলে পরিণত হতে পারে। শোষিত শ্রেণীর মুক্তি তাতে হতে পারে না।

গান্ধিজীর স্বভাবজ দূরদৃষ্টি ছিল। তাছাড়াও পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতার শিক্ষাও তিনি পেয়েছিলেন। ইতিহাসের বিবর্তন এবং বৈজ্ঞানিক নব নব অধিকারের মূল দৃষ্টিও তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই বিপ্লবের সঠিক পন্থার নির্দেশ তিনি দিতে পেরেছেন। সে-পন্থা সত্যই শান্ত, কিন্তু কোনো কারণেই তা অপ্রাকৃত নয়। আর তা হল হৃদয়পরিবর্তনের পথ। বর্তমান যুগে শ্রেণীবৈষম্যের প্রবলই সবচেয়ে বড়। এই বৈষম্য নিরাকরণের পথরূপেও গান্ধিজী হৃদয়পরিবর্তনের নির্দেশ করেছেন। শ্রেণীসংঘাত না-হলেই শ্রেণীবৈষম্যের অবসান হবে না, এই পূর্ব-ধারণা নিয়ে যারা স্বপ্নাবিষ্ট তাঁরা অনেক সময় মনে করেন যে, গান্ধিজী বোধহয় শ্রেণী সংগ্রামকেই অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তা সত্য নয়। The correspondent is wrong in suggesting that I do not believe in the existence of class struggle. শুধু তাই নয়, গান্ধিজী এ-কথাও জানতেন যে, সম্পদের স্বেচ্ছায় ভাগ যদি না-হয় তবে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন অবশ্যস্বাভাবী। কিন্তু শ্রেণী-সংঘাতকে গান্ধিজী কাম্য মনে করেননি এই জন্যই যে, তাতে সুফল হতে পারে না। আর মন জপলেই হৃদয় পরিবর্তন হয়ে যাবে, এ-কথাও তিনি মনে করতেন না : I believe myself to be a revolutionery—a non-violent revolutionery. My means are non-cooperation, willing or forced, of the people concerned. দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে গান্ধিজীর এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, স্থায়ী ফললাভ করতে হলে হৃদয়পরিবর্তনের পথই একমাত্র

পথ । আর হৃদয়পরিবর্তনের জন্তে I have come to the fundamental conclusion that if you want something really important to be done you must not merely satisfy the reason, you must move the heart also. The appeal of reason is mere to the head, but the penetration of heart comes from suffering. আর স্বচ্ছায় যন্ত্রণাভোগের নামই সত্যাপ্রহ, গান্ধীজীর কথায় moral equivalent of war.

বর্তমান যুগে সমস্ত সমাধানের পথ হিসাবে সহিংস আন্দোলন যখন অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে তখন একমাত্র বিকল্পরূপে গান্ধী-পথই শোধিত মানুষের কাছে আলোকবতিকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে । এ-পথ কঠিন, এ-পথ দীর্ঘ সন্দেহ নেই । আর এ-কথা ঠিক যে, নোট বই পড়ে পাশ করার যেখানে চেষ্টা, ব্যধির প্রতিবেদনের পরিবর্তে উপশমেরই যেখানে আকাঙ্ক্ষা, সেখানে সমাজ বিপ্লবেও মানুষ একটা সহজতর পথ কামনা করে । কিন্তু তার সংগে এ-কথাও সত্যি যে, ইতিহাসের গতি অমোঘ এবং বিজ্ঞানে 'শট কাটের' কোনো ব্যবস্থা নেই ।

আজকে

প্রণয় গোস্বামী

ভখন ভোটের বাজার। চারদিকে গরম বহুতা। টেট-বাসে করে উত্তর কলকাতায় কোথাও যাচ্ছিলান। সার্কুলার রোড থেকে বিবেকানন্দ রোডের দিকে বেকে মোড়ে এসে বাসখানা দাঁড়ালো। আর ওখানেই কিছু লোকের ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি বহুতার গলা শোনা গেল। হু-একটি কথা যা কানে আসছিল তাতে বুঝতে বাকি রইল না যে, কোনো বামপন্থী দলের তরুণ বক্তা আগল নির্বাচনের গুরুত্বের কথাই বোঝাচ্ছেন সর্বসাধারণকে। এ-কথাটা বুঝলাম এবং বুঝলাম আর একটা কথাও। সেটা বক্তার মুদ্রা-দোষ “আজকে”। যতক্ষণ টেট-বাসখানা মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি তার মধ্যেই শুনলাম বার দশ-বারো কমপক্ষে “আজকে” কথাটা ব্যবহার করেছেন বক্তা।

বক্তা অনর্গল বলে যাচ্ছেন, আজকে আমাদের ভেবে দেখতে হবে আমাদের সামনে আজকে যে-নির্বাচন উপস্থিত হয়েছে, আজকে দেশের এই সংকটময় অবস্থায়... ইত্যাদি।

একটি মুদ্রাদোষ কি করে সমাজের বুকে শিকড় বিস্তার করে বসতে পারে সেটা সত্যি ভাববার কথা।

ভেবে দেখুন, আমাদের সমস্ত কাজকর্মের মূলেই আছে আজকে। আজ আমরা কি খাব, সব সময় সে-চিন্তায় ব্যস্ত থাকি; কিংবা অন্যভাবে বললে বলতে হয়, ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হই। মাসের শেষ সপ্তাহের প্রতিটি দিনের কথা একবার ভাবুন দেখি। দেখবেন সবকটা দিনই ‘আজকে’। সকালে উঠেই ভাবি কোনো রকমে আজকের দিনটা চালাতে পারলেই হয়, তারপর দেখা যাবে। বাজার-করা থেকে চাল-ডালের দোকান সব জায়গাতেই শুধু এই একটি ভাবনার উপরে ভর দিয়ে সপ্তাহের সব ক’টি দিনের বৈতরণী পার হয়ে আসতে হয়।

ছুটির দিনের কথা ধরুন। ছ’দিন কাজ করার পরে একটি দিন রবিবার। আমরা ভাবি, পরের চিন্তা পরে হবে। আজকের এই ছুটির দিনটি মোটেই মাটি করা যায় না। অভ্যাসমতে আমরা কেউ তাম খেলি, কেউ-বা মাছ ধরি। কেউ আবার মামা-নাসী-পিসী কিংবা দিদির বাড়ি বেড়িয়ে আসি। ভাবটা কি?—সারা হপ্তা তো খেটে মরি, মশাই, আজকের দিনটি বইতো নয়? এ-দিনটির কোনো মতে বাজে খরচ করা উচিত কি? যারা আবার আড্ডা-রসিক তাদেরও ঐ একই অবস্থা। আজকের দিনটিকে তারাও পুরোপুরি কাছে লাগাতে কসুর করেন না বিন্দুমাত্র। তারা আজ আটটা-নটা থেকে দুপুর বারোটা-একটা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে থাকেন অনায়াসে, অক্লেশে।

আপিসেও দেখবেন, হয়তো কোনো একদিন ষ্টাফ খুব কম এসেছে, ধরুন বিয়ের তারিখ। অনেকেই বরযাত্রী যাওয়ার নিমন্ত্রণ রক্ষা করছে বা অমনি একটা কিছু। বড়বাবু যিনি ভুলবশেও আপনার সঙ্গে হেসে কথা বলেন না, এসে বলেন, হেঁ হেঁ, ইয়ে

বাবু আজকের দিনটা কোনো রকমে তুলে দিন। আপনার নেমতন্ন নেই বুঝি ?.....
এমনি আরো কত কি আলাপ। সমস্তটা যেন শুধুই আজকের। বিশেষ করে এসব দেখতে পাবেন মার্চেন্ট অফিসে। সে-সব জায়গায় কাজ জমিয়ে (পেনডিং) রাখার অনেক ঝামেলা। এমন কতগুলো সেকশন আছে যেখানে কোনো মতেই কাজ জমানো চলে না।

আমাদের সামাজিক জীবনে আবার কতগুলো দিন আছে যেমন, পয়লা বৈশাখ, জামাইবঠী, বিজয়া-দশমী, ভাই-কোঁটা, পৌষসংক্রান্তি, ত্রীপক্ষমী এগুলোও প্রত্যেকটিই আজকে। বাড়িতে বড় কেউ যাদের আছেন, যেমন ধরুন, বুড়ো মা কিংবা ঠাকু'মা। দেখবেন তাদের ব্যাপারখানা একবার। তাঁরা বলবেন, আজকের দিনে বাচ্চাদের সঙ্গে অমন করিস্ নে। ওদের আজ নতুন জামা-কাপড় দিবি, একটু ভাল-মন্দ খাওয়াবি। তাতে সেগুড়ে বালি, আবার ওদের সঙ্গে অমন করচিস ? নতুন জামা-কাপড় দেওয়াটা আপনার নিত্যন্ত কর্তব্য। বছরের একটা দিন বৈতো নয়। আজকের দিনের দাবী আপনার কোনোমতেই অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। আপনার নিশ্চয় এর বিরুদ্ধে কতগুলো যুক্তি আছে যা আপনি ভেবে-চিন্তে মনে মনে দাঁড় করিয়েছেন; কিন্তু তা আপনি বুড়ো মা-ঠাকু'মার মুখের উপরে বলতে পারবেন কি ? পারবেন না। কাজেই আজকের এই সামান্য সমস্যা যে আপনি সমাধান করতে পারছেন না সেটা বুঝে শুনে চুপচাপ বসে থাকুন।

আরো একটি আজকের ধাক্কা আছে। যেমন ছেলেকে নিয়ে পড়াতে বসলেন। ছেলে কিছুতেই পড়াতে চাইছে না। বড় কান্নাকাটি করছে। আপনার মা এসে অমনি সামনে হাজির। আজ থাক, নাইবা পড়ল, ছেড়ে দে।

এই তো গেল এক দিকের কথা। এর আবার একটা উল্টো পিঠ আছে। আপনার হয়তো দু-চারটে টাকা দোকানে কিম্বা এক বন্ধুস্থানীয় লোকের কাছে ধার আছে। তারাও দেখবেন আপনার উপরে সব সময় খাঁড়া উঁচিয়েই আছে। মশাই, আজকে আর ফেরাবেন না। অনেক দিন ঘুরিয়েছেন। আজকে দিয়ে দিন।

উপরের যে কোনো 'আজকে'র চাইতে এই 'আজকে' যে কত মারাত্মক তা আপনি আমি সবাই হাড়ে-হাড়ে জানি।

একটি ছোট গল্প বলে শেষ করব আজকের এই কাহিনী।

গল্পটি শুনেছি ভানুদার আড্ডায়। যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলেছেন তিনি নিজেও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন।

পুরনো কলকাতার এক রাজবাড়ির কাহিনী। তাঁদের তখন পড়ন্ত অবস্থা। সংক্ষেপেই বলছি।

ওবাড়িতে এক জন ছিল পুরনো আমলের বিশ্বাসী চাকর। নাম কাশী। বাড়িতে ঝাড়-লঠনগুলোও এখন আর মোছামুছি হয়ে ওঠে না। এমনি পড়ে এসেছে অবস্থাটা। ছোটরানীর যে কোনো গোপূর্ণ কারণে হঠাৎ দশ হাজার টাকার দরকার হয়ে পড়লো। রাস্তার বেলাতেই কাশীকে ডেকে তিনি একটি মুক্তোর হার হাতে দিয়ে বললেন, যা কাশী, যে-ভাবে হোক, বন্ধক দিয়ে কিম্বা বিক্রী করে দশ হাজার টাকা

জোগাড় করবি। খুব গোপনে কিন্তু। এবাড়ির কেউ যেন ধূপাকরেও জানতে না পারে। বুঝলি কানী ?

কানী পুরনো বুদ্ধিমান চাকর। এ-বাড়ির। রাত্তির বেলাতেই বেরিয়ে গেল পেছন দরজা দিয়ে স্ত্রাকরার দোকানে। তখন স্ত্রাকরাদের দোকান বন্ধ করার সময়। জিনিসপত্র সব গুছোচ্ছিল ওরা। এমন সময় কানী গিয়ে হাজির। স্ত্রাকরারা মুক্তোর হারখানা হাতে করে নেড়েচেড়ে দেখে বললে, বন্ধক রাখা চলবে না। যদি বিক্রি করো, চেষ্টা করে দেখতে পারি। পাশের দোকানথেকে দু-একজন স্ত্রাকরা এলো। তারা মোট ছ'জন মিলে ভেবে ঠিক করলো, বারো হাজার টাকা দেওয়া যেতে পারে।

কানী অনেক বুলাবুলি করেও চোদ্দ হাজার আদায় করতে পারলো না।

পরদিন দিনের আলোতে স্ত্রাকরারা ভালো করে হারটি দেখে নিজেদের মধ্যে নীলাম করলো। উপরের দাম উঠলো পঁচিশ হাজার। নগদ টাকায় একজন নিয়ে নিলো। বোম্বে গিয়ে সে ঐ হার বিক্রি করল তিয়ান্তর হাজার টাকায়। পরে ওটা লওনে নাকি এক লক্ষ টাকায় বিক্রি করে এসেছে বোম্বের স্ত্রাকরা।

শোনা গেল ঐ মুক্তোর হার প্যারিস্ থেকে দেড়লক্ষ টাকায় কেনা ছিল।

রাজবাড়ির পড়ন্ত অবস্থায় আজকের সমস্তা তা বেরিয়ে গেল মাত্র বারো হাজারের বিনিময়ে। তাও আবার বাড়ির কর্তাদের অজ্ঞাতে।

পড়বার সময় এমনি করেই লোকের আজকের সমস্তা দেখা দেয়।

আজকে আমাদের সবার জীবনেই এই এক সমস্তা “আজকে”। তাই বলছি “আজকে” তরুণ সেই বামপন্থী বক্তার মুদ্রাদোষই নয় ; ওটা প্রায় সর্বাধিকার জীবনের মুদ্রাঘটিত দোষ।

ধলভূম

প্রবন্ধ চট্টোপাধ্যায়

বিহারের বাসিন্দা বাঙ্গালীদের প্রতি যে ভাল ব্যবহার করা হয়, তাহা নহে। রাজ্যপুনর্গঠন সমিতির নিকট ধলভূমের বাঙ্গালীদের পক্ষ হইতে যে স্মারকলিপি দেওয়া হইয়াছিল তাহা হইতে জানা যায় যে, বিহারের নাগরিক হইয়াও তথাকার বাসিন্দা বাঙ্গালীরা বিহারীদের তুলনায় বিহারসরকার হইতে ভেদাঙ্ক অন্মায় আচরণ পাইয়া থাকে। ধলভূম মুক্তি পরিষদের কর্মসচিব গত ৪ঠা মে ১৯৫৬তে এক বিবৃতিতে বলেন যে, কার্যত এখনও ধলভূমের স্থায়ী বাসিন্দাদের সরকারী কর্তৃপক্ষকে ডোমিসিল সার্টিফিকেট দেখাইতে হয় যাহাতে কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় করিতে পারে যে তাহারা বিহারেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। বিহারের হিন্দিপ্রধান অংশে হিন্দিভাষীদের এই দায় নাই, ধলভূমের হিন্দিভাষীদেরও নাই; কিন্তু ধলভূমের বাঙ্গালীর নিকট ডোমিসিল সার্টিফিকেট না-থাকিলে কাগজকলমে যাহাই নিয়ম থাকুক, কার্যত বিহারে সরকারী চাকুরী ও মিলিবেই না, সরকার হইতে অন্য কোনো সুবিধা যথা পারমিট বা কোন কোন ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত অনুমতি আদায় কিংবা সরকারী কন্ট্রাক্ট বা সরকারের কোন কাজ করিয়া দিবার জন্য আধিক চুক্তি—এ সকলও একজন বিহারীর সহিত সমতুল্য ভাবে পাইবার যো নাই। যে সব বাঙ্গালী ধলভূমে পুরুষাক্রমে বাস করিতেছেন, যাহাদের ধলভূমে বাস্তভিটা, তাহাদেরই এই দুর্দশা; তাহাদের অপরাধ যে তাহারা বাঙ্গালী।

তারপরে শিক্ষার ব্যাপারে অ-হিন্দি স্কুল পাঠশালা হইতে সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া দিবার হুমকি ও বিহার গভর্নমেন্ট কর্তৃক হইতে সদা সর্বদা আছেই। বহু জায়গায় সরকার জোর করিয়া বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়সমূহকে হিন্দিমাধ্যমে শিক্ষা দিতে বাধ্য করিয়াছেন। হিন্দিমাধ্যমে স্কুল আর বাংলা মাধ্যম স্কুলে কি রকম তারতম্য করা হয় তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ জামশেদপুরে রামকৃষ্ণ মিশন চালিত দুই স্কুলের ব্যাপার হইতে পাওয়া যায়। স্কুল দুইটির একটিতে হিন্দির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় আর একটিতে শিক্ষার বাহন বাংলা। প্রথমটি অনায়াসে বিহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং গভর্নমেন্ট হইতে স্বীকৃতি পাইল, দ্বিতীয়টি তিন বৎসর অক্লান্ত চেষ্টার পরেও তাহা পায় নাই। রাজ্যপুনর্গঠন সমিতির নিকট ধলভূমবাসীর স্মারকলিপি হইতে আরও জানা যায় যে বাঙ্গালী হইলে স্থানীয় ছাত্রদের পক্ষে অবধি স্কুলসমূহে প্রবেশানুমতি পাওয়া দুর্বল হইয়া উঠিতেছে।

অতঃপর ধলভূমে জনসাধারণের মতামত ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা ও সুবিধার কথা। ১৯৪৭ সন আগষ্টমাসে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার ৩০৪ দিন পরে ১৮ এবং ১৯ আগষ্ট তারিখে জামশেদপুরে বিহার বাঙ্গালা সম্মিলনের নবম বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হয়। তাহাতে বিহারের বাঙ্গালী অধ্যুষিত সীমান্ত অঞ্চল বাঙ্গালাদেশের সহিত যুক্ত করা হউক এই মত গৃহীত হওয়ার পর সভায় যে তুমুল

উপদ্রব আরম্ভ হইল তাহা বর্ণনাতে। বাহির হইতে আসিয়া বিহারী গুওরা অস্ত্রহস্তে সভায় শ্রোতা-বক্তা-আগন্তুক নিবিশেষে সকলকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। হুইঙ্গন বাঙ্গালী সাংঘাতিক ভাবে জখম হইলেন। পুলিশ নিষ্ক্রিয় রহিল। ইহার কিছু পরে সভাসমিতি করিবার যে সব নিয়ম কর্তৃপক্ষ বাধিয়া দিলেন তাহাদের দ্বায় অসং এনন কি অসম্ভব শর্ত আর কিছু হইতে পারে না। নিয়মগুলি করা অর্থ কর্তৃপক্ষ অনুপ্রাণিত ব্যতীত সভাসমিতি যাহাতে না-হইতে পারে তাহাই সুনিশ্চিত করা।

সভাসমিতি করার শর্তগুলি হইল এই :

- ১। পূর্বেই সভার আশ্রায়ক ও বক্তাগণের নাম কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে ;
- ২। কোনো রাজনৈতিক আলোচনা চলিতে পারিবে না ;
- ৩। সভায় যাহা প্রস্তাব করা হইতে পারে মায় যে-সকল বক্তৃতা করা হইতে পারে, তাহার অথবা তাহাদের নকল কর্তৃপক্ষকে সভার পূর্বেই পাঠাইতে হইবে ;
- ৪। সভার প্রতিদিনের কার্যক্রম অন্তত একদিন আগে কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে।

সময় বিশেষে উপরোক্ত নিয়মগুলির প্রয়োগের ব্যতিক্রম ছিল, বিশেষত বলা বাহুল্য, এই নিয়মগুলি কখনও সরকার সমর্থিত হিন্দিভাষীদের সভায় কিংবা হিন্দি-ভাষীর অধুকূলে সভাসমিতি বক্তৃতায় প্রযোজ্য হয় নাই।

রাজ্যপুনর্গঠন সমিতির জামশেদপুর সরকারকালে, বিহার সরকারের তরফ হইতে বাঙ্গালার দাবী ব্যর্থ করিবার আয়োজনের সীমাপরিমীমা ছিল না। প্রচারের জন্য মোটরগাড়ি ও লরী জবরদখলের হুকুম হইয়াছিল—গাড়িগুলির মালিকদিগের প্রতিজ্ঞনের কাছে পূর্বরাত্রে পুলিশ কনস্টেবল পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল যে গাড়িগুলি যেন যথা সময়ে হাজির হয়, শুধু তাহাই নহে, হাজির হইবার হুকুম তামিলের জামিন হিসাবে গাড়িগুলির চালকদিগের লাইসেন্সগুলি কাড়িয়া লইয়া পুলিশ তাহাদের নিজেদের হেফাজতে রাখিয়াছিল।

১৯৫৫ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারীতে রাজ্যপুনর্গঠন সমিতির নিকট সাক্ষ্যদানের পর ও আগে ধলভূমের প্রতিনিধিগণের লাঞ্ছনার অবধি ছিল না। সাক্ষ্যদানের পর রাস্তায় বাহির হইলে কয়েকটি গুণ্ডা আসিয়া তাঁহাদের প্রহার করে—দুর্ভাগ্যবান তাঁহাদের গায়ে ধুধু অবধি দিয়েছিলেন—পুলিস অবশ্য নিষ্ক্রিয়ভাবে তামাসা দেখিয়াছে। তাহাদের নেতা ধলভূম হিতৈষিনী সমিতির সভাপতি ডাক্তার অরুণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর প্রহার আর লাঞ্ছনার চোটটা বেশ বড়োভাবে পড়িয়াছিল। আবার এক বৎসর বাদে ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬তে যখন জামশেদপুরে বিহারীরা পুরুলিয়ার ও কিসানগঞ্জের কিছু অংশ বাঙ্গালায় চলিয়া যাইবার প্রতিবাদে হরতাল ঘোষণা করিয়াছেন—তখন সেই হরতাল ভঙ্গের অভিযোগে গুণ্ডাগণ দ্বারা এই সব উদ্ভলোক আর একবার ভীষণভাবে প্রহৃত হইলেন। তিনি জামশেদপুরে একজন সর্বপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক—হরতাল হইলেও সর্বজনস্বীকৃত প্রথা অনুযায়ী কয়েকটি জরুরী কর্মানুসরণ, বিশেষত চিকিৎসার কার্য কখনও বন্ধ থাকে না। ডাক্তার অরুণচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাধ, তিনি হরতালের দিনে তাঁহার চিকিৎসাগার বন্ধ রাখিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।

রাজ্যপুনর্গঠন সমিতির নিকট কিন্তু বিহারীদের এইপ্রকার গুণানীর দাম ছিল। বিহার সরকারের শঠতা তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। বলপূর্বক স্থানীয় জনগণের কঠরোধ করা হইয়াছে, বাহির হইতে প্রচুর অর্থ দিয়া লোক আনিয়া বহু আফ্রাফানে ধলভূম বিহারের বলিয়া প্রচার করা হইতেছে, ধলভূমের নেতৃস্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে স্ব স্ব গৃহের বাহির হওয়া অবধি বিপজ্জনক; রাজ্যপুনর্গঠন সমিতির নিকট এই সমস্তই তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য হইয়া গেল—গোয়ালপাড়ায় তদদেশীয় কয়েকজনের স্বার্থবুদ্ধিতে স্বকৌশল উদ্ভাবিত বাঙ্গালী নির্ধাতন দেখিয়া যেমন তাঁহাদের বুদ্ধিতে উদয় হইয়াছিল যে গোয়ালপাড়া আসামীদের দেশ, বাঙ্গালীর নহে,—তেমনি ধলভূমে বিহারীদের জাঁকজমক বাহ্যিকোন্ট কলরবে অভিভূত হইয়া মস্তব্য করিলেন—ধলভূমকে বাঙ্গালার অন্তর্গত করিতে যথেষ্ট আন্দোলন নাই। গুণানী এবং ধূর্ত রাজনৈতিক প্রচারে এই সমিতি বরাবর বিভ্রান্ত হইয়াছেন—শুধু বিহারে নহে অন্য কয়েকটি স্থানেও সরকারী বা বেসরকারী অর্থে পুষ্ট কয়েকজনের প্ররোচনায় গুণানী, ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও স্থানীয় লোকদিগকে ভীতিপ্রদর্শনের ফলে অপপ্রচারের দ্বারা তাঁহারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছেন বলিয়া দেখা গিয়াছে।

আন্দোলন নাই, আন্দোলনের সব পথ সরকারীভাবে বলপূর্বক রুদ্ধ করার পর, আন্দোলন নাই এই অভিযোগ উদ্ভাদের পরিহাসের দ্বারা শুনা যায়। সরকারী নিষেধ স্বত্বেও আন্দোলন চালাইতে গেলে ব্যাপকভাবে আইন অমান্য করিতে হয়—স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর স্বাধীনদেশে তাহা করিতে যে জনসকলের মনে কতদূর অনিচ্ছা জন্মিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। ধলভূমের জনগণের ধলভূমকে বাঙ্গালাদেশের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যে কতদূর আন্তরিক আগ্রহ তাহার নিদর্শন গত নির্বাচনে ধলভূমে লোকসেবক সঙ্ঘের লোকসভার সদস্যপদপ্রার্থীদের বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ। কংগ্রেস চাহিয়াছিল, ধলভূম যেমন আছে বিহারে, তেমনি থাকুক; লোকসেবক সঙ্ঘ চাহিয়াছিল, ধলভূম বাঙ্গালাদেশের অন্তর্গত হউক। নির্বাচনফলদে ধলভূমের ভবিষ্যৎ ছিল সর্বাপেক্ষা বড়ো প্রশ্ন—তাহাতে কংগ্রেস বিপর্যস্তভাবে হারিয়া যায়। এইত সেদিনেও গত ৫ই মে ১৯৫৬ তারিখে শ্রীকিশোরী মোহন উপাধ্যায় এবং শ্রীবিক্রম চন্দ্র চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ১৭৫ জন ধলভূমবাসী পায়ে হাঁটিয়া ধলভূম হইতে কলিকাতায় আসিয়া এখানকার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়ের অট্টালিকার সম্মুখে ধলভূমের বাঙ্গালাভুক্তির দাবীতে ধ্বনি দিতে দিতে কারাবরণ করিয়াছে।

সিংভূমের সদর অর্থাৎ টাইবাসা মহকুমার ওড়িআভাষীর প্রাধান্য হইলেও ওড়িআভাষীরা জানে যে সিংভূম জেলার ধলভূম মহকুমায় তাহাদের কোনো দাবী নাই। ধলভূম বাঙ্গালাদেশের প্রাপ্য বলিয়া ওড়িআরা স্বীকার করে ও তাহারা বঙ্গভুক্তির আন্দোলন সমর্থন করে। উড়িষ্কার বহু নেতা,—তাঁহাদের মধ্যে উড়িষ্কার ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি পরে উড়িষ্কা হইতে নির্বাচিত লোকসভার সদস্য শ্রী বি কে রায় একজন—পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাহিরে একান্তে এ-বিষয় বাঙ্গালীর দাবীকে যুক্তিসহ ও অত্যাৱশ্যক বলিয়া

অভিহিত করিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য স্থানে বহু নিরপেক্ষ ব্যক্তি ধলভূমের বঙ্গ-ভুক্তি সমীচিন বোধ করিয়াছেন। লোকসভার সদস্য ডাক্তার লক্ষ্মীন্দ্রনাথের ইহাই মত এবং তাঁহার সভাপতিত্বে ১৯৫৩ সনের এপ্রিল মাসে অকংগ্রেসী দলগুলি কর্তৃক আহূত যে সর্বভারতীয় ভাষাভিত্তিক প্রদেশ সম্মিলনীর অধিবেশন বসিয়াছিল, তাহাতে ধলভূমের প্রতি বাদ্যলার দাবী জোরের সহিত স্বীকৃত হইয়াছিল।

পুরুলিয়ার ও কিবাণগঞ্জের কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সে সিদ্ধান্ত উল্টাইয়া দিবার চেষ্টার বিরাম ছিল না। প্রায়ই তিনি পশ্চিমবঙ্গের দাবীর বিরুদ্ধে বিহারে বহুস্থানে ধর্মঘট, হরতাল ও বিক্ষোভের কথা উল্লেখ্যে ঘোষণা করিয়াছেন; যখন তখন বলিয়া বেড়াইয়াছেন যে বিহার হইতে কিয়দংশ ভূমিও পশ্চিমবঙ্গকে ছাড়িয়া দিবার সিদ্ধান্তে বিহারবাসীদের ভিতর যে গভীর সন্তাপ এবং ক্রোধের স্রষ্টি হইয়াছে তাহা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং সে মর্মব্যথা তিনি নিজ প্রাণে অনুভব করেন। অতীতকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গের বাহিরে নিকট সীমান্তে বাদ্যলীদিগকে বর্জে ফিরাইয়া আনিবার ব্যাপারে একান্ত উদাসীন। পর-সম্পদে শ্রীকৃষ্ণ-সিংহ-চালিত বিহারসরকারের যত আগ্রহ, নিজ অধিকারে শ্রীযুক্ত বিধান রায়ের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত নহে, কারণ এখানে অধিকার সাব্যস্ত করিতে হইলে শক্তির সহিত বিবাদ করিতে হইবে। বাদ্যলার সমস্তার সমাধানে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের আস্তরিকতা ও নিরপেক্ষতার অভাব রহিয়াছে, একথা কে অস্বীকার করিবে।

তাই রাজ্য পুনর্গঠন সমিতি ধলভূমের বঙ্গভুক্তির পক্ষে ভাষা কিংবা অন্য কোনো দফায় আপাতদৃষ্টিতে অবধি একটি কারণও খুঁজিয়া পায় নাই (রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির বিবরণী—৬৬৭ অনুচ্ছেদ)। এই রকম ত হইবেই। প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকার, —জাতির সম্মান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাহার দায়িত্ব ও আগ্রহ সর্বাপেক্ষা বেশি হওয়া স্বাভাবিক—সেই সরকারই যদি স্বীয় জাতির জন্য সুপারিশ করিতে উদাদীন থাকে বা ভয়ে পিছাইয়া যায়, তাহা হইলে ভারতের বর্তমানাবস্থায় বৃহত্তর ভারতীয় মহাজাতির দরবারে সে জাতি তাহার ক্ষায়া প্রাপ্য পাইবে না, ইহা ত জানা কথা।

ধলভূমকে বিহারের জন্য বজায় রাখিতে রাজ্যপুনর্গঠন সমিতিকে কম বাধা অতিক্রম করিতে হয় নাই। পশ্চিমবাদ্যলা এবং উড়িষ্যা, দুই প্রদেশের দাবী উল্টাইয়া তবেই না বিহার রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির সুপারিসে ধলভূম নিজ সীমানার ভিতর রাখিয়াছে! পুরুলিয়া উপজিলার বিষয় নিম্নরাজি হইয়া শেষকালটা রাজ্য পুনর্গঠন সমিতি যখন উহা পশ্চিমবঙ্গকে দিয়াই দিলেন, তখন সমস্তা হইল যে তাহা হইলে বিহারবাসী ধলভূমে বিহারের পথে যাইবে কি করিয়া? একমাত্র উপায় চাঁইবাসা আর সেরাইকেলা মহকুমার ভিতর দিয়া যাওয়া, কিন্তু সে সব স্থানের প্রতিও যে উড়িষ্যাবাসীর দাবী অকাট্য। তখন ধলভূম বিহারে রাখিবার জন্য রাজ্যপুনর্গঠন সমিতি উড়িষ্যার ক্ষায়া প্রাপ্য অগ্রাহ্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। চাঁইবাসা ও সেরাইকেলা খারসোয়ান সমেত বিহারে থাকিয়া গেল। একটি অন্তায় বজায় রাখিতে আরও বহু অন্তায় প্রবৃত্ত হওয়া, একটি মিথ্যা চাকিতে গিয়া আরও মিথ্যার আশ্রয় লওয়ার এমন দৃষ্টান্ত সচরাচর বহুস্থানে পাওয়া যায় না।

সেরাইকেলা ও খারসোয়ানে ওড়িয়ারাই সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর জাতীয় গোষ্ঠী এবং চাঁইবাঙ্গা মহকুমায় হো-শ্রেণীর আদিবাসীর পরেই সংখ্যায় ওড়িয়ারদের স্থান। হো'রা শতকরা ৯৫ জনে উড়িষ্যাপ্রদেশ এবং চাঁইবাঙ্গা ও সেরাইকেলা মহকুমায় থাকে। চাঁইবাঙ্গা ও সেরাইকেলা মহকুমা উড়িষ্যার সহিত একেবারে লাগাও, পাশাপাশি। সুতরাং এখন যেমন হো'রা দুইরাজ্যের শাসনে বিভক্ত হইয়া আছে—একটি অংশ পড়িয়াছে উড়িষ্যায় আর একটি বর্তমান বিহারস্থ চাঁইবাঙ্গা ও সেরাইকেলা এই দুইটি মহকুমায়—চাঁইবাঙ্গা ও সেরাইকেলা উড়িষ্যার শাসনাধীন হইলে তেমনি হো-জাতির প্রায় সকলেই এক রাজ্যের এলাকায় থাকিতে পারিত—তাহাদের আর বিধাবিভক্ত হইতে হইত না। হো-জাতির সহিত ওড়িয়ারদের বিশেষ সম্প্রীতি। ওড়িয়া ছাড়া কাহারও সহিত হোদের বনিবনাও হয় না। ভাষার সাদৃশ্য, রাজনৈতিক চিন্তাবৃত্তিতে এবং সামাজিক সদভাবে হো এবং ওড়িয়ারদের ভিতর সম্বন্ধ নিকট হইতে নিকটতম। হো'রা তাই স্বভাবতই তাহাদের সমগ্র বাসভূমি উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত করিতে চাহে—তাহাদের মধ্য হইতে সিংভূম এলাকায় নির্বাচিত পাঁচজন বিহারের বিধান সভার সদস্যের অন্যান্য চারিজন বার বার চাঁইবাঙ্গা ও সেরাইকেলাকে উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত করিবার দাবী উপস্থাপন করিয়াছেন। উড়িষ্যার সহিত সংযোগকারী রাস্তাঘাট ও ব্যবস্থা সবই সিংভূম সদরে এবং সেরাইকেলা খারসোয়ানে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। বরং একটি পর্বতশ্রেণীর দ্বারা বিহার হইতেই এইসব অঞ্চল প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। তাহা ছাড়া ওড়িয়া ও হোদের উপর বিহারীরা ভাষার অত্যাচার চালাইতেছে—চাঁইবাঙ্গা ও সেরাইকেলা মহকুমায় ওড়িয়া ভাষা ও কষ্ট দমনের চেষ্টা চলিতেছে অবিরাম এবং পদ্ধতিবদ্ধ ভাবে।

কিছুতেই কিছু হইল না, রাজ্যপুনর্গঠন সমিতির নিকট কোনো যুক্তিই খাটিল না। রাজ্যপুনর্গঠন সমিতির ভয় হইল—যে যদি বিহার পুরুলিয়ার অংশের সহিত সেরাইকেলা বা চাঁইবাঙ্গা মহকুমাও হারায় তাহা হইলে ধলভূম মহকুমার সহিত বিহারের ভৌগোলিক সংযোগ থাকিবে না। বিহারকে সন্তুষ্ট রাখিতেই হইবে, অগত্যা, বিহারের সহিত ধলভূমকে সংযুক্ত রাখিবার জন্য উড়িষ্যার দাবী তুচ্ছ এবং মিথ্যা ছলে পরিত্যক্ত হইল। ধলভূমকে বিহারে রাখা উচিত কিনা সে-প্রশ্নের পাশ কাটাইয়া গিয়া ধরিয়া লওয়া হইল ধলভূম বিহারে থাকিবেই থাকিবে এবং স্বেচ্ছাভাবে তাহার ব্যবস্থা রাখিবার নিমিত্ত চাঁইবাঙ্গা ও সেরাইকেলাকেও বিহারে রাখিতে হইবে। যে বিষয় প্রমাণ করিবার কথা তাহা প্রমাণিত বলিয়া ধরিয়া লইয়া লোককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা রাজ্যপুনর্গঠন সমিতির যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, বুঝা যাইতেছে।

বিহার ও বাঙ্গালা অঞ্চল প্রদেশান্তর আইন পাশ হইয়া গিয়াছে এতদিন পরে, কিন্তু তাহাতে ধলভূমের উল্লেখ মাত্র নাই। মানভূম লোকসেবক সংঘের পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার ক্রায়সম্মত দাবীর বেশির ভাগ উপেক্ষা করিয়া আইনটি যেন যাহারা ক্ষমতার শিখরে বসিয়া জনসাধারণের ক্রায়সম্মত আকাঙ্ক্ষা সহজ শোভনভাবে মানিয়া না-লইয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে বনস্ত করে, তাহাদেরই ক্ষিদে ও ঔদ্ধত্যের প্রতিচ্ছবি। “আমরা ধলভূমাদি বিহারে

পরিত্যক্ত বাঙ্গালী অঞ্চলের বাঙ্গালীদের হৃৎকর্ম নর্ম নর্ম অনুভব করি।” বাঙ্গালীরা বিচার চাহিয়াছিল, কর্তারা দণ্ডভরে ও জবজবাবে তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন সুবিচারের চেষ্টাও অবজ্ঞাভরে করেন নাই। আমরা যুক্তিতে পারি না কেন বিহারীরা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে একটি বহুসংখ্যক বিশিষ্ট অংশের অর্থাৎ বাঙ্গালীদের নিরীহ জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণে প্রতিবন্ধকতা করিল। আমাদের সহিত তাহাদের কিম্বদন্তি শত্রুতা? তুচ্ছ সীমানার অংশ প্রদেশান্তরিত হইলে বিরাট বিহারের এমন কী আসে যায়?

বিহার ও বাঙ্গালা অঞ্চল প্রদেশান্তর বিধি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় আইন সভায় আলোচনা হইবার কালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত পদ্ম এবং তাহার সহকারী শ্রীমাতারেক্ষ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি বাঙ্গালীরা শুনিয়াছে—‘যাহা হইবার তাহা হইল,—বিহার স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া না-দিলে বিহার সীমান্তের অন্ত কোনো ভূমির প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দাবী যাহাই হউক, ভবিষ্যতে আর কোনোক্রমেই পশ্চিমবঙ্গ তাহা পাইবে না।’ ছোর যাহার মুলুক তাহার, এই কথা ত। বাঙ্গালীর উপকার পাছে হইয়া যায়, সেই জন্য যুক্তি ও সদবুদ্ধিকেও কর্তৃপক্ষ স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু আমরা শ্রীমতুলচন্দ্র ঘোষের বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে চাই যে, বাঙ্গালা প্রদেশগঠনে এই বিহার ও বাঙ্গালা অঞ্চল প্রদেশান্তর আইনটি যে শেষ কথা—ইহাই যে বাঙ্গালার দাবী বিটাইবার প্রথম এবং শেষ কিস্তি—এই সব প্রলোপোক্তির প্রশ্রয় ডুলিয়াও আমরা দিতে পারিব না। নিষ্পত্তাধী অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জায় যে-সব বিষয় একটি জাতির জন্মগত ও আবিষ্কৃত অধিকারের সহিত জড়িত, যতদিন পর্যন্ত সেই অধিকারের অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণপ্রাপ্তি না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদের ব্যাপারে শেষ কথা বলিয়া কিছু নাই। *

* ‘ভাদ্র-আবিন’ অগ্রণীতে প্রকাশিত ‘ধলভূম’ শীর্ষক আলোচনার শেষ অংশ।

৮ই আশ্বিনের বর্ষারজনী

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সারাদিন অন্ধ স্বাষ্টি : দৃশ্যপট অম্পট, সন্ধ্যায়
মুসুরু আলোর মৃত্যু হলে,
উন্মত্ত আঁধার এল আনন্দিত নৃত্যের কল্লোলে ।
সুরাচ্ছন্ন বসুমতী ঢলে পড়লো অবশ নিদ্রায়,
হতাশ শান্তিতে ।
তারপর বন্ধ ঘর, উষ্ণ শয্যা সমুদ্রের নিশ্চিত তরঙ্গী,
অনির্দেশ অভিসারে সাদ্র পথ রোমান্স সরণী :
বিবিধ বন্ধুর গঙ্গা শুধু তার চিতে
সমুদ্রের স্বপ্নময় দোলা ।

কিছুতেই ঘুম নেই । বাইরে স্বাষ্টি শুধু স্বাষ্টি আর
কাদের পায়ের ছন্দ অলৌকিক অন্তির স্বীকার ।
কারা আস্তে কথা বললো, তীক্ষ্ণ হাসি হেসে কে তরলা
দূরে গেল কিংবা এল কাছে ।
কিছুতেই ঘুম নেই । বাইরে স্বাষ্টি শুধু স্বাষ্টি আর
সফেন উমির ভাষা লৌকিক নাস্তির প্রতিকার ।
কখন মেঘের ডাকে জেগে উঠলো প্রেতলোক । হিম হাওয়া
উত্তরঙ্গ নাচে

নিল বুঝি দস্যুর ভূমিকা,—
হাতে তার কোতুকের শাপিত তুহিন তরবারি,
চোখে তার বিদ্যুতের সচকিত শিখা ।

আর যে বিনিদ্র, জানি, সে যে এক অন্ধকার নারী ;
এতদিনে মনে পড়লো তাকে ।
সেও এক মধ্যরাত, অচেতন বসুধা, আঁধার
লুপ্ত ক'রে দিয়েছে আমাকে ।
ঝড়ের পূর্বাঙ্ক মৌন মাঠে মাঠে মেলেছে শঙ্কার
রহস্যকুহেলী ।
কখন নীরবে পাশে দাঁড়ালো সে, বললো, এলে তবে ?

দেহে তার রক্তছাতি চেলী

মুখর সোরভে ।

কী আর বলার ছিল হাসি ছাড়া, তারই ঝিলিমিল

জলে থাকলো কিছুক্ষণ ।

তারপর অন্ধ স্বষ্টি, বাতাসের তীব্র আফালন,

বিছাণের রক্ত দাহ, বিটপীর কটাক্ষ কুটিল,

আর প্রাণের পথ—মদআবী দিশাহারা তবু অবারণ ;

বিস্মল পথিক তার, একমাত্র উন্মত্ততা বিনা

কী ছিল তাদের রক্তে আর ?

তাদের ঘোষিত মোনে ব্যপ্ত হয়েছিল অন্ধকার,

মুখর ঝড়েই ছিল অন্তরের আকুল দক্ষিণা ;

আর স্বষ্টি ?—স্বষ্টি ছিল শুধু পটভূমি,—

বহু আকাঙ্ক্ষার ।

কখন সে মুখ তুলে হেসে বললো, তুমি ?

কী আর বলার ছিল হাসি ছাড়া, তারই ঝিলিমিল

আবার ছড়ালো শূন্যে । স্বষ্টি থামলো । আর

বললো সে, এবার ?

শুধু লক্ষ্য সম্ভাবনা । সঙ্কিল্প ধুলে দিল অমর্তের ঝিল ।

প্রাণের প্রতিষ্ঠা হ'ল কল্পনার আশ্চর্য প্রতাপে ।

আজ তার অনিশেষ সুখ

দিকে দিকে ঝরে ওই, ঘিরে দেয় আমার বসুধা

শব্দহীন সঙ্গোপন স্পর্শের উত্তাপে ।

কিছুতেই ঘুম নেই । বাইরে স্বষ্টি শুধু স্বষ্টি আর

কাদের পায়ের ছন্দ অলৌকিক অস্তির স্বীকার ।

আন্তে তারা আসে দলে দলে

আরও কাছে আরও কাছে । দূর কালোজলে

নিশিপত্ত কেঁপে ওঠে,—দেহে তার রক্তছাতি চেলী,

মাতাল সমুদ্রে তার স্বপ্নাবেশে আকীর্ণ কুহেলী ;

স্বাপ্নানু নাবিক

কেন হয় ভুলে যায় সমাজ সংসার দেশ দিক

সচকিত হাওয়ার স্বননে ।

শীতে গ্রীষ্মে আশ্বিনে শ্রাবণে

মনে মনে সারাদিন শুধু সে স্বষ্টির শব্দ শোনে ।

একদিন

অভিভূত মুখোপাধ্যায়

একদিন মাগুৰেয়া বড় হবে
শহর সবুজ এই পৃথিবীতে শান্তির গৌরবে,
বৃত্তা হবে অনেক সহস্র
অশ্রু নেবে রোজ
আনন্দের মুখর উৎসব।
আমাদের আর্ত কলরব
সেইদিন আকাশ মাটির শূন্য ভরাবে সংশ্লিষ্টে।
ঐশ্বর্য রোদে জলে যাই নীল হই শীতে,
অসম্মানে কাঁদি, তবু, একান্ত জীবন
কী করে যে পূর্ণ হয়, তৃপ্ত হয় নিরাশা গহন।
হে পৃথিবী,
রোজ রাতে খুলে দাও নীবি
অশ্রুপ্রার্থী আনন্দ আশ্রয়ে,
সে অশ্রু কবে যে হবে, জানি না, আশ্চর্য হই শেবে,
বন্দী থাকি মাটির শিকলে,
সবুজ পাতার স্বপ্ন জলে যায় রৌদ্রলোভী তৃষ্ণার কবলে।

আমার স্বপ্নের স্রোত আমার অক্লান্ত কল্পনার
চেউয়ে চেউয়ে প্রবাহ গঙ্গার,
দিয়ে চলে যুছে যাই কঠিন পরাণে
কালান্তর মেঘে মেঘে আমরা কোটাই গানে
রামধনু হঠাৎ কখন,
তখন হাতের স্পর্শ ভুলে যায় আগামীর মন।

স্রোতে স্রোতে জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায়
নাচে কাঁপে বিন্দু বিন্দু আলোকের গায়।
চাঁদ আর নক্ষত্রের মুখ
এই স্রোতে বুক নেবে সমুদ্রের বুক,
এই জ্যোৎস্না অনন্তকালের পরে সময়ের সাথে
ঘনিষ্ঠ মিতালি পেতে বসবে ছায়াতে
আকাশ বৃক্ষের,

আমি এক নিম্ন রের
পথে-বৃত্ত উপলের দৃষ্টি পেতে কত চিরদিন
শুয়ে শুয়ে শুয়ে যাব তারাময় কত চেউ হয়েছে বিলীন ।

একদিন মানুষেরা স্বপ্নের সভ্যতা
গাঁধবে, তখন বুঝি উপলের মুখে সুপ্ত কথা
গাইবে সে সভ্যতার ভিত,—
আনি শুনি নাই শুনি সেই মুক্ত সংবেদ্য সংগীত,
মানুষের হৃদয়ের মহৎ মুর্ছনা
সমস্ত পশুত্ব ছিড়ে সেইদিন যাবে আনি শোনা ।

পাঁচ পাহাড়ের ছুড়া ও অন্যান্য কবিতা

স্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

। তারই হৃদয় ।

জানালার পাশে সে দাঁড়িয়ে
আকাশে তার চোখ
সারাটা রাত্তায় তার প্রত্যাশা
প্রতীক্ষায় অধীর
তার হৃদয়

জানালার পাশ দিয়ে
যেন একটা ধাতব গর্জন হুহু করে ছুটে চলেছে
অনেকদিন অনেকরাত্রি
কখন অনেক মুখের আলো
কখন অনেক শুকতার অন্ধকার
অন্ধকারে
সে দাঁড়িয়ে
আকাশে তার চোখ
চোখে প্রতীক্ষা
আর প্রত্যাশায় অধীর
তার হৃদয়

তার হৃদয়
নদীর ছলছল প্রবাহে
তার হৃদয়
আকাশের হৃদয় শূন্যতায়
তার হৃদয়
প্রত্যাশার সুদীর্ঘ পথে
হৃদয়ে
অন্ধকার ছাপিয়ে এলে
সে জানালার পাশে দাঁড়ায়
আকাশে মেলে ধরে তার চোখ

সেই সময় হহ করে ছুটে চলে একটা ধাতব গর্জন
কখন নদীর ছলছল প্রবাহ
আর নাঝে নাঝে হস্তর শূন্যতা
শূন্যতায়
হস্তর আকাশ
প্রবাহে
নদীর ছলছল
প্রতীক্ষায়
ভারই হৃদয় ॥

॥ এদিকে ॥

তোমার নিদ্রা কোথায়
যত্ন চীৎকার করে ওঠে
যত্নময় যত্নপায়
নিদ্রা কোথায়

যেয়েটি বিছানায় মুখ ওঁড়ে কাঁদছে
কুলেকুলে ওঠে অন্ধকার ঘর
অন্ধকারে যত্নপা
যত্নপায় যত্ন চীৎকার করে ওঠে
নিদ্রা কোথায়

পুরুষ-দেয়ালের পাধুরে খাবা
যেয়েলি বিছানার দারুণ মূর্ছা
যেয়েটি বিছানায় মুখ ওঁড়ে কাঁদছে
দেয়ালটা ছমড়ি খেয়ে দেবে

জানালাটা খোলা ভবু আলো নেই
অন্ধকার ছুটে পালায়
ঝাঁকে ঝাঁকে সরীসৃপ অন্ধকার
অন্ধ যত্নপা
সে শুধু হাতড়ায় আর হাতড়ায়
এদিকে অন্ধকার ছুটে পালায়

মেয়েলি বিছানায় ভীষণ মূর্ছা
 পুরুষ-দেয়ালের পাধুরে থাবা
 যন্ত্রণায় যত্ন চীৎকার করে ওঠে
 ঝাঁকে ঝাঁকে অন্ধকারে ছুটে পালায়
 এদিকে সে শুধু হাতড়ায়
 শুধু হাতড়ায় ।

। দিনগুলি কুড়িয়ে নিয়ে ।

দিনগুলি আমি কুড়িয়ে নিলাম
 আমি আর তাকাব না
 বহুদূর থেকে যে-কথা
 ভেসে আসছিল
 তা এখন গর্জন
 হয়ে উঠেছে

এবার আমি উঠব
 ঠাকুরমার ছেঁড়া-খলির সন্ধ্যা
 সেই রূপকথাগুলি
 কখন শেষ হয়ে গেছে
 কখন শৈশব ছেড়ে
 কখন যৌবন পেরিয়ে
 শেষ-হয়ে-যাওয়া এইদিনের রিক্ত উঠানে
 এসে আছড়ে পড়েছে
 পড়ন্ত বেলার মত

আমাকে এবার যেতে হল
 দিনগুলি কুড়িয়ে নিলাম
 বাঁধলাম তাদের
 স্বস্তির ধুটোর
 দূরে সন্ধ্যার গর্জন
 আশ্চর্য
 একদিন এক প্রেমালোপ বলে
 আমার মনে হয়েছিল
 তার লিখনে

আমি ছুটেও ছিলাম একদিন
 এই শেষ-হয়ে-যাওয়া দিনের দিকে
 আমি তাকাই না
 আমাকে যেতে হবে বহুদূরে
 যেতে হবে গর্জন ফেলে
 এখানে দারুণ চীৎকার
 আর চারপাশে আঁধারের ঠেলাঠেলি
 শিউলি ফুলের মত দিনগুলি
 শৈশবের মত ফুলগুলি
 যৌবনের মত উজ্জ্বলতা
 সবই কুড়িয়ে নিয়ে
 আমি চললাম ॥

। বছরের পর বছর ।

বছরের পর বছর হারিয়ে যায়
 বছরের পর বছর বিশেষ যায়
 কোথায়
 কে বলবে
 কে

বছরগুলি হারিয়ে গেলে
 বোঝা যায় না
 যেন সমুদ্রের অসংখ্য মলবিশু
 বছরগুলি হারায়
 যেন মানুষের আদলে অসংখ্য ভাঙ্গনা
 ডুবে যায়
 হারায়
 কোথায়
 কে বলবে
 কে

বছরগুলি হারিয়ে গেলে
 বুড়ো হয়
 বছরগুলি হারিয়ে গেলে

যৌবন আসে
 বছরগুলি হারিয়ে গেলে
 শিশু হাসে
 বছরগুলি কোথায় যায়
 কোথাও যায় না
 মিশেও যায় না
 একটা দিনের রোদুর আর ছায়া
 একটা জীবনের জন্ম আর মৃত্যু
 এই রোদুর এই ছায়া
 এই জন্ম এই মৃত্যু

বছরের পর বছর চলে যায়
 আকাশ স্থির
 ঋতুর পর ঋতু আসে
 বছর ঘোরে
 জন্মের পরে মৃত্যু আসে
 বছর ঘোরে
 দিনের আকাশ
 স্থির
 রাতের আকাশ
 স্থির
 বছরের পর বছর ঘোরে
 কাল স্থির ।

। পাঁচ পাহাড়ের চূড়া ।

পাঁচ পাহাড়ের চূড়া থেকে
 সকাল নেমে এসে
 দিনের বেলায়
 প্রান্তরের মত ছড়িয়ে পড়ল
 এদিকে-ওদিকে
 গুহাবাসীর মত তার আচরণ
 চেহারায় একই বর্বরতা
 রোমশ অরণ্যের মত
 রহস্যময় ও নির্ভুর

পাঁচ সাগর পেরিয়ে
 শতনদীর মোহানা ভিড়িয়ে
 রাজপুত্রুর ধরে এল
 সমুদ্রের হুঃসাহস
 তার বুকে
 মেজাজটা তার
 অনেকটা চেউয়ের মত
 থেকে থেকে আছড়ায়
 স্বগতোক্তি
 তাঁর থেকে সে
 গভীর আর ভয়ঙ্কর

পাঁচটি আঙুল হারিয়ে গেল
 একটি হাতের মুঠোয়
 পাঁচটি চূড়া বিশেষ গেল
 আকাশের চূড়ায়
 পাঁচটি সাগর তলিয়ে গেল
 একটি থৈ থৈ জলরাশিতে
 দিনের বেলায়
 রাজপুত্রুর মত
 বেরিয়ে পড়ল হুঃসাহস
 স্বভাকারে ছড়িয়ে ছড়িয়ে
 পাঁচটি আঙুলে একটি হাত
 পাঁচটি সাগরে একটি সাগর
 পাঁচটি পাহাড়ে একটি পাহাড়
 দিনের বেলায় রাজপুত্রুর মত
 চিকচিক তার চূড়া ।

বাসু

সত্যজিৎনাথ মৈত্র

। এক ।

ঘুম ভাঙল ।

উঠোনে ক্রত ঝাঁটার শব্দ । ঠিক একটা বাঁধা সুরের মতো, ছন্দ কাটছে না । কোথাও ছেদ নেই । চোখ বুজে শুনে মনে হয় অবিশ্রান্ত ধারায় কোথাও থেকে জল ঝরে পড়ছে ।

সব পাখীর ঘুম ভাঙেনি এখনো । আধোঅন্ধকার ঘরের বিছানায় শুয়েই মনে মনে এই সকালের ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পায় বাসু । সামনের বড় ফুল্লী আম গাছটার মাথায় চাপ বাঁধা কুমাসা । রান্নাঘরের খড়ের চাল থেকে চুইয়ে চুইয়ে হলদে রং-এর জল পড়ছে দীর্ঘ বিলম্বিত কোঁটায় । একটা শিরশির-করা মোলায়েম ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে । সূর্য উঠতে এখনো অস্তিত একঘণ্টা ।

এই এত সকালেও না উঠেছে । উঠেছে এরও অস্তিত ঘণ্টাখানেক আগে । কত কাজ এরই ভিতর সারা হয়েছে মার । গত রাত্রির এঁটো বাসন, এখন চকচকে হয়ে কাত করে সাজানো রয়েছে রান্নাঘরের দাওয়ায় । জল পড়েছে মার নিজ হাতে লাগানো কুল গাছগুলোতে । হয়ত এমন আরো অনেক কাজ হয়েছে যার খোঁজ বাসু রাখেন না ।

মাঝে মাঝে অবাক লাগে মাকে দেখে ।

ভাবতে অস্বস্তি লাগে । মার জীবনে কোনোদিন এতটুকু বিশৃঙ্খলা সে আজ পর্যন্ত দেখেনি । সেই ভোরে ওঠা ঘোর ঘোর অন্ধকার থাকতে । তেমনি নিবিড় নিষ্ঠায় কাজ করা ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত । মা যে কখন কোন কাজ করবে তা যেন মুখস্থ বলে দিতে পারে বাসু । অথচ আশ্চর্য, বিশ্বাসের কথা মার মুখ থেকে কোনোদিন সে শোনেনি ।

আজো সে জানে এই ঝাঁটার শব্দ উঠোনের এ কোণা থেকে আরেক কোণা পর্যন্ত ঠিক একই তালে এগিয়ে যাবে । তারপর গোবর ছড়া পড়বে এই উঠোনে । তারপর শব্দ করে জল উঠবে কুমোয়—হাতমুখ ধুয়ে উঠুনে আঙুন দিয়ে আহ্নিকে বসবে না । তারো কিছুটা পরে রোদ উঠবে । পুবেদিকের জানালার কাঁক দিয়ে সূর্যের লাল আভা দেখা যাবে । অনেকগুলো পাখী এসে চৌচানিচি আরম্ভ করবে রান্নাঘরের চালে বসে । মা ডাকবে, বাসু, ওঠ, চায়ের জল চড়াচ্ছ ।

বাসু কিন্তু প্রতিদিনই এর অনেক আগে ওঠে । মা যখন উঠে যায় প্রায় তার সাথে সাথেই । কিন্তু বিছানা ছেড়ে ওঠে না । তার চোখ বুজে বিছানায় পড়ে থাকতেই ভাল লাগে । সেই ছোটবেলায় মা যখন উঠত তখনই জোর করে তুলে দিত বিছানা থেকে । তখনই হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসার নিয়ম ছিল তার । মা বলত,

সকালে পড়লে মনে থাকে। কথাটা ঠিক কিনা আজো বলতে পারে না বাসু। কিন্তু বড় হয়ে যখন সে পড়তে বসেছে, তার অবচেতন মনে, এই সকাল, এই রোদ-না-ওঠা স্নিগ্ধ প্রকৃতির একটি অতি পরিচিত ছবি কুটে উঠেছে।

উঠোনে কাক ডেকে উঠল একটা। এতক্ষণে বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জানালার কাঁকে লাল আভা কুটে উঠবে। বাঁটার শব্দ আর নেই। উঠুনে আগুন দিয়ে মা তাহলে আহ্নিকে বসেছে। ডাক পড়বে এখন। তবু উঠল না বাসু! এখন সে ইচ্ছে করলেই উঠতে পারে—ইচ্ছে করলেই মার সাপে সাপে উঠে ঘুরে আসতে পারে খানিকটা। কিন্তু সে বাসনা কেনন যেন অবশ হয়ে বুকের এক কোণায় নিম্নীলের মতো পড়ে আছে। কি হবে উঠে? কি লাভ?

ইঠাৎ ছেলেবেলার একেকটা দিনের ছবি তার মনের পুটে কুটে উঠতে লাগল। সেই ভোরে গিয়ে মদনগাছির বাড়িতে একটু খেজুর রসের জন্তে থল্লা দিয়ে পড়ে থাকা, কখনও-বা একটু গুড়-নই এর জন্ত। মস্ত কড়াইতে রস কুটছে, গাদ উঠছে—সে কি পরম বিশ্বয়ের ব্যাপার। মদন গাছিকে মনে হত রূপকথার যাহ্নকের মত।

এই সেদিনও মদনের সাথে বাজারের পথে দেখা। সেই সম্বন্ধেই লোকটা যেন ভেঙে কঁকড়ে গিয়েছে। গুড়ের ব্যবসা আর করে না এক বড় মহাজনের দোকানে কাজ করে। দেখা হতেই একমুখ হেসে, যেন অনেকদিন পরে এক পরমাত্মীর দেখা পেয়েছে, এমনি সুরে প্রশ্ন করেছিল মদন,—দাদাবাবু যে! কবে এলেন? আছেন ত কদিন।

এপ্রশ্ন অনেকেই করেছে। যেখানেই গিয়েছে বাসু, সেখানেই এমনি প্রশ্ন শুনতে হয়েছে তাকে। কিন্তু প্রশ্নটা শুনেই যেন একটা আশ্চর্য ব্যাধি মোচড় দিয়ে উঠেছে বুকের ভিতরটা। কেন যে—তা বাসুর নিজের কাছেই খুব স্পষ্ট নয়।

ঠিক আরেকটা ছবি, খুব অনেকদিন আগে দেখা একটা ভাল গিনেমার দৃশ্যের মত এরই তলে তলে বয়ে যাচ্ছিল। তখন সে কলেজে পড়ে। কলকাতায়। মাঝে মাঝে ছুটিতে বাড়ি আসে। সেই শেয়ালদা স্টেশনে টিকিট কিনে একটা ব্যাকুল মন নিয়ে গাড়ীতে উঠে ভোরবেলায় দেশের স্টেশনে নেমে সূর্য-না-ওঠা মস্ত আকাশটা দেখার আনন্দ। সে আকাশ একটু একটু করে লাল হয়, টেলিগ্রাফ-তারের ওপরে বসে এমন সুরে গান গায় ছ'একটা ছোট পাখী যে বাসুর সে-সময় প্রতিবারই ফিরে ফিরে মনে হয়েছে, একি তার সব সুখ, সব বেদনার ওপরে নয়? এর পর একটু একটু করে যতো সে এগিয়েছে প্রাণের দিকে, ততই যেন নতুন নতুন বিশ্বয়ের পর্দা তার চোখের সামনে থেকে উঠে গিয়েছে। আর তার সেই দীর্ঘ ধূলিধূসর পথ যেখানে এসে প্রতিবারই থেমেছে, সেখানে, তার প্রতিবারই দেখা অথচ তার কাছে চিরনতুন সেই ছবিটি তেমনি আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মা। বাসু ঠিক বলে দিতে পারে মা তাকে তখন কি প্রশ্ন করেছে—এত স্পষ্ট এত জীবন্ত সে ছবি যে তার শব্দগুলি যেন এখনি এসে বাসুর চেতনায় আঘাত করে সার সার হয়ে চোখের সামনে দাঁড়াল : যাক বাবা। কাল থেকে ঘুম হয়নি ভাল করে। টুনে উঠেছিলি কখন? মা জানত টুনে কখন ছাড়ে শেয়ালদা থেকে। তবু বাসুকে বলতে হয়েছে, বিকেলে।

কি খেয়েছিলি ?

বাসু কিছু বলবার আগেই মা বলে উঠবে, নিশ্চয়ই খাওনি। তুমি যা ছেলে—
এসব ছবি যত ভিড় করে আসছিল ততই যেন বিশ্বাস লাগছিল এ-দিনের শুরুটা বাসুর
কাছে। একটা বালিশে মুখ চেপে বাসু প্রতীক্ষা করতে লাগল মায়ের ডাকের।

মা বলল, বাইরে থেকে ঘুরে আয় না একটু। সেই যে এসে ঘরে ঢুকেছিস
আর বাইরে বেরুনোর নাম নেই।

কোথায় যাব মা ? বাসু প্রশ্ন করল, কার কাছে যাব ?

কেন ? দারুণ বিষয়ে কথা যেন হারিয়ে গেল মার। এই বাসুই কি ছপুর
গড়িয়ে গেলেও বাড়ি ফেরার সময় পেত না। এই বাসু বাড়ি এলেই কি বেলা তিনটের
আগে মা কোনোদিন খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলতে পারেনি। আর তাঁর এই একলার
সংসার এই বাসু এলেই কি ছেলেদের ভিড়ে ভরে থাকত ! একটা উদ্বৃত্ত দীর্ঘশ্বাস
চাপতে গিয়েও চাপতে পারল না মা। বাসু তাকিয়ে ছিল মায়ের দিকে। সে ভাবছিল
অন্যকথা। অনেকদিন আগের কতকগুলো ঘটনা। ভাবছিল আর হাসি পাচ্ছিল তার।

বাড়ি এলেই বাসুর চক্ৰবর্তী সাথী ছিল নরেশ। একসাথে স্কুলে পড়েছে।
উদ্দাম কৈশোরের সবকটা দিন, সব উচ্ছ্বাস নরেশকে কেন্দ্র করেই। এমনও অনেকদিন
গিয়েছে যে ছপুরের খাওয়া নরেশের ওখানে সেরে, সারাটা দিন আড্ডা দিয়ে সন্ধ্যার
পর নরেশকে সাথে নিয়েই বাড়ি ফিরেছে বাসু। মার সেদিন অল্প ঘরে শোওয়া।
সে-দিন যে ওরা কখন ঘুমোবে, গল্প করতে করতে কখন যে এই দুটি দামাল ছেলে
ক্লান্ত হয়ে মশারী না ফেলেই, জানালা বন্ধ না করেই ঘুমিয়ে পড়বে, তারই উৎকণ্ঠায়
সারারাত ঘুম হত না মার। মাঝে মাঝেই ওদের গল্পের মাঝে ওঘর থেকে মা
ডাকতেন, তোরা এখনো ঘুমোসনি ?

না মা।

ঘরের ভেতর বাতিটা ছোট করে দেওয়া। পাশের জানালাটা খোলা। পুকুরের
জলে কালো নক্ষত্রখচিত আকাশের ছবি।

মা বিরক্তকণ্ঠে বলত, কি যে তোদের এত গল্প বুঝি না। রাত কটা জানিস ?
ছ'টো বেজে গেছে—

ছ'টো। মাত্র ছ'টো। হুজনে হুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলত।

এখনি ঘুমোব মা। তুমি ঘরে যাও।

তারও পর অনেকক্ষণ জেগে থেকেছে ওরা। কক্ষপক্ষের কোন একটা তিথিতে
সব একফালি চাঁদ যখন উঠে আসত পুকুরের ওপারের জঙ্গলটার মাথার ওপর দিয়ে,
তখন হয়ত তারা ঐদিকে তাকিয়ে চুপ করে যেত। হয়ত সেই পাতলা জোছনার
মোহময়তার ধীরে ধীরে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ত ওরা হুজনে।

ঠিক সেই সময়ের কথাগুলো মনে পড়ল বাসুর। তখন লক্ষ্য করেছে মা যেন
বিরক্ত হত তার এমনি অন্তরিতায়, এমনি দামালপনায়। অথচ মা-ই আজ তাকে
ঠেলছে বাইরে যাবার জন্যে। বোধহয় চাইছে, সে ভেমনি সকালবেলার চা-টা খেয়েই

জানা গায়ে গলিয়ে বেরিয়ে যাক। আর সারাটা দিন হটোপাটি করে বেল। হটোপ সময় বাড়ি ফিরে, কোনোমতে নাকে মুখে গুঁজে আবার বেরিয়ে যাক নরেশের বাড়িতে। নয়ত না খেয়েই একেবারে সেই সন্ধ্যাবেলায় নরেশকে সাথে করে বাড়িতে ফিরে হাঁক দিয়ে বলুক,—মা, আজ নরেশ এখানেই থাকে।

সত্যিই তো কোথায় যাবে বাসু! কার বাড়িতে!

কদিন ধরে, তার এখানে আসার পড় থেকেই, একখাটা ক্রমাগত ভাবছে সে। আছে সকলেই, অথচ সেই বাসু, সেই বাসুর মন যেন কোন দীর্ঘ অসুখে ভুগে ভুগে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত হয়ে গিয়েছে।

যাদের ওখানে তার যাওয়া উচিত, অন্তত ভদ্রতার দিক থেকেও, তাদের দেখার চেয়ে তাদের কথা ভাবতেই আজ ভাল লাগছে বাসুর। তার নরেশ, তার কাছলদি, গীতু—একটু চোখ বুজলেই আরো অনেক, অনেকে। যারা তার মনের গভীরে স্থির অচঞ্চল হয়ে বসে আছে, দীর্ঘ সময়ের টেউ-এ যারা একটুও বদলায়নি।

আচ্ছা মা, নরেশ আসে আর? কাছলদি?

আগবে না কেন? কাছল এলেই তোর কথা বলে,—মা বলল।

কেন নরেশ?

নরেশ রাগ করেছে তোর উপর। বলে, চিঠি দিলে উত্তর দিস না।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বাসুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

নরেশ! শ্যামলা রং, সারা গায়ে স্বাস্থ্যের ছাতি। মাথার চুলগুলো কৌকড়ানো কিন্তু ছোট ছোট করে ছাঁটা। এই নরেশকে ভুলেই যেতে বসেছিল বাসু। এককালের নাম-করা কবরের নরেশের বাবা। পাকী চড়ে রুগী দেখতে যেতেন। শুধুমাত্র নাড়ী দেখেই বলে দিতে পারতেন রোগের নাম। কিন্তু দিনের সাথে সাথে তাঁর সে পশার গিয়েছে, প্রতিপত্তিও। দীর্ঘদেহ বৃদ্ধমানুষটি এখনো কিন্তু দোকান সাজিয়ে বসে আছেন বাজারে। নিজের ক্ষমতায় এখনো অসীম বিশ্বাস। যে-বিশ্বাস সেই স্কুলেপড়া আমল থেকে বেশ ভালভাবেই সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছিলেন নরেশের মধ্যে। সেইকালেই নরেশের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আয়ুর্বেদই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গোড়া। একে আয়ুর্ষাত করেই আধুনিক অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার সূত্রপাত। চরক আর সুশ্রুতের আলোচনা প্রতিদিন অন্তত পক্ষে দুবার চারবার করতই নরেশ। সেই নরেশ ম্যাট্রিক পাশ করে চলে গিয়েছিল জলপাইগুড়িতে কবরের পড়তে। প্রথম প্রথম চিঠি লিখত—ইদানিং বোধহয় বাসুর কোনো খবর না-পেয়ে পেয়েই সে সব বন্ধ।

হঠাৎ যেন দেখতে ইচ্ছে করল নরেশকে,—অনেকদিন পর আজো ঠিক ভেমন আছে কিনা নরেশ তাই দেখবার আগ্রহে বাসু যেন হঠাৎই উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল, তাহলে যাই না একটু নরেশের ওখানে থেকে ঘুরে আসি। দেখি ও আজকাল কেমন কবরের হয়েছ।

যাও, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবে।

হাসি পেল বাসুর।

। দুই ।

পথে বেরিয়ে কাজলদির কথা মনে পড়ল বাসুর। ভাবল নরেশের বাড়ি যাওয়ার পথে একবার কাজলদির ওখান হয়েই ঘুরে যাবে। এখনো বেশ সকাল। রোদ উঠেছে। ঘাসের ওপর থেকে গতরাত্রির শিশির এখনো সম্পূর্ণ শুকোয়নি। কাল রাতে যে কুয়াসা করেছিল, এখনো যেন তার কিছু কিছু বাসুদের আম বাগানের নোপের অন্ধকারে জমে জমে আছে। এ সকালটাই যেন কাজলদির মত।

বাসুর কাছে কাজলদির টানও কম নয়। বরং এক অর্থে বেশিই। বাসু আর নরেশকে এককালে ভীষণ টানে টেনেছিল কাজলদি। সবখানে ঘোরার পর, সব ছোটোছুটির পর কাজলদির ওখানে একবার যেতে না-পারলে ওদের দুজনেরই মনে হত আজকের দিনটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল।

বাসু অনেকবার ভেবেছে কাজলদিকে। যখন সে নরেশকে ভাবেনি, তখনও। আজ বেশ বুঝতে পারে বাসু, মার পরে এই একটি মাত্র মেয়েকেই সে ভাবে। আর কেউ সে কথা জানে না, কাজলদি ত নয়ই।

কাজলদির বয়েস, বাসুর কাছে মনে হয়, একটা বিশেষ জায়গায় এসে থেমে আছে। কালো দোহারা গড়নের চেহারা। মুখ চোখ নাক সবই যেন তুলির পাতলা টানে আঁকা। বাসু বেশ মনে করতে পারে এখানে কোনো নতুন বো এলেই না বলত, মুখ চোখ কিন্তু আনাদের কাজলের মত অমন টানা নয়।

সেই কাজলদি কপালে মস্ত করে সিঁড়রের কোঁটা দেয়। আর দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে নিজের মেয়ের সাথে বসে কড়ি খেলে। অনেকদিন দেখেছে বাসু কড়িখেলা নিয়ে মায়ে মেয়েতে তুমুল ঝগড়া চলেছে। কোনোদিন মীমাংসা হয়েছে তার, আর কোনোদিন-বা দুজনেই থেকেছে কথা বন্ধ করে। কাজলদি সাধারণত বাইরে বেড়াতে যায় না। বেড়াতে যায় তখনই যখন তার কথা বন্ধ হয় নেয়ের সাথে।

না বলত, গীতুর সাথে আজ আবার কথা বন্ধ বুঝি, কাজল? খিল খিল করে হেসে উঠত কাজলদি।

একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো মাসীমা। ওই কড়ি খেলেই সময় কাটাই।

এই কাজলদি। কাজলদি নাকি মাসটিক পর্যন্ত পড়েছিল কোনো কালে। আজ এই হাসিখুশি কাজলদিকে দেখে তার একটুও ধরা যায় না। কিন্তু বাসুর ধারণা এই উচ্ছলতা কাজলদির সত্যি নয়। যে প্রকাণ্ড দুঃখকে এই হাসিখুশির আড়ালে প্রতিদিন বয়ে বেড়ায় কাজলদি, তা নরেশ ভাল করে না-বুঝলেও, বাসু বোঝে। আর বাসুর কাছে গীতুর চেয়ে তাই কাজলদির আকর্ষণই বেশি।

গীতুর কথা মনে পড়লেই হাসি পায় বাসুর।

নরেশ গীতুর প্রেমে পড়েছিল।

নরেশের মুখে গীতুর কথা যত শুনত বাসু, ততই যেন কাজলদির বাড়ির লিকলিকে লম্বা মত মেয়েটার একটা নতুন রূপ ফুটে উঠত তার মনে। অবিশি বাসু নিজে কোনোদিন নরেশ-গীতুর প্রেম নিয়ে কিছু দেখেনি। কিছুটা অবিশ্বাস করলেও বাসুর

মনে হয় নরেশের কথা সবটা না হলেও খানিকটা বোধহয় সত্যি। আর এই ভেবেই গীতুকে দেখলেই ভীষণ লজ্জা পেত বাসু। মনে হত এমন একজনের সামনে সে এসে দাঁড়িয়েছে যার মনের অনেক কিছুই সে জানে না। যে নরেশের মত স্পষ্ট করে কিছু বলে না, কিন্তু ওর জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত আছে যা নির্জন ঘরের আবছায়ায় শুয়ে নরেশের মুখ থেকে শোনা কথার চেয়েও বিস্ময়কর। কাজলদি বলত, আচ্ছা বাসু, গীতুকে দেখে তুই এমন লাল হয়ে যাস কেন বলত ?

যাঃ। কোথায় ! আরো লজ্জিত হয়ে বাসু বলত, লজ্জা পেলান কোথায় !

কাজলদি সন্ধানী চোখ মেলে কি যেন খুঁজত বাসুর মুখে কিছুকণ। তারপর ধেমেরই অল্প প্রসঙ্গে চলে যেত সহজভাবে।

নরেশকে সন্দেহ করেনি কাজলদি। সন্দেহ না করার কারণও যথেষ্ট। নরেশ বয়সে বড় বাসুর চেয়ে। অভিজ্ঞতাতেও। বিশেষ করে প্রেমের অভিজ্ঞতায়। সেই কবে কোন ছেলেবেলা থেকে যে নরেশ প্রেমে পড়েছে, তার হিসেব বাসু দিতে পারবে না। তবে তার প্রতিটি নায়িকার হাব-ভাব নরেশের বলার শুণে যেন চোখের সামনে দেখতে পেত বাসু। মেয়েদের নিয়ে এমনিতেই বাসুর খুব লজ্জা। তাই মাঝে মাঝে তার অবাক লাগত এই ভেবে যে, নরেশ কি করে অত সহজে মেয়েদের সাথে মেলে। এমন সহজ ভাবে কথা বলে ! কথা বেধে যায় না ? লাল হয়ে ওঠে না ওর মুখ চোখ !

বাসু জানে, কাজলদির আঙ্গ পর্যন্ত ধারণা বাসু গীতুর প্রেমে পড়েছিল। আর এই কারণেই বাসু ভীষণ লজ্জিত হত কাজলদির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। তবু সে গিয়েছে নরেশের পাশায় পড়ে। না-গিয়ে উপায় ছিল না। কিন্তু যখন সে একটু ছাড়া পেয়েছে নরেশের হাত থেকে, তখন থেকেই সে যাওয়া কনিয়ে দিয়েছে কাজলদির ওখানে। অনেকদিন হল তো যায়ইনি। কিন্তু কাজলদির ওখানে না-গেলেও, কাজলদির আকর্ষণ কমেনি বাসুর কাছে।

বড়ো জানতে ইচ্ছে করে, নরেশ কি এখনো গীতুকে ভালবাসে ? অনেকদিন গীতুকে দেখেনি বাসু। গীতু কি এখনো তেমনি লিকলিকে—তেমনি আতুরে ? কড়ি খেলতে খেলতে হেরে যাবার উপক্রম হলেই, এখনো কি তেমনি মাহুরের উপরে পা ছড়িয়ে দিয়ে নাকি সুরে বলতে থাকে, না খেলব না। হঁ, কোথায় ছুঁ পড়েছে ! এই ভেবেই তো ভোমার সাথে খেলতে চাই না মা।

গীতুর চেহারাটা করুনা করতে চেষ্টা করল বাসু। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ল না। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করল বাসু, গীতুকে সে ভাল করে কোনোদিন দেখেইনি। বার বার যাওয়া আসায় যেটুকু লক্ষ্য করেছে বাসু সেটুকু তার দেহের ভঙ্গী, তার কথা বলার সুর। আর যেটুকু বাকী থাকে তা ছাড়া সেটুকু সে দেখেছে নরেশের চোখ দিয়ে, তার নিম্নের ঘরের বিছানায় শুয়ে।

সেদিন অনেক বড় মনে হত নরেশকে। বাসু ত ওর কাছে ছেলেমানুষ। কিন্তু আঙ্গ হাসি পায় বাসুর। ভাবে, সে সত্যিই এত ছেলেমানুষ ছিল যে নরেশ গীতুকে ভালবাসত বলে তার লজ্জা করত গীতুকে দেখে। [ক্রমশ]

॥ সংস্কৃত-শ্রবণ ॥

॥ সরকারী ভাষা-কমিশনের রিপোর্ট ॥

সরকার কতক নিযুক্ত ভাষা-কমিশনের প্রস্তাবাবলীর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল আপত্তি ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। প্রস্তাবগুলি এখানে পরিবেশন করা যাচ্ছে :

(ক) হিন্দি ভারতের একমাত্র সরকারী ভাষা রূপে এবং কালক্রমে নিখিল ভারতের রাষ্ট্র, শিক্ষা ও শাসন সংক্রান্ত সর্বব্যাপারের একমাত্র সাধারণ ভাষারূপে স্বীকৃত হোক ;

(খ) ইংরেজী যা বর্তমানে বৈকল্পিক সরকারী ভাষা রূপে চলছে তাকে যথাসম্ভব শীঘ্র অপসৃত করা হোক ;

(গ) সমগ্র অ-হিন্দিভাষী অঞ্চলে মধ্য-বিদ্যালয়সমূহে সর্বশ্রেণীতে হিন্দি ভাষাকে শিক্ষার একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে চালু করা হোক ;

(ঘ) হিন্দী-মাধ্যমে শিক্ষাদান-সম্পন্ন যে-কোন স্কুল বা কলেজকে যে-কোন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দিতে বাধ্য থাকবেন এবং যে-কোন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে যখনই হিন্দী-মাধ্যমে শিক্ষাদানের দাবী উঠবে তখনই তার ব্যবস্থা করতে হবে ;

(ঙ) ১৯৬৫-র পর থেকে সরকারী চাকুরিগত সর্ব-ভারতীয় পরীক্ষাসমূহ হিন্দী এবং ইংরেজী ভাষায় গৃহীত হবে, কিন্তু উদ্দেশ্য থাকবে এই যে কালক্রমে একমাত্র হিন্দীকেই পরীক্ষার মাধ্যম বলে মেনে নিতে হবে ;

(চ) অ-হিন্দিভাষী প্রত্যেক রাজ্যের সরকারী পরীক্ষাসমূহের মাধ্যম রূপে রাজ্যের 'আঞ্চলিক' ভাষার পাশাপাশি হিন্দিকেও স্বাকার ক'রে নিতে হবে ;

(ছ) লোকসভায় একমাত্র হিন্দিই ব্যবহৃত হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারে ও বিভিন্ন রাজ্যসমূহে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও একমাত্র হিন্দিই ব্যবহৃত হবে ;

(জ) হিন্দি কালক্রমে হবে সূপ্রীম কোর্টের একমাত্র ভাষা, হাইকোর্টসমূহে রায় দিতে হবে হিন্দিতে, এবং এমনকি ভারতের সর্বত্র নিম্ন-আদালতগুলিতেও রাজ্যের 'আঞ্চলিক' ভাষার পাশাপাশি হিন্দিকেও মাধ্যম হিসাবে রাখতে হবে ;

(ঝ) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের সমস্ত চাকুরিয়া হিন্দি লিখিতে বাধ্য থাকবেন এবং তাতে অপারগ হ'লে শাস্তি পাবেন ;

(ঞ) অ-হিন্দিভাষীদের মধ্যে হিন্দি প্রচার, হিন্দি-সাহিত্যের উন্নয়ন, আইন ও শাসনসংক্রান্ত এবং অন্যান্য সাহিত্যের ভূরিপরিমাণ রচনাবলীর হিন্দি অনুবাদ—আর এইভাবে নানাবিধ প্রয়োজন সাধনের জন্ত হিন্দিকে উপযোগী ক'রে তুলবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাজ্যে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ বা মন্ত্রীদপ্তর স্থাপন করতে হবে ;

(ট) সংখ্যায় বৃহত্তর অ-হিন্দিভাষী প্রজাগণ যদিও হিন্দি শিখতে বাধ্য থাকবেন, হিন্দিভাষীদের অন্য একটি ভারতীয় ভাষা না-শিখলেও চলবে, তার বদলে তাঁরা একটি অ-ভারতীয় ভাষা অথবা মানবধর্ম সংক্রান্ত অতিরিক্ত একটি বিষয় শিখতে বাধ্য থাকবেন।

কমিশনের সুপারিশগুলির অভিপ্রায় এবং ভাষা দুইই বেশ স্পষ্ট, মাথায় হাত দিয়ে ব'লে পড়ার পক্ষে যথেষ্ট। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই কমিশনের একজন সদস্য, এই সুপারিশগুলি কার্যে পরিণত হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে তা তিনি মোটামুটি এইভাবে জানিয়েছেন :

(১) ভাষা-কমিশনের অনুমোদনগুলি কার্যে পরিণত হ'লে ভারতে দেখতে না-দেখতে দুই শ্রেণীর প্রজার সৃষ্টি হবে। হিন্দিভাষী প্রথম শ্রেণীর প্রজাবৃন্দ যারা কেবলমাত্র তাদের ভাষার দরুনই অসংখ্যরকম বিশেষ-বিশেষ সুবিধা পাবে এবং অ-হিন্দিভাষী দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রজাবৃন্দ যারা শুধুমাত্র ঐ ভাষার দরুনই নানান ব্যাপারে চিরকাল অন্ধম প্রতীপন্ন হতে থাকবে।

(২) যেহেতু হিন্দি ভারতের অন্যান্য ভাষার ওপর কোনরকম সাংস্কৃতিক প্রাধান্য লাভ করেনি, তাই হিন্দির দাবী এমনি প্রকট ক'রে তোলার ফলে এক ধরনের 'হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ'-এর উদ্ভব হবে যা জাতীয়তাবোধের অধিকতর বিরোধী হবে।

(৩) ইংরেজীর বদলে হিন্দিকে বসিয়ে অ-হিন্দিভাষী অঞ্চলগুলিতে হিন্দিকে খবরদারী করবার ব্যবস্থা ক'রে দেবার এই যে অস্থির একটা প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে এর ফলে ভারতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবার এক গুরুতর বিপদ দেখা দিয়েছে যা সঙ্কীর্ণমনা ভাষাগত 'প্রাদেশিকতা'-রই নামান্তর।

(৪) হিন্দি ভারতের সরকারী ভাষা রূপে প্রস্তাবিত হয়েছে, কিন্তু হিন্দির চাইরা সর্বত্রই এর চেয়ে অনেক বেশি দাবী ক'রে থাকেন। তাঁদের দাবী এই যে হিন্দি নাকি ভারতের 'জাতীয় ভাষা' এবং শুধু তাইই নয়—ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা। কেউ কেউ এমন ধ্বনিও তুলেছেন : 'হিন্দ, হিন্দু, হিন্দি—এই তিন এক।'

(৫) আমাদের প্রধানমন্ত্রী বার বার এই মত প্রকাশ করেছেন যে ভারতের জাতীয় ভাষা একটি নয়, চোদ্দটি।

(৬) গদ্যের খাড়িবোলি হিন্দি বা হিন্দুস্তানি বা উর্দুকে সরিয়ে দিয়ে আজ সাধারণভাবেই হিন্দি নামে চলছে এবং যা সংবিধানে ভারতের সরকারী ভাষা রূপে উল্লিখিত হয়ে আজ ভারতের 'জাতীয় ভাষা' হবে করণা করা হচ্ছে সেই খাড়িবোলি হিন্দির অস্তিত্ব আঠারো শো পঞ্চাশের আগে আদৌ ছিলো না—অথচ উত্তর ভারতের অন্যান্য আধুনিক ভাষার বয়স কমসেকম হাজার বছর আর দাক্ষিণাত্যের ভাষাসমূহ আরো প্রাচীন।

(৭) রাষ্ট্রস্থানি, কোশলি বা আবাহি, ভোজপুরি এবং মৈথিলি ভাষার সঙ্গে অকায়ভাবে একত্র ক'রে 'হিন্দিভাষী'-র সংখ্যা ফীত ক'রে দেখানো হচ্ছে, যদিও এর কোনো-কোনোটা সম্পূর্ণ আলাদা ভাষা।

(৮) অনেক তথাকথিত হিন্দিভাষী ব্যক্তি যারা খাড়িবোলি হিন্দীকে গ্রহণ ক'রে প্রকৃতপক্ষে আপন-আপন স্বদেশীয় বা মাতৃভাষাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে তারা সাধারণত এইটে উপলব্ধিই করতে পারে না যে বাঙালি, উড়িয়া, অসমিয়া, গুজরাতি, মারাঠি এবং ড্রাবিড় জাতিসমূহ আপন-আপন মাতৃভাষার প্রতি কী গভীর এবং অবিচ্ছেদ্য ভালোবাসা অনুভব করে।

(৯) শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষাবিষয়ক নীতি নির্ধারণ ক'রে মাদ্রাজ-সরকার ইংরেজিকে আবশ্যিক এবং হিন্দীকে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে নির্দিষ্ট করেছেন কারণ তাঁদের মতে : 'আধুনিক স্ট্রটশীল চিন্তার ক্ষেত্রে ইংরেজি প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে সক্ষম, কিন্তু হিন্দীর পক্ষে তা অসম্ভব। এ সত্য স্বতঃসিদ্ধ, এর জন্যে কোন ওকালতি নিষ্প্রয়োজন এবং এ-কথাকে নাকচ করা অসম্ভব।

(১০) ক্রমে ক্রমে ইংরেজি এখন বিশ্বসভ্যতার চিন্তাবিনিময়ের একটি সাধারণ মাধ্যমে পরিণত হয়েছে, এবং যে-সব ভারতীয় ইংরেজি রক্ষণের পক্ষপাতী তা তারা আপন আপন মাতৃভাষাকে গভীরভাবে ভালোবাসে ব'লেই। তাদের অভিপ্রায় হচ্ছে এই যে, ইংরেজির সাহায্যে তাদের দেশের নমনশীল ব্যক্তিরা বিশ্ব-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবাধ, সহজ এবং সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করুক এবং তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধতর হতে থাকুক। ইংরেজিকে রাখার এই ইচ্ছার কারণ জাতীয়তাবোধের অভাব বা মানসিক কোন বিকার নয়, এর মূলে আছে এক সুগভীর মানবধর্মী আদর্শবাদ যা এইটেই নির্দেশ করে যে ইংরেজি ভাষার সহায়তায় আমরা সমগ্র মানবসংসারের মধ্যে সমান গৌরবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারব।

(১১) ভারতভূমি থেকে ইংরেজিকে অপসারিত করার মনোভাবের মধ্যে নিহিত আছে এক অন্তঃসারশূন্য জাতীয়তাবোধের অহনিকা যা আসলে হীনমন্ত্রতার সামিল, অথবা এর কারণ এই সুপরিজ্ঞাত তথ্য সম্পর্কে স্বেচ্ছাকৃত অন্ধতা যে ভারত একটি বহুভাষী দেশ যেখানে কোন একটিমাত্র ভাষা সমস্ত প্রদেশের লোকদের কাছে স্বেচ্ছাপ্রসূতভাবে আবাহন পেতে পারে না।

এমনি সব কারণের ফলে সুনীতিবাবু ভাষা কমিশনের প্রস্তাবগুলির সপক্ষে হাত তুলতে পারেননি, তিনি তাঁর আপত্তিগুলো বিধিমতে লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। অর্থাৎ রাজ্যবিধানসভাগুলিতে এবং লোকসভায় আমাদের নেতৃবর্গ ভাষা-কমিশনের প্রস্তাবগুলির সঙ্গে সুনীতিবাবুর আপত্তিগুলোও একই সঙ্গে পাবেন। আরোও হয়তো, কানে তুলো পিঠে কুলো এবং চোখে ঠুলি দিয়ে না-রাখলে, পাবেন দেশব্যাপী বিক্ষোভের খবর। পাবেন লিখিত প্রতিবাদ এবং বিকল্প প্রস্তাব।

সরকারী ভাষা-কমিশনের এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যে অনেক প্রদেশই সুসংবদ্ধ হচ্ছে। পশ্চিম বাংলাও পিছিয়ে নেই—সর্বত্রই এই নিয়ে গভীর্ন সমিতি ক'রে জনমত জ্ঞাপ্ত করার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। কলকাতায় এ-ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'মাতৃভাষা সংরক্ষণ সংঘ' নাম দিয়ে পঁচিশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্যোগে এক সংঘের প্রতিষ্ঠা,—এঁরা গত দফা বিকল্প প্রস্তাব গণস্বাক্ষর সংবলিত ক'রে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছেন। এই বিকল্প প্রস্তাবাবলীর মর্ম হচ্ছে : সংবিধানে

উল্লিখিত চোদ্দটি ভারতীয় ভাষার প্রত্যেকটিই জাতীয় ভাষা হিসেবে সরকারিভাবে স্বীকৃত হোক এবং প্রত্যেকটি ভাষাই প্রতি ব্যাপারে সমান সুযোগ সুবিধা এবং সমান মর্যাদা পাকু; প্রত্যেক রাজ্যে শিক্ষা সর্বস্তরেই হবে আপনআপন মাতৃভাষার মাধ্যমে, রাজ্যের প্রতিযোগিতামূলক চাকুরি-সংক্রান্ত সরকারী পরীক্ষা এবং শাসন, আইন ও বিচার সংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্মও হবে মাতৃভাষায়; সেই সঙ্গে ইংরেজিকে রাখতে হবে নিখিল-ভারতীয় চাকুরি-সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলির একমাত্র মাধ্যম হিসেবে এবং সর্বভারতীয় আইন ও বিচার সংক্রান্ত ব্যবহারের জন্য এবং কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের অথবা এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের যোগাযোগ রক্ষার একটি অন্যতম ভাষা হিসেবে; এই দিকে নজর রেখে দেশের শিক্ষাসূচীতে সর্বস্তরে ইংরেজি কীভাবে কতটা শেখানো হবে তা প্রতিটি রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করবে। 'মাতৃভাষা সংরক্ষণ সংঘ'-এর ঠিকানা : ২১১ পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা ১৭।

এই ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনে সারিক হবার উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি পরিষদও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এঁরা কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য এই নিয়ে সভা সমিতি সংগঠন করার ভ্রত গ্রহণ করেছেন। এঁদের ঠিকানা : ১সি, মধু গুপ্ত লেন, কলকাতা-১২। মাতৃভাষা সংরক্ষণ সংঘ যে-সব প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন এঁরাও সেগুলির সঙ্গে একমত।

আমরাও সর্বতোভাবে মাতৃভাষা সংরক্ষণ সংঘের উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলির সঙ্গে একমত। এ-বিষয়ে আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের কারও কোনো খটকা থাকলে তা তাঁরা আমাদের লিখিতভাবে জানাতে পারেন, আমরা তা নিরসনের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

অশোক রায়

॥ চন্দ্র ৫

অন্তরীক্ষ : প্রযোজনা : সিনে আর্ট প্রোডাকশন, কাহিনী : তুলসী লাহিড়ী, পরিচালনা : রাজেন তরফদার, সংগীতপরিচালনা : ওস্তাদ আলী আকবর খান, চিত্রগ্রহণ : দীনেশ গুপ্ত, শব্দগ্রহণ : অবনী চট্টোপাধ্যায়, শিল্পনির্দেশনা : বংশীচন্দ্র গুপ্ত, সম্পাদনা : সুকুমার সেনগুপ্ত, ভূমিকায় : প্রবীরকুমার, কাজল চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, কালীপদ চক্রবর্তী, পদ্মা দেবী, প্রেমাংশু বসু, যুত্যাঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে ।

অন্তরীক্ষ । মিষ্টি নাম, বিজ্ঞাপন বা প্রচারের কায়দাটিও উচ্চরুচিসম্মত । তার উপর পরিচালকের নামটিতেও আগ্রহ বেড়েছিল, রাজেনবাবু নিজে চিত্রশিল্পী বলে । উঁচুদরের চিত্রশিল্পীরা সিনেমা ছবির ক্ষেত্রে নতুন কিছু দিতে পারেন এমন ধারণা বেশি করে সৃষ্টি হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টান্ত দেখে ।

ছবির আরম্ভটি সুন্দর । পল্লীদৃশ্যের প্রাণময় পরিবেশের পটভূমিতে কাটিং ভাল না-লেগে পারে না । আলোকচিত্রশিল্পীর সবল সহযোগিতায় প্রথমদিকের কয়েকটি দৃশ্য সৃষ্টিতেও পরিচালক ক্ষুদ্র রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন ।

রঙখেলার দৃশ্যটিতো সত্যিই মনে রঙ ধরায় । দেবালয়ে অর্ধরচনারত নায়িকার সংগে নায়কের সাক্ষাৎটিও সহজ সুন্দর । সংলাপের আধিক্য বর্জন করে শুধু অভিব্যক্তির মাধ্যমে গল্পের যে রূপায়ণ শুরু তাতে সিনেমাছবির সত্যিকারের ভাষাকে যেন খুঁজে পাওয়া যায় । ক্রমশ একটা মহৎ কিছু পাবার আশায় মন প্রস্তুত হতে থাকে । কিন্তু সে-আশা খুসিহীন হতে আধঘণ্টার বেশি সময় লাগে না । এ-ছবির মূল ক্রটি গল্পের বিস্তার । পরিচালকের প্রতিভার রশ্মি গল্পের হৃৎপিণ্ডটিতে প্রতিফলিত হয়নি—এইখানেই রসপিপাসুদের বেদনা । গল্পটিকে একটা সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাঝে এগিয়ে নেওয়া যেত চিত্রনাট্যটি সেইভাবে তৈরী হলে । তা না হওয়ায় গল্পের সুন্দর উদ্বোধনটি একটি ক্রাইম পিকচার-এ পরিণত হয়েছে এমনভাবে যা অত্যন্ত বেরসিকেরও ধ্যানের অগম্য । সাসপেন্স সৃষ্টি সাহিত্যে বা চিত্রে নুতন নয় । বহু ইংরেজী ছবিতে এর সার্থক ব্যবহার রসিকজনকে তৃপ্তি দিয়েছে । কিন্তু সাহিত্যের এই অস্ত্রটি বড় মারাত্মক । ঠিকমত ব্যবহার করতে না-পারলেই বাস্তব ফললাভের উদ্দেশ্যটি হবার সম্ভাবনা । এ-ছবিতে হয়েছে তাই । অকারণ সাসপেন্সকে টেনে রেখে দর্শকের সহনশক্তির উপর অশ্রদ্ধাভাবে জুলুম করা হয়েছে । কিন্তু এই সামপেন্স রাখতে গিয়ে গল্পের গতি এত লম্বা হয়ে পড়েছে যে মনে হয়েছে, গল্প যেন মরে গেছে । গল্পের স্বতদেহটি একটু নড়ে ওঠে গগন গাছুলীর আবির্ভাবে । তারপর আবার সেই অসাড়তা ।

জীবন্ত অভিনয়ে এবং প্রয়োগকৌশলের নিপুণতায় মরা গল্পও অনেক সময়

বেঁচে ওঠে। এ-ক্ষেত্রে তাও হয়নি। নায়িকা নির্বাচন অবশ্য মন্দ হয়নি কিন্তু অভিনয়ের প্রয়োজন তাকে দিয়ে মিটিয়ে নিতে পারেননি পরিচালক। নায়কের সম্বন্ধেও একই কথা।

কল্পনা দিয়ে শূন্যকে ভরাট করে নেবার ব্যাপারটা উপন্যাসে বা কাব্যে অপরিহার্য। কিন্তু ছবিতে দর্শকের কল্পনা উৎসারিত হয় প্রাপবস্ত অভিনয়ে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনায়—সর্বোপরি উত্তম শট কম্পোজিশনে। অন্তরীক্ষে তা হয়নি সর্বত্র। নায়িকার চোখেমুখে সর্বদা একই অভিব্যক্তি, ঘটনার স্বাভাবিকতাতির কোনো চিহ্ন সেখানে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে না। তা-ছাড়া নায়িকার বাচনভঙ্গিও দোষহুটে বলে মনে হল। তাই কামল চট্টোপাধ্যায়কে যতক্ষণ যুক ততক্ষণই ভাল লেগেছে। নায়ক-নায়িকার অভিনয়ের অক্ষুটতা ছবিটির ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। গগন গাঙ্গুলী চরিত্রটিতে কালীপদ চক্রবর্তীর অপূর্ব অভিনয় ছাড়া উল্লেখ্য অভিনয় নেই বলেই চলে। ছবি বিশ্বাসের কথা নাই-বা বললান চরিত্রাচিত অভিনয় আমরা তাঁর কাছ থেকে সব সময়েই পেয়ে থাকি।

বেজায়গায় গান জুড়ে দেওয়ার চেয়ে গুণী শিল্পীর যন্ত্রের টুংটাং যে অনেক বেশি রসসৃষ্টি করে তা পরিচালকেরা ক্রমশ বুঝছেন। ছবিটিতে আলী আকবরের সংগীত বর্ষণ অনেকখানি অবসাদ দূর করেছে একথা জোর দিয়েই বলা যায়। শিল্পনির্দেশনাও প্রসংশার দাবী রাখে। আলোচনা শেষে ক্ষেদোক্তি এই যে, একটি বাজে গল্পের উপর পরিচালকের প্রতিভা অপব্যয়িত হয়েছে। এমন অপব্যয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যত কম হয় ততই মঙ্গল। পরিচালক রাছেন তরফদারের প্রথম কাজ দেখে ভবিষ্যত প্রতিশ্রুতির আভাস পাওয়া গেল বলেই এই কথা কয়টি বলা।

॥ জ্যোতিভূষণ ॥

চন্দ্রনাথ : প্রযোজনা : শচীন্দ্রনাথ বারিক, কাহিনী : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনা : কাতিক চট্টোপাধ্যায়, সংগীতপরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়, আলোক-চিত্রগ্রহণ : বিভূতি চক্রবর্তী, শব্দগ্রহণ : শিশির চট্টোপাধ্যায় ও বাণী দত্ত, সম্পাদনা : হরিদাস মহলানবীশ, ভূমিকায় : উত্তম, সূচিত্রা, চন্দ্রাবতী, বলিনা, পদ্মা, রেণুকা, কমল, নীতিশ, জহর রায়, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্তী ও আরো অনেকে।

শরৎচন্দ্রের কাহিনীর প্রতি মোহ বা আকর্ষণ বাঙালী দর্শকমাত্রেয়ই প্রচণ্ড। কারণ তাঁর কাহিনীগুলি বাঙালী সমাজের প্রতিচ্ছবি। যদিও এই উপন্যাসের সমাজ সমস্যাটি পুরাতন এবং উপন্যাস হিসাবে এটি খুব উঁচুদরের নয় তবুও এর কাহিনীগত বিষয়বস্তু বাঙালী মনকে এখনো নাড়া দেয়। শরৎচন্দ্রের প্রতিটি কাহিনীই কালের সীমারেখা ছাড়িয়ে রঙ্গধন-আবেদন সৃষ্টি করে। তাই অন্যান্য কাহিনীর মত রূপালী পর্দায় চন্দ্রনাথ দেখার কোতুহল দর্শকমনে প্রবল, সেই প্রবল ইচ্ছাটি আবার প্রবলতর করার কাজে লাগিয়েছেন পরিচালক জনপ্রিয় শিল্পী উত্তম-সূচিত্রাকে নায়ক-নায়িকা রূপে নির্বাচন করে।

কিন্তু শিথিল চিত্রনাট্য এবং স্থূল পরিচালনার জন্য ছবিটি আশামূলক আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি।

যুক্তির খাতিরে বলা যায় প্রথম দিকে যে-দৃশ্যে সূচিত্রাকে প্রথম সরযুরূপে দেখানো হচ্ছে সেখান থেকেই পরিচালকের সূক্ষ্ম রসবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ক্যামেরায় ফোকাস করা হচ্ছে সূচিত্রার পা থেকে হাঁটু অবধি সাবানমাখা স্থানটি। সাবান কাচছিল সরযু এই কথা দর্শককে বোঝাতে তার হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন পা না দেখিয়ে অল্প কোনো উপায়ে কি সেটা বোঝানো যেত না! নিশ্চয়ই যেত। কিন্তু পরিচালক যে চান দর্শককে সূড়সুড়ি দিতে, তাইতো তিনি শুধু সূচিত্রার সূঠাম পা দেখিয়েই ক্ষান্ত হন না—তার উর্ধ্বাঙ্গের অন্তরাবরণ খসিয়ে নিয়ে অনেকগুলি অনেকখানি দেখাতে হয়। প্রচণ্ড লাজনত্ৰা সরযুর অন্তরনহলে সাবানকাচা অবস্থায় অন্তর্বাস পরিধানে না-থাকলে সেটা মেনে নিতে বাধ্য নেই। কিন্তু সেই মেয়ে যখন বাড়িতে অপরিচিত যুবকের (চন্দ্রনাথ) সম্মুখীন হতে গিয়ে ভয়ে লজ্জায় সংকোচে একেবারে কঁকড়ে যায় নিজীবের মত—তার পরও কি করে যে এই লজ্জাবতী যুবতী অন্তর্বাস পরিধান না-করেই যুবক চন্দ্রনাথের ধারে কাছে আসতে পারে এটা বোধগম্য হয় না—বোধগম্য হয় না আরো এই জন্য যে সরযুর মাকে সরযুর চেয়ে বেশবাস সম্পর্কে ভ্যাতা বেশি বজ্রায় রাখতে দেখা যায়। অবশ্য বেশ বোঝা যায় এটা ইচ্ছাকৃত ভুল বক্স অফিসের মুখ চেয়ে—শিল্পের ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু এই কথাটা চিন্তা না করলে ছবি দেখতে বেশ লাগে—দেখতে হয় সরযুর ভূমিকায় সূচিত্রার অনবদ্য অভিনয়ের জন্য। যেমন দেখতে হয় ‘বিদ্যাপতি’ ছবিটি অমুরাধার ভূমিকায় কাননের অভিনয়ের জন্য, ‘রাইকমল’ কমল-এর ভূমিকায় কাবেরীর অভিনয়ের জন্য। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সূচিত্রার অভিনয় এ ছবিতে এত সহজ সুন্দর স্বাভাবিক এত প্রাণবন্ত যে কখনই মনে হয় না সূচিত্রা অভিনয় করছেন। অর্থাৎ সূচিত্রার অভিনয়ই এ ছবিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, এ কথা যদি বলি স্বাধী করি অত্যাক্তি হবে না। উক্তম সেই তুলনায় নায়কের ভূমিকায় যান, অনেক স্থানেই ব্যঙ্গনাহীন অভিব্যক্তিতে বিরক্তিকরও। বিশেষ দিকে কাশীর যে দৃশ্যে চন্দ্রনাথ প্রথম তার ছেলে বিশ্বর সংগে আলাপ পরিচয় করছে সেই দৃশ্যটি বাস্তবহীন, স্বাভাবিক ভাবাবেগের অভাবে অত্যন্ত পীড়াদায়ক, অথচ সেখানেও প্রতিটি দৃশ্যে সূচিত্রার অভিব্যক্তি কত স্বাভাবিক কত সার্থক।

আর কমল মিত্রের অভিনয়ে সংযমী ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অদ্ভাঙ্গ উল্লেখ্যদের মধ্যে পড়েন চন্দ্রাবতী, রেণুকা, নীতিশা ও জহর গাঙ্গুলী। শিশু-অভিনেতা বিশ্ব-চরিত্রে ভালই।

ক্যামেরার কাজ আরো উন্নত হলে আবহসংগীত-এর সংগে মিশে অনেকগুলি দৃশ্য অর্থময় হয়ে উঠতে পারতো। অদ্ভাঙ্গ বিভাগের কাজ মোটামুটি প্রশংসনীয়।

চন্দ্রনাথ সম্পর্কে শেষ কথা হচ্ছে—সূচিত্রা-উক্তম জুটি নিয়ে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসটিকে প্রযোজক-পরিচালক একটি ‘হিট’ পিকচার করতে চেয়েছিলেন এবং সে-আশা তাদের পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং ‘হিট পিকচার’ দেখে যারা খুশি হতে চান তাদের এ-ছবি ভালই লাগবে।

॥ চিত্রালাপী ॥

॥ গ্রন্থ-পরিচয় ॥

কৃষ্ণকলি : কুশল নিত্র ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় । প্রকাশক : লোকায়ত, কলিকাতা । দান : আট আনা ।

সাতজন নিম্নো কবির তেরোটি কবিতার বাংলা অনুবাদের সংকলন এই এক ফর্মার পুস্তিকাটি । ষাঁদের কবিতা এঁরা পরিবেশন করেছেন তাঁদের নান ওয়্যারিং কুনে, জোসেফ সীমন কটার (জুনিয়র), জেমস ল্যাংস্টন হিউজ, পল লরেন্স ডানবার, রুড মকে, আর্ন। বর্টম্পস এবং কাউটি কালেন ।

কবিতাগুলির অনুবাদকরয় বইটির ভূমিকায় বলছেন : 'নিম্নো আন্দোলন অধুনা আন্তর্জাতিক মনোযোগের গুরুত্ব পেয়েছে । ফরাসী, স্প্যানিশ, জার্মান বা অন্যান্য জাতির মতো জন্মভূমিগত ভৌগোলিক সীমানির্দেশ, অথবা আপন স্বদেশ আশ্রিত উচ্ছল মননের পবিত্র অধিকার এঁদের নেই । সমগ্র আফ্রিকা, আমেরিকার কিছু অংশ, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি সর্বত্রই কককায় মানুষদের কষ্টলব্ধ কিন্তু শক্তিত বিস্তৃতি । তবু যখন দেখি শিল্প সাহিত্য সংগীত এবং সংস্কৃতির বিচিত্র ক্ষেত্রে এঁদের সুদক্ষ নিপুণ প্রকাশ 'স্তব্ধ প্রাণবন্ত, উদার হাস্যময়, তখন অবশ্যই অনেক পূর্বকল্পিত গোঁড়া ধারণাকে নির্বাসনে পাঠাতে হয় ।'

আমার মনে হয়, এমনি ধরনের সংকলনে অনুবাদকদের এমন একটি বাড়তি কর্তব্য ছিলো যা পালন না করার ফলে অধিকাংশ পাঠকই এ-বই হাতে নিয়ে একটু অপ্রস্তুত বোধ করবেন । সেটি হচ্ছে এই যে, নিম্নো সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে খুব একটা চর্চা হয়নি, ফলে বেশির ভাগ লোকই এ-সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নন ; তাই অনুবাদকদের একটি প্রাথমিক কর্তব্য ছিলো— ষাঁদের কবিতা পরিবেশন করা হচ্ছে তাঁদের মোটামুটি একটা পরিচয় সন্দেহ-সন্দেহ দিয়ে-দেওয়া, সে-পরিচয়ে জানানো দরকার ছিলো বিবিধ তথ্য, এক নিম্নো সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে এঁদের ঐতিহ্যিক ভূমিকা কী এবং দ্বিতীয়ত কে কোন সময়কার লোক ।

আমি যতদূর জানি, নিম্নো সাহিত্য প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার সময় পর্যন্ত পরিণত পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি । নিম্নো জাতির প্রতি নানাবিধ অভিযাপের ফলেই যে এমনটা ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই । একটি জাতির সূত্র এবং স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভের ক্ষমতা যে-সব সুযোগ এবং সুবিধা প্রয়োজন, নিম্নো জাতির ভাগ্যে তা কখনোই ঘোটেনি । ফলে, লোকগাথা এবং লোকসাহিত্য বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি নিম্নোসাহিত্যকে কিছুকাল আগে পর্যন্তও সেই পর্যায়েই পড়ে থাকতে হয়েছে । আফ্রিকাতে নিম্নো-সাহিত্যের মান এখনো পরিণত অবস্থায় উদ্ভীর্ণ হতে পেরেছে ব'লে মনে হয় না, আমেরিকার নিম্নো-সাহিত্য অবিশিষ্ট সে তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়ে গেছে ।

পল লরেন্স ডানবারকে বলা হয় ইনিই প্রথম আমেরিকান নিম্নো যিনি

নিপ্রোঙ্গাসাহিত্যকে প্রথম পরিণতি দান করলেন, নিপ্রোঙ্গাসাহিত্যে প্রথম লিরিকের আবেজ্ঞ আনলেন। এঁর জন্ম ১৮৭২ সালে এবং মৃত্যু ১৯০৬ সালে। এঁর দুটি কবিতা বইটিতে পরিবেশিত হয়েছে। এঁর কাল থেকেই নিপ্রোঙ্গাসাহিত্যের আধুনিক কালের শুরু বলা যেতে পারে।

ল্যাংস্টন হিউজের নাম অবিস্মি বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনেকেই অল্প-বিস্তর শুনেছেন। নিপ্রোঙ্গা ব্লু-দের নিয়ে গদ্য-পদ্যে এঁর অনেক রচনাই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য। এঁর জন্ম ১৯০২ সালে এবং এখনো লিখছেন। এঁর তিনটি কবিতা এ-বইটিতে পাওয়া যাচ্ছে।

জীন টুমার, জেমস ওয়েল্ডন জনসন এবং কাউন্টি কালেনের হাতেও নিপ্রোঙ্গা কাব্যসাহিত্য উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু প্রথমোক্ত দুজনের কোন কবিতা এঁরা এ-বইতে দেননি। কাউন্টি কালেনের কাল হচ্ছে ১৯০৩-৪৬। এঁর একটি কবিতা এতে আছে।

অনুবাদের কাজে অনুবাদকদ্বয় সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পেরেছেন বলে মনে হলো না। ‘নিপ্রোঙ্গা চাষীর কথা’ ‘একটি কালো মেয়ের জন্যে গান’, ‘লিফিং’ এবং ‘হারানো ভালোবাসা’ কবিতাকটি মোটামুটি ভালোভাবেই রূপান্তরিত হয়েছে; যদিও ‘নিপ্রোঙ্গা চাষীর কথা’ কবিতাটির তৃতীয় শবকের দ্বিতীয় চরণে ছন্দপতন আছে, দ্বিতীয় শবকের তৃতীয় চরণে ব্যাকরণ বা ছাপার ভুল আছে।

বানান-ভুলও চোখে পড়েছে প্রচুর যে-বিষয়ে অনুবাদকদের সতর্ক হওয়া উচিত ছিলো।

এ-সব ত্রুটি সত্ত্বেও আমি অনুবাদকদের উদ্ভবের প্রশংসাই করব কারণ নিপ্রোঙ্গা সাহিত্য সম্পর্কে বাঙালী পাঠকের কাছে বইটি যথেষ্ট কোতূহলোদ্দীপক।

গৌতম গুপ্ত

কবি নজরুল : সংস্কৃতি পরিষদ। দাম তিন টাকা।

“কবি নজরুল” সংস্কৃতি পরিষদের প্রথম প্রকাশিত ‘গ্রন্থ’ পরিষদের তরফ থেকে বলা হয়েছে, দৃষ্টিমার্গের বিভিন্নতা দিয়ে নজরুলের সামগ্রিক বিচার হিসেবে এই গ্রন্থটিই বোধ করি অন্য থেকে স্বতন্ত্র, একক। প্রচেষ্টা হিসেবে স্বাভাব্য দাবী করাটা এ সংকলনের পক্ষে মাত্রাতিরিক্ত কিছু হবে না। সাফল্যের কথা স্বরণে-ও অনন্ততার কৃতিত্ব অর্জন করার প্রশ্ন সমর্থনযোগ্য।

শৈলজানন্দের ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা দু খানি জীবনী চিত্র এখানে পরিবেশিত হয়েছে। নজরুলচরিত্রের বিভিন্ন প্রতিফলন মেলে এ দুটোতে। একখানা ছেলেবেলাকার। অন্যখানা ধূমকেতুর নজরুলের। দুটোতেই উজ্জ্বল চিত্র চমৎকারিত্ব যতটা না পেয়েছে তার চেয়ে বেশি পেয়েছে সতেজ প্রাণের সবুজ ভাবের নিবিড়তা। শৈলজানন্দের চিত্রে নজরুলচরিত্রের একটা বিশেষ দিক আপন মহিমায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

“একবার একটা ভারি নজা হয়েছিল। মাসের প্রথমেই রাজবাড়ি থেকে সাতটি টাকা নজরুল নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে। বোডিং-এ এসে দেখে তার ছোট ভাই আলি হোসেন এসেছে গ্রান থেকে। সচ্ছল সংসার নয়। দ্রবির্যের জ্বালা লেগেই আছে। দুঃখকষ্টের কথা পাছে বেশি শুনতে হয় ভাই তাজাতাড়ি সাতটি টাকাই আলি হোসেনের হাতে দিয়ে তাকে বিদেয় করে দিয়েছে।”

পবিত্রবারু ধুমকেতুর আড্ডায় বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা ও কাজী নজরুলের কথোপকথনের বর্ণনা দিচ্ছেন।

গোপীনাথ ‘হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, ‘আপনাদের মনে এত আনন্দ জাগে কোথা থেকে?’

এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন! সবাই তাকান বনে যায়।

‘দে গরুর গা ধুইয়ে’ বলে নজরুল জবাব করে। আনন্দ কোবেকে জাগে তার উত্তর নেই, কিন্তু নিরানন্দ কেন হবে, তাই শুনতে চাই তোমার কাছে।’

মনে আছে, অত্যন্ত দৃঢ় ভঙ্গিতেই গোপীনাথ জবাব করেছিল, ‘দেশ পরাধীন, সাহেবদের অত্যাচার জুলুম দিনদিন বেড়ে উঠেছে। সেই জ্বালায় মধ্য আনন্দ জাগে কি করে। প্রত্যেকটি ইংরেজ আমাদের শত্রু। তারা বুক ফুলিয়ে আমাদের চারপাশে বিচরণ করবে আর আমরা আনন্দে হাসব গাইব।’

‘প্রত্যেকটি ইংরেজ নয়’, বললে নজরুল, ‘সমগ্র ইংরেজ-সম্রাজ আমাদের শত্রু। তাদের ভাসিয়ে দিতে হলে চাই প্রাণবন্ত। তারই আবাদ করছি আমরা এখানে।’

এ প্রশ্নের কোনো জবাব করেনি গোপীনাথ।

নজরুলের দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর জীবনীচিত্রে কাজীর একটা পরিকার চরিত্র ধরা পড়েছে। বর্ণিত ঘটনাগুলোতে প্রেরণার চল আছে। ভাঙতা, সঙ্কোচ, পশ্চাৎ-গমনতা—আজকের বাঙালীর চেহারা কঠিন বাসা বেঁধেছে। অন্ধকার ঘর—ভীষণ অন্ধকার। নজরুলচরিত্র যেন অন্ধকার ঘরে অর্গলভেদে আসা আলোর অবিশ্রান্ত প্রপাত।

অন্যসব প্রবন্ধগুলি নজরুলসাহিত্যের মূল্যায়ণ বলে দাবী করতে পারে। বিভিন্ন দৃষ্টিমার্গ থেকে এ মূল্যায়ণ সম্পন্ন হয়েছে বলে সমগ্র নজরুল-সাহিত্যের অন্তরলোক ধরা পড়েছে। দু-একটি আলোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল কিনা এ-প্রশ্ন-ও উঁকি নাগে যখন প্রত্যেকটি আলোচনাই অনন্তভাবে প্রতিফলিত হবে এ-রকম চিন্তা মনে স্থান দিই।

আপন আপন বক্তব্যের স্বগভীরতায় দীপ্তি পাচ্ছে এরকম রচনা সমগ্র ভট্টচার্যের ‘নজরুল ইসলাম’, অরবিন্দ পোদ্দারের ‘কবি নজরুল’, নারায়ণ চৌধুরীর ‘সংগীতে কাজী নজরুল ইসলাম’, কাজী আবদুল ওহদের ‘নজরুল ইসলাম।’

বাংলাদেশের প্রকৃতি শুধু কোমল তরুর অনুপম লাবণ্য নিয়েই গঠিত নয়। এখানে ভীষণ দুর্যোগের রাত্রিতে-ও বরাভয়ের প্রতিমূর্তি শ্রানাপূজা হয়। দেবী মহাশক্তি ও দেবী শ্রানী এ দুধরনের মূর্তিকল্পনা যে-জাতির মানসপটে ধরা পড়েছে, সে-বাঙালীর কবি কাজী নজরুল। বীর রসের ভাব নিয়ে ভুগু হয়েছিলেন রামপ্রসাদ। বীররসের ভাব নিয়ে জাতীয় সাধক হয়েছিলেন মুকুন্দদাস। কাব্যে-ও সে-বীর

রসের ভাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন নজরুল। বাঙালীমানা স্বভাবের স্বভাবিকতার রূপ নিয়ে কাজীর গুরু হয়েছিলো কাব্যপরিক্রমা ও সংগীতসাধনা। ঐতিহ্যে গভীর বিশ্বাসী সত্ত্ব ভট্টাচার্য্য কাব্যী নজরুলের কাব্য-চরিত্রের এ মূল ভূমিকা ও প্রকৃতি ধরতে পেরেছেন।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমগ্র চরিত্রের সদৃশ মূল্যায়ণ করা আলোচনা অরবিন্দ পোদ্দারের। সুধী লেখক নজরুল-সাহিত্যে যে আলোচনাটা শুরু করলেন সেটি একটি অল্পম সমালোচনা বলে খ্যাতি পাবার অধিকারী। নজরুলসাহিত্য নিয়ে যারা পরীক্ষা-নীরিক্ষা করতে চান তাদের কাছে এ-আলোচনা অপরিহার্য।

আরো কিছু আলোচনা এ-সংকলনে স্থান পেয়েছে যেমন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রাণসুন্দর বিপ্রবী কবি নজরুল', অতীন্দ্র মজুমদারের 'বৈচিত্র্য ও নজরুল', বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নজরুল প্রার্থনার দিনগুলি', গুরুদাস ভট্টাচার্যের 'অগ্নিবীনকার নজরুল' এবং অনিল চক্রবর্তীর 'ঐতিহ্য ও কবি নজরুলের বিশ্বাস।'

মোটামুটি যে-কথাটা বলতে পারলে বইটির প্রতি সুবিচার হবে, তা হচ্ছে যে, নজরুল সাহিত্যের উপর এরকম সাবিকমার্গ থেকে আলোকপাত ইতিপূর্বে হয়নি। নজরুলসাহিত্য প্রাণিকানীদের কাছে এ-বইটা শুধু ভালো লাগবে তা নয়। অপরিহার্য-ও বটে।

পবিত্র পাল

ক্রান্তিকাল : আশ্বিন, প্রথম সংখ্যা—সম্পাদক : শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার। ৫৮টি রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬ থেকে প্রকাশিত। দাম—একটাকা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের কাল থেকে শুরু করে বঙ্গ-ভঙ্গের নিদারুণ জীবন দুর্ধোগের স্রোতের স্রুতি বহন করে ক্রান্ত একাল পর্যন্ত বাঙালী চিন্তাধারার তরঙ্গভঙ্গী যারা প্রতীক মননে লক্ষ্য করছেন, তাদের কাছে এতখানি সুবিজ্ঞাত যে বাঙালী চিন্তাধারা যতখানি আবেদন পেয়েছে ততখানি বেগ পায়নি। বিস্মৃতি পেয়েছে কিন্তু পায়নি যা তা হচ্ছে ঘনতা। এ ঘনতা, এ বেগ নির্ভর করে তৃতীয় নয়নের কর্মনিপুণতার উপর। তৃতীয়নয়নের কর্মনিপুণতা তখনই একটা নিটোল চরিত্র পায় যখন তৃতীয়নয়ন জীবনজাত অভিজ্ঞতার, অহুভূতির সমগ্র চেহারাকে দিনের আলোর মত স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারে। বা, সমগ্র চেহারার অন্তর্প্রদেশগুলোর মধ্যে একটা সুসম ঐক্যবোধ জাগিয়ে তুলতে পারে।

রাসনৈতিক কর্মচাকল্যের তরঙ্গবিক্ষোভে নাগরিকজীবনে যেমন সুনিশ্চিত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে, তেমন আর কোথাও না। আজো বাঙালীর চিন্তাআন্দোলনের পরিধি কলকাতা মহানগরীর বইপাড়া পেরিয়ে অনেকদূর বিস্তৃত হবার শক্তি অর্জন করেনি। আর এ-বইপাড়ার নাগরিক সম্প্রদায়ও বিশৃঙ্খলার রাহপ্রভাব থেকে মুক্ত নয়। ফলে বিস্তারিত পাড়ায় আন্তর্জাতিক মতবাদের অসঙ্গত, অহুদার, অন্ধকার জ্বল সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এখানকার সমাজে বিক্রমাদিত্যের নবরঙ্গমণ্ডার বুদ্ধির

গান্ধীর্ষ উত্তরাধিকারসূত্রে অজিত না-হয়ে তৈরী হয়েছে মুদীদোকানের মাসিক অসতর্ক বেনিয়ারুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতমশায়ের পাঠশালার পরিবেশ। এখানে তাই যা প্রথমেই অস্তিত্বপ্রাপক তা হচ্ছে কলরব। এ কলরবের স্পন্দন, দেখা গেল 'ক্রান্তিকাল' ধরতে পেরেছেন। 'ক্রান্তিকাল' আরো যা-ধরতে পেরেছেন, তা সবিশেষ চিন্তার সঙ্গে অনুধাবনযোগ্য—'...আগাছা গড়ে উঠেছে, আমরা গড়তে দিয়েছি; আমাদের রসবোধ যতটা সম্ভবতায় সরস, ততটা বোধির দীপ্তিতে প্রাপ্ত নয়। তাই অনেকটা আমাদেরই স্নেহলালিত হয়ে সেটা ঐ কোলাহলের তীব্রতাকে বৃদ্ধি করেছে।' মহান্বিতার আরাধক বাঙালীর তৃতীয়নয়নকে জাগাবার জন্যে নিশ্চিতভাবেই যার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে—তা হচ্ছে দর্পণ। এ-দর্পণে নিজের চেহারা দেখা বাঙালী চিন্তানায়কদের অবশ্যকর্তব্য। জানের তাগিদে 'ক্রান্তিকাল' এ-বিশেষ প্রয়োজনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমাদের ধন্যবাদার্থ। 'ক্রান্তিকালে'র আরো একটি উপলক্ষি আমাদের মনাকর্ষণের যোগ্য—'ইতিহাসকে নবসৃষ্টির পরিধান পরানোর চিন্তা যাদের, তাঁদের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাগুলো একত্রিত হলেই কালকে বুদ্ধিগত করা সম্ভব। ঐতিহাসিক রূপান্তর-ও এইপথেই।' মূল্যায়নের এ-বিশেষ ভঙ্গি বহন করে ক্রান্তিকাল নিজের পথ-ও চিনে নিয়েছেন, কলরবের সুরকে উচ্চতর তীব্রতর করার জন্যে আব্রপ্রকাশ করেনি। কলরব তার কাম্য-ও নয়।...যে পথ আর সকলের নয়, যা স্বতন্ত্র ও অনন্য, তা-ই 'ক্রান্তিকালে'র পথ। এ-পত্র শুধু প্রবন্ধই পরিবেশন করবে। সাহিত্য সমাজ, সংস্কৃতি, সামগ্রিকভাবে আমাদের জীবনাচরণ—ইত্যাদি যে-সমস্ত আমাদের প্রতিদিনের চিন্তায় বর্তমান, তাদের বিশ্লেষণে ও উপলক্ষিতে ঐ-সব প্রবন্ধ অঙ্কুর হবে বলে আমাদের গভীর বিশ্বাস।'

'ক্রান্তিকালে'র আবির্ভাবকে সুস্বাগত জানাবার পরে-ও মনের একটা সহজ কথা প্রকাশ না-করে পারছি নে। বাংলাদেশে যে-পথে 'ক্রান্তিকাল' নিতে চলেছেন তা অন্ধকার পিচ্ছিল পথ। গর্ভযন্ত্রণার অস্থিরতা মিলিয়ে না-যেতেই মরণের চেহারা দেখা এ-দেশের পত্রপত্রিকাসমূহের হামেশাই অভ্যাস। রথ উঠে যাওয়ার এ-যুগ। এ-রকম বিপদসঙ্কুল পথে মহান্বিতা দেবীর সুসন্তানরা ভয়াবহ, অবসন্ন, আর যারা এখানে নির্ভীক যাত্রী তারা সন্মীর উপাসক। 'ক্রান্তিকাল'কে এ কথা স্মরণ রেখে চলতে বলি।

প্রথম সংখ্যার আব্রপ্রকাশে স্ববক্তব্যের সুযোগ্য প্রতিকলন নেই বটে, কিন্তু প্রতিজ্ঞার আভাস আছে। দেবজ্ঞত ভোমিকের প্রবন্ধটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর উল্লেখ্য লেখা-এ-কারণে-যে মানিকসাহিত্যের আলোচনার সবচেয়ে বেশি সতর্কতাসহকারে পঠিতব্য। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা, 'সাহিত্যে বস্তু, রূপ ও প্রকৃতি।' এ-আলোচনায় লেখক বহুরকম প্রশ্নের চেউ তুলেছেন। এ-আলোচনা মূলত আত্মলীন নয়, কিন্তু আত্মনিষ্ঠ। এ-আত্মনিষ্ঠা লেখকের আলোচ্য বিষয়ের কৌলিঙ্গ বাড়িয়ে তুলেছে।

বিশ্লেষণের অনন্য ভঙ্গিমায় যে-প্রবন্ধটি পত্রিকাটির প্রধানতম আকর্ষণ—তা হচ্ছে অরবিন্দ পোদ্দারের 'কবি নজরুল।' নজরুলসাহিত্য সম্পর্কে এ-দেশে আলোচনা

হয়েছে খুব কম। আর যা-ও বা হয়েছে তার বেশিরভাগই অবৈজ্ঞানিক। উচ্ছ্বাসের সস্তা মূল্যায়ণে নজরুলসাহিত্য এতদিন পরিচিত ছিল। সুধী লেখক ডঃ পোদ্দার প্রতীক্ষ চিন্তন সহকারে কবি নজরুলের লেখার মূল্যায়ণ করেছেন।

রঞ্জিত চক্রবর্তী ও সিদ্ধার্থ রায়—এঁদের আলোচনায় যতটা পরিশ্রম হয়েছে, ততটা স্বকীয়তা অজিত হয়নি। আত্মসাতীকরণে এঁদের দুর্বল মননের ভাব পরিলক্ষিত মনে হল। অতীন্দ্র মজুমদারের রানমোহন ও “তুফাতুল মওয়াহিদীন” প্রবন্ধটি একটি ভালো আলোচনা।

‘ক্রান্তিকাল’-এর পরবর্তী সংখ্যাতে অধিকতর উন্নতি কামনা করছি।

পবিত্র পাল

জ্যোতির্ষয় গঙ্গোপাধ্যায়

॥ অন্তর্মনা ॥

কলকাতা শহরেরই এক অতি নগণ্য ইকুল মাষ্টারের স্পর্শ কাতর ছেলে অনিন্দ্য। সে কেবল প্রথম চোখ মেলে তাকিয়েছে এই বিচিত্র পৃথিবীটার দিকে, যার সব বৈচিত্র্য, সব বৈষম্যের অর্থ সে আজো খুঁজে পায় নি। এই মিষ্টি কিশোরটির চোখ আর অনুভূতি দিয়েই এ-কালের রুদ্ধ ঘটনাবহুল কালকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন শক্তিমান আধুনিক লেখক। অনুভবের গভীরতায় আর কবির সংবেদনশীলতায় প্রবৃত্তি একালের নতুনপথের পাঁচালী।

। দাম : দু'টাকা ॥

॥ অগ্রণী বুক ক্লাব ॥

১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন,

কলিকাতা-৬

অগ্রণী

। দশম বর্ষ, পৌষ, ১৩৬৪ ।

ব্রাউনিং-এর প্রেম

অমলেন্দু বসু

“অন্তরের প্রীতির সাথে সারিয়ানা ব্রাউনিংকে উপহার” পাতাটি ধীরে ধীরে ওলটায় রবার্ট।

ছোট বোন সারিয়ানাকে উপহার দিয়েছে। লাল মলাট, ওপরে সোনালী জলের অঙ্কর। আগষ্ট ১৮৪৪।

বইটি এবার বুকের কাছে টেনে নেয় সে। সোফার ওপর মেলে দেয় দেহকে—একটির পর একটি পাতা ফুলের পাপড়ির মত যেন সাজিয়ে গেছে কবি—আর তার সুর তার বেদনা গুঞ্জন তুলে যায় বুকে।

পড়তে পড়তে একজায়গায় এসে থমকে দাঁড়ায় আঙুল। ছোট ছোট অঙ্করগুলোর ওপর বার বার চলে যায় তর্জনী। তবু বিশ্বাস করতে চায় না চোখ। একি করেছে কবি, সুদূর ওপার থেকে সম্বন্ধ না জানিয়েছে তাকে।

হ্যাঁ, সত্যিই তাকে। এতদিন ত সে দেখেনি, শেলীর কবরের পাশে ছিল ইতালীতে। আগষ্ট থেকে জানুয়ারী—দীর্ঘ পাঁচমাস বই বেরোবার পর অতিবাহিত হয়ে গেছে। একটা ধনুবাদ জানানো পর্যন্ত হয়নি—বত্রিশ বছরের যৌবনসীমান্তে আজ চমক জাগে। বিহ্বালের আবেগে সমস্ত শরীরে কি এক শিহরণ তুলে যায়। অস্বিরভাবে পায়চারী করে আবার বসে পড়ে চেয়ারে। চোখ চলে যায় কবিতার চরণগুলোতে।

“লেডী জিরালডাইনস্ কোর্টসিপ্” তারই কয়েকটি অঙ্কর—

“কিন্তু ব্রাউনিং-এর কোন পোমপ্রাস্তকে

যদি চেরা যায়

তবে রক্তাক্ত এক হৃদয়কে দেখা যাবে

যার ধমনী বহন করে মানবতা।”

টেনিসন্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর পাশেই রবার্ট ব্রাউনিং-এর নাম।

এক প্রতিভার আর এক প্রতিভার কাছে আত্মনিবেদন। হৃদয়ের এক প্রাস্ত থেকে আর এক প্রাস্ত পর্যন্ত আলোড়ন জাগে।

বুঝতে পারে রবার্ট ভাল লেগে গেছে মেয়েটিকে, তার ছন্দের জাল বস্তুগত করে ফেলেছে তাকে, বার বার ইচ্ছা করে এই মুহূর্তে কয়েকটা অঙ্করে জানিয়ে দেয়

প্রাণের অর্ঘ্য ! কিন্তু লক্ষ্যের এক বুক উপছানো ঢেউ এসে বাধা দেয় তাকে ।
চেপে ধরে কলমকে ।

সাদা লেটার প্যাডটা হাওয়ায় উড়তে থাকে পতপত করে । আর কলমটা
গা ঝাড়া দেয় বারবার । তবু একটা কিন্তু আছে ।

ইংলণ্ডের ভাগ্যাকাশে ডাউনিং আজ একটি সূর্য ।

এর আগে প্রশংসা এসেছে বহুবার, বহু পাঠক বহু পাঠিকা বহু অনুরাগ
মাখা কলমের স্তুতি ।

কিন্তু আজকের ঘটনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ।

ইংলণ্ডের আকাশে-যে মহিলা কবি একমাত্র চাঁদ, মধ্যমণি ।

তার স্নিগ্ধ কিরণে, ছন্দের সহজিয়া সুরে পাঠকের মন লুঠ করে নিয়েছে,
এ কবিতা তার ।

এলিজাবেথ ব্যারে ।

সহকার শাখার মত সেকি আশ্রয় করতে চায় সূর্যকে । মুহূর্তে একটি কল্পনা
পাখা মেলে যায় অন্তরে : সূর্য ও চন্দ্র পরস্পরকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকতে পারে ।
রবার্ট ডাউনিং ও এলিজাবেথ ব্যারে ।

মাঝখানের অবলম্বন হবে পৃথিবী—তাদের কবিতা । কলমটা আবার তুলে
নেয় ডাউনিং ।

রবার্ট ।

চমকে পেছনের দিকে তাকায় ডাউনিং ।

কে ? বিশ্বলের ভাবটা কাটেনি তখনো ।

আমি মিঃ কেনিয়ন ।

পিঠের ওপর স্বচ্ছ স্নেহস্পর্শের একটা আবেগ পাওয়া যায় । বসুন—বসুন ।
হাতটা ধরে নীরবে আকর্ষণ করে ডাউনিং ।

কেমন লাগল ? মিঃ কেনিয়নের কৌতুকমাখা চোখ দুটো নেচে ওঠে ।

অপূর্ব, অদ্ভুত লিখেছে—ইংলণ্ডের আকাশে আর একটি প্রতিভা ।

আমি ত বহুবার বলেছি এলিজাবেথ সত্যিই প্রতিভা । তা আমার পুরস্কার—
আপনার ?

হ্যাঁ, আমিই ও বই বহন করে এনেছি, এলিজাবেথ আমার ভাইঝি, সারিস্থানাকে
উপহার দিয়েছে সে ।

ও আপনার ভাইঝি ? চুপ করে যায় রবার্ট ।

রবার্ট । সেই স্নেহসিক্ত কণ্ঠস্বর, তোমায় যে এই উজ্জ্বলিত প্রশংসা করেছে তার
অন্তে সম্বন্ধ না জানাবে না—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে চিঠি লিখবে না ।

কিন্তু যদি কিছু ভাবে ।

হা-হা-হা আরে আমি তোমাকে বলছি । তোমার গুরুজন—বাবার ছাত্রাবস্থা
থেকে বন্ধুত্ব দুজনের, তার ওপর এলিরও খুড়ো । কিছু ভাবনা নেই, লেখ আজই
লিখে দাও । দেখবে আলাপ করে খুশি হবে, ভারী সুন্দর মেয়ে ।

সত্যই আশ্চর্য সুন্দর একটি প্রতিভা।

এর আগেও তুমি না কয়েকবার আলাপ করতে চেয়েছিলে।

হ্যাঁ, রাজ্ঞী হয়নি, অসুস্থ বলে লোকের সঙ্গে দেখা করতে বা সম্বন্ধ রাখতে সে নারাজ।

সে-কথা সত্যি, কারুর সঙ্গে দেখা করতে চায় না। ছোটবেলা থেকে ও পছন্দ।

পছন্দ ?

হ্যাঁ বিছানা ছেড়ে সোফার বেশি ওঠে না ও, সেইজন্মেই কারুর সঙ্গে দেখা করে না, তবে মহৎ প্রাণেরা তার সবসময় প্রিয়। তুমি লেখো এবার নিশ্চয় উত্তর দেবে, দেখা করবে।

বেশ।

অসুস্থ সুন্দর মেয়ে আর অসুস্থ তার পাণ্ডিত্য, তোমাদের দুজনের মত মিলবে সুন্দর। আজই লিখে দাও কিন্তু। খিলখিল করে হেসে ওঠে আবার কৌতুকমাখা চোখদুটো, সরল সমাচ্ছন্ন মুখটা খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কেনিসনের। আচ্ছা আসি। ফোল্ডিং দরজাটা কঁক করে আশ্চর্য সুন্দর হাসিটি বিদায় নেয় ধীরে ধীরে।

পঞ্চাশ নম্বর উইম্পোল স্ট্রীটে সেইদিনই হাজিরা দেয় একটি চিঠি।

চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করে এলিজাবেথ। বালিশটা বুকের কাছে টেনে এনে বেড্‌ল্যাম্পটা এগিয়ে নিয়ে আসে আরো। রাত্রির প্রহরে দশটার সন্ধেত শুনতে পাওয়া যায়। হুরু হুরু বুক, সমস্ত শরীরে কি এক উত্তেজনা অনুভব করে এলিজাবেথ, শিরাতে শিরাতে জাগে শিহরণ, কিন্তু কে লিখেছে? তলায় বড় বড় অক্ষরে লেখা রবার্ট ডাউনিং।

পারসেলিউসের সত্ৰাট, ভাবের যাহুকর, বেলস্ ও প্রোনপ্রাস্তের কবি সেই ডাউনিং, বিশ্বাস করতে চায় না চোখ, সে-ই আলাপ করতে চায় তার সাথে, সাক্ষাৎ করতে চায়—

চিঠিটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে যায় এলিজাবেথ।

১০ই জানুয়ারী ১৮৪৫

প্রিয় মিস্ ব্যারে,

আপনার কবিতাগুলি আমার হৃদয়কে লুঠ করে নিয়েছে। এ শুধু আমার মামুলী ধন্যবাদপত্র নয়, এ আপনার প্রতিভার স্বীকৃতি আর আমার সহজসরল মনের অভিব্যক্তি, আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে এই বইগুলিকে জলবেসে ফেলেছি আর ভাল বেসে ফেলেছি এদের বেশিকা, আপনাকে।

শেষের কথাগুলি অত্যন্ত সহজ সরল ও স্পষ্ট।

কি লক্ষ্য।

কোনো কিছুই গোপন রাখতে পারেনি ডাউনিং।

সেইরাত্রেই টেনে নেয় ডাউনিং সম্বন্ধে লিখিত যত প্রবন্ধ যত কবিতা। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পড়তে থাকে। কই কোথাও ত সে এতটুকু দুর্বলতা প্রকাশ করেনি ডাউনিং সম্বন্ধে। তবে—

চিঠিটার কয়েকটা অক্ষর যেন তার জীবনকে উদ্ভাস্ত করে দিয়ে যায়। চিঠিটা আবার পড়ে, আবার, গ্রহরের ঘড়িতে বেজে চলে এক-দুই-তিন। জন্মেবাওয়া জড়জীবনে এই কয়েকটা অক্ষর যেন ঘুরির স্রষ্টি করে।

তবু মনকে দৃঢ় করতে হয়, দুর্বল হলে চলবে না, কিন্তু যে-হৃদয় তার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে তার প্রেম আর সহানুভূতি দিয়ে তাকে এভাবে কি করে এলিজাবেথ, তাই কলম আপনি লিখে চলে তার—

প্রিয় মিষ্টার ডাউনিং,

আমার অন্তরের প্রত্যন্ত প্রদেশ হতে আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার চিঠির উদ্দেশ্য ছিল আমাকে আনন্দ দান করা, সে উদ্দেশ্য যদি সাধিত না-হয়েও থাকে আমার উচিত আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। কিন্তু সত্যি বলছি, উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। বিশেষত এমন একটি চিঠি এমন একটি হাত থেকে। আসল কথা সহানুভূতি আমাকে মুগ্ধ করেছে; আর সে-সহানুভূতি আসছে এমন একটি কবির কাছ থেকে যিনি সহানুভূতির বরাভয় নিয়ে এসেছেন আমার কাছে। এর প্রতিদানে আপনি কি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন। এ-বিষয়ে আপনি নিশ্চয় একমত যে, সারা পৃথিবীতে টায়ার থেকে কার্ণেজ পর্যন্ত যত চিঠিপত্র লেখা হয়েছে তার ভেতর সহানুভূতির আদানপ্রদান হল সবচেয়ে মহার্ব্য বস্তু। বাকী সবটুকু আমি ছেড়ে দিলাম আপনার অনুগ্রহের উপর। আমি নিশ্চয় বলব আমি আপনার কাছে ধনী। কেবলমাত্র এই আন্তরিক পত্রের জন্তে নয়, এ যা বহন করে এনেছে তার জন্তে। সবচেয়ে বড় কথা হল, যখন আমায় মহান কাব্যশিল্পের সাধনা করার জন্তেই বেঁচে থাকতে হবে তার প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা ছাড়াও তখন আমি আপনার বিপুল কাব্যশৈলীর কাছে মুগ্ধা ছাত্রী ছাড়া আর কি। এই কথাই আমার হৃদয়ের একমাত্র কথা আর তাই আমি বলছি। ইতি—এলিজাবেথ ব্যারে।

এর উত্তরে কয়েকটি অক্ষর শুধু ভেসে আসে ডাউনিংএর কাছ থেকে।

মিস ব্যারে,

আমার প্রতি আপনার এই অনুগ্রহ আমাকে আপনার সম্বন্ধে কৌতূহল করে তুলেছে। এর আগেও আপনি আমার নামে কয়েকজায়গায় লিখেছেন না—বেশ মনে আছে, এথেনিয়ামে আপনি আমার সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খিত প্রশংসা করে শ্রেষ্ঠ ভাবজগতের কবি বলে আখ্যা দিয়েছেন; কিন্তু সত্যিই কি আমি তার যোগ্য?

কিন্তু কেন?

উত্তর ভেসে আসে এলিজাবেথের।

আপনার স্রষ্টি থেকে আমি যে আনন্দ লাভ করেছি আর অনুপ্রেরণা পেয়েছি এ আপনি অস্বীকার করেন কি করে। আমি আপনাকে বলতে পারি কেন আপনার বিধা করা উচিত নয়। আপনার মনোরাজ্যে বিচিত্র দুই জগৎ পাশাপাশি বিরাজমান,

বস্তুকেন্দ্রিক ও ভাবকেন্দ্রিক। একাধারে আপনি অস্পষ্ট এক ভাবধারার চিত্র আঁকতে পারেন, আবার মানুষের স্বস্তির পূর্ণতর রূপ আঁকাও আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়। এইভাবে নিজের সমস্ত কৌশলই আপনার করায়ত্ত। আপনার এই ক্রমবর্ধমান শিল্পকৌশলকে শ্রদ্ধা ও আনন্দের সাথে গ্রহণ করতে অল্পে বাধ্য। তাহলে আপনি হলেন এক প্রবল পৌরুষের অভিব্যক্তি, আর আমি এক নারী যে শুধু ভাষাহীন বিশ্বয়ে তাকিয়ে রয়েছে সেইদিকে।

বেশ কয়েকবছর আগে আমার যখন একজন ইতালীয় গৃহশিক্ষক ছিলেন, প্রায়ই তিনি বলতেন-যে ইংরাজীতে একটা কথা আছে 'টেটে লাঙ্গা' বলে যার উচ্চারণ অত্যন্ত কষ্টদায়ক—সেই একটা কথাতেই নাকি আমার চরিত্র প্রকাশমান। এ কথায় তিনি বোঝাতে চাইতেন আমি নাকি অত্যন্ত অসহিষ্ণু যদিও এখনো বহুকিছু আমাকে সহ্য করতে হবে। অবশ্য প্রথমে সত্যই আমি ছিলাম অত্যন্ত অসহিষ্ণু। পরিকার পথ না বেছে নিয়ে যত দুর্গম পথেই ছিল আমার পদচারণা। যে কোনো কথার অর্থ শুধু অনুমানে ধরে নিতাম, ডিক্সনারী দেখবার ঐশ্বর্য নেই। চিঠি খুলতাম ছিঁড়ে ফেলে, যথার্থ জায়গায় ধীরে ধীরে না খুলে, প্রতিটি কাজই আশা করতাম কয়েকমিনিটে হয়ে যাবে। বড়কে আশা করতাম বিদ্যুতের সাথে সাথে।

এই মিথ্যা কুহেলিকাময় পৃথিবীতে আমি এখনো আপনার পরিচিতির সম্মান সম্বন্ধে একটা কথাও বলিনি, আমি আপনার বন্ধুত্বের বিনিময়ে আমার সমস্ত কিছুই দিতে পারি, যদি অবশ্য পাখির ভর আপনার না থাকে। ইতি,

এলিজাবেথ ব্যারে

এরপর চোদ্দদিন কোনো সাদা নেই, এক নৈঃশব্দ্য, এক বিশ্বয়জনক নীরবতা। রবার্টের উত্তর নেই, অভিমানে এলিজাবেথের চোখ অশ্রুময়, সেও লিখবে না, কেন এই হতাদর বুঝতে পারে না সে। নাই বা লিখল রবার্ট তাতে এলিজাবেথের কি এসে যায়, বার বার নিজেকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজের কাছেই যেন ধরা পড়ে যায় এলিজাবেথ, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যের এক ছুরসু চেউ এসে তার অন্তর-বাহির একাকার করে দেয়। শেষে আর ঐশ্বর্য রাখতে পারে না এলিজাবেথ, তিনমাস দীর্ঘ প্রতীকার পর শুধু কয়েকটি অক্ষরে মেলে ধরতে চায় মনকে, নিজের অজ্ঞাতে কখন গোপন ডাক তুমি বেরিয়ে আসে এলিজাবেথের।

প্রিয় রবার্ট,

তুমি যদি জানতে এই দীর্ঘ নীরবতার মাঝে কতবার আমি কলম ধরেছি, কতবার আমি লিখতে গেছি তোমায় চিঠি। কিন্তু পারিনি। শুধু অপেক্ষা করেছি কই তোমার জবাব, মাত্র কয়েকটি অক্ষর, বেশি কিছু চাইনি ত, তাও দেওয়া কি সম্ভব নয় তোমার পক্ষে?

এবার উত্তর ভেসে আসে রবার্টের, লঘুপঙ্ক মেঘের মত উদ্দাম বজ্রাহারা তার পদক্ষেপ, তার সুর, নিজেকে গোপন করার কোনো ইচ্ছাই নেই তার, এ সুর আরো

ঘনিষ্ঠ আরো একান্ত হয়ে বাছে—এখন বল কিধরনের বন্ধুত্ব তুমি দিতে চাও আমাকে—
(এখানে জুলিয়েটের মস্তব্য আমার ঠোঁটের আগায় এসে হাজির হয়েছে)। আমার
মনে হয়, সে বন্ধুত্ব একবার এবং চিরকালের জন্যে। তুমি যদি আমাকে লিখতে ঘৃণা
বোধ কর, যেমন আমি যাকে-তাকে চিঠি লিখতে ঘৃণা বোধ করি, আমি অনুরোধ
করি তুমি আমায় লিখো না। আর যদি তোমার কথাখুয়ায়ী আমার প্রতিটি কাছে
তোমার আন্তরিকতা থাকে, আমি তোমাকে বলি, তুমি আরো মন দিয়ে কাজ করে যাও,
ভগবান জানেন তোমার অগ্রগতির কথা শুনতে আমার কত ভাল লাগে (যদি অবশ্য
লিখতে ঘৃণা বোধ না-করে) আমি জানি তুমি লিখবে আমায় এবং লিখতে লিখতে ক্লান্ত
করে নেবে আমায়—

প্রিয় জাউনিং,

এ কথা তুমি কি করে ভাবতে পারছ যে আমি তোমায় ঘৃণা করতে পারি।
এমন একটা জিনিস তুমি বিশ্বাস করতে পার? যদি কেউ সবাইকে লিখতে না
ভাল বাসে অন্তত কাউকে-না-কাউকে সে নিশ্চয় লিখতে ভাল বাসে। এটা একটা
অস্বস্তি জিনিস আমার কাছে-যে তোমার কাছ থেকে কিছু শোনা বা তোমাকে কিছু
লেখা নাকি আমাকে কোনো আনন্দ দান করতে পারে না—আর এ-কথা তুমি ভাবছই
বা কি-করে যখন আমাদের সম্বন্ধ অনেক বেশি সরল হয়ে এসেছে। বিশেষত আমার
জীবনের গত কয়েক বছরে বেশিরভাগ কথাই লিখে জানাতে হয়েছে যেমন করে মানুষ
তার কথা দেওয়ালে মারা পোষ্টারে সবাইকে জানিয়ে দেয়।

তুমি যদি আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে তুমি আমার সাথে বন্ধুর মত
ব্যবহার করবে স্ত্রী বা পুরুষ এই ধরনের কোনো সংস্কার মনের ভেতর না রেখে,
তোমার প্রতিটি বাক্য প্রয়োগকালে, প্রতিটি কথার উচ্চারণে, প্রতিটি চিন্তা যদি
স্বতন্ত্র না-হয় আমার প্রতিচ্ছায়ায় এবং তোমার যথার্থ সরল মনের ভাব যদি প্রকাশ
করতে পার, যেমন করে তুমি তোমার প্রকাশককে ছুঁড়ে দাও সহজ কথা, তাহলেই আমি
রাজী আছি চুক্তি সহ করতে তোমার পত্রালাপিনী বলে। আমার একমাত্র বন্ধুত্ব,
এর ভেতরে যেন কোনো বাধানিষেধ না থাকে, আর না-থাকে কোনো চক্কানিনাদের
প্রয়াস। যখন তোমার মনোভাব স্পষ্ট, তখন আমার প্রতি সহজ হবার কোনো প্রয়োজন
নেই। কিংবা মনে যখন তোমার ঝড় ওঠে, তখন আমার প্রতি ব্যতিক্রম হবার কোনো
কারণ দেখি না। দেখ, এ-জগতের বাইরে আর এক বিচিত্র জগতে আমি বাস
করি। এই দুঃখের মাঝে একমাত্র উপায়ে তুমি আমায় সাহায্য দিতে পার, তা হল,
লৌকিকতা না করা। এটুকু বলতে পারি যে আমি একজন সৎ লোক, যদিও, হয়ত
একটু অসহিষ্ণু। তবুও আমাদের দুজনেরই পারস্পরিক সমবেদনা আছে, আমি
তোমার দিকে ঝুঁকে পড়েছি বহু জিনিসের জন্যে, আর লিখতে প্রস্তুত আছি যতটা তুমি
আমায় শেখাবে।

এর পর এলিজাবেথের যে সুর ভেসে আসে সে-সুর ভিক্টোরীয় যুগের এক পছন্দ
হ্রদল নারীর কণ্ঠস্বর নয় কিন্তু এক শিল্পী আর এক উজ্জ্বল হৃদয়ের স্পর্শে উদ্ভাসিত।
তাই কলম আবার লিখে চলে :

“এটা কি সত্য যে আমি অত্যন্ত অল্প জানি তোমার সম্বন্ধে ! এবং এটাও কি সত্য, যেমন অপরে বলে যে, শিল্পীর সৃষ্টি তার সত্যিকারের অন্তরের রূপকে প্রতিফলিত করে না। অল্প কথায় মানুষ কি ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি নয় ? আমার মনের কাছে এ-কথা সত্য নয়, আর সেই সঙ্গে এ-কথাও সত্য নয়-যে তোমাকে আমি সত্যিকারের চিনি না। তোমার মহৎ শিল্পগুলি এখনো আসতে বাকী আছে, এও আমার বিশ্বাস। তোমাকে বলার খুব প্রয়োজন নেই যে তুমি কি কর বা করতে যাচ্ছ কিম্বা আমাকে কি বলছ সে-কথা শুনতে আমি সবসময় আগ্রহান্বিত। আমি যেন “পুরানো ঘর” আর “ঘণ্টার” আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি (বেলস্ ও পোমগ্রাস্ত থেকে)। যখন তুমি বল আমার কবিতার সম্বন্ধে তোমার আগ্রহের সীমা নেই তখন আর আনন্দ আমি চেপে রাখতে পারি না। তোমার এই আন্তরিক সহানুভূতিতে যদিও মনে মনে আনন্দ বোধ করি, তা সত্ত্বেও আমার ভবিষ্যৎ সৃষ্টি কি হবে, এই কথা ভেবে, আপাতত ধন্যবাদ জানাই। আমার মনে হয়, কবিত্বের সম্বন্ধে যদি তোমার পাশাপাশি আমার নাম করতে হয়, তবে এই কথাই বলব যে, শিল্পের সম্বন্ধে দুজনেরই আমাদের ধারণা অত্যন্ত উঁচু। এ উদ্দেশ্যে এতই মহৎ যে দ্রুত জনপ্রিয়তা যেন আমাদের ‘আটলাণ্টা বনের’ মত আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। তবে আমি সঠিক জানি না, বা অনুমান করতে পারছি না যে, তুমিও কি কঠোর সমালোচনা ও শীতল তুচ্ছতাতে অভিভূত হও ? না—শিল্পের প্রতি ভালবাসাই তোমার কাছে যথেষ্ট এবং শিল্পচর্চাতেই তোমার হৃদয় সবসময় পূর্ণ থাকে।”

এর এক সপ্তাহ বাদে একটি উত্তরে ভেসে আসে রবার্টের দীর্ঘকায় এক পত্রে—“যা আমি ছেপেছি তার কোনো কিছুই আমার মনে নেই, এতে আমার বহুধরনের প্রতিভারই স্বাক্ষর আছে আর আছে এক নাটকীয় সহানুভূতি। আমার ধারণা, আমার জন্ম ও মৃত্যু শুধু একটি কথাই প্রমাণ করবার জন্যে : রবার্ট ডাউনিং একটি কবি। এরপর তুমি জিজ্ঞাসা করেছ সমালোচনা আমাকে কি-ভাবে স্পর্শ করে, আমি এক গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে লিখি—লেখাটাই আমার কর্তব্য। এটাও বিচার করি যে, যা ভুলত্রুটি হয় তা আমারই জন্য, অথচ কি বলে বা না-বলে তা আমাকে স্পর্শমাত্র করে না। কীটস্ এবং টেনিসন—তাদের লম্বা সহস্র জীবনে একটি দুটি রূঢ় কথাতেই অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন কিন্তু আমার কাছে তা অত্যন্ত তুচ্ছ। টেনিসন রীতিমত কোয়ার্টালি পড়তেন এবং যে-ভাবে তাতে নির্দেশ দেওয়া আছে তাঁর গভীর মুখাবয়ব নিরে ঠিক সেইভাবে চলতে চেষ্টা করতেন, তাঁর নিজস্ব পথের নিশানা সম্পূর্ণভাবে বদলে যেত, কিন্তু আমি।”

এলিজাবেথের ‘মন’ যেন ছলে ওঠে, সমস্ত প্রাণমন যেন একই সঙ্গে চীৎকার করে ওঠে রবার্টের সমালোচনার মতামতের সঙ্গে।

কি সত্য, কি অপূর্ব সত্য—যা তুমি বলেছ সমালোচনাকারীদের সম্বন্ধে আমার প্রতিটি বিশ্বাস যেন তোমার প্রতিটি কথাকে অনুসরণ করে।

সমালোচনা সম্বন্ধে কবির যথার্থ মতামত পড়ে আমি আনন্দ লাভ করি। এবং তা আমি পড়ি হৃদয়ের অত্যন্ত সহানুভূতি এবং দরদ দিয়ে।

সমসাময়িক প্রতিভাকে অস্বীকার করাটা নিয়মের ব্যতিক্রম নয়, নিয়মের ধর্ম। বাসায়-বসে-থাকা ঈগলকে কেউই চিন্তার মধ্যে আনে না। যতক্ষণ-না ডানার ঝাপটায় সে চারপাশ সচকিত করে এগিয়ে যায়। বেশির ভাগ সমালোচক সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছে তা সত্য। তাদের যে-মন্দ স্বভাবের পরিচয় পাই আমরা তা থেকে তারা সত্যিই ভাল, যদিও তাদের প্রভাব এ-যুগে অনস্বীকার্য এবং এ-কথা বলা নিশ্চল যে কি গুণে তারা প্রভাব বিস্তার করতে পারলেন। আমার মতে সকলেই বোধহয় কবিতা সমালোচনা করবার মত যোগ্যতা অর্জন করেছে। কিন্তু রসায়ন বা অক্সালে তা নয়। এ পৃথিবীতে সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস হল নিরুদ্বিগ্নতা নয়, কিন্তু নিরুদ্বিগ্নতা নিয়ে চালাকী মারা। কিন্তু তুমি এই সুর এই ধ্বনি থেকে এক বিচিত্র স্বর্গীয় রচনা করেছে। তুমি এখন যা লিখেছ তাইতেই তুমি চিরকাল বেঁচে থাকবার অধিকারী। যদিও তুমি বলে থাক এ তোমার সৃষ্টির শুরু। ইয়া আমাকে সত্যিই আনন্দ দান করে, যখন শুনি তোমার বাগানে গোলাপ ফুটে রয়েছে এবং তোমার চিত্ত আনন্দময়, এ দুয়েরই তুমি অধিকারী আর এই দুইকেই আমার পাবার দাবী আছে তোমার কাছে।”

এমনি করে দিন এগিয়ে চলে—জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী। ধীরে ধীরে ফেব্রুয়ারীও শেষ হয়ে আসে। আর সাথে সাথে পত্রালাপের এক অধ্যায়ের পাপড়ি খসে যায়।

শুধু রুডেল থেকে উইমপোল স্ট্রীটের চিঠির হাঁটাইটিতে পরিতৃপ্তি পায় না রবার্ট। বসন্তের প্রতীক্ষায় নীরবে পথের দিকে চেয়ে থাকে সে। এলিজাবেথের জন্যে বসন্তের কি প্রবল প্রয়োজন। যদিও বসন্তকে নিজেরও যে প্রয়োজন আছে, একথা স্বীকার করতে চায় না রবার্ট। এই অধীর প্রতীক্ষার মাঝেই হঠাৎ একদিন জানিয়ে বসে এলিজাবেথকে দেখবার দীর্ঘদিনের ইচ্ছাকে, নিজেকে চেপে রাখতে না পেরে। তার সমস্ত রক্তমাংস শিরাউপশিরা দর্শন অমুভূতির জন্যে পাগল হয়ে ওঠে, আর বাধা মানে না।

২৬শে ফেব্রুয়ারী বুধবার সকাল।

প্রিয় মিস্ ব্যারে

এবার সত্যিই বসন্ত এসেছে, ভীকু কুন্পিড তার সুর, পাখীরাও জানতে পারছে তা, আর এই বসন্তেই আমি তোমাকে দেখতে চাই, নিশ্চয় দেখতে চাই, এর আগেও কয়েকবার তোমাকে দেখতে চেয়ে প্রত্যাহৃত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে, এ যেন কোনো ঐশ্বর্যময়ী আলোকসজ্জিত বাড়ির সামনে এসেও দরজাটা বার বার বন্ধ দেখতে হয়েছে আমাকে; এবার আর আমি কোনো কথাই শুনব না। এ কাগজটি নিয়েছিলাম অনেককিছুই লিখব বলে। এখন আমি বলছি, আমি কিছুই লিখব না, শুধু আমি জানতে চাই বসন্ত কি সত্যিই এসেছে? • • •

এলিজাবেথের উত্তর ভেসে আসে:

প্রিয় মিঃ জাউনিং,

বসন্ত আসছে এ-কথা সত্যি, কিন্তু বসন্তকে আমি চাই আমার নিজস্ব ধরনে

তোমার মত বা অন্য কবিদের মত নয়। আমার কাছে বরফের কোঁটা পর্যন্ত বরফ পড়ার মতই। পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত হিম হয়ে আসে, পূব বাতাসের শুক গর্জনে বুকের ভেতর পর্যন্ত কেঁপে যায়। এপ্রিল শুধু সংবাদের আভাস দেয়, আর নে আসে ছতের বেশে চুপিচুপি—বসন্ত সম্বন্ধে এই আমার একমাত্র চিন্তাধারা—আমার বসন্ত আসে অনেক পরে। তাহলেও এই কঠিন ঋতুর করস্পর্শের ছোঁয়াচ থেকে নিজের জীবন মুক্ত হওয়ায় আমি ধন্যবাদ না-জানিয়ে পারছি না, আমরা এখন কত সুখী, যদিও পূবের বাতাস পাখীর কলধ্বনিকে ছাপিয়ে ওঠে, তাদের গানকে নষ্ট করে দেয়, তবু আমি কত সুখী যখন তোমার এই প্রাণখোলা চিঠি আমার হাতে এসে পৌঁছয়।

তবু দুর্বল হয় না এলিজাবেথ, এই ছড় পছন্দ অথর্ব দেহ নিয়ে কেমন করে সে দাঁড়াবে ডাউনিং-এর সামনে, কি লজ্জা! হয়তো ঘুণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে ডাউনিং। সমস্ত স্বপ্নের চশমা পড়বে খসে। খুলায় ফেলে যাবে এলিজাবেথকে, তখন? তার চেয়ে স্বপ্ন থাক সুস্বপ্নাশ্রিত, আর সে স্মৃতির তারে বসন্ত যখন দোলা দেবে তখন সে কয়েকটি ষা দেবে মাত্র, কলম এগিয়ে যায় আবার।

না-না তুমি ভুল ভেবেছ, আমার সঙ্গে দেখা করবার মত কোনো সম্পদই নেই আমার, তার ওপর পছন্দ দেহ, ক্রুদ্ধ শীত আর পূবের বাতাস, না, না, সে হয় না।

চিঠিটা ফেলে দিয়ে ডাকে নিশ্চিত হয় এলিজাবেথ। যাক মনকে সে হৃদয়ের ওপরে ঝাড়া করতে পেরেছে, তার একটু হলেই মনও হৃদয়ের সাথে সাথে অন্তর গর্ভে চলে যেত তখন। চিরজীবন গেছে ব্যর্থতা আর ভিত্ততার মাঝে। আজ আটত্রিশ বছর বয়সে, যৌবনের উপাস্তে এসে ছি ছি একি দুর্বলতা, আবার ভগ্নাশা আর রিক্ততা নিয়ে ফিরতে হবে, সে অসম্ভব।

অবাক হয়ে যায় এলিজাবেথ। প্রায় পরের দিনই চিঠির উত্তর দিয়েছে ডাউনিং। চিঠির উত্তর ত সে চায়নি। অবাধ্য মত লিখেছে সে :

আমার সত্যিকারের আন্তরিক শুভেচ্ছা যদি থাকে তুমি আমারই মত পূব বাতাসকে উপেক্ষার হাসি হেসে উড়িয়ে দিতে পার।

হৃদয়ের কোনো কিছুই গোপন রাখতে চায় না রবার্ট। সব কিছুই ফেলে বেলে ছড়িয়ে সে ভরিয়ে দিতে চায় এলিজাবেথকে। কিন্তু হয়, সে জানে না কত দুর্বল এলিজাবেথ, কত ব্যর্থ, কত আকাশকুসুম তার কবিতার ছন্দ, সেই তার সত্যিকারের রূপ নয়।

এতদিন সে বাস করেছে এক অকুণ্ড রাজ্যে, সেখানে মানুষ ছিল না, সঙ্গী ছিল না, সাথী ছিল না, সোফা, কোচ, খাট, আলমারী আর রাশীকৃত বই শুক বিশ্বয়ে তাকিয়ে থাকত এলিজাবেথের দিকে। আর এক নীরব সংগীত প্রবাহের সৃষ্টি করত।

কিন্তু আজ? এই বুক উপছানো ঢেউ এল কোথা থেকে? এ ছোয়ার এ উদ্ভাসতা বাকী আর কিছু রাখবে না, হৃদয়ের সর্বস্ব তার লুণ্ঠ করে নেবে দস্যুর মত। এক অপরিচিত পদধ্বনি, গুণ গুণ করে বেরিয়ে আসে গান, কবিতার চরণ—

“পৃথিবীর সব রঙ ছিল যত কেন বদলাল বল
প্রথম চরণ শব্দ পেয়ে কি মোর হিয়া টলমল ।
ভেঙ্গে চুরে কত চুরমার করে জীবনের মোহনায়
স্বত্ব আমার চির সহবাসী ডুবে যাই অজ্ঞানায়
কেন চুপিচুপি চুরি করলে গো কত করে কত ছল
প্রথম প্রেমের সোহাগস্পর্শে কে বাঁচালে তুমি বল ?
নব সুর দিলে জীবনেতে মোর পূর্ণ পাত্র ভরি .
জীবনবেদের মহামন্ত্রকে নিঃশেষে পান করি ।
সারামুখে তাই রসধারা আজ মিষ্টতা ভরা বুক
স্বর্গ বর্ত্য সব বদলাল একি ওগো কৌতুক ।”

কবিতাটা লিখে নিজেই মুগ্ধদৃষ্টিতে পড়ে এলিজাবেথ । আবার পড়ে । একি
করেছে সে, সনেট, সনেট লিখেছে সে ।

কিন্তু এতো সনেট নয় তার হৃদয়ের রক্ত নেংড়ানো গোলাপ ।
এলি ।

ভাষা ভাষা দুটো চোখ তুলে তাকায় এলিজাবেথ—কাকা তুমি ?
কেন আসতে নেই ? হাতেতে ওটা কি ? লেখা হচ্ছিল বুঝি ?

লজ্জায় সারা শরীর ভরে ওঠে, ও কিছু নয়, ও দেখাবার মত হয়নি । হাতের
মুঠোর ভেতর কাগজটা পুরে ফেলে তাড়াতাড়ি । এ কবিতা সে দেখাবে কি করে ?
এ-যে তার রক্তরঞ্জিত গোপন ইতিহাস, নিজের অজ্ঞাতে কলম এ কাজ করেছে ।
বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার আশ্রয় সাথের । একে সে দেখাবে কি করে ? মুখটা
নানিয়ে নেয় এলিজাবেথ, যদি লজ্জানত চোখদুটোতে কিছু পড়ে নেয় কেনিয়ন ।

এলি । কাছে এসে মাথায় হাত দেয় কেনিয়ন । এমন ভ’ তুমি কখনো করো
না, নিজে থাকতে কবিতা পড়ে পড়ে শোনাও ।

এটা কবিতা হয়ে ওঠেনি কাকা—হাতের মুঠোটা কাঁপতে থাকে ধরধর করে ।

বেশ বেশ, ওটা শুধরে নিয়ে তবে দেখিও । কথাটার হৈতবোধ বুঝতে পারেনি
কেনিয়ন ।

মুখ তুলে তাকায় এবার এলিজাবেথ । মুখাবয়বে এতটুকু রেখা পড়েনি...
অত্যন্ত সহজে কথাটা বিশ্বাস করেছে সে, ছোট একটা নিঃশ্বাস পড়ে এলিজাবেথের ।
নিশ্চিন্ত হয় এবার সে । কি সরল কেনিয়ন ।

একটা কথা জানবার জন্যে এলুম তোমার কাছে ।

বলুন ।

রবার্ট তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছিল দেখা করবার জন্যে ।

মুখটা লাল হয়ে যায় এলিজাবেথের ।

কি চুপ করে রইলে কথা বলছ না, উত্তর দাওনি বুঝি । নীরবে ষাড়টা
নাড়ে এবার সে ।

তবে, না বলেছ নিশ্চয় ?

তুমি ত জান কাকা সব । এবার ভেঙ্গে পড়ে এলিঙ্গাবেথ ।

চোখছুটো দিয়ে বেয়ে পড়ে অশ্রুর ধারা । নাখাটাকে বুকের কাছে টেনে
আনে এবার কেনিয়ন । নীরবে নাখায় হাত বুলোতে থাকে ।

রবার্টকে চেনো না তুমি সে এক আলাদা জগতের মানুষ ।

কিন্তু আমি যে—

ভয় নেই, সে জানে তুমি পছন্দ করিত দেহ দেখে ফিরে যাবার মত মনোবৃত্তি
তার নেই । দেহের চেয়ে অনেক উঁচুতে ঠাঁই দেয় সে হৃদয়কে ।

কিন্তু এ-ছাড়াও আর একজনের মত না হলে বে অসম্ভব ।

কে, তোমার বাবা এডওয়ার্ড ?

হ্যাঁ, একথা আমি লজ্জায় বলতে পারছি না রবার্টকে ।

সে মত করানো যাবে, তুমি আজই ওকে লিখে দাও, ওকে ফিরিও না,
ভুল করবে তাহলে, অসুস্থ পাণ্ডিত্য আছে ওর গ্রীক সাহিত্যে আর আছে তেমনি
উঁচু মন ।

গ্রীক সাহিত্যে ?

হ্যাঁ, যা তুমি শৈশব থেকে ভালবাস, তাছাড়া আছে গ্রীস ও রোমদেশের প্রত্যক্ষ
অভিজ্ঞতা...তোমার সাহিত্যজীবনকে ওর বন্ধুত্ব অনেক উন্নত করতে পারবে বলেই
আমার বিশ্বাস, আজই লিখে দাও ।

বেশ, কিন্তু বাবার মতের স্রষ্টা সম্পূর্ণ দায়িত্ব কিন্তু তোমাকে নিতে হবে । আর
তা ছাড়া শীতটা সম্পূর্ণ না গেলে একেবারেই অসম্ভব আমার পক্ষে দেখা করা ।
চারপাশ বন্ধ তারপর স্বাস্থ্যও ভাঙ্গাচোরা

বেশ, যা ভাল বোঝ তাই লিখে দাও কিন্তু একেবারে ফিরিও না ।

ঘর থেকে আস্তে আস্তে বিদায় নেয় কেনিয়ন । এর কয়েকদিন বাদেই একটা
চিঠি পায় রবার্ট । সেই মেয়েলী গোটা গোটা অক্ষর, প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিল সে ।

তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজী আছি, কিন্তু এ শীতটা না কাটলে কোনো
কিছুই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় । তখন হয়ত এ ঘরটায় একটা ব্যবস্থা করা যেতে
পারে, কারণ আরো শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন আমার ।

ওপাশ থেকে উত্তর ভেসে আসে—আমি অপেক্ষায় রইলাম । প্রথম দর্শনের
সেই উদ্ভূত মুহূর্তটির স্রষ্টা ; কবে বসন্ত আসবে ।

[ক্রমশ]

ইউরোপের ব্যালে নাচের ইতিহাস

অতীন্দ্র মজুমদার

ভারতবর্ষের লোকের কাছে ব্যালে জিনিসটি অপরিচিত। সমবেতনৃত্য বা যৌথ নৃত্যের দ্বারা ব্যালে কথাটার ঠিক অর্থ বোঝানো যায় না, কিংবা প্রচলিত নৃত্যনাট্যও ব্যালে নয়। সেইজন্য ব্যালে কথাটার ঠিক বাঙলা করা মুশকিল। সংক্ষেপে ব্যালে বলতে বোঝায়, একটি ভাব বা রূপ কিংবা কোনো ঘটনার আয়তন (সাবধেষ্টিত) রূপায়ণ—তাতে হয়ত নাটকীয়তা আছে, সংগীতও আছে আবার নৃত্যেরও নানা রকমফের থাকবে। এইজন্যই ব্যালে জিনিসটা জটিল, দুর্জয়। আর এর উৎপত্তিস্থল পাশ্চাত্য দেশে বলে এটা আমাদের কাছে আরও অপরিচিত। কিন্তু পাশ্চাত্য রূপে (ফর্ম) অপরিচিত হলেও বাঙ্গালীজাতির স্বভাবজাত গ্রহণক্ষমতার ফলে পাশ্চাত্যব্যালের এ-দেশী রূপায়ণ, কিংবা বলতে গেলে, ভারতবর্ষে ব্যালে নাচের প্রবর্তন বাংলাদেশেই প্রথম হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ এবং বিশ্বখ্যাত বাঙালী নর্তক উদয়শঙ্কর 'ভারতীয় ব্যালে' নাচের প্রথম প্রবর্তন করেন। কিন্তু সেটা পাশ্চাত্য ব্যালে নাচের বিচারে একেবারেই আলাদা জিনিস। খাঁটি ব্যালে নয়। তাতে নাটকীয়তা বেশি, ভাবরূপ কম। এক রবীন্দ্রনাথের 'কালসুগন্ধা'-কে কিছুটা ব্যালে নাচের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

আমাদের দেশে উচ্চসমাজে পাশ্চাত্যরীতি অনুযায়ী ব্যালে নাচের প্রবর্তন যে হয়নি, এর কারণ প্রাধান্যত দুটি। এক, আমাদের সমাজে উচ্চকোটি অংশে নৃত্যের ব্যাপক প্রচলন নেই, দ্বিতীয় পাশ্চাত্য ব্যালে নাচের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় এদেশী নর্তকদের একেবারে নেই বললেও চলে। সেই কারণে, ব্যালে সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহও কম।

কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে, বিশেষ করে রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে ব্যালে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেজন্য সে-সব দেশে ব্যালে নর্তকদের মধ্যে নানারকম নতুন জিনিস নিবেদন করবার জন্য ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছোটে, জনসাধারণের রসগ্রাহিতা স্রষ্টার মনে নতুন উদ্দীপনা এনে দেয়। ব্যালে এ-সব দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার সঙ্গেই একরকম জড়িয়ে গিয়েছে বলা চলে।

অথচ পাশ্চাত্যের ব্যালে গড়ে উঠেছে মাত্র তিনশ বছরের মধ্যে। প্রবল হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু এই তিনশবছরের যাত্রাপথ খুব সুগম ছিল না। প্রথমেই জনসাধারণ ব্যালে নাচের নামে লাফিয়ে ওঠেনি। প্রথম প্রথম ব্যালের প্রতি আগ্রহ বিক্রপই ছোঁগাত। রক্তহীন চেহারা, লম্বা চুলওয়ালা পুরুষ নর্তক আর খাটো-চুল, আঁটসাঁট পোশাকপরা মেয়ে নর্তকীরা জনসাধারণের বিক্রপেরই খোরাক ছিল। অথচ লওনে ১৯৩৫ সালে ১৭টি বিভিন্ন কোম্পানী লা সিল্ফাইদস্ আর কার্নাভালের বিভিন্ন রূপায়ণ দেখিয়ে গিয়েছেন—আর, ওয়েস্ট এণ্ডের দুটি থিয়েটার হলে কোনোদিনই তিলধারণের জায়গা থাকেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

পর ব্যালে ইউরোপে আরো জনপ্রিয় হয়েছে। এই জনপ্রিয়তার পিছনে যে ইতিহাস আছে তাও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

॥ ১ ॥

ব্যালে নাচের ইতিহাসকে তিনটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করা যেতে পারে। এক, তার আঙ্গিক বিবর্তনের বা টেকনিকাল বিবর্তনের ইতিহাস; দুই সামাজিক ইতিহাস; আর তিন তার শিল্পগত বৈশিষ্ট্যের ইতিহাস। এই প্রবন্ধে খুব সংক্ষেপে এই তিনটি ধারারই কিছু কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

নৃত্য আদিমযুগের জিনিস। ভীত মানুষ ক্রুদ্ধ দেবতার সন্তুষ্টিবিধানের জন্যই আদিমযুগে নৃত্যের প্রচলন করে। নাচ সেইজন্য গ্রামে, শহরে, মন্দিরে, মঞ্চে বিভিন্ন রূপে আছে। কিন্তু ব্যালে এই নাচেরই অতি সংস্কৃত, অতি আধুনিক আর অতি স্বাচ্ছন্দ্য একটি শাখা মাত্র। ইউরোপে নাচের প্রবর্তন প্রাচীন গ্রীকদের সময় থেকে, ইতালী হয়ে ফ্রান্সে, শেষে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে; কিন্তু ব্যালে, অন্তত যে-প্রকৃতির নৃত্যকে ব্যালে বলে আলাদা করা যেতে পারে, তার জন্ম ১৬৬১ সালে চতুর্দশ লুইয়ের আমলে। তিনিই প্রথমে “লা আকাদেমী ফ্রান্সেসে ডু লা ড্যান্স” প্রতিষ্ঠা করেন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়। এর পূর্বে ব্যালে নাচ তো দূরের কথা, অন্যান্য নৃত্যের একাডেমীও কেউ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এই ব্যালের একটি সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান ফ্রান্স প্রথমে খাড়া করলেও, ব্যালে নাচের প্রথম সূত্রটি কিন্তু ইতালীর। সেখানকার ক্যাথারিন দ্য মেডিসিই প্রথমে ব্যালে ধরনের নাচের চিন্তা করেন। এতে নাচও ছিল, গানও ছিল আবার আবৃত্তিও ছিল। বিষয়বস্তু পৌরাণিক, আর উদ্দেশ্য ছিল রাজার মনোরঞ্জন করা। ১৫৮১ সালে এটি প্রথম অভিনীত হয়, আর সেই ব্যালেটির নাম ছিল “লা ব্যালে কমিক্ ডু লা রেইন্”।

এই ক্যাথারিনের এক বিশ্বস্ত সহযোগী ছিলেন। নাম বোল্দাসারিনো বেল্লিওজোসো। তিনি সে-সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ বেহালাবাদক ছিলেন। ক্যাথারিনের মৃত্যুর পর তিনি জীবিকার জন্য ফ্রান্সে আসেন এবং একটা নৃত্য-শিক্ষালয় খোলেন। তিনিই রাজকীয় ডোমসভায় নাচের আসরের বন্দোবস্ত ক’রে সাতটি চতুর্দশ লুইয়ের দৃষ্টিতে পড়েন। তাঁর প্রতিষ্ঠা দিন দিন বাড়তে থাকে। তারপর রাজার শালিকার বিবাহোৎসবে একটি ব্যালের বন্দোবস্ত ক’রে তিনি খুবই খ্যাতিসম্পন্ন হন। এই ব্যালেটির বিষয়বস্তু ছিল গ্রীক উপাখ্যানের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর যুলিসিসের অলুকেরণে এক নির্বাসিত বীরের কাহিনী, যিনি সার্সী মায়াবিনীর কবল থেকে উদ্ধার লাভ ক’রে নিজের প্রাণবিনীর সঙ্গে মিলিত হন। ফরাসীদেশের ব্যালের ইতিহাসে এর উল্লেখ আছে, কিন্তু অনেক খুঁজেও এই ব্যালেটির নাম কি ছিল তা জানতে পারিনি। পাঠককেও জানাতে পারলুম না। ফরাসী ইতিহাসকার বলেছেন, এই ব্যালেটির সর্বাংশে সেই ইতালীয় প্রতিভার ব্যক্তিত্ব আটপেটে ছড়ানো ছিল। এই ব্যালের

কেরিয়োগ্রাফী (পদ সঞ্চালনের ছন্দ), সংগীত, পদক্ষেপ, বিষয়বস্তু—সমস্ত তাঁর নিজস্ব ছিল। স্বভাবতই সম্রাট তাঁকে স্বীকৃতি দেন ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত আকাদেমীর প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। বোল্দাসারিনোর প্রতিষ্ঠা কেমন ছিল তার প্রশংসা পাওয়া যাবে পরবর্তীকালের দুটি ঘটনায়। এক, হোগার্থের চিত্রে তাঁর প্রতিভার রূপায়ণ, দ্বিতীয়, চার্লস ডিকেন্সের 'ব্লিক হাউস' উপন্যাসে তাঁর উল্লেখ। ডিকেন্সের উপন্যাস বোল্দাসারিনো নারা যাওয়ার প্রায় ২০০ বছর পরে লেখা,—সেখানেও তিনি এক বেহালাবাদকের চরিত্রে বোল্দাসারিনোকে অনুরূপ না ক'রে পারেননি। মজার ব্যাপার, বোল্দাসারিনো পরে ফরাসী নাম নিয়েছিলেন বাল্‌তাসার স্ত্র বোছো। তিনি পরবর্তী যত ব্যালে পরিকল্পনা করেন, সব ফরাসী নামে। শিল্পের ক্ষেত্রে নিজেকে উৎসর্গ করার এত বড় উদাহরণ বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই।

বোল্দাসারিনো রাজা লুইকে নৃত্যের-পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে এনেছিলেন কারণ, তিনি বুঝেছিলেন প্রাথমিক অবস্থায় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে এ শিল্পধারার প্রাণরস যাবে শুকিয়ে। রাজা চতুর্দশ লুই নিজেও উঁচুদরের নর্তক ছিলেন, তাই বোল্দাসারিনোর সঙ্গে যোগ দিলেন।

সম্রাট লুই নিজেও অনেক নৃত্য পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তাতে প্রধান অংশ নিয়েছিলেন। এ-সবই ১৬৫১ থেকে ১৬৬১ পর্যন্ত দশ বৎসর ধরে হয়েছিল। এসব ব্যালের বিষয়বস্তু সবই পৌরাণিক। ফিল্ড মার্শাল ব্যাসোম্পিয়েরকে, বিশিষ্ট সম্মানিত পার্লামেন্ট সদস্যদের, সভাসদদের আধা পেশাদার নাচিয়েদের তিনি এই শিল্পে সক্রিয়ভাবে নামিয়ে এনেছিলেন। এর ফলে হয়েছিল এই, ফ্রান্সের নাচিতে ব্যালে নাচ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হল, তার সামাজিক সম্মানও জুটল।

অবশ্য নাচের প্রচলন যে সাধারণভাবে তখন ছিল না, তা নয়। জীপ্সি সম্প্রদায়, নিম্নশ্রেণীর শহরবাসী, ভবঘুরে সম্প্রদায়, সবাই তখন নাচকেই পেশা হিসাবে নিয়েছিল। কিন্তু তাতে সাধারণ শিক্ষিত ফরাসীর কোনো উৎসুক্য ছিল না। চতুর্দশ লুই-ই নৃত্যকে বর্ধাদা দিলেন 'লা আকাদেমী ড্যান্সেনন্ স্ত্র ম্যাজিক এন্ড ল্য দান্স' প্রতিষ্ঠা করে (১৬৬১)। এখনও পারীতে এই আকাদেমী বর্তমান আছে।

নাচের জনপ্রিয়তা এবং জনচিন্তে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এল নাচের পোশাকের বিবর্তনের প্রশ্ন। সেইসময় নর্তকীদের পোশাক ছিল আপাদমস্তক ঢাকা একটা আলখাল্লার মত। এতে প্রথম অসুবিধা দেখা দিল ঘুরপাক্ খাবার সময়। ভারী ছড়ানো ঢিলে পোশাকে সোজাসুজি সহজ পদক্ষেপ চলে কিন্তু শিল্পচাতুর্যের পরিচয় দেওয়া যায় না। প্রথম একজন নর্তকী প্রচলিত পোশাক বদলাতে গিয়ে সাংঘাতিক ধাক্কা খেয়েছিলেন। দোষের মধ্যে তিনি স্টার্টকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত উঠিয়ে নেন এবং দেহের অস্বাভাবিক অংশ যাতে সহজে সঞ্চালন করা যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে গাউনটাকে সামান্য কাট-ছাঁট করে নেন। এ হল ১৭২১ সালের কথা, অর্থাৎ আকাদেমী প্রতিষ্ঠার ষাট বছর পরের কথা। নর্তকীর নাম লা কামারগো। কাগজে কাগজে তাঁর নামে কলঙ্ক ছড়াতে লাগলো, প্রকাশ্যে পোপের কাছে স্বর্গদান সমাজ প্রতিবাদ পাঠালেন ব্যালে

বন্ধ করে দেবার জন্যে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজপন্থিরাও আবেদন জানালেন। কিন্তু কামারগো অচল অটল। তিনি তাঁর পোশাকের এক চুলও রদবদল করলেন না। সাংক্ষেপে অঙ্কিত বিখ্যাত ছবিতে কামারগোর পোশাকের ছবির প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। কামারগোর এক সহকর্মী শালে আরো এগিয়ে গ্রীকদের অশুকরণে বুক কাটা ছায়া প'রে ঘরোয়া নাচের আসরে এলেন। অবশ্য ফরাসী বিপ্লবের আগে পর্যন্ত এ পোশাক অনাদৃত রইল। পরে শালের এক ছাত্রী 'পিগুমালিয়ন' ব্যালেতে এই পোশাকে ফরাসী রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করলেন। সে-যে কি হৈঠেই পড়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সে পোশাকের নাম আজ হয়েছে রোমান্টিক কষ্টম।

এরপর হল ফরাসী বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লব ছিল প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত। এতে যেমন ভাল অনেক কিছু ছিল, তেমনি বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাসের জোয়ারে অনেক মন্দ কিছুও ভেসে আসে। সামাজিক বিধিনিষেধ থেকে মুক্তি চাই, এই সাধারণের প্রথম আকাঙ্ক্ষা। সাহিত্যে, ছবিতে, সংগীতে, নৃত্যে, অভিনয়ের ব্যাপক প্রভাব দেখা দিল। এতে ভাল অনেক হয়েছে, আবার ক্রান্তি বোহেমিয়ানিস্কে জন্ম দিয়েছে ফরাসী বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবের সর্বগপ্রভাব থেকে নৃত্যও বাদ গেল না। সেইসময় ফরাসী অপেরার সাজসজ্জার প্রধান পরিকল্পক ম্যোলৎ প্রথম মহিলাদের ড্রেসিয়ারের উদ্ভাবন করেন। আর এই আবিষ্কার ব্যালে নাচের পোশাকে ও নৃত্যের পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলো। দেখা গেল আঁটসাঁট পোশাকে দেহের সঞ্চালন অনেক সহজ ও ছন্দময় করা যায়। মহিলা সমাজ যখন ড্রেসিয়ার পারিবারিক জীবনে ব্যবহার করতে লাগলেন, তখন নাচের পোশাকে এর প্রচলনে বিশেষ কোনো বাধা আসতে পেল না। এমনকি সর্বজনমাত্রে পোপুকেও এই নতুন বিবর্তনকে মেনে নিতে হল। অবশ্য তিনি নির্দেশ দিলেন, পোপের নির্দেশের অধীন যে সব রাজ্য থাকবে, সে-সব রঙ্গমঞ্চে ড্রেসিয়ারের রঙ মানুষের দেহের রঙের মত হওয়া চলবে না,—তাকে গাঢ় নীল হতে হবে।

[ক্রমশ]

ব্যক্তিস্বরূপ ও রাগসংগীত

অণবকুমার রায়

“ইহলোক নিয়ে সাধনা হল সংস্কৃতি, অনন্তলোক নিয়ে সাধনা হল ধর্ম।” বলেছেন শ্রদ্ধেয় কিত্তিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয়। সংগীত অনন্তধর্মী, কিন্তু যেহেতু শিল্প তাই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইহলৌকিক। আমাদের সংগীতের ইতিহাসেও তাই দেখি ধর্মক্ষেত্রেই সংগীতের উৎপত্তি—তারপর দেশাচার ও রুচিভেদে জনচিত্ত আরোহণ করে দেশীয় প্রাপ্ত হয়েছে। এখানেই তার ইহলৌকিক সংস্কৃতির পরিচয়। অসীম পরিচয়ের গভীরতা সাধারণ মনে আসে না তাই তার প্রয়োজন সীমা। এই সীমার বাধনেই সাধারণ বাধে ইহলোকের গভী। সসীম থেকে অসীমের সন্ধানী মানুষ এরপর নিজের চিত্তবৃত্তি সংস্কারের ভেতর দিয়েই নিজেকে ব্যাপ্ত করেছে—শুরু হয়েছে তার অনন্তের সাধনা। শিল্প-সৃষ্টির-মূলসূত্রে শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসুও বলেছেন—“শ্রদ্ধা, অনুরাগ, আকর্ষণ, বিচিত্রের মধ্যেও একেবারে সামন্তস্যের বোধ, এগুলিই শিল্পসৃষ্টির গোড়ার কথা।”

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ—লোনুপ ভোগীর কাছে নহে। যে লোক পেটুক সে ভোগনের রসভ্র হইতে পারে না।’ এই সমাহিত সাধক হতে গেলেই চাই চিত্তের সাধনা আর সংযম। যোগশ্চিন্তাবৃত্তিনিরোধঃ।—পাতঞ্জল, সমাধিপাদ ৮। চিত্তবৃত্তিসমূহকে রুদ্ধ করাই যোগ। স্বপ্ন, জাগ্রত ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই বৃত্তি প্রবাহিত হয় কিন্তু সেগুলিকে রুদ্ধ করে আনন্দস্বরূপ পুরুষের কাছে নিয়ে যাবার পথকেই যোগ বলে। শিল্পী একাধারে যোগী—মনের অন্তঃস্থিত স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দকে বহির্ভাগতিক পরিবেশে নিরে আসাই শিল্পীর কাজ। তার জন্মে চাই ধ্যান, ধারণা, ‘দেহ বদ্ধশ্চিন্তস্ত ধারণ’—পাতঞ্জল বিভূতিপাদ আর ধ্যান তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্—অর্থাৎ চিত্ত যখন কোনো বিশেষ প্রতিস্মৃতিতে আবদ্ধ থাকে তখন তাকে ধারণা বলে, আর ধারণা দ্বারা যখন ধারণীয় পদার্থে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে তখন তাকে বলে ধ্যান। তাই শ্রুটি-শিল্পী তার আনন্দ খোঁজে প্রতি মনে। বিরাত অথও যে আনন্দ সৌন্দর্যমুভূতি ঋণভাবে প্রতি মনে বিরাজমান তার সাথে নিজের ব্যক্তিগত বোধ মিলিয়ে নন—আনন্দের প্রস্তুতি রচনাতেই তার তৃপ্তি, তার অধ্যাসসাধনার চরম পরিণতি। সমস্ত বিশ্বে নিজেকে ছড়িয়ে, নিজেকে বিলিয়ে দেবার তাগিদেই সেই সৌন্দর্যানন্দের প্রকাশ যে ব্যাপ্ত হতে চায়। সে অসীম আনন্দের প্রতিভূ হয়ে অসীম প্রাপ্ত হয়।

রূপ যে রহস্য দিবে ঘেরা। যত রহস্য তার তত রূপ। বর্ণবিচিত্রতায় সে অন্তহীন ভাবসমুদ্রে লীন হয়েছে। সূক্ষ্ম চিত্তবৃত্তির সংস্কারে তার রসান্বাদন। আর এই রসান্বাদনই তাকে তার রূপের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। তাই বলি রূপের বাহ্যরূপ জীবনের প্রয়োজনে আর প্রাণের প্রয়োজন রূপের অন্তর্লোকে। তাই জীবন বাহ্যিক প্রাণ আন্তরিক। বাহ্যের প্রয়োজন নেনই একথা বলিনে, বলি বাহ্যের প্রয়োজন আছে—প্রকৃতির বাহ্যরূপের মূল অনুভূতি আমার ভৈবধর্ম উদ্দীপিত করে—আমি

আকর্ষিত হই, মুগ্ধ হই ; তারপরই আসে অন্তর্লোকের সন্ধান ।—বাহ্যপ্রকৃতি ধীরে ধীরে তার স্থলতা হারিয়ে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসে—আপাতবৈচিত্র্যের বর্ণসমাবেশ একীভূত হয়ে মিলিয়ে যায় অন্তরের গভীরে । সন্ধানীমানুষ অন্তর থেকে অন্তরতর, অন্তরতর হয়ে পড়ে রূপের, সেই রূপ দর্শনেই তার ভাবসমাধি ।

এই ভাবসমাধির পথ কিন্তু সবার অনাড়ম্বর নয় । ঋণ রূপ তার বিচিত্র বর্ণ সস্তার নিয়ে দ্রষ্টব্য আমার ঋণ মনে । ঋণ মন বলতে বোঝাতে চাইছি আমার বিশিষ্ট মানসিক পরিবেশকে । এই ঋণ মনের ঋণ রূপ দর্শন, তাকে যে অভিজ্ঞতা দেয়, তাতে তার সাময়িক তৃপ্তি, এই সাময়িক তৃপ্তিরই উত্তুঙ্গ আকাঙ্ক্ষা তাকে নিয়ে যায় আরো গভীরে, ঋণ অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে ছড়িয়ে সে মালা গাঁথে পরিপূর্ণতার । কিন্তু প্রশ্ন এই পরিপূর্ণতার সন্ধান সে পায় কোথা থেকে । ঋণ আনন্দ দিয়ে যদি শুরু তবে পরিপূর্ণতার রূপ সে বোঝে কি করে ? একটা করে কুল দিয়ে যখন মানুষ মালা গাঁথে তখন তার ঋণ অভিজ্ঞতার রূপই সে প্রথিত করে । কিন্তু এ ভাব তার চিরন্তনী । অসীমতার পরিচয় তার দেহগত নয় মনোগত । দেহগত বিজ্ঞতিতে সে স্থলত্ব প্রাপ্ত হয়, আর মনোগত ব্যপ্তিতে সে অসীম হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বিশ্বে । এই মনোগত ব্যপ্তিই তাকে সামগ্রিক রূপের অধিকারী করে—এক মানসিক ব্যাপক রূপের অধিকারী করে । এই মানসিক ব্যাপক রূপের অভাবই মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক আর স্থল করে তোলে । এক মানুষ ছাড়া জীবজগতের সর্বত্রই তো এই নিয়ম । ঋণ অভিজ্ঞতাকে মানসিক শক্তিতে বৃহত্তর করাতেই মানুষের সত্যকার পরিচয় । এ ক্ষমতা অন্তর্জীবের নেই তাই তার গণ্ডী সীমাবদ্ধ ।

এক আর এক করে যে দুই—এই যে সংখ্যা বিজ্ঞতির আকাঙ্ক্ষা, এ মানুষ, সে মানুষ করে যে সমষ্টিগত জ্ঞান, এ কুল ও কুল, এ সত্য সে সত্য করে যে প্রকৃতির সামগ্রিক পরিচয়, এর থেকেই মানুষের সমগ্রতা বোধের উদ্ভব । তাই কুল দিয়ে কুল দিয়ে সে মালা গাঁথে—স্বর দিয়ে স্বর দিয়ে সে সুর সাজায় । ঋণ আনন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে সে অধুনা অনন্ত আনন্দের সন্ধান পায় । রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ প্রত্যেকের ভিন্ন সত্তা আছে—মানব মনে তার প্রতিকলণ হয় ভিন্ন ভাব নিয়ে, কিন্তু ঐ যে বলেছি—সামগ্রিক ভাব তার সামগ্রিক বিধান করে । অসমগ্রসকে সমগ্রস করা, টুকরোটাকরা মিলিয়ে জোড়াতালি দিয়ে অধুনা রূপের প্রকাশ করাই বলুন আর দর্শন করাই বলুন, মানুষের চিরন্তন ভাব । সমষ্টিগত সংহতির চিন্তাই মানুষকে যুগে যুগে প্রেরণা দিয়েছে, তার জ্ঞানোন্মেষের পর থেকে আপাত বৈচিত্র্যের, আপাত বিভিন্নতার সমগ্রসীকৃত রূপের সাধনা, ভিন্ন ভাবের সাথে চিন্তা বিচিত্রতার ঋণ রূপের সামগ্রিকতা দান আর পরিশেষে মন আর বহিঃপ্রকৃতির ভাবরূপের সম্পর্ক স্থাপনই তার যুগান্তরের প্রচেষ্টা । এখানেই মানুষের সাথে অন্তর্জীবের পার্থক্য । তাদের গন্তুটি দেহগত আর মানুষের মনোগত । তাই তারা স্থখী আর মানুষ অস্থখী । জৈবিক প্রয়োজন শেষ হবার সাথে সাথেই তার রূপ রস গন্ধ মিলিয়ে যায় কিন্তু মানুষ নিজেই রূপ রস গন্ধে মিলিয়ে ব্যপ্ত হয়ে পড়ে বহিঃবিশ্বে । তাই একজন সীমাবদ্ধ আর একজন অসীম, অনন্তের পরিচয়ে বেগবান । তাই বলছিলাম ঋণরূপী মন সে অধুনা বিলাসী আর অনন্তরূপী সংগীত তার ধর্ম ।

ছায়ানাটক

দেবকুমার বৈদ্য

[পূর্বাহ্নয়তি]

॥ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ ॥

॥ ৫ই ॥

সুজাতাকে কি আমি ভালোবাসি ? জানি না । ওদের বাড়িতে যেতে অতো সঙ্কোচ বোধ করি কেন তাহলে ? বাড়ির সকলের সাথেই তো আমার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা আছে : সুজাতার বাবা চন্দ্রকান্তবাবু, সুজাতার মা (আমি রাঙামাসি বলি, যদিও আত্মীয়তা নেই কোনো), সুজাতার ছোড়দা অরুণ (আমার বিশেষ বন্ধু), সুজাতা ।

অরুণের ঘোঁষেই গিয়েছিলাম সন্ধ্যাবেলা । অরুণ ছিলো না । ফিরে আসছিলাম তখনই ।

সুজাতা বললো, ‘অমনি চলে যাচ্ছে ?’

বললাম, ‘কি আর করবো বসে ।’

সুজাতা বললো, ‘কেন, কথা বলবার মতো আর কেউ নেই নাকি এ বাড়িতে ।’

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, ‘কই আর আছে ।’

অভিমানের ওর মুখ ভার হয়ে এলো তখনই ।

বললো, ‘তাহলে আর বসতে বলে লাভ নেই ।’

রাঙামাসি বোধহয় পাড়াতে কারও বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন । আমি আর সুজাতা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি এমন সময় ফিরলেন ।

বললেন, ‘ও কি অশোক, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ।’

তারপর সুজাতাকে বললেন, ‘তোরা এতটুকু বুদ্ধিবিবেচনা নেই, অশোককে বাইরেই দাঁড় করিয়ে রেখেছিস ।’

‘তা আমি কি করবো ।’ সুজাতা বললো, ‘আমি তো কতবার বসতে বললাম ।’

‘না, রাঙামাসি ।’ আমি বললাম, ‘অরুণের কাছে এসেছিলাম, শুনলাম ও নেই । তাই—’

‘তাতে কি হয়েছে, বসো, এখনই ফিরবে হয়তো ।’

তারপর একটু থেমে বললেন, ‘অনেকদিন আসোনি, তোমাদের খবর কি, বাবা মা ভালো আছেন ?’

‘মা ভালোই আছেন, বাবার শরীর ভালো নয় ।’

‘বুড়ো বয়সের ওই এক জালা ।’ রাঙামাসি বললেন ।

অরুণের ঘরে গিয়ে বসলাম । সুজাতাও ছিলো । রাঙামাসি রান্নাঘরে গেলেন আমার সঙ্গে চা করতে ।

‘এদিকে তো আর আসই না ।’ সুজাতা নখ খুঁটতে খুঁটতে বললো ।

বললাম, 'সময় পাই না।'

'রেস্টুরেন্টে বসে আড্ডা দেবার তো প্রচুর সময় হয়।'

'তা হয়।'

'তোমাদের কথা শুনে গা আলা করে।'

'তাই নাকি!'

সুজাতা জবাব দিলো না।

বললাম, 'তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে।'

এবারও কোনো জবাব দিলো না ও। অন্তরিকে মুখ ফিরিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। ওর শ্রাম কপালে গুঁড়ো গুঁড়ো চুল লুটিয়ে ছিলো, নিটোল মুখের ওপর তেরচাভাবে আলো পড়েছিলো এসে, টানা টানা চোখ দুটো আয়ত দেখাচ্ছিলো আরও; হালকা নীল শাড়ির আঁচলটা হঠাৎ স্থলিত হয়ে সরে গেলো বুকের ওপর থেকে, সেটাকে আবার ঠিক ক'রে নিলো তখনই। আগেও অনেকবার উপলব্ধি করেছি, আরও একবার হুচোখ ভরে দেখলান, শান্ত লাভণ্যে সুজাতা বর্ষার নদীর মতোই কানায় কানায় ভরা।

'যাই চা নিয়ে আসি।'

সুজাতা বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। ফিরলো অলক্ষণের মধ্যেই। একহাতে চা, অপরহাতে একগ্রেট কুচো নিমকি।

'নাও।'

বললাম, 'আমি কিন্তু নিমকি খাবো না।'

'কেন?'

'বাড়ি থেকে এই খেয়ে বেরিয়েছি।'

'কি এমন রাজভোগ খেয়েছো আমার জানা আছে।'

বলেই মুহূর্তে ক্যাকাসে হয়ে গেলো, 'কিছু মনে করো না, আমি কিছু ভেবে বলিনি।'

বললাম, 'না, মনে করবো কেন। অতো চট ক'রে কিছু মনে করলে কি আর চলে।'

'রাগ করলে?'

'না।'

'আমার গা ছুঁয়ে বলো।'

'তোমার গা ছুঁয়েই বলছি।'

বিহ্বল-ভরদেব মতো একটা শিহরণ বয়ে গেলো সমস্ত শরীরে। সুজাতাও দেখলান চনকে উঠলো সাথে সাথে। মুখটা নানিয়ে নিলো মাটির দিকে। পায়ের বুড়ো আঙুল মেঁঝেতে ঘষতে ঘষতে বললো, 'সত্যিই আমি কিছু মনে ক'রে বলিনি।'

'কিন্তু সত্যি কথাই বলেছো।'

'আমরাও কিছু রাজভোগ খাই না।'

॥ ১ই ॥

বাবার ঘরে গিয়েছিলাম সকালবেলা। চমকে উঠেছিলাম ঘরে ঢুকে। প্রায় পনেরোদিন বাদে দেখলাম। এই পনেরোদিনেই আরও অনেক বৃত্তার দিকে এগিয়ে গেছেন একেবার। গাল ঢুকে গেছে গর্তে, চোখ ঘোলাটে, কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না আর। নাকটা খাঁড়ার মতো উদ্ভত এবং ধারালো হয়ে উঠেছে চামড়া কুঁচকে বাবার ফলে। ডান হাত অবশ হয়ে গেছে। ডান পা-ও। পারশিয়াল প্যারালিসিস। আর, কেমন একটা গন্ধ ঘরে। বৃহৎ অথচ হুর্গন্ধ।

ঘোলাটে চোখ মেলে বাবা তাকালেন আমার দিকে। আমি তাঁর দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পারলাম পরিষ্কার আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না বাবা।

‘কে, অশোক?’

‘হ্যাঁ।’

‘বসো।’

চেয়ারটা টেনে নিয়ে খাটের পাশে বসলাম।

চুপচাপ।

বাবা আমার হাতটা টেনে নিলেন বাঁ-হাত দিয়ে। তারপর হাত বুলাতে লাগলেন আমার হাতের ওপর। আঙুল থেকে কিছুই অবশি। ছতিন মিনিট ধরে।

‘বড় রোগা হয়ে গিয়েছে।’ প্রায় অশ্রুট স্বরে বললেন। কেবল ঠোট দুটো নড়ে উঠলো।

আর আমার হঠাৎ কান্না পেয়ে গেলো। গলার কাছে দলা পাকানো অশ্রুভূতি। কিছুক্ষণ পর বাবার কাছ থেকে উঠে এসে রান্নাঘরে মা’র কাছে।

‘মা।’

‘উ?’

‘বাবার শরীরের একি অবস্থা হয়েছে?’

মা আমার মুখের দিকে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বোধহয় কান্না চাপতে।

বললাম, ‘আমি একবার পাকিস্তানে যাই।’

‘পাকিস্তান?’

বললাম, ‘অনেক টাকা বাড়িভাড়া পাওনা হয়েছে। কিছু অন্তত আদায় ক’রে আনবো। বাবার চিকিৎসার প্রয়োজন।’

‘কিন্তু ওরা কি দেবে বাড়িভাড়া?’ অসহায় চোখে তাকিয়ে মা বললেন।

‘কেন দেবে না?’

মা একটু ধেম্বে বললেন, ‘ওরা জানে যে ভাড়া না-দিলেও আমরা এখান থেকে কিছুই করতে পারবো না।’

আমি বললাম, ‘প্রফেসর রহমান এমনিভে অত্যন্ত ভদ্রলোক।’

‘কি জানি।’

‘তুমি একবার ছোড়দাকে বোলো আশ্রয় রাস্তিরে ।’
‘বলবো ।’

॥ ১৫ই ॥

মানুষে গড়া কৃত্রিম সীমান্ত এবং কার্টমাসের বেড়াভাল ভেদ ক’রে ক’লকাতা থেকে একশো ষাট মাইল উত্তরে এই শহরে এসে আজ সকালে পৌঁছেছি । আজ থেকে ন বছর আগে, শৈশব অতিক্রম ক’রে কৈশোরও প্রায় শেষ করে এনেছি সেই সময় রাতারাতি রাজনৈতিক পরিবর্তনে আমার দেশ, আমার জন্মস্থান হয়ে গেছে বিদেশ । যে মাটিতে প্রথম চলতে শিখেছি, যার ধুলোকাদায় রূপরসে জড়িত হয়ে প্রথম চেতনার অভ্যাস হয়েছিলো মনে, যেখানকার প্রতিটি গাছপালা বাড়ির পথঘাট আকাশ নদী সবকিছুর সাথেই নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধন জন্মেছিলো দিনে দিনে, হঠাৎ তার স্বাদগন্ধস্পর্শ কেড়ে নেওয়া হয়েছে আমার কাছ থেকে । আমার মাটিতে, আমার বাড়িতে, আমার জন্মস্থানে, আমার কোনো অধিকার নেই । নেই নিরাপত্তা জীবনেরও । সে এক ভয়ঙ্কর উপলব্ধি । যদি কোনোদিন কোনো বেদনা আমার স্নায়ুকেন্দ্রে আঘাতজনিত অনুরণন তুলে থাকে তো সে-বেদনা আমার জন্মস্থানকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া । মানুষের সেই রক্তাক্ত হোলি খেলার কথা স্মরণ করলেই এখনও আমার মন বিষন্ন হয়ে যায় । এই বিদ্বেষ আর অবিশ্বাস আর ঘৃণার বীজ আমাদের মনে কে বুনেছিলো ?

॥ ১৬ই ॥

বাইরের যে ঘর ছুটো এখনও আমাদের দখলে আছে তার একটাতে বসে লিখছি, আর একটাতে বাবা বসতেন । সে ঘরে বড় বড় কাচের আলমারি বোঝাই আইনের বই এখনও আছে—পুরানো বইএর সোঁদা গন্ধ আলমারি খুললে নাকে এসে লাগে এখনও । বাবা এখানে থাকতে ঘর ছুটো সকাল থেকে বেলা দশটা অবধি (বাবা কাছারি চলে যেতেন তারপর) আবার বিকেল হটা থেকে রাত দশটা এগারোটা অবধি মানুষজনে গমগম করতো । বকেল । এখন চামচিকে আর গোলা পায়রার বাসা । কড়িকাঠের কাঁকে কাঁকে, ডেনটিলেটারের ধুলধুলিতে । দশবছরেরও ওপর ঘর ছুটো মেরামত হয়নি । দেয়াল থেকে চুনবালির পলস্তারা খসে পড়ে অনেক জায়গায় স্ফটিক হয়েছে বড় বড় ফাটল । ইঁদুর ছুঁচোর বাসা ।

একা বসে লিখতে আমার কেমন যেন গা ছমছম করছে । শরীরের কোষে কোষে অস্বস্তির শিরশির বিদ্যুত-অনুভূতি পাক দিয়ে দিয়ে উঠছে । ডেনটিলেটারের ধুলধুলিতে গোলা পায়রা বকম বকম করছে, পেয়ারা গাছের ডালগুলিতে বাতাস শোঁ শোঁ শব্দ তুলছে, আর বাহুড়ের ডানা ঝটপট । অথচ আগে এই সময়ে সমস্ত বাড়িটা মানুষজনে ভরপুর থাকতো । এতো লোক এ বাড়িতে ছিলো, তাদের কার সাথে কার কি সম্পর্ক, কে কোন ঘরে শোয়, এসব তথ্য যে কোনো নতুন মানুষ এলে তার পক্ষে চট করে আয়ত্ত করা কঠিন ছিলো । আমরা চার ভাই পাঁচ বোন,

আশ্রিত আত্মীয়স্বজন, বড়বোদি এবং তার দুই ছেলে এক মেয়ে, চাকর ঠাকুর ঝি। সংসারের মাথায় বাবা এবং মা। হাটবাজার বসলে যেমন মানুষজনের কলরব শব্দ ওঠে এ-বাড়িতেও প্রায় সর্বক্ষণই সেইরকম মনে হতো। কলরবে ভরপুর।

তবু সংসারে অভাব ছিলো না কোনো। বাবা প্রচুর টাকা উপার্জন করতেন। তেমনই ব্যয় করতেন দুহাতে। সংসারের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতেই ফুরিয়ে যেতো সব টাকা। কিছু অমিতব্যয়িতা ছিলো খরচে একথা ঠিক, কিন্তু তার সঙ্গে বাবা বিধা বা কার্পণ্য করতেন না খরচ করতে। বড়দা তখনই একটু একটু ক'রে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে জীবনে, বৃদ্ধবয়সের সঙ্গে বাবার কোনো চিন্তা ছিলো না, ইতিমধ্যে অশ্রান্ত ছেলেরা দাঁড়িয়ে যাবে, এই ছিলো তাঁর ভরসা।

বলতেন, 'টাকা দিয়ে আমি কি করবো, আমার চার ছেলের প্রত্যেকেই তো এক একটি এ্যাসেট্‌।'

এখন সেকথা মনে পড়লেই হাসি পাচ্ছে আমার। এ্যাসেট্‌-ই।

॥ ১৭ই ॥

খুব সকালে ঘুম ভেঙেছিলো। বাইরে কাক ডাকছিলো আর অশ্রান্ত পাখিরা। তাছাড়া শান্ত, শুষ্ক। কুয়াশায় মাঠঘাট আচ্ছন্ন। আবছা আবছা অন্ধকার তখনও ছড়ানুড়ি করছিলো ঘাসে, লতায়, গাছে, আকাশে। ধীরে ধীরে অন্ধকার কেটে গেলো। কুয়াশার আবরণ সরে চলে গেলো মাটি থেকে। প্রসন্ন, প্রশান্ত, স্নিগ্ধ আলোর আভা লেগে ঘাসের শীর্ষে শিশিরবিন্দুগুলি ঝকঝক করে উঠছিলো যুক্তোর মতো। যেন কুচোকুচো বরফ ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ ঘাসের সবুজ গালিচায়।

প্রফেসর রহমানের সাথে সকালবেলা অনেকক্ষণ বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলেছি। ভাড়ার টাকা দিতে রাগী হয়েছেন প্রফেসর। তবে সব টাকা একসাথে দিতে পারবেন না। দেওয়া সম্ভবও নয়। আপাতত পাঁচশো টাকা দেবেন। তবে তিন চারদিন অপেক্ষা করতে হবে। তার আগে দিতে পারবেন না।

॥ ১৯শে ॥

কয়েকটা দিন বলতে গেলে বেশ মির্জাবনার কেটে গেছে। নিষেকে নিয়ে, নিষের যন্ত্রণায় দুর্ভাবনা নিয়ে, পারিবারিক অভাব আর অনটন আর অশান্তি নিয়ে মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হইনি হুশিয়ার আর মানসিক আলোড়নে। চাকরির কথা চিন্তা ক'রে বিনিদ্র রাত কাটাইনি একটিও। শুধু খাচ্ছি আর বেড়াচ্ছি আর ঘুমোচ্ছি। আড্ডা দিচ্ছি পুরনো বন্ধুদের সাথে। আর, যে সময়টা একা একা, বসে বসে স্মৃতি রোমন্থন করছি।

কনেকদিন বাদে দেশে ফিরলে একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি হয়, পুরনো চেনা ভুজ্জ্বল জিনিসগুলিও মনে হয় অপরিচিত, মনোহর, ভুলনাহীন। তা না-হলে ছোটবেলাকার ছোট ছোট স্মৃতি এতো ভালো লাগে কেন? কবে কোন একটা চড়ুইপাখিকে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মেরেছিলাম, কোন্‌দিন চুরি করে আখ খেতে গিয়ে ধরা পড়ে বাবার কাছে

মার খেয়েছিলাম এসব কথা এমনিতে মনে পড়ে না। জীবন আর জীবিকার অন্বেষণের জোয়ালা কাঁধে নিয়ে ঘেরকমভাবে দিন কাটে ক'লকাতায় তাতে ওসব অর্থহীন কথা ভাববার অবকাশ কোথায় ?

॥ ২১শে ॥

প্রফেসর রহমান আমাকে ডেকে বিকেলবেলা বললেন, 'অশোক, মনে কিছু কোরো না, তোমাকে কথা দিয়েছিলাম টাকা দেবো তিন চারদিনের মধ্যেই। কিন্তু—'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম প্রফেসরের দিকে। তবে কি টাকা দেবেন না ? সর্বনাশ। তাহলে আমি ফিরবো কি ক'রে ? আর মাত্র চারটাকা আছে আমার কাছে। টাকা পাব নিশ্চয় এই ভরসাতেই এসেছি। তাছাড়া, বাবার চিকিৎসার জন্তেও যে অত্যন্ত প্রয়োজন।

'আরও দু তিনদিন দেবী হবে।' বললেন প্রফেসর।

যাক, তবু ভালো। আশ্বস্ত হলাম।

মোট একটা চুরুট ধরিয়ে রহমান সাহেব বসলেন, 'মনে কিছু কোরো না। অনর্থক দেবী করিয়ে দিলাম তোমার। তুমি আমার ছেলের বয়সী, তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, পাঁচশো টাকা একজন ধার দেবে বলেছিলো। তারই ওপর বিশ্বাস করে তোমাকে কথা দিয়েছিলাম। এখন সে বলছে আরও দু তিনদিন অপেক্ষা করতে।'।

সাধারণ ভদ্রতা বোধে বললাম, 'না না, তাতে কি আছে। না হয় আরও কয়েকদিন থাকবো আমি।'।

প্রফেসর রহমান বললেন, 'এরকম ছরবছা আমার আগে ছিলো না, পাঁচশোটাকার জন্তেও এখন আমাকে বাইরের লোকের কাছে হাত পাতে হচ্ছে। মেয়েটার চিকিৎসার জন্তে যা কিছু ছিলো সব জলের মতো খরচ করেছি, কাজল যদি ভালো হয়ে যেতো এ আশ্রয় আমি করতাম না, কিন্তু কিছুই হলো না, মাঝখান থেকে টাকাগুলো গেলো।'।

রহমান সাহেবের মেয়ে কাজলকে আমি চিনতাম ছেলেবয়সে। আমার থেকে দু তিন বছরের ছোট। কাজলের অসুখ এবং তার চিকিৎসার জন্তে অকাতরে অর্থব্যয় করবার খবরে তাই কৌতুহল বোধ হলো।

বললাম, 'কি হয়েছে কাজলের ?'

একটু ইতস্তত করে প্রফেসর রহমান বললেন, 'পাগল হয়ে গেছে।'।

আমি চমকে উঠলাম।

'পাগল হয়ে গেছে ?'

কীম্বা কীম্বা হয়ে এলো রহমান সাহেবের স্বর। বললেন, 'হ্যাঁ।'।

'কতোদিন আগে ?'

'তিনবছর হয়ে গেছে। একবছর রাঁচীতে রেখেছিলাম মাসে তিনশো টাকা খরচ দিয়ে, যদি ভালো হয়। কিছুই হলো না।'।

হুগাতে মুখ ঢেকে নিয়েছিলেন প্রফেসর রহমান, 'সবই আমার মজি। তা না হলে এরকম হবে কেন ?'

সবই আমার মজি ! রহমান সাহেবের কথাটা যেন আমাকে ভাড়া করে ফিরছে। সেই বিকেল থেকে। কি আশ্চর্য। আমাদের এই বাড়ির ওপর কি কোনো অভিশাপ আছে ? তেরোবছর আগে এই বাড়িতেই আমার মেজদা পাগল হয়ে গিয়েছিলো। সেই ইতিহাস কোনোদিন ভুলতে পারবো না।

মেজদার কথা ভাবলেই আমার মনে পড়ে বিরাট সংসারটার ছবি : সাংসারিক মনোমালিন্দের যাঁতায় কিভাবে ওঁড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো মেজদা। বিরাট সংসারটা মেশিনের মতো মসৃণভাবে ঘুরে ঘুরে চলতো। মেশিনেরও যেনন মাঝে মাঝে ব্রেকডাউন হয় আমাদের সংসারেরও ছিলো তাই। স্তূর্ভুভাবে চলতে চলতে ধমকে ধেম্বে পড়তো হঠাৎ। নতুন করে তেল জ্বিজ দিয়ে, এখানে ওখানে দু একটা নাট বলটু এঁটে দিয়ে আবার চালিয়ে দেওয়া হতো পুরোগতিতে। দৈনিকের ইতিহাস এক। আজ বা কালও ঠিক তাই। আবার পরশু দিনেও তেমনই।

এর মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলো মেজদা। তার খাওয়া শোওয়ার ঠিক থাকতো না। হিসেব থাকতো না সময়ের। অনেকগুলো পোষা কুকুর বেড়াল ছিলো মেজদার। ছিলো পাখি। চিয়া ময়না চন্দনা। জন্তু জানোয়ারদের নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত। বিয়ে হয়েছিলো সবে, তবু মেজবোদির সাথে এক রাতে শোয়া ছাড়া অন্য কোনো সম্বন্ধ ছিলো না।

মেজদার পোষা কুকুরদের জন্তু বাজার থেকে রোজ মাংস আসতো। পাখিদের জন্তু ছোলা ছাতু লক্ষা। আর কাবলী বেড়াল দুটির জন্তু বরাদ্দ ছিলো মাথাপিছু দৈনিক এক পো করে দুধ।

মেজবোদি অনেকদিন হেসে বলেছে, 'ওগুলো আমার সতীন, দু চক্ষের বিব।'

'তা বলতে পারো।' মেজদাও জবাব দিতো হেসেই।

মেজবোদি যখন প্রথম বউ হয়ে এবাড়িতে আসে তখন মেজদা ছাত্র। কলেজে পড়ে। মেজবোদি এসে দেখেছে এক কলেজের সময় ছাড়া আর সবসময় মেজদা পশুপাখিদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কখনো এটাকে খাওয়াচ্ছে, ওটাকে আদর করছে। পাখিগুলি আশ্চর্য পোষ মেনেছিলো। খাঁচার দরজা খুলে দিলে উড়ে যেতো, আবার খাঁচায় এসে চুকতো সন্ধ্যার আগেই। কুকুর তিনটে বাঁধা থাকতো চেন দিয়ে। কারণ, বাড়ি ভরতি লোক। কামড়ে দিতে পারে। একমাত্র মেজদা বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে ছাড়তো মাঠে নিয়ে গিয়ে। রবারের বল ছুড়ে দিতো। কুকুর তিনটে দৌড়ে গিয়ে কুড়িয়ে আনতো মুখে করে। সন্ধ্যার সকালবেলা কলেজে যাবার আগে কুকুর তিনটেকে স্নানে নিয়ে যেতো নদীতে। তিনটে চেন একসাথে হাতে ধরা—মেজদাকে কষ্ট ক'রে হাঁটতে হতো না—কুকুর তিনটেই টানতে টানতে হিচড়ে ছেঁচড়ে নিয়ে যেতো। সাবান ঘসে ঘসে লোমশ শরীর থেকে ধুলোবালি ময়লা সব্বয়ে নিংড়ে বার ক'রে দিতো মেজদা, আর কুতকুতে চোখ মেলে, যেন স্বর্গসুখ উপভোগ করছে, তাকিয়ে থাকতো সারমেয়ত্রয়। স্নান শেষ হয়ে গেলে শরীর

ঝাড়া দিয়ে গা থেকে জলের ছিটে ভাড়িয়ে দিতো তিনটেই। ওড়ো ওড়ো জলকণা বাতাসে উড়ে আঁকতো রামধনু রং। কোনো কোনোদিন কুকুরদের নিয়ে গভীর ঘলে গীতার দিতো, আবার কখনো কখনো কুকুরদের পাড়ে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে গীতারে চলে যেতো শব্দানেকগজ দূরের বালির চরে। সেখান থেকে সংকেতসূচক হাততালি দিয়ে হেঁকে উঠতো : টেডি জিম টাইগার, স্টার্ট ! কুকুর তিনটেকে এমনভাবে শিখিয়েছিলো যে হাততালি দেবার সাথেই ঝাঁপ দিয়ে পড়তো জলে। শুরু হতো গীতারের, প্রতিযোগিতায় যেটা প্রথম হতো তার পিঠ চাপড়ে মেজদা আদর জানাতো। কিন্তু একটাকে আদর করলে আর দুটো কুঁই কুঁই করতো। তাদেরও আদর করতে হবে।

এ ছাড়া ছিলো পাখি। ময়নাটা ছড়া আওড়াতো। রবীন্দ্রনাথের ছোট ছোট কবিতা শিখিয়েছিলো মেজদা, দিনের পর দিন অসীম ধৈর্যসহকারে। হয় পশুপাখিদের নাওয়ানো খাওয়ানো, নইলে, কোথায় কার বাড়িতে এ্যালসেশিয়ান আছে, কার আছে গ্রে হাউও, কোন বাড়িতে সুন্দর সুন্দর ক্যানারি পাখি আছে— এইসব খবর সংগ্রহ করতেই বাস্তু। ঘোঁরাড় করতো সেইসব জন্তুজানোয়ারদের খুঁটিনাটি খবরও, তারপর মনে মনে তুলনা করতো নিজের পোষুদের সাথে।

আমাদের অনেকদিন বলেছে, ‘ওসব এ্যালসেশিয়ান ফ্যালসেশিয়ান কোনো কর্মের নয়, শুধু নামেই, তুলনা হয় না টেডি জিম টাইগারের সাথে। এমন টুনিং দেওয়া যার তার কন্ঠ নয়।’

তা গর্ব করবার কারণ মেজদার ছিলো বৈকি। টেডি জিম টাইগারের মতো ট্রেনড্ কুকুর লাখে একটা মেলে কিনা সন্দেহ। আর তার পোষা ময়নাটার মতো সুর ক’রে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে পারে আর কার পাখি? কিংবা মেজদার কাবলী বেড়াল দুটির চেহারা বাহার।

মাঝখানে টাইগারের অসুখ হয়েছিলো একবার। কি অসুখ এখন মনে নেই। এটুকু মনে আছে একেবারে নেতিয়ে পড়েছিলো কুকুরটা। আর মেজদার চোখে ঘুম ছিলো না। ভুসে গিয়েছিলো নাওয়াখাওয়া।

সেদিন রাত্তিরে ঝিরঝির স্বপ্নি ঝরছিলো। কখন স্বপ্নি নেমেছে টের পাইনি। ঘুমিয়ে ছিলাম বিছানায়। ‘মা’র কোলের কাছে। হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলো। বাইরে আমবাগানে পাতায় পাতায় স্বপ্নির নুপুর বাজছিলো ঝনঝম। ঘুম ভেঙে যেতে সেই শব্দটা কানে ভেসে এসেছিলো সুরেলা গানের মতো। খুব জোরে নয়, স্বহৃদ, যেন বহুদূর থেকে শব্দটা আসছিলো। ঘরের বাতাসে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। নিরশির করছিলো গা। বিছানায় এপাশ ওপাশ করছিলাম। ঘুম আসতে চাইছিলো না কিছুতেই। তারপর একসময় আমি উঠে বসেছিলাম।

‘মা।’

‘মা।’

‘উ-উ ?’

‘ওঠো, বাধকরে যাবে।’

মা উঠলেন । ছুফনে বেরোলাম বারান্দায় ।

মা বললেন, 'ও কি, কমলের ঘরের দরজাটা হাট খোলা । হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পেলাম : বারান্দার এক কোণে বসে রুগ্ন টাইগারের গায়ে হাত বুলোচ্ছে মেজদা, পরম স্নেহে । মা-ও দেখতে পেলেন ।

'কমল, তুমি এখানে বসে কেন ?'

মেজদা কোনো জবাব দিলো না ।

'ঠাণ্ডা লাগবে, যাও, ঘরে যাও ।'

'ঘরে ?'

'হ্যাঁ ।'

'যাচ্ছি ।'

তারপর আমি বাধরুমে গেলাম । মা দাঁড়িয়ে রইলেন । ফিরে এসে দেখি মেজদা বসেই আছে ।

'গেলে না ?' মা বললেন ।

'যাচ্ছি ।'

'এখনই যাও ।'

'তোমরা শোওগে যাও, আমি একটু পরেই যাচ্ছি ।'

টাইগারের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মেজদা বলেছিলো ।

তবু টাইগার বাঁচেনি । রোজ সকালে গাড়ি করে পশুহাসপাতালে নিয়ে যেতো মেজদা । ওষুধ খাওয়াতো বড়ি ষণ্টা ধরে । কিন্তু টাইগার দিনে দিনে আরও নেতিয়ে পড়েছিলো । প্রথম প্রথম তবু নড়তো চড়তো, বোঝা যেতো প্রাণ আছে । সাত আটদিনের অসুখে একেবারেই নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিলো, মাঝে মাঝে যন্ত্রণাকাতর অব্যক্ত একটা শব্দ করতো, বৃহ বৃহ আলোলিত হতো লেজ ; দশদিনের দিন সব স্পন্দন ধেমে গেলো । নিঃশব্দে কুলে কুলে মেজদা কেঁদেছিলো ।

জানাল দিয়ে আকাশের দিকে তাকালে কেশরমাথা সিংহের মতো যে নারকেল গাছটার ভুতুড়ে ছায়া দেখতে পাচ্ছি এখন, তারই নিচে কবর দিয়েছিলো টাইগারকে । অবসর সময় সেই নারকেলপাতার ঝিলিমিলি ছায়ায় চুপচাপ বসে থাকতো মেজদা, টাইগারের কবরের পাশে । পরম আত্মীয় বিয়োগেও লোকে এতো শোকাভূর হয় না । চোখ ভুলে তাকালেই বোঝা যেতো মেজদার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে । চোখের নিচে গভীর কালো, গাল ভেঙে গর্ত, তীক্ষ্ণ নাক তীক্ষ্ণভর, উসকোখুসকো চুল, হয়তো দশদিন তেলই পড়েনি ।

[ক্রমশ]

ছোটো ছোটো মেয়ে

শিশিরকুমার দাশ

তখন হুপুর, রোদ্দের রেখা পুকুরের তলে
আশ্রয়ে ধুঁজে, গা নাজছে ঘলে,
কাস্ত ছায়াটা ধুঁকতেধুকতে ছাতা পাশে রাখা বুড়োর মতন
সুয়ে পড়ে আছে মুদির চালায়
নির্জন পথ চমকে চমকে হুপুরে তখন
ছোটো ছোটো মেয়ে দৌড়ে পালায়—

দৌড়ে পালায় ছোটো ছোটোমেয়ে, ঝইচিরডাল হুহাতে ছিঁড়ে
সুমন্ত ভরহুপুরের রোদে প্রজাপতি সব
মস্ত আসন

পাতায় পাতায় ঘুনোয় গোপনে, একটানা হাওয়া
উত্তর থেকে ছুটে যেতেযেতে হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে দেখছে
ঝুরঝুরে চুল ছলছে উড়ছে, পায়ের নুপুর ঝনঝনঝন
ঘূমের ওপর হেঁটে যায় ঘূম
ছোটো ছোটো মেয়ে দৌড়ে পালায়।

পথে কেউ নেই, কুকুরের ডাক, ফুলের গন্ধ সব মিশে গেছে
হুপুরের রোদে জীবনটা যেন পিঠ মেলে দিয়ে
ঝড়ার দিকে তাকিয়ে হাসছে, সাদা বকফুল ঝুরঝুর করে
উঠোনে উড়ছে, সাননের মাঠ হলুদ ধানের, চাষার গানের
এক হাঁটু জল, থৈথৈ কাদা, আনার প্রাণের
হলুদধানের সমুদ্র চিরে বেকে গেছে আল
ভারই গায়ে গায়ে, অগাধ স্নদুরে
ছোটো ছোটো মেয়ে দৌড়ে পালায়।

জীবনের গায়ে চিকচিকে বালি, ঝিরঝিরে জল
হুপাশে নিবিড় কালো পাহাড়ের বন জঙ্গল
ঝিঁঝি ডেকে যায়, একটা কি পাখি ভারি নীল পাখা
একটা কি গাছ ডেঙে গেছে ডাল
সরুপথ গেছে জঙ্গল শেষে আরেকটা নদী
বনে দাবানল কে যেন জালায়
নির্জন পথে বাজছে নুপুর ঝনঝনঝন
ছোটো ছোটো মেয়ে দৌড়ে পালায়।

তাসের ঘর

নচিকেতা ভরদ্বাজ

দূরের থেকে দেখি যখন—চমৎকার !
 কাছে এলেই কেমন যেন বিষণ্ণতার
 ছায়ায় ম্লান—ছিল তার স্বপ্ন-শব ।
 উত্তরণের অভীশায় আবেগে বুক
 কেঁপেছে তার ডাগর চোখে সুর-সাগর ;
 হৃদয়ে তার রঙের যেন কী উৎসব ।
 ঘোনটা ধুলে যখন তার দেখেছি মুখ,
 হৃহাতে তার তুলেছি তনু বুকের পুর
 দেখেছি তার দারিদ্র্যের ব্রষ্ট রূপ ।
 বাসরঘরে বেদনাক্লান্ত আকাশ চুপ ।

রূপের রঙের ভেবেছি তারে উৎসর্গি ।
 ভেবেছি তার বুকের ঘরে অন্তহীন
 স্বপ্ন যেন চেউয়ের মত উচ্চরোল ।
 ভোরের ফুলে আনত তনু-গুচ্ছটি
 গন্ধে তার আকাশ হবে আনন্দ,
 ঝাউয়ের বুকে কেঁপেছে কত স্বচ্ছ দিন,
 স্নেহাচ্ছনা রাতে হাওয়ার হাতে বেজেছে দোল
 আকাশ-আলোর আশিত এক সুন্দর ।

তাকে পাবার উচ্চাশায় যৌবনের
 অন্ধকার হৃহাতে ঠেলে অন্বেষার
 অস্তে গিয়ে রক্তঝরা বিহঙ্গের
 ডানায় কাঁপে শব্দহীন যন্ত্রণার
 অশ্রুভূতির তীব্র তীর । পাইনি তাকে—
 বুকভরা সেই সার্বদ্রিক আর্তনাদ . . .
 সে ও তো ভালো ! এমন করে নিশীত তাকে
 না দিয়ে গাড়া : আহারে তার সোনার হাত
 কেন যে ছুঁয়ে হারিয়ে গেল স্বপ্ন তার ।

কেনন করে নামাব এই বুকের ভার
 শুনেছি তার কান্না যেন ! বুকের ঝড়
 ব্যথায় নীল—দুঠোঁটে তার হিনেল স্বাদ ।
 নদীতে তার নিভেছে ঢেউ ! শুক রাত
 আহত তারা । ভেঙেছে সব তাসের ঘর ।

উৎসমুখ

বাসুদেব গুপ্ত

হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
 আনন্দের লক্ষ ইশারায়—
 হুঃখবোধ কেটে গেছে স্রোতে
 বর্ণনায় রোজ-কুয়াশায় ।

ত্রস্ত শীতে বাসায় এখন
 চুপ-কথা চুপচুপ করে ।
 আভিযয় নানা বর্ষরে—
 যুগান্তের স্মৃতি উদঘাটন ।

উঁচুহর্মা-লগ্ন-আকাশেতে
 নগরের দেশীয় পাখীর
 পক্ষ-বেলা—সঙ্গে যেতে যেতে
 হুই চকু আশ্বারো অধীর ।

হৃদয়ের উৎসমুখ ছিঁড়ে
 সময়ের মহাস্রব বসে ।
 রুদ্ধতার স্বস্তে শুধু বসে
 দিন গত—রাত্রিও ধীরে ।

দুঃখ-প্রতিমা

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

দুঃখ নিয়ে ভুলে-থাকা জেনেছিল অসম্ভব সে-ই—
যখন শহরে পথে আপনমনেই
বাণির আকাশে তার নক্ষত্রের আলোকিত ভূমি,
এবং হৃদয়ে ফোটা রঙিন মরসুমি,

তবুও খুঁচিয়ে নেবে দেবেছে অনেকে
এনেছে দর্শকস্বন্দ কাছে ডেকে ডেকে :
(চিড়িয়াখানার জন্ত দেখো সে কি আশ্চর্য জিনিস
ধাক্কাক দুর্গন্ধ তবু হাতছাটো করে নিশপিন ।)

এ-শুধু অপ্রেম, স্বভা, অভিশপ্ত কাঙালের আশ,
রাস্তায় কুলের পাশে শোনায় আপন ঐকতান—
স্বভাবে অবজ্ঞা করে অবজ্ঞায় পয়সা ফেলে দিয়ে
পথচারী! হেঁটে যায় নিজের খেয়াল বুকে নিয়ে ;

দুঃখ যদি সহচরী, সে-ও তবে তার সহচর,
পথের শুকনো গাছে আরো শুকনো কোনো ছোট বর
যেমন গিয়েছে বেঁধে নামগোত্রহীন এক পাখি—
ভেমনি বাধবে সেও, স্বষ্টিশেষে যার গায়ে
নাচবে ঘোনাঝি ।

॥ দুই ॥

সামনে পিছনে শুধু ইচ্ছার শিশুর কলরব • •
চতুর্দিশির মত ঘনিষ্ঠ, একান্ত কাছে থাকে,
ভরায় না মন তবু, মনে মনে কত কী সে আঁকে,
এবং বিলিয়ে দেয় সবটুকু, যত আছে সব ;

অপূর্ণ স্মৃতির বিন্দু অপ্রমেই ভরে তোলে তাকে,
অঙ্ককারে থেকে থেকে সে-ও এক অঙ্ককার হয়—
দুঃখ যেন বন্ধু তার বসে বসে দুঃখ দিয়ে ঢাকে
নিজের আগুন রাঙা গোপনে যে লালিত নির্ভয় ;

জানে না, যে যায় সামনে তার ছায়া পিছনেই পড়ে,
ইচ্ছার স্নগদ্ব কুল কুটে থাকে ভেমন অন্তরে ।

শুধু দেখেই

অমলকাস্তি ঘোষ

দেশের ঘরে
ক্ষেত থেকে ফসল তুলে
ডাল শুকিয়ে, ডাল ভেঙ্গে
রাগ্না করতাম ।

এক মাইল দূরে টিপটিপ ঝরনা
পাহাড় পার হয়ে
ঘড়ায় ভরে জল আনতাম ।

তুমি বললে
শহরে খুব মজা
অনেক বাড়ি অনেক গাড়ী ।

এখন আমি প্রতিদিন
খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে
কাছে যাই

আমার শিশুর কান্না ধামে না
তবু সারাদিন
আর এক শিশুর কান্না ধামাই ।

এবং যাওয়া-আসার পথে
চোখ মেলে দেখি
অনেক বাড়ি অনেক গাড়ী ।

বন্ধু আকাশের

যজ্ঞিত মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

একবার বলে! তুমি বন্ধু আকাশের
গলায় তারার মালা, পিরান ঘাসের ।

হুঃখ দার বাধা নয় পেছনের ঠেলা
সন্ধ্যাদিন কাটে ঘেন মেলা,
দৃষ্টি বার আলোকোৎসব—
ইচ্ছে, বুকে ব্যপ্তির বৈভব ।
একবার বলে! বন্ধু তুমি সকলের
সামর্য্যও বাঁচি, জানি তুমি এ-দলের

॥ ২ ॥

জীবনগুলি গাছের মত খিঁমায়
উদ্ভলতা কাঁপাও পাতার সীমায়
স্বপ্ন ছড়াও অন্ধের চোখে চোখে—
কাদতে শেখাও অমোঘ যমের শোকে ।

॥ ৩ ॥

একবার হও তুমি আপন-মাটির,
চোখে চেউ সবুজ দৃষ্টির,
কথায় কখন নামে বসন্ত বিকেল,
ক্লাস্ত প্রেম এবার উবেল ।
একবার বলবে না সময়ে কানে
যেখানে প্রণয় আছে থাকি সেইখানে ?

সার্থক জনম মাগো

সত্যত্রয় বোঝ

সার্থক জনম মাগো, বিশেষত, যখন জন্মেছি এই দেশে ।
কিন্তু পোড়া ভাগ্যে হয় ছুটলো না শাসালো কারুকে ভালোবেসে,
ধন-প্রতিপত্তি-মার্কী মর্ত লোকে আকাঙ্ক্ষিত পুঞ্জি ।
মনের সাধনা বলো কী দিয়ে কোথায় আমি খুঁজি ?

বহরের পঁচিণে বোশেখ
কিংবা, ধরো আরো দশটা জাকালো তিথিতে
একান্ত নিম্নের রাজ্যে আছো অভিষেক
হল না,—সময় গেল পাঠ নিতে নিতে
সকালে চলন্ত ট্রেনে, ছপুরে অফিসে
বিকেলে হাওড়া ব্রিজে । পাইনাকো দিশে

কোথায় স্বভাব তার মুক্তি খুঁজে পাবে
ভাবের যুত্মকে কেনা অনন্ত অভাবে ?

ম্যা-কে

অরুণাংশু দেব

তুমি দিয়েছ প্রাণ, আর
পৃথিবী এ জীবন ।

তোনার এক একটি অণু বিচ্ছ রিত পৃথিবীর
বিশাল থেকে বিশালের ক্রমবিবর্তনে ।

কিস্ত আমি ?
জীবনের পিছু পিছু ছুটে
সময়ের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে
পর্যুদস্ত ।
কোথায় সে জীবন ।

জীবনকে আমার চোখের সামনে ভুলে বর,
আমি দেখি ।
জীবনকে আমার হাতের মুঠোয় এনে দাও
আমি অনুভব করি ।
জীবনকে আমার প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে দাও,
আমি ভাঙি গড়ি ।

কবরের পাশে

গোপাল ভট্টাচার্য

জীবন

যুড়া হতে চাইছে

আর যুড়া

হতে চাইছে জীবন ।

লাল নীল সব পর্দা ধসে গেছে

স্মৃতি

রহস্যের ওপার থেকে ডাকছে

তারই নিকে ফিরিয়ে নিয়ে আনার

ইচ্ছার স্রোত ।

এবার বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ব আমি ।

এদিকে বাতাস বইছে

তার কান্না হয়ে

সেই কান্না আমার সাক্ষাচ্ছে

তার কৃষ্ণচূড়া দিয়ে ।

সব বাধা কুচি কুচি করে

মুখোমুখি বসতে চাইছে

আর কাঁদছে ।

জীবন

যুড়া হতে চাইছে

আর যুড়া

হতে চাইছে জীবন ।

কবিতাবলী

উৎপলকুমার বসু

॥ গোকুল এবং গোকুলের মাসী ॥

ভোর রাতে শেষ হ'লো পালা । গোকুলের মাসী
দৈবে ঐ বাঁশবনে কার যেন দ্রুত অট্টহাসি
স্পষ্ট শুনে দৌড়ালেন । সমীচীন ভয়ের আসর
কাছাকাছি ঘেসে এলো । শুধায় সকলে তারপর ?
পায়ের গোড়ায় এক ডাঙা হাঁড়ি জড়োয়া কঁাকণে
সুবর্ণ বিলোয় ছটা । মাসী তবু সতর্কিত মনে
বলেছেন পাড়া ঘুরে ও নিশ্চয় তাঁর দান হবে
স্বর্গত স্বামীর দান—যতদিন রয়েছে ভবে
অর্থের বাসনা তুচ্ছ ।

গোকুল কিন্তু বড় চতুর মেধাবী
পরদিন বাঁশবনে নাসিক্য বর্ণের যোগে জানালেন দাবী
মাত্রা তার বেশি হ'লো । অতঃপর বাহুল্য কখন
হতভাগ্য মাসী এই ধরাধাম, বুদ্ধ দেহ, সতর্কিত মন
হারালেন । আমাদের মনে এক সুখী বৃক্ষ নীরব সবুজে
খেলা করে—প্রয়োজন আনে তাকে ইতস্তত খুঁজে ।
তার রূপ একদিন অগোচরে কঠিন অঙ্গার
হয়ে যায় । যদিও উদ্ভাপে শ্বেত সংগ্রামী লক্ষ তলোয়ার ।

॥ স্মৃতি চিহ্ন ॥

আম্র কোনো ছেঁড়াপাতা ঝরাবে না পথে পথে হাওয়া
তুমি তল্লান যেতে পারো । তারাবন খেয়াঘাট তীরের স্মরণ
একটি আলোয় গাঁথা । তুমি যে দিকে বাসনা
সেই দিকে ফিরে যাও ।

বহুগান বেজে ওঠে তবু ।

বটগাছ নানা টুকরো কাপড়ের আশায় সাজানো এক রণভূমি মনে হয়
আন্তের বিরোধে বাঁধা যত তরী যাত্রী নিয়ে
এপারে আসুক—একদিন সাদ হয় মেলা ।

প্রহরে প্রহরে ছেনো অনাহত সময় তোমার ।
 তুমি অক্লদেশে যেতে পারো । অক্ল গানে ।
 জনস্ত ধুলির লাল পদ্যরেণুর নতো শরীরে ছড়ানো
 ফেলে আসা দূর প্রাণে পাতা ঝরে উত্তর বাতাসে
 অনাহত এখনো সময়
 সম্মুখে রয়েছে । তুমি ফিরে যাও ।

মন্দির জনশূন্য । বটগাছ শুক হয়ে দেখে
 যে আলোয় তারাবন খেয়াঘাট এতক্ষণ গাঁথা ছিলো তাকে
 কে নেভালো ?

একটি নীরব ছায়া আরো দূর দূরান্তে চলেছে ।

॥ এপারে ওপারে ॥

জলের ধারে সহস্র বুনো পথ
 তোমার মনে কপট কিছু ভান
 নদীতে আছে গভীর শ্রোত তাই
 নদীরে ভয় পাই ।

ঘড়ার ঘল এমনি করে গেল
 ফুলের গাছে নয়ত তরুণুলে
 যখন সূর বিলিয়ে চলে যাবে
 নদীতে শ্রোত পাবে ।

মিথ্যা শুধু কপটতার মালা
 জড়িয়ে রাখে ধাতুর দর্পণ
 এ কথা তুমি বুঝতে পেরেছিলে
 নদীতে ঝাঁপ দিলে ।

মায়ায় কাঁদে মলিন দর্পণ
 ভেবেছে নন কাকে যে বলো ভান ?
 ঘল সইতে শ্রোতের ধারে যাওয়া
 নয়, নদীতে ঝাঁপ দেওয়া ।

বিদেশী মুদ্রাসকট ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা

সলিলকুমার সিদ্ধান্ত

॥ ০ ॥

অতি সাম্প্রতিককালে অনেক ভি. আই. পির মুখ থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় একটি নির্মম ছাঁটাই চালানোর ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। যখন প্ল্যান কাঠামোর খসড়া প্রথম তৈয়ারী করা হয় তখন অধ্যাপক বি. আর. শেনয়(১) প্রমুখ অনেকেই পরিকল্পনায় উচ্চাশা ও অবাস্তবতার দিকটি বিশেষ করে সামনে তুলে ধরেন। প্ল্যান ছাঁটাই-এর ইঙ্গিতও যে তাঁদের লেখায় ছিল না এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তখন তাঁদের এককথায় নস্যাৎ করা হয়েছিল। অথচ আজ বারবার প্লানে কাঁচি চালানোর ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। সেদিনের সেই “বিজ্ঞানদের” আর “অজ্ঞানদের” পুরোনো সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে শুরু করেছেন কেন, সমস্যাটি বাস্তবে কী এবং এর সম্ভাব্য সমাধানই বা কোন পথে, এগুলোই এই প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য।

॥ ১ ॥

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পাবলিক সেক্টরে উন্নতিমূলক বিনিয়োগের মোট পরিমাণ ৩৮০০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। এর সঙ্গে চলতি তহবিলের (কারেন্ট একাউন্ট) খরচ ১০০০ কোটি টাকা যোগ করলে পাবলিক সেক্টরে মোট-ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৮০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৪০০০ কোটি টাকার সংস্থান দেশের মধ্যেই করা হবে, বলা হয়েছে। বৈদেশিক ঋণরাতি বা ধার (Resources to be raised externally) এর পরিমাণ ধরা হয়েছে ৮০০ কোটি টাকা। (২) এখানে একথা বলবার তাৎপর্য হল এই যে, বৈদেশিক সাহায্য বিদেশী মুদ্রায়ই হবার ফলে জাতীয় বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলও বৈদেশিক সাহায্যের সমান পরিমাণে বাড়বে।

এখানে অবশ্য একথা যোগ করা অশ্রায় হবে না যে, প্ল্যানিং কমিশনে এই হিসেবের সমালোচনা অনেকেই করেছেন। বিশ্বব্যাংকের যে বিশেষজ্ঞদল কিছুদিন আগে ভারত পরিদর্শনে এসেছিলেন, তাঁরাও এক স্মারকলিপিতে প্ল্যানিং কমিশনের এই হিসেবকে অত্যন্ত আশাবাদী ও অবাস্তব বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ ইচ্ছামাত্রই দান বা ধার মেলে না। দাতা এবং গ্রহীতার, উত্তমর্গ এবং অধমর্গের ইচ্ছা যেখানে একই রূপ, সেখানেই মাত্র মেলে। অর্থাৎ, প্ল্যানিং কমিশনের এই হিসেবকে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ভারতবর্ষের সাহায্য গ্রহণের সর্বোচ্চ সীমারেখা বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। কিন্তু একথা কিছুতেই বলা চলে না যে বিশ্বপরিস্থিতি ঐ সীমারেখায় পৌঁছানোর অসম্ভব। পরোপচিকীর্ষায় নিদ্রাহীন রক্তনী ন্যাপন কোনও রাষ্ট্রাই করছে না। বিশেষত যারা আমাদের উত্তমর্গ, তারা ত নয়ই। তাঁদের দান, তাঁদের ধার আমাদের দেওয়া হয় শুধু ক্ষেত্র বিশেষে আমাদের দাবার বড়ের মত ব্যবহার করবার সুযোগ পাবার জন্য।

আবার অতীত যদি ভবিষ্যতের কোনও নির্দেশক হয় তবে প্র্যানিং কমিশনের হিসেব ভুল বলেই প্রমাণিত হবে। প্রথম পরিকল্পনাকালে সংগৃহীত মোট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ২৯৮ কোটি টাকার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে ৮০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা কোনও সম্মানজনক শর্তে হবে বলে মনে হয় না।

ব্রিটেনে সঞ্চিত ষ্টালিং তহবিল থেকে ২০০ কোটি টাকা তুলবার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান ব্রিটেনের আর্থিক পরিপ্রেক্ষিতে তার পক্ষে যে কোনও সময় বৈকে দাঁড়ানোও অসম্ভব নয়। তার বিদেশী মুদ্রার তামান সঞ্চয় যাতে রাতারাতি কাবার হয়ে না যায়, তার জন্য তাকে সুদের হার চড়াতে হয়েছে শতকরা সাত-এ। তবে যে ষ্টালিং পাওয়া যাবে, তাতে এর আগে যে সমস্ত ধার করা হয়েছে, তার সুদ মেটানো অবশ্য চলবে। (৩)

॥ ২ ॥

এই বিরাট পরিকল্পনা সফল করতে হলে যে বিরাটবহরের যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে, একথা বলাই বাহুল্য। এই যন্ত্রপাতির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে প্রয়োজনীয় ও ভারতে অপ্রাপ্য আরও অনেক কিছুই আমদানী করতে হবে। পরিকল্পনার পাঁচ বছরে (১৯৫৬-৬১) ৪৩৪০ কোটি টাকার মালপত্র বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে। এর প্রায় অর্ধেকই ধাতু ও ধাতুনির্মিত যন্ত্রপাতি। (২১৫০ কোটি টাকা)। খাণ্ড আমদানীর ব্যয় ধরা হয়েছে ২৭৫ কোটি টাকা। যাই হোক প্রকৃত আমদানীর পরিমাণ আরও বেশি হবে বলেই বোধ হয়। কারণ, বিদেশের বাজারে মুদ্রাস্ফীতি আর সুর্যেজ্বালে গওগোলের দরুন আমদানী খরচা বেশিই পড়ছে এবং ভবিষ্যতেও পড়বে। এ-ছাড়া আমদানীকৃত দ্রব্যের পরিমাণও বেড়ে গেছে এবং আরও বাড়বে। দেশের খাণ্ডাবস্থার দিকে তাকিয়ে বলা যায় যে খাণ্ড আমদানীর জন্য বরাদ্দ টাকা আরও বাড়তে হবে। অতএব ৪৩৪০ কোটি টাকার চেয়ে অনেক বেশি টাকার মাল দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আমদানী করতে হবে।

এবারে আসা যাক রপ্তানীখাতে। মোট রপ্তানীর পরিমাণ (১৯৫৬-৬১) ধরা হয়েছে ২৯৬৫ কোটি টাকা। রপ্তানী করে যে টাকা পাওয়া যাবে তা থেকে আমদানীর পুরো দাম দেওয়া চলবে না।^{*} ব্যাল্যান্স অব ট্রেডে ঘাটতি হবে ১৩৭৫ (৪৩৪০—২৯৬৫=) কোটি টাকা। এর সঙ্গে যদি অদৃশ্য আদানপ্রদান খাতের উদ্ধৃত্ত যোগ করা যায় তবে ব্যাল্যান্স অব পেমেন্টস্-এ ঘাটতির পরিমাণ কমে দাঁড়াবে ১১২০ (১৩৭৫—২৫৫=) কোটি টাকায়। তবে উপরিলিখিত যুক্তি অসুযায়ী (যদি আমদানী বেশি হয়) এ অতি সহজেই অসুমেয় যে প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ আরও অনেক বেশি হবে।

॥ ৩ ॥

(২)এ বর্ণিত আমদানী-রপ্তানীর পরিমাণ বাচক সংখ্যাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছোটো অসুমানের ভিত্তিতে রচিত। পয়লা নম্বর অসুমান হল এই যে বাণিজ্য

মূল্য (টারম্‌স্ অব ট্রেড) ১৯৫৫-৫৬এর প্রথম ৯ মাসে যা ছিল বরাবর তাই থাকবে। দোসরা অনুমান হল এই যে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে দেওয়া হবে না।(৪) অর্থাৎ সকলেই জানেন যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মুদ্রাস্ফীতির দরুন এবং স্বেচ্ছ গুণগোলে মানবহন খরচা বৃদ্ধির দরুন আমদানী মূল্য বেড়েছে। অপরদিকে দেশে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধে সরকার ব্যর্থ হওয়ায় আমদানীর পরিমাণ বেড়েছে এবং আরও বাড়বে। ফলে ব্যাল্যান্স অব পেমেণ্টস্এ বিরাট ষাটতি দেখা দেবে। প্র্যানিং কমিশনও একথা স্বীকার করেন।(৫)

এ অবস্থায় প্র্যানের চাপে বিদেশী মুদ্রার সঞ্চিত ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্স ডিপার্টমেন্টে মে (১৯৫৬) মাসে বিদেশী সিকিউরিটির পরিমাণ ছিল ৬৮১ কোটি টাকা। ১৯৫৭-এর আগষ্ট মাসে সেটা দাঁড়ায় ৩৬০ কোটি টাকায়। তেমনি, সোনা সহ বিদেশী মুদ্রার রিজার্ভেরও একটা নিম্নগতি দেখা দিয়েছে। এমন সময় সরকার থেকে আইন করা হল যে, বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় আরও কম রাখা চলবে। আগে যেখানে সাধারণ আইনগত সীমা ছিল ৪০০ কোটি টাকায়, এখন সেখানে সীমা বেঁধে দেওয়া হল ২০০ কোটি টাকায়।

তা হলে আমরা দেখলাম যে সমস্যাটি আসলে মাথাভারী প্র্যানের জন্য বেশি আমদানীর সমস্যা। প্র্যানের হিসেবেই প্র্যানের বিপদ। তার উপর আমরা দেখছি যে প্র্যান আসলে বেহিসেবী। প্র্যানের এটিমেট মত কোনও কিছুই ঘটছে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, প্র্যানে ১৯৫৬-৫৭ সালের আমদানী ৭৮৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।(৬) কিন্তু আসলে ঐ সময়ে মোট আমদানীর পরিমাণ হয়েছে ১০৭৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১৯৪ কোটি টাকা বেশি। প্র্যানিং কমিশনের হিসেবে ১৯৫৮-৫৯ এই আমদানী সর্বাধিক হবে; ৯৯০ কোটি টাকার। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্রথম বছরের আমদানী ঐ সর্বাধিক পরিমাণকেও ছাড়িয়ে গেছে। (আহা! এ না হলে প্র্যানিং কিসের!) তাই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার যে সঞ্চয় রিজার্ভ ফাও হিসাবে থেকে দেশের কোনও কাজেই লাগছিল না, তা কাজে লাগানোর বন্দোবস্ত করলেন সরকার নিম্নতম রিজার্ভের সীমা নামিয়ে দিয়ে।

কিন্তু সরকারের এই কাজ অনেকেরই মনঃপুত হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সরোজকুমার বসুর মতে "Any attempt to dispense with the existing requirements of a minimum gold and foreign exchange reserve or to lower the minimum at this juncture... would be likely to shake the confidence of the outside world in the strength of the Indian rupee or even in the very basis of India's economy".(৮) [বর্তমানে নিম্নতম সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার রাখবার বিধি প্রত্যাহার করলে বা তার নিম্নতম সীমা আরও নিম্নতম স্তরে নামিয়ে দিলে, টাকার ওখা ভারতের অর্থনীতির সামর্থ্য বহির্জগতের বিশ্বাস খুব সম্ভব নষ্ট হয়ে যাবে।] তাঁর মন্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি হল এই যে, সোনার প্রতি লোকের একটা অহেতুক মোহ আছে। (অথবা,

মার্কেটাইলিটে থিয়োরীর প্রতি অব্যাপক বস্তুর একটা অহেতুক মোহ আছে ? (!)) আমেরিকার দিনে আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা বাঁচা করেন, হয় তাঁরা নিজেরা বিশেষজ্ঞ, নয়ত বিশেষজ্ঞের উপদেশে তাঁরা কাজ করেন । কোনও দেশের মুদ্রা বা অর্থনীতির উপর তাঁদের আস্থা সেদেশের ঠুনকো স্বর্ণভাণ্ডারের উপর নির্ভর করে না, করে সে দেশের সাবিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ।

শ্রীমত্বেশ ভালভাবেই জানেন যে, রিজার্ভব্যাঙ্কের সঙ্কিত স্বর্ণভাণ্ডারের প্রধান কাজ হল ব্যাল্যান্স অব্ পেমেণ্ট্‌স্-এর সাময়িক ঘাটতি পূরণ করা । (৯) অর্থাৎ, আমেরিকার ব্যাল্যান্স অব্ পেমেণ্ট্‌স্-এর ঘাটতি পূরণে এই রিজার্ভ ব্যবহার করবার জন্য আইনগত সর্বনিম্ন সীমা আরও নানিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে এখন আপত্তি তিনি জানাচ্ছেন । ভাষ্যব্যাপার বৈকি ।

বাই হোক, একাধিক বিনিময় হার (Multiple exchange rate) প্রবর্তনের দ্বারা এই সমস্যার খানিকটা সুরাহা করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন । (১০) দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে এর প্রয়োগ দেখে তিনি খুব উৎসাহিত বোধ করেছেন । কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে আই, এন্, এফ্, এর নীতি একাধিক বিনিময় হার প্রবর্তনের বিরোধী । ঐ সংস্থা কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে একাধিক হার মেনে নিয়েছেন বলে ভারতের ক্ষেত্রেও মেনে নেবেন এর কোনও সন্দেহ নেই । আবার, শ্রীমত্বেশ মতে, অদূর ভবিষ্যতে সেখান থেকে ধার পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই, অতএব আই, এন্, এফ্, এর অনুমোদনের বিরোধিতা করেও এটা করা ভাল । কিন্তু শ্রীমত্বেশ এই সূক্তি অত্যন্ত ভুল । কারণ ব্যাল্যান্স অব্ পেমেণ্ট্‌স্‌এ ঘাটতি পূরণের জন্য যেমন বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় দরকার, তেমনই সেই কাজ আই, এন্, এফ্, এর স্বল্পমেয়াদী ধারের টাকা দিয়েও করা সম্ভব । আর অর্থনৈতিক ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারলে, অর্থাৎ কি না ক্লস্ অর্ বা দি গেমস্ মেনে চললে, ভবিষ্যতে যে আই, এন্, এফ্, থেকে ধার নিলবে না এমন কথা বলা যায় না ।

শ্রীমত্বেশ অসম্ভব মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছেন । কিন্তু এক্ষেত্রে আই, এন্, এফ্, ভারতের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, তার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার কথা একবারও তিনি বললেন না কেন ?

একাধিক বিনিময় হারের প্রকৃত অর্থ হল এই যে, কতকগুলো জিনিস আমদানী কম করবার জন্য, তার উপর একটা অদৃষ্ট কর বসানো । আর যা আমদানী করা দরকার, যেমন যন্ত্রপাতি, তার জন্য আমদানীকারীকে সাবসিডি দিয়ে সহায় করা । এ অর্থাৎ, এ প্রথা প্রবর্তন করলে কর নির্ধারণের ক্ষমতা আংশিকভাবে পার্লামেন্টের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের হাতে দেওয়া । দ্বিতীয়ত, একাধিক বিনিময় হারকে কেন্দ্র করে ফাটকা বাজার বেশ জমজমাট হয়ে উঠবে । আর আমাদের রাজকর্মচারীকুলি সং ও স্বেচ্ছানিষ্ঠ এমন দুর্দান্ত অতি বড় শত্রুরেও দিতে পারবে না । কাজেকাজেই উচ্চপদস্থ কিছু সংখ্যক কর্মচারীর সহায়তায় আর কিছুসংখ্যক ফাটকাবাজের লাভের পথ সুগম হবে ।

সর্বোপরি, একাধিক বিনিময় হার লাভজনক হতে হলে দেশের আর্থিক অবস্থা

ভাল হওয়া দরকার। দেশে মূল্য-মান স্থিতিশীল থাকবে এবং বিদেশী মুদ্রার রিজার্ভও থাকবে বেশ ভাল রকমের। কিন্তু এগুলো থাকলে একাধিক বিনিময় হার চালু না করেই অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে কাজ চালানো যায়। (১১)

শ্রীমন্তের দ্বিতীয় সমাধান হল, আমদানীর দাম দেবার ক্ষমতা দেশের “হোর্ডার” (মজুতদার) দেয় থেকে সোনা সংগ্রহ করা। সাধারণ ভাবে এই প্রস্তাবে আপত্তি করার বিশেষ কিছুই নাই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে সরকার যদি হোর্ডারদের সোনা আংশিকভাবেও কিনে নেন, তবে দেশের লিকুইডিটি এমন ভাবে পরিবর্তিত হবে যে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ অনেক যাবে বেড়ে। (কারণ মজুত সোনা সব সময়েই প্রকৃতপক্ষে লিকুইড নয়। লিকুইড হিসেবে ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা শুধু (পোটেনসিয়ালি লিকুইড)।) যাই হোক, এর ক্ষমতা মজুতদারদের কাছে তাদের সোনা কিছু পরিমাণে সরকারের হস্তায় দেবার আহ্বান জানানো যেতে পারে। (শতকরা ১০ ভাগ।) এতে করে, তাঁর মতে, এক টিলে দুই পাখী মারা হবে। প্রথমত, সরকারের এই আপীল একেবারে ব্যর্থ হবে বলে তিনি মনে করেন না। দ্বিতীয়ত, মজুতদাররা কি পরিমাণে এই আপীলে সাড়া দেয় তাই দিয়ে জনগণের সহযোগিতার পরিমাণ করা যাবে। *The extent to which the hoarders respond to the appeal will be a measure of public cooperation,* (১২) এই নাপকাঠিতে বিচারের কথা বলায় আমার মনে হচ্ছে যে, আকাশে পাখী কোন দিকে উড়ে গেল, তাই দিয়ে গরু কত গের দুধ দিল তাও মাপা চলবে। (মোক্ষা কথা, জনসাধারণের শতকরা কতজন তাঁর মজুতদার পর্যায় ছুঁতে? ১জন না ১০জন?)

॥ ৪ ॥

এ সমস্যার সমাধান কোন পথে হতে পারে, বিষয়ে বর্তমান লেখকের অভিমতও কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করা ভাল। এ সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করার সময় পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা কি, তা ভুললে চলবে না। ভুললে চলবে না যে, উনবিংশ শতকের বাণিজ্যনীতি আজ অচল। আজকের বাণিজ্যজগতে দ্বিপক্ষীয় বিনিময় চুক্তির সাহায্যে খুব অল্প পরিমাণ বাণিজ্য হয় না। একে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। উন্নাসিক ইংরেজ একে শাখাটির শয়তানী নামে উল্লেখ করতে পারেন। কিন্তু বাঁচবার এই একমাত্র পথই আজ ভারতের সামনে খোলা। বাঁচবার ক্ষমতা ভারতকে দ্বি-ত্রিপক্ষীয় অর্থনৈতিক চুক্তি করে—তার ভিত্তিতে তাকে বাণিজ্য করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ভারত সোবিয়েৎ রাশিয়া বা অপর যে কোনও দেশের সঙ্গে পারস্পরিক আমদানী-রপ্তানী সমান করার চুক্তি করতে পারে। আবার, এমন কতকগুলো চুক্তি করা যেতে পারে যে ভারতবর্ষ চুক্তিবদ্ধ দেশগুলো থেকে মাল আমদানী করবে এই শর্তে যে আমদানীর মূল্য সে ভারতীয় মুদ্রায় দেবে। অতি সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষ এই ধরনের একাধিক চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং আরও করবে।

কতকগুলো ক্ষেত্রে ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে অসুবিধা দেখা দেয়। যেমন, ভারত চেকোস্লোভাকিয়া থেকে যে পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানী করতে চায়, তার তুলনায় অনেক কম মাল চেকোস্লোভাকিয়ার ভারত থেকে আমদানী করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তৃতীয় একটি দেশ, যেমন ইন্দোনেশিয়া সহ ত্রিপক্ষীয় একটি চুক্তি করলে, তিন দেশই লাভবান হবে। ভারতবর্ষ চেকোস্লোভাকিয়া থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী করবে। চেকোস্লোভাকিয়ার যে বাড়তি প্রাপ্য ভারতের কাছে, তা শোধ করবে ইন্দোনেশিয়া তাকে তিন আর রবার দিয়ে। ইন্দোনেশিয়ার দাবী ভারত নেটাবে ভারতে তৈয়ারী যন্ত্রপাতি দিয়ে। এরকম চুক্তি সম্পাদন করলে ব্যালান্স অব পেমেন্টস্ এ ষাটটি এড়িয়ে চলা আশাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

এ ব্যবস্থার অপর একটি সুভদিক হচ্ছে এই যে কোনও একটি মাত্র দেশের উপর অতি নাজার নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয় না।

এ ছাড়া এ ব্যবস্থায় যে সব দেশ দৌড়ের পাল্লায় আমেরিকার কাছে হেরে যাচ্ছে, তাদের থেকে দীর্ঘ বা নাতিদীর্ঘ মেয়াদী হারে ধারও পাওয়া যেতে পারে। তাতে, ঐ ৮০০ কোটি টাকা জোগাড় করা অনেক সহজ হবে। কানাডা, পশ্চিম জার্মানী বা জাপানের উপর এ বিষয়ে নির্ভর করা যেতে পারে।

অপর পক্ষে আমদানী লাইসেন্স ইস্যুর ব্যাপারে যে কলঙ্কারীগুলো ঘটেছে ওগুলো ভবিষ্যতে না ঘটলেই ভাল হয়। সরকারকে সহিবেচকের মত, লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদি ইস্যু করতে হবে। এবং পরিকল্পনার অগ্রগতি ও প্রয়োজনের সঙ্গেও যেন তার সংযোগ থাকে। অপ্রয়োজনীয় বা অল্প প্রয়োজনীয় মালপত্রের আমদানী যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। আর যে সব ব্রিনিস ভারতেই উৎপাদন করা যেতে পারে, সেগুলোর ভারতে উৎপাদন ঘরান্বিত করতে হবে।

রপ্তানী বাড়ানোর সম্ভাব্য সকল উপায়ই চেষ্টা করে দেখতে হবে। সাধারণ যন্ত্রাদি ও ভারতীয় ভোগ্যপণ্য খাতে এশীয়া আফ্রিকার বাজারে আরও বেশি করে চালানো যায় তার চেষ্টা করতে হবে। এ বিষয়ে রপ্তানী বৃদ্ধি কমিটির সুপারিশগুলো ভেবে দেখতে হবে এবং যতটা সম্ভব কাজে পরিণত করতে হবে।

অতএব ; মাত্র বিদেশীমুদার ষাটটির ভুল প্রানে কাঁচি চালানোর কোনও অর্থ হয় না। যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে উপরিউক্ত উপায়ে চেষ্টা করলে, মাত্র বিদেশীমুদ্রা স্ফটের ভুল পরিকল্পনা বিফল হবে না।

১। Second Five Year Plan—A Draft Outline—(Planning Commission প্রকাশিত)-এ অধ্যাপক শেনয়-এর দ্বিমতজ্ঞাপক লিপিটি দ্রষ্টব্য।

২। Second Five Year Plan—(P. C. প্রকাশিত) ৭৭-৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩। ঐ—১০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪। ঐ—১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৫। "The balance of payments is particularly sensitive to inflationary pressures."—ঐ—৯৬ পৃ: দ্রষ্টব্য।

৬। ঐ—৯৫ পৃ: দ্রষ্টব্য।

৭। বাঁকা হরফ বর্তমান লেখকের ব্যবহৃত।

৮। অর্থনীতি ভল্যুম ১, ১নং, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।)-তে শ্রী এস, কে, বসু—The Crisis In India's Foreign Exchange Reserve প্রবন্ধের ৯৭-৯৮ পৃ: দ্রষ্টব্য।

৯। ঐ—৯৭ পৃ: দ্রষ্টব্য।

১০। ঐ ৯৯ পৃ: দ্রষ্টব্য।

১১। এ প্রসঙ্গে Schlesinger লিখিত Multiple Exchange Rate (Princeton University Press) বইটি পড়ে দেখা যেতে পারে।

১২। অর্থনীতি, নভেম্বর ১৯৫৭, ১০১ পৃ: দ্রষ্টব্য।

[পূর্বাহ্নবৃত্তি]

বাসু এমনিতেই একটু মুখচোরা। ননের মত সঙ্গী না পেলে কিছুতেই আলাপ করতে পারে না। এ নিয়ে অনেক ঠাট্টা, অনেক বাদ বিক্রপ গছ করতে হয়েছে তাকে। কিন্তু কিছুতেই এ খোঁসগ ভেঙে সে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

কেদারদা বলত, বাসু কেরিয়ারিষ্টে ছেলে।

বাসু তখন স্কুলে পড়ে, পড়াশোনা করে, গল্পের বই পড়ে আর নরেশের সাথে কখনো গিয়ে বসে থাকে কাজলদির বাড়িতে, কখনো চলে যায় প্রানের বাইরে অনেক দূরে—সেখানে ছ'পাশে ধানের মাঠ দিগন্তবিস্তৃত। আর সেই মাঠের মাঝে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চাষী পল্লী।

এ পথে ওরা কেন-যে আসত তা ঠিক স্পষ্ট করে বলতে পারত না। কিন্তু যেদিনই কাজলদির বাড়িতে যেতে ভাল লাগত না সেদিনই ওরা আসত এই দিকে। একটা অনির্দেশ্য যন্ত্রণা, যা কোনো সময়েই স্বস্তি দেয় না, যা তাড়িয়ে নিয়ে ফেরে এক কাজ থেকে আরেক কাজে—যুনে, আগরণে, বই পড়ায়, গল্প করায় সেই অসহীন অস্থিরতার তখন ছটফট করত বাসু। কিন্তু একথা সে কাউকে বলতে পারেনি। হয়ত জিজ্ঞাসা করলেও বলতে পারত না। শুধু মা যেন কি একটা অশ্রুমান করত, যখন সামান্য কথাতেই রেগে উঠে কেঁদে ফেলে দিত বাসু। ঠিক সেই কালে নরেশ ছাড়া আরো যে ছ'একটি লোককে ভাল লেগেছিল বাসুর, কেদারদা তাদেরই একজন।

বাসুর কাছে কেদারদার আকর্ষণ তার বৈচিত্র্যময় ভয়ঙ্কর জীবনের।

ছোটখাট নিতান্ত সাধারণ চেহারা। খুব ধীরে কথা বলত কেদারদা—একটু অশ্রমস্বত্ব থাকলে প্রায় শোনাই যেত না। এই গোটা ইন্ডুলে এত ভাল ছেলে থাকতে কেদারদা কেন যে বেছে বেছে ওর সাথেই আলাপ করেছিল সে আজও রহস্য বাসুর কাছে। প্রতিদিন বাড়িতে আসত, পড়িয়ে, যেত বাসুকে—আর তারই সাথে টুকরো টুকরো ছাড়া ছাড়া গল্প কেদারদার নিজেই জীবনের। কিন্তু সে সব কাহিনী এত ছোট, এত অসম্পূর্ণ যে বাসুর প্রতিদিনই মনে হত—একটা ভীষণ রোমাঞ্চকর কোনো কিছুকে একটা বাস্তবের মধ্যে ঢাকা দিয়ে রেখে ভালোটা তুলে আর একটু দেখিয়ে গেল কেদারদা। বাসু একটা দুনিবার তাগিদ অনুভব করতো ঐ ভালো তুলে সম্পূর্ণ দেখার। বাসু বুঝতো সে নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ওই ঢাকনা খুলে ফেলে দিলে। তবুও।

নরেশও আসত কেদারদার কাছে। কিন্তু কেদারদার জীবনের এ পরিচয় বোধহয় নরেশ জানত না। নরেশকে টেনেছিল কেদারদার গান। স্কুলের লাগোয়া নির্জন যে বোডিংটার কেদারদা থাকতো, প্রায় বিকেলেই সেখানে আসত বসতো

গানের। বাসু নরেশের মত অনেক ছাত্রের সাথে হু'একজন শিক্ষকও আসতেন সেখানে।

সেই কেদারদা বলত, বাঁচার মত বাঁচ। তুই জন্মালি, বেশ কিছুদিন ধরে পৃথিবীর অন্ন ধ্বংস করলি, তারপর একদিন টুপ করে মরে গেলি পিলে পেটা হয়ে—কি লাভ। তুই না জন্মালে কি ক্ষতি হতো?

কথাগুলো বাসু শুনতো, আর মনে করতো সে একা একটা অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে। আকাশ ভরে মেঘ করে ঝুটি নেমেছে গভীর রাত্রির কোনো একটি প্রহরে। হঠাৎ বিছাৎ চম্কে উঠে মেঘ ডেকে উঠল গুড় গুড় করে। কেদারদার ফিস্ ফিস্ করা কথায় সেই মেঘের গর্জন।

কোনো কোনোদিন আবার এমন কথাও বলত কেদারদা যার অর্থ বুঝতে পারেনি বাসু। বিভিন্ন কথায়, মেলামেশায় কেদারদার যে ছবি বাসু গড়ে তুলেছিল নিজের মনে, কেদারদার সে সব কথাগুলো তার গায়ে হাল্কা সবুজ রং-এর তুলি ঝুলিয়ে অনেক নরম করে দিত।

বুঝলি বাসু, ভালবাসতে না পারলে এ জীবনটাই বৃথা। এমন গভীর ভাবে ভালবাসতে হবে, যাতে কাঁকি না থাকে—চালাকি না থাকে।

একটু খেনে কেদারদা জিজ্ঞেস করত তেমনি সুরে, আমাকে তুই ভালবাসিস বাসু?

ভালবাসা কথাটার অর্থ বাসুর কাছে অস্বরকম তখন। নরেশ ভালবাসে গীতুকে। কাজলদির বারো বছরের মেয়ে। নরেশ আরো বহু মেয়েকে ভালবেসেছে। ভালবাসা বাসুর কাছে একান্ত লজ্জার—বড় গোপনতার। তাই কেদারদা যখন তেমনি আশ্চর্য গলায় বলত, আমাকে তুই ভালবাসিস বাসু? যদিও তখন ভীষণ লজ্জা করত তার, তবুও একটা দুর্বীর আবেগ অনুভব করত বাসু। মনে হত, একসঙ্গে অনেকগুলো কথা ফেনিয়ে গলার কাছে কান্নার চেউ-এর মত উঠে আসছে—মনে হত ছুটে গিয়ে কেদারদাকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে উঠে বাসু বলে, তোমাকে ভীষণ ভালবাসি কেদারদা।

সেই কেদারদা বাসুকে বলেছিল, কেরিয়ারিষ্ট।

দিন কয়েক আগে থেকেই কেমন যেন বিপর্যস্ত মনে হচ্ছিল কেদারদাকে।

ছুদিন পড়াতে এল না। প্রস্ন করলেও উত্তর পাওয়া না। একদিন শুধু বলল, আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে বাসু। আমার কিছু বই তোর কাছে রেখে যাব।

তার পর আর কোনো কথা নয়। কুলে বোর্ডে উঠে অঙ্ক বোঝাতে গিয়ে বার বার ভুল করে, কিছু বলতে গেলেই রেগে ওঠে ভীষণ।

একদিন সকালে উঠেই শুনতে পেল বাসু, কেদারদার ঘর ঘেঁরাও করেছে পুলিশ। সংবাদটা এনেছিল নরেশ। হু'একনেই ছুটে গেল সেখানে। বোড়ি:

বাড়িটায় লোকলোকারণ্য। পুলিশের দারোগার সাথে হেডমাষ্টার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। সামনে কেদারদার ঘরটা হাট করে খোলা। কেদারদা নেই।

কেমন করে যে খবরটা এমন বিজ্ঞাতের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল কে জানে, গোটা ইস্কুলের প্রায় সব ছেলেই এসেছে ব্যাপারটা দেখতে। কেউ বলছিল, কেদারদা ডাকাতি করেছে। কেউ বলছিল, পরশুদিন একটা লোককে গুলী করে মেরেছে কেদারদা।

হঠাৎ হেডমাষ্টার ডাকলেন বাসুকে, তোমাকেই তো কেদারবাবু পড়াতেন, না ?

হ্যাঁ স্যার, বাসু বলল।

হেডমাষ্টারকে খানিয়ে দিয়ে দারোগা প্রশ্ন করল বাসুকে, কাল তোমাকে পড়িয়েছেন তিনি ?

না।

বাড়িটা কোথায় তোমার ?

বাসু বাড়ির ঠিকানা বলল।

কিছু বলেছেন তোমাকে কেদার বাবু ?

বাসু হঠাৎ ঠিক করে উঠতে পারলো না, কি উত্তর দেবে এ প্রশ্নের। কোন কথা এরা জানতে চাইছে। হঠাৎ মনে পড়ল বাসুর সেই বইগুলো রাখার কথা।

বাসু বলল, হ্যাঁ বলেছিলেন, কতকগুলো বই তিনি আমার ওখানে রাখবেন।

হেডমাষ্টারের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো দারোগা।

তোমাদের বাড়িটা একটু দেখাবে চলতো বোকা—বেশ মিটি করে বলল দারোগা।

তারপর ওখানকার সব লোক এসে ভেদে পড়ল বাসুদের বাড়িতে। বাসুদের প্রতিটি ঘর, বাসুর প্রতিটি বই তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল ওরা। ইস্কুলের খাতার যেখানেই অপরিচিত হাতের লেখা দেখে, সেখানেই প্রশ্ন করে, এটা কার লেখা ?

বাসু উত্তর দেয় কেদারদার।

অমনি পাতাটা ছিড়ে নেয় পুলিশে। প্রায় একঘণ্টা পরে পুলিশ বেরিয়ে গেল। সাথে নিয়ে গেল রাজ্যের ছেঁড়া কাগজ আর একখানা খাতা। ওর ভেতর কেদারদা একটা বাংলা রচনা লিখে দিয়েছিল বাসুকে।

সেদিন সন্ধ্যা বেলাতেই কিন্তু কেদারদার সাথে দেখা হয়েছিল বাসুর। আর এমন জায়গায় দেখা হয়েছিল যেখানে বাসু কল্পনাই করতে পারেনি। কাজলদির বাড়িতে।

সন্ধ্যার একটু আগে বাসু গিয়েছে কাজলদির ওখানে। অল্পদিন যেমন কথাবার্তায় সরগরম থাকে বাড়িটা সেদিন যেন তার ব্যতিক্রম। বাড়িটা অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। বাড়ির উঠানে গিয়ে দাঁড়াতেই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কাজলদি।

ও তুই। আয় ভেতরে আয়—কাজলদির গলার স্বরও যেন কিছুটা ভারী।

ঘরের ভেতরে ঢুকেই বাসুর হৃদপিণ্ডটা যেন একবার লাফিয়ে উঠেই থেমে

গেল। চোকির উপরে যে লোকটা চুপ করে বসে ছিল তাকে অমাবস্তার রাতে দেখলেও ভুল করবে না বাসু। কেদারদা।

হ্যাঁ বোম। কেদারদার স্বরটা গভীর। বাসু গিয়ে বসল চোকিটায়। কাজলদি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অনেকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতা। ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে অন্ধকার গাঢ় হল। কয়েকটা মণা এসে একঘেঁয়ে সুর তুলে ঘুরতে থাকল কানের কাছে। একবার মণার কামড় খেয়ে উঃ করে উঠল বাসু, তবু নড়ল না কেদারদা। অথচ বাসু স্পষ্ট অনুভব করছিল স্থির অলস্ত দৃষ্টিতে কেদারদা চেয়ে আছে ওরই দিকে। এমন অবস্থায় বাসু কোনোদিন পড়েনি। এই অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় পড়ে বাসুর মনের আকাশটা একটা বিছাতের চাবুক খেয়ে সর্বপ্রথম স্মরণ করলো, কেদারদা তাকে কি বলেছিল না বলেছিল ডা দারোগার কাছে না বললেই ভাল হত। হয়ত এতদূরেই কেদারদা কথা বলছে না ওর সাথে। যেমন মনে হল এ-কথাটা বাসুর, অননি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

কাদছি কেন? কেদারদার প্রশ্ন।

আরো উচ্ছ্বসিত হল বাসুর কান্না।

ধাম্। কঠিনকণ্ঠে হুকুম করলো কেদারদা, সববিষয়ে বেশি কৌতুহল যাদের তাদের আমি দেখতে পারিনি।

বাসুর কান্নাটা হিন হয়ে গেল কেদারদার পক্ষার সুরে। এমন কঠিন, এমন নিশ্চল কথা কেদারদার মুখে কোনোদিন শোনেনি বাসু।

তোকে অসুস্থ এধরনের ছেলে মনে ভাবিনি।

এতক্ষণে কথা বলবার ব্যর্থ চেষ্টা করল বাসু। কিন্তু গোটা কয়েক অর্ধশতাব্দী ছাড়া আর কিছু বেরোল না ওর মুখ দিয়ে।

ভাল ছেলে। ব্যঙ্গ কেদারদার গলা বিকৃত হয়ে উঠলো, কেন গিয়েছিলি ওখানে? মজা দেখতে?

কাজলদি ঘরে এসে ঢুকল।

ওকে বকছো কেন? ছেলেমানুষ একটা কিছু না হয় বলেই ফেলেছে—

কেদারদা তেননি সুরেই উত্তর দিল, বলেই ফেলেছে। বলেই ফেলবে কেন? ছেলেমানুষ। তারপর কাজলদির দিকে, ফিরে বলল, ছেলে চরিয়েই ত এতবড় হলান কাজল। কে যে কি তা আমি জানি। বাসু হবে কেয়িয়ারিষ্ট। দেশের দিকে ও কোনোদিন তাকাতে শিখবে না।

কাজলদি হাসল একটু, তারপর বলল, খুব শিখবে।

কেদারদাও হাসল, বলল, দেখো ও ঠিক কালকে গিয়ে বলে আসবে, আমি তোমার এখানে ছিলাম।

কাজলদি মুচ্ছিতপ্রায় বাসুকে হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে এল। অনেকটা দূরে এগিয়েও দিয়ে গেল। না এলেও ক্ষতি ছিল না কোনো। কেন না বাসুর অতীত তখন অশ্রু হয়ে গিয়েছে। সে যেন মরে গিয়েছে—এমনি হালকা, নিশিষ্ঠ একটা মন নিয়ে বিছানায় গিয়ে পড়েছিল বাসু। মা যেন কি একটা প্রশ্ন করেছিল।

কি যেন একটা উত্তর দিয়েছিল বাসু। তারপর সারারাত ভরে সে কি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে, কামায় বালিশ ভিজিয়ে পরদিন সকালের রোদের নিকে যখন তাকিয়ে দেখল বাসু, তখন তার মনে হল, গতকাল ভয়ঙ্কর অর হয়েছিল তার।

সেদিনের কেদারদার আর সব স্মৃতি অম্পষ্ট হয়ে এলেও, বাসু কেদারদার সে কথাটা আজ পর্যন্ত ভুলতে পারেনি। কেরিয়ারিষ্ট। মাঝে মাঝেই আজো কথাটা খোঁচা মারে তাকে। বিশেষ করে এখন, যখন কোনোদিকেই উৎসাহিত হবার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছে না বাসু। সব কেমন যেন ছাড়া ছাড়া, কেমন যেন অর্থহীন।

নিজের সমস্ত অতীতটার দিকে আরেকবার সমালোচকের দৃষ্টিতে তাকালো বাসু। সে কি সত্যি কেরিয়ারিষ্ট? সংসারে আর কারো দিকে না তাকিয়ে সে কি একান্ত স্বার্থপরের মত গড়ে তুলতে চেপ্টা করেছে নিজেকে? ভেবেছে একখানা বাড়ি করবে কলকাতার নেকের কাছাকাছি—যে বাড়িটাকে শেষ চৈত্রের পূর্ণিমা রাত্রিতে হঠাৎ দেখলে ইট আর সিনেটের গড়া মনে হবে না। ওপরতলার পর্দা-ঝোলানো জানালার ওপারে বাজবে বৃহকঠ রেডিও। দোতলার বালকনিতে দাঁড়িয়ে পাশের শেকল বাঁধা এ্যালসেসিয়ানটার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বাসু ভাববে, এইত চরম পেয়েছি। জীবনের কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু চাইবার নেই।

নিজের সে ছবিটা যখনই স্পষ্ট হয়েছে বাসুর মনে তখনই একটা তীক্ষ্ণ বিতৃষ্ণায় নিউরে উঠেছে সে। বাসু নিজেই বুঝতে পারে, এটাও তার একটা বাড়াবাড়ি। যেন খানিকটা উপভোগ সৃষ্টি করা নিজের জীবনকে নিয়ে। খানিকটা ইচ্ছে করে দুঃখ পাওয়া।

কথাটা বলেছিল তাকে মিহুমাসী। মার এক দূরসম্পর্কের মানাত বোন। বাসুর চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। কথাটা বাসু শুনেছে চুপ করে, কিন্তু উত্তর দেয়নি। উত্তর দেয়নি বাসু দুটি কারণে। প্রথমত জীবন সম্পর্কে বাসুর মনে তখনো কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। আর দ্বিতীয় যে কারণটা, তা নিয়ে বাসুর নিজেকেই গভীর লজ্জা আছে। তা সেই ভালবাসার কথা।

সেদিন উত্তর না দিলেও বাসু আহত হয়েছিল মিহু মাসীর কথায়। বাসু মনে করত এ জীবনটাকে নিয়ে যদি সে একবার ছিনিমিনিই না খেলল, তাহলে এটা পেয়ে, কি এমন লাভ হল তার। সে বোধহয় চাইত একটা প্রচণ্ড আঘাত দিতে, যে আঘাতে পৃথিবীর সবগুলো সুর একসাথে বেজে উঠে বিচিত্র এক রাগিনীর সৃষ্টি করবে। অন্তত সভাঙ্গন চমকে উঠে তাকাবে তার দিকে।

কিন্তু যতো দিন গিয়েছে, যতো বয়স বেড়েছে, তত বেশি করে অসুস্থ হয়ে গেছে বাসু যে মিহুমাসী ঠিক কথাই বলেছিল তার সম্পর্কে। দিন গিয়েছে, অস্থিরতা এসেছে শান্ত আর স্তব্ধ হয়েছে বাসু। হেসেছে, গরু করেছে কিন্তু জীবনের একটানো একষেয়েষী বাসুকে যেন দিনের পর দিন বিরে ধরেছে নিশ্চিৎ থেকে নিশ্চিৎ করে। ঠিক এ সময় বাসুর মনে হত, হয়ত সে উন্মাদ হয়ে যাবে কিংবা হয়তো এমন কিছু করে মরবে যা সে কোনোদিন করতে চায়নি।

ভাই হঠাৎ যেদিন এম, এ পড়ায় ইস্তফা দিয়ে শেয়ালদার ট্রেনে গিয়ে চাপল বাসু, সেদিন মনটা তার অনেক হালকা মনে হচ্ছিল। বাসু ভাবছিল, এবার হয়ত সে ঠিক মতো বেঁচে উঠতে পারবে, আবার প্রথম থেকে পরিচয় শুরু করবে জীবনের সাথে। অসুস্থ কলকাতার প্রতিদিনকার যত্নের হাত থেকে ত সে রেহাই পাবে। অসুস্থ তার সাথে তো দেখা হবে না তাদের প্রতিদিনকার বাঁচার যন্ত্রণা নুকিয়ে রাখবার জন্যে যারা রেস্টোরাঁয় গিয়ে আড্ডা মারে, রকে বসে তাকিয়ে থাকে অফিস যাত্রী মেয়েদের দিকে কিংবা বিকেলের বিবর্ণ আলোয় গিয়ে ঠাঁড়ায় সিনেমার কিউএ।

বাসু ভেবেছিল, এখানে সে আর কিছু না হোক আন্তরিকতা পাবে। সে এখানে এসে মুখোমুখি কথো কথো কইবে না। হাসবে, কথা বলবে চেষ্টা করে। সকলে তাকে টানবে হৃদয়ের টানে, যেমন তাকে কৈশোরে টেনেছে। আর সবার উপরে আছে না। এই একটি জায়গা যেখানে এলে পাখা ওটিয়ে বসতে পারে বাসু। ইচ্ছে না করেও ফিরে যেতে পারে সেই আনন্দময় উৎসে—তার ছোটবেলায়।

কিন্তু ভাল লাগছে না বাসুর। যে ছরস্তু স্রোতে গা নেনে দিয়ে ভেসে যাবে ভেবেছিল সে, সে স্রোত নেই। শুক নিখর জলে বাসু বার বার নিষ্পেষিত চেহারা দেখে নিষ্পেষিত অস্থির হয়ে উঠছে।

॥ তিন ॥

কাঞ্চলদির বাড়ির চারদিকটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

বাড়িতে চুকবার মুখে মস্ত দরজাওয়ালা যে গেটটা সেখানে ঠাঁড়ালে এ বাড়িটা অনেকটা বই-এ পড়া তপোবনের মত মনে হত বাসুর। বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ, আর ফুলের গাছে সারা বাড়িটা ডরা। এই গাছের ভিড়ে নিত্যন্ত সামান্য টিনের পাঁচ ঢালা ঘরখানা যেন বড্ড বেমানান। কাঞ্চলদি বলত, এটা বাড়ি নয়, বাগান পাহারা দেওয়ার ঘাঁটি।

অনেকদিন পরে আজ আবার সেই বাড়িটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল বাসু। বোধহয় পাঁচ বছর পরে। প্রায় তেমনিই আছে বাড়িটা। তবে সামনের বাগানটার যেন কিছুটা অবস্রের ছাপ। বাসুর মনে পড়ল, কাঞ্চলদির বাড়ির এই দিকটাই ওর ভাল লাগত সবচেয়ে বেশি। গেট থেকে বাড়ি পর্যন্ত যেতে গাছ পাতার ভেতর দিয়ে যে-পথ সেই পথটার একপাশে একটা উঁচু চারকোণা বাঁধানো জায়গা। অনেক গরমের বিকেলে এখানে বসেই গল্প করেছে ওরা চারজন। বাসু, কাঞ্চলদি, গীতু আর নরেশ। কোনো কোনোদিন এ আগরে কেদারদাও আসত। এই বাঁধানো জায়গাটার ওপারেই একটা কাঁঠালি চাঁপার খোপ। কাঞ্চলদির বাড়ির কথা মনে হলেই যে স্মৃতিটি বাসুর মনে আসে তা ওই কাঁঠালি চাঁপার গন্ধে সুরভিত।

দরজার মুখে ঠাঁড়িয়ে বাড়িটির দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখল বাসু। সরু পথটার ওপর আরগাছের শুকনো পাতা পড়ে আছে। ছায়া ছায়া বাড়িটার আর যেন সেই আনন্দ নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ। এ বাড়িতে লোক আছে কি নেই, বাইরে

থেকে একটুকুও বুঝতে পারা যায় না। শুধু কাঞ্চলদির ঘরের চিনের চালটার ওপর থেকে একটা অলস ধোঁরা যেন একেবেঁকে উঠে উঠে কিসেন ভোগ আমগাছটার মাথায় চাপ বেধে আছে। আর সারা বাড়িটা ভরে একটা দম আটকানো পুরোনো গন্ধ। গন্ধটা নাকে যাওয়ার সাথে সাথে একটা তীক্ষ্ণ হুঃখ যেন বাসুর রক্তে ব্যথিয়ে উঠলো। নেই—কিছু নেই। সেই দিন না, সেই বাড়ি না, কাঞ্চলদি গীতু না, এমন কি সেই বাসুও না।

বাসু একবার ভাবল, ফিরে যাবে। আবার কি মনে করে একপা ছুপা করে এগিয়ে চলল। ঠিক বাড়িতে ঢুকবার দরজার মুখোমুখি এসে দাঁড়াতেই বাড়ির ভেতর থেকে যে মেয়েটি এসে দাঁড়ালো বাসুর সামনে তাকে চিনতে একটুকুও কষ্ট হল না তার। গীতু।

এমনি ভাবে গীতুর মুখোমুখি হবে বাসু তা ভাবেনি। বোধহয় গীতুও ভাবেনি একথা। প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই, বাসু মুখ তুলে দেখে গীতু কখন সরে গিয়েছে সেখান থেকে আর কলকণ্ঠে ছুটে আসছে কাঞ্চলদি।

বাপরে! তুই কি ভীষণ ভদ্র লোক হয়েছিস রে? ছুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস দোরগোড়ায় এসে?

একটু হাসল বাসু। প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে।

আয় ভেতরে আয়। তোর সাথে ঝগড়া করব আজ। গীতু, বসতে দে বাসুকে।

এতক্ষণে ভাল করে কাঞ্চলদিকে দেখল বাসু। কাঞ্চলদির হাতে গোবর মাখা। বোধহয় উঠোন নিকোচ্ছিল। প্রতিদিন উঠোনে গোবর দেওয়া কাঞ্চলদির এক বাতিক। ঝকঝকে তকতকে উঠোন সেই কালে কতবার যে নষ্ট করে দিয়েছে ওরা তার ঠিক নেই। তবু কিছু বলেনি কাঞ্চলদি। আজ অনেকদিন পরে সেই কাঞ্চলদির মুখের দিকে একবার তাকালো বাসু।

কি দেখছিস এমন হাঁ করে? কাঞ্চলদি প্রশ্ন করল।

কিছু না।

কোনো উত্তর না দিয়ে হাসল কাঞ্চলদি। অনেকক্ষণ নিপুণ হাতে উঠোন নিকিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, একটু বস। আমি হাতটা ধুয়েই আসছি।

[ক্রমশ]

চলচ্চিত্র

পরশ পাথর : প্রযোজনা : প্রমোদ লাহিড়ী, কাহিনী : পরশুরাম অবলম্বনে, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সত্যজিত রায়, সংগীত : রবিশঙ্কর, আলোকচিত্রশিল্পী : সুব্রত মিত্র, নিয়ন্ত্রণদর্শক : বংশীচন্দ্র গুপ্ত, শব্দযন্ত্রী : হুর্গাদাস মিত্র, সম্পাদক : হুলাল দত্ত, ভূমিকায় : তুলসী চক্রবর্তী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, রাণীবালা, হরিধন, জহর রায়, বীরেশ্বর সেন, মণি শ্রীবাসী, সন্তোষ দত্ত, প্রদোশকুমার বসু, শ্যামসুন্দর আগরওয়াল, শিউরামদাস আগরওয়াল, খগেন পাঠক, শ্রীমান মানস এবং আরো অনেকে ।

হল থেকে বেরুতে বেরুতে বন্ধুর বন্ধন তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়াকে একটি বিস্ময় বাক্যে ঘনীভূত করে বলেন 'এ্যামেজিং কেস', তখন আপত্তি জানিয়ে বলেছিলাম 'এ্যামেজিং' নয়, বরং সত্যজিত বাবুর কাছে ঠিক এমনটিই প্রত্যাশিত । অথবা বলতে পারেন প্রতিভাই পরশ পাথর ।' বলা বাহুল্য, বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটেনি ।

ছবিটির প্রতিটি পর্যায় মনের মধ্যে ইলোড় বাধিয়েছে । এ বলে, আমি আগে ও বলে আমি আগে ।

ডালহোসি স্কোয়ার, কার্জনপার্ক, পরেশ দত্তের পাথরপ্রাপ্তি, পণ্টুকে সমর্পণ, পণ্টুর পণ্টনের স্বর্ণাভবন, পরেশ দত্তের পাথরটি হস্তগতকরণ, পরীক্ষণ ও আনন্দাভি-শয্যে অক্ষমোচন, বুলিয়ন মার্কেট, ট্যাক্সি যাত্রা, দিবাস্বপ্ন, শিউটিনির গোলা, মিটিং ও ভাষণ, সেক্রেটারির সঙ্গে আলাপপ্রসঙ্গে যাত্রার পাঠোচ্চারণ, প্রোটা গিল্লীর সঙ্গে কণ্ঠহার হস্তে প্রেমভিনয়, কক্টেস পার্টি, নেশাস্তরের স্তব্ধ ভাব, কপারাম সকাশে ফরমুলা প্রকাশন, শেয়ার মার্কেটের ডামাডোল, পরেশ দত্তের সপত্নীক পলায়ন, ইন্সপেক্টরের ঘোরার উত্তর দান, প্রিয়তোষের প্রেমলীলা ও পরশপাথর গলাধঃকরণ, ডাক্তারের পরীক্ষণ, স্বর্ণের পুনর্মৌহত্ত্বতা, অর্থ মুক্তি—ইত্যাদি প্রতিটি পর্যায় উপস্থাপনে, অর্থে, ইচ্ছিতে এমন প্রাপকন্ত যে, প্রতিটি পর্যায় নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করলে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় ।

পাত্রনির্বাচনের এমন আশ্চর্য দক্ষতাও তো এমন করে আর চোখে পড়েনি । পরেশ দত্ত, গিরিবালা, প্রিয়তোষ, ভদ্রুয়া, কপারাম, থানা ইন্সপেক্টর, পুলিশ অফিসার এদের ভূমিকায় যথাক্রমে তুলসী চক্রবর্তী, রাণীবালা, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, গঙ্গাপদ বসু, বীরেশ্বর সেন ও হরিধন ছাড়া যেন আর কাউকেই কল্পনা করা যায় না । পণ্টু, পণ্ডিত মশাই, সোনা বেচার হিড়িকে দেখানো একটি বন্ধ ও একটি বন্ধা, শেয়ার মার্কেটের লোকজন, ড্রাইভার, গাড়োয়ান এরা শুধু চেহারাতেই পরিস্থিতিকে জীবন্ত করে তুলেছেন । পণ্ডিত মশাইয়ের কণ্ঠে "সংস্কৃত এটা" চিরকালের পণ্ডিত কণ্ঠ হয়ে বেজেছে আর ঈশ্বিত রসস্রষ্টাও হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে । এমনি সর্বত্র ।

এমন একটা কথাও কাউকে দিয়ে বলানো হয়নি যা ছবিটির প্রাণবন্তর পরিপোষক নয়। পশ্চুর মুখের হলদে সবুজ ওরাং ওটাং ইটপাটকেল চিংপটাং, মুশকিল আসান উড়ে মালী, ধর্মতলায় কর্মখালি' এবং পরেশ দত্তের মুখে এর অনবস্ত পুনরুচ্চারণ প্রথম থেকেই আমাদের একটা ফ্যান্টাসির পরিমণ্ডলে এনে কলে। পরেশ দত্তের কয়েকটি বচন ও বাচন, যেমন, “এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে হবে’ বা প্রিয়তোষের কাছে ঐশ্বর্যের বহুস্ত বর্ণনা এসঙ্গে সোনা থেকে টাকা, টাকা থেকে বাড়ি, গাড়ি, তোমার চাকরি, মায় কালকের কেলেকারি (ইংরেজী ‘ব্যাখাজ’-এর একটি চমৎকার উদাহরণ), অথবা, প্রিয়তোষ এনগেজমেন্ট কন্যাতে বলায় “এরা যে আমাকে চায়” বলা, অথবা হরিধনের “গিলেন কেন” এ কথাগুলোই হাসির নিউটিনি গোলা।

অভিনয় এসঙ্গে বলা যেতে পারে কেউই অভিনয় না ক’রে অভিনয়ের চরন উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। তুলসী চক্রবর্তী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর সেন, হরিধন, জহর রায়, রাণীবালা, এরা প্রত্যেকেই যাঁর যাঁর ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনয় কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। হাসির আড়ালে নিটোল অশ্রুবিন্দুটি টলমল করে ওঠে পুলিশের কাছে পরেশ দত্তের স্বীকারোক্তিতে। ফোনে বিদ্যুৎতরঙ্গের মধ্য দিয়ে দুটি হৃদয়ের সংযোগ ও বিচ্ছেদ আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় রসোত্তীর্ণ হয়েছে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে।

বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরে ঘরে প্রবেশ করা মাত্র ধাতু পাত্রে পতন থেকে আরম্ভ করে হরিধনের হিটলারি সজ্জা পর্যন্ত অসংখ্য ঘটনা ও পরিবেশের সূক্ষ্ম প্রতীকশ্রোতকতা ছবিখানিকে বুদ্ধিপরিপূর্ণ শ্রিতরসে অভিষিক্ত করে রেখেছে। স্ট্যাচুর মাথা নাড়া, মাইকের যান্ত্রিক আওয়াজ, মাখায় ডাবের জল ঢালা ইত্যাদি সাধারণ ও অসাধারণ ঘটনা রচনাটির স্টাটারারকে তীব্রতর করে তুলতে সাহায্য করেছে। কক্টেল পার্টির দৃশ্যটি তো আমাদের কুচিবিকার ও অপসংস্কৃতির জাতীয় প্রদর্শনী।

প্রতীকশ্রোতকতার শক্তি সংগীতে সুপ্রচুর। রবিশঙ্কর এই শক্তির আনাগোড়া সহ্যবহার করেছেন। ছবিখানির সাফল্যের অর্ধেক কৃতিত্ব এই গুণী শিল্পীর। একখানি পূর্ণাঙ্গ কণ্ঠসংগীত আছে ছবিটিতে। গিরিবারার কণ্ঠে টপ্পা চালে গীত এই গানখানি অবিস্মরণীয়। প্রকৃতির এবং অপ্রকৃতির তুলসী চক্রবর্তীর স্বকণ্ঠে গানের যে দু একটি কলি উদ্গীর্ণ হয়েছে পরিবেশ অমুযায়ী তা অনবস্ত। যেমন, কক্টেল পার্টিতে ‘মুরলী কী বুনি সুন’ এবং ‘আমি দেখে এলেন তারে’ অথবা গিরিবারার সঙ্গে প্রেমভিনয়ে ‘আমি দোবনা, দোবনা’। পরিবেশকে রসময় করে তুলতে এই সব ডাঙটা সুর এবং গায়নভঙ্গী প্রচুর সাহায্য করেছে। ডালহোসির যান্ত্রিকতা, ভজুরার বাস্তবতা বা ভটস্বতা যন্ত্রের এসাদেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কক্টেল পার্টিতে কাকার আনন্দে পরেশ দত্তের মুখে বোল উঠেছে—কক্টেল কক্টেল, ‘আর সঙ্গে সঙ্গেই ভজুরার বোল উঠেছে তারই অল্পকরণে, যা সমস্ত দর্শকের মনকেই নাচিয়ে ছাড়ে।

হুজ ও বহু হুই’ অর্ধেনই ক্যামেরার কেরাভতি অবশ্যই প্রশংসনীয়। যেমন অকিল শেকের ত্রস্তব্যস্ত ডালহোসি, ধরুদ্বিগ্নাত এসপ্ল্যানেন্ড, পরেশ দত্তের অঙ্গর মহলে জীর সংগে হাসানদিস্তে লোনা করার পরে উল্লসিত অবস্থার দৃশ্যটি, এবং এমনি আরো অসংখ্য।

বারবার বলছি, ছবি দেখে খুশি হয়েছি, অভিভূত হয়েছি। কিন্তু একথাও বলব যে ১৯৬৬ সালের (১) সোনা বেচার মরুভূমে দীর্ঘ কমেটারি ডাল লাগেনি। শেয়ার মার্কেট আর সোনা বেচার হলোড় এবং কক্টেল পার্টির একটানা দৈর্ঘ্য গল্পের গতিকে একটু মত্ত করেছিল। পরেশ দত্ত ট্যাক্সিতে উঠতেই ভিথিরির পয়সা চাওয়া এবং পরেশ দত্তের প্রত্যাখ্যান দ্যোতক হিসেবে দুর্বল মনে হয়েছে। শব্দগ্রহণ সর্বত্র সমান হয়নি। বিশেষ করে ছবি শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই জানালায় পল্টু-পরেণ সাক্ষাৎকার শব্দগ্রহণের ক্রটির জন্যে কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে হয়েছে।

পরিশেষে, সংগীত পরিচালনা সম্বন্ধে একটি নিবেদন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করি। পথের পাঁচালী, অপবাজিত ও পরশ পাথর তিনখানি ছবি পর্যালোচনা করলে রবিশঙ্করের সংগীতপরিচালনার মূলগত ঐক্য ধরা পড়ে। তিনখানি ছবিতেই তিনি প্রধানত তিনটি যন্ত্রকে ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সেতার, তবলা (বা ঢোল,) এবং বাঁশি। তিনখানি ছবিতেই একটি বাদী-স্বর (বিশেষ কয়েকটি স্বরসংযোগ) আছে যেটি ছবির আত্মটিকে কেন্দ্র করে উৎসারিত। এই স্বরটি মাঝে মাঝে পুনর্ধ্বনিত হয়। আর অনুবাদী কিছু স্বরসংযোগ বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আলোচ্য ছবিটিতে পরশ পাথর ছোঁয়াতে যাবার সময় একটি ক্রতস্পন্দমান টুং টুং ধ্বনি—কণন বা মণন। ক্রততা, যান্ত্রিকতা বা উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে তবলালহরার প্রয়োগ তিনটি ছবিতেই আছে। স্বর সংযোজনায় এই প্রক্রিয়া আমাদের বিমুগ্ধ করেছে। তবু বলছি, চতুর্থ অবদানে তিনি যদি প্রতীকাস্তর চিন্তা না করেন তা হলে নতুন সৃষ্টির গৌরব পুরোপুরি নাও পেতে পারেন। তাঁর কাছে অপরিণীত আশা নিয়েই আমরা একথা বলছি।

॥ জ্যোতিভূষণ ॥

লোহ কপাট : এল বি ফিল্মস ইন্টারন্যাশনাল, কাহিনী : জরাসন্ধ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : তপন সিংহ, সংগীত পরিচালনা : পঙ্কজ মল্লিক, শিল্পনির্দেশনা : সুনীতি মিত্র, শব্দগ্রহণ : অতুল চট্টোপাধ্যায়, চিত্রগ্রহণ : বিমল মুখোপাধ্যায়, সম্পাদনা : সুবোধ দত্ত, ভূমিকায় : ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, ব্রজেন চট্টোপাধ্যায়, মালী সিংহ, মঞ্জু দে এবং আরো অনেকে।

চোর, ছোচ্চোর, খুনী, পকেটমার, ডাকাত—বিচিত্র প্রকৃতির এই অপরাধীদের জীবন মনুষ্যসমাজে স্থগিত এবং অবহেলিত। কিন্তু মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলো যে এদের জীবনের অঙ্গের বহির্ভূত নয় এবং সমস্ত অপরাধপ্রবণতা সত্ত্বেও এদের জীবনের গভীর সত্য যে মনুষ্যত্বের শাস্ত মহিমা বিরাজিত—লেখক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাঝে এ জিনিস আবিষ্কার করেছেন এবং অভ্যস্ত দরদী মন নিয়ে ‘লোহ কপাট’-এ স্টে বহু চরিত্রের মাঝে তা ব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। বিক্ষিপ্ত বহু ঘটনার মাঝে বিচিত্র প্রকৃতির বহু মানুষের ভিড় জমে উঠেছে এখানে।

তপন সিংহ রচিত 'লৌহ কপাট'-এর চিত্র রূপ দেখে মনে হোলো, পরিচালক ঐশ্বর মূল বক্তব্যকে বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁর সেই প্রচেষ্টা কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে সেটাই বিচার্য বিষয়।

জেলর, পকেটনার, বড়ী আন্না, কাফী ইত্যাদি চরিত্র বাদ দিয়ে ধরলে দেখা যায় ঐশ্বর থেকে তিনটি ঘটনা চয়ন করে ছবিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

প্রধান তিনটি ঘটনার মাধ্যমে যে চরিত্রগুলোকে ছবিতে প্রত্যক্ষ করা যায় তা থেকে ছবির মূল বক্তব্য অটুট আছে কিনা সেটা প্রথমেই অনুধাবন করা প্রয়োজন। আনাদের মনে হয়েছে মূল বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রধান ঘটনা তিনটির চরিত্রগুলোকে একটু বিশ্লেষণ করলেই আনাদের বক্তব্য পরিষ্কার হবে আশা করি।

এক নম্বর : ভদ্রসন্তান যতীন—চোর। জেল থেকে বেরিয়ে সে সমাজের কাছে উপেক্ষা আর অবজ্ঞাই লাভ করলো পদে পদে। জীবনটাকে শোধরাবার কোনো সুযোগ সে পেল না। সুতরাং পঙ্কিল পথই তাকে বেছে নিতে হোলো আবার। এখানে সাধারণ মানুষের অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে সমাজের গলদ ধরা পড়ে, আমাদের ক্রটি আনরা বুঝতে পারি এবং সেজন্য অপরাধী যতীনের প্রতি স্বতঃই সহানুভূতির উদ্রেক হয়।

দুই : বদর মুন্সী—ডাকাতির সর্দার। তার দুর্দান্ত জীবনে অনেক ডাকাতি সে করেছে, কখনো ধরা পড়েনি। পূর্বজীবনের পুঞ্জীভূত অপরাধ তার মনকে কখনো নাড়া দেয়নি। কিন্তু শেষবার ডাকাতি করতে এসে যখন সে ধরা পড়লো তখন বদর মুন্সী ভিন্ন লোক বনে গেল। ধরা সে পড়তো না, ইচ্ছে করেই ধরা দিল। ডাকাতি করতে এসে বিশেষ এক দুর্বল মুহুর্তে তার হৃদয়ে আপত্যস্নেহ জাগরিত হওয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির সন্তুবিবাহিত কন্যাকে সমস্ত ধনসম্পত্তির বদলে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু তার অজ্ঞাতে তারই দলের দুর্জন কর্তৃক কন্যাটি অত্যাচারিত হোলো—এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার সংগে সংগে বদর মুন্সীর মনপ্রাণ প্রানিতে ভরে গেল। দলের সবাই পালালো। পালিয়ে গেল না শুধু বদর মুন্সী। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে অত্যাচারীকে বাঁচিয়ে নিজেই সমস্ত দোষ কবুল করে নিল। বদর মুন্সীর অপরাধবোধ কতখানি তীব্র তা তার কথাতেই প্রমাণ—আমি দল না গড়লে তো নেয়েটির এ সর্বনাশ হোত না। সুতরাং আসল দোষী আমিই।

বদর মুন্সীর এই স্বীকারোক্তির মাঝে মহত্ত্ববোধের যে উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়—তাতেই তার সমস্ত পাপ স্থালন হয়ে যায় মুহুর্তে, তার প্রতি সহানুভূতি ও আন্তরিক কারুণ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উৎসারিত হয়ে ওঠে। আবেগের সংগে দেখলে একথাই মনে হবে। কিন্তু ধরুন এই ডাকাতির সময় ঐ দুর্বলতাটুকু যদি না জাগতো বদর মুন্সীর মনে ? - এ প্রশ্ন তুললে বদর মুন্সীর চরিত্র দাঁড়ায় কোথায় ?

তিন : ফকীর ও কুটি বিবি। নির্ধন বৃৎসতার প্রতীক ফকীর। অলৌকিক প্রক্রিয়ার অর্থপ্রাপ্তির মোহম্বল বিস্তার করে ভুলিয়ে নিয়ে এসে তার বিবির সহায়তায় কত যে নিকলুস প্রাণকে রাত্রির অন্ধকারে জ্যান্ত কবরস্থ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এ রকম মানুষ এককথায় সমাজদ্রোহী। অমার্জনীয় সে অবশ্যই।

সুতরাং আইনের বিচারে তার কাঁসীর হকুম হোলো। এটাই স্বাভাবিক এবং সেজন্য তার প্রতি বিন্দুনাথ সহানুভূতি জাগা উচিত নয়। কিন্তু ছবিতে কাঁসীর পূর্বে ফকীরকে তার যুবতী বিবির জন্য আকুলি-বিকুলি দেবিয়ে চরিত্রটির প্রতি যে সহানুভূতি আকর্ষণের প্রচেষ্টা তার মধ্যে সংগত যুক্তির অভাব রয়েছে। আর কুটি বিবিকেও প্রথম থেকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রায়িত করা হয়েছে তার জন্যও উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত না হওয়ায় কুটি বিবিও আদৌ বলিষ্ঠ চরিত্র হতে পারেনি। ফকীরের কাঁসীর খবরের পর কুটি বিবির স্বামীর প্রতি পতিধর্মের স্বাভাবিক আবেগ প্রকাশের মাধ্যমেও অসাধারণ কিছুই প্রকাশ পায়নি।

সুতরাং যুক্তির খাতিরে চিত্রনাট্য সম্পর্কে একটি মৌল প্রশ্ন ওঠে যে মানবিক আবেদনের মূল বক্তব্য বদর মুঙ্গী এবং এই ফকীর ও কুটি বিবি চরিত্রের জন্যই ব্যাহত হয়েছে এবং তারপর এ ছবির কি কোনো সার্থকতা থাকে? এটাই চিত্রনাট্যের মূল এবং মারাত্মক ত্রুটি। কাজে কাজেই বলবো 'লোহ কপাট' ছবিটি জনকল্যাণ এবং জনশিক্ষার বাহন রূপে সৃষ্টি হবার পরিবর্তে ঠিক তার পরিপন্থী রূপে দেখা দিয়েছে।

চিত্রনাট্যের আরো দুর্বলতা আছে। দরদী স্বেলর মলয় চৌধুরী, যার দৃষ্টিতে সমস্ত ঘটনাগুলি ব্যস্ত, সেই স্বেলর-চরিত্রটি উপযুক্ত গভীরতায় বর্ণিত হয়ে প্রতিভাশালিত হয়নি। কাঁসীর মত একটি মনোরম চরিত্র—তাও সূক্ষ্ম পরিচালনার অভাবে আশাহুরূপ-ভাবে পরিস্ফুট হয়নি। এই দুর্বল দিকগুলি না থাকলে চিত্রনাট্য ও পরিচালনার জন্য প্রাপ্য কৃতিত্বের গৌরব জানাতে কুঠা ছিল না।

ভরুণ পরিচালক ভপন সিংহ প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছেন ইতিপূর্বেই। তাই এ ছবিতে আরো বেশি আশা করেছিলাম, আশাদের সে-আশা পূর্ণ হয়নি।

ক্যামেরায় উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির অভাবও যেমন লক্ষ্য করা গেছে তেমনি সূক্ষ্ম কাজও আছে। যেমন, সম্ভ্রমুক্ত অপরাধী চোর যতীনের পক্ষিল পথে অধোগতির স্তরে পুনরায় অঙ্গসর হওয়ার প্রতীকী দৃশ্যটি। শুধু ক্যামেরার কাজই নয়, পরিচালকের সূক্ষ্মদর্শিতার দৃষ্টান্ত হিসাবে দৃশ্যটি স্মরণীয় এবং রম্যোত্তীর্ণ।

একথা স্বীকার যে ছবিটি দেখে এক নতুন অহুভূতি নিয়ে ফিরতে হয়। যা অন্য-স্বাদিতপূর্ব। বদর মুঙ্গী এবং ফকীরের এসংগ অবশ্য বাদ দিয়ে—একথা বলাই বাহুল্য। দাগ না দিলেও উদ্ভেজিত চিন্তার খোরাক জোগায়—কেন আগেই তা বলা হয়েছে।

অভিনয়ে প্রথমেই নজরে পড়বে বদর মুঙ্গীর ভূমিকায় কমল মিত্রকে। কমল মিত্র তার ব্যক্তিত্বের সংগে জোরালো অভিনয় দেবিয়ে চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। আর ফকীরের ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি বিশ্বাস সম্পর্কেও একই কথা। ভাসু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও একধেরেমির উর্ধ্ব নতুন ভাবে দেখা গেল। আর নতুনভাবে পাওয়া গেল কাঁসীর ভূমিকায় মালা সিংহকে এবং কুটি বিবির ভূমিকায় নজু দে-কে। উল্লেখযোগ্য অল্প ভূমিকাগুলিতে আছেন নির্মলকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সংগীত পরিচালনা ছাড়া অগ্রাঙ্ক বিভাগের কাজ মোটামুটি ভালই। শিল্প-নির্দেশনার কাজ বেশ প্রশংসনীয়।

পথে হোলা দেবী : প্রযোজনা, পরিচালনা ও চিত্রনাট্য : অগ্রদূত, সংলাপ : নিতাই ভট্টাচার্য, চিত্রগ্রহণ : বিভূতি লাহা, সম্পাদনা : বৈষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিল্পনির্দেশনা : সত্যেন রায়চৌধুরী, শব্দগ্রহণ : যতীন দত্ত, ভূমিকায় : উত্তম, ছবি, অল্প, পাহাড়ী, জহর গাঙ্গুলী, শ্যাম লাহা, গোপাল মজুমদার, স্মৃতি, চন্দ্রাবতী, শোভা সেন, কমলা মুখার্জী ও আরো অনেকে ।

বাঙলায় প্রথম গেডাকলার চিত্র অগ্রদূত পরিচালিত 'পথে হোলা দেবী'র কাহিনীটি প্রতিভা বসুর । ছবিটি মিলনাত্মক । বিচিত্র পরিবেশে নায়ক-নায়িকার প্রণয় ; অতঃপর ঘটনাপরম্পরায় নায়িকার আভিজাত্যগর্বী দাত্তর একত্বয়েমিহ্নিত স্মৃতিতায় উভয়ের দীর্ঘ বিরহ এবং বিরহের পর মিলন ।

প্রায় গাতানুগতিক ছকে ফেলা কাহিনী, বাস্তবের সংগে সম্পর্কহীন । চিত্রনাট্যও দুর্বল । স্বভাবতঃই চরিত্রগুলি ছাড়া-ছাড়া । সংলাপও স্থানে-স্থানে অত্যন্ত দুর্বল এবং অস্বাভাবিক । যেমন, ব্যারিষ্টার প্রমথেশ মল্লিকার গান শুনে বলছে—এটা কি জার্মান না হাঙ্গেরীয় সুর ? বাঙলা গান শুনে বিলেত ফেরৎ বাঙালী ব্যারিষ্টারের মুখ দিয়ে এমনি গবেষকের মত মন্তব্য বার হতে পারে—ভূভারতে এমন কথা কেউ শুনেছেন কি ? সংলাপের দুর্বলতার পক্ষে আশা করি এই একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট ।

গল্পের সমস্তার মাত্রা যুক্তির চেয়ে আবেগের প্রাধান্যই বেশি । এবং সেই আবেগকে বেগবান করতে সহায়তা করেছে নাট্যাংশ । সম্পাদনা মোটামুটি ভাল হওয়ায় নাট্যাবেগ বজায় থাকেছে । এবং সেজন্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে একঘেয়েমি বোধ হয় না—হয় না এতদূর আরো যে ছবিটির বর্ণসময় প্রশংসনীয় । ক্যামেরার কাজও ভাল কিছু কিছু ছায়গায়—দাঙ্গিলিংএর টুডিও সেটে তোলা দৃশ্যগুলি পরিবেশ সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটিয়েছে একথা বেশ বলা যায় ।

নায়িকা মল্লিকার ভূমিকায় স্মৃতিজার আবেগধন অভিনয় দর্শককে তৃপ্তি দেয় । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মল্লিকার সাজপোশাকের দিকে পরিচালক এত অধিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন যে ছবিখানি শাড়ি এক্সজিবিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে । উত্তম নায়ক জয়ন্তের ভূমিকায় যথায়থ । মল্লিকার ভাই রুণু চরিত্রটি বিসদৃশ—কিন্তু এই চরিত্রে অল্পকুমারের অভিনয় প্রশংসনীয় । আর প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন ব্যারিষ্টার প্রমথেশের ভূমিকায় নবাগত গোপাল মজুমদার । 'যাত্রা হোল শুরু' এবং 'পৃথিবী আমারে চায়' ছবিতে এর আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করেছি । এ ছবিতে সুরোগ কম, ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে ইনি আরো ভাল অভিনয় করতে পারবেন বলেই আমাদের ধারণা । নবাগতা কমলা মুখার্জী আরতি চরিত্রে দর্শকমনে প্রতিশ্রুতির কোনো আভাসই রেখে যেতে পারেননি । অন্যান্য উল্লেখ্যদের মধ্যে চন্দ্রাবতী, পাহাড়ী ও ছবি বিশ্বাসের নাম করতে হয় ।

আবহ-সংগীত এবং কণ্ঠসংগীত প্রশংসার্হ । অন্যান্য বিভাগের কাজও নিন্দনীয় নয় ।

॥ চিত্রালোচনী ॥

॥ গ্রন্থ-পরিচয় ॥

একালের চোখে : অচিন্ত্যশ ঘোষ । প্রকাশক : নিতালয় । মূল্য—তিন টাকা ।

গ্রন্থকারের পনেরোটি গ্রন্থের সঙ্কলন, ১৩৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থ । দু-ভাগে গ্রন্থগুলি বিভক্ত হয়েছে : লৌকিক বিভাগে আছে ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি ; একমুখবর্তী পরিবার প্রথা ; বাঙালীর পরিচ্ছদ ; সমাজে তরুণের ভূমিকা ; সনাতনী সমাজ ; করণিক প্রসঙ্গ ; মাইক সংস্কৃতি ; রবীন্দ্র জয়ন্তী ; সাহিত্যের সামাজিক দায়িত্ব এবং প্রাদেশিকতা আর অলৌকিক বিভাগে পরিবেশিত হয়েছে দেবরহস্য ; একালের ধর্মীয় উৎসব ; দোল উৎসবের উৎস ; শক্তিপূজার রূপান্তর এবং ধর্ম ।

‘একালের চোখে’-র লেখকের চোখে একালের দৃষ্টিভঙ্গীই গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে কুটে উঠেছে এ-কথা নিঃসংশয়েই বলা চলে । দৃষ্টিভঙ্গীটি একালের, রচনার আঙ্গিকও আধুনিক এবং বিভিন্ন বক্তব্য খোলসা করার ক্ষমতা বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের ব্যাপারে লেখক প্রশংসনীয় উদ্যম দেখিয়েছেন ।

এঁর চিন্তাধারা ও রচনাগুলি অধ্যয়নের পর আমার মনে হলো তথ্যানির্ভর তথ্যমূলক আলোচনায় এঁর যতটা অধিকার দ্বন্দ্বিতা, যুক্তি নির্ভর বিচারমূলক আলোচনায় তেমনি পারদ্রবতা ইনি অর্জন করতে পারেননি ।

যেমন কিনা, বইটির প্রধান গ্রন্থ গ্রন্থ ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি পড়তে পড়তে কোথাও ঝটকা লাগে না ; এখানে লেখক ‘সংস্কৃতি’-র সংজ্ঞা নির্ণয়ে এ-বিষয়ে পৃথিবীর চিন্তানায়কদের মতামত একত্র সমীক্ষা করেছেন, ব্যক্তিসত্তা আর সমাজসত্তার বর্তমান অসামঞ্জস্য যে চিরন্তন নয়, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের এবং ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সমাজসত্তার যে মৌলিক কোনো সংঘাত নেই—ইত্যাকার তব সম্বন্ধে সমাজ-বিজ্ঞানে যে-সব যুক্তি তর্ক আছে তা বেশ গুছিয়ে সহজভাবে গ্রন্থিগ্রন্থ করতে পেরেছেন । এমনি দক্ষতা লেখক আরো কয়েকটি গ্রন্থে দেখাতে পেরেছেন যথা ‘একমুখবর্তী পরিবার প্রথা’, ‘বাঙালীর পরিচ্ছদ’, ‘সমাজে তরুণের ভূমিকা’ । অলৌকিক বিভাগের গ্রন্থ পাঁচটিও সুখপাঠ্য । এই সব গ্রন্থে লেখক আপন বক্তব্য পবিত্রকৃত করার ক্ষমতা বহুবিধ তথ্য আহরণ করেছেন, স্থানে-স্থানে কথাবর্তা বেশ রসালো, স্বভাবতই বলতে হয় এ-সব গ্রন্থে লেখকের যুক্তি ও বিচারবোধ সম্পর্কে পাঠকের আস্থা জন্মে ।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অবস্থা সম্পূর্ণ লোপ পায় বাদ-বাকি গ্রন্থগুলি পড়লে । তার প্রধান কারণ হয়তো বা এই যে, ‘সনাতনী সমাজ’ ‘করণিক প্রসঙ্গ’ ‘মাইক সংস্কৃতি’ এবং ‘রবীন্দ্র জয়ন্তী’-র প্রথমার্ধ পর্যন্ত লেখক সহজ-সাধারণ রচনা ভঙ্গী ভ্যাগ করে রচনায় যে স্নেহাস্রক ভঙ্গী গ্রহণ করেছেন তা লেখক আদৌ আমন্ত্রণ করতে পারেননি । যে অস্ত্রের ব্যবহার তিনি কিছুনাড় শেখেননি সেই-অস্ত্র মনের আনন্দে বেপরোয়া চালাতে গিয়ে তিনি নিজেকেই ঝতম করেছেন, নিতান্ত করুণ এবং শোচনীয়ভাবে । হয়তো বা এই অনভ্যস্ত পথে পা বাড়ানোর ফলেই, লেখকের

যুক্তি-তর্ক-বিচারবোধ সমস্তই তখনকার মতো মাথায় উঠে গিয়েছিলো, শ্রেষাঙ্ক রচনাভঙ্গীর মারাত্মক পিচ্ছিল পথে অনবরত পা হড়কে গিয়ে লেখক কেবলই উন্টোপাণ্টা কথাবার্তা বলেছেন, বুদ্ধি এবং কাণ্ডজ্ঞান বিপর্যস্ত হয়ে যাবার ফলে হঠকারিতার চূড়ান্ত করেছেন, সমস্ত বাঙালী সমাজ সম্পর্কে নির্বোধ উক্তি করেছেন অবিশ্বাস্যরকম।

অথচ ভরসার কথা এই যে সেই একই লেখক যখন ‘রবীন্দ্র-জয়ন্তী’ শীর্ষক একই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে ঠাট্টা-টিটকিরির চূড়ান্ত ক’রে এবং তার ফলে নিজের অজান্তে নিজের গালেই চুন-কালি মাখিয়ে অবশেষে হঠাৎ সে-পথ ছেড়ে দিয়ে গভীর সহজ-সরল রচনার পথে পা বাড়িয়েছেন, তখন লক্ষণীয় এই যে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই লেখক সুস্থ বিচারবুদ্ধি ফিরে পেয়েছেন, কথাবার্তায় শালীনতার স্বাক্ষর লেগেছে, যুক্তি-তর্কও যথাযোগ্য হয়ে উঠেছে। ঠিক এই একই হুর্ঘটনা ঘটেছে ‘প্রাদেশিকতা’ শীর্ষক প্রবন্ধে, তবে উন্টোভাবে, সেখানে প্রথমাংশ সুস্থ সহজ কিন্তু শেষাংশ বিরজিকর।

‘সাহিত্যের সামাজিক দায়িত্ব’ শীর্ষক প্রবন্ধটিতে লেখক যে-প্রণালীতে সাহিত্য সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ একটি রচনা কেঁদেছেন, সেই প্রণালীতে বিজ্ঞান-পাঠ্য রচনা-বইগুলিতে গোক ঘোড়া কুকুর ইত্যাদি সম্বন্ধে রচনা লেখা হয়ে থাকে। সাহিত্যের দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু লিখবার দায়িত্ব এঁকে যদি গ্রহণ করতেই হয় তাহ’লে এমনি রচনা-প্রণালী বর্জন করাই বোধ করি সমীচীন হবে।

কল্যাণ কর

অন্তঃশীলা : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাক্। সাড়ে তিন টাকা।

বৃত্ত : সঞ্জয় ভট্টাচার্য। নিউ স্ক্রিপ্ট। ছ’টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

‘জনপ্রিয়তা’ বস্তুটা হাড়ে-হাড়ে শয়তানের মতলবে তৈরী। এর আদর বাড়লে গুণের কদর করা হয় কিনা সে প্রশ্নটা বিবেচ্য। আরওণে বধিত হয়ে জনপ্রিয়তা আপন রাজস্ব চালাতে যদি পারে—তবে সে একটা মনোরম ও কাঙ্ক্ষিত ব্যাপার। কিন্তু সে-জিনিস সম্ভব করতে হলে জনমানসের পরিমণ্ডল সম্পূর্ণ সুন্দর আর সুস্থভাবে তৈরী হওয়া দরকার। বিশেষ করে, বিচারের অর্থে, বুদ্ধির অর্থে, মানবিক অর্থে। এরকম প্রস্তাব শিল্পের ক্ষেত্রে রীতিমত ভাবে পাশ করাতে হয়। নতুবা শিল্পের জ্ঞানের প্রশ্ন সংকটোভিমুখী হয়ে পড়ে। সুস্থ ও সুরুচিসম্পন্ন জনমাজসের অস্তিত্ব পুরোপুরি ভাবে কোনো দেশেই আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। অমুপাতগত প্রশ্নে খুব একটা হর্ষস্টিকারক উত্তর পাওয়া-ও কঠিন সমস্যা সব দেশেই। আর এবিষয়ে রীতিমত ভাবে নৈরাশ্রজনক অবস্থা বাংলাদেশে মিলছে। নতুবা সাহিত্যের সংকট এত ভীষণ কেন এদেশে? জনতার রুচির পরিবর্তন আনবেন সাহিত্যিকরা, শিল্পীরা, সৌন্দর্যসেবীরা, রুচির পরিবর্তন আনতে গেলে কি পরিমাণ সাধনা আর আঁয়াসের মুখোমুখী হতে হয়—এ জ্ঞান এখানকার শিল্পজ্ঞানীদের অনেকেই মনে রাখেন না। জনতার মজি যেদিকে যায়, তাদের রুচি যেদিক বস্তু আশ্বাদ চায়, তাদের বুদ্ধি

বিচার যেরকম আয়াসহীন আশ্রয় খোঁজে—এ দেশীয় অধিকাংশ লেখকরাই সে সমস্ত বিষয়ে জনমেজাজকে বশ করবার জন্যে সাহিত্যে বাতুলতা বিস্তার খেল দেখাচ্ছেন। সাহিত্যের আত্মচরিত্র দর্শন সদ্ভাবে সম্পন্ন না হলে বিপদের দ্বাস ঘটবে না।

ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন, ‘সত্যাকারের নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিত নয়, চিন্তাশ্রোতের বিবরণ থাকবে, হয়ত কোন সিদ্ধান্তই থাকবে না, কীটগের নেগেটিভ কেপেবিলিটি থাকবে; তবে শ্রোত যে বইছে তার ইঙ্গিত থাকবে, একটা ঘটনা ঘটুক, অমনি ঝড়কুটো যেমন শ্রোতে ভেঙ্গে যায়, ঘটনাটি তেমনি বিলিষ্ট হয়ে যাবে। অন্তঃশীলা গতির ইতিহাসই হলো পিওর নভেল কারণ সেটি সাস্থিক মনের পরিচয়।’ ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন তাঁর অন্তঃশীলার নায়ক খগেনবাবুর মুখ দিয়ে। তবে এখানে অধিকতর কিছু বলা বাঞ্ছনীয়। ঘটনাস্রোত জীবনের অপরিণীত পরিধির অন্তর্গত। শুধু তা-ই নয়, প্রাণপ্রবাহের আভাস দিয়ে দিয়ে জীবনের গতিকে পথ দেয়। তা-ই ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা আমরা জীবনস্পন্দমানতার লক্ষণ পাই। চিন্তাস্রোত ঘটনাস্রোতের আগে আগে দৌড়লে আমরা বাস্তববঞ্জিত মানসিকতার বেশ কিছুটা প্রশ্রয় দেব। চিন্তাস্রোত পেছন থেকে ঘটনাস্রোতকে চালাবে। জীবনগত অমুভূতিকে বুদ্ধিগত অমুভূতির সঙ্গে লাগিয়ে দিলে সুন্দরতম জীবনবোধ তৈরী হয়। কিন্তু জীবনগত অমুভূতির থেকে বুদ্ধিগত অমুভূতির বাস্তব দাম কখনোই বেশি নয়। আমরা বলব, জীবনগত অমুভূতি আর বুদ্ধিগত অমুভূতি এছোটোর হরগোরী মিলন হলে রুচিবান, সুস্থ, সুন্দর জীবন পাওয়া যায়। মননধর্মী উপন্যাসের রূপটা এরকম ভাবে তৈরী হবে যেখানে আমরা জীবন থেকে নায়ককে পালাতে দেখব না। নায়ককে চিন্তাহীন মানুষ হিসেবে দেখব না। তার বুদ্ধি, বিজ্ঞা চর্চিত হবে ঘটনাসংঘাতের ভিতর দিয়ে। সাধারণ ঘটনাবহল আবেগপ্রবাহবাহী উপন্যাসের সঙ্গে মননধর্মী উপন্যাসের তফাৎ এই যে, প্রথমটাতে চিন্তাস্রোত থাকে না। আবেগ থাকে বেশি। ঘটনাস্রোত বা গল্পাংশ থাকে সমস্ত স্থান জুড়ে। দ্বিতীয়টায় চিন্তাস্রোত থাকবে। ঘটনাও থাকবে। চিন্তাস্রোতকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা দেবে ঘটনা। আবার চিন্তাস্রোতেও ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে সৌন্দর্যসেবার কাছটাকে সুসম্পন্ন করবে। আবেগ থাকবে। বুদ্ধিগত আবেগ। লাগাম ছাড়া নয়। চিন্তাস্রোত ঘটনাস্রোত ছাড়া শুধু আত্মরতিবিমুক্ত হলে, সেধরনের কারবারে মননধর্মী উপন্যাসের পরিণতি বুদ্ধদেব বঙ্গুর উপন্যাসের মতো হয়ে দাঁড়াবে।

সুখের বিষয়, গণ্ডয় ভট্টাচার্য ও ধূর্জটিপ্রসাদ আমাদের দেশে সত্যাকারের মননধর্মী উপন্যাস লিখেছেন এবং সার্থক উপন্যাস। এ দুজনের মধ্যে দ্বিতীয়জনের লেখায় জীবন ও চিন্তা পাণাপাশি পথ চলতে পেরে সকলের দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। প্রথমজনের লেখায় চিন্তা জীবনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়াতে খানিকটা দৃষ্টিকটু লেগেছে। দুজন সঙ্গী একসঙ্গে পথ চললে, একজন বরাবর এগিয়ে পথ হাঁটলে ব্যাপারটা খুব সুবুদ্ধির ব্যাপার হয় না, এগিয়ে চলা বঙ্গুর পক্ষে। এখানেই গণ্ডয়বাবুর ভিৎ অধিকতর প্রবীন বোদ্ধা লেখক ধূর্জটিপ্রসাদের উপর দিয়ে।

ধূর্জটিপ্রসাদের ‘অন্তঃশীলা’ পুরোপুরি একখানি মননধর্মী উপন্যাস। এর প্রথম

থেকে শেষাবধি যে কাহিনী তা একজন বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীর কাহিনী, নাগরিকতার পরিমণ্ডলে নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব নিয়ে নাগ করেন ঋগেনবাবু। 'অন্তঃশীলা' বইটিতে এ'রি মনোলাল!নিকেতন তৈরী হয়েছে, নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে গভীর পাণ্ডিত্যের যোগা-যোগ ঘটলে যেধরনের শুক পণ্ডিতের চরিত্র সৃষ্টি হয়, ঋগেনবাবুর চরিত্র মূলত তাই। এমন ধরনের চরিত্রের সমাজে চলতে-ফিরতে অস্ববিধে বিস্তর। কারণ, চিন্তার ওপর অগাধ বিশ্বাস রেখে গভীর একক সভা সামাজিক মানুষের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে অক্ষতা বোধ করে। ব্যক্তিত্বচৈতন্যের বিকাশ পুরোপুরি বা অনেকাংশে বা আদৌ সুস্থতার রূপ নিয়ে সম্ভব নয় যদি সমষ্টি-মানসের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ বোধ না জন্মায়। আজকের এগিয়ে চলার যুগে তেমন মানুষ-ই বুদ্ধিমান ও প্রিয়, যে মানিয়ে চলতে জানে। মানিয়ে চলতে না জানলে, নিঃসঙ্গ ভবনাপ্রবাহে মনের একটা উর্ধ্বগতি আনবার চেষ্টায় বরাবর ব্যস্ত থাকলে, যে-কোনো মানুষ আজকের দিনে তার সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও সাংঘাতিক হৃদয়হীন বলে গণ্য হবে। ঋগেনবাবু পণ্ডিত সংস্কৃতির সাধক। কিন্তু নিজস্বদ্বিনী সাবিত্রীর প্রতি তাঁর হৃদয়হীনতা অগহনীয়। বুদ্ধিসর্বস্ব মনের বিরুদ্ধে বার্গসের যে রব তোলা, তাতে ধূর্জটিপ্রসাদ সাড়া দিয়েছেন। সেসব অব লাইফ-কে বুদ্ধির ভিতর যদি বিমুখাত্র আদর না জানানো হয়, তবে সে-বুদ্ধি জীবনসন্ধান কোণে কাজে লাগাবে না। বরং মানবিক অর্থে সেরকম বুদ্ধি পাশবিক পর্যায়ে পড়ে। সাবিত্রী আত্মহত্যা করলেন। দায়ী কে? ঋগেনবাবুর চিন্তাসর্বস্ব পাশবিক বুদ্ধি দায়ী বলে আমরা মানব। স্ত্রী সাবিত্রীর অস্তিত্ব স্বীকার করেননি বুদ্ধিবাদী ঋগেনবাবু। এ হৃদয়হীনতা অক্ষমণীয়।

এ ঋগেনবাবুরও পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। রমলা দেবীর কাছাকাছি এসে সে এক নতুন অশ্রুভবের জন্ম হল তাঁর। রমলা দেবীর কাছে যখন তিনি বললেন, 'চিন্তার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস।'

রমলা দেবী পরিষ্কার কণ্ঠে তখন জবাব দেন, 'চিন্তার ওপর আমার অগাধ অবিশ্বাস। অভিজ্ঞতার বদলে, জীবনের পরিবর্তে চিন্তা করা হল সমগ্রতার বদলে অংশকে স্বীকার করা।'

রমলা দেবীর ওরকম রমণীয় উত্তর ঋগেনবাবুর চেতনার পর্দায় যে দোলা দেয়, তার দোলায় ঋগেনবাবুর মত 'ডগমেটিক ইনফেলেকচুয়ালকে' ছলতে হয়েছে। বলতে হয়েছে তাঁকে নবচেতনার সৌরভ জ্ঞান গ্রহণ করতে করতে, 'এবার যাকে ভালবাসব তার বিশেষ অস্তিত্ব আমি প্রাধ করব।' রমলা দেবীর সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক তৈরী হয়েছে পরে ধীরে ধীরে ভোরের বিনম্র আলোর মত—সে সম্পর্ককে আমরা বলি প্রেমজাত। এ প্রেম উভয়ের অস্তরের স্পন্দনে সন্মানিত হয়ে সার্থক হয়েছে। রমলা দেবীর সংস্পর্শে এসে ঋগেনবাবুর মনোনিবেশনের যে ওলট-পালট হয়েছে তা দেখে মনে পড়ে যায়, মাদাম ক্রোভিস্কির সঙ্গে দার্শনিক কোঁতের সম্পর্কের কথা। উক্ত ভদ্রমহিলার সংস্পর্শে এসে বুদ্ধিসর্বস্ব কোঁতের হৃদয়ের বিস্তর পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব নিয়ে ঋগেনবাবুর মানসিক মানের হাস্যবুদ্ধির কাহিনী নিয়ে

রচিত এ-ই বইটিতে ঘটনা ও চরিত্র খুব কন। ইন্দ্রিত দিয়ে চিন্তাপ্রবাহের পেছনকার কারণগুলো ঘটনা ঘটনের আভাসে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন, ধূর্জটিপ্রসাদের চিন্তা মন ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। কঠিন গান্ধীর্ষের পোশাক পরে প্রবন্ধ ভালো লেখা হয় জানি, কিন্তু উপন্যাস বা গল্পে এ বস্তুটির জবরদস্ত উপস্থিতি প্রীতিদায়ক নয়। তা-ই মনে হয়, আরো সরস মিষ্টতার কোমল প্রলেপ তিনি তাঁর বননের সঙ্গে বেশালে বইটি উপন্যাস হিসেবে আমাদের কাছে অধিকতর আদরণীয় হতে পারত। হয়ত-বা খগেনবাবুর চরিত্রের প্রতি নজর রাখতে গিয়ে তাঁর পথে এ-ছাড়া অন্য উপায় খোলা ছিল না। ‘বৃত্ত’ সঙ্ঘবাবুর উনিশ শ চল্লিশ সালের লেখা। ‘নিউ স্ক্রিপ্ট’ এ-বই আবার প্রকাশ করে আমাদের ধনবাদাই।

‘বৃত্ত’র লেখক সঙ্ঘ ভট্টাচার্য্যর মেজাজ ‘অন্তঃশীলা’র লেখক ধূর্জটিপ্রসাদের মেজাজ থেকে পৃথক। ধূর্জটিপ্রসাদ লঘুচপলতা বর্জন করে পুরোমাত্রায় সিরিয়স হতে শিখেছেন। অন্যদিকে সঙ্ঘ ভট্টাচার্য্য সরস মনের সঙ্গে ‘সিরিয়স-’মনের এমন একটা মিশেল দিয়েছেন যে নবজাত মনটি একটি সামাজিক সুস্থ চরিত্রগুণ অর্জন করেছে। সঙ্ঘ ভট্টাচার্য্য কবি। কোবিদ কবি। ফলে তিনি ‘মন’ বস্তুটিকে এমন এক কোঠায় উন্নীত করেননি যেখানে আমরা ধরোয়া ভাব অলুড়ব করব না। জীবনের আবেগকে খানিকটা স্বেচ্ছায় চলবার ক্ষমতা না দিলে মনে অবদমনজনিত হুজিয়ার উৎপাতের সম্ভাবনা প্রচুর। এ আশঙ্কটিকে স্মরণ রেখেছেন ‘বৃত্ত’র লেখক। স্মরণ রেখেছেন বলেই ‘বৃত্ত’র নায়ক সত্যবান ঝাঁকে লেখক নিজের মন-ভাবা-কর্ম চিন্তা ধার দিয়েছেন, ভাবতে পারছেন, ‘নিজের জীবনকে পরিচ্ছন্ন করে দেখা শুধু চোখের দৃষ্টিতে হয় না—তার জন্তে প্রাণের উচ্ছ্বাস চাই। সে উচ্ছ্বাস আসে রক্তমাংসের জীবন থেকে, বিচার বুদ্ধির মাপা শীর্ণ-জীর্ণ জীবন থেকে নয়।’

এ উপলক্ষি সত্যবানের মনে দস্তর মতো একটা নতুন প্রাণপ্রবাহের জন্ম দিতে পেরেছে। এ সত্যবানের জ্ঞান তৈরী করেছে কতকগুলো মাহুষের প্রাণ কোষ। সতী, সুরমা, রজত, বনানী, মাষ্টারমশাই—এঁরা সে-ই মাহুষ। সুরমার সমস্তা, রজতের বেনিয়ানী, বনানীর বিবাহিত-সত্যবানের প্রতি প্রেম, সর্বোপরি সতীর ভালবাসা—এগুলোর সঙ্গে সত্যবান দরদ দিয়ে, প্রাণ দিয়ে মিশেছেন। জানতে পেরেছেন। মনের সঙ্গে এঁদের নিয়ে যুক্ত করেছেন। সব কিছুর মূলে ভালোবাসার গান। এ গান এমন গান যাতে জীবনের পরিচ্ছন্ন চেহারা আরো পরিচ্ছন্ন হয়ে ধরা পড়ে। চিন্তার আর কথার মায়াজালকে জীবনের উন্নত রূপ বলে যে সত্যবান ভাবতে গিয়ে নিজসঙ্গিনী সতীর সান্নিধ্যকে জাস্তব বলে ভাবতে শিখেছিলেন, সে সত্যবান তেমন সতীকে প্রেয়েছিলেন কি? যে-সতী বনানীর সঙ্গে সত্যবানকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখে-ও নিজের মনের রূপ আর মননের ‘ভীকৃতাকে যৌন দৈর্ঘ্য’ ক্রেদান্ত করতে দেননি? যে-সতীকে দেখে সত্যবানের মনে হয়েছিল মনের দিক দিয়ে দুটি ছেলেমেয়ের মা সতীর জীবনে ফুলটপু এসে গেছে, সে-সতী—বখন বলেন, ‘পেট ভরে খাবার জন্তে বিয়ের আমার দরকার ছিল না, মনকে ভরে তুলবার জন্তই দরকার ছিল তার’, তেমন সতী সে-সত্যবানের জীবনে কি তখন এসেছিলেন, যে-সত্যবান

মানসিক প্রকর্ষের চিন্তার মূল্যে নিজ স্বীকে কুহু বলেই কেতল ভাবতে শিখেছিলেন ? সংস্কৃতিবান, মননশীল কুচিবান ভদ্রলোক সত্যবানের জীবনে এমন ভুল ভাঙ্গার দিন সে-সতীই এনে দিয়েছিলেন যাকে দেখে সে ভদ্রলোক ভাবতে পারলেন, 'সতীর শুধু দেহই নেই, আছে মন, আছে মনন।' জীবনে প্রেমের চেহারা তার মূল্যবোধ সত্যবান জানতে পারতেন না, যদি বনানী ও সুরমা সতীর পরে তার জীবনে না আসতেন।

প্রথম মহামুদ্রের পর দ্বিতীয় মহামুদ্র এসেছে। মানুষের জীবনে বছরকম প্রশ্ন নিয়ে এ ছ'ছটো মুদ্রা এসেছে। রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, মানসিক। এ-প্রশ্নগুলোর উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে সত্যতার ইতিহাস কিরকম গড়ন পাবে মানুষের হাতে এ-ও একটা প্রশ্ন। 'স্বস্ত'র চরিত্রগুলো এ সমস্ত প্রশ্নগুলোকে জীবনের প্রশ্ন বলে ভেবেছেন। কারণ জীবনবিশ্বাসের বাঁচা মরার প্রশ্ন এ-প্রশ্নগুলোর সঙ্গে ভড়িয়ে রয়েছে। যেমন সুরমা ভাবেন, 'জানো, জাত হিসেবেই আমরা কাঁপা। কেন হব না বল। সমাজে একটা যুগ দেহে আমরা ঝুলে আছি। তাছাড়া আমাদের সাহিত্য—জীবন সম্বন্ধে সত্য ইঙ্গিত বাংলা সাহিত্যে কোথাও তুনি পাবে না।' সুরমা দেবী আধুনিক সাহিত্যিকদের আরো ভাবিয়ে তোলেন, রবিবাবু শরৎবাবুর পর অতি আধুনিক সাহিত্য এল কিন্তু কোনো নতুন ভাবধারার জন্ম হল না। অবাধ যৌনযুক্তির গান গেয়ে কোনো লাভ আছে? মনে হয় রুদ্ধ, বিকৃত যৌনাবেগ কাগজের পাতায় তার ইচ্ছা পূরণ করে যাচ্ছে। এই নিউরোটিক সাহিত্যে জাত তৈরী হয় না।' অথবা লেখক-মন-পাওয়া সত্যবান প্রগতিসাহিত্য সম্পর্কে বলেন, 'যেকথা প্রগতি সাহিত্যিকরা বলে তার সঙ্গে তাদের রক্তের যোগাযোগ নেই—এমনকি বিশ্বাসের-ও দৃঢ়তা নেই। এ যেন একটা ফ্যাসান। মার্কসবাদ বাংলাদেশে এসে ফ্যাসানে পরিণত হয়েছে।' মার্কসবাদী শিশিরকে বনানী ভালো বেসেছেন। উভয়ের ব্যক্তিগত প্রেমের স্থান শিশির স্বীকার করতে চান না। তিনি মনে করেন, যুগধরা বিকৃত সমাজকে সুস্থ করা এখন দরকার। কাজেই থাক না আবেগ অমুভূতি আপাতত শিকের তোলা—মনে করই তার দরকার নেই—স্নেহমমতা প্রেম আমাদের জীবনে না-ই রইল এখন। সত্যবানকে এ-প্রসঙ্গে সুরমা দেবীরই মেয়ে বনানী বলছেন, এখানেই 'ওর সঙ্গে আমার মতান্তর। যতটুকু শক্তিতে কুলোয়, মানুষ হিসেবে ত স্বাভাবিক রাখতে হবে নিজেকে? মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামে ইন্দ্রিয়রোধের প্রশ্ন কেন আসে? সত্যি বলতে কি সত্যবানদা, ওটা আমাদের ভারতীয় মনের একটা কুপ্রবৃত্তি। একটা মহৎ কাজের সঙ্গে ইন্দ্রিয় রোধটা আমরা একান্ত করে দেখতে শিখেছি।...ব্রহ্মচর্যের এই ঐতিহ্যকে কমিউনিস্টরা-ও ভুলতে পারেনি। গান্ধিবাদী সত্যবান বলছেন, 'গান্ধিজীর ডি-সেন্টে লিভেন্সন অব্ ইণ্ডাস্ট্রি ত শুধু ধনতান্ত্রিক নিগড়কে' অলগা করে দেবার জন্য তা স্বাধীনতা অর্জনের পরেকার প্রোগ্রাম না-ও হতে পারে। মার্কসের পড়ুয়া মেয়ে বনানী বলছেন, কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পথে দীর্ঘদিন যখন মানুষ আদি গ্রাম্যজীবনে অভ্যস্ত হয়ে থাকবে। মানে যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তাহীন জীবনে কণ্ঠশনড্ হয়ে, সেই অবস্থা থেকে

ইণ্ডাস্ট্রিয়েল জীবনে ফিরিয়ে আনতে আরো কত বছর লাগবে কে জানে—আর ফিরিয়ে আনাও সম্ভব হবে কিনা, তা-ও বা কে বলতে পারে? চল্লিশ সালের চরিত্রগুলো কিভাবে ভাবতেন রাষ্ট্রনীতি সাহিত্য, জীবন সম্পর্কে—তারি হৃদিশ মিলবে উপরের কথাগুলোতে। সঙ্গে সঙ্গে এটা-ও ভাবতে হবে, এ সমস্ত ভাবনার মধ্যে লেখক যেখানে নিজের ভাবনাকে মিলিছেন সেখানকার ভাবনাটা চল্লিশ সালের ভাবনা। আজ হয়ত কোথা-ও কোথা-ও তিনি বদলাতে পারেন। চল্লিশের বাংলায় বুদ্ধিজীবীদের ভাবনার এমনি রূপ জানতে না পারলে আজকের বুদ্ধিজীবীদের চেহারা যেন-সংকট ঘনিয়েছে তার চরিত্র ধরা যাবে না। বনানীর সমস্তা অনেক মেয়েরই সমস্তা। সুরমা দেবীর-ও তাই। বইটি একটা হুঃসাহসিক বই। এ বইয়ের চরিত্রগুলো থেকে অনেক চরিত্র তৈরি হতে পারে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভাষা আশ্চর্য রকম মনোরম। তাঁর ভাষার রমণীয় গতি পাঠকের মনে সৃষ্টি চরিত্র একে যায়। ভাষার এমন রমণীয়তা যার একটা আশ্চর্য রস, প্রাতিরস পাঠকের মনে দান করার ক্ষমতা আছে—বাংলাসাহিত্যে অনন্ত। প্রীতিরস যেটা বললান, সেটা ভাষার রম্যতরঙ্গ থেকে উদ্ভূত গীতিরস থেকে রূপ পাওয়া। ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষা প্রমথ চৌধুরীর মন-পাওয়া। বুদ্ধির গান্ধীর্ষ ‘অন্তঃশীলা’র ভাষার চরিত্র তৈরী করেছে। অত্যন্ত সাধারণ চলতি ভাষা যে বলার শুনে ওজন ভারী হয়ে যেতে পারে—‘অন্তঃশীলা’র ভাষা তার প্রমাণ।

উভয় পুস্তকই পাঠক মনে যে রসের জন্ম দান করে—তা শুধুমাত্র চিত্তবিনোদের রস নয়, সদ্‌চিন্তের চর্চাজনিত রস। এমন রস আহরণ করা আজকের বাঙালী পাঠকের দরকার। কেননা, কেবলমাত্র পাঠকের বৈদগ্ধ্যই বাংলাসাহিত্যের চরিত্র পাঠাতে পারে।

পবিত্র পাল

॥ স্রম-সংশোধন ॥

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ অগ্রণীতে প্রকাশিত ‘গান্ধীপথ কি অবৈজ্ঞানিক’ শীর্ষক রচনায় ৪৭৯ পৃষ্ঠা, ২৮ লাইনে মুদ্রিত :

‘I have simply lived in my’ ইত্যাদির জায়গায় ‘I have simply tried in’ হবে ; এবং

৪৮৩ পৃষ্ঠা, ৩৪-৩৫ লাইনে :

“My means are non-cooperation willing or forced, of the people concerned”-এর জায়গায় ‘My means are non-cooperation. No person can amass wealth without the cooperation, willing or forced’ হবে।

অগ্রণী

॥ দশম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৬৪ ॥

ছায়ানাটক

দেবকুমার মৈত্র

[পূর্বাহ্নস্মৃতি]

মনের অভলে নেমেছিলো স্মৃতির ডুবুরীরা। তারা যেন খেই হারিয়ে ফেলছে। অনেক ঘটনার ভিড় ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে জমে আছে। তার ভেতর থেকে ঠিক কোন ঘটনাটা ঘটেছিলো খুঁজে পাওয়া শক্ত। ছোটখাটো অনেক ঘটনা হারিয়ে গেছে স্মৃতি থেকে। যেটা মনে পড়ছে এর পরেই সেটি হলো একটি আষাঢ় মাসের ঘটনা।

আকাশে বর্ষা ঝরঝর। বাতাসে বিয়ের গন্ধ। বাড়িতে একটি বিয়ে। ছোড়দির। বাড়িতে সাজো সাজো রব, হৈহৈ হলুদুল, কেনাকাটা, ফর্দতালিকা, পুরুতপঞ্জিকার সমারোহ। বাবা তবু মামলা-মক্কেল-নথি এবং আইনের বই নিয়েই ব্যস্ত। অন্তদিকে নজর দেবার সময় নেই। মেয়ের বিয়ে, তবু না। শুধু টাকা রোজগার করা কর্তব্য। দায়। বাকি সবকিছু, সংসার দেখাশোনা, ঝকিঝামেলা সামলানো, বড়দার কাজ। মক্কেলের হাত থেকে মুহুরীর হাতে, মুহুরীর কাছ থেকে বাবার কাছে, তারপর টাকাপয়সা সব বড়দার জিম্মায়। সংসারের হাল তার দৃঢ় মুঠিতে। কিসে লাভ, কিসে লোকসান বড়দার নখদর্পণে। কিভাবে ঝরচ করলে, কোন জিনিসে অপব্যয় বাঁচাতে পারলে সংসারের সাশ্রয় হবে সেটা একমাত্র বড়দার বিবেচনাসাপেক্ষ। আর, বড়দা মানেই বড়বোদি। বড়বোদির অঙ্গুলিহেলনে বড়দার চলাফেরা-আসাযাওয়া কর্তব্যবুদ্ধি সবই নিয়ন্ত্রিত হতো।

বড়বোদি কথা বলতো কম। যেটা বলতো, পালিত হতো বেদবাক্যের মতো। নামে বড়দা, কাজে বড়বোদিই ছিলো বাড়ির সর্বময়ী কর্তা। যা সারাদিন পুজোর ঘরে কাটাতেন। অন্য কাজে নষ্ট করবার মতো সময় ছিলো না। ঝায়অন্ডায় যাই হোক না কেন বড়বোদির বিবেচনা, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো কুরসং ছিলো না। (হয়তো কুরসং ছিলো, হয়তো নজরে পড়তো সবকিছুই, তবু দেখেও দেখতেন না। কারণ, দেখলেই অশান্তি)। আর, বড়বোদি কর্তা বলেই অনেক ঘটনা মুখ বুজে সহ্য করতে হতো সকলকে। ঝায়অন্ডায় আত্মপরবোধ মানুষমানাতেরই থাকে, আমাদেরও ছিলো। ক্ষুব্ধ হতাম স্বার্থপরতা দেখে। যেনন, সকালে চা জলখাবার আমাদের সাথে বড়বোদি এবং ছেলেমেয়েরা বা বড়দা কেউই খেতো না। তাদের

জন্মে আলাদা বন্দোবস্ত ছিলো। দুধ গরম হয়ে চলে যেতো বড়দার ঘরে, পাউরুটি ডিম-মাখন-ওভালটিন আসতো তাদের জন্মে; ঘরের দরজা বন্ধ করে জলখাবার পর্ব শেষ করে তবে বাইরে আসতো তারা। বাড়ির আর সকলের জন্মে অন্য বন্দোবস্ত। চা, আটার রুটি এবং হালুয়া।

সবাইএর কথা জানি না, আমি ক্ষুব্ধ হতাম এই নির্লজ্জ স্বার্থপরতার, সেই ছেলেবয়সেও। কিন্তু সেই দুঃখ, মনের জ্বালা প্রকাশ করবার উপায় ছিলো না। একথা যদি বলি, বড়দা রাগ করবে, বড়বোদি কেঁদে লাল করে ফেলবে চোখ, আর মা বলবেন : ছি ছি, এতো ছোট মন ভোমাদের। সত্যিই আমাদের মন ছোট নয়, আমরা স্বার্থসর্বস্ব নই, এটা আমরা নিভেরা অস্তুত জানতাম। জানতেন মা-ও। তবু। সংসারের সূঁঠু নির্বাহে এই সামান্য কারণ থেকেই অশান্তি দেখা দিতে পারে, এই বুঝেই মা নীরব থাকতে চাইতেন। চাপা দিতে চাইতেন সকলের মুখ। কিন্তু সেই অশান্তি—মা-যেটা এড়াতে সর্বদা চেষ্টা করতেন—এড়ানো যায়নি। মেজদার মনের সবচাইতে দুর্বল জায়গায় আঘাত দিয়ে ফেলেছিলো বড়বোদি।

বাড়িতে একটি বিয়ে আসন্ন, তা-ও মেয়ের বিয়ে। প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সংসারের জমাখরচ বড়বোদির হাতে, কাজেই, যেখান যেখানে ব্যয়বাহুল্য সে তা নির্ধন হাতে বন্ধ করতে লাগলো। দৈনন্দিন বাজারের সাথে মেজদার কুকুরদের জন্মে বরাদ্দ মাংস আনা বন্ধ হলো। বন্ধ হলো কাবলী বেড়াল দুটির বরাদ্দ মাথাপিছু এক পো দুধ।

‘তোমার কুকুরগুলো মাংস না খেলেও বাঁচবে। আর, বেড়ালকে আনিখোতা ক’রে রোজ আধসের দুধ খাওয়ায় কেউ জন্মে শুনিনি কোনোদিন।’

প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো মেজদা। এরকম কিছু আশঙ্কা তার ছিলো না। পরক্ষণেই ফরসা ধবধবে মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। বললো, ‘আপনি অনেক কিছুই তাহলে শোনেননি।’

মুহুর্তে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো বড়বোদি, ‘কি বললে মেজঠাকুরপো?’

‘আমার কুকুরদের মাংস বা বেড়ালের দুধ বন্ধ হলে চলবে না।’

‘তুমি তো হকুম করেই খালাস। কতো ধানে কতো চাল যাকে সবদিক সামলাতে হয় সে-ই বোঝে। মধ্যবিত্ত ঘরে অতো নবাবী চলে না। তাছাড়া, তোমার দাদার হাতে বাজে খরচ করবার মতো টাকা বাবা দেন না।’

মেজদা গুম হয়ে ছিলো কিছুক্ষণ। তারপর বলেছিলো, ‘বাবা কতো টাকা দেন আর সংসার খরচের জন্মে কতো টাকা লাগে তার একটা আন্দাজ আমাদেরও আছে। শুধু শুধু মিছে কথা বলে লাভ কি।’

‘আনি মিছে কথা বলছি?’

‘হ্যাঁ।’

বড়বোদি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো কয়েক মুহুর্ত। তারপর চোখ থেকে ঝরঝর জল ঝরিয়েছিলো। সারাদিন আর জলস্পর্শ করেনি সেদিন। মেজদাও খায়নি কিছু। আর, সব শুনে বড়দাও স্নানখাওয়া না-ক’রে কাছারি চলে গিয়েছিলো বাবার সাথে।

সমস্ত বাড়িটা নিখুঁত। গুনোট খমখম। সকাল থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে হুপুর, হুপুর থেকে বিকেল, তারপর রাত হয়েছিলো।

‘তোমার এটা অন্তায় হয়েছে কমল।’ মা ডেকে বলেছিলেন মেজদাকে।

‘কেন?’

‘হাজার হলেও বড়বউমা তোমার গুরুজন। তাকে এমন কথা বলা উচিত হয়নি কখনো।’

‘মা, তুমি শুধু আমার দোষটাই দেখছো, বোদিই বা এমন কথা বলবে কেন?’

‘সেটা তোমার বিচার নয়।’

‘কিন্তু—’

‘না। তোমাকে মাপ চাইতে হবে বড়বউমার কাছে।’

‘মা!’

‘আমি বলছি কমল, এতে তোমার মাথা হেঁট হবে না একটুও।’

পুজোর ঘরে প্রদীপের স্বপ্ন আলোয় মা মেজদাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। পাশে বসিয়ে মাথার চুলে আঙুল বুলাতে বুলাতে (এটা মার সাধনা দেবার রীতি) বলেছিলেন। ‘সংসারে কারণে অকারণে অশান্তি হয় এটাই কি তোমরা চাও। সামান্য মুখের কথা খরচ করলেই যদি মনোনাশিত্ব নিটে যায়—’

কথাটা আর শেষ করেননি। হেসেছিলেন দ্রবৎ। সমস্ত মুখে চেটে দিয়েছিলো সে হাসির আভা। শুধু মুখের হাসিতে অসমাপ্ত বাক্যের বাকি কথাগুলি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন : তোমরা তো বড় হয়েছো, বোঝ সবই, কোনটা সত্য অন্তায়। বুঝি আমিও। কিন্তু—কি করবো বলো। বুলালেই, চোখ মেললেই তো অশান্তি। কান্নেই এই পুজোর ঘরে চোখ বন্ধ করে বসে থাকি। স্নেহের চেয়ে স্বস্তি ভালো।

শিশুবয়সে একবার একটি প্রলয়ঙ্কর ঝড় দেখেছিলাম। বৈশাখ মাস, আকাশ নির্মেষ, হঠাৎ কোথা থেকে এক টুকরো কালো মেঘ এসে জড়ো হলো আকাশের এক কোণে। কয়েক মুহূর্তেই প্রাস ক’রে ফেললো গোটা আকাশটা। শুরু হলো ঝড়ের মাতামাতি। আর ঝড়ি। আমাদের বাড়ির অদূরে একটি শিবমন্দির ছিলো, সেই শিবমন্দিরের ধারে বিশাল এক প্রাচীন বটগাছ ছিল সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। কয়েকমিনিটের ঝড়েই মাথা কাত হয়ে গিয়েছিলো তার, তারপর কয়েকদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো তার অস্তিত্বও। তখন কে বলবে : পথের ওই মোড়ে শিবমন্দিরটার মাথায় পঞ্চাশবছর ধরে একটি বটগাছ ছাতা মেলে রেখেছিলো। পুরনো কথা ভাবতে বসে ওই ছবিটাই আজ আমার মনে পড়ছে। সর্বাঙ্গে। ওই বটগাছটার মতোই সংসারটার মাথায় ত্রিশবছর ধরে ছাতা মেলে রেখেছিলেন বাবা, রোদ ঝড়ি লাগতে দেননি। কিন্তু হঠাৎ ঝড়ে সেই সগৌরব মাথা কাত হয়ে পড়লো। অসুখ। ডবল নিউমোনিয়া। প্রাণ সংশয়। ডাক্তার আর ওষুধ আর টাকার ছড়াছড়ি। এখনকার দিনে নিউমোনিয়া কোনো মারাত্মক রোগ নয়। পেনিসিলিন আছে, অমোষ ওষুধ। কিন্তু এসব অনেকদিন আগেকার কথা। তা প্রায় চোদ্দবছর হবে। সেই অসুখ

থেকে অবশ্য বাবা সুস্থ হয়েছিলেন, কিন্তু আর একটি রোগ এসে বাসা বেঁধেছিলো বুকে। হাঁপানী। কাড়িয়াক এ্যাঙ্গনা। বেশি নড়াচড়া করতে পারতেন না। অসহ্য কষ্টে। একটু বাতাস, শুধু একটু বাতাসের জন্যে আঁকুপাকু করতো কুসকুস। কোর্টে যাওয়া বন্ধ হয়েছিলো। অর্থাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো উপার্জন। জীবনে অনেক টাকা রোজগার করেছেন, তেমন ব্যয়ও করেছেন হুহাতে। একটা টাকাও সঞ্চয় করতে পারেননি। ফলে, যে সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিলো সুপ্রচুর প্রথম অর্থকষ্ট দেখা দিলো সেখানে।

না অনেক সময় বলেছেন, 'সব টাকাই উড়িয়ে দিচ্ছে, ভবিষ্যতের কথা কি চিন্তা করো না কোনো সময়?'

বাবা বলতেন, 'বর্তমান শুধু নানি ভবিষ্যত নাহি মানি।'

'কিন্তু না মানলে তো চলে না, আজ রোজগার করছো কোনো ভাবনাই নেই, কিন্তু কাল যদি অক্ষম হয়ে পড়ো, তখন?'

'টাকা দিয়ে কি করবো আমি। একটি ছাড়া আর সব মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, আর ছেলেরা? ওরাই তো আমার ক্যাপিট্যাল।'

এরপর সেই ক্যাপিট্যালে হাত পড়লো। ছেলেদের মধ্যে এক বড়দাই কিছু উপার্জন করতো, মেজদা, এবং ছোটদা কলেজে পড়তো, আমি তখনও নাবালক। কাজেই একমাত্র ক্যাপিট্যাল বড়দা।

নদীর একপার ঘরন ডাঙে আর একপার গড়ে ওঠে, এই নাকি নিয়ম। পদ্মার ক্ষেত্রে দেখেছি এমন। এপার ডাঙেছে হুহ করে, ওপারে চর পড়ছে। বাবা কোর্টে যাওয়া বন্ধ করলেন, বড়দার পসার ঘনে উঠলো। সারাদিনে নিশ্বাস ফেলবার সময় পেতো না। নামলা মক্কেল আর নথি। তার ওপর যুদ্ধের বাজার। কাঁচা পয়সার ছড়াছড়ি।

সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী আগেই বড়বোদি ছিলো। এরপর আর কথাই ছিলো না। আগে সংসারের প্রয়োজনীয় অর্থ বাবা দিতেন, যদিও সেটা থাকতো বড়দার জিন্মায় অর্থাৎ বড়বোদির হাতে, তাহলেও সকলের সমান দাবী ছিলো তাতে, কোনো অসুবিধে হলে মুখ কুটে জানাতে পারতো, জানাতোও। কিন্তু টাকা ঘুরে গেলো। বড়দার উপার্জনে সংসার চলছে, কারও কোনো অসুবিধে হলে মুখ কুটে জানাতে পারতো না কেউই। বড়দার উপাধিত অর্থে আমরা প্রতিপালিত হচ্ছি, আমরা আশ্রিত, বড়বোদির ব্যবহারে এবং কাথায় বার্তায় পরিকার বোঝা যেতো এই ইঙ্গিত। আগে বড়বোদি কর্ত্রী থাকলেও না পরোক্ষভাবে ছিলেন তারও কর্ত্রী, সংসারের চাকাটা ধমকে ধমকে পড়লে আবার তেলপ্রিজ লাগিয়ে চালিয়ে দিতেন তিনিই, কিন্তু এর পরে নিজেকে একেবারেই সরিয়ে নিয়েছিলেন পুজোর ঘরের চারদেয়ালের আড়ালে।

আর, এই পরিবর্তনের কথা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দিতে বড়বোদির চেষ্টার ক্রটি ছিলো না। একটি বিশেষ ঘটনার কথা মনে আছে এখনও। যুদ্ধের দরুণ হুভিক্ষ দেখা দিয়েছে। চাষডাল অগ্রিমূল্য। সকলে একসাথে খেতে বসেছি একদিন দুপুরবেলা। বোধহয় রবিবার ছিলো সেদিন কিংবা ছুটির দিন। লম্বা টানা বারান্দায়

সার বেঁধে আসনের পর আসন। ঠাকুর সবাইএর পাতেই ভাত দিয়েছে, মেজদার পাতে পরিমাণে কিছু বেশি। মেজদা বরাবরই ভাত একটু বেশি খেতো, শুধু ভাত কেন সব জিনিসই, ছফিট লব্ধা পেশল সুগঠিত দেহ—সেই দেহকে সুস্থ রাখতে সাধারণের চাইতে একটু বেশি খাদ্যের দরকার হবে এ এমন কোনো আশ্চর্যের কথা নয়। মা সামনে বসে পাখা দিয়ে বাতাস করছিলেন, পাতে নাছি না বসে। এটা তাঁর দৈনিকের অভ্যাস ছিলো। শত কাজ থাকলেও আমাদের খাবার সময় সামনে এসে বসবেনই।

‘এই ছুভিক্ষের বাজার, চাল ডালের দান আগুন, উনি পর্যন্ত খাওয়া কমিয়ে ফেলেছেন।’ যেন দেয়ালকে উদ্দেশ্য করে বললো বড়বোদি।

কথাটা হঠাৎ বড়বোদি কেন বললো, কাকে বললো, অর্থ কি, কিছুই তলিয়ে বুঝতে পারিনি তখন। কিন্তু দেখেছিলাম বাতাস করতে করতে মা’র হাতপাখা হঠাৎ থেমে গেলো, মেজদা পাত থেকে তুলে নিলো হাত। এক মুহূর্ত নিম্পলক তাকিয়ে রইলো বড়বোদির দিকে, তারপর একপ্রাস ভাতও মুখে না-দিয়ে উঠে পড়লো আসন ছেড়ে।

মা বসে ছিলেন নিম্পন্দ হয়ে। হাত থেকে পাখা পড়ে গিয়েছিলো মাটিতে।

যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে বড়বোদি বলেছিলো, ‘কি হলো মেজঠাকুরপো খাবে না?’

‘না।’

‘কেন?’

‘আমার ক্ষিদে নেই।’

নতমুখে নাটির দিকে তাকিয়ে জবাব দিয়েছিলো মেজদা।

‘তাহলে শুধু শুধু ভাত নষ্ট করলে কেন? ওতে দুজন লোকের পেট ভরে যেতো। এই ছুভিক্ষের বাজারে চালডালের দান আকাশ ছোঁয়া, তাও পাওয়া যায় না পয়সা দিলেই, চাল ছোঁগাড় করতে উনি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, আর তোমরা যদি তা এইভাবে নষ্ট করো—’ বলে বড়বোদি ঘরে চলে গিয়েছিলো।

তখন আমি দেখেছিলাম : মা’র আয়তস্বল্প চোখ দুটি জলে জলে টলমল। আর, সঙ্গে সঙ্গে আমিও বুঝতে পেরেছিলাম সবকিছুই। কান্না জিনিসটা ছোঁয়াচে। আমারও চোখে জল এসে গিয়েছিলো। অসহ আলায় জলে উঠেছিলো বুক। অথচ কিছু করবার ছিলো না। ঘরে গিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছিলাম।

এটা একটা টুকরো ঘটনা মাত্র। অনেক ঘটনার ভেতর এই একটিই মনে আছে। এই একটি বুঝিয়ে দেয় সবকিছু। কিভাবে বড়বোদি বুঝিয়েছিলো সংসারে সেই এখন সব বিবেচনার মালিক। বড়দার অর্থে আমরা আশ্রিত। তবে সকলের মধ্যে মেজদার ওপরই বড়বোদির আকোশ ছিলো বেশি। ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার পর থেকে সুযোগ পেলেই আঘাত করেছে। নিকরুণ আঘাত, যে আঘাত মর্মে বিঁধে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। মেজদারও কপাল মল। একটার পর একটা সুযোগ না চাইতেই পেয়েছে বড়বোদি। যেমন বি, এন্স, সি পরীক্ষার ফল বেরোতে দেখা

গেলো মেজদা পাশ করতে পারেনি। অথচ সে যে ফেল করবে এটা সকলেরই ধারণার অতীত ছিলো। বরাবর ভালো ফল করে পাশ করেছে। ম্যাট্রিকে ষ্টার পেয়েছিলো, পাঁচটা লেটার। আই, এন্স, সিতে নাইনথ্। বড়বোদি এই স্মরণ ছাড়েনি।

বললো, 'পাশ করবে কি করে, পাশ করলে যে সংসারের উপকার হবে, চাকরি বাকরি করতে পারবে। তাতে দুপয়সা আসার সম্ভাবনা আছে যে। উনি তো ম্যাট্রিষ্টেট সাহেবকে বলে ঠিকই করে রেখেছিলেন চাকরি। কিন্তু বারু পাশই করতে পারলেন না। করবেই বা কি করে, গারাদিনে বই নিয়ে বসে কখনো? কেবল কুকুর আর বেড়াল আর পাখি। আদিখ্যেতা যতো! আবার একটা বছর এখন কলেজের মাইনে টানতে হবে। উনি একা মানুষ, এতো টাকা আনবেনই বা কোথা থেকে?'

মেজদা কোনো জবাব দেয়নি। মাথা নিচু করে শুনেছিলো।

মা সেইসময় পুজোর ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি কথা তাঁর কানেও গিয়েছিলো।

বললেন, 'বউমা!'

তবু বড়বোদি চুপ করেনি।

'আপনি কেন সব কথায় কথা বলতে আসেন মা! আপনার অতিরিক্ত আদর পেয়ে পেয়েই ছেলেরা নষ্ট হয়ে গেছে।'

মা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না নিজের কানকেও।

এমনিভাবেই দিনের পর দিন নিত্যানতুন উপায় উদ্ভাবন করে বড়বোদি কথার তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়ে বিঁধছে মেজদাকে। শুধু মেজদাকেই বা বলি কেন, সে ছিলো মাধ্যম। একদিন মেজদা বাজার থেকে তার কুকুরদের জন্যে মাংস আনা, বেড়ালের জন্যে বরাদ্দ দুধ বন্ধ হলে বড়বোদির মুখের ওপর প্রতিবাদ করেছিলো। তখনও বাবা উপার্জনক্ষম ছিলেন, সেই সাহসেই মেজদা প্রতিবাদ করেছিলো, কিছু অপ্রিয় কথা, যদিও সত্যি, বলেছিলো বড়বোদিকে। প্রচুর অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিলো তা নিয়ে। তারপর মা মাপ চাইতে বলেছিলেন মেজদাদে বড়বোদির কাছে, মাপ চেয়েছিলো সে, মা'র কথা অবহেলা করতে পারেনি। তবু, সে মাপ চাইলেও, বড়বোদি ভুলতে পারেনি সে ঘটনার স্মৃতি। আর, ভুলতে পারেনি বলেই বোড়ের কিস্তিতে দাবা মাত করবার মতো শেষ চাল দিয়েছিলো। বাজার থেকে মেজদার কুকুরদের জন্যে মাংস আনা আবার বন্ধ হলো, বন্ধ হলো বেড়ালদের বরাদ্দ দুধ, পাখিদের ছোলা ছাতুলকা। বড়বোদি জানতো ক্ষমতা তখন পুরোপুরি তার হাতে। মেজদা আর প্রতিবাদ করবে না, তার প্রতিবাদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। সত্যিই মেজদা কোনো প্রতিবাদ করেনি। কোনো কথা বলেনি। কুকুর দুটোকে চেন ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিলো বাড়ির পেছনের বাগঝাড়ের ভেতর। একটা ঝাড়ের সাথে চেন দিয়ে বেঁধে রেখেছিলো দুটোকেই। তারপর বাড়ির ভেতর

এসে বার করেছিলো দো-নলা বন্দুকটা। ভরে নিয়েছিলো ছোটো কারটিজ। আবার চলে গিয়েছিলো বাঁশঝাড়ের ভেতর।

‘গুড্‌ম !’

‘গুড্‌-উ-ম্ !’

পর পর ছোটো প্রচণ্ড আওয়াজ এসেছিলো বাড়ির ভেতর। দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

মা ছুটে বেরিয়েছিলেন পুছোর ঘর থেকে। চিৎকার ক’রে উঠেছিলেন, ‘কমল’ !’

আমরাও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিলো। ঠকঠক করে কাঁপছিলো।

না। মেজদা আরহত্যা করেনি। কয়েক মুহূর্ত বাদেই দেখা গেলো স্বত কুকুর ছটোকে চেন ঘরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে বাড়ির ভেতর। ছোটো কুকুরেরই বুকের কাছে গভীর ক্ষত। রক্ত বেরোচ্ছে ভালকে ভালকে।

বড়বোদি দাঁড়িয়ে ছিলো বারান্দায়।

‘এইবার আপনি সন্তুষ্ট নিশ্চয়।’

বলতে গিয়ে কান্নার আবেগে মুখ বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো মেজদার।

সেদিন ছিলো রবিবার। বড়দা বাইরের কাছারি ঘরে (এখন যে ঘরে বসে লিখছি আমি) বসে মক্কেলদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। গুগুগোল শুনে বেরিয়ে এলো বাড়ির ভেতর। উঠানের মাঝখানে মেজদা তখনও দাঁড়িয়ে, পায়ের কাছে স্বত কুকুর ছোটো, বন্দুকটা একপাশে পড়ে। রক্ত চুইয়ে চুইয়ে গড়িয়ে গেছে নর্দমা অবধি। জমে থকথকে ঘন হয়ে এসেছে রক্তের ধারা। কিছুক্ষণ গভীরভাবে সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বড়দা। বারান্দার ওপর থামের গায়ে হেলান দিয়ে বড়বোদি তখনও নিশ্চল দাঁড়িয়ে, রান্সসরাজত্বের রূপোর কাঠির ছোঁয়ার যেন সব অহুভুতি তার প্যাষণ হয়ে গেছে। সেদিকেও বড়দা একবার তাকালো।

তারপর মাকে এসে বললো, ‘কমল আনার বউকে যে অপমান আজ করেছে তার পরে এবাড়িতে আমাদের আর থাকা চলে না এক মুহূর্ত।’

মা শুনলেন। চুপ করে থাকলেন একলহমা। তারপর অফুটস্বরে বললেন, ‘জানি অনেকদিন থেকেই ছুতো খুঁজছিো তুমি। আজ তা পেয়ে গেছ।’

বড়দা তক্ষুনি বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে। ফিরলো ‘ঘণ্টা’ দুয়েক বাদে। আরম্ভ হলো ত্রিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা। বড়বোদি এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলো তখন বেলা তিনটে। না খেয়ে না দেয়ে। মা পুছোর ঘর থেকে আর বেরোলেন না। বড়দারা গেলো, তবু। বাবা এতো গুগুগোলের মাঝেও নীরব বিছানার ওপর বসে। কোলে বালিশ। হাতে ছকার নল। যেন কিছুই হয়নি।

চারিদিক কাঁকা কাঁকা। বড়দার ঘরে কেউ নেই। নিঃশব্দ। ওরা চলে গেছে, আর কোনোদিন আসবে না এবাড়িতে, বিশ্বাস হচ্ছিলো না তবু। মনে হচ্ছিলো : হঠাৎ কোনো মন্ত্রবলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। ফিরে আসবে

বড়দারা। ছোড়া লাগবে ভাঙা সংসার। পুজোর ঘরে মার পাশে গিয়ে বসলাম। মা কোনো কথা বললেন না। একটা হাত রাখলেন আমার গায়ে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ, শালগ্রামশিলা, দেয়ালে শিব এবং মা-কালীর ছবি এবং অন্যান্য দেবদেবীর ছবির অরণ্যের দিকে তাকিয়ে অবাক লাগছিলো আমার : বাড়িতে এতোবড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেলো তার বিন্দুমাত্র ছায়া নেই কোথাও, শাস্ত সমাহিত স্থির, যেমন আগে ছিলো।

‘এ কি করলে ভগবান।’

মা হঠাৎ অন্ধুটে কঁদে উঠলেন।

কিছুক্ষণ চুপ ক’রে থেকে আমি বললাম, ‘মা, তুমি কঁদছো?’

শাড়ির আঁচল দিয়ে মা চোখ মুছলেন।

‘না বাবা, কঁদবো কেন।’

‘বড়দারা আর কোনোদিন কি আসবে না মা?’

‘না।’

‘কেন?’

মা কোনো জবাব দিলেন না।

হঠাৎ কিভাবে বললাম, ‘তুমি কিছু ভেবো না মা, আমরা বড় হলে তোমার আর কোনো দুঃখ থাকবে না।’

আমাকে দুহাতে জড়িয়ে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে মা আবার কঁদে ফেললেন। তার কিছু পরেই বাবা ডাকলেন আমাকে।

‘তোমার মাকে এক কাপ চা ক’রে আনতে বলো তো।’

বললাম মাকে।

কয়েক মিনিট বাদেই বাবা আবার ডাকলেন।

‘চা হলো?’

‘হচ্ছে।’

কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই আবার ডাকলেন।

‘হলো চা?’

‘হচ্ছে।’

‘এক কাপ চা করতে এতো সময় লাগে?’ বাবার গলায় বিরক্তির স্বর।

‘মা নিজের রান্নাঘরে গেছেন।’

বলে আমি গিয়ে রান্নাঘরে বসলাম মার পাশে। উলুন থেকে কেটলি নামিয়ে টি-পটে জল ঢেলে চা ভিজিয়ে দিলেন মা। সাজালেন কাপপ্লেট। এমন সময় বাবা এসে ঢুকলেন রান্নাঘরে।

‘চা হয়নি এখনো?’

মা বললেন, ‘এই তো হয়ে এলো। ভিজিয়ে দিয়েছি।’

‘হয়ে এলো, হয়ে এলো, হয়ে এলো। সেই একঘণ্টা ধরে শুনছি। চাইনা আমার চা।’

একটা প্রচণ্ড লাথি দিয়ে বাবা উলটে দিলেন টি-পটটা। গরম জল ছিটে গিয়ে পড়লো মার হাতে। কাপপ্রেট টি-পট ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন নিমেষে। পরিশ্রমে এবং উত্তেজনার শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়ে গিয়েছিলো।

‘বাবা হঠাৎ ওরকম করলেন কেন?’ আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

‘তোমার বাবার আজ মন ভালো নেই।’ মা বললেন।

(এখন ওই ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করলে কার্যকারণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি আমি। বাবার পয়লা নম্বর এ্যাসেট লিকুইডেটেড্ হয়ে গিয়েছিলো সেদিন, সেই আশাভঙ্গ এবং মানসিক আঘাত প্রতিফলিত হয়েছিলো ওইদিন বাবার সেই আকস্মিক এবং অতিনাটকীয় আচরণে।)

গভীর রাতে স্বপ্ন দেখে সেদিন ঘুম ভেঙেছিলো আমার। স্বপ্ন দেখেছিলাম : টেডি আর জিমের রক্তাক্ত যুতদেহ দুটো উঠোনের মঝিখানে পড়ে আছে, মেজদা পাশে দাঁড়িয়ে বন্দুকহাতে, চুল এলোমেলো, চোখ রাঙা, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

‘বোদি।’

চিৎকার ক’রে ডাকলো মেজদা। বড়বোদি দাঁড়িয়ে ছিলো ঝরান্দায়।

‘এইবার আপনি সন্তুষ্ট নিশ্চয়।’

বলতে গিয়ে কান্নার আবেগে মেজদার মুখ বিকৃত হয়ে গেলো।

সকালের দৃশ্যটা। স্বপ্নে সেইটেই দেখেছিলাম আবার। তারপর দেখেছিলাম : টেডি আর জিম যেন রক্তমাখা শরীরে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে আর যন্ত্রণাকাতর অব্যক্ত কুঁই কুঁই একটা শব্দ করছে থেকে থেকে।

ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। ঘরে আলো জ্বলছিলো। বিছানায় মা ছিলেন না। উঁকি দিয়ে দেখলাম বাবার ঘরেও আলো জ্বলছে, আলো জ্বলছে মেজদার ঘরেও। বাবা এবং মার গলার আওয়াজ আসছিলো সে ঘর থেকে। কেমন যেন ভয়ভয় করছিলো আমার। গা ছমছম।

চিৎকার ক’রে উঠেছিলাম, ‘মা—আ।’

মা সাড়া দিয়েছিলেন ওই ঘর থেকেই।

‘তোমার আবার কি হলো?’

‘ভয় করছে।’

‘এঘরে চলে এসো।’

বিছানা থেকে নেমে ও ঘরে গিয়েছিলাম আমি। খাটের ওপর হুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিখর হয়ে শুয়ে ছিলো মেজদা। খাটের ধারে বাবা এবং মা ছুজনেই বসে। মা বাতাস করছিলেন পাখা হাতে।

‘এখন তুমি সুস্থ বোধ করছো তো?’ মেজদাকে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন।

‘হ্যাঁ।’

বাবা উঠে চলে গেলেন। মাকে বলে গেলেন, ‘তুমি আজকের রাতটা কমলের কাছেই থাকো।’

‘আমার একা শুতে ভয় করছে।’ বাবা চলে যাবার পর মাকে বললাম।

‘ভয় ? কেন ?’

‘মনে হচ্ছে টেডি আর জিম যেন রক্তমাখা শরীর নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে।’ মেজদা চুপ করে শুয়ে ছিলো। আমার কথায় চমকে উঠে বসলো।

‘এ আমি কি করলাম মা !’

মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ‘তুমি এখন ঘুমোবার চেষ্টা করো।’

‘ঘুম যে আসছে না কিছুতেই। চোখ বন্ধ করলেই দেখছি টেডি আর জিম সারা শরীরে রক্ত মেখে আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে। নিরীহ চোখ মেলে বলতে চাইছে : আমরা তো কোনো দোষ করিনি, করেছি কি ?’

‘ও তোমার মনের বিকার।’ মা বললেন জবাবে, ‘হু একদিন বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে।’

মা বলেছিলেন বটে, কিন্তু ঠিক হয়নি। মেজদা পাগল হয়ে গিয়েছিলো। প্রথমে এই মস্তকবিকৃতি ধরা পড়েনি। রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠতো : টেডি—টেডি, হ্যালো জিম্, কাম হিয়ার, ইত্যাদি। সকলে ভাবতো ঘুমের ঘোরে হুঃস্বপ্ন দেখেই এমন করে সে। কিন্তু কিছুদিন বাদেই টের পাওয়া গেলো। হয়তো বসে আছে উঠোনের বেঞ্চিতে বিকেলবেলা হঠাৎ শুনতে হাত বুলিয়ে বলতে লাগলো : ইয়েস, সিট্ ডাউন। ডোর্ট কোয়ারন্।

মা দেখতে পেয়ে হয়তো বললেন, ‘ওকি কমল, অমন করছো কেন ?’

সঙ্গে সঙ্গে চেতনা ফিরে এলো তার, ‘এ্যা ? না, ও কিছু না।’

মা বললেন, ‘যাও বাইরে বেড়িয়ে এসো। মন ভালো থাকবে তাতে।’

মেজদা উঠে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় হাতে করে নিয়ে গেলো রবারের বল দুটো।

একদিন বিকেলে আমরা মাঠে খেলছিলাম। এমন সময় দেখলাম, মেজদা এসে রবারের বল দুটো ছুঁড়ে দিলো মাঠের ভেতর। তারপর চিৎকার করে উঠলো, ‘টেডি এ্যাও জিম, গো ! পিক আপ দোজ বলস্।’

সবীর আমাদের বললো, ‘কমলদা পাগল হয়ে গেছে নাকিরে ?’

আমি বললাম, ‘যাঃ, পাগল হবে কেন ? কুকুর দুটোকে খুব ভালোবাসতো কিনা তাই।’

কয়েকদিনের মধ্যেই মেজদা ঘোর উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলো। সারাদিন চিৎকার করতো : টেডি—টেডি, জিম—জিম। খেতো না ঘুমোত না। চেহারাটাও কেমন ভীতিপ্রদ হয়ে গিয়েছিলো। করমচা-লাল চোখ—তাও গর্ভে ঢুকে গেছে, এলো মেলো তুলের রাশ লুটোপুটি করেছে মুখের ওপর। বস্ত্র একটা ছাপ সমস্ত মুখে। শেষপর্যন্ত হাতে দড়ি বেঁধে তালি বন্ধ করে মেজদাকে আটকে রাখতে হয়েছিলো ঘরে। খোলা থাকলেই জিনিসপত্র ভেঙেচুরে একাকার করে ফেলছিলো। হাতের সামনে হয়তো একটা কাঁচের গেলাস পেলো অমনি ছুঁড়ে মারলো শুনতে, যেন কোন শত্রু অদৃশ্য হয়ে এসেছে ঘরের ভেতর, তাকে হত্যা করতে।

‘গেট আউট্, আই সে গেট আউট্ !’

গলার সবটুকু ঘোর দিয়ে চিৎকার ক’রে উঠতো, ‘গেট আউট্, অর আই উইল কিল ইউ !’

কান্দারি কাজ করা কাঠের একটা সুদৃশ্য টি-পয় ছিলো ঘরে, সেটা হুহাতে তুলে ছুঁড়ে মেরেছিলো একবার সেই অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে। অমন সুন্দর দামী মিনিসটা ফেটে চোচির হয়ে গিয়েছিলো।

কিংবা কোনো সময় হয়তো কাঁদছে। হুহাতে মুখ ঢেকে অশ্রু নয় বিনয় করছে, ‘টেডি মিম, তোরা তো জানিস তোদের আমি কতো ভালোবাসতাম। আমি নিজের হাতে তোদের খুন করেছি, তখন আমার মাথার ঠিক ছিলো না। তার জন্যে তোদের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি, আমাকে মাপ কর। ওকি, ক্ষমা করবি না? আমাকেও মেরে ফেলবি? আ, টেডি—টেডি, আমার গলা কানড়ে ধরলি কেন, ছেড়ে দে। উঃ, বড় লাগছে। টেডি—টেডি—টেডি—’

[ক্রমশ]

ইউরোপের ব্যালে নাচের ইতিহাস

অভীন্দ্র মজুমদার

॥ ২ ॥

প্রত্যেক শিল্পেরই আদিক এবং ভাবের মধ্যে বিরোধ আছে। বিষয়বস্তু আর প্রকাশভঙ্গীর বিভিন্নতাই সমালোচকের প্রধান অবলম্বন। কবিতার বিষয়বস্তু যদি বিচিত্র টেকনিকে প্রকাশ করা যায়, তখনই সমালোচকের রক্তচক্ষু উদগ্র হয়ে ওঠে। আবার এ-কথাও সত্যি, একই বিষয়বস্তু একই টেকনিকে ক্রমাগত প্রকাশ ক'রে গেলে শিল্পের যুত্ব অবধারিত। কানারগো যে নুতনত্ব আনদানী করলেন, তার বৈচিত্র্য প্রথমেই জনচিন্তকে আকৃষ্ট করল সন্দেহ নাই, কিন্তু পরে হ'ল কি, সেই নুতনত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবার, তাকে আরো বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে নুতনতর বৈশিষ্ট্য দান করবার প্রতিভা দেখা গেল না। সেইজন্য কিছুদিন বাদেই এর অসারতা সমালোচকদের চোখে ধরা পড়ল। তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করলেন, এই শিল্পের ভবিষ্যৎ অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ কিন্তু উপযুক্ত প্রতিভার জাহ্নস্পর্শ না পেলে এ-শিল্প বাঁচবে না, পুনরাবৃত্তি এবং গতানুগতিকতার ঘুনিপাকে এ নিজেই ডুবে মরবে। সকলেই আশ্রয়ে প্রতীক্ষারত নুতন মনীষার জন্য। সকলেরই প্রত্যাশাকে সার্থক ক'রে এগিয়ে এলেন জে, জি, নোভার, ব্যালে নাচের অন্ততম শ্রেষ্ঠ পরিকল্পক ও স্রষ্টা—আজকের দিনেও তাঁর প্রভাব থেকে ব্যালে নাচ সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি।

নোভারের জন্ম ১৭২৭ সালে। তাঁর বাবা ছিলেন দ্বাদশ চার্লসের দেহরক্ষী। ছোটবেলা থেকেই পিতামাতার ইচ্ছায় তিনি সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিবর্তনে তিনি হলেন নৃত্যশিক্ষক লুই ছপের ছাত্র। বোলবছর বয়সেই নাচের আসরে তাঁর নবজীবন শুরু হ'ল। যে পদযুগলের জন্য নিদিষ্ট ছিল সামরিক কুচকাওয়াজ, তারা তার বন্ধন ছিন্ন করে দেখা দিল অভিনব সৃষ্টির উন্মাদনায়।

সারা ফ্রান্সকে সেই অল্পবয়সেই তিনি মাতাল ক'রে তুললেন। সারা ইউরোপে তাঁর প্রতিভার কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল। পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ডেভিড গ্যারিক তাকে তার নিজের থিয়েটারে ডেকে নিয়ে গেলেন। নোভারের তিনি আদর করে নাম দিয়েছিলেন, 'দি সেক্সপীয়র অব দি ডার্স'।

সেইসময় আবার লাগলো ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ। লওনের রক্ষয়ত্রে যেদিন তার প্রথম আত্মপ্রকাশ, সেদিনই এই যুদ্ধের ঘোষণা প্রকাশিত হল। বাধ্য হয়ে পরদিনই ইংলও থেকে তাঁকে চলে আসতে হয়। সে যুদ্ধে ফ্রান্স হেরে গিয়েছিল। পরে এ পরাজয়ের শোধ নিলেন নোভার তাঁর নৃত্যকলা দিয়ে ইংলওকে জয় করে। শুধু তাই নয়, তাঁর নৃত্যবিষয়ক প্রধান গ্রন্থ "লেতারস্ সুর লু দান্স" ১৭৬০ সালে প্রকাশ করলেন।

এই গ্রন্থ মূলত নুতন নর্তকদের দিগ্‌দর্শন। এতে তিনি বলেছেন : "প্রকৃতি যেমন চিত্রকলার প্রেরণার উৎস, নৃত্যও তাই। প্রকৃতিই নৃত্যের জন্মদাত্রী। চিত্রকর

যেমন চিত্ররূপায়ণের সময় নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে তুলির টানে টানে প্রকৃতিকে চিত্রপটে কুটিয়ে তোলেন, তেমনি নৃত্যপরিকল্পকেও সৃষ্টির সেই সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে।”

ব্যালে নাচের যদি ক্রমাবনতি দেখা যায়, জানতে হবে সেই নাচে আত্মসম্বোধিত চোখধাঁধানো চমক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তার ছন্দে একটা গতানুগতিক ফরমুলা ছাড়া গভীর কিছুই ছিল না। নৃত্যশিল্পীকে একমুখ দায়ী করলে চলবে না। দোষী তিনি, যিনি নাচকে ছাঁচে ঢেলেছেন মাত্র, সৃষ্টির মূলকথা মুক্তি তাকে দেননি।...নৃত্যের মধ্যে নন্দনতত্ত্বকে প্রধান স্থান দিতে হবে। এতে আনতে হবে প্রাণোচ্ছলতা, মুক্তির উল্লাস, কিন্তু সেই মুক্তিও হবে শিল্পের বাঁধনে শাসিত।...ব্যালে নাচে আনতে হবে নাটকীয়তা।

“Ballet is not an excuse for dancing, dancing in ballet is the means of expressing a dramatic idea.” নৃত্যকে ছকে ধরা কোরিয়াগ্রাফী থেকে নন্দনতত্ত্বের দার্শনিকতায় উন্নীত করলেন নোভার। সেইজন্য ভোলন্তেয়ার তাঁকে বলেছিলেন, You are a Prometheus, you must form men and breathe life into them. নৃত্যগুরু অষ্টা নোভারের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল স্টাটগার্ট। তাঁর শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন দিক্‌পাল নর্তকী মাদমোয়াজেল হেইলেন (পিকিয়েৎ পদসঞ্চালনের আবিষ্কারী), গার্দেলও ডেস্‌ত্রিস (২য় স্তর জ্যাম্ব—পদসঞ্চালনের আবিষ্কারকনয়) দুবারভেল প্রভৃতি। গার্দেলই প্রথম ব্যালে নাচে মুখোশের ব্যবহার উঠিয়ে দেন। আগেকার দিনে প্রত্যেক নাচে নর্তকের মুখোশ ব্যবহার বাধ্যতামূলক ছিল (রোমিও জুলিয়েৎ নাটক স্মরণীয়)। গার্দেল এই বন্ধন থেকে নৃত্যকে মুক্তি দিয়ে, ব্যালে নাচে আনলেন চক্ষুর সাহায্যে মুখের সাহায্যে বিভিন্ন ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা। এ যুগটিকে বলা যেতে পারে ব্যালে নাচের রেনেসাঁ যুগ। কামারগোতে এর শুরু, নোভারে এর বিকাশ আর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এর পূর্ণতা।

এই রেনেসাঁর গর্ভেই জন্ম নিল বিদ্রোহী সম্ভ্রান্ত রোমান্টিসিজম। নোভার ছিলেন প্রকৃতিবাদী, বাস্তবতা ছিল তাঁর নৃত্যের ভিত্তি। বাস্তবতা অবলম্বন করেই নন্দনতত্ত্ব। কিন্তু তাগলিয়োনি, মেরিস্তো, এন্স্‌লার প্রমুখ শিল্পীরা নৃত্যকে করতে চাইলেন সূক্ষ্ম, হালকা ও স্বপ্নময়। তাগলিয়োনির নৃত্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তিনি Walks among the tree-tops to gather a nest, floats over a water-fall, moves across a meadow without disturbing a blade of grass. নোভারের পরিকল্পনা ছিল নাটকধর্মী, এঁদের পরিকল্পনা হ'ল কাব্যধর্মী। ১৮৩০ সাল থেকে ফ্রান্স এবং রুশিয়া বাদে সমগ্র ইউরোপে কাব্যধর্মী নৃত্যের প্রভাব ক্রমেই বাড়তে লাগলো। রোমান্টিসিষ্টরা হংকার দিয়ে ইঠলেন, Banish reality, art must be an escape into an enchanted realm. কল্পনার জগতে মানুষকে নিয়ে যাবার সাধনায় যেতে উঠলেন নৃত্যশিল্পীরা।

The fairy the wile, the witch and the vampire swept away the heroes of antiquity, the pale German moonlight of Goethe replaced Olympus, Man

was no longer the hero, gone are the days of Vestris : woman was idealised and man must be content to remain in the background and lift her when necessary. এখন থেকে ব্যালে নাচে প্রাধান্য পেলেন মেয়েরা। অবশ্য এতো হবেই। মানুষের সমস্ত কাব্য নারীকে নিয়ে। মানুষের স্বপ্নই নারীকে কেন্দ্র করে। তাই রোমান্টিসিজমের প্রধান দান নৃত্য-র মাধ্যমে নারীকে এই চিরন্তন রূপে মোহনীয় করে তোলা। মেরী তার্গলিয়োনির অমর কীর্তি “লা সিল্ফাইদস্” ব্যালে আশ্চর্যকর্মের মোহনয়, অথচ বিদুমাত্র ঘোঁসতা দোষহুঁটে নয়। ফ্রান্সের দেহবিলাস পৃথিবীবিখ্যাত, অথচ সেই ফ্রান্সেই তিনি প্রতিষ্ঠা পেলেন the first Christian dancer হিসাবে যার নাচ ছিল So free from sex appeal.

কিন্তু এত করেও নৃত্যের গরীয়সী মহিমাকে রোমান্টিসিজম সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলো না। রোমান্টিসিজম পৃথিবীর কোনো শিল্পে ছবিতে, নাটকে, সাহিত্যে রিয়ালিজমকে জিততে পারেনি। নৃত্যের ক্ষেত্রেও সে কি করে টিকবে। নোভার যেখানে নৃত্যের সংগীতে ক্লাসিকস্কে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করেছেন, রোমান্টিসিজমের বাঁধভাঙ্গা আবেগ তার জায়গায় আমদানী করলো চটুলতা, এতে শিল্পরস আর থাকলো না, রইল কেবলমাত্র চোখধাঁধানো দৃশ্যের সমারোহ, মাধুর্যের নির্বাসন হবার পর রাজস্ব পেল চাতুর্য। রোমান্টিক ব্যালে সম্বন্ধে তাই সমালোচকবর্গ বলেছেন—“রোমান্টিক ব্যালে আমাদের কি দিয়েছে কেবল সারি সারি অর্ধনগ্ন, পরীর পাখনাওয়ালা কর্ণেটের দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ কামনামদির নর্তকীর দল যাদের সঙ্গে একটু ধনবান লোকেরাই বিরতির সময় রতি উপভোগ করতে পারেন, আর দিয়েছে একদল ধেড়ে ইঁদুর যাদের যন্ত্রের কিচনিচানি, গোলাপফুল নয়, পচা পনীরের দুর্গন্ধে মানুষকে বিতারিত করে।”

দুইশত বছর আগে এই ফ্রান্সেই প্রথম এ্যাকাডেমী ডু লা দান্সের প্রতিষ্ঠা— আর মাত্র দুশতাব্দীর মধ্যেই সে দেশের নৃত্যশিল্পের এরকম দেউলিয়া অবস্থা। প্রতিপত্তিশালী লুই যাকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন, মলিয়ের, ভোলভেয়ার যাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, নোভার যাকে সার্থকতার সুউচ্চ শিখরে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে নৃত্যশিল্পের প্রাণরসধারা এল শুকিয়ে। শুধু ফ্রান্স নয়, ইংলওও সেই একই অবস্থা। রোমান্টিক ব্যালের জনপ্রিয়তা ইংলওও কম ছিল না। রাজনীতিক ক্ষেত্রে তখন ফ্রান্সের সদি লাগলে সারা ইউরোপের যেমন হাঁচি শুরু হত, তেমনি শিল্পের নূতনতম নমুনা পারীর রঙ্গমঞ্চে, চিত্রশালায়, সংগীতআসরে, সাহিত্যে, জামাকাপড়ের ছাঁটে দেখা দিলেই সারা ইউরোপে তা সংক্রামক ব্যধির মত ছড়িয়ে পড়ত। ব্যালের ক্ষেত্রে বরং বলা চলে পারীর চেয়ে ইংলওওর লোক রোমান্টিক ব্যালে বেশি আদর করে ভুলে নিয়েছিলেন।

থিয়োফেল গতিয়ের নামে এক সমালোচক রোমান্টিক ব্যালেকে ইংলওওর মাটিতে খুব বেশি প্রশংসা না দিতেই একদা সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু তাতে কেউ কর্ণপাত করেনি। অবশ্য ইংলওও যে রোমান্টিকতা দীর্ঘজীবী হয়নি তার কারণ সেখানে ফ্রান্সের মত সুদক্ষ নর্তক বিশেষ কেউ ছিলেন না। তৎকালীন বিখ্যাত ইংরাজ নর্তকী হিসাবে নাম করা যেতে পারে আদেলিনা প্রাঙ্কো আর ক্লারা ওয়েবস্টারের।

ক্রায়া ওয়েবস্টার এ দুজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি প্রতিভাশালিনী ছিলেন, কিন্তু এক আকস্মিক দুর্ঘটনা এর প্রতিভার অবসান ঘটায়। ডারি লেনের রঙ্গমঞ্চে এক সন্ধ্যায় নাচতে নাচতে তাঁর পোশাকে আগুন ধরে যায়। এবং সেই দুর্ঘটনাতেই তার মৃত্যু হয়। ইংলণ্ডে নৃত্য রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা কোনোদিনই পায়নি, নৃত্যের আকাদেমীও ইংলণ্ডে নাই। সেজন্য যেটাকে আকাদেমিক পিওরেটি বলে, ইংলণ্ডের নাচে তা আজও আসেনি। অবশ্য নামকরা নৃত্যশিল্পী ইংলণ্ডে হয়নি, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। সে দেশেও আদেলিন জিনি, লিঙ্গী কায়াসত অথবা ফিলিস বেদেলের মত নৃত্যপ্রতিভা দেখা গেছে, কিন্তু তাঁদের নৃত্যকলায় নোভারের ক্লাসিসিজম রোমান্টিসিস্টদের প্রতিভার মত বৈশিষ্ট্য আসেনি। তারা সবাই বরং সুদক্ষ কোরিয়োগ্রাফার, নৃত্যপ্রতিভা নন। এই শোচনীয় থেকে শোচনীয়তর অবস্থার মধ্যেই ইংলণ্ডের ব্যালের পতন হয়। রুশ নৃত্যপ্রতিভারাই ইংলণ্ডকে বাঁচিয়ে দেন, বরং বলা উচিত তাঁরা লগুন ‘অধিকার করেন’। এখনও রুশ আধিপত্য সেখানে বর্তমান আছে।

॥ ৩ ॥

রুশদেশের ব্যালের ইতিবৃত্তও খুব অর্ধাচীন নয়। চতুর্দশ শতাব্দীর রাজসভাতেও কিছু “মস্কোভাইট” নর্তক, নৃত্যকলার শিক্ষার্থী হিসাবে যোগ দেন। কিন্তু তারা তাঁদের অমনোযোগী স্বভাবের জন্য নৃত্যগুরু খুব অপ্রিয়ভাজন হন। এরপর পিটার দি গ্রেট (১৬৭২-১৭২৫) রুশ ব্যালের দিকে নজর দেন। ইতিহাসের ছাত্রদের নিশ্চয় স্মরণ আছে, পিটার রাতারাতি রাশিয়াকে পশ্চাত্যসভ্যতায় পরিবর্তিত করবার জন্য কি না-করেছিলেন। তিনি রুশীয়দের চিরপ্রচলিত লম্বা দাড়ি রাখা নিষিদ্ধ করে দেন, আইন করে দাড়ি কামানো বাধ্যতামূলক করেন। তিনি আইন ক’রে রুশীয় চলচলে পোশাক পরিবর্তিত ক’রে, অঁটসাঁট পোশাকের প্রবর্তন করেন। বিশেষ ক’রে নাচের ক্ষেত্রে এই পোশাকের বিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো একটি জাতির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য নৃত্য ও সাহিত্যে যত বেশি প্রতিকলিত হতে পারে, শিল্পের অস্বাভাবিক শাখায় তা হয় না। পিটার এটা বুঝেছিলেন পোশাক বদলালেই জাতীয় মনোবৃত্তিও বদলায়। রুশদেশের সমাজে নারীপুরুষের খোলাখুলি সামাজিক মেলামেশা ছিল না। পিটার এই বিভেদ স্মৃতিয়ে দিলেন। তিনি সামাজিক নৃত্য আসরের বন্দোবস্ত করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি আইন ক’রে এসব সভায় নারী পুরুষের মেলামেশা বাধ্যতামূলক ক’রে দিলেন। তিনি বুঝেছিলেন প্রাচ্যদেশীয় গোঁড়ামী নিয়ে, একাকীত্ব নিয়ে, ক্রমবর্ধমান পশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। পরবর্তীকালে ডুরকের আতাতুর্ক যা বুঝেছিলেন, পিটার তার তিনশ বছর আগেই রুশদেশে তার প্রচলন করেছিলেন। তিনি বাধা পাননি, এমন নয়। কঠোর হস্তে তাঁকে সেই বাধা দমন করতে হয়েছিল। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, Shave the men’s beards, remove their dignified and cumbersome robes, and they become eligible partners for the dance. তিনি একজন চার্চের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, বহু লোককে

কয়েদ করেছিলেন—এক কথায় সমগ্র রুশ দেশে নিজেকে আধুনিক যুগের ডিক্টেটরের মত সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এর দরকার ছিল, কারণ তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, to impose upon a backward people the social dance of the west. Peter forced the art at his country into a new channel, just as he forced the armament by land and sea. Where the present day dictators in Italy and Germany (অর্থাৎ মুসোলিনী এবং হিটলার) have thought nationally, Peter, in everyway a more enlightened man has vision enough to think internationally and to borrow what was best from abroad, until he had planted it firmly in his country : Painting, dance, architecture, fashions, the army and navy. By so doing he parmanently enriched his country. এই অসীম কীর্তির সুফল ফলতে বেশি দেবী হ'ল না। রুশদেশের জন্মে নৃত্যের বীজ খুব তাড়াতাড়ি অঙ্কুরে প্রফুটিত হ'ল সম্রাজ্ঞী এ্যানের আমলে (১৬৯৩-১৭৪০)। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন রুশ দেশের নৃত্যের জন্ম আকাদেমী। আজো তা ক্রমবর্ধমান খ্যাতি নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি ফরাসী নৃত্যগুরু ল্যান্সেককে আকাদেমীতে নিয়ে আসেন। সমরশিকারীদের জন্ম নৃত্যানিশা বাধ্যতামূলক করলেন। সুন্দরীশ্রেষ্ঠা রানী এলিজাবেথও একজন অস্টিয়ান নৃত্যানিশক হিলফারদিংকে নিয়ে এলেন আকাদেমীতে।

তারপর ক্যাথারিন দি গ্রেটের (১৭৬২-১৭৯৬) আমলে আরও একথাপ রুশিয়া এগিয়ে গেল। তিনি বিখ্যাত ইতালীয়ান নৃত্যগুরু এ্যানজিওলিনিকে তাঁর রাজসভায় নিয়ে এলেন। তিনি রাশিয়াকে দীক্ষা দিলেন নৃত্যতত্ত্বে ও আত্মবিশ্বাসে।

ব্যালের যেমন ইংলণ্ডে তেমনি রুশদেশেও একটি 'বরোড আর্ট', হয়তো রুশদেশেও ব্যালের একটি 'বরোড আর্ট' হিসাবেই জনপ্রিয় থাকত যেমন ইংলণ্ডে ছিল বা এখনও আছে। কিন্তু একটি ঐতিহাসিক কারণে ইংলণ্ড ব্যালেকে আপনায় করে নিতে পারল না, কিন্তু রুশ এগিয়ে গেল। তার কারণ, ইংলণ্ড শুধু ব্যালের শিল্পীকেই উপভোগ করল। ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পীরা একের পর এক লণ্ডনে গেছেন, আর মোটা টাকা পকেটে পুরে ফিরে এসেছেন। কিন্তু তবুও ইংলণ্ড নিষস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জাতীয় ব্যালের তৈরী করতে পারল না। ইংরেজ বরাবরই, এমনকি আজ পর্যন্ত, গুড অডিয়েন্স হিসাবেই থেকে গেল। কিন্তু রাশিয়া দর্শক থাকলো না, সে নিজে নর্তক হয়ে উঠল। ইংলণ্ড খালি বাহবা দিল, আর রাশিয়া বাহবা নেবার প্রতিজ্ঞা করল।

ইংলণ্ডের এই শোচনীয় পরিণতির জন্ম আমার মনে হয় তার ইতিহাসই দায়ী। অষ্টম হেনরীর আমলে কিম্বা এলিজাবেথের আমলেও ইংলণ্ডে নৃত্যের মুখে মুখোশ পরানো থাকলেও, পায়ে নীতিবোধের শিকল পরানো হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মমত প্রভাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড হয়ে উঠল পুরোপুরি নীতিবাদী। ইংলণ্ডের এই নীতিবাদের কবলে সব আগে যারা পড়ল সে দেশের সংগীত ও নৃত্য। ফলে আজও অন্তত নৃত্যের ক্ষেত্রে ইংলণ্ড is a good consumer, and never creator.

অন্যদিকে রুশদেশে ঘটল এর বিপরীত। জনসাধারণ নৃত্যকে নিজেদের জীবনসস্তার সঙ্গে মিশিয়ে নিল। অবশ্য সে-দেশের সামাজিক গঠন এবং প্রাকৃতিক অবস্থা এতদূর অনেকখানি দায়ী। রাশিয়ার ধনিকশ্রেণী ছিল সবাই জমিদার। তাদের বিরাট বিরাট সম্পত্তি আর অসংখ্য সাফ। এত বড় লাভজনক ছিল এই সম্পত্তি যে জমিদার সন্তানদের বাধ্য হয়ে অবসর সময়ে নিজেদের জন্য আনন্দ প্রমোদের ব্যবস্থা করতে হোত। তাঁরা নিজেরাই শিক্ষা দিয়ে অসংখ্য সার্ক ব্যালে ট্রুপ গড়ে তোলেন। সারা রুশদেশের থিয়েটারও এই সার্ক শিল্পীদের কাছে ধনী। এর ফলে হ'ল এই, নৃত্য জনসাধারণের জীবনযাত্রার সঙ্গেই মিলেমিশে গেল। আবার রাশিয়াতে মানবতার সঙ্গে নৃত্য যতটা আপোস করতে পেরেছিল, ফ্রান্সে ততটা হয়নি। সে ক্ষণে ফ্রান্সে ব্যালে ধংস হয়ে গিয়েছে, কিন্তু রাশিয়াতে হয়নি। রাশিয়াতে কোনো শিল্পই Passive instrument হয়নি। কারণ, রাশিয়া কৃষিজীবী। আর কৃষকদের মত বাস্তববাদী আর কেউ নয়। আর সেইজন্যই রোমান্টিসিজমের বস্তায় সারা ফ্রান্স যখন ডুবে গেল, তখন রোমান্টিসিজমের ফর্ম গ্রহণ করলেও রাশিয়া তার বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গা ছাড়েনি।

১৮৬১ সালে সার্ক মুক্তি আন্দোলন আরম্ভ হয় রাশিয়াতে। দেশের ছোট থেকে বড় সমস্ত রঙ্গমঞ্চে এই সাফ আন্দোলনের প্রেরণা পাওয়া গেল। সেন্ট পিটার্সবার্গ আর মস্কোর বৃহত্তম রঙ্গমঞ্চে অসীম সাহসে সেদিনের নৃত্যশিল্পীরা সার্কদের প্রাণের কথা ফুটিয়ে তোলেন। এই প্রচণ্ড আলোড়নের অস্ত্রে রাশিয়ার মাটি থেকে সাফ দাসত্ব উচ্ছেদ হ'ল। প্রমাণ হ'ল, রঙ্গমঞ্চের চেয়ে বড় অস্ত্র জনতার আর নাই।

ক্যাথারিন থেকে আরম্ভ করে তার পরের ইতিহাসে দেখি রাশিয়া কি ভাবে পশ্চাত্য নৃত্যতরকে আকর্ষণ ক'রে নিয়েছে। রাশিয়াতে বহু বিদেশী গুণী; যেমন দি দেলাং, ডুপ্রো, তাগলিয়োনী—আরও কত খ্যাতনামা নর্তকী এসেছেন। কিন্তু রাশিয়া তাদের বাহবা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি তাদেরকে গ্রহণ করেছে। যেতে উঠেছে সক্রিয় শিল্পসৃষ্টির সাধনায়, যার স্রোত আত্মও অব্যাহত। তাদের মধ্যেই তারা সৃষ্টি করেছে তাগলিয়োনিকে, নোভারকে। আদ্রিয়ানোভা, দানিলোভা, ইস্তোমিশ, সোকোলোভা, তাসেব—আর সবশেষ এ্যানা প্লাভলোভা।

নোভার তাগলিয়োনির নাম পৃথিবীর অনেক দেশ ঘানে না, কিন্তু প্লাভলোভার নাম শোনেনি এমন লোক পৃথিবীতে কেউ নেই। তাঁর অমর সৃষ্টি 'ডাইং সোয়ান' সম্প্রতি বিখ্যাত রুশনর্তকী মারকোভার দোলতে কলিকাতাবাসীর দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ১৯০৯ সালে প্লাভলোভা ফ্রান্স ভ্রম করেন, ইংলও ভ্রম করেন—এখনও সেই আধিপত্য থেকে ইংলও আর ফ্রান্স মুক্ত হতে পারেনি।

সবশেষ রুশবিদ্রোহীরাও প্লাভলোভা সম্বন্ধে কি বলেন সেটুকু ভুলে দিয়েই আমার প্রবন্ধ শেষ করবো। তাঁরা বলেন—

Her importance in the history of ballet and as one of the founders of the contemporary movement, lies in the fact that she proved to the world

that the ballet dancer could be a completely expressive artist the equal of a Duse, a Barnhardt (প্রখ্যাত ইংরাজ অভিনেত্রী) or a Chaplin. She stands as an ideal and as an inspiration and her value as an influence lives on after her. The phrase 'Pavlova as an ideal and as an inspiration' must not be misunderstood, as it so often is when people ignorantly talk of a second Pavlova (যারকোতা সহজে বলা হয়—লেখক)। Had Pavlova been a second Taglioni she would never have made an impression. She was the first and only Pavlova

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

Ballet by Arnold Haskell. English Ballet by Janet Leeper. Land of the Soviets by James Gregory. A Survey of Russian Ballet by F. L. P. H, (Moscow). Letters Sur La Danse by J. G. Noverre. (ইংরাজী অনুবাদ)

ব্রাউনিং-এর প্রেম

অমলেন্দু বসু

[পূর্বাহ্নবৃত্তি]

এরপর কিন্তু ছাড়ে না রবার্ট। রীতিমত উৎপাত শুরু করে দেয়। যে-দুঃখ, যে-বেদনা সে পেয়েছে সে-বেদনা ছড়িয়ে দিতে চায় এলিজাবেথের মাঝেও।

“এ পৃথিবীতে আমি নষ্ট হয়ে গেছি, ভেসে বেড়িয়েছি, হয়ত একটা চালের ভুলে সমস্ত ভবিষ্যত সুখই আমার নষ্ট হয়ে যাবে, এরই মাঝে তোমার কাছে এসেছিলাম আনন্দের জন্যে, কিন্তু তুমিও দুঃখে আমার বুক ভাসিয়ে দিলে।”

এইবার সত্যাকারের আসন টলে এলিজাবেথের। এতবড় হৃদয়কে ফেরানো তার পক্ষে অসম্ভব। দয়িত বলে গ্রহণ না করুক সে কিন্তু রবার্টের বন্ধুত্ব আর প্রয়োজন। তার সুনাম, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা আর সাহচর্য মুগ্ধ করেছে এলিজাবেথের হৃদয়কে, হুকু হুকু বুক সে লেখে :

বন্ধু,

কোনো দুঃখই তোমায় দিতে চাইনি—কখনও জীবনের অগ্রভাগে কারুর সঙ্কর থাকে দুঃখ, কারুর থাকে আনন্দ, পৃথিবী অবিরাম ঘুরে চলেছে, তুমি জান, তাই হয়ত ঘূর্ণিপাকে হলাহলের ভাগটিই আমার চিঠিতে ফুটে উঠেছে। কিন্তু বন্ধু সত্যিই তুমি কিছু চিন্তা করো না, আমার লেখা সম্বন্ধে বা তার অন্তর্নিহিত দর্শন সম্বন্ধে। আমার যা কিছু দেখা তা হল আলোর পরিবর্তে আঁধারের মাঝেই, তাই তাতে শুধু বেদনারই সুর। ভগবান করুন, তা যেন, তাইই হয়। আমার এই দৈহিক একাকীত্ব ও কঠিন মানসিক সাধনার মাঝে আমি ছুটি শিকাই পেয়েছি—উৎকল্লতার সারগর্ভতা ও সামাজিক কর্তব্যবোধ। গভীর হুঁচিতির মাঝেও আমি আনন্দ করেছি, বহমানুষের মাঝে অনুভব করেছি একাকীত্ব আর তা উপাদেয়ই হয়েছে, অস্বাভাবিক কিছু হয়নি। সত্যিই আমার জীবনের বন্ধনার মাঝেও পৃথিবীকে মনে হয় আরো উজ্জ্বল। গোলাপ গাছের নিকড় ভুসলে পাওয়া যাবে সূর্যের পরিচিতি আর সূর্যের অন্তরালে আছে ঝড়। জীবনকে আমরা যা বলে থাকি তা হল আত্মার এক অবস্থা। আত্মা নিশ্চিত বৃদ্ধি পাবে সুখ ও জ্ঞানের দিকে। এক নিম্নস্ব ক্রটি ছাড়া আমাদের চোখের অন্ধ, দেহের কোনো বেদনাই এই গতিকেরোধ করতে পারবে না। কত দয়ালু তুমি, কত শান্ত ও বৃহস্পতি তুমি কথা বল। কিছু কিছু কথা তুমি যা বল তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী আর আশ্চর্যজনক। অবশ্য আমি এ-বিষয়ে সচেতন যে, তুমি অনেকসময় অবচেতনভাবে আমাকে এড়িয়ে বলো আমার গুণাগুণ সম্বন্ধে। তবুও এইভাবে জেগে যুমানো, আর তোমাকে বন্ধু বলে ভাবতে পাওয়া সত্যিই আনন্দের। ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন।

এর পাঁচদিন পরে জবাব আসে রবার্টের, বেশ চিন্তা করে লেখে সে :

প্রিয় মিস্ ব্যারে,

তোমার চিঠি পেয়ে যে কত সুখা হয়েছি তা কি বলব, এই সুখ আমাকে নীরব করে দিয়েছে।

সত্যিই দুঃখের মত সুখও নীরব করে দেয় রবার্টকে, তারপর প্রশ্ন করে সে।

“এ্যাসকাইলাসের সম্বন্ধে তোমার মত কি? সে কি গ্রীক আত্মাদের মধ্যে স্বর্গীয় ও অন্ততম নয়?”

কিন্তু শুধু গ্রীক, শুধু সাহিত্য ও তার মতবাদে সন্তুষ্ট থাকে না রবার্ট—তার মন আবার ব্যাকুল হয়ে ওঠে প্রথমদর্শনের অধীর অপেক্ষায় :

“গ্রীক সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি—এবার আমি তোমার কাছে যেতে চাই, তুমি মনে কর, অবচেতনভাবে তুমি আমার কাছে যে কি তাই শুধু বাড়িয়ে বলি। তুমি জান না তা সত্যিই কি জিনিস। আমিই-বা তা বলি কি করে। যে ভাষায় আমি এ-সব সম্বন্ধে নিজের সঙ্গে কথা বলি তা হ’ল আধিভৌতিক এবং প্রেমের দ্বৈতবোধ—ভাষাবিদ্রা বলে থাকেন। কিন্তু আমি নিজে তার পাঠোদ্ধার করতে পারি এবং জানি কেন আমি তোমাকে বলি যে, আমি অত্যন্ত আত্মসচেতন। আমি এই মনে করেই বলি, পাছে তুমি আমায় ভুল বোঝ। এখন খালি কথা বলে লাভ কি? তুমি যদি একভাষ্যগায়, অন্তত কয়েকবছর; আমার সঙ্গে থাক তা হলেই সব বুঝতে পারবে। লক্ষ্মিটি, সত্যি করে বল, তুমি কি মনে করছ, কবে আমি তোমার দেখা পাব : দুমাস, তিনমাস পরে? আমি হয়ত আবার বেরিয়ে পড়তে পারি।”

এর আটদিন পরে উত্তর ভেসে আসে এলিজাবেথের। দ্বিধা, সংকোচ, জড়তা, সন্দেহ সবকিছুকে কাটিয়ে উঠে মুখর হয়ে ওঠে এবার সে :

প্রিয় ব্রাউনিং, যখন তোমায় লিখতে দেবী হয়, তখন নিশ্চয় জেন যে আমার ভালসময়টা আমি নিজের জন্য রেখে দিই না বরং সে সময়টা আমার সবচেয়ে খারাপ। আমি বলব, এ তোমার অত্যন্ত সৌজন্য আমার খোঁজ নেওয়া এবং আমার না-লেখার জন্য কিছু মনে না করা—বিশ্বাস কর আমি খুব সুস্থ ছিলাম না, কিনা সময় বাঁচানোর স্পৃহাও ছিল না। কিন্তু তা হলেও শরীরের অবস্থা যতটা খারাপ হওয়া উচিত ছিল ততটা খারাপ হয়নি। সাধারণ অবস্থার থেকে একটু দুর্বল মাত্র, এখন শিক্ষা করছি কোনোমতে এককোণে জীবিতের অবয়বে বেঁচে থাকতে। তারপর এও শেষ হয়ে যাবে। এপ্রিল আসছে তারপর আসবে মে ও জুন, এবং ততদিন যদি বেঁচে থাকি তাহলে বোধহয় আমাদের দেখা হবে। তোমাকে দেখা ছাড়াও, আমার মনে হয়, তুমি আমায় বোধহয় অবিশ্বাস কর এবং আমার এই মোনতাকে ঠিক উপলব্ধি কর না। তুমি জান না দীর্ঘদিন অনভ্যন্ততার দরুণ কোনো জীবিতমূর্তি দেখলেই ভেতরে ভেতরে আমি যেন কেঁপে উঠি। মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে তুমি জ্ঞানবান, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পার আত্মার মত একা জীবন যাপনের ফলাফল কি হতে পারে, বিশেষত সামাজিক কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সুস্থ জীবনদর্শন থাকলে। আমার অবস্থাটা বুঝতে না-পারলেও কিছু ক্ষতি নেই, আমি বলছি, নিশ্চয় দেখা করব, যখন এই উষ্ণ ঋতু কিছুটা আরোগ্য করে তুলবে আমায় তখনই এই

পৃথিবীকে আনন্দ করার উপযোগী করে তুলব। যদি তুমি মনে কর যে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই না—তবে তা ভুল হবে, তোমার সমস্ত শিকাই ব্যর্থ হবে। এ বিষয়ে আমি সত্যই ভীত—যদিও এ আমি লিখছি না : তুমি হলে দুর্ভাগ্য পারগেলিউস এবং আমি এক বন্দি—যার সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলি ভেঙে শিথিল হয়ে পড়েছে, নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেছে।

সমাজ সম্বন্ধে যা তুমি বল তাতে তোমার এবং আমার জীবনের এক তুলনামূলক সমালোচনা উপস্থিত করা যেতে পারে। মনে হয়, জীবনপাত্রকে পরিপূর্ণভাবে পান করেছে তুমি, এবং সূর্য প্রতিভাত হয় তাতে। আর আমি বেঁচে রয়েছি কেবলমাত্র অন্তরে দুঃখকে সম্বল করে, এক সবল উচ্ছ্বাসময় জীবনের ক্ষমতা। অসুস্থতাবশত একাকিত্ব বরণ করার আগেও আমি ছিলাম একা ; আমার থেকে কন্সবরসী এমন মেয়ে খুব কমই আছে যারা আমার অপেক্ষা বেশি দেখেনি, শোনেনি, বা জানেন না। এমন এক রাজ্যে আমি বেড়ে উঠেছি যেখানে সামাজিক কোনো সুযোগ ছিল না। শুধু বই আর কবিতা আর ছন্দ, তারই মাঝে আমার সব অভিজ্ঞতা। এক অদ্ভুত একক জীবন। চারপাশে যার সবুজ ঘাসের প্রচ্ছন্ন। বই এবং স্বপ্ন—যেখানে আমি বাস করতাম সাংসারিক জীবন শুধু তার ঘাসের চারপাশে মোমাছির মত গুপ্তনধ্বনি তুলে যেত। এমনি করে সময় অতিবাহিত হয়ে যেত। তারপর যখন অসুস্থতায় পড়ে গেলাম এবং জীবনের প্রান্তে এসে দাঁড়িলাম, কোনো ভবিষ্যৎ নেই (অবশ্য কম সময়েই মনে হয়েছিল) এক ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকা ছাড়া, তখন আমি তিক্ততার মাঝে চিন্তা করতে শুরু করলাম। (আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখময় সময়ে) যেন এই মন্দিরে আমি অন্ধের মত বাস করছি, কোনো মানুষকে দেখিনি, এমনকি এই পৃথিবীতে আমার ভাইয়েরা আর বোনেরা আমার কাছে কতকগুলি নামের অপভ্রংশ। দেখিনি কোনো পাহাড়, কোনো নদী, বাস্তবিকপক্ষে কিছুই না ; তুমি কি ঠিক বুঝতে পারছ ? ধারণা করতে পার এই অজ্ঞতা আমার শিল্পসাধনার পক্ষে কত অসুবিধাজনক ? যদি আমি বেঁচে থাকি, এই বন্দীজীবন থেকে নিষ্কৃতি না-পাই, তুমি কি বুঝতে পার না, এ কতখানি অস্বাভাবিক হবে আমার কাছে—বলতে গেলে অন্ধ কবির সাথে আমার কোনো প্রভেদই নেই।

লিখতে লিখতে একটু খামে এলিজাবেথ, বোধহয় সব লেখা সব চেষ্টাই তার ব্যর্থ হবে, তবু শক্তি সঞ্চয় করে সে মনে, তারপর আবার লেখে—“কিন্তু বোধহয় গুমরে ওঠা খারাপ। আমাদের সকলেরই ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, যে জীবন তিনি আমাদের দিয়েছেন তার ক্ষমতা। আমাদের মনে করা উচিত এই আমাদের যথেষ্ট”— আমি লিখছি যাতে তুমি ভুল না-কর, সমাজ সম্বন্ধে আমার লিখিত মতামত ভুল ভাবে না নাও। যদিও আমার দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না। তবুও তুমি বুঝতে পারছ, আমি ঠিক কি বলতে চাইছি, আমার জীবনে সবচেয়ে প্রবলতম আনন্দের মাঝে আমি বেঁচে থেকেছি, এবং আমার সমস্ত উচ্ছ্বাসপ্রবণতা যার সাথে জেগে রয়েছে তা হ’ল আমার কবিতা—এবং একমাত্রই কবিতা। লেখার প্রতি ভালবাসার কথা ? তা নিশ্চয় আছে আমার, যখন আমি লিখি তখনই ‘শুধু আমি বেঁচে থাকি,

সেইটাই আমার জীবন। নইলে বেঁচে থাক! আর কি? কেবল মাত্র খাওয়া পান করা আর নিঃশ্বাস নেওয়া নয় বরং জীবনকে অশুভব করা তিলে তিলে, সমস্ত স্বত্তি দিয়ে, আনন্দের সাথে—

এরপরও দুঃখের সুর আসে এলিজাবেথের। সে পছন্দ, যতই সে লিখুক না তার মানসিক তেজে আর উচ্ছ্বাসপ্রবণতার বেগে, রবার্ট এক প্রাণবন্ত উদ্যম শক্তি, তার কাছে এক জড়ীভূত পদার্থ ছাড়া আর কি সে, দুঃখের জীবনের মিল নেই কোথাও, একঘনের বরাহারা উদ্যম জীবন আর একঘন চলৎশক্তিহীন।

চিঠির শেষে সেই সুরই ভেসে আসে এলিজাবেথের।

তুমি আর আমি, দুঃখের জীবনের সুর সম্পূর্ণ বিপরীত, আমি চাই মানুষ দেখতে আর তুমি দেখেছ অনেক মানুষ, অনেক জীবন।

শেষে আমি জিজ্ঞাসা করি যদি তোমায় ভ্রমণ করতে বেরিয়ে যেতে হয় তবে আমিই বা তোমায় হারাব কেন? এ-বিষয়ে তোমার বক্তব্য কি?

চিঠি শেষ হয়ে যায় কিন্তু তার সূচনা শেষ হয় না, তার সুর অদেহী আত্মার মত তাড়না করে এলিজাবেথকে। দুঃখের জীবনের এই বৈসাদৃশ্য বারবার তাকে ব্যথিত সচাকত, উদ্দীপ্ত করে তোলে। সে বিষাদের সুর কলমকে নিষ্কৃতি দেয় না, তাই সেই রাত্রে বাইরে যখন বরফ পড়ছে কাচের ঢাকা সারসির গা দিয়ে, তার ঘরের ভেতর বিছানায় শুয়ে লেপটাকে আরো ঘন করে টেনে নিয়ে বেডল্যাম্পের পাশে খস খস করে লিখে যায় এলিজাবেথ, বুকের রক্তে ভেজানো ছন্দ—যা তাকে মাতাল করে দিয়েছে—

“হে হৃদয় ওগো—তোমায় আশ্রয় তফাৎ রয়েছে কত
জীবন তোমার প্রাচুর্যে ভরা আমার হৃদয়ে ক্ষত
তুমি দেবদূত হুপাশে দাঁড়িয়ে মুখ চাওয়া চাওয়া করে
সংঘাতে তার শুধুই বেদনা ঝরে”—

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভেসে আসে রবার্টের।

৩১শে মার্চ, ১৮৪৫

মিস্ ব্যারে,

এমনিই একটি সূর্যঝরা সকালকে যেন চেয়েছিলাম আমি তোমার জন্ত। এখন ঘড়িতে ১০টা বাজে, এখন বল এই দশটার সময় আমার অন্তরের শুভেচ্ছা তোমার কাছে পৌঁছিয়েছে কি না। আমি আমার জীবনের সমস্ত সম্পদ তোমাকে দেব, যা তুমি চাও, যেন সেই প্রাচুর্য তোমার ওই শুকনো মুখেতেও একটুকরো হাসি ফোটাতে পারে।”

এরপর এক অদ্ভুত স্তব্ধতা। হুপকই অকারণে নীরব। কিন্তু রবার্টকে নীরব থাকলে চলবে না। দাবার চালে একটির পর একটি চাল দিয়ে চলেছে সে, অপেক্ষা করছে কবে কৃতকার্য হবে, তাই আবার লেখে।

১৩ই এপ্রিল,

কাল তোমার বাড়ির দিকে গিয়েছিলাম উইমপোলা স্ট্রিটের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত, একটির পর একটি বাড়ির নম্বর দেখে দেখে, যে পর্যন্ত না তোমার বাড়ির সামনে

এসেছিলেন। সোমবার, গত রাত্রে, যখন কোনো কিছুই করবার নেই তখন তোমায় লিখতে বসেছিলেন, সে এক বিচিত্র লেখা, তা আমি তোমায় বলতে পারব না, অথচ সেই সময়ে সেই পারিপাশ্রিক সেই কথাগুলি বেড়িয়ে আসা একমাত্র সম্ভবপর, তাদের বাদ দিয়ে আমি লিখি কি করে তোমায় ?

চিঠিটা এসে পৌঁছয় এলিজাবেথের কাছে। যুহু হাসির রেখা ফুটে ওঠে তার ঠোঁটের কোলে। রবার্টের মনকে দর্পণের মত দেখতে পায় যেন সে। বন্ধু ছাড়া আর কোনো চাহিদা ছিল না তার নিজের, কিন্তু প্রেমে পড়ে গেছে রবার্ট। সে চায় এলিজাবেথকে, তার আশা স্পর্শ করেছে এলির আশাকে। আর তা যত ভাড়াভাড়ি হয় ততই মদলকর, ততই শুভ।

কিন্তু নিজের দুর্বলতাটাকেও চাপতে পারে না এলিজাবেথ, সেও লেখে।
প্রিয় আউনিং,

তুমি যদি জানতে কভার আমি লিখেছি তোমাকে, এই চিঠি নয়, এর থেকে আরো ভাল আরো সুন্দর একটি চিঠি—আমার দীর্ঘ নীরবতার মাঝে—তখন তোমার একবারও মনে হত না যে পূর্ববাতাস কোনো কিছু অনিষ্ট করতে পারে, আমার মন থেকে তোমার দাঁপকে নির্ধাপিত করতে পারে, হাতে কলম নিয়েছি তোমায় লিখতে গেছি কিন্তু তা শুরু হয়ে গেছে, কেন তা আমি বলব না তোমায়, তুমি দেখ তোমার সমস্ত লেখা পূর্ববাতাসকে পরিবর্তন করে দিতে পারে না। একদিন সকাল দশটার সময় তুমি তোমার সমস্ত শুভেচ্ছাকে জানিয়েছিলে তা আমি ভুলে যাইনি, তাই বলছি, সেদিন আমি সত্যি বলেছিলাম যদিও সেদিনটি অনেকদিন চলে গেছে। অতএব যুক্তিসঙ্গতভাবে আমি বলব আমার কথা তোমার মনেই পড়ত না যদি না পূর্ববাতাসের কথা স্মরণ হত তোমার, যাই হোক, একথা তুমি কখনো বল না যে আমি ভাল আছি কিম্বা আমি যা নয় তাই। আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রত্যেক জীবনের একটি অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, এবং তা হওয়া উচিত বিচিত্রতর—অথচ ভেবে দেখ আমার মত একজন লোক, কবি হয়েও যার জীবনের সমস্ত দরজাগুলো বন্ধ, কি অদ্ভুত বেদনাময় অবস্থা। আর তোমার ওপর যা কিছুই আঘাত করুক তা রেখার মত দাগ কেটে যায়। তা আনন্দ হোক বেদনা হোক আর ঘৃণাই হোক, তা তোমাতে প্রতিফলিত হয়ে অদ্বাদীভাবে মিশে যায়।

চিঠি শেষ হয়ে আসে। এলিজাবেথ তার গাভীরকে বজায় রেখে কলমকে চালনা করে নিয়ে এসেছে, নিজের অণু-পরমাণু ভেঙ্গে পড়া হৃদয়ের রাস আর কিন্তু বশ মানেন না। নিজেকে সে বলতে চায়, মেলে ধরতে চায়, ফুল হয়ে ফুটেতে চায় দয়িতের কাছে—

তোমার চিঠি পেয়ে কত সুখ কত আনন্দই না পেয়েছি, কত অপক্লপ নাশুর ভরা আনন্দ যে আমি তোমায় ঠিক বলতে পারছি না।

চিঠিটা নিয়ে কুকের পাশে রেখে চোখটা বুজে আসে এলিজাবেথের, সুখের প্রচ্ছন্ন প্রাণমন তার ভরপুর হয়ে আছে, কিবা ঘুমে কিবা জাগরণে এক কাহনাজড়িত স্বপ্ন—সেই স্বপ্ন যে কি তা আর ঠিক বলতে পারে না এলিজাবেথ—শুধু বুক ভরে অনুভব করে। এর পর শুরুতা। তারপর আবার লেখে রবার্ট।

৩০শে এপ্রিল,

প্রিয় মিস্ ব্যারে,

তুমি যদি জানতে সোমবারের পরে কলম আমাকে নীরব করেছে কেমন করে। প্রায় পনের মিনিট ধরে শুধু আমি এই চিন্তাই করছি কেন আমি কিছু লিখতে পারছি না, কালি শুকিয়ে গেছে কলমে, এ আমার জ্ঞানগর্ভতা না নিরুদ্ভিতা।

আবার স্তব্ধতা, আবার নীরবতা। ক্লান্ত পদক্ষেপকে কাটিয়ে কেন উত্তর দিতে পারে না রবার্ট, এইবার পরিষ্কার করে মেলে ধরে সে।

এক অদ্ভুত মাথার যন্ত্রণা আমায় পেয়ে বসেছে। খুব কড়া ব্যায়ামে যদি তা একটু ছাড়ে। কিন্তু আমার লরিয়ার কাব্যসাধনা থেকে তা আমায় বারবার বিচ্যুত করে। এখন আর কিছু নয়, ১২ই তারিখে মিঃ কেনিয়নের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আমি। কই কথা বল, কেমন আছ এখন তুমি, যদি আজও স্বাস্থ্য তোমার ভালর দিকে না-যেয়ে থাকে তবে আমি দেখা করব না, এ জড়তাকে মুক্ত করবার ইচ্ছে আমার নেই। যদিও জানি গাছের ডালে ডালে ফুলের কুঁড়ি দেখা দিতে শুরু করেছে। ভূমিকম্পের মাঝে ছোট ছোট পাহাড় নড়ার মত নাচছে তা হল দক্ষিণপশ্চিম বাতাস নিশ্চয়।

এলিজাবেথ কিন্তু চিন্তায় পড়ে যায় রবার্টের অসুস্থতায়। সে যেন ঠিক ভাবতে পারছে না, কলম ব্যঙ্গ করে ওঠে।

জ্ঞানী লোকেদের ব্যাপারই আলাদা, সারারাত জেগে তারা লিখবে ছটা অবধি, আবার নটার সময় আসবে টেবিলের পাশে, আশ্চর্য। বলতে পার এই ভৌতিক কার্যকলাপের মাঝে তোমার লরিয়ার আবির্ভাব হবে কি করে? কিন্তু এর শেষ হবে কবে? আমি বুঝতে পারি না, এর যৌক্তিকতা কোথায়, যখন অষ্টার জীবন একটা জীবন নয়, দুটো জীবনের সমন্বয়, সেখানে খাওয়া খাকা ছাড়াও চিন্তা করতে হয় সৃষ্টি করতে হয়। তাই প্রয়োজন আরো বেশি ঘুমের।

বেদনায় হুঃখে মমতাবোধে ভরে আসে এলিজাবেথের বুক।

১২ই তারিখে তুমি তাইলে যাচ্ছ মিঃ কেনিয়নের কাছে। আমার ভাই এবং বোনেরা সেখানে একদিন রাত্রে খাবারের সময় দেখা করবে তোমার সঙ্গে। কিন্তু আমি কবে দেখা করছি তোমার সঙ্গে? তাহলে নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে হয় আমার একথা, এ বৎসর মে মাসের মধ্যে, হ্যাঁ নিশ্চয় যে, ইংলণ্ডের বসন্তের বাতাস এবার তার পাখা মেলে দিয়েছে, আমি এখনো নিচে যেতে পারি না। কিন্তু আমি আগের থেকে অনেক সবল অনেক ভাল এবং আরো ভাল আমি হব।

এরপর এক ভয়াবহ চিঠি। এলিজাবেথের জবাব না পেয়ে তার উদ্বিগ্ন হৃদয়কে আর চাপতে পারে না সে।

তোমার মাথাধরা কেমন আছে? মিঃ কেনিয়ন কাল এখানে এসে এক অদ্ভুত খবর জানিয়ে গেলেন। বিশ্বাস করো সারারাত ঘুমোতে পারিনি আমি। আগে বল সত্যি এখন কেমন আছ তুমি? তারপর আমি বলব কবে দেখা করব আমি

তোমার সঙ্গে, মঙ্গলবার বলেছি তুমি, সোমবারের বদলে, আমি তোমার চিন্তা করছি,
তোমার সঙ্গে দেখা হবে মঙ্গলবার, বোনের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। ইতি,
তোমার বন্ধু—ই, বি, বি

আমার প্রিয় বন্ধু,

আমার অন্তরের থেকে ধন্যবাদ। যদি তুমি আমায় জিজ্ঞাসা কর আমাকে
নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে কখন আমি দেখা করব তোমার সঙ্গে। আমি তোমাকে
বলব, অস্বস্তি করব, আমার সঙ্গে দেখা না-করতে যতদিন তুমি অসুস্থ থাকবে কিম্বা
আমার প্রতি অবিশ্বাস রাখবে।

না...না...তা আরো সুন্দর। আমার সঙ্গে তুমি দেখা করো তোমার যখন
সুবিধা হবে। কেবল চিঠি লিখে জানিও না।

তোমার রবার্ট

এ চিঠি পড়ে কিন্তু অবাক হয়ে যায় এলিজাবেথ, কি বলতে চায় রবার্ট।
অবিশ্বাসভাজন,—তার জন্ম দেখা করতে না-চাওয়া সব যেন ঘুলিয়ে যায় তার, সে
তাই লেখে।

কিন্তু অবিশ্বাসভাজন বলতে তুমি কি বোঝ? আর তা কেমন করে সম্ভব?
কি বলেছি তোমায় মনেই করতে পারছি না ঠিক, কি বললাম, বড়জোর বলেছি এটা
নয় ওটা, আজকে নয় কালকে, আর তুমি ভুল বুঝলে। লক্ষ্মী বলছি, আমায় ক্ষমা
করো, আমি স্বভাবতঃই লাজুক। আমার অভিজ্ঞতায় আর অবস্থায় এই দীর্ঘ একাকিত্বে
সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলিই শিথিল হয়ে গেছে। আর এরই ফলে তুমি ভুল বুঝেছ,
বলেছ আমায় লাজুক অকৃতজ্ঞ, শুধু অবিশ্বাসিনী নয়। আর কিছুই আমার বলবার
নেই, শুধু জেন, অবিশ্বাসের পাত্রীরা এমনি খোলাখুলি ভাবে লেখে না।

সমস্ত জিনিসটা তুমি নিজে ভাল করে ভেবে দেখ, আমাকে দেখবার
কিছু নেই। কিম্বা জানবারও কিছু নেই। লওনে যেমন ধরনের কথা তুমি বল
সে কথা বলতে পারার শিক্ষাও আমার নেই। যদিও মিঃ কেনিয়নের মত ধারাল
কথাকে উপলব্ধি করার মত ক্ষমতা আমার আছে। আমার কবিতা যদি কারুর ভাল
লেগে থাকে সেই আমার হৃদয়ের একমাত্র কুল, আমার আনন্দ, আমার সৃষ্টি।
আর বাকী যা-কিছু তা সবই শাখাহীন মূলের মত মাটির তলায় অন্ধকারে থাকবার
যোগ্য। এ-সব কথা যদি তোমায় বলি তা হাস্যকর ছাড়া আর কি হবে
তোমার কাছে। সত্যি, তোমার আশ্রয় আশ্রয় স্পর্শ করেছে আমার হৃদয়কে, আমি
যেন বুঝতে পারছি। তবে এস বন্ধু সত্য ও সরলতা উদ্ঘাটিত হ'ক তোমার চোখের
সামনে। আর আমি তোমায় বাধা দেব না। তুমি মহৎ ও উদার, আমি তা
নিত্য অনুভব করি, তাই অবিশ্বাসের বদলে তোমার প্রতিভার ওপর আমার চিরন্তন
আর পূর্ণ বিশ্বাস। বিশ্বাস কর এ আমার অন্তরের কথা।

এর উত্তরে শেষ জবাব ভেসে আসে রবার্টের দৃঢ়কণ্ঠে :

প্রিয় মিস্ ব্যারে,

তোমার এই সম্মতির জন্ম তোমায় কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। মঙ্গলবার

হুটোর সময় আনি নিশ্চয় যাচ্ছি, তারিখটা খুব কাছে, এর ভেতর যদি কোনো অঘটন ঘটে তুমি সময় পাবে আমাকে জানাতে ।

এর পরও ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠস্বর ভেসে আসে এলিজাবেথের । সমস্ত বাঁধন তার ছিঁড়ে গেছে—আসবেই রবার্ট, ওজর আপত্তি কোনো কিছুই শুনবে না, তবে এই পছন্দেই দেখে দেখে যদি ফিরে যায়, নন বলে, না—না কিন্তু বারণ করবার আর উপায় নেই, অসহায়ভাবে তার শেষ কথা সাজ করে এলিজাবেথ, করুণ তার সুর-বেদনার্ত তার ভাষা, বিবাস্ত তার ভঙ্গী । মঙ্গলবার আমি প্রস্তুত থাকতে চেষ্টা করব, তবুও তুমি, পৃথিবীর যে অনেকখানি দেখেছে আর জানে, আশা করি আমার এই পারিপাশ্বিক অবস্থাকে সত্যকারের উপলব্ধি করতে পারবে, দরজার ভেতরে বন্ধ করা এই দীর্ঘকালের জীবনকে, আর বুঝতে পারবে এতদিন পরে সেই বন্ধ দরজাকে খোলবার প্রয়াস কি হাম্বকর । - কি অদ্ভুত তফাৎ হুটো জীবনের, কেবল আসবার আগে তোমাকে দেখা করবার জন্য রান্ধী হওয়ায় ক্ষমা করো আমাকে । যখন তুমি অপার দয়ার কথা বল, এই কি তার নির্দয়তম নমুনা, আমার ওপর প্রয়োগ করেছ তার শয়তানী । কিন্তু বন্ধ মঙ্গলবার অবধি আমরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধ থাকব তারপর বোধহয় তারপরেও—আর আমি জানি না ।

এরপর ২০শে মে ১৮৪৫ । এক সূর্যবরা দিন । এগিয়ে আসে প্রথম দর্শনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি, বড়িতে তিনটে বাজে ঢং ঢং করে । পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দেয়, একরাশ ঝড়ো হাওয়ার মত ঘরে এসে ঢোকে রবার্ট । সর্বাঙ্গে তার সূর্য ঝলমল করছে, কণ্ঠে গান ।

বিছানার একপাশে বসে এলিজাবেথ । ক্লান্ত, বিষণ্ণ একটি পাখী আর তার বেদনার গান, শুধু ভাষা ভাষা হুটো চোখ তুলে হাসতে চেষ্টা করে সে । পাতলা ঠোঁটেতে অবাধ্য একটা চেউ খেলা করে যায় । ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখেতে এসে পড়ে কি এক আলো ।

অভিবাদন করে সামনে এসে বসে রবার্ট । চারপাশে বইখাতা এলোমেলো ছড়ানো । ঘরের দরজা-জানালা সমস্ত বন্ধ, তার মাঝে এলিজাবেথকে যেন মর্মরমূর্তির মত লাগে ।

আজকে আমার মত সুখী কেউ নেই । বলে ফেলেই লজ্জিত হয় রবার্ট । প্রথম দর্শনেই গভীর প্রেমে পড়ে যায় সে । তবু অতকিতে কথাটা বের হয়ে যাওয়া উচিত হয়নি ।

কিই-না হবে তোমার আমাকে দিয়ে । মিছেই বালিতে জল ঢালছ । আমি তোমার কাছে বোঝা ছাড়া আর কিছুই হতে পারব না কোনোদিন ।

মর্মরিত স্বরে কথাগুলো বেরিয়ে আসে এলিজাবেথের । প্রাণহীন প্রতিমূর্তির মত ভেসে আসে তার কণ্ঠস্বর ।

এর চেয়ে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেও দুঃখ পেত না আউনিং । কিন্তু এই বেদনা তার অন্তঃস্থলে তল্লীতে গিয়ে যা মারে ।

তবু ধৈর্য হারায় না রবার্ট । আস্তে আস্তে ধীরপদে এগোতে হবে তাকে ।

হৃৎ, বেদনা, কষ্ট সবকিছুকে অতিক্রম করতে হবে। বেশি কথা বলে না রবার্ট।
ধীরে ধীরে উঠে পড়ে এবার।

ওনছো।

পেছন ফিরে তাকায় একবার। একটু একটু করে এগিয়ে আসে বিছানার
সামনে। লক্ষ্যনত দুটো চোখ।

কি একটা বলতে গিয়েও বলতে পারছে না এলিজাবেথ।

কিছু বলবে?

আবার কবে আসবে?

মাথাটা নিচু করে হাতের তালুটা বিছানার ওপর নীরবে ঘসতে থাকে।
আর বলতে পারে না সে।

হৃৎলতাটা ধরা পড়ে গিয়েছে যেন, বেদনাতুর একটা হৃদয়ের আহ্বান।

আসবধন।

কথাটা ছোট করেই শেষ করতে চায় রবার্ট। সে উদ্দাম ছরস্ব একটা ঝড়ো হওয়া,
সময়ের গতিবিধি নেই, নেই জীবনের নির্দিষ্ট গতিপথ, নিয়ন্ত্রণহীনতা তার কাছে অপরাধ।
না। মুখটা গম্ভীর হয়ে যায় এলিজাবেথের।

ওসব আমি শুনেই চাইনে কবে কবে আসবে বলে যাও। সপ্তাহে দুদিনের
বেশি নয়। কিন্তু—তা নয়ত বড় বিত্রি দেখায়।

এলিজাবেথের মুখের দিকে তাকায় এবার রবার্ট। কঠোর আদেশ।

ডাউনিংকে আদেশ করবার এত ক্ষমতা অধিকার সে পেল কোথা থেকে। মনে
মনে হাসল সে।

এলিজাবেথের হৃদয়টা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। এ আদেশ করবার অধিকার
কাউকে দিতে হয় না।

মনের এই বিশেষ মানুষটি আপনাপনিই একদিন শক্তির দণ্ড ধরে বসে।
কাকুর অহুসতির অপেক্ষা রাখে না। বুঝতে পারে ডাউনিং তার অধ্যবসায় জয়যুক্ত
হয়েছে। এলিজাবেথও ভালবেসেছে।

বেশ।

তবু এলির চিঠির অক্ষরগুলো সত্যক, প্রহরীর মত হকুম জারী করছিল। তাই
গম্ভীরভাবে উত্তর করে রবার্ট। কবে কবে আসব বল।

সেটা তোমার ইচ্ছার ওপর। একদিন যদি না আস তার বদলে আর একদিন
বাছতে পার। কিন্তু নোটনাট সপ্তাহে দুদিন।

তবে মঙ্গল ও শনিবার।

তাই কথা রইল।

মুখটা আর তুলল না এলিজাবেথ, যদি মনের ইতিহাসের এই গোপন
পৃষ্ঠাগুলোর পাঠোদ্ধার করে নেয় রবার্ট।

কিন্তু রবার্টের যা জানবার তা জানা হয়ে গেছে। ধীর পুনরুদ্ধারে বেরিয়ে যায় সে।

[ক্রমশ]

রুশ-ভারত সংস্কৃতি-মৈত্রীর একটি স্মরণীয় অধ্যায়

॥ ভগবদ্গীতার রুশ অনুবাদ ॥

এন, আনিকেইয়েফ

প্রত্যেক জাতির আধ্যাত্মিক সম্পদগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি মানব-মনীষার চিরস্মরণীয় অবদান রহিয়াছে যেগুলি সেই জাতির নিকটে একান্ত প্রিয় ও পবিত্র এবং যেগুলি তাহার প্রেরণালাভের এক চিরন্তন উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি সৃষ্টি রহিয়াছে যাহা বিশ্বের সর্বমানবের স্বীকৃতি অর্জন করিয়াছে, এবং ভারতীয় জনগণের অমর রচনা ভগবদ্গীতা যে এগুলির অন্যতম তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

॥ ভারত-সোবিয়েৎ বাত্বের উদ্দেশে ॥

সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে এই ভগবদ্গীতার একটি পূর্ণাঙ্গ রুশ অনুবাদ ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল সংস্কৃত হইতে নিখুঁতভাবে ইহা অনুবাদ করিয়াছেন সোবিয়েৎ বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য বি, স্মিরনফ এবং ইহা তাহার বিশ বৎসরব্যাপী পরিশ্রমের ফল। আশ্চর্য্যবাদ হইতে তুর্কমেন বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছে।

ভগবদ্গীতার সহিত পরিচিত হইবার পরে সোবিয়েৎ পাঠক নিঃসন্দেহে মানবসংস্কৃতির ভাঙারে ভারতীয় জনগণের অবদান সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বুঝিতে ও মূল্যায়ণ করিতে পারিবে। ভারত ও সোবিয়েৎ দেশের জনগণের আধ্যাত্মিক বিকাশের মধ্যে যে কতটা মিল রহিয়াছে তাহাও সে উপলব্ধি করিতে পারিবে। তাই, রুশ অনুবাদে এই গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য বুঝিয়াই অনুবাদক তাহার এই শ্রমফলকে উৎসর্গিত করিয়াছেন “ভারতের ও সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের বাত্বের উদ্দেশে।”

॥ স্মৃগভীর জীবন-সিদ্ধাসা ॥

যেসব ভাবসম্পদ ও দর্শন-চিন্তার জন্ম ভগবদ্গীতা বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে, সোবিয়েৎ পাঠকসমাজের এক ব্যাপক অংশ সেগুলির প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হইবে। ভগবদ্গীতার বক্তব্য ও দার্শনিক সূত্রগুলি স্মৃগভীর কাল হইতে ভারতবর্ষে এবং দেড়-শতাব্দিক বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রবল বিতর্কের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ, এক প্রাচীন প্রবাদবাক্যের পুনরুজ্জীবিত করিয়াই স্মন্দরভাবে বলা যায়, ফলভারে আনত গাছকেই লোকে বেশি করিয়া নাড়া দেয়। মানুষের অস্তিত্বের অর্থ, ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক, কর্তব্য ও হৃদয়বেগের মধ্যে সংঘর্ষ, মুক্তি ও প্রয়োজনের মধ্যে বিরোধ ইত্যাদি প্রশ্ন সম্পর্কে যেসব প্রশ্নে স্মৃগভীরভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, ভগবদ্গীতা সেগুলির একটি বিশিষ্টতম উদাহরণ।

ভগবদ্গীতার এই রুশ অনুবাদে ডুমিকায় স্মিরনফ লিখিয়াছেন, নৈতিক প্রশ্নগুলিকে এক বিশ্বজনীন মানবিক সমস্যা হিসাবে তুলিয়া ধরা হইয়াছে যেসব রচনায়, সেই রচনাগুলির মধ্যে ভগবদ্গীতা হইল প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি; এই প্রশ্নটির আলোচনাকে এমন এক গভীরতায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে যে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি

বাধ্য হয় নিজের অস্তিত্বকে বিশ্বজনীন নৈতিক নিয়নের অধীন বলিয়া স্বীকার করিতে। এই জন্যই ভগবদ্গীতা তাহার চিরন্তন আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক মূল্য হারাইতে পারে না।

॥ অনুবাদক প্রসঙ্গে ॥

ভগবদ্গীতার রুশ অনুবাদক আচার্য বি. শ্মিরনফের জীবন রীতিমত বৈচিত্র্যময়। তাঁহার পেশা হইল ভেষজ-বিজ্ঞান—ভারততত্ত্বের এলাকা হইতে বহু দূরে। কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন অভিজ্ঞতায় ও জ্ঞানে সুসমৃদ্ধ। ইহারই ফলে তাঁহার যে জীবনদর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে, হয়তো তাহাই তাঁহাকে গভীরভাবে ভগবদ্গীতা উপলব্ধি করিবার এবং ইহার ভাবসম্পদকে এতো সুন্দরভাবে ভাষান্তরিত করিবার ক্ষমতা জোগাইয়াছে। এই রুশ অনুবাদকের সহিত তিনি যে সুবিস্তৃত ভূমিকা ও খুঁটিনাটি টীকা-ব্যাখ্যা-ইত্যাদি সংযোগ করিয়াছেন তাহা শুধু অনুবাদকের ব্যাপক ভাষাতাত্ত্বিক ও বৈয়াকরণিক জ্ঞানেরই পরিচয় দিতেছে না, সেই সঙ্গে তিনি যে কত গভীর ভাবে মূল রচনাটির মর্মকথা ও ভাবসম্পদকে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহারও প্রমাণ দিতেছে।

শ্মিরনফ ভগবদ্গীতার কাব্যগত ও ভাষাগত রূপরীতিগুলি খুঁটাইয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গের বিভিন্ন ভাষ্যের অনুশীলন করিয়াছেন।—ইহারই ফলে তিনি অধিকাংশ ভারতীয় পণ্ডিতের এই মতের সপক্ষেই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে ভগবদ্গীতা হইল একটি সামগ্রিক ও অখণ্ড রচনা অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে ইহার বিভিন্ন অংশ রচিত হইয়াছে বলিয়া কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত যে-মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। উইন্টারনিৎস্, প্রোয়েডার, গার্বের প্রভৃতি পাশ্চাত্য গবেষকদের মতে, ভগবদ্গীতার কোনো কোনো অংশ প্রক্ষিপ্ত হইবার ফলে ও পরবর্তীকালে উহার ভাষাগত সংস্কার সাধন হইবার ফলে উহা অত্যধিক সংস্কৃতবহুল ও তুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং যে ধর্ম-দর্শন নীতিগত বিচারবিষয়গুলিকে এই প্রসঙ্গে উপস্থিত করা হইয়াছে সে সম্পর্কে ইহার বিশ্বদৃষ্টির মূল প্রত্যয়টির ধারাবাহিকতাও অক্ষুণ্ণ থাকে নাই।—শ্মিরনফ পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিমালা বিস্তার করিয়া এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

॥ ভগবদ্গীতার সামগ্রিক অখণ্ডতা ॥

শ্মিরনফ বলিতেছেন, “ভগবদ্গীতার যে-অংশটুকু প্রক্ষিপ্ত তাহা এই রচনাটির সামগ্রিক অখণ্ডতাকে মোটেই ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই—ঠিক যেমন সেক্সপীয়রের কতকগুলি নাটকের কোনো সংলাপ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সম্প্রহাতীভরূপে প্রমাণিত হইলেও সেই নাটকগুলির সামগ্রিক অখণ্ডতা মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বরং, ভগবদ্গীতায় যে এত কম প্রক্ষিপ্ত অংশ রহিয়াছে সেইটাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—কারণ শত শত বৎসর ধরিয়া লোকের মুখে মুখে প্রচলিত এই রচনাটি গণচেতনায় এমন গভীরভাবে প্রস্থিবিদ্ধ যে ইহার সামান্য ভাষাগত পরিবর্তনে মৌল দার্শনিক তাৎপর্ষ্যের কিছুই পরিবর্তন ঘটে নাই।”

ভগবদ্গীতার মূলগত ভাবসম্পদের ও জীবনদর্শনের সামগ্রিক অখণ্ডতা সম্পর্কে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত হইতেই শ্মিরনফ ঘোষণা করিয়াছেন যে “ভগবদ্গীতার রচনাভঙ্গী ও ভাষা বিচার করিয়া ইহার আদি রূপটিকে বহু পূর্ববর্তী সংস্কৃত রচনাবলীর শ্রেণীতে ফেলা যায় এবং ইহা উপনিষদগুলির সমগোত্রীয়।” ভারতীয় পণ্ডিতগণও এই মতেরই পরিপোষক।

তাসের সৌভাগ্যে

অজর, আমার আবালোর নদীর তীরে

মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

চরের কোমল বিছানায় আরোগ্যার্থে প্রতীক্ষায় যে-নৌকোটা
তার বুকের নিচেই সবচেয়ে রাত্রির মতন অন্ধকার,
হয়ত বা অন্ধকারের চেয়েও আরো ;
সে-ই ধমকে এসে বসল স্তনের মত একটা চেউ-এর চুড়ায়
যে মুহুর্তে অস্ত্র যাবার জন্যে এদিকে পাশ ফেরল সূর্য । তখনও
তখনও আমি বুঝিনি আমরা পরিচিত ।

বালির শীতল সিক্ত অশ্রুভব ছেড়ে
কে লোকটা উঠে চলে গেল । প্রথমে গাছের পত্রালির অস্তঃপুর
পরে ঘাটের পুরনো ভাঙা অক্ষুট সিঁড়ির আবছায়া
শেষে সব শূন্য করে
সব ক'টি পাখিই মিলিয়ে গেল দূরান্তে । তবু,
তখনও আমি জানি না ও আমাকে ডাকবে ।

তারপর ও আমাকে ডাকল
আমার শিশুবয়সের বাতিল অনভ্যস্ত নাম ধ'রে ডেকে
আমার চোখের নিচের অপরিচিত তরাই-এর বিষয়ে জানতে চাইল, তখনই
আমি বুঝলাম ও আমাকে জানে অগ্রজ যন্ত্রণার মতই, আমিও
অ বাক হলাম ওর সত্তার শূন্য সৈকতের দিকে চেয়ে, আর
তখনই আমার মনে হল ওকে চিনি ;

কী ভারি ওর নিঃশ্বাসের শব্দ
গভীর গভীর একটা কান্না
যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে শ্রোতের ঐতিহাসিক ফাটল দিয়ে । কিন্তু
ওর ত সমুদ্র হবার স্বাক্ষর ছিল, ওর
অন্যলগ্নের যে নক্ষত্রটা একবার মাত্র জলে উঠেই হারিয়ে গেল
নীল অন্ধকার সমুদ্রে, তারই অন্বেষণে
ও ত সমুদ্রই হয়ে যেত একদিন !

জলে জলে ঢোলখাওয়া উন্মাদ স্বপ্নের মত বিড় বিড় ক'রে
 ও কিছু বলতে চাইল বোধহয়, আর তখনই
 আর একটা দিনের অন্ত্যেষ্ট শেষ ক'রে
 সন্ধ্যার প্রথম সতর্ক তারাটা জলে উঠল, আর তখনই
 ও মুখ ঢাকল ওর করপুটের লালিত অমাবস্যা'য়—
 অন্ধই যেন এড়াতে পারে ত্রিশকু হুঃসময়কে !

ওর খুব কাছে গিয়েও ফিরে এলাম
 ওকে আর জাগলাম না, নিষেই দেখুক ও
 ওর করপুটের বিষাদ মগ্নন ক'রে
 ওর চতুর্দিকে রাত্রি কেমন ফেনিল বিজ্ঞপ হয়ে উঠেছে, অন্ত্যাকাশে
 দেখুক না ও নিষেই
 আরো একটা সূর্যের সস্তাপকে বুকে নিয়ে সন্ধ্যাতারাটা কী ভীষণ হয়ে উঠেছে ।

ওর খুব কাছে গিয়েও ফিরে এলাম, ওকে—
 আমার অস্তিত্বের আকাঙ্ক্ষার অন্ততম সেই অশ্রুশোচনাকে
 জাগলাম না আর, বুঝলাম
 অশ্রুশোচনের সেই রহস্যলোকিত দুর্লভ নক্ষত্রের অন্বেষণে বেরিয়ে
 একটা গভীর গভীর কান্নার আবর্তে ও জড়িয়ে পড়েছে, বুঝলাম
 প্রতিদিনের আকাঙ্ক্ষায় ওর জন্ম, আর
 প্রতিসন্ধ্যায় আকাঙ্ক্ষার আক্ষেপে ওর মৃত্যু ।

শিয়ালদায়

চিত্তরঞ্জন পাল

চোখে জল ভরে আসে শিয়ালদা ইন্সটিশানে গেলে ।
চতুর্দিকে স্তুপাকার মানুষের আবর্জনা ঠেলে
যান্ত্রিক নিয়মে চলে প্রাত্যহিক যাত্রীদের পাড়ি
ইতস্ততঃ কর্মক্ষেত্রে । ছত্রাকার সংসারের হাঁড়ি ।
ভিক্ষা মাগে শিশুপাল । মর্মান্তিক একটানা সুরে
আগামী ভারতবর্ষ ট'্যা ট'্যা করে বে-আক্ৰ আঁতুড়ে ।
পান সাজে, জুতো মাছে বাপুজীর দেশের কিশোর—
অনুর্ঘম্পশ্চারও ধূপকাঠি বেচে যাজ্ঞা নিশিষ্ঠোর ।

মাংসের মাণ্ডল দেয়, চায়ের দোকান আলো করে
অনুচ্চ সাবিত্রী সব ; বেকারের দীর্ঘশ্বাস ঝরে
উদাসীন রাজপথে । বাঁচার মিনতি কড়া বুটে
চুরমার ; সে-জ্বালার বিজ্ঞাপন এঁটে মধু লুটে
যে ভান ভাবের ঘোরে স্বহস্ত-বীর্ষ দেয় নাড়া—
জ্ঞানে না খাণ্ডব-বনে বৈশ্বানর দিতে পারে সাড়া ।

কবিতাবলী

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

॥ অষ্টপদী ॥

চুড়ায় কেশর কুল দিতে তোর কি যে ভালো লাগে,
প্রেম—আহা, ক্রনোত্তর পুণ্যময় করুণ ব্যক্তিত্ব,
নিছক অশ্রুর বাহা, চুড়ার কেশর পদতলে
অতীতীয় সম্মেলনে যে গান আভাগচ্ছলে আগে ।

শিরশ্চূড়া পড়ে থাকে মস্তকের নতো পদতলে,
রক্তাক্ত কবন্ধ একটি হৃদয়ের নুলো মূল্যহীন ;
কী শোক স্বত্বকে পায় না, কাকে পাবে অনিদিষ্ট কালে ?
সমস্ত বিনয়, ধৈর্য, অনাবর্ত থাকে চিরদিন ।

॥ উত্তরা, স্পর্ধিত সভা ॥

ভালোবাসা কি সে মানায় ? অন্ধকারে
কার কথায় ফেণার বিম্ব উপকূলের পদচিহ্নে জ্বলো...
জীবন পুড়ে গেলে অমন সফেন স্মৃতি তোমার সাগর বলয় ।
কালো কয়েকটি নুতন দেহ তীরবর্তী নিবিড় কোতুহলে...
প্রোচ রেখা, অল্পবয়স, অসমুদ্র-অভিজ্ঞতায় দক্ষ ।
আমি প্রচুর মনোযোগে সঙ্কল্পিত কোমল বিম্বগুলি
বস্ত্রভরে রেখে দিলাম সামিয়ানার শান্ত তলদেশে...
ব্রাহ্ম্যমান প্রতিধ্বনি ফিরে এসে বুকের ভেতর বললো :
ভালোবাসার অন্ধকার এবার শুরু হয় ।
কালো কয়েকটি ছায়ার সভা প্রান্তরেখার নিচে
প্রেমের ধ্যান পরিশ্রমী শিল্প দেখে তন্ময় ফটিক ।

• ॥ গীমাস্তের স্বপ্নান ॥

দুর্লভ নাধুর্য রাঁখো পানপাত্রে শান্ত,
জ্যোৎস্নাময় চতুর্দিক কে ক্রত নুপুরে ভরে দিলে ?
সন্ধ্যাবেলা পথরেখা অরব তোমার যাত্রা প্রেমহীন শোক
ভেবেছিল ।

এখন এমন নৃত্য উপহার ? পত্রপাত
 বায়ুগানী সময়ের সতর্কতা ভুলে যাবে।
 নর্তকী, প্রাচীন সব আত্মীয়তা ভাগমান স্মৃতিশ্রোত,
 পরিপুষ্ট উৎসবের উজ্জ্বলতা নাটমঞ্চ ঘিরে—
 আনন্দিত ঝর্ণারেখা, সম্বল সুরভি ।
 তারপর ক্রান্ত প্রোচকালে
 ওই পথ, বন্ধু পারিচিত অরব নুপুর শুনে
 বুঝবে তুমি শূন্যপাত্র ফিরে আসছে দেশে...
 চতুর্দোলা...নিচে বানুস্তূপ সাদা ভৌতিক কঙ্কাল ।

লীলাবতীদের উৎসর্গ

মানস রায়চৌধুরী

ভেবোনা রেখেছি কাছ আকাঙ্ক্ষায় দিগন্তবিস্তৃত,
নীরস্ত অধরে নেই শুভ শুচিন্মিত
প্রেমিকের সন্তোষ। নিদ্রাহীন ছুচোখে জ্বালিনি
মিলনের আমন্ত্রণ অথবা রহস্যময় বাণী—
—সব স্নেহে আসতে চাও এসো তবে...শূন্য অন্ধকার
প্রণয়ের প্রতিদানে পাবে হয়তো দগ্ধ হাহাকার।

প্রেমের মদির ভাষা আমার অজানা আর বলি
বসন্তসখাও নই, পঞ্চমে কাঁপেনা বনশ্রলী।
কেননে রাঙাতে হয় তোমাদের সুকোমল মন
তা-ও তো শিখিনি সখি, এই শাস্ত্রে রয়ে গেছি আনাড়ি ভীষণ।
বুধাই ভাবছো বুকে ঠাই পাবে নিশ্চিত উত্তাপে
পরিণামে অবসাদ, যৌবন কুরোবে কেন ব্যর্থ মনস্তাপে ?

হয়তো জানোনা তাই কল্পনার হাতে হাত রাখো
রোমান্সিত ভাবনায় পার হও ঠাণ্ডা জ্বলা, নড়বড়ে সীকে।
চরণ ফেলোনি আঁধো অন্ধকারে...কাঁটাভরা মাটি...
সহসা জানবে দেখো আলিঙ্গন ভরে নেই গোলাপ-দোপাটি।

সে এসো সোমনাথ মৈত্র

অবশেষে
ধরা দিলে
আশ্চর্য বিকেলে,
আমাকে সে
চিনে নিলে
যেন চিরকালে
চেনা লোক । তার
ছুটি চোখ আর
চিবুকের তিল
দেখি অনাবিল
বুক আহা, অবিস্মরণীয় ।
দেখেছি কোন সে স্থানীয়
ভঙ্গীমা ;
রঙ্গীমা
চলনে বলনে
আজ্ঞাও ঠিক ।
অনিমিত্ত
চেয়েছি ;
পেয়েছি
এতকালে
তাকে ।
ও তাকালে
কাকে
যেন মনে পড়ে
অস্পষ্ট অক্ষরে
যার নাম
লেখা খাম
এখনো ফেলিনি ডাকে ।

পাঁচটি কবিতা

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

॥ প্রত্যাশায় ॥

প্রত্যাশায় দোর খুলে আমি অনেকদিন দাঁড়িয়ে ছিলাম। কেউ যেন এই এল এই ভাবনায় আমার সারাটা শরীর ভয়ানক কঁপে উঠেছিল। কতক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম তার জন্তে আমি বলতে পারব না। বলতে পারি শুধু হাওয়ায় হাহা একটানা দীর্ঘশ্বাস আমার বুক থেকে বেরিয়েছিল।

কোথায় যেন বেরিয়ে পড়ল সমুদ্রের সংসার থেকে মাতালের মত একদল চেউ পরস্পরের হাত ধরে। তাদের উচ্ছ্বাস ফেনায় দেখেছিলাম। তাদের নিশ্বাস হাওয়ায় স্পন্দিত হয়েছিল সারাক্ষণ। যে-মুখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাদের আমি আমার হাসির ছোঁয়ায় বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। কারণ এর বাইরে অচেনা মুখের মত পথের অন্ধকার। হাতড়ে এগুতে হয় অনেকটা মাতালের মত টলতে টলতে।

টলতে টলতে কোথায় বেরিয়ে পড়লাম। প্রত্যাশার দোর যেন আছড়ে খুলে গেল। ছিটকে গেলাম আমি একখণ্ড আগুনের মত আকাশে। আকাশে অন্ধকার। আর মাটিতে অচেনা পথ। আমি ঘুরতে ঘুরতে যেখানে এলাম সেটা একটা ঘেরা জায়গা। মনে হল, এর ভেতরে সাতমহলা, কোন অচিন মুখের আলোয় আমার মুখ দেখতে পাব। ভেতরে সেই আশায় গেলাম। আমাকে অপেক্ষা করতে হল অনেকক্ষণ। বাতাসে কার গাঢ় নিশ্বাস সমগ্র অস্তিত্বকে ভারী করে তুলছিল, গভীর রহস্যময় হয়ে উঠেছিল চারপাশ।

প্রত্যাশায় দোর খুলে দিতে গেলাম। কী ভারি। আর কী নিদারুণ অক্ষম মনে হল নিজেকে। আমি প্রাণপণে খোলবার চেষ্টা করলাম, শ্বাস দিলাম আর আছড়ে পড়লাম—তবু পারলাম না খুলতে। এর ভেতরে তার প্রাণ যেন ছটফট করছে। কী দারুণ অন্ধকার-যন্ত্রণা। মাঝেমাঝে কানপেতে শুনি এইবুঝি খুলে গেল—এই বুঝি সে এল! এইকথা ভাবতে আমার শরীর ভয়ানক কঁপে উঠেছিল। প্রত্যাশায় দোর খুলে দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

॥ স্পর্শের দিনগুলি ॥

আবার ঘনিয়ে ঘনিয়ে রাত্রি
আমাকে একদিন হুঁড়ে দিয়েছিলেন
মুঠোমুঠো হাওয়ার মত
পুরানো পথে
তার স্বাক্ষর আজও মিলবে
আজও চোখে পড়বে
অরণ্যের গাছের পাতায়
দিনরাতের নিবিড় স্পর্শ

যেদিনগুলি আমি ফেলে এসেছি
তারা আজ বয়সের বাঁকে অদৃশ্য
আমাকে নিরীক্ষণ করি
একএকটা দিনের আলোকে
একএকবার অন্ধকারে
খুঁটিয়ে দেখি
আমার এই হাত
যে-হাত আমি বাড়িয়ে-দিয়েছিলাম
সামনের দিকে

এই দিনগুলি
যেন সুদীর্ঘপথের মত
ফেলে-আসা-পথ
যেন অতীত স্মৃতি
সামনে ছড়িয়ে যে-পথ
তা' ভবিষ্য
একটানা ক্রান্তি
এই সুদীর্ঘ পথে
খুলিবাঁলি কাদা
আর বৃষ্টি
এইপথে

দিনগুলি আমার সামনে ক্রমশ ছড়িয়ে যাচ্ছে
আমি জানি
পথে একসময় রাত্রি নামবে
রাত্রি নামলে

আমি তখন কোথায় যাব
কোথায় গেলে
আমাকে আবার ছুঁড়ে দিতে পারব
মুঠোমুঠো হাওয়ার মত আনন্দে
পথে পথে
তার স্বাক্ষর রাখবে
ঘোর রাত্রেও
অরণ্যের গাছের পাতা
রাখবে তাকে একান্তে
নিবিড়তায় ॥

॥ সমুদ্রের কথা ॥

আমি কোনদিন সমুদ্রকে বুঝিনি । তার কথা হাওয়ার
জটলায় শুনেছিলাম । ওদের মুখে তার রহস্যের কথা
শুনেছিলাম । আমি চুপ করে শুধু দাঁড়িয়ে শুনতাম ।

যে-জীবনের পাকে আমি আবদ্ধ, যে-বন্ধার আমি
শ্রোত তা' শুধু অব্যক্ত আক্রোশে লক্ষ্যহারা হয়ে অনর্থক
মাটির মোহে জড়িয়ে পড়ে । সেটা আমি বুঝি । লোনা
চোখের জলে সমুদ্রের স্মৃতি উথলে ওঠে, আছড়ে পড়ে
আবেগ এই চোখের তীরে ।

তখন আছড়ে পড়ে আরো একজন । সে কাছে এগিয়ে
এলে আমি ভুলে যাই সকলের কথা । সে তখন হাসে ।
বলে, ভুলে যাও । রাত্রি ভেবে ভুল করে বেরিয়ে পড়না ।
ভুল হবে ।

আমি ভুল করতে চাইনা । ভুলে কাকেও ভুল বুঝতে
চাইনা । আমি জানি, ভালোবাসার কথা ভাবলে আমি
কীরকম হয়ে যাই । মাটির মত তার দেহ যদি
আমি চিরকাল ছুঁয়ে থাকি সে বলে, আমাকে
পাবে । আমি তাকে পেতেই চাই ।

সে পেতে চায় সমুদ্রের স্বাদ । আমার চোখে সমুদ্রের
স্মৃতি । আমি তাকে এ-কথা বললাম । সে বলল, ভুলে
যাও । ভুল করে সমুদ্রকে ভুল বুঝে বেরিয়ে পড়না ।
তার প্রতিধ্বনি পাই হাওয়ার জটলায়, রহস্যের
অন্ধকারে ।

।। কে যেন নিঃসঙ্গে ॥

এই দিনগুলি ফুরিয়ে গেলে

মুখ-ভরা হাসি

হারিয়ে গেলে

দেহ ছড়িয়ে যৌবন

বিলিয়ে গেলে

নিঃসঙ্গে কে যেন তখন

কী খুঁজতে থাকে

সারাটা আকাশ-জুড়ে মেঘের বিষণ্ণতা

মেঘে হাওয়ার গাঢ়তা

তার গলার আওয়াজে

দিনগুলি যেন কাছে এগিয়ে আসে

মুখে হাসির পাল তোলে

যৌবনের নৌকা

কে যেন তখন আমাকে

একবারে পেয়ে বসে

কে যেন আমাকে বলে

আকাশের দিকে চেয়ে দেখ

বলে : নদীর দিকে তাকাও

অকস্মাৎ কাঁধে হাত রেখে বলে

কী দেখছ

দেখি : দিনগুলি ফুরিয়ে যায়

মুখগুলি বিলিয়ে যায়

যৌবনের নৌকা অদৃশ্য

আকাশে মেঘের বিষণ্ণ ভাঙ্গুর

হাওয়ায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিলিয়ে যায়

যেন তারই মুখ

যন্ত্রণায় টুকরো টুকরো হয়ে যায়

তারই হৃদয়

সারাটা পৃথিবীর শিরাউপশিরায়

বয়ে যায় আত্মির স্রোত

ছড়িয়ে যায় রক্তের উচ্ছ্বাস

ছড়িয়ে গেলে

কে-যেন তখন নিঃসঙ্গে

তুমি কী কুঁজতে থাকে ।

॥ অকস্মাৎ অন্ধকারে ॥

অকস্মাৎ স্রোতের শব্দ শোনা গেল
অন্ধকারে পাথুরে মগ্নতা
আর নির্ভীকতা
এতক্ষণে শেষ হল

নৈরাস্ত্রের শূন্যতা থেকে
একটি ছায়া রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ল
এখন অনেক রাত
নিঃশব্দ পথ
নিঃশব্দে
একটি ছায়া রাস্তায়
কখন টলেটলে চলতে শুরু করেছে

রাস্তায়
একটানা নীরবতা
অন্ধ ধোয়াগুলি
ভয়ানক প্রাণীর মত
ককিয়ে ককিয়ে উঠছে
গভিয়ে উঠছে
ছঃস্বপ্ন-দেখা রাত
আর মাঝেমাঝে
কে যেন পরিহাসের মত
তাল ঝুকছে
এসব নিদ্রায় শোনা যায়

রাস্তায়
একটানা নৈঃশব্দের অন্ধকার
নৈরাস্ত্রের শূন্যতা থেকে
একটি ছায়া রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ল
ছাপিয়ে উঠল অন্ধকার
আকাশের কানায় কানায়
ছুলে উঠল সারাটা পথ
নোকার মত

●নিঃশব্দে

অন্ধকারে
অকস্মাৎ স্রোতের ছলছল শব্দ শোনা গেল ।

বাসু

সত্যেন্দ্রনাথ মৈত্র

[পূর্বাত্মক]

কাজলদি বেরিয়ে যেতেই, কাজলদির কথাই আর একবার মনে পড়ল বাসুর। এই সেই কাজলদি, যাকে সে দেখবার জন্যে ছুটে এসেছে আজ অনেকদিন পরে! কিন্তু কি আশ্চর্য, এই মাত্র তার সামনে থেকে যে মহিলা উঠে গেলেন তার মধ্যে কি তার সেই চেনা কাজলদির এককণাও অবশিষ্ট আছে?

চুল পেকেছে। হাসি মুখে যখন অভ্যর্থনা করতে ছুটে এসেছিল, তখনই বাসু লক্ষ্য করেছে নিচের পাটির সামনের ছোটো দাঁত পড়েছে কাজলদির। চোখের দৃষ্টিতে সে উজ্জলতা নেই। কেমন যেন ক্লান্ত, বিপর্যস্ত।

অথচ এই কাজলদিই কি ছিল! সে ইতিহাস তো আজও এমন কিছু পুরোনো হয়নি। নাকে স্ক্রিন্স করলে আজো বলবে, এমন সুন্দর বো, এ গাঁয়ে আর আসে নি। বাসুও জানে এই গোটা গ্রামটির মধ্যে কাজলদিই বোধহয় প্রথম বো এসেছিল যে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইতে পারত। পর পুরুষ দেখলে যে একগলা ঘোমটা দিয়ে ছুটে পালাত না। বাসু শুনেছে, কাজলদি নাকি বিয়ের আগে তাদের দেশের গাঁজার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বেণী ছুলিয়ে পিকেটিং করেছে। তেরজা পতাকা ঝাড়ে নিয়ে গান গাইতে গাইতে নিছিল করেছে—

‘এখনো নেভেনি চিতার আগুন

আসিছে ধূপেরি গন্ধ...’

এ গান পরেও শুনেছে বাসু কাজলদির গলায়। যখনই শুনেছে তখনই রোমাঙ্কিত হয়েছে সে। এমন সুন্দর গলা থাকতেও আর গান করে না কাজলদি। এই গান করা নিয়েই কম কথা হয়েছিল গ্রামে! কেউ বলেছিল, বেহায়া। কেউ বলেছিল, অসভ্য। কাজলদি এসব গল্পে মাথেনি কোনোদিন। বা এ নিয়ে দুঃখও করেনি কারু কাছে। বলত, এরা তো এমনিই বলে। শরৎ চাটুজের বইয়ে পড়িস্ নি। নতুন কিছু দেখলেই এদের চোখ টাটায়। কাজলদির চরিত্রের এই স্বাভাবিক সবলতাই টানত বাসুদের।

অথচ বাসু জানে কি নিদারুণ যন্ত্রণার জীবন এই কাজলদির। আর জানে বলেই আজো কাজলদির আকর্ষণ করেনি বাসুর কাছে।

কাজলদির স্বামী, যাকে বাসু দেখেছে বলে স্মরণ করতে পারে না, তিনি পাগল। স্থানীয় জমিদার বাড়ির নায়েব ছিলেন। জমি জমা বাগান পুকুর ইত্যাদি নিয়ে, অবস্থা কোনোদিনই খারাপ ছিল না শশীশেখর চৌধুরীর। কিন্তু হঠাৎ গীতুর জন্মের কয়েক মাস পরেই তিনি যে কেমন করে উন্মাদ হয়ে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন সে আজো রহস্য সকলের কাছে। প্রথম প্রথম কাজলদি খুব খোঁজ করেছিল

ভাঁর । নানান জায়গায় লোক পাঠিয়ে ছিল, চিঠি লিখেছিল । কিন্তু ভাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি । সময়ের সাথে সাথে সে বাগ্ৰতা কমে এলেও কাজলদির কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ভাঁর স্বামী বেঁচে আছেন । যেন একদিন অকস্মাৎ উধাও হয়েছিলেন বাড়ি থেকে আবার ভেঁমনি করেই ফিরে আসবেন একদিন ।

চোদ্দ বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেলে, গ্রামের সকলে নাকি বলেছিল কাজলদিকে, স্থানীয় একটা কুশ-পুস্তলিকা দাহ করে বৈধব্যা গ্রহণ করতে । কাজলদি রাজী হয়নি । রাজী হয়নি নয় শুধু এর পর থেকে যেন বেশি করে সাজতে শুরু করেছিল কাজলদি । মা বলে, কাজল যেন কেপে উঠেছিল সে সময়টায় । মুখে ত কিছু বলতে পারিনি, তবু হুঃখই হত কাজলের ঘরে ।

মার কাছে কাজলদির সম্পর্কে যত শুনেছে বাসু, তত গভীর বেদনায় তারও মন যুচড়ে উঠেছে । ভেবেছে সত্যিই ত আজ কাজলদির জীবনে আর কি আকর্ষণ আছে তার ওই মস্ত সিন্দুরের কোঁটাটা ছাড়া ? এ জীবনের কাছে কি পেয়েছে কাজলদি, কিছু অপবাদ আর কিছু অপমান ছাড়া ?

বাসুর মনে হয়, কাজলদির জীবনের এই দিকটাই বোধহয় সবচেয়ে হুঃখের । এ সব কথা কাজলদির কাছে শোনা নয়, দিনের পর দিন বিভিন্ন খানে বিচ্ছিন্ন ভাবে যে কাহিনী সে শুনেছিল তা ছোড়া দিলে, গল্পটা অনেকটা এমনি দাঁড়ায় । কাজলদির জীবনের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে তার সাথে পরিচয় হয় কেদারদার । ঠিক কোন সূত্রে পরিচিত হয়েছিল কাজলদি, তা বাসু জানতে পারেনি । তবে কেদারদার সাথে পরিচিত হবার পরেই গ্রামের মেয়েদের নিয়ে নারী-সমিতি গড়তে শুরু করেছিল কাজলদি । প্রতিদিন মেয়েদের আখড়া বসত কাজলদির বাড়িতে । ছুরী খেলা, লাঠি খেলা; খবরের কাগজপড়া এমনি ধরনের হাজার কাছে কাজলদির সারা সময় ভরা থাকত । আর এসব কাছে নরেশের দিদি ছিল কাজলদির ডান হাত । কিন্তু এ বেশিদিন চলল না । কাজলদি আর কেদারদাকে নিয়ে কথা উঠল গ্রামে । এমন কথাও নাকি উঠেছিল, যে প্রায় রাত্রেই কেদারদা বাড়ি থেকে কাজলদির বাড়িতে আসতেন । ভোর রাত্রে ফিরে যেতে অনেকেই দেখেছে তাঁকে । নরেশের দিদি আজ্ঞা বলে, এগুলো মিথ্যে রটনা । তবু বাড়ির চাপে পড়ে তাকেও সম্পর্কচ্ছেদ করতে হল কাজলদির সাথে । ধীরে ধীরে কমে গেল মেয়েদের সংখ্যা । হতে হতে এমন অবস্থা হলো যে একজনও সাহস করে কাজলদির আঙিনায় এসে দাঁড়াল না । কাজলদি কেয়ার করেনি এসব—বাড়ি বাড়ি ঘুরেছে সকলের কাছে । অবশেষে হুঁতিন জায়গায় কুৎসিত অপমান হয়ে সেই যে বাড়ি এসে চুকেছে আর বাইরে বের হয়নি, নেহাত প্রয়োজন না হলে । তাও বাসুদের বাড়ি ছাড়া আর কারো বাড়ি কাজলদি যায় না । একা মেয়েকে নিয়ে আজ্ঞা নিঃসঙ্গ নির্জন জীবন যাপন করছে ।

কাজলদির ওখান থেকে আসার পরও, বাসু মন থেকে এ চিন্তাটা দূর করতে পারেনি যে, কাজলদি আর ভেঁমনি নেই । অথচ কেমন হলে তার ভাল লাগত, তাও ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছিল না বাসু । কাজলদি কথা-বলল, হাসল, ঠাট্টা করল

—অথচ কি যেন নেই। কি যে নেই, যা থাকলে বাসুর মন কানায় কানায় ভরে উঠত তা বাসুর নিজের কাছেই অজানা। আর অজানা বলেই, কাজলদি নয় তার নিজের উপরেই যেন রাগ হচ্ছিল।

কাজলদির বাড়িতে গিয়ে, বাসুর আর একটা যে লাভ হল, তা হচ্ছে গীতুকে দেখা। বড় সুন্দর হয়েছে গীতু। দীর্ঘ দিন থেকে মনে মনে গীতুর যে ছবি এঁকেছিল বাসু, সত্যিকারের গীতুর তার সাথে একটুও মিল নেই। দরজার সামনে চকিতে যে মুখ তার চোখে পড়েছিল, কাজলদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার পরও, সারাটা দিন ধরে সেই গভীর কালো চোখের বিস্মিত চাউনি তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। বাসু থাকা সময়ে কাজলদি কতবার ডেকেছিল গীতুকে, কিন্তু বাইরে আসেনি গীতু। মাঝে মাঝে কখনো বা ঘরের ভেতর থেকেই উত্তর দিয়েছে, যাও পারব না আমি।

শুনছি! বাসু, কাজলদি সাক্ষী মেনেছে বাসুকে, দেখেছে তো নেয়ের আকল খানা! বাসু উত্তর দেয়নি। অথচ বুঝতেও পারেনি, গীতু কেন লজ্জা পাচ্ছে বাসুকে দেখে!

দিন দুই পরের এক দুপুরবেলা মার সাথে গল্প করছিল বাসু।

গল্প ঠিক নয়। মা বক্তা আর শ্রোতা বাসু। গল্প হচ্ছিল বাসুর বাবাকে নিয়ে। পিতা সম্পর্কে বাসুর ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তার জন্মের দু'মাস পরেই তিনি এ পৃথিবী ছেড়ে গিয়েছেন। বাসুদের শোবার ঘরে একখানা মাত্র ছবি আছে তাঁর। তাঁর একা নয়, মা আর তিনি। মা বলে, কলকাতায় বেড়াতে গিয়ে সখ করে তুলেছিল। সখটা অবশ্য বাবারই। কিন্তু সে ছবিটাতেও বাবার চেহারা স্পষ্ট নয়। বিধবা হবার পর পরই মা কিছুদিন ঐ ছবিটা পুজো করেছিল বোধহয়। তাই সিঁহুর আর চন্দনে ছবির বাবার দিকের অংশটা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বাসু অনেক চেষ্টা করেও বাবার মুখের সে অস্পষ্টতা ঘোচাতে পারেনি।

বাবাকে নিয়ে ছেলেবেলায় বাসুর মনে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। তাঁদের দুজনের সংসারে আরো কোনো একজনের অস্তিত্ব যে ছিল এককালে, বাসু তা ভাবতেই পারত না। বাবার উল্লেখ হয়েছে তখনই যখন বাসু কোনো খারাপ কাজ করেছে বা নম্বর কম পেয়েছে পরীক্ষায়। মা খুব কম বলে বাবার কথা। এমন কি যদি কথা প্রসঙ্গেও কোনোদিন তা উঠে পড়ত তা হলে খুব অল্প কথাতেই তার নিষ্পত্তি করে দিত মা। কিন্তু মা'না বললেও তার প্রাণের অনেকেই বলে। বলে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে। এ সব শুনে শুনে কেমন যেন একটা দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল বাসুর যে জীবনের এই অস্থিরতা সে পেয়েছে তার বাবার কাছ থেকে। বাবার কথা একদিন কেদারদার মুখেও শুনেছিল বাসু।

—একটা মানুষ ছিল বুঝলি! কেদারদা বলেছিল, ঠিক মানুষ বললে যা বোঝায়। বিজ্ঞায় বুদ্ধিতে শক্তিতে ভালবাসায় এমন একটা মানুষ আমার চোখে পড়েনি। অত বড় দিলও দেখিনি কারুর।

সেদিন কেদারদার চোখের দিকে তাকিয়ে বাসুর মনে হয়েছিল, ঠিক বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। একটা প্রকাণ্ড মানুষ—প্রশস্ত যার বুক, চওড়া যার

কপাল, দুটো চোখ যেন দুখানা হীরে, ধীরে ধীরে শরীর নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠত সেই লঠনের আলোয়—বাসুর পড়ার ঘরে ।

কিন্তু বাসুর সবচেয়ে আশ্চর্য লাগত কেদারদা বাবাকে চেনে দেখে ! কেদারদার বাড়ি ত বাসু জানে সেই কোন ঢাকা না বরিশাল ।

এ প্রশ্নের উত্তর কেদারদা দেয়নি । ঝানিকটা চুপ করে থেকে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে যেন সব ভাবনা সব স্মৃতিকে উড়িয়ে দিয়ে কেদারদা বলত,—হ্যাঁ কি হল যেন, দুটো অপ্রবেশ শিলাস্তরের মধ্যে একটা প্রবেশ শিলাস্তর থাকলে—

বাবাকে নিয়ে বাসুর শ্রদ্ধা মেশানো কোতুহল থাকলেও, নিজে থেকে সে কোনোদিন প্রশ্ন করেনি কাউকে । এ প্রশ্ন না-করার একটু গভীর কারণ আছে । আর যার জন্তে বাবাকে নিয়ে বাসুর মনের গোপনতম প্রদেশে একটু অপরাধবোধও আছে । আত্ম অবিশ্টি হাসি পায় তার সে-কথা মনে করে কিন্তু এককালে তার প্রথম কৈশোরে এ প্রশ্ন তাকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল ।

ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সাধারণ । খুলে না বললে ঠিকমত বোঝা যাবে না । বাসুদের পরিবারে আজ মাত্র দু'জন লোক । সে আর তার মা । কিন্তু বাসুর জন্মের আগে এই চক্রবর্তী পরিবারই সবচেয়ে জমকালো ছিল এই গ্রামে । বাসুর বাবা ছাড়াও ছিল ঠাকুরদা, ঠাকুমা, এক কাকা আর দুই পিণি । কিন্তু তার জন্মের বছর ঝানেকের মধ্যেই সব শেষ । বাসুর নিকট আত্মীয়ের মধ্যে আজ বেঁচে আছে এক পিণি । তাও বহুদূরে, সেই চক্রধরপুর না কোথায় যেন তাঁর বাড়ি ।

প্রতিবেশীরা বলতে শুরু করলো, বাসুর জন্মেই নাকি এমনি অঘটন । গ্রাহর দশায় ওর জন্ম । বেঁচে থাকলে এমনি ধরনের দুর্ঘটনা আরো ঘটবে বাসুর জীবনে । পর পর বৃত্যতে মাও কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল । কেমন যেন অসাড় নিপ্রাণ । ভাল করে লক্ষ্যই করত না বাসুর দিকে । বাসুর শৈশব তাই কেটেছে অনাদরে অবহেলায় । কামলদি বলে :

—ও সময়টা প্রায়ই তোদের ওখানে যেতাম । একদিন গিয়ে দেখি মাসীমা তোকে শুইয়ে রেখেছে একটা চট্ পেতে তোদের পুৰ দিকের বারান্দার । আর তুই হেগে মুতে সেই ও তুলে তুলে মাখছিস । বকলাম মাসীমাকে । তোকে খুইয়ে মুছিয়ে নিয়ে গেলাম আবার ওখানে ।

এমনি করেই শৈশবের গোটা তিনেক বছর কেটেছে বাসুর । যতদূর আজ মনে করতে পারে বাসু, সে দেখে, সেই অতি শৈশবেই সে যেন কেমন গঙ্ঘুচিত হয়ে বেড়াত । ঠিক প্রাণ খুলে মিশতে পারেনি কারুর সাথে । কিন্তু কি যে তার কারণ তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারত না । শুধু এটুকু অস্বস্তি করতে পেরেছিল বাসু যে তার অস্তিত্ব দিয়ে সে যেন কি একটা ভয়ানক অপরাধ করে ফেলেছে যার জন্তে তাকে কেউ দেখতে পারে না । এর পর অবিশ্টি মা স্তব্ধ হয়েছে । দ্বিগুণ স্নেহে টেনে নিয়েছে বাসুকে । কিন্তু সে তিনটি বছরের প্রভাব বাসু প্রাণপণ চেষ্টা করেও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ।

মা কোনোদিন বাসুর কাছে তার পিতার উল্লেখ করে না। বাসুও নিজে থেকে এ প্রশ্ন তোলে না; মার কাছেও নয়—অন্য কারো কাছেও নয়। কিন্তু কিছুদিন থেকে এ প্রশ্ন বাসুর মনে উঠছে। উঠেছে নিজেকে বিচার করতে গিয়ে। ভেবে দেখতে গিয়ে, সত্যিই কি এ পৃথিবীতে বাসু এমনি হাল ভান্না নোকার মতো শুধু ঘাট থেকে ঘাটে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঠেকে ঠেকে যাবে!

প্রশ্নটা মাই ভুলেছিল।

বাসু শুয়ে ছিল জানলার কাছে। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে ছপুরের রোদ। কি যে ভাবছিল বাসু তার ঠিক নেই। সে ভাবনার কোনো রূপ নেই, কোনো অর্থও নেই। শুধু কিছু একটা নিয়ে বিভোর হয়ে থাকি, কিম্বা শুধুই তাকিয়ে থাকি ছপুরের ঝিল্লি সাদা আকাশটার দিকে, যেখানে গোটা কয়েক চিল অনাবশ্যক পাক খেয়ে খেয়ে ক্রমাগত উপরে উঠে যায়।

মা বলল, তাহলে পরীক্ষা দিবিনে?

বাসু তাকাল মার দিকে।

তোমার বাবার ডারা ইচ্ছে ছিল এম. এ-টা পাশ করার।

মার দীর্ঘশ্বাসের শব্দটা স্পষ্ট শুনল বাসু। কিন্তু উত্তর দিল না। মা আবার বলল—এতদিন পড়লি, আর কটা মাসের জন্যে—

আচ্ছা মা, বাবা এম. এ পড়েছিলেন? বাসু প্রশ্ন করল।

না, মা বলল, বি. এ পাশ করার পর হোম ইন্টার্নড হয়েই ছিল বছর খানেক। তবু চেষ্টা করেছিল পরীক্ষা দেওয়ার। জীবনেই কুলোল না—

হোম ইন্টার্নড ছিলেন বাবা? জেলে যাননি? বাসু উঠে বলল।

এর পর আর প্রশ্ন করতে হল না। বাসুর এ চালাকি চোখেই পড়ল না মার। স্মৃতির অতলে ডুবে ধীরে ধীরে বলে চলল তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সবচেয়ে দুঃখের কাহিনী। আর এ কাহিনীতে বাসু তার জীবনে যা কোনোদিন পায়নি তার পিতার সেই অন্তরঙ্গ ছবিটাকে যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে পেল বছরদিন পরের এক ফাঙ্কন মধ্যাহ্নে।

॥ চার ॥

বিয়ের পরে বাবার জীবনের আরেকটা দিক প্রত্যক্ষ করে বিষয়ে ভুয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল মা। সহজ সরল পাড়ারপায়ের মেয়ে। জীবনের মহৎ আদর্শ আত্মত্যাগ এ-সব কথা কোনোদিন শোনেনি। প্রথম কুলশয়ার রাত্রে বাবা যে সব কথা বলেছিলেন সেগুলি শুনেই মা অসুস্থ হয়েছিল, আরো পাঁচটা মেয়ের জীবনের শুরু যে ভাবে হয়েছে তার বেলায় তা হল না। বাবা দু'একটা কথা বলেছিল তার পর একসময় পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিল, নিশ্চিন্তে—এতটুকু উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে? ঘরে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলতে থাকল, কুলদিয়ে সাজানো বিছানার উপর ঠায় বসে সেদিকে তাকিয়ে রইল মা। এক সময় কুলের মুকুট, কুলের হার নিশ্চিন্তে স্ত্রিয়মান হয়ে এল শরীরের উত্তাপে। চোখদিয়ে ছটিধারা জল গড়িয়ে পড়ল নিঃশব্দে। মধ্যরাত্রে

কোনো এক সময় না নিজের অজ্ঞাতেই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু না বাবার সে কথাটা সারা জীবনে ভুলতে পারেনি,

—দেখ বিয়ে আমি করতে চাই নি। বিয়ে করা আমার উদ্দেশ্যও নয়। এর চেয়ে অনেক বড় কাজ করতে হবে আমাকে। যাক্, তবু যখন বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছি এর বেশি আমার কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করো না।

না তা করেওনি কোনোদিন।

না কোনোদিন বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেনি। কোন প্রশ্ন করেনি কোনো দিন। যেদিন যখন চেয়েছে বাবা নিজের অলঙ্কার নিঃশব্দে এনে তুলে দিয়েছে না। বাবা কি করে, কোথায় যায় এ খবর না নেয়নি, নিতে সাহসও হয়নি তার। বিয়ের বছর খানেক এমনি করেই কাটল। এতদিনেও বাবাকে ঠিকমত চিনতে পারেনি না। মনে হত কেমন রহস্যময়, কেমন অগোছাল। খাওয়ার ঠিক নেই, নাওয়ার ঠিক নেই। ঠিক বাসুর মত। কোনোদিন হয়ত জানা কাপড় পরে বাইরে বেরুল ফিরে এল শুধু গেঞ্জি গায়ে। জামাটা দিয়ে এসেছে কাউকে। একদিন সোনার বোতাম লাগিয়ে বেরুল জামায়, কি যে করে এল বোতামটা সেই জানে। এ সব দেখে, বাবার সম্পর্কে একটু করুণা মেশানো অবজ্ঞাই ছিল মার মনে। কিন্তু বাবার যে আসলে কি রূপ সে না দেখতে পেল অনেকদিন পরে। আর সেই একটি ঘটনাই মার চোখে রূপ পালটে দিল এই নিতান্ত অশ্রমবস্ত্র, অগোছাল সদাপ্রকৃত লোকটির।

—তবে যে বললে, বিয়ের রাত্রে অমন কড়া কড়া কথা বলেছিল তোমাকে। প্রশ্ন করল বাসু।

—ঐ একদিনই, তারপর তার মুখ গভীর দেখিনি কোনোদিন।

ঠিক সালটা মনে নেই মার। তবে সে সময়টা খুব ধরপাকড় হচ্ছে। বাসু তখনো পেটে আসেনি। হঠাৎ একদিন বাড়িতে পাওয়া গেল না বাবাকে; নাই ত নাই—কোনো খোঁজই নাই। শান্তী জিজ্ঞেস করেন, শশুর জিজ্ঞেস করেন মাকে। না বলবে কি করে। এ সব কথা সে কউকে বললে ত। শশুর এ নিয়ে আর কোনো উচ্চাচ্য করলেন না। হঠাৎ একদিন সকালবেলা বাড়ি ঘেরাও করল পুলিশে। সারাটা বাড়ি একেবারে ওলট পালট করে দিল। বাবার বালিশ ছিড়ে তুলোগুলো উড়িয়ে দেখতে লাগল। রান্না ঘরের মেঝে খুঁড়ে, বাড়ির উঠান খুঁড়ে তখনছ করে গেল সারা বাড়িটা। দারোগা বললেন :

—অমুক বাবুর স্ত্রীকে ডাকুন, তাঁকে কটা প্রশ্ন করব ?

শশুর এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। কিন্তু এবারে আর সহ্য হল না তাঁর। বললেন, এ বংশের বৌরা বাইরের লোকের সাথে কথা বলে না কখনো।

—তা হলে ত চলবে না। উনি অনেক কিছুই হয়ত জানেন। দারোগা বলল, হয়ত রাত্রে বাড়িতেও আসেন অমুকবাবু।

শশুর রেগে উঠলেন এবারে।

—বাড়িতে আসে ত, সেপাই পাঠিয়ে বাড়ি পাহারা দেওয়ালেই পারেন।

কিন্তু রাগারাগি করে ফল হল না। দারোগার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হল মাকে।

মা ত কাঁপতে কাঁপতে একটা বেনারসী শাড়ী পরে, একহাত ঘোমটা দিয়ে স্বস্তুরের হাত ধরে দারোগার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

—আপনার স্বামী কোথায় জানেন।

মা মাথা নাড়ল।

—রাত্রে বাড়ি আসেন তিনি ?

মা মাথা নাড়ল।

চিঠি পত্র পাঠান তিনি কারুর হাতে ? চেনেন তাকে ?

মা মাথা নাড়ল এবারো।

চিঠি তাহলে পাঠান তিনি ?

এবার আর সঙ্ক হল না মার। অনেকক্ষণ থেকেই উত্তেজনায়া অবসাদে ধৈর্যের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল মা। এবারে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

যা হোক তখনকার ব্যাপার চুকল একরকম করে। কিন্তু সেই রাত্রেই বাবা এলেন। এলেন না বলে নিয়ে এল বলাই উচিত। দেখে চেনা কঠিন। একমুখ দাড়ি, রং কালো অর্ধার। বয়ে এনেছিল যে, তাকে বাসু চেনে। কেদার। বাসুর কেদার দা।

বাবার তখন কথা বলার ক্ষমতা নেই। কেদারদার মুখে সব শোনা গেল। কদিন থেকেই নাকি ঘুস-ঘুসে জ্বর চলছিল বাবার। জ্বরটা ছাড়েই না দেখে, জ্বরের একমাত্র ওষুধ কুইনিন খেয়েছিলেন বাবা। সম্ভবত মাত্রা ঠিক হয়নি। তাই আজ সকাল থেকে শুরু হয়েছে রক্ত প্রস্রাব। বাবাকে রেখে কেদারদাই বেরিয়ে গেল ওষুধ আর ডাক্তার যোগাড় করতে। ডাক্তার এল। ওষুধ পড়ল। ব্যবস্থা হল যাতে রোগী একেবারে নড়াচড়া না করে। কিন্তু ডাক্তার বেরিয়ে যাবার সাথে সাথেই, স্বস্তুর একটু ব্যস্ত হয়ে চুকলেন ঘরে। মা তখন বাবার পায়ে গরম জলের বোতলটা চেপে বসে ছিল চুপ করে আর এদের রহস্যময় চলাফেরা, ফিসফাস্ কথাবার্তার একটা অর্থ বের করবার চেষ্টা করছিল।

স্বস্তুর চুপি চুপি ডাকলেন, কেদার—

কেদারদা বেরিয়ে গেল তাঁর সাথে। তার পর ফিরে এসেই মাকে বলল, বৌদি শাড়ি দিন তো একখানা।

বাবা চোখবুজে পড়ে ছিলেন। হঠাৎ তাকিয়ে বললেন, কি হয়েছে কেদার।

কিছু না, শুয়ে থাকুন আপনি। কঠের উষ্মেগ ঢাকা দিতে গিয়েও পারল না কেদারদা।

—না বল, কি হয়েছে। বাবা উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে কেদারদা সত্য গোপন করবার সাহস পেল না। বলল, পুলিশ—

এঁয়া! উঠে বসলেন বাবা। তুমি পালাও।

পালানোর উপায় নেই।

মা তাকিয়ে ছিল বাবার দিকে। দেখল চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠছে, একটা

অদ্ভুত কাঠিন্দ আসছে ক্রান্ত চোখ দুটোতে । তার পর হঠাৎ কি ভেবে জানার তলা থেকে বের করে একটা কালো ভারী জিনিস মার দিকে এগিয়ে দিয়ে বাবা সর্বপ্রথম মাকে বললেন :

দেখো এটা যেন পুলিশ না নিতে পারে । তারপর বিছানায় শুয়ে খুব ধীরে ধীরে বললেন, তোমরা বেরিয়ে যাও এবার থেকে ।

বাবার মুখে হাতদিয়ে চুপ করার ইঙ্গিত করে কেদারদাকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল মা, আনন্দ, বেদনা আর ভয়ের একটা আশ্চর্য অমুভূতি নিয়ে ।

অঞ্চ আশ্চর্য মা, বাসু বলল মার মুখের দিকে তাকিয়ে, আমাদের সাথে কেদারদার যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, কেদারদা সে কথা বলেনি কোনোদিন ।

ওরা অমনি, মা উত্তর দিল ক্রান্ত কণ্ঠে ।

বাসুর মনে একসাথে অনেক গুলো প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল । সেই যে মা কেদারদাকে নিয়ে চলে গেল, কি হল তার পর । পুলিশ কি পেয়েছিল সেই জিনিসটা । বাবা কি ধরা পড়লেন পরদিন ?

মার কাহিনীও শেষ হয়ে এসেছিল ।

পরদিন ভোর রাতে পুলিশ হানা দিল বাড়িতে । কেদারদাকে যখন মার বিছানা থেকে পাওয়া গেল, তখন একটু আশ্চর্য হয়েছিল দারোগা ।

—এ কে ?

অবিচলিত গলায় মা সেদিন উত্তর দিয়েছিল, আমার ভালবাসার লোক । মাথার ঘোমটা খোলা । সমস্ত মুখে চোখে একটা আশ্চর্য দৃষ্টি । স্বস্তর শাওড়ী বজ্রাহতের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন । পুলিশ বোধহয় চিন্তা না কেদারদাকে ।

—কিন্তু আপনার স্বামী ?

—আমার স্বামী তো ভালবাসেন না আমাকে ।

মার উত্তর শুনে দারোগাও স্তম্ভিত হলেন । এই কি সেই মেয়েটি যাকে সকাল বেলাতেই দেখে গিয়েছিলেন ।

—আপনি কি বলছেন হয়ত বুঝতে পারছেন না । আপনার স্বামী অসুস্থ হয়ে ঘরে পড়ে—

যা বলছি, তার অর্থ আমি জানি ।

পুলিশ ধরে নিয়ে গেল কেদারদাকে । বাবা অসুস্থতার জন্তে পুলিশ পাহারায় বাড়িতে থাকবার অসুমতি পেলেন । ছিলেন বোধহয় দিন ছয়েক । কিন্তু এই ছটিদিন মার জীবনে ছটি শতাব্দীর চেয়েও মূল্যবান । বারার এমন চেহারা মা কোনোদিন দেখেনি । প্রতিমূহর্তে মাকে কাছে চেয়েছেন বাবা । ঘরের মধ্যে হয়ত আপন মনে কিছু করছে মা, হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেছে বাবা তাকিয়ে আছেন তার দিকে । চোখাচোখি হলেই হেসে ফেলেছেন মা মার কাছে সম্পূর্ণ নতুন । সেই পুলিশ পাহারা, বাবার ঘরে ঢুকবার পথে হাজারো বাধা তার মধ্যেই মার নতুন জীবনের আরম্ভ হল ।

জ্বলে যাবার আগের রাতে, একটা কি যেন কথা বাবা বার বার চেষ্টা করেও বলতে পারছিলেন না । মা প্রশ্ন করল, কিছু বলবে ?

দেখ, বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল বাবার।

কি—

আমাকে ক্ষমা করো তুমি।

আর সেইদিনই বোধহয়, মার জীবনেও সর্বপ্রথম উচ্ছ্বাসত কান্নায় বাবার সম্মুখে জীবনের সমস্ত নিরুদ্ব অভিযোগ প্রকাশ করেছিল মা।

আচ্ছা মা, বাসু প্রশ্ন করল, বাবা সেবারে কতদিন ছিলেন জেলে।

বোধহয় বছর তিনেক।

যদিও ততক্ষণে ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকার। মার মুখটা স্পষ্ট করে দেখা যায় না। সেই স্নান আলোয়, বাসুর মাননে বসে থাকা শীর্ণ দেহা মহিলাটিকে, এই জীবনে প্রথম নতুন করে দেখল বাসু। ভাবতে তার ভয় হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল অপ্রচুর আলোয়, এই ছোট ঘরটায় মার চেহারাটা এত বড় যে বাসু সেই মুহূর্তে কিছুতেই ভাবতে পারছিল না, এই তার মা। বাবার চেহারাটা বাসুর কাছে ছায়া ছায়া, কিছুতেই স্পষ্ট না। বাসু ভেবেছিল, মার বর্ণনায় বাবার অন্তরঙ্গ চিত্র একটা পাবে সে, কিন্তু বাবার জীবনের যে কাহিনী বাসু শুনে শেষ করল এই মাত্র, তাতে তার বার বার এই কথাটাই মনে হতে লাগল, এ জীবনে বাবার চেয়ে মা অনেক বেশি যন্ত্রণাকে সহ করেছে, করেছে নীরবে। যেমন আজো করছে, বাসুর খানখেয়ালীপনায়।

আমি পরীক্ষা দেব, মা।

মা হাসল। দীর্ঘশ্বাসের শব্দটা চাবুকের মতো বাসুর কানে এসে লাগল।

সত্যি, বিশ্বাস করো মা।

শোন, তোর বাবা জেল থেকে ফিরে এসেই আমাকে কি বলেছিল জানিস? বলেছিল, দেখ, জেলে বসে অনেক ভেবে দেখেছি, কিন্তু দেখলাম, ঠিক পথ আমরা কেউই পাইনি। অথচ এটা চাকতে গিয়ে নিজেরা নিজেরা মারামারি করে মরছি। ভাবছি এন. এ-টা দেব এবার।

বাসু জানে বাবা দিতে পারেননি। সেই পুরোনো রোগ আবার আক্রমণ করল বাবাকে। সারানোর ক্ষেত্রে চেষ্টার কসুর হয়নি। নিয়ে যাওয়া হল কলকাতায় কিন্তু ফল হল না। মেডিকেল কলেজে বাবা মারা গেলেন। তাঁকে দাহ করা হয়েছিল কেওড়াভায়ায়। সেটা বোধহয় তেরশ বত্রিশের মাঝামাঝি। বাসুর তখন দুমাস বয়স।

মা বলল, আশ্চর্য মরবার আগে, শুধু তোকেই দেখতে চেয়েছিল অথচ তুই তখন এখানে আমার কাছে। বাসু উত্তর দিল না। মা বলল, পরীক্ষাটা দে, হেলায় নষ্ট করিস না।

মা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাসু চুপ করে বসে রইল। জানালাটা খোলা, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বাসু উঠে বন্ধ পর্দা করে দিতে পারল না জানালাটা। শুধু একটা অনির্দেশ্য যন্ত্রণায় ওর মুকটা ছিড়ে যেতে লাগল।

বাইরে চাঁদ উঠেছে । অন্ন অন্ন কুয়াসায় জোছনা কোটেনি ।

এই জোছনাই কেন জানি না বাসুর ভাল লাগে । মনে হয় এই আবছা আলোর সাথে তার হৃদয়ের কোথায় যেন নিল আছে । ঠিক এমনি স্পষ্ট না, এমনি বেদনার্ত । মিস্ত্রীমাসী বলেছিল, এটা বাসু তোমার বাড়াবাড়ি । নিজেকে নিয়ে এমনি করে খান খেলাপিপনায় কি লাভ । তোমার মা আছে, জন্মে সুখী হতে পারেননি তিনি । তাঁকে সুখী করা তোমার উচিত ।

ছাতের উপর সেদিনও এমনি জোছনা । সেটাও ফান্সনমাসই বোধ হয় । বাসু তখন আই.এ পড়ে । মিস্ত্রীমাসী দাঁড়িয়ে ছিল ছাতের একটা কোণায় হেলান দিয়ে, চাঁদের দিকে পিছন ফিরে । বাসু উত্তর দেয়নি । মিস্ত্রীমাসী সচরাচর এতটা গম্ভীর না । বরং তার উল্টো । মিস্ত্রীমাসীর কাছে গেলে, বাসু ভাবতেই পারেনি সময় কোনদিক দিয়ে চলে গেছে । যে বাসু কোনোদিন, কোথাও গিয়ে সুস্থির হতে পারেনি, সেই বাসুকেই এক তীব্র আকর্ষণে বেঁধে রেখেছিল মিস্ত্রীমাসী । মিস্ত্রীমাসীর কাছে গেলে, বাসু যেন আরেকটা নীড় পেত । নীড় না—আকাশ ।

মা বেরিয়ে যাওয়ার পর—নিঃশব্দ অন্ধকারে বসে বাইরের জোছনার দিকে তাকিয়ে, বাসুর মনে হল সে যেন মিস্ত্রীমাসীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আবার । সেই দিবা, সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব স্তব্ধবিকৃত হচ্ছে । কোনো স্পষ্ট উত্তর দিতে পারছে না । অথচ সেদিন তাকে বেশিক্ষণ ভাবতেও দেয়নি মিস্ত্রীমাসী । যেন এ প্রশ্নটি বাসুর মনে তুলে দিয়েই, আবার তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল আনন্দের উচ্ছ্বাসে । গানে, গল্পে—লুডো খেলায় । আজ কিন্তু সে এসে হাত ধরল না । কালো মুখখানা কুয়াসায় আলতো করে ভাসিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল একটু দূরে পুকুরের ধারের লম্বা খেজুর গাছটার নিচে । আর যত্নপায় ওর বুক ছিড়ে যেতে লাগল,

আমি কি করব এবার । বলো, কি করব—

বাসু জানল না—কখন তার চোখ থেকে দুটি ধারা জল নেমে এসেছে, কখন দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে নির্মম ভাবে । কখন সে নিঃশব্দ কান্নায় নিজেকে উদ্ধাড় করে দিতে লাগল সেই অন্ধকার ঘরে । এ কান্না তার অনেকের জন্মে অনেক অভিমানে । বাবার জন্মে, মার জন্মে এমন কি মিস্ত্রীমাসীর জন্মেও ।

[ক্রমশ]

সংগীত ও সমঝদার

প্রণবকুমার রায়

অসীম মানুষ ব্যাপ্ত হবার জন্যেই শিল্প সৃষ্টি করেছে। এই শিল্প সৃষ্টির পথ সরল অনাড়ম্বর নয়, একথা আগেই বলেছি। সরল হলে আড়ম্বর থাকে না—সহজ ভাবে, সহজ খণ্ড রূপেই তার তৃপ্তি। কিন্তু অসরল হলেই মুঞ্চিল। সেখানে খণ্ড রূপেরও বিচিত্র প্রকাশভঙ্গিমা। একদিকে যখন রাগ রক্তিম হয়েছে অন্যদিকে তখন তার আঁধারিমা। অরুণ আর আঁধার। বিচিত্র অন্ধুত প্রকাশ। সামন্ত্য আছে? আছে বৈকি! একেরই ভিন্ন রূপ। পৃথিবী ঘুরে গেলো সূর্য প্রদক্ষিণ করে—আগুনের হকা বইলো মাটিতে, জলের স্রোত বইলো নদীতে, হাকা মেঘ উড়ে গেলো নীল আকাশের গায়, মাঠের ধান হলো সোনা, সমস্ত পৃথিবী সব ছেড়ে দিলো নিঃস্ব রিক্ত হয়ে—আবার পরিপূর্ণ আনন্দের সম্বন্ধনা জানালো বসন্ত। এক পৃথিবীর এক গতি—ভিন্ন রূপের আলো বুলিয়ে গেলো প্রতি মনে।

এখানে বক্তব্য এই যে, পৃথিবী বৈচিত্র্যের খণ্ড অভিজ্ঞতা আমাদের মনে এসে বুদ্ধি আর মনন সাহায্যে অখণ্ডরূপে প্রতিভাত হয়। তাই আমরা শৃঙ্খলার মাধ্যমে সমাজ গড়ি—ভাবের আদান প্রদান করি সুসংযত ভাবে। খণ্ড তো অখণ্ডে পরিণত হলো—এবার প্রশ্ন খণ্ডকে বুঝি কি করে? উত্তরে বলা যায় বুদ্ধি বা চিন্তা, মানুষের জীবনের সব চাইতে বড় আশীর্বাদ, যা দিয়ে সে যাচাই করে তার পরিবেশ, তার নিজস্ব সম্বন্ধে। ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পাওয়া অভিজ্ঞতাকে মস্তিষ্ক একটা বিশেষ রূপ দেয় আর মন দেয় তাকে রং, তার বর্ণবৈচিত্র্য। তাই বিচিত্রতায় ভরা পৃথিবী ধরা দেয় আমাদের কাছে। এ বোধ তাই দেহগত নয়, মনোগত। ইন্দ্রিয় বোধ ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যক্ত থাকে যতক্ষণ তাতে মন-মস্তিষ্কের ছাপ না পড়ে। মন-মস্তিষ্কের ছাপ পেলে তবেই সে ব্যক্ত হয়। এই প্রকটীকরণকেই বলে শিল্প। এই প্রকটীকরণের আগে অনেক কাজই (সংস্কার) করে নেয় মস্তিষ্ক আর মন। যা দেখলাম, যা পেলাম তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, ছাঁটকাট করা আর শেষে রঙের তুলিতে মনের ফিনিশিং টাচ। এতেই শিল্প মহৎ থেকে মহত্তর হয়। শুধুমাত্র অহুভূতির কোনো রূপই নেই যতক্ষণ পর্যন্ত না তাতে মস্তিষ্কের আদেশ প্রবাহিত হয়। যেমন পাগলের কোনো বোধই থাকে না যেহেতু তার মস্তিষ্ক সুস্থ নয়। এই সুস্থ মস্তিষ্ক কাকে বলে, না, যে বিচার করে নিতে পারে ভালো মন্দ রং বেরংয়ের পার্থক্য। তাই আমার প্রথম প্রতিপাদ্যে ফিরে আসি—খণ্ড অভিজ্ঞতা বা আনন্দ থেকে অখণ্ড অভিজ্ঞতা বা আনন্দে যেতে হয়। খণ্ড অভিজ্ঞতায় আছে অহুভূতি+মস্তিষ্ক, আর অখণ্ড আনন্দে আছে অহুভূতি+মস্তিষ্ক+অভিজ্ঞীয় ভাব। অর্থাৎ রসরাজ্য থেকে ভাবরাজ্যে পৌঁছানো। এ কেমন, না, যেমন দোতলায় ওঠবার পর আর সিঁড়ির কথা মনে থাকে না কিন্তু অবচেতন মনে সিঁড়ির একটা আবছা ছায়া থেকে যায়। এ ভাব রাজ্যেও ঠিক তাই—রস সাম্রাজ্যের একছত্র অধিপতি এই ভাব। রস-প্রজাদের নিয়েই রাজ্য, কিন্তু রাজার কথাই

মনে পড়ে আগে। সমস্ত ঋণ মিলে গিয়ে যেন অধঃের সংহত রূপ মনে জ্যোতি বিকীরণ করে।

সংগীতেও ঠিক এই ব্যাপারই হয় বলে মনে করি। প্রথম প্রথম স্বরজ্ঞান। তারপর তার অলঙ্কার। স্বর সাজিয়ে দিলাম বিভিন্ন কাণ্ডদায়, রাগ সৃষ্টি হ'লো, তাকে অলঙ্কারে সাজিয়ে দিলাম—তান তোড়ায় ছেয়ে দিলাম রস সৃষ্টি হ'লো—আর এই রস এর পথ ধরে চলে গেলান ভাবের গভীরে! যে জিনিস যত বুঝি তার অনুভূতি তত প্রখর, যা বুঝিনা তাই আবছা। স্বর বুঝি তাই শুদ্ধ বিকৃতির বৈষম্যে অনুভূতির পার্থক্য। অলঙ্কার বুঝি তাই তার সূচু প্রয়োগে গৌন্দর্ষ উপলব্ধি—স্বর বা রাগ বুঝি তাই তাতে রসের অনুরাগ আর রস বোধেই ভাব সমাধি। প্রত্যেকটি প্রত্যেকের ওপর নির্ভরশীল। একছাড়া অন্যের অস্তিত্ব যে খাপছাড়া বেসামাল হয়ে পড়ে! মানুষের মনের ভারসাম্য তাতে করে নষ্ট হয়। মনের তুল্যদণ্ডে সে বিচার করে নিরপেক্ষ ভাবে সামান্য ক্রটিও তার বুদ্ধিকে অতিক্রম করতে সাহসী নয়। এ নিয়ম প্রকৃতিগত। তাই বিচার বুদ্ধির মাধ্যমে অণু অণু করে বিচার করে সে পথ দেখায় শুদ্ধ রসের নইলে বেহিসেবী, বিকৃত বুদ্ধির বীভৎস তণ্ডবে সাংগীতিক পরিবেশ শুকিয়ে মরে যায়। আর একমাত্র শুদ্ধরসের সূচক সিঞ্চেই ভাবের পরিচয় আর গভীরতা।

তাই বলছিলাম, আমরা সবাই সমঝদার হই আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির মাধ্যমে, আর শিল্পী তার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় পায় ভাবের সন্ধান। আমাদের পথ সূক্ষ্ম বিচারের আর শিল্পীর পথ ভাবের ব্যঞ্জনা। এই শিল্পী হতে গেলে যে ক্রমানুযায়ী শিক্ষার প্রয়োজন নেই তা নয়—সাধারণ জ্ঞান থেকেই সে অসাধারণের পথে যায়—কিন্তু শুধুমাত্র অসাধারণ শিল্পচাতুর্য শিল্পীর একমাত্র পরিচয় নয়—সেই শিল্প চাতুর্যের মাঝে বিশিষ্ট প্রাণস্পন্দন,—বিশিষ্ট ভাবাবেগের অনুপ্রবেশ করানোতেই তার শিল্পঅভিব্যক্তি। এই প্রাণস্পন্দনের প্রবেশ কি করে হয় তা শিল্পীর জ্ঞানের বাইরে—বিচারের বাইরে, এ অবস্থা বোধ করি সমঝদারেরও। শিল্পীর ক্রমানুযায়ী শিক্ষা বিস্তৃতির পথে অর্থাৎ সাধারণ পরিবেশের মাঝে, সাধারণ বিচারবুদ্ধির আশ্রয়ে থাকতেই এমন একটা বিশেষ অনুভূতির সন্ধান সে পায় যা নাকি তার ধরাবাঁধা ক্রমের বাইরে। তবে সে একে গ্রহণ করতে পারে যেহেতু তার শিক্ষা আছে ক্রমপর্যায়। আর তাই দিয়েই সে প্রকাশ করতে পারে সাধারণের নিকটে। সমঝদার-সাধারণ তার ক্রম দিয়ে বা বিশিষ্ট আঙ্গিক নিয়ে শিল্প বিচারে বসে—কিন্তু কোনো সময় সে দেখতে পায় এমন প্রকাশ যা নাকি সমস্ত আঙ্গিক (অবশ্য ধরাবাঁধা) অতিক্রম করে নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গীমায় দৃশ্য। এর আবেদন তার নিকট সূচু, সংহত, প্রাণময়। কিন্তু বিচারের মাঝে কোথায় যেনো একটা সূত্র নেই—যেনো বিশিষ্ট রেখার গতি যেতে যেতে মুছে গিয়ে আবার আরম্ভ হয়েছে, এই রকম। একেই বলে অতীন্দ্রিয় ভাব। এ শিল্পীর মনে আসে। এরই ভাগিদে শিল্পী নতুন সৃষ্টি করে। সমঝদারের মনে আসেনা (এলেও তার প্রকাশ নেই) কিন্তু সমঝদারই একমাত্র শিল্পীর নিকটতম আত্মীয় হতে পারে তার বিশেষ বোধ দিয়ে, সাধারণে নয়। তাই সমঝদার হতে গেলে, শিল্পকে বুঝতে হলে চাই বিশেষ জ্ঞান। বিশিষ্ট শিল্পের আঙ্গিক বুঝতে হলে ক্রমানুযায়ী শিখতে হবে

আর আঙ্গিক বুঝতে পারলেই ক্রমশ রসের গভীরে—শিল্পভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। নচেৎ শুধুমাত্র সহজাত অনুভূতির সামান্য বোধেই সন্তুষ্ট হয়ে ছোট পরিবেশে রসপোলকি ঘটে।

মোটকথা, বহির্জগত আর অন্তর্লোকের নিত্য সংঘাতে নতুনের প্রকাশ। আমরা যা দেখি তার অনুভূতিমাধ্যমে যে বোধ হয় তাকেই যখন অন্তরের অন্তঃস্থ ভাবে মণ্ডিত করি আর সেই ভাব যখন কোনো কিছুর মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাকেই বলি শিল্প, আর যে প্রকাশ করে সেই হলো শিল্পী, আর পরোক্ষভাবে যে এই ভাবের অদৃত শক্তকরা ৭৫ ভাগ বুঝতে পারে সেই হলো সমঝদার।

১৯০৫ সালের ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলন প্রসঙ্গে লেনিন

ই. কোমারফ

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সমগ্র এশিয়া জুড়িয়া যে ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়ন চলিতেছিল, ভারতে ১৯০৫-১৯০৮ সালের ঘটনাবলী হইল তাহারই বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রকাশ। এশিয়ার কতকগুলি দেশে পুঁজিবাদের জন্ম এই ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের ইন্ধন জোগায়, এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পক্ষ হইতেও ঔপনিবেশিক শোষণ তীব্রতর হইয়া ওঠে। তদুপরি, রুশ-জাপান যুদ্ধ ও বিশেষত ১৯০৫-১৯০৭ সালের রুশ বিপ্লবের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর দ্বারাও এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকখানি প্রভাবিত হয়। এই রুশ বিপ্লব গণতন্ত্রের পক্ষে বাহ্যিক সংগ্রাম করিতেছিল তাহাদের আস্থা ও প্রেরণা জোগায়।

১৯০৫ সালে লেনিন “এশিয়া জাগিয়া উঠিতেছে” শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে প্রাচ্য দেশগুলিতে মুক্তি আন্দোলনের অভ্যুদয়কে লেনিন এই প্রবন্ধে নিপীড়িত জাতিগুলির প্রতি গভীর সহানুভূতি সহকারে বিবৃত করেন এবং উহার ঐতিহাসিক কার্যকারণ ও তাৎপর্যের উপরে বিশেষ জোর দেন। তিনি লেখেন : “বিশ্ব-পুঁজিবাদ ও ১৯০৫ সালের রুশ আন্দোলন সুস্পষ্টভাবেই এশিয়াকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। মধ্যযুগীয় আধা-বর্বরতার স্তরে অবস্থিত কোটি কোটি পদদলিত মানুষ জাগিয়া উঠিয়াছে এক নূতন জীবনের মধ্যে, তাহাদের মূলগত মানবিক অধিকারের ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মধ্যে।” সনাক্তের এক সর্বাঙ্গীন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া লেনিন ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি লইয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন যে এশিয়ার জনগণ সমগ্রভাবে মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করিবে। এই প্রবন্ধটিতেই তিনি লেখেন : “এশিয়ার এই জাগরণ এবং ইউরোপে রাজনৈতিক অধিকারের জন্য প্রগতিশীল নিবিশ্বস্ত্রণী যে সংগ্রাম চালাইতেছে তাহা বিশ্ব-ইতিহাসে এক নূতন যুগকে চিহ্নিত করিতেছে—ষে-যুগের সূচনা হইয়াছে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে।”

এশিয়া সম্বন্ধে এবং বিশেষত ভারত সম্বন্ধে লেনিন যে আশ্রয় প্রকাশ করিতেন, ইহাই হইল তাহার কারণ। ১৯০৫-১৯০৮ সালের ভারতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে লেনিনের শুধু কয়েকটি মন্তব্য সম্পর্কে আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। এই মন্তব্যগুলির মধ্যে ভারতীয় জনগণের প্রতি তাহার গভীর সহানুভূতি প্রতিকলিত হইয়াছে।

লেনিন লুণ্ঠন-মনোভাবাপন্ন ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার এবং নিপীড়িত ভারতীয় জনগণের উপরে যেসব অত্যাচার-অবিচার করা হইয়াছে তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। ১৯০৮ সালে লিখিত “বিশ্বরাজনীতিতে বিক্ষোভক ইন্ধন” নামক একটি প্রবন্ধে লেনিন বলেন, “ভারতে ব্রিটিশ শাসন হিসাবে পরিচিত ব্যবস্থাটির মধ্যে অত্যাচার ও লুণ্ঠনের কোনো শেষ নাই।” ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা প্রতি পদে বাধা দিয়া থাকে। “সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কয়েকটি কথা” শিরোনামায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লেনিন মন্তব্য করেন, “ইংল্যান্ড এই দেশের শ্রমশিল্পের গল

টিপিয়া ধরিতেছে।” ভারতের গভর্নমেন্ট-ব্যবস্থা যে এক স্বৈরাচারী একচ্ছত্র শাসনব্যবস্থা এবং উহা যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে জাতীয় সংঘর্ষ বাধাইতে সচেষ্ট, সে কথা উল্লেখ করিবার পর লেনিন বিশেষ জোর দেন উপনিবেশ-স্থাপনকারীদের অধীনে ভারতকে যে রাজনৈতিক নিপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে তাহারই উপরে।

জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিরুদ্ধে উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা সেসব সম্ভাসমূলক বিধিব্যবস্থা প্রয়োগ করিতেছে, লেনিন তাহার স্মৃতিস্তম্ভ নিন্দা করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লেখেন : “জন মর্লের স্তায় স্বাধীন ব্রিটেনের যারপরনাই উদার ও প্রগতিবাদী রাজনীতিবিদরাও ভারত শাসন করিতে আসিয়া অকৃত্রিম চেঙ্গিস খাঁ হইয়া ওঠেন, শাসনাধীন জনসাধারণকে “শাস্ত” করিবার জন্য যেকোনো ব্যবস্থাকে—এমন কি, রাজনৈতিক প্রতিবাদীদের উপরে চারুক মারাকেও অমুমোদিত করেন।”

১৯০৫-১৯০৮ সালের ঘটনাবলীর মূল্যায়ন করিতে গিয়া লেনিন উল্লেখ করেন—রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে ও জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের মধ্যে ভারতীয় জনগণের জাগিয়া ওঠার ব্যাপারটিই ঐতিহাসিক তাৎপর্যের দিক দিয়া এক নিয়ামক ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ইহা প্রমাণিত হয় সর্বাত্মক উপনিবেশবিরোধী মনোভাবের প্রকাশের মধ্য দিয়া, সভা-সমিতি-মিছিল-বিক্ষোভপ্রদর্শন ইত্যাদির মধ্য দিয়া, এবং বিশেষত ভারতের কতকগুলি শহরে ধর্মঘটের মধ্য দিয়া। “এক পুঁজিবাদী উপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে—অর্থাৎ দাগহ, লুঠন ও অত্যাচারের এক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে” ভারতের “জনগণের জাগরণ ও সংগ্রাম” সম্পর্কে লেনিন বারংবার বলেন।

তৎকালীন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অন্ততম নেতা বালগঙ্গাধর তিলক ও তাঁহার সহযোগীগণ ভারতের জনগণের জাতীয় চেতনা বিকাশে ও তাহাদের সংগ্রামের অগ্রগতি ঘটানোর কাজে অনেকখানি প্রেরণা জোগাইয়াছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইঁহারা আগিয়াছিলেন “পোর্ট বুর্জোয়া” বুদ্ধিজীবীদের মধ্য হইতে—গম্বাজের অন্যান্য তথাকথিত “শিক্ষিত অংশের” চেয়ে ইঁহারা ছিলেন জনগণের বেশি কাছাকাছি। লেনিন তিলককে ও তাঁহার অনুগামীদের গণতন্ত্রপন্থী ও জননেতা বলিয়া অভিহিত করেন। উপরিলিখিত প্রবন্ধটিতে লেনিন বলেন : “কিন্তু ভারতের সর্বসাধারণ তাহাদের নিজেদের লেখক ও রাজনৈতিক নেতাদের আদর্শকে উচ্চে তুলিয়া ধরিতে শুরু করিয়াছে। ভারতের গণতান্ত্রিক নেতা তিলকের উপরে ব্রিটিশ শৃগালরা যে নিতান্তই ঘৃণ্য রায় দান করিয়াছে তাহা হইল একজন গণতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে টাকার খলিয়ার আজ্ঞাবাহীদের এক প্রতিশোধমূলক হুজুয়া। তাঁহাকে বহু বৎসরের স্বল্প নির্বাসন-দণ্ড দেওয়া হইয়াছে এবং ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্স-এর এক প্রস্তোত্তর হইতে জানা গিয়াছে যে ভারতীয় জুরিগণ তাঁহাকে মুক্তিদানের পক্ষে রায় দিলেও ব্রিটিশ জুরিগণ এই দণ্ডদানকে জোর করিয়া বলবৎ রাখেন। এই ব্যাপারের ফলে কোম্বাইতে বিক্ষোভ-প্রদর্শন ও ধর্মঘট হয়।”

তিলকের অনুগামীদের গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রথমত ও প্রধানত এই ব্যাপারটির মধ্য দিয়াই প্রকাশ পায় যে, তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের উদার ও নরমপন্থী (মডারেট) নেতাদের পক্ষে না গিয়া তাঁহারা জনগণকে উপনিবেশিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প

লইয়া এক গণসংগ্রাম চালাইবার আহ্বান জানান। ইহারাই বোম্বাই-ধর্মঘটের দ্বারা গণবিক্ষোভের প্রদর্শনীকে সংগঠিত করিয়া তোলেন। তিলকের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যসূচীর প্রকৃতি ছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক। তিনি ও তাঁহার অনুগামীগণ দাবি তোলেন এক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্য (১) ; জাতি ও ধর্ম নিবিশেষে সকলের সমান অধিকারের জন্য (২) ; জাতি ও ভাষাগত নীতির ভিত্তিতে নূতন এক প্রশাসনিক বিভাগের জন্য (৩)। তাঁহার দাবি তোলেন—জাতীয় শ্রমশিল্পকে আরও আগাইয়া লইয়া যাইতে হইবে এবং দেশ স্বাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির শাসনের অবসান ঘটাইতে হইবে (৪)।

জনসাধারণকে মুক্তি-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলার প্রয়াসে তিলকের নেতৃত্বে ভারতীয় দেশপ্রেমিক ও গণতন্ত্রবাদীগণ জনগণকে নিজেদের সামাজিক সমস্যাগুলির নিজেরাই সমাধান করিয়া লইবার আহ্বান জানান।

১৯০৫-১৯০৮ সালে জাতীয় মুক্তির জন্য গণআন্দোলন ছিল উহার প্রাথমিক অবস্থায়। উহার সম্মুখে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার ছিল। কিন্তু সেই সময়েই তিলকের সমর্থনে ভারতীয় শ্রমিকগণ কর্তৃক সংগঠিত বোম্বাই-ধর্মঘট প্রসঙ্গে যত্নব্য করিতে গিয়া লেনিন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে “ভারতীয় নিবিত্ত শ্রেণী ইতিমধ্যেই এক শ্রেণী-সচেতন রাজনৈতিক গণসংগ্রামের জন্য পরিণত হইয়া উঠিয়াছে।” সেই সঙ্গে তিনি ইহাও বলেন, ভারতীয় জনগণ এই যে সচেতন জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মধ্যে আগিয়া উঠিয়াছে, ইহা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অস্তিন দিনের সূচনা ঘটাইতেছে। আজ লেনিনের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে। ভারত স্বাধীন উন্নয়নের স্তরে আগিয়া পৌঁছিয়াছে।

(১) • বালগঙ্গাধর তিলক : “বক্তৃতাবলী ও রচনাবলী” (গণেশন, মাদ্রাজ, ১৯১৯) পৃ: ৮০।

(২) আই, এন, তোপা কর্তৃক উদ্ধৃত বিপিনচন্দ্র পালের বিবৃতি : “ভারতে জাতীয় চেতনার বিকাশ ও ক্রমবৃদ্ধি” (হায়দ্রাবাদ, ১৯৩০) পৃ: ১৬২।

(৩) প্রথমোক্তগ্রন্থ—পৃ: ৯৬।

(৪) মাদ্রাজে ১৯০৭ সালে প্রদত্ত বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা।

—ভাস

১১ চন্দ্র ৫

প্রিয়া : কাহিনী : বিজয় গুপ্ত, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সলিল সেন, সংগীত পরিচালনা : রাঘবেন সরকার, আলোকচিত্র : অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলজা চট্টোপাধ্যায়, শব্দগ্রহণ : মণি বসু, সম্পাদনা : সুবোধ রায়, ভূমিকায় : সাবিত্রী, রবীন, অসিতবরণ, নীতিশ, ছবি, অশুপ, জহর রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে ।

‘প্রিয়া’—এই নামটুকুর মধ্যে যে কান্যা আছে, নানা উপকরণে সমৃদ্ধ ছবিখানির মধ্যে তার লেশমাত্রও নেই ।

কৃত্রিম বিষয়ও পরিবেশনার গুণে স্বাভাবিক বলে মনে হয়, কিন্তু এ ছবিতে ঘটনা সংস্থাপন ও দৃশ্যরচনা সূষ্ঠ না হওয়ার জন্য তা হয়নি ।

খুঁটিনাটি আলোচনার মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, গল্পটিতে একটি মৌলিক ত্রুটি আছে । অশুভ সমীরকে সুস্থ করে তুলতে মানসী কাজে লাগলো স্ত্রীর মত দেখতে ব’লে । কিন্তু আবেগঘন মুহুর্তে সমীর যেই তাকে নিবিড়তর করে পেতে চায় তখনই পবিত্রতা রক্ষার জন্যে মানসীকে তার বাহুবন্ধন এড়াতে হয় ; আর সমীর তখনই পায় ‘শব্দ’ ; আবার তার ট্রেন দুর্ঘটনার স্মৃতি মনের মধ্যে আসে । এ অবস্থায় অশুভের উন্নতি কি করে হতে পারে ভেবে পাওয়া মুশকিল । স্বামী-স্ত্রীর মিলনের ক্ষেত্রে ‘তুমি এই পর্যন্ত এর বেশি নয়’—এমন পাওয়া পাওয়ার পরিতৃপ্তি আনে না, চাওয়াকেই আরো বাড়িয়ে দেয় । শিবপুজোর অজুহাত ধোপে ঢেকে না । আসল কথা আপনি যদি মুক্তি নিয়ে বুঝতে চান বা দেখতে চান, তাহ’লে এ ছবি দেখতে যাবেন না ।

অভিনয়ে রবীন মজুমদার ও অসিতবরণ দুজনেই নিপুণ । লঘু পরিবেশেও রবীন মজুমদারের মুখে অকারণ কাঠিন্য অত্যন্ত গীড়াদায়ক বলে মনে হয়েছে । কোনো অশুভূতির তীব্রতা যখনই আমরা এদের মুখে প্রতিফলিত হতে দেখতে চাই, তখনই এরা হয় হাত দিয়ে মুখে একটা আবরণের সৃষ্টি করেন, নয় মুখ ঘুরিয়ে নেন অথবা সেই সময় ক্যামেরা আর এক মুহুর্ত সময়ও বেশি দিতে সাহস পায় না ।

শিল্পী অরুণের চলনে বলনে এমন কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল না যার জন্য তার উপর সহানুভূতির সৃষ্টি হতে পারে । শিল্পীর ঘরে মানসীর উপস্থিতির সময়টুকুও কোনো আবেগের সৃষ্টি করতে পারে না । তাই মূর্তিমান উপদ্রবের মত যখন পাওনাদারের বেশে তুলসী চক্রবর্তীর আবির্ভাব হয়, তখন তাকে স্বাগত জানাতে ইচ্ছা হয় ।

আলোকচিত্র, গ্রহণ বা সংগীতপরিচালনায়ও কোনো কতিপয় চোখে পড়লো না । একমাত্র সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণবন্ত অভিনয়ের জন্যেই ছবিটি শেষ পর্যন্ত দেখা চলে ।

রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত : কাহিনী : শরৎচন্দ্র, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : হরিদাস ভট্টাচার্য, সংগীতপরিচালনা : জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, আলোকচিত্র : জি, কে, নেহতা, শব্দগ্রহণ : দেবেশ ঘোষ, শিল্প-নির্দেশনা : সুবোধ দাশ, সম্পাদনা : সুবোধ গাঙ্গুলী ; ভূমিকায় : সুচিত্রা, উত্তম, তুলসী, অনিল চ্যাটার্জী, শিশির বটব্যাল, জহর রায়, হিম্মু ভাওয়াল ও আরো অনেকে ।

‘রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত’ প্রধানত শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের চিত্ররূপ, যদিও ইন্দ্রনাথ বা অন্নদাদিদি এখানে নেই ।

যে সমস্ত বইকে একদিক থেকে ক্র্যাসিক্স বলা যেতে পারে তার চিত্ররূপ দিতে যতটা পরিশ্রম, যতটা অধ্যবসায় আশা করা যায় তার কোনো লক্ষণ নেই এ ছবিতে ।

বই পড়ে রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তকেও আমরা যেভাবে কল্পনা করেছিলাম, চিত্রে তাদের সেভাবে পেলাম না । শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর যে প্রেমকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিল—“বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া দেয়” সেই ‘বড় প্রেমের’ ছবিটি এ ছবিতে অনুজ্জ্বল । উত্তমকুমার অন্নদিনের মধ্যে শরৎচন্দ্রের তিনটি পুরুষ চরিত্র রূপ দিলেন কিন্তু, হৃৎখের সংগেই বলতে হচ্ছে, কোনোটিতেই তিনি কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন না । নায়িকা সুচিত্রার কাছে পূর্বেই তাকে নিশ্চয় মনে হয়েছে, এ ছবিতে আরো বেশি । অবশ্য তার মানে এই নয় যে সুচিত্রার সব অভিনয়ই রসোত্তীর্ণ । অভিনয়ের সার্থকতা বা বার্থতার জন্য পরিচালক নিঃসন্দেহে অনেকখানি দায়ী । সুন্দরী সুচিত্রার দেহলাবণ্য নানাতাবে দেখিয়ে বক্স-অফিস গ্যারান্টির স্বপ্ন দেখলে আর যাই হোক কলালক্ষ্মীর লাবণ্য তাতে প্রকাশ পায় না । রাজলক্ষ্মীকে নাচিয়ে ছাড়া হোল, কিন্তু কলালক্ষ্মী আসন ছেড়ে পালালেন । এমনতর ট্রাজেডা শিল্পের ক্ষেত্রে আর কি হতে পারে ।

শ্মশান আমরা দেখেছি, শ্রীকান্তের শ্মশান আমাদের কল্পনায় দেখেছিলাম অন্য চোখে ; জানতে পেরেছিলাম আঁধারেরও রূপ আছে । ‘রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত’র শ্মশান দেখলাম—শ্মশানের একটা ফটোগ্রাফ । শ্মশানের আত্মা নেই সেখানে ।

শিকারের দৃশ্য, শ্মশানের দৃশ্য, সাধুর আখড়া, রাজলক্ষ্মীর বাউলী হবার ইতিহাস—সবই অত্যন্ত স্থূলভাবে চড়া রঙে আঁকা, কাহিনীর বিস্তারিত কোথাও সূক্ষ্ম রেখার কাব্য নেই ।

গল্পে গল্পের অভাব থাকলে আলোকচিত্রশিল্পীর কলাকৌশলে অনেকটা এক্ষেপেয়ি কাটে কিন্তু এ বিষয়েও বলবার মত কিছু চোখে পড়লো না ।

অভিনয়ে একমাত্র ডাক্তারের চরিত্রটি ছাড়া হরিধন, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি সবাই অতি-অভিনয় দোষ ছুঁতে ।

‘ছবিটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ একটি ঠুংরী ও একটি খেয়াল । আবহসংগীত উচ্চাঙ্গের না হলেও এই গান‘ছ’টির জন্যে সংগীতপরিচালককে ধন্যবাদ ।

শ্রীকান্তের অন্তিম পর্বও ক্রমশ রূপায়িত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে, এ বিষয়ে আমাদের আশার সংগে আশংকাও জড়িয়ে থাকলো—এ কথাটা শ্রীমতী পিকচার্স স্বরণ রাখবেন আশা করি ।

॥ জ্যোতিভূষণ ॥

॥ গ্রন্থ-পরিচয় ॥

জঙলা মাঠের ফসল : শশিভূষণ দাশগুপ্ত। নিরীক্ষা, কলিকাতা-১২।
দাম—৩,২৫ নয়া পয়সা।

আধুনিক বাঙ্গলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষ করে লক্ষ্য করবার বিষয় বিভিন্ন স্তরের জনগণের জীবনকে রূপায়িত করবার দিকে তার প্রবণতা। কিন্তু এই জীবনকে রূপায়িত করতে গিয়ে জগত ও জীবন সম্পর্কে লেখকের গভীর উপলব্ধি ও সেই সঙ্গে সত্য জীবনদৃষ্টির পরিচয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয় ধোঁয়াটে নয়ত আরোপিত, আর কোন কোন ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনা, চরিত্র চিত্রণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতির মধ্যে অযথা বাগ্-বিস্তার অনেক সময় গ্রন্থকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। এই সমস্ত ক্রটি বা অভিযোগ থাকে। তবে উপন্যাসের ক্ষেত্রে সার্থক বা সুন্দর সৃষ্টি আধুনিক যুগে হয়েছে এবং যথেষ্ট অগ্রগতির পরিচয়ও বহন করে। প্রখ্যাত এবং প্রতিভাবান পরিচিত উপন্যাসিকদের কথা বাদ দিয়েও অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত বা একেবারে নবাগতদের হাত থেকেও বিষয়বস্তু ও কলাকৌশলের দিক থেকে সুন্দর সার্থক সৃষ্টি কিছু কিছু আমরা পাচ্ছি। যে জীবনকে নিয়েই কাহিনী রচিত হ'ক, সেই জীবনের সঙ্গে লেখকের অন্তরঙ্গ পরিচয় এবং সহানুভূতির সাক্ষাৎ যেখানে পাই সেখানেই মন সাড়া দিয়ে ওঠে। আর সেই কাহিনীর মধ্যে যে চরিত্রগুলি পাই তারা যদি তাদের সুখ দুঃখ হাসিকান্নার মধ্য দিয়ে সেই জীবনের বাস্তব চরম সত্যকে তুলে ধরতে পারে—ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং শ্রেণীগত পটভূমিতে লেখক যদি তাদের জীবনসত্যকে রূপ দিতে পারেন, তবে তা সার্থক সৃষ্টি হিসাবে গণ্য হবে, সে কথা বলা বাহুল্য।

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ঠিক উপন্যাসিক হিসাবে ততটা পরিচিত নন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট সমালোচক হিসাবে তাঁর যে স্থান সেখান থেকে উপন্যাসের জগত একটু দূরের। কিন্তু তার 'জঙলা মাঠের ফসল' পড়ে চমৎকৃত হলাম। ভাল লাগা ছাড়াও কয়েকটি প্রশ্ন মনে এল বলে এই সমালোচনা লেখা।

প্রথমত বইটি পড়ে মনে হয়, যে জীবনকে নিয়ে লেখক লিখেছেন তাঁর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা অনস্বীকার্য। কিন্তু শুধু পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা থাকলেই সেটা সাহিত্য হয়ে ওঠে না। যখন দেখি সেই জীবনকে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত করবার নিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে তার মধ্যে কুটে উঠেছে সত্যকার জীবনরসরসিকতা তখনই সৃষ্টি হয় তার সাহিত্য মূল্য। এই দুটি দিকেরই সাক্ষাৎ আলোচ্য উপন্যাসটিতে আছে এবং সেখানেই এর আকর্ষণ। জায়গায় জায়গায় কথোপকথনের মধ্য দিয়ে যে অকৃত্রিম জীবনরস উৎসারিত হয়েছে তাতে মুগ্ধ হতে হয়—উদ্ধৃত করতে হলে এরকম অনেক জায়গা আছে, তবু একটি জায়গা উদ্ধৃত না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অভাবের ভাড়নায় জয়লাল মহাশয়ের নিকট টাকা আনতে গিয়েছিল, মহাশয় তাকে

বাগে পেয়ে পঁচিশ টাকার স্থানে পঞ্চাশ টাকা নিতে বাধ্য করেছে এবং এমন দলিল করে নিয়েছে যাতে ফসল সন্তোষ জনি গায়েব হয়ে যায়। অসহায় চাষী বিপদে পড়ে প্রতিবেশি মামুদ মিঞাকে ডেকে পরামর্শ চাইছে।

মামুদ বলে, ডাকছিল নাকি জয়লাল? কি, ব্যাপার কি?

ডাকছি চাচা বড় কারণে,—চোক গিলিয়া বলে জয়লাল। ঐ যে আমার সেই ভুতুরদিয়ার ধানী জমিখান—

হঁ—তার কি?

ভান্দোরে ত চাচা সব জলে গেল।

জানি সবই।

তারপরে ত নিজের জ্বরে পড়লাম, আবার ময়নালকে কাটল সাপে।

সবই নছীব জয়লাল, আল্লা ভরসা।

হে মেঞা, আল্লাই ত ভরসা। তার পরে ত পড়লাম বড় ঢেকায়।

অজানা নাই কিছুই।

কুজি তো আর চলে না। বুদ্ধি তখন গেল উল্টা দিকে, নিজের হাতে গু খাইলাম।

কি করলা মেঞা?

গেলাম তিলের চর রামশরণ সা'র কাছে—

হুর্গতি করলা মেঞা, একেবারে হুর্গতি; টাকা নিলা বুঝি?

হয়—বলিয়া মাথা নীচু করে জয়লাল।

কত?

পঞ্চাশ!

পঞ্চাশ?

চুপ করিয়া থাকে তিনজনই।

কাশি দিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া মামুদ বলে, ভুল করলা মেঞা—ভুল। ওত মামু নয় দানো—ঐ যে রক্তচোষা দানো; ওর দিষ্ট গেছে এখন তোমার জমির উপর, ছাড়ান মুন্সিল।

উপন্যাসটির দ্বিতীয় আকর্ষণ তার জয়লাল এবং ময়লাল চরিত্র। জীবনে অভাব এবং প্রাকৃতিক দুর্ভোগের তাড়নায় টিকে থাকবার তীব্র সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত জয়লাল, চরিত্র, শান্ত ভীকু সরল প্রামা চাষী। তার ছেলে ময়লাল যুবক, তার স্বভাব বাপের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। নিজের অধিকার এবং দাবীকে সে পেতে চায় নিজের মত করে, সেখানে প্রামা সরলতা আছে বটে কিন্তু আছে একটা পাবার এবং ভোগ করবার উচ্ছত ভঙ্গী—শক্তির এবং অত্যাশঙ্ক্যকারী বিক্রমে তীব্র প্রতিহিংসা। এরই জন্যে সে ঘরোয়া জীবনকে পেল না—সমাজ সংসার তাকে ঠেলে দিল নীড়-হার। মায়াবর জীবনের মধ্যে প্রতিহিংসার তীব্রতায় তাকে ছেলে ঘানি টানতে হল। কিন্তু এই চরিত্রের সুস্থ সবল যৌবনধর্ম আরো চমৎকৃত করে যখন তার হৃদয়ের সরল একরোখা প্রেমের সৌরভের স্বাদ পাই, যখন দেখি, যে শক্তির সে যত্ন কামনা করে তাকেই পৌরুষধর্মের অবমাননা

সহ করতে না পেরে অবশ্যস্তাবী মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। ময়লাল চরিত্র সম্পর্কে এককথায় বলা যায়, 'এ হিরোইক সোল স্ট্রাগ্‌লিং ফর ইটস্‌ একজিস্টেন্স'। অগ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে মামুদ মিঞার নাম করতে হয় সর্বপ্রথমে। তা ছাড়া কানুসর্দার, মৈনদ্দি প্রভৃতি প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে যেমনি রয়েছে একদিকে মানবিক আকর্ষণ তেমনি তারা প্রত্যেকে বিশিষ্ট। স্রীচরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে বাস্তব পটভূমিতে তাদের স্ব স্ব পরিবেশে সার্থক রূপায়ণে।

উপন্যাসের পরিসমাপ্তি লেখকের গভীর জীবনদৃষ্টির পরিচায়ক।

আধুনিক উপন্যাসের পল্লবিত বাগ্‌-বিস্তার ও অতিবিশ্লেষণ পদ্ধতি 'জুলা মার্ঠের ফসল'এ অনুসরণ করা হয়নি। শিল্পরীতির দিক দিয়ে সেগুলি কতখানি বর্জনীয় বা লক্ষ্য পৌছবার পথে বাধাস্বরূপ তা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। তবে বর্তমান উপন্যাসে কোথাও কোথাও বিশ্লেষণের সংক্ষিপ্ততা এবং বাক্‌-সংযম বিষয়ের উপলব্ধি ও অনুভবকে গভীরতর করে তুলতে পারেনি। কোথাও কোথাও ঐ দুটি গুণই রসের নিবিড়তা সৃষ্টি করেছে। বলা যেতে পারে এ জিনিসটা শিল্পীর হিসাব এবং অথও দৃষ্টি সাপেক্ষ।

কক চক্রবর্তী

অগ্রণীর বই

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'ষ্টালিন' তৃতীয় সংস্করণ চলছে।
ষ্টালিনের জীবনকাহিনী এত সুন্দর করে বাংলা ভাষায়
আর লেখা হয়নি। চমৎকার ছাপা বাঁধাই। তিনখানি
ছুরঙা ছবি। ৬৮

অনুবাদগ্রন্থ : ম্যাকসিম গর্কীর লেখা ছোট ও বড় গল্প, ডায়েরীর
বাছাইকরা কয়েকটি অংশ, জবানবন্দী, একটি সম্পূর্ণ নাটক
ও কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন 'শিল্প ও সংগ্রাম' ৩।০

রমণা রলার। আই উইল নট রেস্ট-এর বাংলা 'শিল্পীর
নবজন্ম' ৫৮

বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভেরকর ও ইউরোপের অন্যান্য বিখ্যাত
কয়েকজন লেখকের গল্পসংগ্রহ 'বিদেশী গল্প' ২।০

লিও টলস্টয়ের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কাহিনী ক্রুয়েটজার সোনাটার
বাংলা অনুবাদ (অঃ কৃষ্ণ চক্রবর্তী) 'রাহ' ২৮

আধুনিক জার্মানীর শক্তিশালী লেখিকা আন্না সেঘেরসের
'সাবোতিয়ারস' (অঃ দ্রষ্টব্যকুমার বসু) ২৮

আইভান ভুর্গেনিভের 'অশ্রুতী' (অঃ শিশির সেনগুপ্ত ও
জয়ন্তকুমার ভাট্টা) ২।০

ছোট গল্প : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিস্থিতি' ; ২।০

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বেদিয়া-ছন্দ' ২৮

শান্তি দেবীর 'শান্তী' ১।০ ; সুবোধনোহন ঘোষের
'উৎস' ২৮

নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের 'অপরিচিতার চিঠি' ২৮

উপন্যাস : গুণময় মাল্লার 'লখীমের দিগার' ৪।০ ; শিহির
আচার্যের 'দিনবদল' ২৮ ; বৈষ্ণবনাথ ঘোষের 'কল্যাণ' ৫৮

বরণকথা : ডাঃ গৌরমোহন দাসের 'বহাযুদ্ধের পরে
মালয়' ২।০ ; রাহুলের 'জনপদের ছন্দ' ৩।০

কবিতা : মায়াকভ স্কির কবিতা অনুবাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ
মৈত্র ২।০ ; এঁরই স্বরচিত 'আকাশের মুখ' ১।০ ; চিত্ত

ঘোষের 'অন্তরা' ১।০ ; রামেন্দ্র দেশমুখের 'জনসমুদ্র' ১।০

বিবিধ : সরোজ আচার্যের 'মার্কসীয় শ্রুতিবিজ্ঞান' ২৮

অগ্রণী বুক ক্লাব

। ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬।

অগ্রণীর গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি নিবেদন

হারিগন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের সংযোগস্থলে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ভিতর এ-ব্লকের নতুন বইয়ের বাজারে ১ ও ৬৫ নং স্টলে অগ্রণী প্রকাশনীর বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এখানে বাংলা ও ইংরেজী বই এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকা পাওয়া যায়। ইংলও, আমেরিকা, রুশ, চান, জার্মানী ও অন্যান্যদেশের ইংরেজীভাষায় প্রকাশিত বই ও পত্রপত্রিকার জন্ম যোগাযোগ করুন।

পত্র সংবাদ দিলে অগ্রণী প্রকাশনীর প্রতিনিধি আপনাকে বাড়িতে বসে বই ও পত্রপত্রিকা দেখার সুযোগ করে দেবেন।

অগ্রণী প্রকাশনী

এ ব্লক, ১ ও ৬৫ নং স্টল, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

॥ দ্বীপ ॥

দশম বর্ষ, চৈত্র, ১৩৬৪

সম্পাদক : প্রফুল্ল রায়

॥ গল্প ॥

শত্মনিধি ... বীরেন্দ্র নিওগী ৬২০

॥ রেখাচিত্র ॥

সংস্কার ... শ্যামাপদ রায় ৬৬৮

॥ উপন্যাস ॥

ছায়ানাটক ... দেবকুমার মৈত্র ৬৫১

॥ প্রেম-কথা ॥

ডাউনিং-এর প্রেম ... অমলেন্দু বসু ৬৬৩

॥ প্রবন্ধ ॥

স্পুংনিক ও আপেক্ষিকতাবাদ ... ভিতালি গিন্সবুর্গ ৬৫২

আত্মচৈতন্যের বিকাশ ... মানস রায় চৌধুরী ৬২১

দৃষ্টিভঙ্গির রূপ পরিবর্তন ... অমল হালদার ৬২৬

মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে অপরাধীর শ্রেণীবিভাগ ... প্রমোদ রায় ৬২২

॥ কবিতা ॥

অটোগ্রাফ ... অন্নদাশঙ্কর রায় ৬৮২

অন্ধকার হলে ... মনসুর আহমদ ৬৮৩

পরিচ্ছন্ন আকাশ—তার জন্মে ... সত্যজিত ঘোষ ৬৮৪

জর্জাল : তেসরা কাতিক ১৩৬৩ ... দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৮৫

তুমি ... তারাপদ রায় ৬৮৭

বুহ ... বাসুদেব গুপ্ত ৬৮৭

আমরা কবে ... মণিক মুখোপাধ্যায় ৬৮৮

সঞ্চয়পাত্র ... অমলকান্তি ঘোষ ৬৮৯

দুটি কবিতা ... অরুণাংশু দেব ৬৯০

॥ চলচ্চিত্র ॥

ডাক হরকরা ... চিত্রালাপী ৭০৯

রাজভিলক ... ৭১০

প্রফুল্ল রায় কর্তৃক অগ্রণী প্রেস ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনন্দিন জীবন
চন্দ্রলেখার সফলগুরু

চন্দ্রলেখার গীতা

বিজয়ীমাতা ৩ সাদমী
ভারতের প্রাচীন
নৃত্যশিল্পীদ্বয়

গণেশ, ভাগিন্দার
দুর্গা ধোটে, বিপিন গুপ্ত
আগা, প্রাণ, এবং
আরো
অনেকে



রাজ তিলক

জমিনীর মহান চিত্র

ভারতের সর্বত্র তক্ষ তক্ষ দর্শকের
আনন্দ বর্ধন করিতাছে ।

হিন্দ
ততাপনিস্তিত ও
নারেনিক্ কীন্)

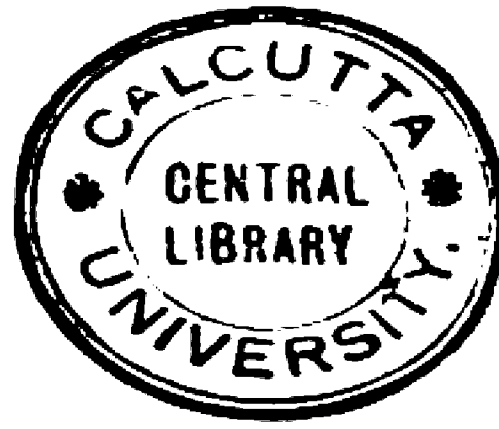
::

রূপালী

::

খান্না

এবং ভারতের সর্বত্র



অগ্রণী

। দশম বর্ষ, চৈত্র, ১৩৬৪ ॥

ছায়ানাটক

দেবকুমার মৈত্র

[পূর্বাহ্নয়তি]

প্রথমবারের মস্তিকবিকৃতি থেকে মেজদা ভালো হয়েছিলো প্রায় মাস দেড়েক পর। একেবারে সুস্থ। পরের বার বি, এস, সি পাশ করলো ফাস্ট ক্লাশ অনার্স পেয়ে। তারপর টেক্সটাইল টেকনোলজিতে টুনিং নিয়ে আমেদাবাদে ভালো চাকরি পেয়েছিলো একটি। বাবা মার হুশিচুতা দূর হয়েছিলো। মেজবোদিকে মা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমেদাবাদে, মেজদার কাছে। প্রতি মাসে মাকে পঁচাত্তর টাকা পাঠাতো মেজদা। সে টাকা সংসারে অনেক কাজ দিয়েছে। বাবার পয়লানঘর এ্যাসেট লিকুইডেটেড হয়ে গেলেও দ্বিতীয় এ্যাসেট ভালো হারেই সুদ দিচ্ছিলো। ইতিমধ্যে আমি বড় হয়ে গেছি। ভর্তি হয়েছি কলেজে। ছোড়দা চাকরি করছে কলকাতায়। বিয়ে হয়ে গেছে তারও। ছোটবোদিও কলকাতায়। বিরাট সংসার ছোট হয়ে গিয়েছিলো : বাবা মা আমি আর ছোট বোন নমিতা। মেজদার পাঠানো পঁচাত্তর টাকা (ছোড়দা টাকা পাঠাতে পারতো না, সে যা চাকরি করতো তাতে তার পক্ষে পাঠানো সম্ভবও ছিলো না), আর বাবা ঘরে বসেও কনসালটেশনে প্রায় ৭ হুয়েক টাকা রোজগার করতেন, সংসার একরকমভাবে চলে যেতো।

তারপর দেশ ভাগ হয়ে গেলো। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে আমরা এলাম কলকাতায়। কানাগলিতে ইঁটের হাঁ-মুখ বার করা নোনাধরা ছাতাপড়া বাড়ির অঙ্ককার স্যাতসোতে চারটে ঘরের ভেতর। তারও পর প্রায় দুবছর কেটে গেলো। এইসময় আমেদাবাদ থেকে একদিন একটি টেলিগ্রাম এলো : মেজদা আবার পাগল হয়ে গেছে।

টেলিগ্রাম পাবার সাথে সাথে বাবা আমাকে আমেদাবাদ পাঠালেন। আমিই একমাত্র বেকার (তখনও আমি কলেজে ভর্তি হইনি, কলকাতা আসবার পর দুটি বছর আমার এমনি নষ্ট হয়েছিলো), হাতে অকুরন্ত সময়। ছোড়দা নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। - তার পক্ষে আমেদাবাদ যাওয়া সম্ভব নয়।

আমেদাবাদে ক্যান্ট্রির দেওয়া বাংলোতে মেজদা থাকতো। আমি গিয়ে পৌঁছতে/মেজবোদি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। দূর বিদেশে, আত্মীয়পরিজনহীন অবস্থায় পাগল সামলাতে কয়েকদিনেই হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলো।

প্রশ্ন করলাম, 'ইঠাৎ এতোদিন বাদে আবার এরকম হলো কি ক'রে।

'জানি না।'

বলতে গিয়ে মেজবোদির চোখে জল এসে গিয়েছিলো। একটু থেমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিলো, 'এবার তোমার মেজদার এমন বিত্ৰী একটা সন্দেহবাতিক হয়েছে।'

আমি কোন কথা না বলে মেজবোদির দিকে তাকিয়েছিলাম জিজ্ঞাসু চোখে।

'মুখহাত ধুয়ে বিশ্রাম করো। তোমার জন্যে চা জলখাবার নিয়ে আসি আগে। পরে বলবে সব।'

মেজবোদি চলে গেলো।

'কে, কে কথা বলছে?'

চুল এলোমেলো, করমচা-লাল চোখে বকু হিংসা, মেজদা এসে চুকলো ঘরের ভেতর।

'ও, তুমি।' শাপিত এবং সন্দেহজনক তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো, 'ইঠাৎ এসেছো যে, কেন, কি মতলব তোমার?'

আমি শুধু অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলাম।

'মেজবোদির সাথে প্রেম জমাতে এসেছো?'

'মেজদা!'

আর্তনাদ ক'রে উঠেছিলাম আমি। কি বলছে মেজদা।

'কি, চুপ ক'রে থাকলে কেন, জবাব দাও।'

আমার ষাড় ছুটো ধরে একটা ঝাঁকি দিলো মেজদা।

ইঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেলে গেলো। বললাম, 'তোমাকে দেখতে এসেছি।'

ও অবস্থায় অন্য কোনো কথা মনে আসেনি। কোনো কথাই মেজদা বিশ্বাস করবে না, যা বলবো তাতেই সন্দেহ বাড়বে আরো। তার চাইতে একথা বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। হয়তো নরম হতেও পারে মেজদা।

ফল হলোও। সঙ্গে সঙ্গে মেজদা নরম হয়ে গেলো।

'আমাকে দেখতে এসেছিস, বেশ বেশ। কিন্তু ওই মাগীটার সাথে কথা বলছিলি কেন, ওর ধারে কাছেও যাবি না, ভয়ানক খারাপ চরিত্রের মেয়েমানুষ। খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে দেবে, আমাকে ও ওইভাবে মেরে ফেলবার মতলবে আছে। আমাকে সরাতে পারলেই ওর পোয়াবারো, পঞ্চ নিকটক। বারো ভাতার নিয়ে ছেনালী করতে পারবে।'

মেজবোদি সেইসময় ঘরে এসে চুকলো চা এবং জলখাবার হাতে নিয়ে। কথাগুলো কানে গিয়েছিলো তারও। বললো, 'শুনলে তো ছোটঠাকুরপো, কি ধারণা আমার সম্বন্ধে।'

মেজদা একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'চুপ করো বুলছি।'

তারপর এক লাফ দিয়ে গিয়ে মেজবোদির হাত থেকে চা এবং খাবারের প্লেট ছিনিয়ে নিয়ে ছু ড়ে ফেলে দিলো জানালার বাইরে।

‘খবরদার বলছি অশোক, ওর হাত থেকে ছলও থানি না। সব বিষ মেশানো।’

আমার বিচার বিবেচনা বুদ্ধি সব গুলিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিলো। মেজদার এ কোন্ চেহারা ?

তারপর হুপুরবেলা মেজদাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুমপাড়িয়ে মেজবোদির কাছে গিয়ে বসেছিলাম।

‘এমন হলো কি করে ?’

‘জানি না।’

মনে হলো মেজবোদি এ প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চায়।

বললাম, ‘তুমি জানো না এটা কেমন কথা ?’

একটু ইতস্তত ক’রে মেজবোদি বললো, ‘সত্যিই আমি জানি না।’

বললাম, ‘কিন্তু হঠাৎ এমন বিজ্ঞী সন্দেহ মেজদার মনে তাহলে এলোই বা কেন ?’

মেজবোদি তীব্র দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। বললো, ‘তুমিও কি সন্দেহ করছো আমাকে ?’

চমকে উঠলাম মেজবোদির কথায়। তাইতো। বললাম, ‘আমার কথার ওরকম মানে করছো কেন ?’

মেজবোদির টানাটানা চোখ দুটি জলে ভরে টসটসে হয়ে উঠলো। বললো, ‘তোমার কোন দোষ নেই ছোটঠাকুরপো, সকলেই এই কথাই ভাববে।’

স্বপ্ন স্বাভাবিক একটা মানুষ পাগল হয়ে যায় কি ক’রে ? মস্তিষ্কের কোন সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ? একটা লোক বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, ধীর, স্থির, সংযতবাক, দূরদর্শী, কয়েকদিন বাদে সেই লোকটিই উদ্ভ্রাণ, বন্য, উন্মাদ, প্রগলভ, পশু হয়ে যায় হঠাৎ—কেন ? শরীরের শিরায় শিরায়, রক্তের কণিকায় কণিকায়, মস্তিষ্কের কোষে কোষে, আঙ্গ যা ছিলো কয়েকদিন বাদেও তো তাই থাকে, তবে ? প্রকৃতির এ কি লীলা ? আর, যদি হয়ই তো অন্য কোনো রোগের মতো ওষুধ দিলেই সেরে যায় না কেন ? বিজ্ঞানের গবেষণায় কতো কিছু আবিষ্কার হয়, হচ্ছে, বাম্পীয় শকট থেকে পরমাণবিক বোমা, আর সামান্য একটা রোগের চিকিৎসা বা তার ওষুধ আবিষ্কার কি সম্ভব হয় না ? এ রোগ কি এতোই মারাত্মক ? তা না হলে মেজদার এরকম হবে কেন ? উন্মাদ, সন্দেহপরায়ণ, হীনমনা, ইতর, নীচ। ধীরে ধীরে রোগ বেড়েই চলেছে আরো। কাল যা ছিলো আজ তার থেকেও খারাপ। বন্ধ পাগল এখন।

সবই আমার মজি। রহমান সাহেব বলছিলেন। না না না। এ কখনো ভগবানের মজি হতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি না।

॥ ২৪শে ॥

বাড়িভাড়ার টাকা পেয়েছি। পাঁচশো টাকা। ছানকীনাথ মাজোরাজীর দোকানে গিয়ে হাণ্ডি ক’রে এসেছি। শতকরা দশটাকা বাটা। অর্থাৎ পাঁচশো টাকার বদলে ছানকীনাথের কলকাতার গদি ওই হাণ্ডিটা দেখালে আমাকে সাড়ে চারশো টাকা

দেবে। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা নেই। এই পক্ষাশ টাকার লোকসান দিতেই হবে। কেন না, আমার টাকার প্রয়োজন। আর, ওরা যখন ব্যবসা করতে বসেছে তখন যেভাবেই হোক না কেন মুনাফার খোঁজে থাকবেই।

॥ ২৭শে ॥

আবার সেই কানাগলি। সেই নোনাধরা ছাতাপড়া ইঁটের হাঁ-মুখ বার করা বাড়ির দাঁত ভাংচানি। সেই অন্ধকার আলোহাওয়াহীন ঘর। অভাব অনটন দারিদ্র্যের সাথে দেয়ালপিঠ যুদ্ধ।

॥ মার্চ, ১৯৫৬ ॥

॥ ৪ঠা ॥

গল্প আমি কোনোদিনই লিখতাম না আগে। চেষ্টা করলে আমিও কিছু লিখতে পারি, কোনো ঘটনা নিয়ে, মানুষের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক নিয়ে বুন্ডে পারি গল্পের জাল, জানা ছিলো না। বড় বড় নামকরা লেখকের গল্প উপভাস পড়ে আশ্চর্য হতাম। মানুষের মনের এইসব গোপন দিকের সন্ধান—এমন বিচিত্র সব গল্প—কাগজের পাতায়, শুধু ভাষার মাধ্যমে নায়কনায়িকাদের জীবন্ত ক'রে গড়ে তোলা কতখানি ক্ষমতা আয়ত্তে থাকলে সম্ভব : অবাক মনে ভাবতাম।

আমার এক বন্ধু ছিলো। অমিতাভ সেন। সাংবাদিক। তার সাংবাদিক জীবনে অনেকরকমের লোকের সংস্পর্শে এসেছিলো সে, আর, সেই বিচিত্র নরনারীর মেলাকে ধরে রেখেছিলো তার নোটবইএর পাতায় পাতায়। অমিতাভের সেই নোট বই পড়িছি আমি। পড়ে অভিভূত হয়েছি। আশ্চর্য লিপিকুশলতায় উজ্জল। প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি ঘটনা নোটবইএর পাতা থেকে উঠে এসে মনে প্রবেশ করে, দোলা দেয়।

অমিতাভকে বলেছিলাম একদিন, ‘আচ্ছা, এগুলো কি ক'রে লিখলে তুমি?’

তার পুরু লেন্স চশমার ভেতর দিয়ে বড় বড় চোখ দুটি তুলে প্রশ্ন করেছিলো অমিতাভ, ‘কেন?’

বলেছিলাম, ‘আমার ভাবলে অবাক লাগে। এদের সকলের ব্যথা বেদনাই কি তুমি উপলব্ধি করেছো?’

অমিতাভ ঝুঁকি হেসেছিলো। ওর হাসি ভারি সুন্দর। বড় বড় চোখ দুটি প্রশ্নর আভায় উজ্জল হয়ে ওঠে, হাসির চেউরে গালে টোল খায়। তবু শিল্পীজনোচিত।

আমার প্রশ্নে হেসে অমিতাভ জবাব দিয়েছিলো, ‘যদি চেষ্টা করো তাহলে তুমিও লিখতে পারবে।’

বলেছিলাম, ‘আমি।’

অমিতাভ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলো।

‘হ্যাঁ, তুমি ।’

‘তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?’

‘না । মাথা আমার ঠিকই আছে ।’

‘আমার কিন্তু মনে হচ্ছে না ।’

‘ঠাট্টা রাখো অশোক ।’ অমিতাভ বলেছিলো, ‘তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব আজকের নয় । তোমাকে আমি জানি, তোমার মনের অলিগলির সন্ধানও আমার নখদর্পণে । সেটা স্বীকার করো তো ?’

‘করি ।’

‘তাহলে ?’

‘তাহলে কি ?’

‘তোমার মতো সংবেদনশীল মন কখনের থাকে ?’ একটু থেমে তারপর বলেছিলো, ‘আমি জানি তোমার মধ্যে সম্ভাবনা আছে ।’

‘ক্যাটারি করছো ?’ তরল স্বরে বলে বিষয়টাকে লম্বু ক’রে দিতে চেয়েছিলাম আমি ।

‘তোমার এই এক দোষ ।’ ক্ষুণ্ণ হয়ে অমিতাভ জবাব দিয়েছিলো, মাঝে মাঝে বড্ড লাইটমুডেড্ হয়ে যাও ।’

অমিতাভকে সমুদ্র করবার ভুলে তারপর বলেছিলাম, ‘তোমার কথা না হয় মেনেই নিলাম । কিন্তু—’

‘ওসব কিন্তু টিস্ত বুঝি না ।’ অসহিষ্ণু স্বরে অমিতাভ বলেছিলো, ‘তুমি লেখো ।’

রবিবারের দুপুর ছিলো সেদিন । অমিতাভর বাড়ি গিয়েছিলাম আড্ডা দিতে । প্রায় প্রতি রবিবারই ওর বাড়ি যেতাম আড্ডা দিতে । সারা দুপুর সময় কাটতো গল্পে । বিকেলের দিকে শকুন্তলাবোদি চা খাওয়াতো, আর গরম গরম ডিমের ওমলেট । সেটাও একটা লোভের বিষয় ছিলো ।

অমিতাভর সাথে কথায় কথায় দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গিয়েছিলো সেদিন । আলোচনায় এতোই মত্ত ছিলাম যে টেরই পাইনি । শকুন্তলাবোদি চায়ের সঙ্গে ডাক দিতে খেয়াল হয়েছিলো ।

তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে অমিতাভ বলেছিলো, ‘তুমি সত্যিই লেখো অশোক ।’

বলেছিলাম, ‘কিন্তু কি নিয়ে লিখবো ?’

‘গল্পের অভাব ?’ ও বলেছিলো, ‘পথেঘাটে, হাটেবাজারে, বাড়িতে, চারদিকেই তো ছড়িয়ে আছে গল্প । তোমার যেটা খুশি বেছে নাও ।’

পুরনো ছুতোর সুখতলা ভেদ ক’রে হঠাৎ কোনো পেরেক মাথা তুলে দাঁড়ালে প্রতি পদক্ষেপে যন্ত্রণাকাতর অহুভূতির দ্বারা পেরেকটি তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে যেমন সর্বদাই, তেমনই অমিতাভর কথাটা কারণে অকারণে সর্বদাই আমার মনকে খোঁচা দিয়েছে । লিখতে হবে । কিন্তু কি নিয়ে লিখবো ? আমার চিন্তাশক্তির দৈন্যের খবর অমিতাভ জানতো না । পথেঘাটে, হাটেবাজারে, হাজার হাজার চলমান

মানুষের মিছিলে, বস্তিতে মাঠে, নগরে কারখানায় অনেক গল্প ছড়ানো আছে, একথা আমিও বুঝি, কিন্তু তার মধ্যে কোনটাকে বেছে নেবো? কিছুদিন চেষ্টা ক'রে অবশেষে হয়রাণ হয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম। কতোগুলো গল্প লিখতে আরম্ভ করেছিলাম, এগিয়েছিলামও অনেকটা, তারপর আবার পেছিয়ে আসতে হয়েছিলো; কোনো গল্পই শেষ করতে পারিনি। এই যে নিত্য মানুষের সার এগিয়ে চলেছে সময়ের স্রোতে তার কি শেষ আছে কোনো? নেই। এক অকুরন্ত অনাদি প্রবাহ, তারই মধ্যে কেউ হয়তো স্রোতের সাথে তাল রাখতে না পেরে হাঁপিয়ে পেছিয়ে পড়ছে, লড়তে লড়তে অনেকের জীবনই যাচ্ছে ফুরিয়ে, তা বলে স্রোত বন্ধ হয়ে নেই, সে চলেছে অবিরাম। ওই চলমান স্রোতের অঞ্চল রূপটাই হচ্ছে জীবন। আর, সেই স্রোতে ভেসে যেতে যেতে যতো লড়াই হৃদ—হাসিকান্না—জয়পরাজয়, সেগুলো জীবনের ভেতরের গল্প, অর্থাৎ, বিশাল বিরাট বহমান জীবনের ঝগ ঝগ ছবি মাত্র। ঝগ জোড়া দিয়ে অঞ্চল, বিন্দু জোড়া দিয়ে সিন্ধু, ঝগ জোড়া দিয়ে শাস্ত, আমার মনে হতো। সেই পরিপূর্ণতাকে বারবারই চেষ্টা করতাম কাগজের পাতায় ধরতে। কিছুতেই পারিনি।

অমিতাভ আমার কথা শুনে বলেছিলো, 'তোমার ধারণা ভুল।

'কেন।'

জবাবে হেসেছিলো ও।

'সমুদ্রের জলের স্বাদ লোনা এইটে জানবার জন্যে সমুদ্রের সবটুকু জল নিঃশেষে পান করবার প্রয়োজন হয় না, এক আঁচলা মুখে দিলেই টের পাওয়া যায়। গল্পের বেলাও ঠিক তাই। ঝগের মধ্যে অঞ্চল, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু, ঝগিকের মধ্যেই শাস্তের স্বাদ এনে দেওয়া সম্ভব। এবং সেই ক্ষমতা যার করায়ত্ত সে-ই সার্থক শিল্পী। একটু থেমে তারপর বলেছিলো, 'নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই, চেষ্টা ক'রে যাও।'

ওর কথা মেনে নিয়ে তারপর থেকেই চেষ্টা ক'রে চলেছি। অনেক গল্প লিখেছি, ছাপাও হয়েছে অনেক, তবু তৃপ্ত হতে পারিনি। চেষ্টা ছাড়িনি এখনো। গল্পের জন্যে ভাবনা নেই। আমার পারিবারিক ইতিহাসটাই একটা বিচিত্র গল্প। কতো ঘটনা ঘটেছে, কতো আঘাত এসেছে, লোভ আর স্বার্থপরতার অনেক জঘন্য ছবি দেখেছি—সেগুলো লিখেই হাত পাকানো সম্ভব। অমিতাভ আমার দেখবার চোখ খুলে দিয়েছিলো।

অমিতাভ, আমার বহুদিনের বন্ধু অমিতাভ, সেই স্মৃগোর চেহারার লালকম্বু ছেলেটি—ঈশ্বর উত্তেজনাতেই যার গাল রক্তাধিক্যে লাল হয়ে উঠতো—গতকাল মারা গেছে হাসপাতালে। ওর কথা আজ ঘুরে ফিরেই মনে পড়ছে। বারবার।

॥ চই ॥

নিয়মিত ডাক্তার দেখানো হচ্ছে, ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে বড়িঘণ্টা ধরে, তবু, কোনো উন্নতিই হয়নি বাবার শরীরের। বরঞ্চ দিনে দিনে আরও খারাপ হচ্ছে, আরও নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন। কেমন একটা দুর্গন্ধে ভরে গেছে সমস্ত ঘর। আগেও

ছিলো, এখন যেন তীব্র হয়েছে আরও। কটু, বসি বসি হুর্গক। গ্যাংগ্রিণ। ডাক্তারবাবু বলেছেন, দাঁতের পায়োরিয়া থেকে গ্যাংগ্রিণ বরে গেছে চোয়ালের হাড়। সময়মতো ধরা পড়েছে এই রকম। না হলে—

নাহলে কি? সেটা ডাক্তারবাবু বলতে চাইলো না কিছুতেই। অনেক পীড়াপীড়ি করাতে বললেন।

‘পচে পচে চোয়ালের হাড় খুলে পড়ে যেতো। না, ঠিক তা নয়। হয়তো তার আগেই মারা যেতেন উনি, অব্যক্ত যন্ত্রণায় তিল তিল কষ্ট পেয়ে।’

শিউরে উঠে আমি বললাম, ‘এখন তো আর সে ভয় নেই?’

‘না। তবু—’

‘তবু?’

‘তাহলেও বেশিদিন আর বাঁচবেন না। ভাইট্যালিটি বলে কিছুই নেই আর শরীরে।’

বললাম, ‘তাহলে আর চিকিৎসার অর্থ কি?’

ডাক্তারবাবু বললেন, ‘শেষসময় অনর্থক কষ্ট যাতে না পান, কিছু রিলিভ যদি দেওয়া যায়, এই আর কি।’

অতএব পেনিসিলিন ইন্জেকশন দেওয়া হচ্ছে। দৈনিক চারলাখ ইউনিট। বত্রিশলাখ ইউনিট দেওয়া হয়ে গেছে। আরও অন্তত পঞ্চাশলাখ ইউনিট দিতে হবে। এছাড়াও আছে অন্যান্য ঔষধ। হাইড্রোক্সেনপারঅক্সাইড দিয়ে কুলকুচি করানো, মীলটি ভিটামিন ট্যাবলেটস্ খাওয়ানো, ইত্যাদি।

॥ ১২ই ॥

মা বুঝতে পেরেছেন বাবা আর বেশিদিন বাঁচবেন না। হুপুরবেলা, যখন ছোড়দা অফিসে ছিলো, ছোটবৌদি ঘুমোচ্ছিলো তার ঘরে, তখন আমার ঘরে বসে বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিলেন মা।

‘ওঁর এই কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না।’

আমি কোনো জবাব দিইনি।

সত্যিই বাবার এই কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। হাড় পচে যাওয়ার হুর্গক সমস্ত বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে। শরীর শুকিয়ে মিশে গেছে বিছানার সাথে। এপাশ থেকে ওপাশ হতে পারেন না। খেতে পারেন না কিছু, সমস্ত মুখে ঘা। তার সাথে আবার নিশ্বাসের কষ্ট। হাঁপানী।

আম্রই সকালবেলা ছোড়দা আমাকে বলছিলো, ‘এখন বাবার পক্ষে যত্ন্যই মঙ্গল।’

আমিও বললাম, ‘তাই।’

কিন্তু বেঁচে থাকবার একটা অদম্য ইচ্ছে এখনও বাবার মনে প্রবল।

বিকেলবেলা আমি গিয়ে বসেছিলাম পাশে। বললেন, ‘আরও কিছুদিন আমাকে বাঁচতেই হবে। তোমার একটা চাকরি বাকরি হোক, নমিতার বিয়ে দিয়ে নিই, তারপর মরতে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না।’

॥ ১৪ই ॥

ট্রাম রাস্তার ধারে ছোট ত্রিকোণাকার পার্ক, কয়েকটি আমগাছ, আমগাছগুলির নিচে ছোট ছোট সবুজ রংএর বেঞ্চি। বিকেলে অপেক্ষা করবার কথা ছিলো ওখানে। এক এক মিনিট মনে হচ্ছিলো এক এক যুগ। ফুটপাথে চলমান মানুষের মিছিলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম অপলক : দূরে, বহুদূরে দেখতে পেলোও, মানুষের ভিড়ের ভেতর থেকেই চিনে বার করেছিলাম সুজাতার হাঁটার ভঙ্গীকে। উজ্জল লাল পোশাকে ওকে মনে হচ্ছিলো একগাছ বসন্তের কুমুদুড়া।

বললাম, 'উঃ! কতোক্ষণ বসে আছি সুজাতা, তোমার একেবারে সময়ের জ্ঞান নেই।'

মণিবন্ধে কালো-রেশমের ব্যাণ্ডে ছোট হাতঘড়ি, সেদিকে তাকিয়ে সুজাতা জবাব দিলো, 'দেখো ঠিক ছ'টা। আমি তো বলেইছিলাম সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে আসবো।'

বললাম, 'কিন্তু আমি যে স'পাঁচটা থেকে বসে আছি।'

সুজাতা মিষ্টিভাবে হাসলো, 'তোমাকে স'পাঁচটায় আসতে কে বলেছে ?

আমি বললাম, 'আর তোমাকেই বা ছ'টার আসতে কে বলেছে ? সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টা তার মানে এ নিশ্চয় নয় যে ঠিক ছটার সময়েই আসতে হবে।'

কলকাতার আকাশে তখন সন্ধ্যার স্থানিমা স্বপ্নের আবেশে ভরপুর। পথের ধারে বিজলী ঝলোমলো দোকানের সারি, ট্রাম বাসের ব্যস্ত ঘর্ষর। ট্রামের ঘণ্টি, বাসের ভেঁপু, ফিরিঙলার হাঁক, এ সবই দিনের অন্য সময়ে অত্যন্ত কর্কশ লাগে। অথচ গোধুলির সেই নরম মুহূর্তে আশ্চর্য মনোরম লাগছিলো। পার্কের ঘাসের জাজ্জিমে ঝরাপাতার মর্মর জাগিয়ে তারপর হাঁটতে হাঁটতে আমরা গিয়ে বসেছিলাম লেকের পাড়ে। নিস্তরক নিঃশব্দ ছুই প্রাণ। তবু সুজাতা মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলেছে, আমি শুধু শুনেছি; ওর কথা শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে গিয়েছি, ওর কথার ভেতর দিয়ে আমি যেন নিজেদেরই দেখতে পাচ্ছিলাম। পাশে ও বসে আছে, এই অল্পভূতিটাই অত্যন্ত মধুর লাগছিলো।

প্রচলিত অর্থে যাকে ভালোবাসা বলা হয়, গল্পে যে ভালোবাসার কথা পড়েছি, বন্ধুবান্ধবদের কাছে প্রেমের যেসব গল্প শুনেছি, সেইদিক থেকে বিচার করলে আমি ওকে ভালোবাসি কিনা বলতে পারবো না। সুজাতাকে কোনোদিন বলিওনি যে আমি তাকে ভালোবাসি, সুজাতাও আমাকে বলেনি।

[ক্রমশ]

স্মূনিক ৩ আপেক্ষিকতাবাদ

ভিত্তি গিন্সবুর্গ

(সোরিয়েৎ বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য)

মহাবিশ্বের গঠন-প্রকৃতির স্বরূপটি কি ? এই মহাবিশ্বের সমস্ত কাজ চলছে কোন্ কোন্ শক্তির ক্রিয়ায় ? দেশ, কাল আর পদার্থের পারস্পরিক সম্পর্ক কি ? প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মধ্যে সবচেয়ে রহস্যময় যে অতিকর্ষ আর মহাকর্ষ-শক্তি, যে-শক্তির টানে প্রত্যেকটি গ্রহ নিখুঁত আর সুনির্দিষ্ট একে একটি কক্ষপথে সূর্য-প্রদক্ষিণ করে, সেই শক্তিটিরই বা স্বরূপ কি ?—এসব প্রশ্ন যুগ যুগ ধরে মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার করনাকে উজ্জীবিত করেছে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বচিন্তার খোরাক জুগিয়েছে ।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে-শাখায় সমগ্রভাবে মহাবিশ্বের গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণা-অন্বেষণ করা হয়, সেই শাখাটির নাম ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বা “কস্মোলজি” । এই ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের ভিত্তি হল আইনস্টাইনের সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতাবাদ বা “জেনারেল থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি” । এই আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারা আইনস্টাইন সর্বপ্রথম দেশ (স্পেস), কাল (টাইম) আর ভরের (ম্যাটার) পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন ।

বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটনে আইনস্টাইনের তত্ত্ব প্রয়োগ করার আগে এই তত্ত্বটিকে আমাদের যাচাই করে নিতে হবে ; অর্থাৎ আপেক্ষিকতাবাদের সিদ্ধান্তগুলি কতোটা সঠিক সেটা জানা চাই । এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সেটা খুব চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করতে পারেননি—কারণ, এই তত্ত্বের সঙ্গে যে নতুন নতুন কার্যকারণগুলি সংশ্লিষ্ট এবং যে-কার্যকারণগুলির পরিণামগত (কোয়ান্টিট্যাটিভ) যাচাইয়ের সম্ভাবনা আছে, তা নিতান্তই কম । বৈজ্ঞানিকরা যে আইনস্টাইনের তত্ত্বের যাথার্থ যাচাই করার জন্য অনবরত নব নব পদ্ধতি অন্বেষণ করে চলেছেন, এটা তার অত্যন্ত প্রধান কারণ ।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা একটি নতুন আর রীতিমত নির্ভরযোগ্য সূত্র পেয়েছেন এই আপেক্ষিকতাবাদ সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে । পর পর তিনটি মানুষের-হাতে-গড়া কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে নিক্ষেপ হবার পর তারা মনে করছেন যে এর থেকে সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব-যাচাইয়ের কাজে তারা বিরাট সাহায্য পাবেন ।

॥ মূল নীতি ॥

আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব-যাচাইয়ের ব্যাপারে এই স্মূনিক যে কি ভাবে কাজে লাগতে পারে সেটা বুঝতে গেলে আগে আইনস্টাইনের ওই তত্ত্বটি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা চাই । কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে এই ধারণা করাটা অসম্ভব । তাই, খুব ভাসাভাসা ভাবে এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে অতিসরল করে নিয়ে নোটামুটি

ব্যাপারটা ছেনে নেবার চেষ্টা করা যাক । বলে রাখা ভালো, এর থেকে আইনস্টাইনের তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা খুব স্পষ্ট না হলেও, গ্রহগুলির সূর্য-প্রদক্ষিণ আর বিশেষত স্পুটনিকগুলির পৃথিবী-প্রদক্ষিণ থেকে আইনস্টাইনের তত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলির মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে ।

আম্র থেকে প্রায় একশো বছর আগে লেভেরিয়ে নামে একজন ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী বুধের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার সময়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন : অক্সান্ড গ্রহের যতোই এই বুধ গ্রহ তার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে একবার করে সূর্যের নিকটতম বিন্দুতে এসে পৌঁছায়, আবার ক্রমশ দূরে সরে যায় । গ্রহদের এই কক্ষেরও একটা গতি আছে—যদিও এই গতি অত্যন্ত মন্থর । সূর্যের নিকটতম বিন্দুতে গ্রহের এই অবস্থানকে বলা হয় অক্ষুস্মর বা “পেরিহিলিয়ন” । কক্ষের গতি আছে বলে এই অক্ষুস্মরেরও গতি আছে । লেভেরিয়ে লক্ষ্য করলেন, বুধের এই অক্ষুস্মরের গতিটা বুধের গতিমুখের (ডিরেকশন) দিকে অতি সামান্য পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে । লেভেরিয়ে প্রথমে ভাবলেন যে বুধের অক্ষুস্মরের এই গতিবৃদ্ধির কারণ হল অক্সান্ড গ্রহের মহাকর্ষের ক্রিয়া । কিন্তু তিনি অনেক হিসাব কষে দেখলেন যে অক্সান্ড গ্রহের মহাকর্ষের ক্রিয়ায় বুধের অক্ষুস্মরের যতোটা গতিবৃদ্ধি হওয়া উচিত, আসলে তার চেয়ে বেশি গতিবৃদ্ধি হয়েছে । ব্যাপারটা সমস্ত দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর পদার্থবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও, কেউ এটার ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না ।

এর অনেক পরে, ১৯১৫ সালে, আইনস্টাইন তাঁর সামান্যীকৃত আপেক্ষিক তত্ত্বের সাহায্যে এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দেন ।

কিন্তু মুশ্কিল হচ্ছে যে বুধের এই কক্ষের ঘূর্ণান-গতি অত্যন্ত কম । বুধ-কক্ষের ৩৬০ ডিগ্রি অর্ধাৎ সম্পূর্ণ এক পাক ঘুরতে সময় লাগে প্রায় ৩০ লক্ষ বছর । সুতরাং এই গতিকে যথেষ্ট সঠিক ভাবে মাপতে গেলে বুধ গ্রহের গতিবিধি আর এর অক্ষুস্মর প্রায় দু-শো বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করে সেই পর্যবেক্ষণের ফলাফলকে কাজে লাগাতে হবে ।

এইতো গেল বুধ-কক্ষের ঘূর্ণান-গতি । অক্সান্ড গ্রহের বেলায় তাদের কক্ষ-ঘূর্ণানের গতি এতোই কম যে এখনও পর্যন্ত হিসাবই করে ওঠা যায়নি ।

সামান্যীকৃত আপেক্ষিক তত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্তগুলিও প্রমাণ করা কঠিন । সূর্যের অথবা কোন তারকার কাছ দিয়ে যখন একটা আলোক-রশ্মি চলে যায় তখন সেই রশ্মির গতিপথ কিছুটা বেঁকে যাবেই—এই হচ্ছে আপেক্ষিকতাবাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচ্যবিষয় । এই সিদ্ধান্তের মূল কথাটি হল—আলোর শক্তি বা “এনার্জি” রয়েছে, অতএব তার একটা ভর বা “ম্যাস্”ও রয়েছে ; এবং মহাকর্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আলোর এই ভর সূর্যের বা তারকার ভরের টানে আকৃষ্ট হয় বলেই আলোক-রশ্মির পথটা বেঁকে যায় । আলোক-রশ্মির এই ভাবে বিপথচালিত হবার ব্যাপারটাকে বলা হয় বিক্লেপ বা “ডিক্লেকশন” । তাহলে ব্যাপারটা ঠাঁড়াচ্ছে এই-যে, এই বিক্লেপের মাত্রা—অর্থাৎ কতোটা পরিমাণে আলোর পথটা বিক্লিপ্ত হচ্ছে—জানা না থাকলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বহু দূরের তারকাদের সঠিক স্থিতিস্থানকে তাঁদের দূরবীণ-ইত্যাদির মাধ্যমে নির্দেশ করতে পারেন না ।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের তৃতীয় আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রমাণ করা আরও কঠিন। এই তৃতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিভিন্ন নক্ষত্র তারকা ইত্যাদি থেকে পৃথিবীতে যে আলোক-তরঙ্গ বা বেতার-তরঙ্গ এসে পৌঁছায় সেই তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি (প্রতি সেকেন্ডে তরঙ্গের সংখ্যা) অভিকর্ষ-শক্তির প্রভাবে বদলে যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অবস্থানবিন্দুতে এই পরিবর্তন কি পরিমাণে ঘটে সেটা বৈজ্ঞানিকরূপে এ পর্যন্ত হিসাব করে উঠতে পারেননি।

॥ সৌর-পরিবার ও মহাজাগতিক ॥

আইনস্টাইনের তত্ত্বের এই নতুন কার্যকারণগুলি যদি এতোই যৎসামান্য হয়, তাহলে এই তত্ত্বটা গুরুত্বপূর্ণ কেন?—আপেক্ষিকতাবাদের গুরুত্ব অপরিমিত এই জন্য যে আমাদের পক্ষে এই তত্ত্বের কার্যকারণগুলি যৎসামান্য হলেও মহাজাগতিক স্তরের বিস্তারের ক্ষেত্রে এই সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব-প্রয়োগ নিখুঁতভাবে খাপ খেয়ে যায়। আর, এই মহাজাগতিক আয়তনের তুলনায় আমাদের এই সৌরমণ্ডল হল গিয়ে এক চৌবাচ্চা জলের মধ্যে একটি ছলবিস্মুর মতো।

আমাদের এই সৌর-পরিবার যে “মহাজাগতিক নাপকাঠি”র হিসাবে কতো ক্ষুদ্র, তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে এই উদাহরণটি থেকে : সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছাতে লাগে আট মিনিট ; সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে এমন নক্ষত্রেরও সন্ধান পাওয়া গেছে যেখান থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছাতে লেগেছে ১০০ কোটি বছর ! অর্থাৎ, সেই নক্ষত্র থেকে যদি কোনো মানুষ পৃথিবীকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেত, তাহলে সে ১০০ কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর অবস্থা চান্ধুষ জানতে পারত।—এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, সৌর-পরিবারের তুলনায় মহাজাগতিক আয়তন কতো বিপুল।

কিন্তু তবু, সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতাকে মহাবিশ্বের অনুশীলন-ক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরি প্রয়োগ করতে পারি না—যতক্ষণ পর্যন্ত না বর্তমান প্রাকৃতিক পরিবেশে এই তত্ত্বের পরিমাণগত কার্যকারণগুলিকে একেবারে নিখুঁত ভাবে আমরা যাচাই করে নিতে পারছি।

কি ভাবে এই যাচাইটা করা যেতে পারে।

কৃত্রিম উপগ্রহগুলির সাহায্যে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব-যাচাইয়ের জন্যে একেত্রেই স্পুংনিকের অন্ততম কার্যকারিতার প্রশ্ন উঠছে।

কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষের ঘূর্ণন-কোণ গ্রহগুলির কক্ষের ঘূর্ণন-কোণের চেয়ে ঢের বেশি—বুধের কক্ষের ঘূর্ণন-কোণের চেয়ে প্রায় ৩০ গুণ বেশি। এই স্পুংনিকগুলির সাহায্যে পৃথিবীর সঠিক আকৃতিটা নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা যাবে। পৃথিবীর ভেতরে পদার্থ কিভাবে ছড়িয়ে আছে আর কোন জায়গায় তার ঘনত্ব কতোটা, সেটা জানা যাবে। স্পুংনিকের গতিবিধির ওপরে চাঁদের মহাকর্ষ আর পৃথিবীর আবহমণ্ডল কতোটা আর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেটাও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হচ্ছে। এই সব হিসাব পাওয়ার পরে, কৃত্রিম উপগ্রহগুলি বিজ্ঞানীদের

হাতে এমন নিখুঁত আর সুন্দর যন্ত্র হয়ে দাঁড়াবে যা দিয়ে আইনস্টাইনের ওই তত্ত্বটির উপরোক্ত কার্যকারণগুলিকে যাচাই করে নেওয়া যাবে, মহাব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেক বেড়ে যাবে।

ইতিমধ্যেই, আপেক্ষিকতাবাদের তৃতীয় সিদ্ধান্তটিকে—অর্থাৎ, স্পুটনিক থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গগুলির ফ্রিকোয়েন্সি পৃথিবীর অভিকর্ষ-ক্ষেত্রের প্রভাবে কতোটা আর কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে—সেটা যাচাই ও নির্ধারণ করার কাজে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

॥ সময় ও গতি ॥

এই প্রসঙ্গে আইনস্টাইনের আরেকটি অত্যন্ত দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তের কথাও বলা দরকার। এটা হল : গতির উপরেই সময় নির্ভর করে। অর্থাৎ গতি যতো বাড়বে সময়ও ততোই মন্থর হয়ে আসবে—আলোর গতিতে যদি কোন মানুষ মহাশূন্য দেশে চলে তাহলে তার কাছে সময়ের প্রবহমানতা প্রায় থাকবে না বললেই চলে। ধরা যাক, এমন একটা মহাব্যোমযানে চেপে আমরা চলেছি যার গতি আলোর গতির নব্বদশমাংশ বা সেকেন্ডে ১,৬৭,৪০০ মাইল। সেক্ষেত্রে এই মহাব্যোমযানের ভেতরে আমাদের কাছে সময়ের মাত্রা দাঁড়াবে পৃথিবীর সময়ের মাত্রার অর্ধেক মন্থর—অর্থাৎ পৃথিবীর একদিন হবে এই মহাব্যোমযানের ভেতরের ১২ ঘণ্টার সমান! পৃথিবীতে যে-মানুষের ৮০ বছর বাঁচার কথা, সেই মানুষ যদি আত্মীবন এই মহাব্যোমযানের ভেতরে থেকে যায় তাহলে সে বাঁচবে পৃথিবীর হিসাবে ১৬০ বছর। অবশ্য সে নিজে এ সম্বন্ধে সচেতন থাকবে না।

কিন্তু স্পুটনিকের বেলায় সময়ের এই তারতম্যটুকু নিতান্তই নগণ্য। আমাদের কাছে কৃত্রিম উপগ্রহের সেকেন্ডে পাঁচ মাইল গতি প্রচণ্ড হলেও, আলোর গতির কাছে সেটা কিছুই নয়। তাই লাইকার পক্ষে সময়ের মন্থরতা মোটেই লক্ষ্যণীয় রকম হয়ে উঠতে পারেনি—কারণ সেকেন্ডে পাঁচ মাইল গতিতে যে-চলেছে তার কাছে সময়ের প্রবহমানতার মাত্রা কমে আসবে এক বছরে এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগেরও কম। তা সত্ত্বেও, পারমাণবিক ঘড়ির সাহায্যে সময়ের এই অতি সূক্ষ্ম তারতম্যটুকুও ধরা সম্ভব। ইদানিং সোবিয়েৎ বিজ্ঞানীরা এমন নিখুঁত পারমাণবিক ঘড়ি তৈরি করেছেন যার সাহায্যে তিন হাজার বছরে এক সেকেন্ডের তারতম্য ধরা যায়। তাছাড়া, ভবিষ্যৎ স্পুটনিকগুলির গতিও আরও ঝড়ানো যাবে। এর ফলে স্পুটনিকের মারকতেই আইনস্টাইনের সামান্যীকৃত আপেক্ষিক তত্ত্বের তৃতীয় কার্যকারণের সিদ্ধান্তগুলিকেও যাচাই করা চলবে—যা এ পর্যন্ত প্রয়োগ-পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।

ডাউনিং-এর প্রথম

অনলেস্টু বসু

সেইদিনই বাড়িতে এসে লিখতে বসে সে :

সত্যি করে বলো তো তুমি কেমন আছ এখন, খুব ক্লান্ত, না মোটেই ক্লান্ত নয় ? যদি কোনো ভুল করে থাকি কিম্বা কোনো কাজ আমার করা উচিত ছিল বলে মনে হয়ে থাকে তোমার, তা জানাও । আজ সকালের মত এর পরে তোমার সমস্ত অনুবিধা সজ্জাও যখন ঘন ঘন দেখা হবে আমাদের তখন যেন একই ভুল আর না হয় । যেমন ধর, সবাই বলে আমি নাকি কথা বলি খুব দোরে (অবিশিষ্ট এ চাতুর্য ধরা পড়েছিল যখন আমি একজন আত্মীয়র সঙ্গেই কথা বলছিলাম) আর আমি কি তোমার ওখানে সত্যি অনেকক্ষণ ছিলাম ; তোমার বন্ধুত্ব আমি গবিত আর খুশি হয়েছি, ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন ।

ইতি

তোমার ক্বাচ

এর উত্তর অত্যন্ত দ্রুত ভেসে আসে : কোনো ভুল তুমি করনি, আর তা সম্বন্ধে কি কি করে ? সবই ঠিকমত করেছ তুমি আর তা হবে না-ই বা কেন ? উচ্চক্রমে কথা বলার সম্বন্ধে খিজাগা করেছ তুমি, বাস্তবিক কোনো কথাই স্তন্যেত পাইনি আমি কাল, শুধু একটি জিনিস অনুভব করছি, কে যেন সুখী আর সম্মানিত করে গেছে আমাকে । আমার হৃদয়কে যদি খুলে দেখাতে পারতাম তো দেখতে তোমার সম্বন্ধে কোনো অভিযোগই তাতে লেখা নেই । একথা বোঝা তোমার পক্ষে অসম্ভব, আমার জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর আমার মানসিক অবস্থা কোন পর্যায়ে আছে । তুমি যখন তোমার সুখের মসনদ থেকে অনুবোধ কর আমার তোমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখতে, তাতে কতজ্ঞতা বা দয়ার প্রদর্শন নেই । তোমার প্রতি নির্ভর বা অকৃতজ্ঞ হব কি করে, অথবা তুমি যা পছন্দ কর না তা করবই বা কি করে ।

তুমি কিন্তু মঙ্গলকর নিশ্চয় এসো, তারপর আমার এস যখন তোমার মন চান্ন । আমার কোনো অনুবিধাই হবে না বরং খুশি হবে আমি । কেন তুমি আমার ভুল বোঝা বলত ? তোমার আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করাই একান্ত স্বাভাবিক, যখন খুশি তুমি এখানে আসবে আর তা কথাতে বোঝাবার প্রয়োজন নেই, বিশ্বাস কর আমার । ইতি,

তোমার বন্ধু—ই, কি, বি,

এরপর একটা ঘোড়ার বন্ধু চলল শুধু ।

সে ঘোড়াকে কত জড়ল, কত গড়ল, কত শিলাজিপির অন্ধরে পড়ল তার

ইতিহাস পৃথিবী রাখল না, শুধু দুটি হৃদয় দুটি অববাহিকার স্রোতে এসে পড়ল এক নোহনায় ।

আর এমনি এক মুহূর্তে সুস্পষ্ট আবেদন জানিয়ে বসল রবার্ট, সে-আবেদন কাউকে দেখাল না এলিজাবেথ ।• বারবার পড়ল, বারবার বুকে চেপে ধরে আদরে সোঁহাগে বিহ্বল হয়ে গেল, তারপর আতঙ্কবিহ্বলিত দৃষ্টিতে তাকালো দরজার দিকে । যদি কেউ দেখে ফেলে এ-চিঠি, এ-চিঠি সে কাউকে দেখতে দেবে না, জানতে দেবে না এই পৃথিবীতে । আঙনের লকলকে শিখায় সে চিঠি নলে ধরে এলিজাবেথ, চিঠি ছাই হয়ে যায় কিন্তু অক্ষরগুলো যুনাতে দেয় না তাকে সারারাত । সকালের পাখার কলস্বরে সচকিত হয়ে ওঠে এলিজাবেথ, রাতের বিহ্বল হৃদয়কে সূর্যের কনস্পর্শে এবার সে দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরতে পারবে, তবু দরজা বন্ধ করে এলিজাবেথ । মোমবাতির ত্রিয়মান শিখায় লিখে চলে সে ।

সারারাত তোমায় লিখব বলে ভেবেছি । সারাসকাল কি-এক অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করেছি কিন্তু কেন পারিনি লিখতে তা জানিনে । তোমার ঐ অদ্ভুত কথাগুলো আমায় কত কষ্ট দেয়, তা তুমি জান না । কি অসহ্য কথাগুলো আর অদ্ভুত খামখেয়ালীতে ভরা, ওকথাগুলো আর কখনো বলো না, বলো না শুধু নয়, তুমি সম্পূর্ণ ভুলে যাও যে এ-কথা আমায় বলেছ কখনো । কথাগুলি তোমার ও আমার মধ্যে থেকে তাহলে নীরবে বিদায় গ্রহণ করবে । এ তুমি করবে শুধু আমারই জন্তে, যে তোমার সবচেয়ে বড় বন্ধু । এটি একান্তই দরকার আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ রাখার জন্তে । তোমার মনে আছে বোধহয় তোমাকে আমি জানিয়েছিলাম যে আমি এক অদ্ভুত অবস্থায় দিনযাপন করছি । সেই জন্তে-ই তোমায় সাদরে গ্রহণ করব যেমন গত মঙ্গলবার করেছিলাম । যদি তুমি ও প্রসঙ্গের পুনরুজ্জীৱিত কর বা চাও করতে তাহলে আর তোমার সঙ্গে দেখাই হবে না ; তাই তোমায় আবার অনুরোধ করছি কেবল আমার জন্তেই, আমায় হৃৎপিণ্ড দিও না এমন কথা বলে যাতে আমাদের ভেতরের এই সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায় । এই সম্পর্ক আমার কাছে আনন্দের । আর আমি হলাম এমন একজন যার জীবন ভরা বেদনা, আনন্দের স্মৃতি নেই বললেই হয় । তুমি এমন কিছু নিশ্চয় করবে না যাতে আমি তোমার কাছে সহজ না-হতে পারি । কারণ তোমার কাছ থেকে নেবার মত অনেক আছে, তুমি হলে উন্নত চিন্তার অগ্রদূত । তোমার প্রভাব আমার কবিতালেখাকে 'অগ্রগতির পথ দেখাবে । এ বাড়িতে লেখার জন্যে অনেকে ভালবাসতে পারে আমায় কিন্তু আমাকে বিচার করবার মত মনীষা কারুর নেই । তোমার বন্ধুত্ব আর সমতাবোধ আমার সারাজীবন ভরপুর করে রাখবে । তোমার ভুল আবার আমি করতে পারব না । (তুমি অত্যধিক বিনয়ের সুরে যা বলেছ) তাকে একান্তভাবে একপাশে সরিয়ে রাখলাম, সঙ্কতস্ত অশ্রুভার চোখে । এই আঘাত শ্রদ্ধার মুকুটকে নষ্ট করতে পারেআবার ফুল ফোটাতেও পারে ।

তুমি আমার এই লেখায় অসন্তুষ্ট হওনি তো ? তাহলে তা আমার কাছে বহু ও বিহ্বলতার মত ভয়াবহ মনে হবে । তোমার মত অনেক কথাই আমি লিখিনি যা লিখতে পারতাম ; 'তুমি জান আমি পাথর নই, যদিও মৌনের এক প্রতীক ।

যদি এখন মুখর হয়ে কোনো অপ্রাসঙ্গিক কথা লিখে তোমায় বিরক্ত করে থাকি তাহলে আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন যেন সে বিরক্তির পুনরুক্তি আর না ঘটে আমার তরফ থেকে ।

চিঠিটা পড়ে হতবাক হয়ে যায় রবার্ট । দাবার চালে সে ভুল করে বসেছে । আরো ধীর আরো শান্ত হওয়া উচিত ছিল তার পদক্ষেপে যাতে তার গতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবার সুযোগ পর্যন্ত না পায় এলিজাবেথ । তাই তার লেখাকে এক নতুন ধরনে সাজাতে বসে যায় সে ।

আমায় ঠিক চিনতে পারনি মনে হয় । নইলে আমার সমস্ত কথাগুলোকে ভুল বুঝে বসবে কেন, আর এখন যদি তাতে আমি হেসে উঠি তাহলে তুমি নিশ্চয় বলবে আমি একটা বর্বর অসভ্য, তাই নয় কি ? তবুও আমি তাই বলব, এই বলাই পরিষ্কার করে দেবে, জানিয়ে দেবে, যা আমি সত্যিকারের বলতে চাইছি । আর তা হল তোমার থেকে আমি সবদিক দিয়েই ছোট । আমার এক অসর্তক মুহূর্তে তোমায় আমি লিখে বসেছি । এক উচ্ছ্বাসময় আবেগপূর্ণ ক্ষণে নিজেকে যা চিন্তা করেছি তাই বলে ফেলেছি, যা নিরর্থক, মূল্যহীন, তা-যে তুমি ধরে ফেলেছ সে জন্তে অজস্র ধন্যবাদ । তুমি সত্যই মহৎ, আমার থেকে অনেক বড়, যতক্ষণ না তুমি তা বুঝতে পারছ আমার মনে শান্তি নেই । তোমার সহানুভূতি, সাহায্য ও সরলতা সবদিক দিয়েই আশা করি আমি ।

ইতি, তোমারই রবার্ট

প্রিয় রবার্ট

সত্যি তোমার কাছে অনেক অপরাধ ক্ষমা হয়ে আছে । একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তুমি যে এমনি সোরগোল করবে এ আমি ভাবতে পারিনি । এর জন্তে আন্তরিক ভাবে লজ্জিত আমি । তুমি হয়ত এখন বিশ্বাসই করবে না যে এমনি ভুল আমি জীবনে কখনো করিনি । গতরাত্রে উজ্জ্বল পর আমি আর চিঠিটা ধুলে দেখিনি । কারণ ভেবে দেখেছি তোমার এই অস্পষ্ট অস্বচ্ছ ভাবের আবির্ভাব তোমার অবচেতন মনের এক সুন্দর অনুভূতি থেকে । আর তার বিচ্ছুরিত আলো থেকে পাঠক শুধু দ্বিধাপ্রসূ পথ হারিয়ে যাবার অবকাশ পায় । যেমন আমি হয়েছি । যাই হোক, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, এই বিশ্রী ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি পার ভুলে যাও, একথা ভবিষ্যতে আর উল্লেখ মাত্র করো না । আমরা আবার তোমাকে সাজিয়ে নি, এসো আবার আমরা নতুন করে খেলতে বসি, যদি তুমি চাও অবিশ্রী । মনে রাখব তুমি একজন নাটকীয় কবি, সেই বলেই আমি শ্রদ্ধা অর্পণ করব তোমাকে । যদি চাও তো এ-সপ্তাহে এস, আমাদের সম্পর্কটার শেষ নিশ্চয় আসেনি । যদি মঙ্গলবার না চাও তো বুধবার তিনটার সময় নিশ্চয় আসবে । তোমায় দেখে সত্যি খুশি হব আমি । আর ততদিনে নিশ্চয় কোনো এসব ব্যাপার আমি বেমানাম ভুলে যাব, নিজের ক্রটিগুলো ভুলে যাওয়াই আমার অভি্যাস । যদি বুধবারও তোমার সুবিধা না-হয়

তাহলে জানি না এ-সপ্তাহে আর আমাদের দেখা হবে কিনা। সবটাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভর করছে। একথা ভেবো না যে বুধবারই তোমায় আসতে বলছি। আমি শুধু একটা কথাই জানাতে চাই, আমার প্রতি তুমি খোলা মনে একনিষ্টতার সাথে শ্রবণে। কোনো কথার প্রত্যয় আমি চাই না। আমি সত্যকে ভালবাসি, তাকে সহ্য করার ক্ষমতা আমার আছে, কথা বা কাজে বাতাই হোক। যারা আমায় দীর্ঘদিন জানে তারা আমার সম্বন্ধে এই কথাই বলবে। ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন। একদিন হয়ত আমরা পরস্পরকে চিনতে পারব।

তোমার চিরকালের অনুরাগত ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ই, বি, বি

এর উত্তরে আমদারের সুর ভেসে আসে রবার্টের : না, আমি কিন্তু শেষ জবাব চাই, যেমন সবমাহুধেরই এক অক্লান্ত অন্তায় কৌতুহল থাকে, আমিও সেই কৌতুহল-বশতই বলছি। জবাব পেলে পর আর এ-প্রসঙ্গ তুলব না। তুমি বলেছ, আমি নাকি তোমাকে অনেক ব্যথা দিয়েছি, যতক্ষণ তা আমি না-দিই তুমি আমার সম্বন্ধে যা খুশি ভাবতে পার। কিন্তু তোমার আগের চিঠি আসার আগে আমি সত্যি নিজের কোনো মূল্য খুঁজে পাইনি। যে তারিখ আর যে সময় তুমি বলেছ সেই সময় তোমার সঙ্গে দেখা হলে রীতিমত খুশি হব।

ইতি, রবার্ট ডাউনিঃ

এইবার গুণগুণ করে সুর ভেসে আসে রবার্টের—নতুন কবিতার ছন্দ। এলিজাবেথের চিঠি যেন একটা গান যে গানের স্বর তালে মন-প্রাণ ভরপুর হয়ে যায় রবার্টের। চিঠি ছেড়ে কবিতার “লষ্ট মিষ্টেস” লিখতে বসে রবার্ট।

“কাল” এই কথাটার ভেতর কত সুর, কত গান, কত রঙের আলপনাঃ

“কালকে আমরা আবার মিলছি প্রিয়তম
তোমার হাতটি নিতে কি পারিগো হাতে ?
শুধু বন্ধু, বন্ধুর মত আচরণ হবে মম
আর কিছু আমি চাইনাক তার সাথে।

তবু আজ আমি বন্ধুর মত বলবু

কেবল একটা সবল ভাবনাতে।
সবায়ের মত তোমার হাতটি ধরে
হয়ত একটু দেরী হয়ে যাবে তাতে।”

এরপরেও কিন্তু দেখা হয় না। পরের দিনই চিঠি লেখে এলিজাবেথ—

আজ সকালে একটা চিঠি পেয়েছি। আমার বন্ধুরা লগুনে আসছেন আসছে বঙ্গলবারেই (কাল) ছুচারদিন থাকবার জন্যে। যতদিন না বাকী দিনগুলোর

জন্মে হোটেলের ব্যবস্থা করতে পারছে ততদিন আমার কাছেই থাকবে মনে হয় তারা। এর মধ্যে যদি তারা চলে যায় এবং শনিবারে তোমার আসার সুবিধা হয় তবে একটি কথাতেই জানাব তোমাকে।

এরপর একটু থামে এলিজাবেথ। পাছে আবার ভুল বোঝে রবার্ট। ঘটনার ভেতর সত্য অংশ থেকেও তার দেখা করবার অনিচ্ছাটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, তাই ছোট ছোট কথা জুড়ে দেয়।

আমাদের দুজনেরই ভাগ্যটা কোথায় একটু খারাপ নয়ত এমন হবে কেন। তুমি যেন আমার এক ধরনের অনিচ্ছা, রবিবারের চিঠিতে যত অবিশ্বাস আর নির্দয়তার সুরই থাকুক না কেন তার জন্মে বারবার আমার অন্তর থেকে কমা চেয়ে নিচ্ছি। বিশ্বাস কর, এ আমি চাইনি যদি হয়ে থাকে আমার অজ্ঞাতে তা হয়েছে।

শনিবার কি সোমবার যেমন তুমি বলবে আমি তাইতেই রাজী আছি। উত্তরের সাথে সাথে রবার্টের হাসিমাখা মুখটাও যেন দেখতে পায় এলিজাবেথ।

শেষ রায় দিয়ে বসে এবার সে :

যদি শনিবার এক সুন্দর দিন থাকে তবে সেদিনই এসো কারণ ঝুটি পড়লে তোমায় আর আশা করব না। ঠিক তিনটের সময় আমার দেখা পাবে।

শনিবার আবার আসে রবার্ট। তেমনি উন্মত্ত তার গতিবেগ, উদ্দাম তার কথাবলার ভঙ্গী। এলিজাবেথের জড়তা কিছুটা কেটেছে। প্রথমদর্শনের হতবাক অবস্থা আর নেই। কাব্যসাহিত্যে যার পরিচয় পেয়েছে সে বইয়ের পৃষ্ঠায়, প্রত্যক্ষ দর্শনের রঙে তা উদ্ভাসিত মর্মরিত করে সে তাই জিজ্ঞাসা করে :

ইতালীতে শেলীর কবর কেমন লেগেছে তোমার? বিশেষত গ্রীক কাব্যে যাদের নিদর্শন পাই তারা আছে তো?

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে রবার্ট।

[ক্রমশ]

সংস্কার

শ্যামাপদ রায়

ছাত্রক্রাস মাস্টার মহাশয়ের শেষ রাত্রে হঠাৎ হার্টফেল করিয়া মৃত্যু হইয়াছে। ক্রাস সেভেনের লাস্ট বয় ভূতো ও তাহার মত অন্যান্য ক্রাসের লাস্ট বয়রা যাহাদের হৃদয়ে তিনি প্রত্যহ ক্রাস সৃষ্টি করিতেন, বলিলেন-তাহারা হয়ত বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু সত্যই তিনি জ্যোতির্ময় বর্ষে দেবদূতের পিছন পিছন স্বর্গে চলিয়াছেন। আজ হাতে আর তাহার সেই ভীষণ মারণাস্ত্র বেতটি নাই। তিনি দেবদূতের সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ‘তোমার নাম কি’ ?

মৃদু মধুর হাসিয়া শিশুর মত দেবদূতটি বলিল ‘কেন বলুন তো।’

‘না হলে তোকে ডাকবো কি করে ?’

‘আমাকে ডাকার প্রয়োজন তো আর হবে না। আপনাকে স্বর্গের প্রবেশদ্বারে পৌঁছে দিয়েই আমি ছুটি নেব।’

‘ও’ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন, ‘আচ্ছা, দেবদূতদের সংখ্যা কত বল তো ?’

‘তাতো জানি না।’

‘জানিস না।’ মাস্টারমহাশয় বিস্মিত হইলেন, তারপর একটু ভাবিয়া বলিলেন, ‘আচ্ছা, স্বর্গের মোট জনসংখ্যা কত ?’

সম্মিত মুখে দেবদূতটি উত্তর করিল, ‘তা তো জানি না।’

‘এইসব খবর কিছু জানিস না ?’ মাস্টারমহাশয়ের কণ্ঠে এবার অকৃত্রিম বিস্ময়। দেবদূতটি বলিল, ‘স্বর্গের সমস্ত আয়োজন পর্যাপ্তেরও বহুগুণ বেশি, সুতরাং জনসংখ্যা জানার কোন দরকার সেখানে নেই।’

‘তাই বলে সবকিছু বেহিসেবী চলবে।’

দেবদূতটি তড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ‘এই যে আপনার প্রবেশদ্বার।’ আচ্ছা।’ বলিয়াই হাত দুইটি নমস্কারের ভঙ্গীতে তুলিয়া দেবদূত হাওয়া হইয়া মিলাইয়া গেল।

মাস্টারমহাশয় চোখ তুলিয়া চাহিয়া মুহূর্তের জন্য দিশাহারা হইয়া গেলেন। পুঙ্খ পুঙ্খ দ্যুতিময় স্বচ্ছ আলোককণায় গঠিত উর্ধ্বোৎসারী এক প্রবেশদ্বার, উপরে ইন্দ্রধনুচাপের এক অপক্লপ খিলান। মুহূর্ত পরেই সম্মিৎ ফিরিয়া পাইয়া সপ্রশংসভাবে কাছে গেলেন আরো ভাল করিয়া প্রবেশ দ্বারটি দেখিবার জন্য। কাছে যাইয়াই হতাশ ভাবে মাথা নাড়িয়া অমুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, ‘নাঃ, মাটির সাথে চোকাঠ দুইটি সমকোণ হয়ে নেই। আঃ, এত ভুলও করে এরা সব।’

দ্বারী দেবদূতটি এই মন্তব্যটি শুনিতে পায় নাই। সে এই নবাগতকে প্রবেশদ্বারটি ভাল ভাবে দেখাইবার জন্য অগ্রসর হইয়া বলিল, ‘বিশ্বকর্মার এই অপূর্ব সৃষ্টিটি সত্যই অমূপম।’

মাস্টারমহাশয় আক্কেপের সহিত বলিয়া উঠিলেন, ‘অল্পপন আর হতে পারলো কই, অল্পের জন্য একেবারে মাটি করে দিল। ছ্যা ছ্যা, চৌকাঠ কিনা মাটির সাথে নক্সুই ডিগ্রার চাইতে কম কোণ করেছে। এ দরজা আর কদিন টিকবে। ছমড়ি খেয়ে গোটা দশ-বার লোক খুন করে ভেঙ্গে পড়বে না একদিন? ছিঃ, এমন ইঞ্জিনীয়ার তোমাদের বিশ্বকর্মা।’

বিশ্বয়স্থলিত কঠে দেবদূত বলিল, ‘আঁা, নক্সুই ডিগ্রী—সে আবার কি।’

‘নক্সুই ডিগ্রী কি জাননা ছোকরা। স্বর্গের প্রাইমারী স্কুলে বুঝি পড় এখনো। তা এত অল্প বয়সে হারীর কাজ শুরু করে দিয়েছ—বেশ চালাক ছোকরা তো।’

দেবদূতটি ধীর গভীর কঠে বলিল ‘ছোকরা আমি ঠিক নই। আমার বয়স এই দেড় কোটি বছর। আর ইনফ্যান্ট স্কুল কেন—কোন স্কুলেই আমি কোনদিন পড়িনি। স্বর্গের সবাই আশুকাশ; বিদ্যা বা শিক্ষা এখানে আয়াসলভ্য নহে, অনায়াস লভ্য। স্বর্গে স্কুল নেই।’

মাস্টারমহাশয় বিদ্যাস্পৃষ্টের মত চমকাইয়া উঠিলেন। হুই এক পা পিছু হটিয়া বলিলেন, ‘তবে—’ আবার হুই এক পা পিছু হটিলেন, ‘তবু’? তারপর নিমেষে পিছন ফিরিয়া জ্যোতির্বর্ষ দিয়া মুক্তকণ্ঠে মাস্টারমহাশয় ছুটিয়া চলিলেন।

দেবদূত ক্রমশীণায়মান বাক্যপরম্পরা শুনি ‘যে দেশে স্কুল নাই সে দেশে আমিও নাই’। দেবদূত পশ্চাদ্ধাবন করিবার উপক্রম করিতেই লম্বুস্পর্শে চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল, দেখিল স্বয়ং চতুর্ভুজ বিষ্ণু স্নিগ্ধ-মধুর স্বরে বলিতেছেন, ‘উহার প্রাক্তন কর্ম এখনও শেষ হয় নাই। অসীম সৌন্দর্যের মধ্যে সামান্য ধুং যাহা রাখিয়াছি এখন পর্যন্তও তাহাই উহার চক্ষে প্রথম পড়িতেছে। পৃথিবীতে আর কিছুকাল উহার মাস্টারী করিতে হইবে। আর স্বর্গতো অনিচ্ছূকের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে বন্দী করে না’। দেবদূত লজ্জায় অধোবদন হইল।

এদিকে মাস্টারমহাশয়ের দেহ হঠাৎ সম্বিত পাইয়া উঠিয়া বসিল। রোহুস্তমান আত্মীয়বর্গ ছুটিয়া ভিতরে যাইয়া সশব্দে দ্বারে অর্গল বন্ধ করিয়া কান্না পর্যন্ত ভুলিয়া গেল। মাস্টারমহাশয় বেলা দেখিয়া অল্পমানে বুঝিলেন সকাল সাড়েসাতটা। শহরের অপর প্রান্তে এই সময়ে তাহার যে টিউশনিটি ছিল সেখানে তাড়াতাড়ি যাইয়া তিনি একেবারে ছাত্রের পিছনে উপস্থিত হইলেন। ছাত্রটি তখন তাহার পোষা মিনির নাকে নম্র দিলে কি কি ভাবাস্তর হয় খুব নিবিষ্ট মনে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত এই পরীক্ষাটিতে ব্যাপ্ত ছিল।

মাস্টারমহাশয় পিছন হইতে তাহার হুই কান চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কিরে, ট্রান্সলেশন হয়েছে—হ-ত-ভা-গা।’

শঙ্খনিধি

বীরেন্দ্র নিওগী

হুপুরে আবার সেই শকটটা উঠল—শাঁখা লাগবে না, শাঁখা-আ ?

অনুপমা বাইরে বেরিয়ে এল। হু'হাতের শাঁখাই বেড়ে গিয়েছে। মাস খানেক হোলো যেওঁচি পাড়ছে স্বামীর কাছে, শাঁখা বেড়ে গেছে, একজোড়া না পরলেই নয়। তা কে কানে তোলে তার কথা ? আজ হবে কাল হবে, রোববার একেবারে তোমাকে সাথে করে কালীঘাটে নিয়ে যাব, ওখান থেকে শাঁখাও পরে আসবে মাকালীও দর্শন হবে, এই সব গাত পাঁচ বলে কয়ে পাশ কাটিয়ে গেছে সুরেন। আদতে আঙু কুড়ে মানুষ একটা। গাত কথার এক কথা যদি কানে তোলে ? বলে বলে শেষটায় না পেরে কাস্ত দিয়েছে অনুপমা।

কিন্তু হাতের দিকে তাকালে বড়ই ঝাড়া ঝাড়া লাগে। খাকার মধ্যে হু'গাছা করে চুড়ী আর বাঁ হাতে একটু নোয়া। শাঁখা জোড়া থাকলে তবু একটু ভরাভরতি লাগে। তা ছাড়া স্বামীর কল্যাণ-অকল্যাণও তো আছে একটা। মানুষটার উপর ভরসা করলে কোনোকালেই আর শাঁখা পরা হবে না। নিজেই বন্দোবস্ত করতে হবে। মাস কয়েক ধরে এদিক ওদিক করে শিশিবোতল কিছু বিক্রী করে, সুরেনের পকেট থেকেও হু'এক পয়সা করে নাঝে নাঝে সরিয়ে গোটা তিনেক টাকা জমিয়েছিল, তাই ভাঙ্কতে হবে আর কি।

কালও ডেকে গিয়েছিল ঠিক এমনি সময়েই। একটু চুলমত এসেছিল তখন অনুপমার। উঠে দোড়গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই চলে গিয়েছিল লোকটা বাড়ীর সমুখ থেকে। দূর থেকে শুধু হাঁকটা ভেসে এসেছিল। কিন্তু তখন আর ডাকা যায় না।

আজ তাই তাকে তাকে ছিল অনুপমা। হাঁকতেই বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ডাকল, ও শাঁখাওয়ালা, শুনে যাওতো এদিকে।

লোকটা কিরে দাঁড়াল হাতের স্টকেসটা নিয়ে। আসি মা, মিষ্টি করে বল। তারপর বড় বড় পা ফেলে গলি ছেড়ে এসে চুকল অনুপমাদের গেটে।

গেট দিয়ে পাশের ফালি উঠোনটায় এসে দাঁড়াল। নাঝবয়সী বেঁটে মত মানুষটা। তামাটে মুখ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। একটু একটু পাক ধরেছে। তবু মুখখানা নিরীহই লাগে। গায়ে একটা আধময়লা হাত কাটা জামা। হাতে টিনের স্টকেস। স্টকেসটা নামিয়ে দরজার দিকে মুখ করে বসল লোকটা উঠোনের উপরেই। তারপর ডালা খুলতে খুলতে বলল হু'হাতের শাঁখাই বুঝি বেড়ে গিয়েছে মা ?

হ্যাঁ। অনুপমা যুহুস্বরে বলল। বসো, আমি আসছি।

শীতের নির্জন হুপুর। ছোট উঠোনটার উপর ঝকঝকে রোদ এসে পড়েছে। পাঁচিলের উপর একটা কাক অলসস্বরে ডাকছে। পাশপাশের বাড়ীগুলো নিস্তক। কাককর্মে শেষে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুম দিচ্ছে বোধহয় সবাই। অনুপমার পাশের

ঘরের ভাড়াটেদেরও কোনো সাড়াশব্দ নেই। কেউ সাথে না থাকলে যেন সাহস পাওয়া যায় না ঠিক।

ঘরে ঢুকে ছেলেটাকেই ঠেলে জাগিয়ে তুলল। তারপর কোলে করে বেরিয়ে এল বাইরে। লোকটা একবার তাকাল অনুপমার মুখের দিকে, একবার বাচ্চাটার মুখের দিকে। তারপর কাগজের মোড়কে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করল—সাদা শাঁখা নেবেন মা, না লাস?

আচ্ছা সাদাই দেখাও তো আগে।

বেশ কাজ করা এক জোড়া সাদা শাঁখা। পাতলা কাগজের মোরা খুলে ছ'আঙুলে করে তুলে ধরল।

কেমন, চলবে মা?

দাম কতো?

আড়াই টাকা।

আংকে উঠল অনুপমা। ওরে বাবা! অতো দামের জিনিস কি আর আমরা ছুঁতে পারি? প্লেনের উপর কমদামের মধ্যে কিছু নেই?

আছে। তবে এর মতো অতো সরেস হবে না। দুই পৌনে দুই এইরকম করে জোড়া পড়বে। বলে মোড়ক খুলে আর এক জোড়া শাঁখা বের করে দেখাল লোকটা।

প্লেনের উপর কাজ। পৌনে ছ'টাকা দাম।

হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল অনুপমা শাঁখাজোড়া। একটু মোটা আর খর খরে। তবে একেবারে মন্দ নয়।

কিন্তু এইটেই নেবে শেষ পর্যন্ত। মনটা খুঁতখুঁত করে কেমন যেন। পাশের ঘরের অরুণাদি কেমন একজোড়া সুন্দর কাজ করা সাদা শাঁখা কিনেছে মাস দুই হোলো। দেখে লোভ হয়েছিল বড় অনুপমার। কিন্তু তখন হাতে শাঁখা ছিল। তাই বলতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত এই শাঁখা পরলে কি মুখটিপে হাসবে না সবাই?

আগের জোড়ার দাম একটু কমসম হয় না? জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল অনুপমা।

না মা, এটা বরং চার আনা কম করতে পারি, কিন্তু ও জোড়ার উপরে আমার কমানোর সাধ্যি নাই। লোকসান খেতে হয় তাহলে। নইলে আমার কি বিক্রী করবার অসাধ?

মুখটা স্থান হয়ে গেল অনুপমার। ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। যাকগে, কি আর করা যাবে! আপাতত এই হোক। হাতে একটা তোলা দরকার কিছু, তাই তুলছে।

আপনারা মা সরু সরু বলেন, কিন্তু ছেলেপুলের ঘর, হুদিনেই হয়তো পুটপুট করে ভেঙ্গে যাবে। বেশী পয়সা দিয়ে কেনা মানে তো অর্থদণ্ড। তার চাইতে এই নিন। মানাবেও ভালো। টেকসইও হবে। চওড়া শাঁখাতেই লক্ষ্মীত্ৰী খোলে। আমার আর কি? সরু কিনলেতো আমারই ঘরে হুটো পয়সা আসবে। তবু আপনার ভালোর জন্যই বলছি এই জোড়াটাই কিনতে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘর নাড়ল অল্পপমা—আচ্ছা, তবে তাই দাও ।

দিন মা বাঁ হাতখানা ।

উবু হয়ে বসল লোকটা । আস্তে করে পরিয়ে দিল ছুঁহাতে । অল্পপমা হাত তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল । মল দেখাচ্ছে না তো ? বেশ হাত ভরা ভরা ঠেকছে । মুখে বলল—দেখো বাছা, কাল কিন্তু একবার এসো । আমার স্বামীকে দেখাই আগে । পছন্দ না হলে কিন্তু বদলে দিয়ে যেতে হবে ।

নিশ্চয়ই মা, সে কথা আর বলতে । আমরা তো ব্যবসা করেই খাই । খন্দের চটিয়ে আমাদের লাভ কি বলুন ? কিন্তু যতই বলুন মা, আপনার হাতে এ শাঁখা সুন্দর মানিয়েছে । এ আমি জোর গলায় বলছি । একেবারে মালম্মীর মত লাগছে আপনাকে ।

লজ্জায় অল্পপমা একটু লালই হয়ে উঠল । লোকটার প্রশংসার যেন ছিরিচাঁদ নেই । কেমন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দেখো না ? অকারণেই নিজের হাতছোটোর দিকে একবার তাকিয়ে ভেতরে উঠে গেল অল্পপমা ।

রাত্রে সুরেন ফিরে আসতে অল্পপমা হাসিমুখে বলল—একটা কিন্তু অন্যায় কাজ করে ফেলেছি । বলো কিছু বলবে না ।

কি আবার ? ভুরু ঝুঁচকে সুরেন জিজ্ঞাসা করল ।

হাত ছোটো সুরেনের সামনে তুলে ধরে অল্পপমা বলল—শাঁখা পরলাম আজ । কেমন, ভালো না ?

ই, কতো হোলো ?

দেড় টাকা ।

ঝট করে বেগে উঠল সুরেন দামটা শুনেই । কোন্ মহাত্মা পরিয়ে দিয়ে গেছে । শালা জোচ্ছোর ! এতো শ্রেফ গালে চড় মেরে ঠকিয়েছে । এই মোটা শাঁখার দাম কখনো দেড় টাকা হয় ; বললাম দুদিন সবুর করো, কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে পরিয়ে নিয়ে আসছি । তা সবুর তো আর সইলো না । খপ করে কিনে ফেললে কেদানি করে ।

গজগম্ব করল অনেকক্ষণ । অল্পপমার মুখে কড়া কথা এসে গিয়েছিল । ইচ্ছে করলে সেও তো অনেক কথাই বলতে পারে । একমাস ধরে বলছে, কই হস হয়নি তো এতদিন । এখন নিজের টাকায় কিনেছে তাই লম্বাচওড়া বাক্য আর হস্তিত্ব । লজ্জাও করে না ।

মুখ ফুটে আর বলল না । অনর্থক ঝগড়া করে লাভ কি ?

কিন্তু সুরেন যখন বলল, আহা কিনেছ কিনেছ, তাও আবার মোটা শাঁখা । পছন্দেরও বলিহারি যাই । কি আমার রূপ খুলেছে রে ! তখন আর স্থির থাকতে পারল না । ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—যুরোদ তো হয়নি এদিন এও কিনে দিতে । আবার বড়ো বড়ো কথা ! মোটা কিনেছি বেশ করেছি । ক্রমতা থাকে ভালো দেখে সরু দেখে কিনে দাও । রূপ খুলুক ।

বেশ, কালই কিনে দেবো । বলে কঠিন একটা শপথ উচ্চারণ করল সুরেন । তারপর একটু চিবিয়ে বলল—দেখকসেই জোচ্ছোরটা কেমন আসে কাল ।

কিন্তু পরদিন সত্যিই যখন দরজায় হাঁক উঠল—না আছেন ? সুরেন অবাকই হল একটু । রবিবার । বাড়িতেই ছিল সুরেন । এনং রবিবারটা হিসেব করেই বোধহয় শপথ উচ্চারণ করেছিল ।

অনুপমা শুধু অফুটো একটু টেনে তাকাল সুরেনের দিকে । অর্থাৎ খুব যে জোড়োর বলা হয়েছিল । এখন ?

বাইরে বেরিয়ে এল অনুপমা । পিছনে সুরেন । বাচ্চাটা ঘুম দিচ্ছে । বাঁচোয়া । লোকটা একগাল হাসল । ছুঁতোর দিকেই তাকাল । তারপর বলল—কেমন পছন্দ হয়েছে তো মা ?

অনুপমা ঠোট উল্টালো ।—বাবু যে যা তা বলছেন । মোটা বিচ্ছিরি । হাতে মানাচ্ছে না । দাম বেশি ।

স্ট্রাকেশটা এবারে হাত থেকে নামাল লোকটা । গোজা হয়ে দাঁড়াল । পছন্দ না হয়তো আমার কপাল বাবু, আর কি বলব । তবে বুকে হাত দিয়ে এটা বলব, বাজার থেকে এক পরমা বেশি নিইনি । বিশ্বাস না হয়, দশ জায়গায় যাচাই করিয়ে নিতে পারেন ।

যে রকম ভোর গলায় বলল লোকটা তাতে আর কিছু বলতে ভরসা পাওয়া যায় না । তবু তাচ্ছিল্যের সুর ফুটিয়ে সুরেন বলল—যাকগে, সরুটক যদি থাকে, দেখাও তো ।

একগাদা সরু শাখা বের করে দিল লোকটা । দেখে শুনে একজোড়া হাতে তুলে দিয়ে সুরেন স্খিজাসা করল—কত দাম ?

ছ'টাকা দশ আনা ।

সে কি ? বড্ডই যে বেশি মনে হচ্ছে ।

না বাবু, কাজটা দেখুন একবার ।

তা কাজটা সত্যিই ভালো । অস্বীকার করবার উপায় নেই । তবু দরদস্তুর করল সুরেন গম্ভীরভাবে । পাকা সংসারীর মত । অনুপমা একটু দেখুক, কেমন করে দরদস্তুর করতে হয় । অবশেষে ছ'টাকা ছ'আনা ঠিক হল ।

তাহলে হাতেরটা খুলে নেবোতো ? লোকটা প্রশ্ন করল ।

হ্যাঁ, খুলবে, তবে নেবে না । তোমার মায়ের যখন পছন্দ হয়েছে, ও জোড়াটাও থাক বাড়িতে । বলে চট করে একবার তাকিয়ে নিল অনুপমার মুখের দিকে । যাকগে, ছুঁজোড়াই থাক না হয় । কিছুতো দিতে পারে না, না হয় ছুঁজোড়া শাখাই হোক ।

হাতের মোটা শাখা খুলে তারপর সরুটা পরিয়ে দিল লোকটা । খুশি পায়ে ঘরে এসে ঢুকল অনুপমা । বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু । যাই বলো, মানুষটার পছন্দ আছে ।

দাম চুকিয়ে দিয়ে সুরেন ঘরে এসে ঢুকল । অনুপমার উজ্জ্বল মুখের দিকে একটুকুণ তাকিয়ে রইল । ঝকঝক করছে সাদা শাখা জোড়া । সুন্দর মানিয়েছে । সত্যিই রূপ খুলেছে এবারে ।

এগিয়ে গিয়ে বুকের কাছে টেনে নিল অল্পপমাকে । তারপর মুখের উপর গভীর আবেগে চুমু খেয়ে জিজ্ঞেস করল—পছন্দ হয়েছে ?

উত্তরে অল্পপমা মুখ ওজল ওর বুকে । অক্ষুট গদ গদ স্বরে বলল—একদম না । অরুণদিও বলেছিলেন—বেশ সুন্দর হয়েছে ।

শুনে সুরেন হেসেছিল একটু । তারপর অল্পপমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—এবারে একজোড়া ভালো চুড়ি, কি বলো ?

অল্পপমা কৃত্রিম ভাচ্ছিলো ঠোট বঁকিয়েছিল—শাঁখাই, তাই কতো রাগারাগি বকাবকির পর দিয়েছ । তারপর আবার সোনার চুড়ি ? তার আগে কপাল সোনা দিয়ে বাঁধতে হবে ।

তারপরেই গভীর হয়ে বলেছিল—এই বেশ আছি । কি দরকার বাপু, এখন ওসব সোনাদানার কথা ভেবে ? অবস্থা ভালো হোক, শতখন ওসব না হয় করা যাবে । দিনতো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না ।

তা সত্যি । সংসার চালানোই সমস্যা । কাজ করে সুরেন বড়বাজারে এক দোকানে । মাস গেলে একশো দশটাকা মাস্তুর মাইনে । পঁচিশ টাকা ভো বাড়িভাড়াতেই বেরিয়ে যায় । যা থাকে তা দিয়ে সংসার চালানোর পর আর সখ সৌখিনতা করবার মত কিছু অবশিষ্ট থাকে না । তবু তো সুরেনের হাতখরচা নেই বলতে গেলেই হয় । তার পয়সার বিড়ি বরাদ্দ রোজ । ওতেই চালিয়ে নেয় । দোকান থেকে ফেরার পথে শেয়ালদা থেকে বাজারটা সেরে আসে । কিছুটা সস্তা হয় বইকি । উপরি পাওনাও যেমন নেই । উপরি খরচাও নেই তেমনি । কালে ভদ্রে একআধটা সিনেমা দেখে । এই পর্যন্ত বিলাসিতা । অল্পপমাকেও বাহবা দিতে হবে । আর দশটা মেয়ের মতো স্নো, পাউডার আর সিনেমার বায়না ধরে কোনোদিন ব্যতিব্যস্ত করে তোলেনি সুরেনকে । বুঝে চলতে জানে । লক্ষ্মীটি বলতে হবে ওকে ।

না, সুরেন অসুখা নয় ওকে বিয়ে করে । আবদার নেই, বায়না নেই । তবু দিতে তো সাধ যায় । বিয়ে হয়েছে এই বছর আড়াই । ক'টা শাড়ি কিনে দিতে পেরেছে সে । গরনা তো দুরন্দান । মাঝে মাঝে কড়া সঙ্কল্প করে, একটা কিছু দেবেই এবারে । কিন্তু টাকা কোথায় ? ঘোঁকের মাথায় ওই শাঁখা জোড়াই যা হয়ে গেল হঠাৎ ।

আয়টা কিছু যদি বাড়ানো যেত ; ভাবে মাঝে মাঝে । কিন্তু যে চশমখোরের চাকরী । এক কোঁটা সময় পাবার উপায় নেই । সকাল আটটা থেকে রাত আটটা অবধি প্রায় চাকরী । কঁাক পেলে তবে তো এটা ওটা করবে । চোখের সামনে অনেক ব্যবসাই তো আছে । মাথার ও ঘোরে দু'একটা । কিন্তু হলে হবে কি । কুরসৎ কই ?

মাঝে মাঝে ভাবে, মালিককে মাইনেটা একটু বাড়ানোর ক্ষেত্রে ধরলে কেমন হয় ? অনেকগুলো বছরইতো হয়ে গেল এখানে চাকরী করা । সেই যে প্রথম প্রথম একবার দশটাকা বেড়েছিল, তারপর থেকে একেবারে চুপচাপ ।

অনুপমা পর্যন্ত মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেছে—মাইনে বাড়েনা তোমাদের ? কি রকম কাজ করো বাপু ? সেই এসে থেকে যে একশো দশটাকা দেখছি, তাই চলছে এখনো সমানে । বলতে পারোনা, হাঁ বেড়েছে, মাইনে বাড়বেনা কেন ?

হ্যাঁ, তাহলে তোমাকে আর টোকনকে কাঁধে ফেলে একদিন উপস্থিত হতে হয় সোজা মালিকের কাছে । দেখে শুনে যদি খুশি হয়ে মাইনেটা বাড়ায় । হাসতে হাসতেই ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে সুরেন ।

যাও । লজ্জায় মুখ ফিরিয়েছে অনুপমা ।

কথা আর বাড়েনি এর পর । কিন্তু সুরেনের চিন্তা বেড়েছে । সত্যিইতো খরচা বাড়ছে দিনের পর দিন । একটা কিছু উপায় বের করা দরকার । নেহাৎ অনুপমার মতো মেয়ে বলেই সংসার ঠিক মতো চালাচ্ছে । নইলে এতো দিন চোখে সর্বের ফুল দেখতে হত ।

দোকানেও এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে দু'একজনের সাথে । সবারই মত, এ মাইনেতে আর চলে না । অন্তত দু'দশটাকাও যদি বাড়ে, তাহলেও কিছু সুরাহা হয় । কিন্তু যা হাড়-কঙ্কর মালিক, কানে তুলবে কি তাদের কথা ? কথাটা পাড়তেই যে ভরসা পাওয়া যায় না । আগে আগে পুজোর সময় বোনাসের মত যা হোক গোটা কয়েক টাকা দিত, গেল বছর তাও বন্ধ করেছে । সুতরাং মতলব স্পষ্ট, সবার মাইনে বাড়বে না । এ সম্বন্ধে সন্দেহই নেই । এখন নিজের নিজেরটা যদি বলে কয়ে গুছিয়ে নিতে পারে । যদি নরম করতে পারে মালিককে কোনরকমে কেঁদে কেটে ।

হ্যাঁ, তাই বরং ভালো । শেষ পর্যন্ত ঠিক করল সুরেন একবার বলেই দেখবে, মাইনেটা বাড়ানোর কথা । অবিশিষ্ট বলি বলি করে অনেক দিন বলাই হয় না । তারপর জোর করেই একদিন দোকান বন্ধের মুখে গুটি গুটি পায়ে মালিকের গদির কাছে এসে দাঁড়াল । মাথা চুলকাল একবার । উসখুস করল একটু । তারপর সাহস সঞ্চয় করে হঠাৎ বলে ফেলল—মানে, অনেকদিন তো হয়ে গেল, বলছিলাম কি, এবারে একটু মাইনে টাইনে যদি বাড়াতেন । মানে—সংসার আর চলছে না কিছুতেই ।

কি ? পুরু চশমার ভেতর দিয়ে প্রোচু মোটা-সোটা মালিক তাকালেন সুরেনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ।

একটু ভয়ই পেয়ে গেল সুরেন । এক এক করে কর্মচারীরা বেরিয়ে যাচ্ছে কোলাপসিবল গেটের সরু কাঁকটার মধ্যে দিয়ে । কেউ একবার তাকাচ্ছেও না ওর দিকে ।

এই মাইনে বাড়ানোর কথা আর কি । অসাড় গলা দিয়ে বেরিয়ে এল সুরেনের ।

হু । একটু চুপ করে রইলেন মালিক । তারপর যেন হাসিমুখেই বললেন, দোকানের অবস্থাতো নিজে চোখেই দেখতে পাচ্ছে হে । তারপরেও কোন মুখে এসব কথা বলা বলতো ! ভাবছি, কোথায় দু'একজনকে বাদ দিয়েই কাজ চালানো

যায় কিনা, না উর্টে মাইনে বাড়ানোর কথা বলছে। হ, হ' একজনেও যেন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল বটে।

মনে মনে শিউরে উঠল সুরেন। আর কোন কথা না বলে বিনীতভাবে নমস্কার করে দোকানের বাইরে বেরিয়ে এল। উঃ, কি কুক্ষণেই যে কথাটা পাড়তে গিয়েছিল। চোখে যেন অন্ধকার দেখল সুরেন বড়বাজারের আলোকিত সরু রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে। মনে মনে ভয়ংকর রাগ হতে লাগল অল্পমার উপর। ওর জন্যই তো এই কাণ্ডটা হোলো। অমন করে না খোঁচালে সুরেন কি আর বলতে যেত। এখন চাকরীটা গেলে না খেয়ে মরুক সবাই মিলে! ওর আর কি।

শেষপর্ষন্ত সত্যই চলে গেল চাকরীটা। দুদিন পরে কাজের শেষে সবাই চলে যাওয়ার সময় সুরেনকে আর গণপতিকে মালিক ডাকলেন। এটা ওটা হ' একটা কথা বলে তারপর বললেন, ব্যবসার খুব খারাপ অবস্থা। আর চালাতে পারছি না। এক একবার ভাবি ভুলেই দেব ছাই। তা এতগুলো লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে সেটা আর করতে মন সরে না। হাজার হোক খেয়ে বাঁচছে তো লোকগুলো।

চোক গিলবার চেষ্টা করল সুরেন। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। মালিক আর ওদের দিকে তাকালেন না। ক্যানিয়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখি, আজ পর্ষন্ত ওদের মাইনের হিসেব করা হয়েছে। তাহলে ওর সাথে আর এক মাসের করে পুরো মাইনে ধরে দাও এদের। আমার নিজেই খুব দুঃখ হচ্ছে যে তোমাদের রাখতে পারলাম না। তবে অবস্থা একটু ভালো হলেই আবার তোমাদের নিশ্চয়ই নিয়ে আসব।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিল সুরেন। যন্ত্রের মত কখন টাকাগুলো নিল, কখন বেরিয়ে এল বাইরে, নিজেই জানে না। বড় রাস্তার উপর এসে হঠাৎ যেন সন্ধিৎ ফিরে পেল। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইল এতক্ষণে। ক্ষোভে, অভিমানে বুকের মধ্যে কেমন করছিল যেন। কার উপর অভিমান নিজেই বুঝতে পারছিল না।

উদ্ভ্রান্তের মত হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে বাসায় এসে পৌঁছল। কান্নাটা খুলেই কোন কথা না বলে চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানার উপর। চোখের উপর ডান হাতটা আড়ালি করে রেখে নিঃশব্দে পড়ে রইল।

কি হয়েছে? অল্পমা উদ্ভিন্ন চোখে তাকাল ওর দিকে। ভাড়াভাড়ি টোকনকে কোল থেকে নামিয়ে মেঝের উপর ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেল সুরেনের দিকে। হাত-পা ধোয়া নেই হঠাৎ মাহুঘটা এসেই অমন ধপাস করে শুয়ে পড়ল কেন? অসুখ-বিসুখ হয়নি তো? ধক করে উঠল বুকটা।

কি হয়েছে? ওগো? এগিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাস করল আবার অল্পমা।

কিছু হয়নি। ষড়ষড়ে বিরক্ত গলার সুরেন কোন রকমে উত্তর দিল।

তাহলে এরকম এসেই শুয়ে পড়লে যে? মিছে কথা বলছ। নিশ্চয়ই হয়েছে কিছু।

বলছি কিছু হয়নি। ভীত, বিরক্তিতে রনরন করে উঠল সুরেনের গলা। মহা মুক্তিরতো।

দেখি । তাড়াতাড়ি এসে কপালে হাত রাখতে গেল অন্নপমা ।—জরটর হয়নি তো !

আঃ ! একটা ঝটকা দিয়ে কপালের উপর থেকে অন্নপমার হাতটা সরিয়ে দিল সুরেন । মটমট শব্দ উঠল একটা বিচ্ছিরি ।

চমকে উঠে বসল সুরেন বিছানার উপর । ডান হাতের শাঁখাটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে । টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে মেঝের । আর সেই দিকে তাকিয়ে পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্নপমা । দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা প্রাণপণে চেপে ।

সেই দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সুরেন—বেশ হয়েছে । আপদ গেছে । সব করা মিটল এবার । আর থেকে আমারও আর চাকরি নেই । বুঝলে ?

কোন কথা না বলে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল অন্নপমা মেঝের উপর । তারপর নিঃশব্দে শাঁখার ভাঙ্গা টুকরোগুলো নিপুণ হাতে কুড়াতে লাগল ।

হাতে আছে মাত্র দুশোটি টাকা । এই নিয়ে অনিদিষ্ট কালের জন্য সংসার চালানো । এ যেন ঝড়কুটোর উপর ভরসা করে সমুদ্রে ভাসা ।

প্রথম দিনকয়েক খুব ঘুরল সুরেন এখানে ওখানে । বড়বাজারের আনাচে কানাচে । যদি একটা চাকরী মিলে যায় । পুরনো দোকানেও গিয়েছিল একদিন । শুনল, সুরেন ঘোঁটা পাকাচ্ছে সন্দেহ করে মালিক তাড়িয়েছেন ওকে । মালিককে গিয়ে চেপেচুপে ধরল । আশ্বাস দিলেন উনি, সম্ভব হলেই নিশ্চয় নেব ।

কিন্তু ছেঁদো কথায় পেট ভরে না । আর লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে ফিরেও চাকরী যোগাড় হয় না । সুতরাং প্রথমে বাজারটা কমল । তারপর একদিনের বাজারে দুদিন ।

টোকনের দুধ কিছু কমাতে নাকি ? একদিন প্রস্তাব করল সুরেন ।

ফুঁসে উঠল এবারে অন্নপমা ।—এমনিহেতো একপোয়া করে দুধ নেওয়া হচ্ছে । কমাতে আর থাকবে কি এরপর ? তার চেয়ে বলো না খাইয়ে মেরে ফেলে দি ।

কিন্তু এরপর যখন একদমই দুধের বন্দোবস্ত করা যাবে না, তখন ? অন্তদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল সুরেন ।

বাপ যখন হয়েছে, তখন ছেলের দুধের বন্দোবস্তও যেমন করে পারো করবে । বলে টোকনকে কোলে তুলে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল অন্নপমা ।

আগের চাইতে যেন ক্লান্ত হয়ে গেছে অন্নপমা । অক্ষম ক্রোধে চুপ করে কঁসতে কঁসতে সুরেন ভাবল । আজকাল টুকটাক কথাতেই কি করে যেন ঝগড়া বেঁধে যায় । বাড়ী এলেই অশান্তি । তার চাইতে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানো বরং ভালো । কিছু চেষ্টা করা হোক বা না হোক, অন্ততঃ বাড়ীতে ঝগড়ার হাত থেকে তো বাঁচা যায় ।

উঠে গায়ে জামা গলাতে যাচ্ছিল । অন্নপমা ভেতরে চুকল । নীরস গলায় বলল—হুন কিন্তু একদম ফুরিয়ে গেছে ।

স্বপ্নে একটু লবণটা বেশীই খায়। তাই শোনাতে এসেছে নাকি অনুপমা। যেন ওর জন্ম কিছুই লাগেনা। না ভাত, না কাপড়, না অন্ন কিছু। সব করে তাহলে শাঁখা ছোড়া কার জন্ম কিনেছিল সে সেদিন? এত নীচ অনুপমা।

সুনাম। গভীর মুখে বলল স্বপ্নে। তারপর অনুপমার হাতের দিকে তাকিয়েই বলল—তু'হাতের শাঁখাই গেছে। বাঃ! নালক্ষীর হাতই বটে। শুধু শাঁখা কেন, এবারে ঘরদোর সব ভাঙ্গে এক এক করে। তাহলেই যোলো কলা পূর্ণ হয়।

অনুপমা চুপ করে রইল। কি বলবে এর উত্তরে? স্বপ্নে যদি জেনেও না জানার ভান করে তবে আর বলার কি আছে? সেদিন ওর হাতের ঝটকায় শুধু একগাছা শাঁখাই ভাঙেনি, ডান হাতটা ছোরে বাঁ হাতের উপর এসে পড়ায় অন্নটাতেও চিড় ধরে গিয়েছিল। দিন কয়েক পরে সেটাও তাই খসে পড়ে গেছে। কিন্তু অরুণাদি অন্ন অর্থ করে মুখ টিপে খুব হেসেছিলেন। ভেবেছিলেন, স্বামীর আদরেরই এই পরিণতি। ইঙ্গিতটার আর প্রতিবাদ করেনি অনুপমা। বলেনি, আদর নয় অনাদরেরই ফল এটা। কি হবে বলে? বরং ভুল বুঝে যদি বাইরে সম্মান বাঁচে বাঁচুক।

সংসারটা উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবে একেবারে। দাঁতে দাঁত পিষল স্বপ্নে।

যাওতো বাইরে বরং একটু ঘুরে এসো। সারাদিন ঘরে থেকে থেকে একেবারে নেয়েদের মতো প্রস্রাব হয়ে যাচ্ছে তোমার। সারাদিন শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া। তীব্র গলায় বলল অনুপমা।

চুপ করে গেল স্বপ্নে। তারপর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল বাইরে।

জুদিন আগেও একটা সুখী সংসারের স্বপ্নে ছুঁতে বিভোর হয়ে ছিল। একটু ভালোভাবে থাকবে, তু'একটা গয়না গড়িয়ে দেবে অনুপমার, শুধু শাঁখা নয়। আর আশ্ব? দিন বিশেকের মধ্যেই কি মানুষ এতটা বদলে যেতে পারে? আশ্চর্য।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মাথা ঠাণ্ডা করে স্বপ্নে ভাবল কিছুক্ষণ। নাঃ, একটা কিছু করতে না পারা পর্যন্ত এ অশান্তির হাত থেকে মুক্তি নেই। এসব ঝগড়াঝগড়ি তার নিজের দোষেই হচ্ছে। চাকরী বাকরী একটা পেলে বা একটা যাহোক কিছু উপার্জনের বন্দোবস্ত করতে পারলেই সবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

সারাদিন ধরে ভাবল স্বপ্নে। এর ওর কাছে গেল। উপদেশ নিল। কি করা যায়? হাতে এখনো শ'খানেকের কিছু বেশী টাকা আছে। এরি মধ্যে কিছু একটা করে ফেলা দরকার। নইলে আর কয়দিন পরে এ টাকাটাও ফুরিয়ে যাবে। তখন কুটপাত আর ভিক্ষে ছাড়া গতি থাকবে না।

কদিন থেকেই ব্যবসার কথা ভাবছিল। অল্প-পুঁজিতে মোটামুটি দাঁড় করানো যায় এমন ব্যবসা। এর ওর কাছে উপদেশও নিয়েছে। কেউ বলেছে কাটা কাপড়ের কথা, কেউ বা গেঞ্জির ব্যবসার কথা। আশ্ব অমলেশ বলল—তার চেয়ে লুজ চায়ের ব্যবসা করো না? আমি চায়ের বন্দোবস্তটা মোটামুটি করে দিতে পারবো। কিছু স্টাম্পল ঠিক করে নাও, তারপর রেজিস্ট্রার গুলোয় ধর্না দিতে থাকো। আমাদের

পাড়ার ছ'একটা রেপ্টারেন্ট না হয় আমিই ঠিক করে দেবার ভার নিচ্ছি। তুমি তোমার পাড়া জ্বাখো। এই করতে করতেই হয়ে যাবে। তারপর ছোটখাট একটা দোকান দিও।

মন্দ যুক্তি নয়। কিন্তু টাকা তো কিছু চালাতেই হবে। নয় নয় করতে করতেও অন্ততঃ ষাট সত্তর তো বটেই। পুঁজিতো মাত্র এই শ' সোয়া শো। তাহলে খাবেই বা কি আর ব্যবসাই বা করবে কি দিয়ে?

রাতে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করল। কি করা যায়। তিন জনের সংসার চালানো গোজা ব্যাপার। এক হয়, যদি কিছু দিনের মত অন্য জায়গায় বৌ ছেলেকে পাঠিয়ে দিতে পারে। কিন্তু পাঠাবে কোথায়? স্বস্তরবাড়ী? তাদের অবস্থাই কি ছাই ভালো এমন কিছু? নাঃ, অন্ততঃ ভাবতে গেলে আর চলবেনা। অন্ততঃ মাসদুয়েক যদি থেকে আসতে পারে, তার মধ্যেই মোটামুটি ব্যবসাটা গুছিয়ে ফেলতে পারবে সুরেন।

পরদিন সকালে অল্পমাকে ডেকে বলল জ্বাখো, ব্যবসা করাই ঠিক করলাম শেষ পর্যন্ত। লুজ চায়ের ব্যবসা করব। এক বন্ধু সাহায্য করতে রাজী হয়েছে, বুঝলে। ভালো না?

অনেকদিন পরে অল্পমার মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাই নাকি? বেশতো? সেই মুখের দিকে তাকিয়ে সুরেন ধীরে ধীরে বলল—কিন্তু একটা কথা। তোমাদের নিয়ে কি করা যায় বলোতো? এইতো অবস্থা দেখতেই পাচ্ছো, হাতে যে কয়টা টাকা আছে ব্যবসায় খাটাতে হবে। একদিন দু দিনেই তো আর ব্যবসা কেঁপে উঠবে না। মাসখানেক অন্ততঃ খাটতে হবে। তারপর যদি কিছু কিছু করে আসে। কিন্তু সে কয়দিন কি করে চলবে? বলে জিজ্ঞাসু মুখে অল্পমার দিকে তাকাল।

অল্পমা মুখ নিচু করে বলল—তার আমি কি বলবো বলো।

আমি বলছিলাম কি, মাস দেড়েক দুয়েকের মত বরং তোমার বাপের বাড়ী থেকে একটু ঘুরে এসো। ইতিমধ্যে আমিও গুছিয়ে নিই একটু।

কি? তীক্ষ্ণস্বরে অল্পমা জিজ্ঞেস করল। সেই স্বরে একমুহুর্তে সংকুচিত হয়ে গেল সুরেন। তারপরেই জ্বলে উঠে বলল—কেন, কি এমন খারাপ কথাটা বলা হয়েছে? বিপদের দিনে সবাই সবাইকে দেখে। আর বাপ হয়ে নিজের মেয়েকে দেখবেনা ছদ্দিন?

না। অস্বাভাবিক শাস্ত্র স্বরে বলল অল্পমা। সে হয়না। তুমি বুঝবে না। সে কিছুতেই সম্ভব না। সুদিন থাকলে দু মাস কেন চার মাসও গিয়ে থাকা আপত্তি ছিলনা। কিন্তু এখন এই অবস্থায় কোন মুখ নিয়ে গিয়ে দাঁড়াব? কি বলব?

বলবে, তোমার সোয়ামীর চাকরী গেছে! • খেতে পাচ্ছোনা! দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল সুরেন।

সেই বয়েই কি তোমার সম্মান থাকবে? শাস্ত্র চোখে তাকাল অল্পমা।

সম্মান ধুয়ে কি জল খাবো? শাস্ত্রর যতো সব ইয়ে।

সকাল বেলাতেই কুত্ৰী একটা কলহ হয়ে গেল। কি বিত্ৰী! কি বিত্ৰী!

হুজনে দেখা হলেই কি আর ঋগড়া ছাড়া কিছু নেই ! বিছানায় চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে ডাবল সুরেন। রোজ রোজ আর কাঁহাতক এই রকম ঋগড়াঝাটি ভালো লাগে। যাঃ শালা ! সকালে বেরোবে ভেবেছিল অনলেশের কাছে। যাবেই না। কি হবে। যার নিম্নের ত্রীই অঝু, সে নিম্নে কেন অত কর্তব্যপরায়ণ হতে যাবে ? কিসের দায় পড়েছে তার !

বাচ্চাটা বারান্দায় পড়ে পড়ে কাঁদছে। তার কি ? মা-ই যদি না দেখে, তবে বাপ করবে কি ?

কান্নাটা খেমে গেল। ঋগড়া একটু কাত করে দেখল, অমুপমা এসে তুলে নিয়েছে। মাই দিয়ে চুপ করাচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একবার মনে হল সুরেনের, অন্ততঃ টোকনটার জন্তেও তো তার কিছু করা দরকার। ওতো কিছু দোষ করেনি।

ঝিন্ন এসেছিল বুঝি একটু। অকস্মাৎ একটা বৃহৎ স্পর্শে ধড়মড় করে জেগে উঠেই চোখ মেলে তাকাল সুরেন। সামনে অমুপমা। একটু বুঝি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। হাতটা বাড়িয়ে বলল—এই নাও, ধরো।

কি ? বিহ্বল গলায় সুরেন বলল।—একি, এ যে তোমার গয়না ?

হ্যাঁ। বন্ধক দাও। না হয় বিক্রী করো, যা খুশি তোমার। সংসার চলুক।

তীব্র উদ্বেগনায় উঠতে যাচ্ছিল সুরেন, অমুপমা বাধা দিল। তারপর বলল, শোনো। তুমিই একবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে জ্ঞাখো, এই অবস্থায় কখনো বাপের বাড়ী যাওয়া যায় ? বাপের বাড়ী যাবো মাথা উঁচু করে। যেখানে তোমার সম্মান থাকবে না, কিছু না, সেখানে কোন্ মুখে গিয়ে আমি থাকব বলোতো ?

শুনতে শুনতে স্নিগ্ধ মনতায় সুরেনের মনটা আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। না, ঠিকই বলেছে অমুপমা। এ দিকটা সে আদৌ ভেবে জ্ঞাখেনি।

আমি বলি কি, অমুপমা বলল—আমার গয়না বন্ধক দাও। ব্যবসায় খাটাও। আর খোলার ঘরটর যা হয় কিছু দেখে সস্তায় বাড়ী ভাড়া নাও। টাকা দশ পনেরোর মধ্যে। কষ্টে পড়লে সবই করতে হয়। হুঃখ করে, থাকব তবু স্বাধীন থাকব। এখানে থাকলে ওই অরুণাদি নাক সিঁটকাবে। আর কেউবা ছটো কথা বলবে। তা শুনতে যাবো কেন ? কি বলো ?

উৎসাহে উঠে বসল সুরেন। যেন আলো দেখতে পেয়েছে। সত্যিই তো। কষ্ট করবে, খাটবে, শুয় কিসের তাতে ! অনেকদিন পরে হাসল। শুয়া গলায় বলল—ঠিক বলেছ।

একটু এগিয়ে এল অমুপমা। বলল—আর আমিই কি সাহায্য করতে পারবো না। দরকার পড়লে বাড়িতে বসে ঠোঙাও তো তৈরী করতে পারবো। হুজনে নিলে দেখো, ঠিক সংসার চলে যাবে। বলে গয়নাগুলো সুরেনের হাতে তুলে দিল।—নাও। বন্ধক দিয়ে ব্যবসায় লেগে যাও। আর তাড়াতাড়ি বাসা পার্টানোর চেষ্টা করো।

হুখানা নিরাভরণ হাত। সুরেনের সামনে একটু কালের জন্ত উজ্জ্বল হয়ে

রইল। সেই দিকে তাকিয়ে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল সুরেন। শুধু একগাছা নোয়া বাঁ হাতটায় নিখ্রাণ হয়ে আটকে রয়েছে। চোঁক গিলল, তারপর বলল—কিন্তু তোমার ওই হাতের দিকে যে একদম তাকানো যাচ্ছে না।

হঠাৎই যেন মনে পড়ে গেল। অল্পপনা উজ্জ্বল মুখে বলল—সেই আগের শাঁখা ছোড়াতো তোলা আছে। দেখি। বলে তাড়াতাড়ি গিয়ে ট্রাকটা খুলল। হ্যাঁ, রেখে দিয়েছিল সেদিন মোটা শাঁখাছোড়াটা। ঠিক আছে। বের করে নিয়ে হাতে পরল। তারপর হাত দুটো সুরেনের সামনে তুলে বলল—স্বাধোতো, কেমন দেখাচ্ছে।

একছোড়া অতি সাধারণ মোটা শাঁখা। তবু তাইতেই যেন অল্পপনার হাত ভরে উঠেছে। মনও বুঝি।

সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুরেন বলল—ঠিক না-লক্ষ্মীর মত দেখাচ্ছে।

অটোগ্রাফ অন্নদাশঙ্কর রায়

। আত্মীয়েরা ।

আত্মীয়েরা আছে আমার
দেশে দেশে
ছড়ানো ।
দেখে গেলেম, সুধারসে
নয়ন হলো
ভরানো ।

॥ সুর্যোদয়ের দেশে ॥

সুর্যোদয়ের দেশে
হঠাৎ আমি এসে
ভালোবাসা পেলেম এবং
গেলেম ভালোবেসে ।

অন্ধকার হলে

মনসুর আহমদ

অন্ধকার করে দিতে ঘর ওরা আসে আলতো ছায়ায়
কয়েকটা পাখীর পালক, শুকনো ফলের খোসা
বিবর্ণ পাতার শরীর,
বিছানার কাচানো চাদরে একে একে জনে ওঠে
পরিত্যক্ত জীবনের জীর্ণ আবরণ ;
কোনরাতে বুনা ঝড় এলে ।

এমন মায়াবী রাতে নরম পালক নিয়ে হাতে
হঠাৎ যে কেনো হোলো, সারাদেহ ছুঁয়ে দেখলাম
তপ্ত প্রাণের গতি, ধমনীতে রক্তের স্রোত
এই গাঢ় অনুভূতি সব যেনো ভালবাসলান ;
মনে হোলো অগ্নিনি জনহীন নগরীর মতো
আমার এ-দেহ হবে শত্রুর আঘাতে বিকৃত
জ্বালাধরা তীরের ফলায়,
সহসা এমন রাতে, মৌসুমী ঝড়ের হাওয়ায়
উড়ে আসা পাতা আর নামহীন পাখীর পালক
আমার বুকের কাছে চেপে ধরি কি যে মনভায় ।

পরিচ্ছন্ন আকাশ—তার জনো

সত্যব্রত ঘোষ

আমি নির্জন আকাশ খুঁজে ক্রান্ত,
নির্জন আকাশ খুঁজে ক্রান্ত !

কতোদিন ভেগে ভেগে
খুঁজেছি উদার শান্ত আকাশের পরিচ্ছন্ন নীল,
খুঁজেছি, পাইনি তবু।
উষ্ম বাস গ্রহরের আচ্ছন্ন বিবেকে
কোথায় হারিয়ে গেছে
আকাশের স্নিগ্ধতার অসীম আশ্বাস,
খুঁজেছি, পাইনি আমি
বিবিক্ত আকাশ, তার পরিচ্ছন্ন নীল।

অথচ নিশীথে,
যখন আকাশ মগ্ন
পরিব্যাপ্ত পরিচ্ছন্ন নীলে,
বিজ্ঞান আকাশ শুধু একমাত্র বিরল বাস্তব,
তখন ঘুমিয়ে আমি,
অচেতন, অন্ধ, বেহিসেবী।

জর্নাল : তেসরা কার্তিক ১৩৬৩

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেহুর সন্ধ্যার মাঠে কার্তিকের সলাজ শিশির
 ঝ'রে পড়লো । দূর চক্রবালে
 অনল্হ মেঘের গুঠা ঠেলে দিয়ে বিধুর মদির
 চাঁদ উঠে এল ধীরে : রূপসীর সবুজ কপালে
 চন্দনভিলক ।
 ছুটি পথচারী গেল সামনে দিয়ে । ধীর পায়ে বৃহ গুপ্তরণে
 নিরুদ্দেশ ছুঁনারই চন্দ্রাহত চোখ
 আগন্তুক হাওয়ার স্বননে
 একটু কঁপে উঠলো । আরও দূরে
 কে এক নির্জন যাত্রী গান ধরলো বেসুরো গলায় ।
 এরই মাঝে আচম্বিতে তমসার কুণীল চিকুরে
 তারাগুলি জলে উঠলো একে একে । দ্বিতীয়ার হিমাদ্র জ্যোৎস্নায়
 ভেসে গেল মাঠ ।
 শঙ্খনিভ গঙ্গাতট উজ্জল স্বপ্নের রাজ্যপাট
 কী মন্ত্রে বসালো বুকে নিবিড় বিষম বাংলাদেশে ।

হুয়োরানী মা আমার, জানি
 তোমার ও রাজ্যে শুধু আমারই একান্ত অধিকার ।
 তাই কী দিনান্তে রোজ আমার বিলাসশয্যাখানি
 তোমার বুকের কাছে স্নেহের ব্যাকুল অঙ্গীকার ।
 তাই বুঝি হয়
 হুয়োরানী মা আমার, তোমার বিজ্ঞান যন্ত্রণায়
 আমি জলি হুঃসহ দহনে ।
 নিরাকার শূন্য হতে স্বপ্নের রাগিনী
 হাওয়ার আঁচলে মেলে যে বৈদেহী নামে সজোপনে
 একাকিনী নল্ল নিশীথিনী,
 কী বিস্ময় আমি তাকে চিনি চিনি চিনি :
 সে দেয় প্রশ্ন তাই কড়ির মতন শাদা মুখে
 পৌরাণিক রূপসীরা ঘিরে আসে আমার সম্মুখে ।

শৈশবের রূপকথা যুদ্ধ ছবি যেন চতুর্দিকে ।
 কল্পনার মায়ানোকটিকে
 যতদূর নিয়ে যাই রোমান্থিত হাওয়ায় হাওয়ায়,—
 নীলাঙ্কিত অন্ধকারে কার উষ্ণ স্পর্শ : যেন কাঞ্চনমালার এলোচুলে
 রহস্য আপন পথ ভুলে
 ধমকে দাঁড়িয়েছে । ওই স্পর্শকামাতুর শূন্যতায়
 বুঝি ধ্বনিহীন সুর, বুঝি বাণীহীন ইচ্ছা, বুঝি
 অলৌকিক রূপবিভা মধুর মাদর স্বপ্নরুচি
 মেলেছে । হৃহাতে
 অক্ষম আনন্দ তার কঁপে উঠি উদ্ভাস্ত নাবিক ।
 নিশ্চুতিবিষয় দিগ্বিদিক
 স্নেহার্থীর মত টানে অঙ্গে তার নিঃশেষে জড়াতে ।

স্বরচিত ইন্দ্রজাল ছিঁড়ে
 পাগল উত্তরে হাওয়া বাণ হানে সহসা শরীরে ।
 বেদনাবিছানো পথে কাতিকের উদাস আগুন ।
 দশদিশি পুড়ে যায় । তার একপ্রান্তে আমি তুমায় বিবাস,
 দেখি আলেয়ার পিছে দুর্মর প্রেতের পরিহাস,
 দেখি শূন্যত্ব
 আমার নিরিক্ত হৃদি ভেঙে যায় যন্ত্রণায় ধীরে
 নির্বেদের সিতাত শিশিরে ।
 শঙ্খনিভ গঙ্গাতট একপাশে শঙ্খিনী নদীর চেয়ে আরও
 নির্জন হতাশা : তার ক্রান্ত অক্ষধারা
 কেবলই কুহেলী চালে । কী ছিল যে প্রত্যাশা প্রগাঢ়,—
 যার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি চিন্তে আজও বন্দে দিশাহারা ।

ভূমি

ভারাপদ রায়

আমার হৃৎকের মতো বড়ো ভূমি ।

আকাশে মেঘের ছায়া এলোমেলো,
নদীতে তীরের ছায়া এলোমেলো,
একটানে কে দিলো মিলিয়ে । অন্ধকারে মেঘ-নদী মিশে গেলো ।
দেয়ালের মৌন ছবি, কলিতকাস্তার স্নান মুখ
সে-ও যেন কতকাল চেনা
কতকাল তাকেও দেখি না ।

যতদূর চোখে পড়ে, যতদূর মনে পড়ে
ধূ ধূ শূন্য কোনো চিহ্ন রাখেনি কোথাও ।
আমার কান্নাকে জানি
শোকে-জ্বলে বাসনায়-দৈনিকের সাগর মগ্ননে
স্বপ্নতির কলস ভরে হৃৎকের অমৃত তুলে আনি
গাঢ় স্বাদ, গাঢ় গন্ধ স্মৃতিতে চেতনা :
তোমাকেই খুঁজে পাই, তোমাকেই জানি ।

আমার হৃৎকের মতো, কিম্বা হৃৎকেরো চেয়ে বড় ভূমি ।

বুহ

বাসুদেব গুপ্ত

মথিত মথিত চিন্তায় চিন্তায়
পর্যুদস্ত ধ্বংসের ছবি নাশ
এখন, আমার উদানে বারোমাস
লভক আলো আছে বুহ রচনায় ।

•বুহের নিকটে অসুখের পীপিলিকা
নতমস্তকে নরকের কাছাকাছি
হামাগুড়ি দেয়—দর্পী আগুন শিখা
ওড়াও নগর উপনগরের মাছি ।

আমরা কবে মানিক মুখোপাধ্যায়

শীত শেষ । বসন্তের হাওয়া
দোল দিয়ে যায় পৃথিবীকে ;
কিন্তু আমাদের ঘিরে
কী যেন এক অসীম রিক্ততা
থেকে থেকে ভুলছে
হাহাকারের গুঞ্জন ।
এক বছর বেকার, হালে শুনছি
স্পেশাল কেডারের চাকরীটা
হয়তো বা হবে ।
স্ত্রীর চিঠি পাই,
টাকার তাগিদ ছাড়াও
করুণ মিনতি :
দোহাই তোমার,
একবার যেন এসো,
কতোদিন তোমায় দেখিনি ;
ছোট্ট খোকনটা ভারী ছুটু হয়েছে,
বাবার কথা প্রায়ই বলে ।

ফাল্গুনের হাওয়া বইছে
শহরে, গ্রামে ।
অথচ শুল্ক পকেট,
দিনকে মনে হয় দেশান্তরী ;
গঙ্গার ধারে সেদিন সন্ধ্যায়
যুবক স্বামীটি বউকে
সোহাগ করে বলে :
এসো, আজ এই চমৎকারের ঐশ্বর্যে
আমরা বসন্তের গান গাই ।
অস্থির হয়ে ফিরে আসি
আবার আমার সেই
পুরোনো অক্ষর আন্তানায় ;
কুঞ্চুড়ার গাছটা কিন্তু
তখনো নিম্পত্র ঝাঁড়িয়ে ।

আমরা কবে বসন্তের গান গাইবো ।

সঞ্চয়পাত্র অমলকান্তি ঘোষ

চমকে যাবে ও একদিন
ভাববে :
এ কা'র বাড়ি এলাম ।
কারণ
দরজায় আকাশী রঙের পর্দা
জানালায়
তারই ছোট আকার ।
আনি বন্ব
হুপুরে
ফেরীওয়াল এসেছিল ।

চমকে যাবে ও একদিন
কারণ
চমৎকার একটা পয়লায়
চা ঢেলে
ওর হাতে তুলে দেবো ।
বন্ব
আজ সকালে কিনেছি ।
: মাটির ছোট সঞ্চয়পাত্রটার গায়ে
হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল মেয়েটি
আর
একটু নেড়ে-চেড়ে
পয়সার শব্দ শুনছিল ।

দুটি কবিতা

অরুণাংশু দেব

। একটি অনন্ত অমুভূতি ।

মনে আমার অরের উত্তাপ,
সর্বাঙ্গে কার্পেট মসৃণতার
প্রহেলী অমুভূতি ।
সূর্য গ'লে গ'লে মাটির বুকে
বাদামী রেণুর নিবিকার প্রলেপ ।
আকাশ-কার্পেটে শুধু
মাটি বিদীর্ণ-করা উচ্ছ্বাসের চেউ ।
মনের চক্ষুণীলে আদিগন্ত-বিস্তৃত
সময় কার্পেটে ।

মনে এখন কার্পেট মসৃণতার
অমুভূতির রেশ ।
সূর্য গলে গলে আকাশের গায়
সময়-কার্পেট ।
কার্পেট-বিস্তীর্ণ মাঠে রামধনু-চোখে
গোধূলির নিমিষে নিষেধ ।

॥ অন্য অমুভব ॥

এক একটি দিন : এক একটি যুগ,
এক একটি যুগ : এক একটি ইতিহাস,
এক একটি ইতিহাস : হাজারো যুগ-পরিক্রমা ।

আর আমি ?

এক একটি দিনে বিধৃত : হাজারো যুগ-অন্বেষণ,
এক একটি কথায় বিধিত : শত শত সূর্য-নিহারিকা,
আর সেই কথাগুলো আমার ?
এক একটি ভবিত অমুভূতির রেখা ॥

আত্মচৈতন্যের বিকাশ

মানস রায়চৌধুরী

একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, মানুষজীবনের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় চিহ্ন হলো প্রতিটি মানুষের অভিন্ন ব্যক্তিত্ব (ইণ্ডিভিডুয়ালিটি)। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন হয় না। আমরা জানি যে প্রতিটি মরদেহী তার নিজস্ব অনুকরণীয় ভঙ্গীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। আমাদের নিত্যকার সামাজিক মেলামেশায় প্রতিটি ব্যক্তিত্বের এই অবিনিশ্র রূপটি সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাগরে কি স্বপ্নে সর্বসময়েই রাম ও শ্যাম, শ্যাম ও মদুর ব্যক্তিত্বের পার্থক্য আমাদের চোখে ধরা পড়ে। তেমনই অনুভবে বোঝা যায় আমাদের স্বীয় সত্তা ও অস্তিত্বের মৌল রূপটি। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কিত এই চেতন বোধটিকেই মনোবিজ্ঞানীরা বলেন আত্মচৈতন্য (সেল্ফ কনসাসনেস)। এই আত্মচৈতন্য কখনই অন্ধের দৃষ্টিগোচর নয়। অথচ আমাদের মানসলোকে এর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করা যায়। উপমার সাহায্য নিয়ে বলা যায়, এই আত্মচৈতন্য যেন একমুখী কোনো ক্ষীণ চঞ্চল আলোকরশ্মি যার বিভায়ে আমাদের অন্তর্জগত পূর্ণ আলোকিত হয় না। অথচ চৈতন্যের এই ক্ষীণ রশ্মিটুকু ছাড়া আমাদের স্বীয় অস্তিত্বের উপলব্ধি প্রায় অসম্ভব।

আরম্ভেই বলে রাখা ভালো যে আত্মচৈতন্য এবং সাধারণ চেতনাকে (কনসাসনেস) কদাচ একজাতীয় মানসিকক্রিয়া ভাবা চলবে না। বস্তুত এ-দুটি পৃথক শ্রেণীর মানসক্রিয়া। চিন্তাশাস্ত্রীদের মতে আমাদের প্রতিটি মানসিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি আত্মবোধযুক্ত নয়। আমাদের প্রতিটি চেতন অনুভূতিতে অহং তথা স্বীয় অস্তিত্বজনিত সংবেদনা জড়িয়ে থাকে না। অতএব চৈতন্য মানেই আত্মচৈতন্য নয়। তবে মনোবিজ্ঞানীদের মতে চেতনা কি? চেতনা হচ্ছে আমাদের সেই জাগরবোধ যা বস্তুজগতের অন্য কিছু প্রত্যক্ষ করায়। সজ্ঞাত একটি শিশুর মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিশু-চেতনার সেই আলো-অন্ধকার আবছায়া দিনগুলিতে কোনোকিছুই পূর্ণ অর্থবহ মনে হয় না। সবটাই যেন তীক্ষ্ণ কোলাহলে মুখর এক হুর্বোধ্য দৃশ্যপট! যেহেতু সে সময়ে আত্মচৈতন্য নিতান্তই অবাস্তব, সেকারণ পরবর্তীকালে আমাদের স্মরণে শৈশবের ছবিগুলি অস্বচ্ছতার আভাস আনে। তাছাড়া এ-সত্য তো সর্বজনবিদিত যে, জীবনের প্রথমস্তরে, শৈশবে আমাদের মনোজগতে আত্মচৈতন্য একান্তই অনুপস্থিত। ক্রমে অভিজ্ঞতার নানামুখী স্পর্শে তা স্কুরিত হয়ে ওঠে। যদিচ শুদ্ধ চেতনা বা কনসাসনেস, যত দুর্বলই হোক না কেন—জন্মের শুরুতেই বর্তমান। শৈশবে তাই আত্মরূপ বা সত্তা (সেল্ফ) সম্পর্কে কোনো বোধই থাকে না। অহরহ আমরা দেখতে পাই, শিশু তার নিজের শরীরকে ভাবে বিচিত্র খেলনা। তার নিজের হাত-পা-কে পুতুল বলে গ্রহণ করতেও তার দ্বিধা হয় না। শৈশবে আত্মবোধ সম্পূর্ণ অবর্তমান বলেই শিশুর কাছে আত্মপর ভেদাভেদ আশা করা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত শিশু-চেতনায়

স্বীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না হওয়া, ততক্ষণ তার পক্ষে বস্তুজগতের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিরূপণও সম্ভব নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, শিশুমানসে আত্মচৈতন্যের অভাব কেন। মার্কিন মনোবিজ্ঞানী গার্ডন অলপোর্ট এই প্রশ্নটির এক যুক্তিবহ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, শিশুমনে স্মৃতিশক্তির অনটনের কথা সর্বজনবিদিত। পূর্বে দেখা কোনোকিছুকে পরবর্তীকালে স্মৃতির নিরিখে পরিচিত বলে চিহ্নিত করা ছবছরের শিশুর পক্ষেও প্রায় অসম্ভব। শৈশবে স্মরণশক্তির এই অক্ষমতার কারণ হিসাবে বলা যায়, সে-বয়সের অভিজ্ঞতাগুলি ভাষায় রূপায়িত নয়। শিশু তখনও কথা বলতে শেখেনি। কোনো অভিজ্ঞতাকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করার শক্তিও তার অনায়াস। ফলে অস্তিত্বের চলমান মুহূর্ত-গুলিকে স্মৃতিতে ধরে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। শারীরতাত্ত্বিকরা অবশ্য বলেন, মস্তিষ্কের স্মৃতিগ্রাহী অংশগুলি শিশুবয়সে পূর্ণতা লাভ করে না বলেই স্মরণশক্তির ব্যাপারে শিশু এত অসহায়।

শৈশবে আত্মচৈতন্যের অভাবের অন্য একটি কারণ হলো বস্তুজগত ও অন্তর্জগত-এর ব্যবধানরেখাটি শিশুর নিকট স্পষ্ট নয়। ভাষাজ্ঞানের অভাবও তাকে এ-ব্যাপারে বিপদে ফেলে। ছবছরের শিশু প্রায়শই কথোপকথনে ‘আমি’ ‘সে’ ও ‘তুমি’-র মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটায়। আজ ও কাল-এর সময়সীমানা সে অহরহই নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। শিশুদের এ-জাতীয় সংলাপ অনেকেই শুনে থাকবেন—‘আসছে কাল আমি তপনদের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম।’ বস্তুত ব্যাকরণের সঠিক নিয়মে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার তার মধ্যে কুলায় না।

এছাড়া শৈশবে প্রকোভের অভিব্যক্তিগুলি স্বভাবতই অত্যন্ত অনিয়ন্ত্রিত ও অসংবদ্ধ। শিশু কোনো সময়েই উদ্দীপক ও ঘটনার প্রকারভেদের কথা চিন্তা করতে পারে না। একটুতেই সে হাসিতে ফেটে পড়ে, আবার পরক্ষণেই সামান্য কারণে দারুন উঁচু পর্দায় কান্না জুড়ে দেয়। বলা যায়, আবেগের ব্যাপারে শিশু সর্বদাই চরমপন্থী।

ব্যক্তিসত্তায় কেমন করে আত্মচৈতন্য বিকশিত হয়ে ওঠে, তা বহুকাল মনো-বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়বস্তু। সংবেদনপন্থী (সেনসেসনলিষ্টিক) মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, শরীরের বিভিন্ন তন্ত্র, যন্ত্র, এবং মাংসপেশী অস্থিমজ্জা থেকে উদ্ভূত সংবেদনাই আমাদের মনে আত্মবোধ জাগিয়ে তোলে। বিশেষত, মেরুদণ্ড সোজাকরে বসলে অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন একপ্রকার অনুভূতি আমাদের মনে পাখির অস্তিত্বের সংবেদন এনে দেয়। সংবেদনপন্থীদের এই ব্যাখ্যা থেকে দূরে সরে গিয়ে গেটল্ট সম্প্রদায়ভুক্ত মনোবিদ কাফ্কা রহস্যময় ভাষায় বলেছেন, স্বরূপ বা সেল্ফ ডান ও বাম, সামনে ও পিছনের মাঝখানে অবস্থিত। আমাদের প্রতিটি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা এর মধ্যে চিহ্নিত করা যায়। অতীত ও ভবিষ্যতের যথার্থ সন্ধিস্থলে এ বিরাজ করছে।

সামাজিক জীবন গড়ে ওঠার কালে মানুষ বিভিন্ন বস্তুর মাধ্যমে তার সত্তাকে অনুভব করতে পারে। এই বস্তুগুলি হলো তার শরীর, নাম, পোশাকপরিচ্ছদ, অলঙ্কার, এবং সর্বোপরি তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা। এই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা নানাপ্রকার

পরীক্ষামূলক গবেষণা চালিয়েছেন। জনৈক বিজ্ঞানী শিশুদের কয়েকটি প্রশ্ন করে, ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ সম্পর্কে তাদের ধারণা কি, তা বুঝতে চেয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত প্রশ্নগুলি এই জাতীয় :

প্রশ্ন : তুমি কে ?

উত্তর : আমি বাবুল।

প্রশ্ন : কে বাবুল ?

উত্তর : আমি।

প্রশ্ন : এটা কি বাবুল ? (তার বিছানাটির দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করে)

উত্তর : না।

এরপর বিজ্ঞানী শিশুটির দেহের নানা অংশে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—
এটা কি বাবুল ?

যথা : হাত—না। পা—না। মাথা—না। শরীর (বুকের অংশটা)—হ্যাঁ।
গলা—না।

শিশুটির উত্তরে বোঝা যায়, তার মতে শরীরের সামনের অংশটাই অর্থাৎ বুক থেকে পেট অবধি হচ্ছে ‘সে’। তার হাত-পা-মাথা ‘সে’ নয়। কয়েকদিন বাদে প্রশ্ন করে শিশুটির নিকট হতে একই জবাব পাওয়া গিয়েছিল। আরেকটি শিশুকে এ-জাতীয় প্রশ্ন করায় সে তার মাথাটিকে স্বরূপ বা সেল্ফ বলে বর্ণনা করেছিল। অন্য এক শিশুর মতে মুখমণ্ডলটাই হচ্ছে ‘সে’।

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রশ্ন করে দেখা গেছে অনেকেই মনে করেন, মুখমণ্ডল ও মস্তিষ্কের মধ্যে স্বরূপ বা সেল্ফ নিহিত আছে। জনৈক অধ্যাপক বলেন, চিন্তার সময় তাঁর স্বরূপ চোখের পিছনে মাথার মধ্যে বিরাজ করছে। কিন্তু যখন জানলার বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি নানাপ্রকার দৃশ্যবস্তু দেখতে ব্যস্ত, তখন তাঁর স্বরূপ যেন বাইরে—খানিকটা অস্পষ্টতায়। আবার খবরের কাগজ পড়ার সময় তাঁর স্বরূপ যেন ছুইচোখ ও সংবাদপত্রের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

উপরোক্ত বিজ্ঞানী কয়েকজন মনোস্তত্ত্বের ছাত্রের নিকট একটি প্রশ্নপত্র দেন। প্রশ্নপত্রটির বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে একটি ছিলো এই প্রকারের : শরীরের ভিতরে অথবা বাইরে কোনো একটি স্থান নির্দেশ করো যা একান্তভাবে তোমার পরিচয় দেয়।

উত্তরদাতাদের মধ্যে বেশিসংখ্যকই বলেছিলেন, মাথা ও মুখমণ্ডলই আমার স্বরূপ বা সেল্ফ-এর স্রোতক। চোখ, হৃদপিণ্ড এবং মস্তিষ্কের সপক্ষেও মত প্রকাশ করেন অনেকে। কেউ কেউ মাথা, চোখমুখ, হৃদপিণ্ড জননেদ্রিয় সমেত সম্পূর্ণ দেহটি সেল্ফ-এর পরিচায়ক বলে অভিমত প্রকাশ করেন। একজন বলেন, স্বরূপ বা সেল্ফ হচ্ছে এমন একটি অদৃশ্য স্থান যেখান হতে মানুষ সমস্ত পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

এই পরীক্ষাকার্যে অংশগ্রহণকারী সকলেই পাশ্চাত্যদেশের অধিবাসী। যদিচ প্রাচ্যভূখণ্ডে এবিধ কোনো গবেষণা হয়নি, তবু নিঃসন্দেহে বলা যায় মুখমণ্ডল এবং হৃদপিণ্ডকেই অধিকাংশ লোক সেল্ফ-এর বস্তুরূপ বলে ধারণা করেন।

শরীরকে বাদ দিলে, আত্মচৈতন্য বিকাশে আমাদের নামের ভূমিকাও উপেক্ষণীয় নয়। সেক্সপিয়রের সেই ক্লাসিক মন্তব্যের (‘নামে কি আসে যায়?’) অনর্থকাদা করে বলা যায় সামাজিক পটভূমিকায় নামের অনেক মূল্য আছে। বিশেষত সমাজ-জীবনে নাম হচ্ছে ব্যক্তি-সত্তার সন্ধান পথ। ‘গুরুদ্বন্দ্ববিশিষ্ট একজন সৌম্যদর্শন উপনিষদীয় কবি’ বললে কিছুই প্রকাশ পায় না—যতক্ষণ পর্যন্ত না বক্তা উচ্চারণ করেন—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বস্তুত প্রত্যেকের নামকে কেন্দ্র করে তার প্রতিবেশীদের মনে একটি ভাবের পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। নামটি সর্বদাই ঐ মানুষের সত্তার প্রতীক হিসাবে কাজ করে। খ্যাতনামাদের ক্ষেত্রে নামতো একটা সম্পদ বিশেষ। কোনো সাহিত্যসভায় শরৎচন্দ্র শব্দটি উচ্চারিত হওয়া মাত্রই শ্রোতাদের মধ্যে একটা অনুভবের স্রোত বয়ে যায়। ‘শ্রীকান্ত’ কি ‘পথের দাবী’র লেখকসত্তা যেন মুহূর্তেই সকলের মনে প্রভাব বিস্তার করে।

জন্মের পর শিশুকে যখন একটি নাম উপহার দেওয়া হয়, তখন সে তার গুরুত্ব সম্পর্কে নিতান্তই অচেতন থাকে। কিন্তু অপরের মুখে বারংবার নিজের নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরে গড়ে ওঠে একটা আত্মবোধ এবং সামাজিক বিজ্ঞানসে স্বকীয় ভূমিকাও তার জানা হয়ে যায়। ক্রমে সে বুঝতে পারে তার নাম হচ্ছে একটা পবিত্র সম্পদ। আমরা সকলেই জানি, যে অবাস্তবিত কাছ স্বনামে করা প্রায় অসম্ভব, স্বচ্ছন্দেই তা বেনামীতে সমাধা করা চলে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে নিজের পারিবারিক সীমানা পেরিয়ে বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করতে হয়। এই অপরিচিত অজ্ঞাত পরিবেশ মানুষের মনে আশ্চর্য-জনক ভাবে আত্মচৈতন্যের উদ্বোধন ঘটায়। পরিচিত পরিবেশে আমরা স্বচ্ছন্দেই মেলামেশা করতে পারি। কিন্তু এই স্বচ্ছলতায় নিজের সত্তাকেও যেন অনুভব করা যায় না। অথচ অপরিচয়ের জলধিতে আমাদের পৃথক ও স্বতন্ত্র রূপ ফুটে ওঠে। আমরা নিজেদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে শিখি। একঘর ইংরেজ-এর মাঝখানে একজন ধুতিচাদর পরা বাঙালী বারবার তার নিজের সত্তা এবং ব্যক্তি-রূপকে উপলব্ধি করতে পারে। শহরে বৈঠকখানায় মলিন বেশবাস পরা জয়নগরের চাষী প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করতে পারে তার সামাজিক পরিচয় কি।

এছাড়া পোশাক পরিচ্ছদ, মেয়েদের ক্ষেত্রে নানাপ্রকারের অলঙ্কার এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি মানুষের মনে আত্মচৈতন্য জাগিয়ে তোলে। বয়সবৃদ্ধি এবং শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যে আত্মসচেতন হয়ে ওঠেন, এ-ও আমরা দেখতে পাই। বস্তুত, শিশুদের পক্ষে আত্মবিশ্বস্ত হওয়া যেমন সহজ, প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে স্বীয় অস্তিত্বকে ভুলে থাকা তেমনই দুঃসহ।

শিশুর চেতনায় আত্মবোধ জাগ্রত হয় ধীরে ধীরে গতিতে; পরিবার তথা সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। কোনো আধিভৌতিক ঘটনার মতো আকাশ হতে আত্মচৈতন্য নেমে পড়ে না। ব্যাপক অর্থে সমাজ এবং পৃথিবীর উষ্ণ-আর্দ্র জলহাওয়া যেমন ব্যক্তিত্বের মধ্যে পরিণতি আনে, তেমনই মানুষকে করে তোলে আত্মসচেতন। যে শিশু জীবনের প্রথমাবস্থায় পোশাক ছাড়াই অপরের সঙ্গে

মেলানেশা করতে পারে, মাত্র কয়েকবছর বাদেই ছেলেবেলার সেই সব গল্পে সে লাক্ষরক্তিম হয়ে ওঠে ।

উপসংহারে বলি, শুধু বাল্যে নয় বয়ঃসন্ধিকালে, এমনকি, প্রাপ্তবয়সেও আত্মচৈতন্য জাগে নানাবিধ প্রক্ষোভ ও মানসিক আবেগের মাধ্যমে । ব্যক্তিগত গোপন ব্যর্থতার আলা, ব্যথাবেদনা, নানাপ্রকার সামাজিক অসম্মান ও উপহাস আমাদের আত্মমগ্ন করে তোলে । আর এই আত্মমগ্নতাই আত্মবোধ লাভ করার নিশ্চিত পন্থা । যন্ত্রণা-মুখর নৈঃসঙ্গ্য মনের আশিতে বারবার নিজেদের সত্তার প্রতিবিম্ব দেখতে পাই । বুঝতে পারি, সমাজজীবনে আমার ভূমিকা কতো পৃথক ও স্বতন্ত্র । আনন্দে আমরা যদি-বা আত্মহারা এবং আত্মচৈতন্যহীন—কিন্তু বেদনা সর্বদা অন্তরে দৃষ্টি ফেঁদায় । আর সেই মুহূর্তেই নিজের সীমিত ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে হৃৎকের আলোয় পুনর্বার চিনতে পারি ।

দৃষ্টিভঙ্গির রূপ পরিবর্তন

অমল হালদার

কোনো ছুঁজন সমালোচকই একজন জীবিত সাহিত্যিকের একই বই সম্পর্কে একমত হন না। একজন সমালোচক যে বইকে লেখকের সেরা সৃষ্টি বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, অন্যজন হয়ত সেই বইকেই আঁস্তাকুড়ে ফেলবার জন্যে উপদেশ দেন। কিন্তু, মজার ব্যাপার এই যে, এঁরা অতীতের সাহিত্যিক সম্পর্কে প্রায় সব সময়ই একমত। মিল্টন বা কীটসকে (অথবা কালিদাস বা জয়দেবকে) নিয়ে এঁদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। অবশ্য একথা ভাবলে ভুল করা হবে যে, এঁরা প্রাচীন সাহিত্যের গুণ-কীর্তন যান্ত্রিকভাবে করে থাকেন, এঁরা তা করতে সত্যিকারের উৎসাহ বোধ করেন বলেই মনে হয়। যখন এঁরা চলতি সাহিত্যের আলোচনা করেন তখনই বাধে সংঘর্ষ। কেন এমন হয়? হয় এই কারণে যে, আলোচ্য বই বেরিয়েছে সম্প্রতি (চসার বা সেন্সপীয়ার, ম'তাইন বা ম'পার্সা, জ্ঞানদাস বা চণ্ডীদাস সম্পর্কে এঁদের মতামত মোটামুটিভাবে স্থির)। এতে ক্ষতি হচ্ছে দু-দলের : পাঠকদের এবং লেখকদের। পাঠকদের পয়সা জলে যাচ্ছে, শ্রম ও সময়ের অপব্যয় হচ্ছে। লেখকদের দিক থেকে জিনিসটা আরও ভয়াবহ। যে লেখক অমেষ দুঃখ বরণ করে প্রস্থ রচনা করে চলেছেন, তিনি জানতেও পারছেন না তাঁর সেই সম্মানপ্রতিম রচনাগুলির ভবিষ্যৎ কি। কালের কুলোয় ঝাড়াইঝাড়াই হবার পরও তা টিকে থাকবে কি না। তিনি যেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন সাহিত্যিক অমরত্বের আশায়, তাঁকে আলো দেখাবার কেউ নেই। কাচ থেকে হীরককে আলাদা করে দেবে এমন কষ্টপাথর কোথায়?

লেখকদের কথা আপাতত থাক। বিষয়টা পাঠকদের দিক থেকেই প্রথমে বিবেচনা করা যাক, কেন না আমরা প্রত্যেকেই পাঠক, সকলেই লেখক নই। একমাত্র অসাধারণ পাঠক সাহিত্যের মধ্যে দেখতে চায় নিজেকে, নিজের আশে-পাশের আর পাঁচজনকে; নিজের যুগের ভাবধারা, ঘাত-সংঘাতকে নতুন করে পেতে চায় সাহিত্যের রসালোকে। তাই সে যদি প্রাচীনসাহিত্যের প্রতি বিমুগ্ধ হয়, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। থাক না তার ধর্মগীতে পূর্বপুরুষের শোণিত ধারা, তবু সে যে রাঙামাটির মায়াবন্ধন ছেড়ে অনেক-অনেক-পথ হেঁটে আসে এসে পৌঁছেছে এ্যাসক্যান্ট বাঁধানো রাজপথের বিহীনহৃতির মাঝখানে। এখানে এমন সমালোচক কি নেই যে তাকে অসংখ্য পণ্যসামগ্রীর বিচিত্রসত্তারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে ঠিক বিপণীতে হাঙ্গির করে দেবে?

না—নেই। কেন না অতীতে সমকালীন সমালোচনার স্বাস্থির ভুরি-ভুরি উদাহরণ আছে। কীটসকে এনডাইমন লেখার জন্যে যে নির্ভুর সমালোচনা গল্প করতে হয়েছিল তার কথা ভাবুন। যথেষ্ট আশ্রয়প্রত্যয় না থাকলে এই সৌন্দর্যের বাণীকণ্ঠ সেদিনই শুষ্ক হয়ে যেতেন। সমকালীন সমালোচনা উত্তরকালের কাছে কতদূর হান্ধকর হয়ে ওঠে তার একটা নমুনা দেখুন।

“টেম্পেটের মত, গালিভার্স ট্রাভলসের মতই ইহা (টোল্ড বাই-এ্যান-ইভিরট) অবশ্য পাঠ্য, কেন না শ্রীমতী মেকলের কবি-প্রতিভা টেম্পেট রচয়িতার মত না হইতে পারে, গালিভার্স ট্রাভলসের লেখকের মত তাহার লেখনী স্বেচ্ছায়ক না হইতে পারে, কিন্তু তাহার জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি ইহাদের কাহারও অপেক্ষা কম মহে।” ডেলি নিউজ এ-কথা যেদিন লিখেছিল তার পরের দিনই ইংরেজী সাহিত্যের একটি সুবিখ্যাত গ্রন্থ সম্পর্কে নিচের মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল মাক্লেটের গাড়িয়ানে। “পরিশেষে এই কথাই বলতে হয় যে শ্রীযুক্ত এলিয়ট যদি সাধারণের ভাষায় তাঁর ‘ওয়েটে ল্যাও’ লিখিতেন,—তাহলে হয়ত তা ‘ওয়েটে পেপার’ (অবশ্য নতুর্বিদ্ ও পণ্ডিতদের কাছ ছাড়া) হয়ে উঠত না...”

প্রশংসানিদার এই জলপ্রপাতের নাম সমসাময়িক সমালোচনা। সমালোচকরা যে অপরাধ করে থাকেন জীবিত লেখকদের কাছে, তা যদি তাঁরা করতেন অতীতের কবি-সাহিত্যিকদের কাছে তাহলে দু’দিনেই তাঁদের সমস্ত খ্যাতি ম্লান হয়ে যেত। সমকালীন সমালোচকরা পথ-নির্দেশ করতে পারেন না। তাঁরা শুধু এই বলে উপদেশ দিতে পারেন যে, আপন সংজ্ঞাকে অনুসরণ কর, কোনো জীবিত সমালোচকের মতামতের কাছে আত্মসমর্পণ না-করে অতীতের সেরা সৃষ্টিগুলিকে বার-বার পড় এবং নিজের মত করে ‘সাহিত্যিক সৃষ্টি’ সম্পর্কে একটা ধারণা করে নাও।

এ-কাজ পাঠকের পক্ষে সত্যিই দুর্লভ, এ কাজ পাঠকের নয়, সমালোচকেরই। কিন্তু তেমন সমালোচক কোথায়, যাকে নির্ভয়ে নির্ভর করা চলে? মতানৈক্য যে থাকবে না তা নয়, তর্ক-বিতর্কও হবে, কিন্তু এমন একজনও থাকবেন যিনি সন্তা নিন্দা সাধুবাদের উর্ধ্বে থেকে সত্যিই রচনার গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম।

পুস্তক পরিচেষ্টা আমাদের আছে, কিন্তু সাহিত্যসমালোচক আমাদের নেই। পুলিশের ধরপাকড় আছে, কিন্তু যথেষ্ট জ্ঞানবুরিসম্পন্ন বিচারকের অভাব আছে। অবশ্য এর কারণও আছে। সাহিত্যিক যেমন, তেমনই সমালোচকও হাজারে হাজারে জন্মায় না বরং প্রথমশ্রেণীর সমালোচকের সংখ্যা অনেক কম। কারণ যে-কোনো সমালোচকত্ব শেষ কসল হোল সমালোচক। সমালোচকের পুষ্টির জন্যে চাই খাদ্য, সে-খাদ্য হোল সাহিত্য। সাহিত্য নেই, সমালোচক আছে, এ অসম্ভব ব্যাপার।

আজকের দিনে শুধু আমাদের এইটুকু স্বীকার করলেই চলবে না যে, আমরা একই বই সম্পর্কে একমত নই।

আমাদের এ-কথাও ভেবে দেখতে হবে, যা নিয়ে আমাদের তর্কযুদ্ধ তাকে আদৌ গ্রন্থ আখ্যা দেব কি না। তা কি গ্রন্থ, না গ্রন্থের ভগ্নাংশ? এ যুগটাই ভগ্নাংশের। হয়ত কবিতার কয়েকটা স্তবক, প্রবন্ধের কয়েক পৃষ্ঠা, উপন্যাসের একটা ছোটো পরিচ্ছেদ, হয়ত কোনোটার শুরু বা কোনোটার শেষ, পুর্বসূরীদের সাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয়।

মনে হয় প্রতিভার যুগের পরই শুরু হয় প্রবন্ধের যুগ, স্বাভাবিক প্রাচুর্যের পর কষ্টাঙ্কিত কণ্ঠতা। অবশ্য এরও প্রয়োজন আছে। গৃহনির্মাণের মত গৃহসংরক্ষণও একটি প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় কাজ।

অতীতকে আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি, কিন্তু ভালবাসতে পারি না। বর্তমান

নিজের অযোগ্য সন্তানের মত, গালমন্দ তাকে করতে পারি। কিন্তু ভাল তাকেই বাসি, পরের ছেলেকে নয়। বর্তমানকে নিয়েই আমাদের চলতে হবে, অতীতকে নিয়ে নয়। তাই নতুন বই দেখলেই সেদিকে মন ছোটে এই আশায় যে, তার মধ্যে একাল সেকালের দূরত্বকে, আমার কালের অনন্ত মৌলিকতাকে প্রতিফলিত দেখব। কিন্তু হতাশাই। প্রেমের পর প্রেম শেষ করে দেখি অসফল সম্ভাবনাকে, গভীরতার একান্ত অভাবকে, আর পরিচয় পাই বিভিন্ন কোণ থেকে দেখা বিস্তৃত পরিধির ও বিচিত্র জীবনের, সাহিত্যের রসভাসে যা বাস্তব হয়ে উঠতে পারল না। তাই একইসঙ্গে উৎসাহবোধ করি এবং হতাশাই।

বাধ্য হয়েই অতীতের পানে তাকাতে হয়। নিত্যের পাশে অনিত্যকে রেখে তার মূল্যায়ণ করবার চেষ্টা করি।

এ ছ'য়ের মধ্যকার বিরাট ব্যবধান দেখে বিস্মিত হতে হয়। জানি মহৎ সাহিত্যের জৌলুস থাকে না, তাতে পাঠককে অবাক করে দেবার প্রয়াস নেই, তবু প্রাচীন সাহিত্য বড় একঘেঁয়ে লাগে। আধুনিক সাহিত্যের ব্যক্তিমানসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতি, ভাবনা-ধারণা কোথায় সেখানে? প্রাচীন সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিও আধুনিক মনকে ভরাতে পারে না। তবু তাদের অধিকাংশের মধ্যেই আছে একটি শাস্ত উপাদান যা আজও আমাদের আকর্ষণ করে।

সৃষ্টির এই চিরন্তনতার উৎসটি কোথায়?

লেখার অমরত্বের বীজ রয়েছে লেখকের প্রত্যয়ের মধ্যে। এই সব কালজয়ী রচনার লেখকেরা বিশ্বাস করতেন যে, জীবন একটি বাস্তব সত্য—যদিও এঁদের কেউই জীবনের বাস্তবতা প্রমাণ করবার জন্তে উঠে পড়ে লাগেননি। আমাদের নিষ্পদের বক্তব্যের সত্যতায় বিশ্বাস করতে হবে, বাকিটুকু আপনি আসবে। আমাদের এ-বিশ্বাস থাকা চাই যে, আমার কথা অস্ত্রেরও কথা, আমি যা জানি সত্য করেই জানি।

এ-কালের লেখকেরা বিশ্বাস করতে ভুলে গেছেন। তাই তাঁরা তাঁদের অন্তরকে সাধারণের করে তুলতে পারেন না। ওয়র এণ্ড পিসের মত মাস্টার পিস রচনার আশাও তাঁরা করতে পারেন না। তাঁদের কাব্য, নাটক, উপন্যাস জীবনের রসভাষা নয়, চীকাভাষা মাত্র। ফুলমাস্টার মহাকালের হাতে পড়লে এই সাহিত্য প্রকৃষ্ণগুলি লালকালির দাগে কণ্টকিত হয়ে উঠবে, তবে তিনি এগুলিকে আঁতাকুড়ে ফেলবেন এমন মনে হয় না, বরং পরবর্তী কালের ছাত্রদের সামনে মেলে ধরবার জন্তে নিজের কাছে রেখে দেবেন। আজকের চীকাকাব্যের থেকে জন্ম নেবে আগামীকালের মাস্টারপিস, আজকের ভগ্নাংশ থেকে আগহেদিনের সম্পূর্ণতা।

সমালোচকদের কাছে শুধু এই অনুরোধ, প্রচলিত ধারার অক্ষথা করে তাঁরা যেন একটু উদার হন, আধুনিক সাহিত্যের প্রতি বিরূপতা ত্যাগ করে তাঁরা যেন আজকের সাহিত্যকে এক অন্তহীন সাহিত্যধারার তরঙ্গ বলেই মনে করেন। নিম্নোক্তান অটোলিকার সকল শিল্পীই কিছু অমর হয়ে থাকবেন না, কিন্তু তাঁরা যেন মালাচন্দন হাতে নিয়ে দূরদিগন্তের পানে নেল রাখেন তাঁদের জাগর-দৃষ্টি যাতে নতুন সৃষ্টিকে আগেভাগেই আহ্বান করে আনতে পারেন।

মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে অপরাধীর শ্রেণী বিভাগ

প্রমোদ রায়

যে কোনো অপরাধ অপরাধীর মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করে। হত্যার পশ্চাতে কোনো কারণ থাকুক আর নাই থাকুক, বর্তমানে কোনো সভাদেশ অপরাধীকে ক্ষমার চক্ষে দেখে না; একমাত্র উন্মাদই শাস্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পায়। অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়া দেখিতে গেলে মনোবৈজ্ঞানিকগণ যে কোনো অপরাধীর মনোবৃত্তি, আবেগ ও উচ্ছ্বাস বিশ্লেষণ করিয়া অপরাধ নিবারণ করিবার বিধান দেন। এই জন্যই বিভিন্ন অপরাধ ও অপরাধীর বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান রাখা উচিত। রোগের প্রকৃত কারণ এবং রোগ কি যদি জানিতে পারা না গেল, তবে রোগ নিরাময় করা যাইবে কি উপায়ে। অপরাধের প্রকৃতি ও অপরাধীর মনোবৃত্তির সত্যক উপলব্ধির উপরই অপরাধ নিবারণ নির্ভর করে। ১৯৫৪ সনের ১০ই অক্টোবর স্টেটস্ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত ডাঃ কাটজুর দীনপত্নীর আলোচ্য বিষয়ের তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া লেখক এই আলোচনায় তাহার সাহায্য লইয়াছেন। আইন ব্যবসায় অভিজ্ঞ ডাঃ কাটজুর বেশ অশ্রুভব করিতে পারিয়াছিলেন যে, অনেক সময় আইনই অপরাধীর সৃষ্টি করে।

রেমণ্ডের বর্ণিত অপরাধীর পন্থি (সাইকোলজিকাল টাইপস্ অব ক্রাইমস্) হইতে এই আলোচ্য বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। পাঠকদিগের সুবিধার জন্য রেমণ্ড-এর প্রবন্ধকে, এই স্থলে লেখকের দ্বারা বহুলাংশে বর্ধিত ও পরিবর্তিত করা হইয়াছে।

॥ বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধী ॥

অপরাধীদিগের সংশোধন এবং ভবিষ্যতে তাহাদের অপরাধমূলক কার্যাবলীর নিবারণ করিবার জন্য অপরাধীদিগের অস্থিতার (পার্সনালিটি) জ্ঞান অবশ্যই প্রয়োজন। অপরাধীদিগের শ্রেণীবিভাগ নিম্নে দেওয়া হইল।

॥ আকস্মিক অপরাধী ॥

সাধারণের বিশ্বাস অনুসারে যে-সব ব্যক্তি ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ করে তাহাদিগকে আকস্মিক অপরাধী বলে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো সুরাপায়ী ব্যক্তি গাড়ী চালাইতে গিয়া কোনো ব্যক্তিকে চাপা দিল। এই ক্ষেত্রে গাড়ী চালকের লোকটিকে হত্যা করিবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। ইহা ব্যতীত অন্য একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে।

মনঃসমীক্ষ গবেষকগণ দেখিয়াছেন যে, কোনো আকস্মিক অপরাধী আইনের চক্ষে দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইলেও, মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে অপরাধী নয়। প্রায়ই বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, কোনো অপরাধী ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো দোষ করিলেও তাহার মনের গভীরতম আবেগ, উন্মাদই তাহাকে প্রেরণা দেয়। গভীরতম অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষাই অপরাধ কার্যাবলীর হেতু হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদিগের মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো জ্ঞান নাই, তাহাদিগের নিকট এইরূপ একটি যুক্তি হাস্যকর ও

অতিরঞ্জিত মনে হইবে। লেখক কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা এই বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধ ও অপরাধীদিগের চিত্র সুন্দর করিয়া সকলের বোধগম্য করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন।

আত্মহত্যাই সর্বাপেক্ষা উত্তম উদাহরণ। কেহই এই সুন্দর পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে চায় না; কিন্তু মনের গভীরতম আবেগ উদ্ভ্রাস ও আকস্মিক উন্মাদনা অথবা কখনও ইচ্ছাকৃত ভাবেই এইরূপ অপরাধ ঘটয়া থাকে।

৯৮ বৎসর বসন্ত যুদ্ধ দার্শনিক জেনো পড়িয়া গিয়া পায়ের যুদ্ধ-অঙুলি হারাইয়া ফেলেন। ইহাতে তিনি এতদূর অভিভূত হইয়া পড়েন যে, আত্মহত্যা করিয়া এই পৃথিবীর সঙ্গে সম্বন্ধ চুকাইয়া দেন। এই সম্বন্ধে অন্য একটি চিত্তাকর্ষক উদাহরণ উল্লেখ করা হইল। ইহা ১৯৩৪ সনের ২০শে মার্চ টাইমস্ পত্রিকা হইতে লওয়া হইয়াছে।

মিসেস্ জন কুলজুস্কি, মিষ্টার কুলজুস্কিকে বলিলেন, “তুমি গৃহের বাহিরে যাইয়া কোনো একটি আকস্মিক ঘটনার সহিত জড়িত হইয়া পড়”। তিনি তাহাই করিলেন এবং একটি পা হারাইলেন। পুনরায় মিসেস্ কুলজুস্কি তাহার স্বামীকে বলিলেন, “আমি ইচ্ছা করি তুমি অপর একটি পা হারাইয়া ফেলো”। অগত্যা তিনি তাহাই করিলেন। মিসেস্ কুলজুস্কি এইরূপ অপর কোনো ইচ্ছা প্রকাশ না-করেন তাহার জন্য তিনি বিবাহবিচ্ছেদের সুযোগ খুজিতে লাগিলেন।

কে, এল, গ্যুবার-এর ‘ফেমাস্ ট্রায়ালস্ ফর লাভ এণ্ড মার্ডার’-হইতে অনন্ত রুনাগৎ-এর অদ্ভুত জীবনেতিহাসের পরিচয় দেওয়া হইল। অনন্ত এবং তাহার স্ত্রী পুত্র শোকে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়েন। এই পুত্র শোক হইতে উপশম লাভ করিবার জন্য তাহার উভয়েই আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করেন। অনন্ত প্রথমে নিজেকে হত্যা করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু তাহার স্ত্রী ইহাতে বাধা দেন। স্ত্রী প্রথমে তাহাকে হত্যা করিতে অনুরোধ করেন। এইরূপে কে প্রথমে জীবনাবসান করিবে এই ব্যাপারটি স্থির না হওয়ার জন্য তাহাদের আত্মহত্যা সাময়িকভাবে স্থগিত রহিল। অল্প কিছুদিন পরে পুনরায় তাহারা আত্মহত্যা করিবার সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। অনন্ত স্ত্রীকে একটি ধারাল অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করিল। কিন্তু সে নিজেকে হত্যা করিতে পারিল না, এবং নিজ ভ্রাতাকে পুলিশ ডাকিবার জন্য অনুরোধ করিল। অনন্ত নিজেই নিজেকে অপরাধী প্রমাণিত করিল এবং কঁাসির মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। এই ঘটনা হইতেই তাহার অবচেতন মনের প্রভাব নিজেকে হত্যা করিবার ইচ্ছা প্রকাশিত হইল।

এই সকল উদাহরণ হইতে প্রমাণিত হয় যে, কতকগুলি ঘটনাবলী এবং সুযোগই আত্মনাশক কার্যে রূপান্তরিত হয়। অবচেতন মনের আবেগ যাহা এইরূপ কার্যাবলীর প্রেরণা যোগায় তাহা একমাত্র মনঃসমীক্ষণের দ্বারা দূরীভূত হইতে পারে।

॥ অবস্থা বিশেষে অপরাধী ॥

অবস্থা বিশেষে অপরাধিগণ অর্থাৎ যাহারা পারিপাশ্বিক অবস্থার চাপে পড়িয়া দুর্ভাগ্য করে তাহারা নিম্নদিগের কুকার্যের জন্য সম্পূর্ণরূপে সচেতন থাকে। তাহার বিকৃত অস্থিতা যাহা বাহ্যিক ঘটনাবলীর চাহিদার চাপে সামাজিক ক্রিয়া (বিহেভিয়র) হইতে ব্যত্যয় ঘটায় তাহারা নিজস্ব যুক্তি দিয়া তাহার সত্যতা প্রমাণ করিতে চায়। এই ধরনের অপরাধের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া গেল।

জিন ভালজীন তাহার ভ্রাতৃপুত্রের জীবন রক্ষার জন্য একটা টুকরা পাউরুটি চুরি করিয়াছিলেন।

পেবলো নামে জনৈক মেক্সিকেনবাসী দক্ষিণপ্রদেশে মুজুরী খাটিবার জন্য আসে। অল্প কয়দিন কাজ করিবার পরে তাহার অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায় এবং আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে। অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হইয়া তিনি একটি গৃহে অর্থের সন্ধানে প্রবেশ করিলেন।

বিখ্যাত অপরাধী ম্যাক্স একদিন তাহার কন্টার হাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে শুনিতে পাইল। ম্যাক্সকে তৎক্ষণাৎ একজন বিশেষজ্ঞের নিকট তাহার কন্টার লইয়া যাইতে বলা হইল। বিশেষজ্ঞ তাহার নিকট অর্থের দাবী করিলেন। অর্থশূন্য ম্যাক্স বিশেষজ্ঞকে একটি জাল চেক দিল। চেকটি ভাঙ্গাইতে গিয়া জাল বলিয়া প্রমাণিত হইল এবং ম্যাক্স দোষী সাব্যস্ত হইলেন।

এই স্থলে ম্যাক্স তাহার কুকার্যের কি ফলাফল হইতে পারে তাহা জানিয়াও এইরূপ অপরাধ করিতে ইচ্ছুক হইল।

এইরূপ অপরাধীদের কুকার্যের বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহারা অদূরদর্শী এবং সাধারণ নাগরিকের ন্যায় পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া চলিতে পারে না। এইরূপ অপরাধিগণ পারিপার্শ্বিক বিপর্যয়ের সময় দূরদৃষ্টি হারাইয়া কেলে।

বর্তমানযুগের অপরাধবিদগণের মতানুযায়ী দুইটি বিশেষ কারণ প্রত্যেক অপরাধীর জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। বংশগতধারা এবং পরিবেষ্টনীর প্রভাব। এই দুইটি মূলত অপরাধীজীবনের সহিত জড়িত থাকে। লেখকের মতানুসারে অবস্থাবিশেষ অপরাধীদের ক্ষেত্রে বংশপরম্পরার প্রভাব অত্যধিক ক্রিয়াশীল হয়।

এই সকল অপরাধীদিগের বিশেষ বিশেষ কর্মের ব্যবস্থা এবং মনোবৈজ্ঞানিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ দিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত।

II দায়িত্বহীন অপরাধী II

এমেন্ট ও ডিমেন্ট এই পর্যায়ে স্থান পায়। মানসিক অসম্পূর্ণতাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে এমেন্ট বলে। ইহা সাধারণত জন্মের প্রারম্ভ হইতে বিকৃত গুত্রকীট এবং মস্তিষ্কে কোনোরূপ আঘাতের জন্য হইয়া থাকে। অন্তদিকে ডিমেন্টগণের জন্ম সময়ে মানসিক বর্ধন সম্পূর্ণ থাকে, কিন্তু, পরে মস্তিষ্ক বিকৃতি এবং মস্তিষ্কে আঘাতের জন্য হইয়া থাকে।

ডাঃ গব্রিয়েল সংখ্যানুযায়ী মানসিক অসম্পূর্ণতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বহুবিধ অপরাধ করিয়া থাকে এবং নিম্নে তাহা দেখানো হইল।

১। অগ্নীকাণ্ড	৫২.৯
২। ইচ্ছাকৃত অনিষ্ট করা	২২.২
৩। গৃহদাহ	১৬.৭
৪। ধর্ষণ, শিশু	১৫.৮
৫। বলপূর্বক ডাকাতি	১৫.৬
৬। অস্বাভাবিক যৌনঅপরাধ	১৪.০

৭।	কালাবাজার	১৪'৩
৮।	প্রবন্ধনা	১২'৮
৯।	চৌধুরী	১১'৮
১০।	অপহরণার্থে রজনীতে গৃহে প্রবেশ	১০'০
১১।	হত্যা এবং হত্যার চেষ্টা	৯'৫
১২।	ধর্ষণ, বয়স	৬'৭

ডব্লিউ, কে, এবং কে, এল-এর জীবনচিহ্ন এই সকল দুষ্কার্যের পশ্চাতে অদ্ভুত মানসিক প্রযুক্তির পরিচয় দেয়।

দশ বৎসরের ছেলে ডব্লিউ, কে, ট্রেনে পকেটমার হিসাবে ধরা পড়ে। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে যে তাহার মাতাই একরূপ ছোর করিয়া ট্রেনে কোনো এক মহিলার মালপত্র চুরি করিবার প্রেরণা দিয়াছিলেন। পুলিশ তাহার বিবরণীর সত্যতায় সন্দেহান হইয়া উঠে। এই সময় স্কুলবোর্ডের জনৈক কর্মচারী তাহার মানসিক অসম্পূর্ণতার কথা প্রকাশ করেন।

(মটোলএও) ২৮ বৎসর বয়স্ক এক তরুণ যুবক হইলেও তাহার মানস-বয়স দশ বৎসরের ছিল। মাত্র নয় বৎসর বয়স হইতেই তাহার অপরাধমূলক মনোবৃত্তি দেখা দেয়। সে বহু অপরাধ করে এবং অবশেষে তাহাকে আটক করিয়া রাখিবার আদেশ দেওয়া হয়। একবৎসর পরে তাহাকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার সুবিধা দেওয়া হয়।

একদিন সে একটি গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। তথায় একটি মাত্র স্ত্রীলোক ছিলেন। সে স্ত্রীলোকটিকে তাহার পরিধেয় বস্ত্র সেলাই করিয়া দিতে বলে। স্ত্রীলোকটি তাহাই করিলেন। অকস্মাৎ স্ত্রীলোকটি পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলে সে একটি কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা স্ত্রীলোকটির মস্তক এবং হাত ভাঙ্গিয়া ফেলে।

ইহা বেশ ভালভাবে ধরা হয় যে, সাধারণ চেষ্টিত বিকল্প (বিহেডিয়র ডিসঅর্ডার) হইতেই তরুণবয়স্ক অপরাধীর সৃষ্টি হয়। অতএব এই তরুণবয়স্কের চুক্তিয়া বাহাতে ভয়াবহ আকার ধারণ না-করে তাহার জ্ঞান মনোবিশ্লেষণ ও সামাজিক শিক্ষা দ্বারা তাহাদের সংশোধন করিতে হইবে।

II. স্নায়বিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি II

স্নায়বিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সর্বদাই তাহাদের আকাঙ্ক্ষার সহিত হস্ত করিয়া চলে। সে জানে না কি জন্তে এবং কেন এইরূপ করিতেছে। এমন কি তাহার মনে যে একটা হস্ত চলিতেছে ইহাও সে জানে না। বহুক্ষেত্রে এই অজানা অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষার সহিত হস্ত করিতে গিয়া অনেক সময় সে অপরাধ করিয়া বসে। আত্মসচেতন ও বিবেচক স্নায়বিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যখন কোনো জঘন্য অপরাধ করিয়া বসে, বুঝিতে হইবে যে, তাহার দোষী মনকে শান্ত করিবার জন্তই সে এইরূপ অপরাধ করিয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ মনোবিকারজনিত চুরির কথা বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ আবেশবশত চুরি করিয়া থাকে। সাধারণ মানসিক অবস্থায় তাহারা চুরি করে না। স্নায়ুবিকারগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সর্বদাই নিম্ন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়া থাকে। নিচের উদাহরণগুলির দ্বারা ইহা বোধগম্য হইবে।

একটি ভদ্র কেরানী মস্তপান করিতে আরম্ভ করে এবং দ্রীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সুরাপায়ী অবস্থায় তাহার প্রেতিবেশী একটি পুলিশ কর্মচারীর গৃহে প্রবেশ করিয়া একটি বন্দুক চুরি করে এবং অত্র একটি গুদামে প্রবেশ করিয়া একটি মোটর গাড়ী চুরি করে। তারপর কোনো প্রকারে রাত্রি যাপন করিয়া, প্রাতে পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করে। ৪৭ বৎসর বয়সে তিনি এই পথের পথিক হন। সুরাপান অভ্যাস ব্যতীত, তাহার স্মৃতিশক্তি ও আতঙ্ক ও অশুকষিতার প্রভাব ছিল।

কে. এল, গ্যাবার-এর পুস্তক ফেনাস্ ট্রায়ালস্ ফর লাভ্ এ্যাণ্ড মার্ডার হইতে সমসদ বাইয়ের হত্যা সম্বন্ধে অত্র একটি স্নায়বিক রোগগ্রস্ত লোকের মানসিক স্থানের উদাহরণ দেওয়া হইল। খাদ্-এ ১৯১১ খঃ নবাব মহম্মদ নওয়াজ খানের জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পঞ্চাবের একটি বিস্তীর্ণ জমিদারী উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন। তিনি এটিম্মন কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। পড়াশুনায় বিশেষ মেধাবী না হইলেও বন্ধুদের প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৯৪১ সনে তিনি চিকিৎসার্থে লাহোরে আসেন এবং বিখ্যাত সুন্দরী বাইজী সমসদ বাইয়ের সহিত পরিচিত হন। তিনি তাহার রূপে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া ১৭০০ শত টাকা দিয়া তাহার সহিত একরাত্র যাপন করেন ও স্বীকৃত্যে লইয়া যান। ইহাদের পরিচয়ের-মাত্র দুদিন পরে একটি সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে। একদিন অকস্মাৎ রাত্রে ভৃত্যেরা প্রভুর কামরা হইতে আর্ডনাপ শুনিতে পাইল, কামরার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল যে নবাব মৃত সমসদবাইয়ের দেহ আকড়াইয়া পড়িয়া আছেন এবং পার্শ্বে একটি রিডলবার। পুলিশের আগমনেও নবাবের কোনোরূপ চাক্ষু্য দেখা দিল না। এই শ্রেণীর স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মৃতদেহের প্রতি যৌন আকর্ষণকে শবকার বলে।

নিস্তবৎ লক্ষিতা একটি ২২ বৎসর বয়স্ক মহিলা বেশ ভীত হইয়া কাম-শীতলতার চিকিৎসার্থে আসেন। তিনি আরসংঘন হারাইয়া অত্যন্ত খিট্‌খিটে মেজাজী হইয়া পড়েন। তিনি মনোবিকার জনিত চুরি করিবার অভিযোগের কথা স্বীকার করেন। বাড়িতে মিষ্টি এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চুরি করারও তাহার অভিযোগ ছিল। সাধাদিগের পয়সা কড়িও চুরি করিতেন। এবং দোকানদারের অল্পপস্থিতিতে চুরি করিবারও অভিযোগ তার ছিল। টাকা পয়সা ব্যয় করিবার দিকে খুব বেশি মন দিতেন না। চুরির টাকা সাধারণত মিষ্টি দ্রব্যাদি খাইয়া অথবা ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ খেলাধুলা দেখিয়া খরচ করিয়া ফেলিতেন। তিনি বলিতেন যখনই তাহার মনে চুরি করিবার ইচ্ছা জন্মিত, তখন সমস্ত কিছুই তিনি ভুলিয়া যাইতেন এবং কি উপায়ে বেশ বুদ্ধিমানের মত চুরি করিতে পারিবেন, ইহাই তাহার চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইত। চুরি করিয়া তিনি বেশ আনন্দ পাইতেন। সময় সময় নিজের চুরি করিবার অদম্য স্পৃহা দমন করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু বিশেষ ফল হইত না।

এই স্নায়বিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে মনঃসমীক্ষণ ও মনঃচিকিৎসা দ্বারা নিরাময় করা যাইতে পারে।

॥ বাতুল অপরাধী ॥

এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সাধারণত সন্দিক্টিত হয়। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রকার বাতুলতার লক্ষণ দেখা যায়। ইহারা মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তি নয়। ইহারা কোনো-প্রকারে সমাজের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলে এবং উন্মাদনিকেতন হইতে দূরে থাকিতে সক্ষম হয়। আন্তরিকতা, অসঙ্গতি এবং ব্রমবাতুলতা প্রভৃতি লক্ষণগুলি দেখা যায়।

অন্যকথায় এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অনেকক্ষেত্রে মানসিক অপরিণত বয়স্ক এবং বাহ্যিকভাবে হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহারা অপরের দ্বারা নিজেদিগের অনিষ্টের দ্বারা বিশ্বাসে আত্মবিশ্বাস। হীনমন্ত্যতার জন্য অন্য ব্যক্তির কর্মে অবিশ্বাসী হইয়া কখন কখন আশাভীত এবং অসংযত কর্ম করিয়া ফেলে।

লেখক মনে করেন হিটলারের বাতুল অস্থিতাই সর্বাপেক্ষা উত্তম উদাহরণ। হিটলার নিজের হাতে গড়া নব্য জার্মানীকে ধ্বংসের পথে লইয়া যান। লেখক ডেসনদ ইয়ং লিখিত রোমেল পুস্তক পাঠ করিয়াছেন। এই পুস্তকে বর্ণিত হিটলারের জীবনচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, হিটলার একপ্রকার বাতুলরোগগ্রস্ত ব্যক্তি ছিলেন। এই রোগকে ইংরাজীতে বলা হয় প্যারানয়েড। তিনি সর্বদাই অন্যের হাতে ধ্বংস হইয়া যাইবার ভয়ে ভীত থাকিতেন। মানসিক দুর্বলতা পূরণের জন্য তিনি তাহার এই দ্বন্দ্ব ধারণা অন্যের উপর আরোপন করিতেন এবং প্রত্যেককেই শত্রু বলিয়া গণ্য করিতেন। অন্য কথায় এই রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে প্যারানয়েড রোগের ভাবাবেগ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান যুগের গবেষকগণের মতামতমতে মনঃসনীকা, মনোচিকিৎসা, ও মনোরোগবিজ্ঞা প্রভৃতি বিজ্ঞা দ্বারা এই রোগীদিগের চিকিৎসা করা যাইতে পারে।

॥ পেশাদার অপরাধী ॥

এই শ্রেণীর অপরাধিগণ বায়ুরোগের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হইতেছে যে বহু প্রকার অপরাধ করিলেও ইহারা শাস্তির হাত হইতে নিস্তার পাইয়া যায়। পেশাদার অপরাধিগণ কদাচিত্ত কারাগারে যায় এবং যাইলেও বেশিদিন সেখানে থাকে না। সে তাহার অপরাধের সামাজিক তাৎপর্যতা বেশ বুঝিতে পারে। 'ইহা বুঝিয়াও সে অপরাধ করাই ভাবিকা নির্দাহের পন্থা হিসাবে অবলম্বন করে। কেহ যদি এই পেশাদার অপরাধীদিগের সম্বন্ধে আরও পড়িতে ইচ্ছুক হন, তাহারা কনভেলস লিখিত "পেশাদার অপরাধী" (প্রফেসনাল থিভস) পুস্তক আলোচনা করিবেন। ইহা ব্যতীত নরড্যাল মরিস এই পেশাদার অপরাধীদের সম্বন্ধে বহু উল্লেখযোগ্য চিত্তাকর্ষক উদাহরণ দিয়াছেন।

৪০ বৎসর বয়স্ক আর্থার চার বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। রজনীতে গৃহে প্রবেশ করিয়া চুরি করাই তাহার শেষ অপরাধ। মাত্র ২৮ বৎসর বয়স হইতেই তিনি পেশাদারী অপরাধী জীবন আরম্ভ করেন। ১৯২৭ সন হইতে তিনি কিছুদিনের জন্য কারাগারের বাহিরে ছিলেন এবং কারাগার হইতে ছাড়া পাইবার কিছুদিনের মধ্যেই পুনরায় আর একটি অপরাধ করেন। মোটমোট তাহাকে ১৩ বার শাস্তি দেওয়া হয় এবং মোট ৭০টি অপরাধ তিনি করেন।

৬ হাইকোরওয়াল ভারতীয় অপরাধী আদিবাসী জাতিগুলির উপর গবেষণা করিয়াছেন, তাহার মতে সরকারী এবং বেসরকারী সংগঠনের সাহায্যে আর এই অপরাধী আদিবাসীদিগের অপরাধ করিবার স্পৃহা এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং তাহারা সুখে বাস করিতেছে। এই আদিবাসীগণ যখন ভ্রাম্যমান যাবাবর জীবন শেষ করিয়া কৃষিজীবী হয়, তখন তাহারা আর অপরাধমূলক কার্য করে না।

॥ মনোবিকার রোগগ্রস্ত অপরাধী ॥

এই শ্রেণীর অপরাধীগণ তাহাদের চুক্তির প্রতি সচেতন থাকে। অপরিণত অস্থিতা ও আবেগবশত এইরূপ অববেচকের মত কাজ করিয়া থাকে। নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণগুলি হইতে এই মনোবিকার রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের অদ্ভুত অস্থিতার পরিচয় পায়।

বের্গ-এর লিখিত স্যাডিস্ট পুস্তক হইতে পিটারকুরটেন-এর বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যের বিবরণ দেওয়া হইল। বিবাহিত পিটার ১৮৯৯ ১৯৩০ সালের মধ্যে মোট ৭০টি অপরাধ করে। ইহার মধ্যে অগ্নিসংযোগ, গলাটিপিয়া হত্যা করা, ছুরিকাঘাতে হত্যা করা, এবং হত্যা প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যাই প্রধান। শিশু, বয়স্কাস্ত্রীলোক ও পুরুষ কেহই তাহার হাত হইতে নিস্তার পায় নাই। পিটারের নিজের কথায়, “আমার বাসস্থানের নিকটেই শিকারের অন্বেষণে ঘুরিতেছিলাম। পকেটে একটি মাত্র কাঁচি মরল ছিল। প্রায় সন্ধ্যানাগাদ দূরে একটি স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়া উচ্চৈশ্বরে তাহাকে ধানিতে বলিলাম এবং কোনোরূপ শব্দ করিতে নিষেধ করিয়া নির্দয়ভাবে কাঁচির আঘাতে স্ত্রীলোকটিকে সাংঘাতিকভাবে আহত করিয়া অচেতন অবস্থায় তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিলাম”।

ডনেল-এর পুস্তক ‘দি ওয়ার্ল্ড্‌স্ ওয়ারস্ট ওম্যান’ হইতে অন্য একটি অপরাধীর ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস দেওয়া হইল।

অপরাধীদিগের জীবনেতিহাসের মধ্যে জীন উইভার-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার স্থান সাধারণ হত্যাকারীদিগের অনেক উর্ধ্বে। অর্থের প্রলোভনে তিনি হত্যা করেন নাই। যৌন-লিপ্সা ও যৌন-আবেগ তাহাকে এই হত্যার পথে লইয়া যাইত। সাত মাস হইতে সাত বৎসরের অসহায় শিশুরাই তাহার অপরাধের শিকার ছিল। পর পর ছটি হত্যা করিয়া দুইবার দণ্ডিত হইয়াও তিনি আরও একটি শিশুকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেন। ঘটনাটি ঘটে একটি সরাইখানায়। মাদাম পরিওট তাহার শিশুকে জীনের নিকট শয়ন করিতে অনুমতি দেন।

কারমোট নাম্নী এক ভদ্রমহিলাও সেই সরাইখানায় ছিলেন। মধ্যরাত্রে তিনি একটি অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পাইলেন। দরজা খুলিয়া খুঁজিতে পারিলেন যে জীনের কামরা হইতে গোঙানির শব্দ আসিতেছে। কপাট খুলিয়া দেখিলেন যে জীনের শয্যাতে বালকটি মাথা কত করিয়া পড়িয়া আছে ও মুখগহ্বর হইতে রক্তপাত হইতেছে। তিনি জীনকে টানিলেন ও তাহার অদ্ভুত বিভীষিকাময় অবয়ব দর্শনে ভীত হইলেন।

আরেকটি উদাহরণ : এ্যাটিওনেট নেরী বলিয়া একজন ভ্রাম্যাকারি ক্রাসীদেশে কাজ করিতেন, ১৯২৪ সনে তাহার তত্তাবধানে যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি

আসিয়াছিল তাহাদিগকে একের পর এক তিনি হত্যা করেন। একমাত্র পৌড়িত স্বামী ছাড়া প্রত্যেকেই তাহার কবলে প্রাণ হারান। তিনি তাহাদিগকে বিষ দিয়া হত্যা করিতেন তাহাদের কাহাকেও তিনি ঘৃণাও করিতেন না ভালও বাসিতেন না। তাহার কোনো এক রোগীকে তিনি বলেন যে, “অর্থের জন্যে কখনও চিন্তা করিও না। রোগীদিগের শুশ্রূষা করাই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। পারিশ্রমিক আমার নিকট কিছুই নয়।” ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি অর্থের লোভে কখনও এইরূপ দুর্কার করেন নাই। নেরী পাঁচটি লোককে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাহার কাঁসীর হুকুম হয়। পরে তিনি বাবাজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

যুগান্তর পত্রিকায় ২৩এ আগস্ট ১৯৫৪ সনে প্রকাশিত অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। দিল্লী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটি ব্যবহৃত টিকিট লইয়া এক ব্যক্তি ভ্রমণ করিতেছিল। একজন টিকেট চেকার ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে রেলওয়ে পুলিশের নিকট লইয়া যান। দিল্লীসাবাদ করিবার সময় অকস্মাৎ সেপকেট হইতে একটি রিভলবার বাহির করিয়া গুলির আঘাতে তিনজন ব্যক্তিকে গুরুতররূপে আঘাত করেন।

মনোরোগবিদ্যা ও মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা দ্বারা এই শ্রেণীর মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে নিরাময় করা যাইতে পারে। ইহার সমাধের একটি বিবরণ কীট, অভিজাবের (সাজেসন) দ্বারা এই অপরিণত প্রকব (ইমোসন) কিছুটা সংবরণ করিয়া এই মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করা যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের অপরাধী

পশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তিগণই অপরাধীর তালিকায় সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থান পায়। পশ্চিম বাংলায় ইহার আকার অন্য রূপ। নিম্নে পশ্চিমবঙ্গের অপরাধমূলক কার্যাবলীর নির্ধটন পত্র দেওয়া হইল।

নির্ধটন পত্র

পশ্চিম বাংলার অপরাধীদিগের সংখ্যা

বৎসর	সাংঘাতিক অপরাধ	স্বল্প অপরাধ
১৯৪১	২০,৩৪৭	১২৭,৭৮১
১৯৪২	১৭,৬১৮	১০৭,৫১৮
১৯৪৩	২০,৩৩২	১২১,২২৫
১৯৪৪	২০,১৩৭	১২৩,৮৯৪
১৯৪৫	২০,৬৫৭	১৩২,৪২৪
১৯৪৬	২৬,০৯৭	১১৪,০১০
১৯৪৭	২৩,৪৩৮	৮৯,৭৯১
১৯৪৮	৩১,৯৪৩	১৯৪,১২৬
১৯৪৯	৩২,৮৫৪	২১০,২২১
১৯৫০	৩৪,৫৪৯	১৮৭,৫১৭

১৯৪১ হইতে ১৯৫০ সনের মধ্যে অপরাধমূলক ঘটনাবলীর নির্ধটন পত্র দেওয়া হইল। ১৯৪৫ সালে সমাজবিরুদ্ধ অপরাধমূলক কার্যাবলীর উঠতিপরতি

দেখা যায়, কিন্তু ১৯৪৬ সালে সাংঘাতিক অপরাধের সংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে ১৯৪৭ সালেই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। পুনরায় ১৯৪৮ সাল হইতে সাংঘাতিক সমাজবিরুদ্ধ অপরাধমূলক কার্যাবলীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। লেখকের মতামতানুসারে প্রথমত পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিপর্যয়, বিশেষত, আর্থিক দুর্গতি ও গত মহাযুদ্ধের পর হইতে জনসাধারণের নৈতিক অবনতি ঘটে এবং একশ্রেণীর লোক জনসাধারণকে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইতে বঞ্চিত করিয়া অসং উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে থাকে। দ্বিতীয়ত অসহ্যুচ্চেষ্টা নারীব্যবসা এই সময় আরম্ভ হয়। এই সকল ক্রমবর্ধমান সমাজবিরুদ্ধ অপরাধমূলক কার্যাবলীর জন্মই ১৯৪৫ সালে সাংঘাতিক ও স্বল্প অপরাধমূলক কার্যাবলীর উঠতিপরতি দেখা যায়। অল্পকথায় বংশ বা হেরিডেটরী এবং অন্তর্দিকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই উভয়ের প্রভাবই ১৯৪৫ সালের সমাজবিরুদ্ধ কার্যাবলীর উঠতিপরতির কারণ বলিয়া মনে হয়। উপরোক্ত অপরাধমূলক কার্যাবলীর উঠতিপরতির কারণ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জনসাধারণের সাধারণ দুর্গতি এবং গত মহাযুদ্ধের পর হইতে তাহাদের স্থানান্তর গমন প্রভৃতি কারণ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে এই সকল অপরাধমূলক কার্যাবলীর বৃদ্ধির মূলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু দুইটি বিশেষ প্রশ্নের, যেমন ১৯৪৮ সনে অপরাধমূলক কার্যাবলীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ১৯৪৬ সনের তুলনায় ১৯৪৭ সনে অপরাধীর সংখ্যার হ্রাস, এর কোনো উত্তর দেওয়া হয় নাই। লেখকের মতামতানুসারে ভারত বিখণ্ডিত হওয়ার জন্মই উপরে উল্লেখিত বিপর্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারত বিখণ্ডিত হওয়ার পর হইতেই দলে দলে উদ্বাস্তু ভারতবর্ষে আসিতে থাকে। ইহার ফলে জীবনযাত্রার ব্যয়ভার-এর পরিণাম বৃদ্ধিত হয়। জনসংখ্যা গণনার নির্ঘটন পত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রতি মধ্যবিত্ত সংসারের মাসিক ব্যয় ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে গড়পরতায় ২৪৪ টাকা ছিল, কিন্তু ৫১ সালের মে মাসে ৩৮১ টাকা হয়। ইহা হওয়া সত্ত্বেও প্রতি সংসারেরই আয়ের পরিমাণ, ব্যয়ের পরিমাণ হইতে বহু নিম্নে ছিল। ইহার ফলে বহুসংখ্যক লোক জীবনযুদ্ধে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যে-কোনো উপায়ে অর্থ উপার্জনের রাস্তা খুজিয়া লইল।

এখন প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, কোন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এই সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিপর্যয়ে পড়িয়া অপরাধী বৃত্তি বাছিয়া লয়। লেখকের মতামতানুসারে যে সমস্ত ব্যক্তি পূর্বে হইতেই স্বাভাবিক বিকীরপ্রস্তু ও অবস্থাবিশেষে অপরাধী ছিল, তাহাদের উপরই এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব বেশী বিস্তার করে। অবশ্য পেশাদার অপরাধীদিগের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ইহাদের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিপর্যয়ের প্রভাব বেশী বিস্তার করে নাই।

১৯৪৭ সনে সমাজবিরুদ্ধ কার্যাবলীর সংখ্যার হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কারণ বিশ্লেষণ এইরূপ ভাবে করা যাইতে পারে। ১৫ই আগষ্ট ভারত বিভক্ত হয় ও পাকিস্তানের সীমা নির্ধারিত হয়। দোষী নির্দোষী সকলেই বেশ কিছুটা আতঙ্কপ্রস্তু হইয়া পড়ে। কারণ সকলেই একটা আকস্মিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

দ্বিতীয় এবং এই নতুন অবস্থার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া নিবার জ্ঞাত ভালমন্দ সকল লোকেরাই নিজনিজ কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে, এ-রূপ সিদ্ধান্ত লেখক যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করেন না। কেন না প্রতিবৎসর জনসংখ্যা কতটা বৃদ্ধি হ্রাস পাইল তাহার তালিকা থাকে না। প্রতিবৎসর জনসংখ্যা গণনা সম্ভবপরও নয় এবং করাও হয় না। ১৯৪২ সনে সাংঘাতিক অপরাধের সংখ্যা ছিল, ১৭,৬১৮ কিন্তু ইহার তুলনায় ১৯৪৭ সনে সাংঘাতিক অপরাধের সংখ্যা ২৩,৪৩৮ এ পৌঁছায়। মাত্র এই কয়েক বৎসরের ব্যবধানে ১'৪ গুণ সাংঘাতিক অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে কি জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে? অন্যদিকে এই সময়ের মধ্যে স্বল্পঅপরাধের সংখ্যা ১'২৪ কমিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে কি বুঝা যায় যে একই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা অর্ধেকের কিছু কম হইয়াছে? ইহা সুস্পষ্ট যে একই সময় জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও হ্রাস সম্ভবপর নয়।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধ নিবারণ করিবার পূর্বে অপরাধ হ্রাস করিবার চেষ্টাই হওয়া উচিত। যদি কাহারও মধ্যে অপরাধের শুক্রকীট নিহিত না থাকে, তাহা হইলে সাধারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা সকলশ্রেণীর লোককে অপরাধীতে পরিণত করে না। ইহা ব্যতীত সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, একদিকে মনোবিদ্যা এবং অন্যদিকে সামাজিক কার্যাবলীর দ্বারা পৃথকীকরণ, হাতে কলমে কাজ শিক্ষা, সাধারণ খেলাধুলা এবং দলবদ্ধভাবে সময় কাটানো প্রভৃতি শিক্ষা দ্বারা অপরাধীদিগের সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভবপর।

॥ ভ্রম সংশোধন ॥

এই সংখ্যা অশ্রনীতে প্রকাশিত “আয়টচতুরের বিকাশ” প্রবন্ধের দ্বিতীয় লাইনে মুদ্রিত “অভিন্ন ব্যক্তিতা (ইনডিভিডুয়ালিটি)” স্থলে “অনন্ত ব্যক্তিতা” হবে। সঃ, অঃ

“ চন্দ্র ” ৭

ডাক হরকরা : কাহিনী ও গীতরচনা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অগ্রগামী, সংগীতপরিচালনা : সুধীন দাশগুপ্ত, আলোকচিত্রগ্রহণ : রামানন্দ সেনগুপ্ত, শব্দগ্রহণ : অবনী চট্টো:, জগন্নাথ চট্টো:, বি, এ, শর্মা, সম্পাদনা : কালী রাহা, শিল্প-নির্দেশনা : সুধীর খাঁ, বৃত্তান্ত-পরিচালনা : অনাদিপ্রসাদ ; ভূমিকায় : কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, গঙ্গাপদ বসু, স্বভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিত বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, শোভা সেন, সাবিত্রী চট্টো:, কমলা অধিকারী, মঞ্জুলা ভট্টা:, মণি শ্রীমানি ও আরো অনেকে ।

‘ডাক হরকরা’ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক সুপরিচিত ছোটগল্পের চিত্ররূপ । বাংলা সাহিত্যের যে কোনো মনোযোগী পাঠকই জানেন লেখক তারাশঙ্কর কি পরিমাণ লিপিকুশলতার মাধ্যমে দীলু হরকরার ব্যক্তি-জীবনের মর্যাদাসিক বেদনাকে কাহিনীটিতে উদ্ঘাটিত করেছেন । দীলু হরকরার জীবনচর্যার নানামুখী সংঘাতের মধ্যে বাংলাদেশের এক অবহেলিত সম্প্রদায়ের দুঃখময় ইতিহাস আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । কিন্তু ছায়াচিত্রে কাহিনীকে যেভাবে উপস্থিত করা হয়েছে তাতে তারাশঙ্করের সেই আবেদনটুকু সম্পূর্ণভাবে অনুদ্ঘাটিত হয়ে গেছে । ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর মাধ্যমে দীলু হরকরা ও তার সংসারের যে চেহারা দর্শকরা দেখতে পান, তাতে সহানুভূতি জাগে, কিন্তু মন ভরে না ।

অথচ সবাই জানেন পর্দায় মুক্তি পাবার আগেই ছবিটি শহরের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলে চাকল্য সৃষ্টি করে । পর্দাস্থ হবার পরও দেখা যায় শুধুমাত্র পত্রপত্রিকাগুলিই নয়, সমাজের বিভিন্ন মহলের খ্যাতনামারা ছবিটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন । এমনকি ছবিটি নাকি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি—এমন সমালোচনাও দেখতে পাওয়া যায় । ছবিটি দেখার পর অন্তঃসবার সঙ্গে কঠিন মেলাতে পারলে আমরা সুখী হতাম । কিন্তু নিজের বিচারবুদ্ধি ও ক্রটিবোধের উপর আস্থা স্থাপন করায় তা সম্ভব হয়নি । কোন মুক্তিতে ছবিটি ‘প্রথম শ্রেণী’র বলে আখ্যাত হচ্ছে তা-ও আমাদের কাছে দুর্বোধ্য ।

• ইতিপূর্বে বলেছি তারাশঙ্করের কাহিনীর মূল বক্তব্যটি পরিচালকগোষ্ঠী হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি । সত্যজিৎ রায়ের অমুকরণে হাজার হাজার ফিট বহির্দৃষ্টি গ্রহণ করায় ছবিটি চিত্রসমুদ্রে সন্মুখ হয়ে উঠলেও, দীলু চরিত্রের মনোস্তাত্ত্বিক পটভূমি তাতে বিস্মৃতিতে পরিণত হয়নি । তাছাড়া দীলু ও তার ছেলের সম্পর্কটিও সামগ্রিকভাবে দর্শকদের মনে কোনো রেখাপাত করে না । কেমন যেন ওপর-ওপর এবং অগভীর অস্বচ্ছতায় সমস্ত সম্পর্কটি হারিয়ে যায় । তেমনি প্রাণহীন ঠেকে দীলুর ছেলে

নিতাই ও নাচওয়ালী বাসিনীর সম্পর্ক। নেয়েটি ক্যামেরার সামনে আসে যায়, সবার চোখ ধাঁধিয়ে নাচে গায়, কিন্তু সমগ্র ছবিটির গতি ও বিস্তারিত কি সাহায্য করে, তা বোঝা ভার। এক একটা 'চরিত্র' চরিত্র হিসাবে দাঁড়াবে কখন? যখন সেই চরিত্র ঘটনাপরম্পরায় নিজের স্বরূপ বিকাশ করবে স্বাভাবিক বাস্তবতায়। কাজেই চিত্রনাট্য রচনার সময় গল্প এবং ঘটনা-সংস্থাপনে সংগত এবং শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন, পরিচালককে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্বন্ধ এবং খুঁটিনাটি সম্পর্কেও সজাগ থাকতে হয়। কিন্তু 'ডাক হরকরা'র চিত্রনাট্যে সে-পরিচয় পাওয়া যায়নি।

তাছাড়া বাংলার গ্রাম, মাঠ-ঘাট জলাজল পশুপাখী সব মিলিয়ে এছবির প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের বারবার 'পথের পাঁচালী'র কথা মনে পড়ায়। উত্তম দৃষ্টান্তকে স্বরণে রাখা দোষাবহ নয়, যদি সেই অনুপ্রেরণায় নতুন সৃষ্টির অঙ্কুর বিকশিত হয়ে উঠে। এ ছবির 'পিসী' চরিত্র ইন্দির ঠাকরুণকে মনে করায়। কিন্তু গভীরতার অভাবে এ চরিত্র সে তুলনায় কত ত্রিয়মান।

তবুও এই নতুন পরিচালকগোষ্ঠীকে আমরা অকুণ্ঠ স্বাগত জানাই 'শিল্পী' ও 'সাগরিকা'র পর 'ডাক-হরকরা'র হাত দেবার জন্য। এ ছবির দোষত্রুটি বড় কথা নয়, পরিচালকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে সেটাই শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত সুলক্ষণ।

রামানন্দ সেনগুপ্তের ক্যামেরার কাজ কয়েকটি দৃষ্টে উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। শব্দগ্রহণ সর্বত্র সমান নয়।

নিতাইয়ের ভূমিকায় নবাগত অজিত গাঙ্গুলী দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন। বাসিনীর ভূমিকায় সাবিত্রীর অভিনয় প্রশংসনীয়। অন্যান্য উল্লেখ্যদের মধ্যে আছেন শোভা সেন, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি। কিন্তু সবাইকে ছাপিয়েছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম ভূমিকায় তিনি আশ্চর্য সুন্দর ও স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। বাউল-নৃত্যে শান্তিদেবও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এছবির সংগীতাংশ সমৃদ্ধ। 'চোখে ছটা লাগিল তোর আশ্রনা-বসা চুড়িতে.....' এবং 'কাচের চুড়ির ছটা' পরিস্থিতি অনুযায়ী এই গান দু'টির রচনাশৈলী যেমন অনবদ্য, সুর-যোজনাও তেমন মনোজ্ঞ হয়েছে। দু'টি বাউল গানও আমাদের খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু আবহসংগীত টাইটেল-এ যেমন অভিনব, তেমন সর্বত্র নয়।

রাজ তিলক : প্রযোজনা ও পরিচালনা : এস. এস. ভাসান, কাহিনী : জেমিনীর গল্প বিভাগ, সংগীত-পরিচালনা : সি. রামচন্দ্র, আলোকচিত্রগ্রহণ : পি. এল্লার, শব্দগ্রহণ : সি. ই. বিগ্‌স, সম্পাদনা : এন. আর. কৃষ্ণস্বামী, ভূমিকায় : পদ্মিনী, বৈদ্যসুখীমালা, হুর্গা খোটে, প্রাণ, জাগিরদার, গণেশ, বিপিন গুপ্ত, এবং আরো অনেক।

এ বাবৎ জেমিনির যত ছবি হয়েছে তার মুখ্য উদ্দেশ্যই দেখা গেছে দর্শক-সাধারণকে প্রমোদ উপযোগী বিচিত্র উপকরণ দিয়ে আনন্দ দান করা। আনন্দ

পরিবেশনের ব্যাপারে এরা সিদ্ধহস্ত। সব রকম দর্শক যাতে সন্তুষ্ট হতে পারে এমনভাবে কাহিনী নির্বাচন করা হয়। আলোচ্য ছবিটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

খুঁতখুঁতে দর্শকরা অবশ্য এ বিষয়ে একমত না হতে পারেন। কিন্তু বিবেচনা করলে দেখা যায় যে এদের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তত কোন ভেদ্যাল নেই। এবং সেই কারণেই এরা বিশেষ এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। নিছক আনন্দের জন্য অবসর বিনোদন করতে হলে সাধারণ দর্শকের কাছে জেমিনির ছবির চেয়ে উপভোগ্য ছবি পাওয়ার কথা ভাবা যায় না। - এবং এই উদ্দেশ্যের মাপকাঠিতে বিচার করলে একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে আলোচ্য ছবিটি এদের উদ্দেশ্যকে অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত করেছে।

এক রাজকীয় পরিবারের উত্থান-পতনের ইতিকথা নিয়ে গড়ে উঠেছে এ ছবির আখ্যানভাগ। গল্পের বিস্তার একটি ষড়যন্ত্রকে কেন্দ্র করে। সমস্ত ব্যাপারটা কাল্পনিক হলেও, সেই কল্পনাকে কোথাও কোথাও চমকপ্রদভাবে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। অসংখ্য ঘটনা উপঘটনা এবং নাটকীয় পরিস্থিতির বিস্তার কোথাও কোথাও এমন কুশলতার সংগে হাজির করা হয়েছে, মনে হয়, দর্শককে যেন এক ফ্যান্টাসীর জগতে এনে ফেলেছে। দোষের মধ্যে চিত্রনাট্যটি স্মরণীয় নয়। এই ত্রুটিটুকু না থাকলে এবং সম্পাদনা আরো ভাল হলে ছবিটি আরো উপভোগ্য হতে পারতো। সম্পাদকের কাজ হচ্ছে কাঁচি নিয়ে। অপ্রয়োজনীয় ত্রুটিপূর্ণ অংশগুলির প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। কারণ ভাল সম্পাদকের উপর ছবির উৎকর্ষসাধন অনেকখানি নির্ভর করে।

অভিনয়ের কথা বলতে হলে আগেই দুর্গা খোচের নাম করতে হয়। ছোট্ট একটি ভূমিকায় তিনি অপূর্ব অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন প্রাণ, গণেশ, বিপিন ওপ্ত প্রভৃতি। বৈজয়ন্তীমালা এবং পদ্মিনীর অভিনয় এ ছবির বিশেষ আকর্ষণ; এদের দ্বৈত নৃত্যের দৃশ্যটি তো অনবদ্য।

আলোকচিত্রগ্রহণ এবং অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

। চিত্রালাপী ।

অগ্রণীর বই

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'ষ্টালিন' তৃতীয় সংস্করণ চলছে।
ষ্টালিনের জীবনকাহিনী এত সুন্দর করে বাংলা ভাষায়
আর লেখা হয়নি। চমৎকার ছাপা বাঁধাই। তিনখানি
ছুরঙা ছবি। ৬৮

অনুবাদগ্রন্থ : ম্যাকসিম গর্কীর লেখা ছোট ও বড় গল্প, ডায়েরীর
বাছাইকরা কয়েকটি অংশ, জবানবন্দী, একটি সম্পূর্ণ নাটক
ও কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন 'শিল্প ও সংগ্রাম' ৩।০

রম্যা রলার। আই উইল নট রেস্ট-এর বাংলা 'শিল্পীর
নবজন্ম' ৫৮

বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভেরকর ও ইউরোপের অন্যান্য বিখ্যাত
কয়েকজন লেখকের গল্পসংগ্রহ 'বিদেশী গল্প' ২।০

লিও টলস্টয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনী ক্রুয়েটজার সোনাটার
বাংলা অনুবাদ (অঃ কৃষ্ণ চক্রবর্তী) 'রাহ' ২৮

আধুনিক জার্মানীর শক্তিশালী লেখিকা আন্না সেঘেরসের
'সাবোতিয়ারস' (অঃ এর্ষত্যকুমার বসু) ২৮

আইভান তুর্গেনিভের 'অশ্রুমতী' (অঃ শিশির সেনগুপ্ত ও
জয়সুকুমার ভাট্টা) ২।০

ছোট গল্প : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিস্থিতি' ; ২।০

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বেদিয়া-ছন্দ' ২৮

শান্তি দেবীর 'শান্তী' ১।০ ; সুবোধমোহন ঘোষের
'উৎস' ২৮

নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের 'অপরিচিতার চিঠি' ২৮

উপন্যাস : গুণময় মাল্লার 'লক্ষীন্দর দিগার' ৪।০ ; মিহির
আচার্যের 'দিনবদল' ২৮ ; বৈষ্ণবনাথ ঘোষের 'কল্লান্ত' ৫৮

বঙ্গবন্ধা : ডাঃ গৌরমোহন দাসের 'মহাযুদ্ধের পরে
মালয়' ২।০ ; রাহুলের 'জনপদের ছন্দ' ৩।০

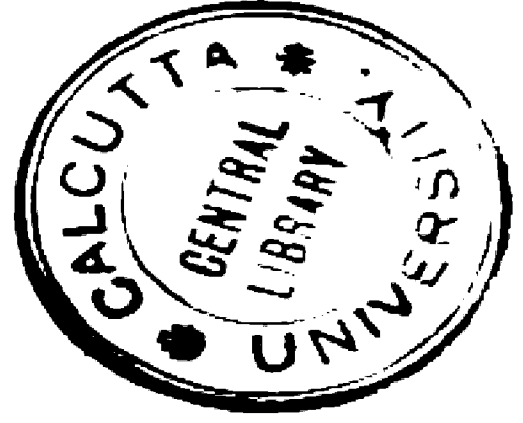
কবিতা : মায়াকভ স্কির কবিতা অনুবাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ
মৈত্র ২।০ ; এঁরই স্বরচিত 'আকাশের মুখ' ১।০ ; চিত্ত

ঘোষের 'অস্তরা' ১।০ ; রামেন্দ্র দেশমুখের 'জনসমুদ্র' ১।০

বিবিধ : সরোজ আচার্যের 'মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞান' ২৮

অগ্রণী বুক ক্লাব

। ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ ।



অগ্রণী

। দশম বার্ষিক জয়ন্তী, ১৩৬৫ ।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্প

অচ্যুত গোস্বামী

সাম্প্রতিক কালের বাংলাদেশের গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনার দায়িত্ব অগ্রণীকর্তৃপক্ষ আমার উপর ন্যস্ত করেছেন। বিষয়টির কাঠিন্যের কথা স্মরণ করে প্রথমটায় খুব ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু পরে মনে হল, আমার দায়িত্ব বোধকরি শুধু পরবর্তী আলোচনার একটি ভিত্তিভূমি তৈরী করা মাত্র, একটি পূর্ণায়তন স্বয়ং-সম্পূর্ণ আলোচনা উপস্থিত করা নয়। এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি অগ্রসর হচ্ছি। বিস্তার এবং সূক্ষ্মতা বাদ দিয়ে মোটা মোটা দাগে আমি বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি আলোচ্য সূচি উপস্থিত করছি মাত্র। আমার যা অপূর্ণতা তা পরবর্তী বক্তারা সম্পূর্ণ করে নিতে পারবেন।

॥ আধুনিকতার সংজ্ঞা ॥

আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে আধুনিকতার একটি সূচু সংজ্ঞা আমাদের সামনে উপস্থিত থাকা দরকার। একজন ইংরেজ সমালোচককে অনুসরণ করে বলা যায় যে, পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গে এ-যুগের মানসিক অভিজ্ঞতার তফাৎ কি এই প্রশ্নের জবাবে যা পাওয়া যায় তাই আধুনিকতা। আধুনিকতার স্বরূপ নির্ধারণ করার পর লেখকের দায়িত্ব অবিশিষ্ট তার সঙ্গে পূর্ববর্তী ঐতিহ্যের সংযুক্তিসাধন করা। শুধু অভিজ্ঞতা না বলে মানসিক অভিজ্ঞতা বলার তাৎপর্য এই যে, পূর্বযুগ আর এ-যুগের অন্তর্বর্তী সময়টা খুব ঘটনা-বহুল হতে পারে, কিন্তু তা জীবনের মর্মমূলের চিন্তায় চীর না-ও ধরাতে পারে। পক্ষান্তরে ঘটনা-বাহ্যাহীনতা সত্ত্বেও পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার উপর চিন্তা প্রয়োগের বিবর্তনে এমনকিছু নতুনত্ব সাধিত হতে পারে যাকে মৌলিক বলা চলতে পারে। মানসিক অভিজ্ঞতা কথাটাকে বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি তিনটি জিনিস পাওয়া যায় : প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী, দ্বিতীয় মূল্যবোধ, তৃতীয় বাস্তবকে বিশ্লেষণের প্রণালী। এবং বলা বাহুল্য, এই তিনটি জিনিসই যখন নিছক বুদ্ধির স্তর ছেড়ে জীবনের প্রত্যক্ষ-সংযোগজাত আবেগে রূপান্তরিত হবে তখনই তাকে মানসিক অভিজ্ঞতা বলব, তার আগে নয়।

আধুনিকতা দেশের প্রত্যেক সংবেদনশীল মানুষের মধ্যেই উপস্থিত রয়েছে, পাঠক-সাধারণের মনে যা অস্পষ্ট অগোছালো, লেখক তাকেই স্পষ্টায়ত বা সূক্ষ্মায়ত

করে তোলেন। যা পাঠকমানসে অনুপস্থিত, তাকে বাইরে থেকে ধার করে এনে পরিবেশন করলে তার আবেদন বার্থ হতে বাধ্য। মনে রাখা দরকার যে, কথা দিয়ে আমরা সাহিত্য সাজাই, কিন্তু মানুষের মনে কোনো আবেগ জাগানোর ক্ষমতা কথার নেই, যেমন আছে কোনো সুন্দরী নারীর। কথা হচ্ছে কতকগুলো প্রতীক মাত্র, যার সাহায্যে পাঠক তার মনের আবেগকে সুশৃঙ্খল করে তুলতে পারেন। সেইভাবেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের মূল্য এত বেশি, যুগযুগ ধরে তিলতিল করে আমরা সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের আবেগ-অনুভূতিসমূহকে সম্প্রসারিত জটিলীকৃত এবং রূপান্তরিত করে চলেছি। এই ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে হঠাৎ-ই কারো পক্ষে আধুনিক সাহিত্যের রসাস্বাদ করা সম্ভব নয়। সেইভাবেই সুদূর পল্লীর নিরক্ষর কৃষকের গাননে রবীন্দ্র সাহিত্যের কোনো আবেদন নেই।

পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গে এ-যুগের মানসিক অভিজ্ঞতার তফাৎ কি—এ প্রশ্নের জবাবই যে আধুনিকতা এ-কথায় আশা করি বিতর্কের কোনো অবকাশ থাকবে না যদি আমরা সঙ্গে সঙ্গে আরো স্বীকার করে নেই-যে এ-প্রশ্নের জবাব বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে দিতে পারেন। কিন্তু লেখকের জবাবের সঙ্গে সংবেদনশীল পাঠকের মনের অভিজ্ঞতার যদি একেবারেই মিল না থাকে তবে তাকে আধুনিকতা বলব কিনা সন্দেহ।

কিন্তু তবু আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমার এই প্রস্তাবিত সংজ্ঞা সম্পর্কে আপত্তি তুলবেন চিরন্তনবাদীরা এবং এ-যুগের ছদ্মবেশী শিল্পকৈবল্যবাদীরা। এই বিতর্ক একটা বিস্তীর্ণ বিষয় এবং এ-সম্পর্কে আলোচনা তুললে তা সহজে শেষ হবে না। কাজেই বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে না-গিয়ে শুধু এইটুকু বলতে পারি, যেগুলোকে চিরন্তন রস বলা হয়, বাৎসল্যরস শৃঙ্গাররস প্রভৃতি, যুগযুগ ধরে তাদের মধ্যে গুণগত এবং পরিমাণগত রূপান্তর ঘটেছে; এই রূপান্তরকে ধরতে পারাই আধুনিকতা। যে-সব সাহিত্যকে চিরন্তন সাহিত্য বলা হয়, যেমন সেক্সপীয়রের সাহিত্য, সে-সব সম্পর্কে একটা কথা বললেই যথেষ্ট যে যুগে যুগে পাঠকমানস ভিন্নভাবে তাদের উপভোগ করে। সেক্সপীয়রের সাহিত্য তিন শো বছরের আগের পাঠক যে-ভাবে উপভোগ করত আজকের পাঠক তা করে না। সেক্সপীয়র সমালোচনার অগ্রগতির ইতিহাস যারা জানেন তারাই এ-কথা স্বীকার করবেন। রামায়ণ মহাভারতকে প্রামের একজন সাধারণ মানুষ এবং শহরের একজন সফিস্টিকেটেড পাঠক সমানভাবে উপভোগ করবেন। কিন্তু উপভোগের রকমটায় নিশ্চয় তফাৎ আছে। আমি আগেই বলেছি সাহিত্য লেখক ও পাঠকের যুগ্ম-সৃষ্টি। দীর্ঘস্থায়ী সাহিত্যকর্মগুলির বিশেষত্বই এই-যে তাকে বিভিন্ন যুগের পাঠকেরা নতুনতর ভাবে সৃষ্টি করে নিতে পারেন। এই বিশেষত্ব যে কী তা সঠিকভাবে আমরা এখনো বলতে পারব না। কিন্তু এ-কথা ঠিক খুব মুষ্টিমেয় কয়েকখানি দীর্ঘস্থায়ী সাহিত্যকর্ম আধুনিকতা বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না।

পক্ষান্তরে শিল্পকৈবল্যবাদীরা হয়তো বলতে পারেন পাঠককে ভাললাগানোর মধ্যেই সাহিত্যের সার্থকতা। ভালো লাগানো কথাটার মধ্যে বিপদের আভাস আছে

বলে এ-প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। আমি আগেই বলেছি পাঠকের মধ্যে আধুনিকতা-বোধ অসংগঠিত; কিন্তু আগের আগের যুগের অমুভবগুলি তার মধ্যে অনেক বেশি সুসংগঠিত, কারণ সেইসব যুগের সাহিত্যকর্ম তার কাছে অনেক বেশি সুপরিচিত। কাজেই পূর্বযুগের ধ্যানধারণাকে কেন্দ্র করে লেখা সাহিত্য পাঠকের কাছে থেকে খুব সহজে ভাল লাগার স্বীকৃতি আদায় করতে পারে। কিন্তু কোনো প্রকৃত আধুনিক সাহিত্যকে ভাল বলার আগে পাঠককে খানিকটা সময় নিতে হয়। অবিশিষ্ট একটা কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, পশ্চাত্যতাকে ভিত্তি করে লেখা কোনো সাহিত্য নিশ্চয়ই পাঠকের থেকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আদায় করতে পারে না। বর্তমান যুগে মুক্ততা আলো বা অবধূতের গল্পগুলো অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু তাদের স্বল্পস্থায়ী জনপ্রিয়তার সুবর্ণযুগেও আমি এমন কোনো পাঠকের সাক্ষাৎ পাইনি যিনি তাদের লেখা গল্পগুলোকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নিদর্শনগুলির সঙ্গে তুলনা করার কথা মনে মনেও চিন্তা করেছেন।

অতঃপর আমার প্রস্তাবিত আধুনিকতার সংজ্ঞাকে স্বীকার করে নিয়ে সেই ভিত্তিতে সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যের পর্যালোচনায় অগ্রসর হব। কিন্তু তার আগে আধুনিক সাহিত্যে প্রধান প্রধান যে লক্ষণগুলো আজ সুপরিষ্কৃত সেগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার। এই আলোচনায় আমি সাধারণভাবে তারাকঙ্কর-মনোজ বসু বুদ্ধদেব প্রভৃতি প্রবীন লেখকদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করব না। যে তরুণ সম্প্রদায়ের উপর সাহিত্যকে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার ন্যস্ত রয়েছে, তারাই আমার আলোচনার প্রধান লক্ষ্য।

II. সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যের লক্ষণসমূহ II

১। মূল্যবোধের অনিশ্চয়তা। আধুনিক সাহিত্য ঘাঁটলে এই রোগের খুব ব্যাপক প্রাধান্য আবিষ্কার করা কঠিন নয়। আজকালকার অনেক লেখককে দেখতে পাওয়া যাবে অতিআধুনিক চটকদারা ভাষার মধ্যে, বিভিন্ন বিষয়ের, বিশেষ করে যৌনবিষয়ের, বেপরোয়া অনবগুষ্ঠিত উপস্থাপনার মধ্যে যারা সুকৌশলে পুরোনো পরিত্যক্ত মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করছেন, এবং এইভাবে নতুন এবং পুরোনো মূল্যবোধের একটা খিচুড়ি তৈরী করে পাঠক-মানসকে বিভ্রান্ত করছেন। উদাহরণের অভাব নেই, কিন্তু আমি দু'একটি মাত্র উল্লেখ করছি। বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি-গোলাম' বইখানিতে ক্ষয়িক্ষু জমিদারতন্ত্রের আস্তঃসারশূন্যতা এবং পতনকে দেখানোর একটা চেষ্টা আছে। কিন্তু এই বইয়ের প্রধান কাহিনীটি হল ক্ষয়িক্ষু জমিদার বাড়ির ছোটবোরাণীর মস্তপ চরিত্রহীন স্বামীর চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা। ক্ষেত্র নিধিশেষে পতিপরায়ণতা-একটি সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ। সতী-নারী কর্তৃক চরিত্রহীন স্বামীর চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা—এই বিষয়বস্তু বংকিম বা পরবর্তীকালেরও কোনো কোনো কাহিনীতে দেখা যায়। কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, সে-যুগেও কোনো উল্লেখযোগ্য লেখক এই কাহিনীকে গ্রহণ করেননি। বিমল মিত্র এই কাহিনীকে নিছক ঐতিহাসিক বাস্তবতা হিসাবে উপস্থিত করেননি, কারণ বোরাণীর সাধনাকে তিনি উচ্চমূল্য দিয়েছেন। স্ত্রীমনি এই বইয়ের আধুনিক মেয়ে জবা যে তার প্রেমিককে ত্যাগ

করে ছ'মাস বয়স কালে বিবাহিত স্বামীকে ফিরে পাওয়ার সাধনায় রত হয়েছে, সেখানেও লেখক সেই সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। 'সাহেব-বিবি-গোলামের' কাহিনী পরিবেশনের কোশলেও উনবিংশ শতাব্দীর টেকনিকের সঙ্গে আধুনিক টেকনিকের অদ্ভুত সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। আকস্মিকতা, অদ্ভুত যোগাযোগ প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দী-সুলভ বিশেষত্বের সঙ্গে আধুনিক কোশল : কতকগুলো বিচ্ছিন্ন কাহিনীর মধ্য দিয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন সমাজজীবনকে দেখানোর চেষ্টা,—এই দুয়ের মিলন ঘটানো হয়েছে বইটাতে।

বিমল মিত্রের অধিকাংশ বইতেই মূল্যবোধগত অসামঞ্জস্যের ছাপ চোখে পড়বে। তেমনি রমাপতি চৌধুরীর 'লালবাই' বইটি এই পর্যায়ের। এই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে কথিত বইটির মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। লেখকের প্রকাশকোশলের মধ্যে কলোনিয়াল যুগীয় দৃষ্টিভঙ্গী বিদ্যমান, এবং তিনি সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

২। কলোনিয়াল মূল্যবোধ : যৌন-অবদমন একটি সামাজিক পাপ এবং যৌনক্ষুধার যে-কোনো উপায়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার নৈতিক মূল্য স্বীকার্য : কলোনিয়াল যুগের মূল্যবোধের প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে এই সূত্রটি। কলোনিয়াল কালীনদের মধ্যে একটি অপরিণত যুবক-সুলভ বিদ্রোহের আশ্রয় এবং ঔজ্জ্বল্য ছিল : সেইটুকুকে বাদ দিলে আধুনিক কালের জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর প্রভৃতি একশ্রেণীর লেখকদের প্রায় অধিকাংশ লেখাকেই কলোনিয়াল যুগের লেখা বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। অথচ এই দুই যুগের মাঝখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। মানিকবাবু যৌনসমস্তার অনেক গভীরে পদক্ষেপ করেছিলেন এবং মানবপ্রকৃতির মধ্যে যৌন-কামনার স্থান কোথায় এবং তা সামাজিক আদর্শবাদকে কী করে পর্যুদস্ত করে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। পরিণেবে 'আরোগ্য' বইতে তিনি যৌনসমস্তাকে সমাজের স্বহস্তের সমস্তার সঙ্গে সংযুক্ত করতে পেরেছেন। আধুনিক লেখকদের উচিত ছিল এই প্রশ্ন উত্থাপন করা : মানিকবাবুর মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাদের মানসিক অভিজ্ঞতার তফাৎ কি? তার বদলে মানিকবাবু পঁচিশ বছর আগে যাকে অবহেলায় এক পাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তারা সেইখানেই ফিরে গিয়েছেন তাদের সাহিত্যের পাঠ্যের জগৎ।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একটি গল্পে আছে সুল চরিত্রের এক নায়কের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সুল ক্রটিসম্পন্ন নায়িকা এক প্রেসের কম্পাউন্টারের সঙ্গে প্রেম করছে। সুল ক্রটিবতীর গা থেকে কিন্তু শাড়ির আঁচল বারবার করে খসে খসে পড়ে যায়। এই কাহিনীর সঙ্গে লরেন্সের 'লেডী চ্যাটার্লির প্রেমের' সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়, এবং লরেন্স কলোনিয়াল যুগের একজন প্রিয় লেখক।

বিমল মিত্রের 'মেয়েমানুষ', 'কল্যাপক্ষ' প্রভৃতি বইতে বা বিমল করের অধিকাংশ ছোট গল্পে যৌন-অবদমনের প্রতিকারের অকাঙ্ক্ষার দাবী ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু কলোনিয়াল যুগের সাহিত্যে আরও কতকগুলি পজিটিভ মূল্যবোধ ছিল,

যেমন, প্রেম, নারীর স্বাধীকার অর্জন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবী প্রভৃতি। আধুনিক লেখকেরা এই মূল্যবোধগুলির অস্বীকৃতির ভিতর দিয়ে কলোনিয়ালকালীনদের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সপ্রমাণ করেছেন।

৩। সস্তা মানবতান্ত্রিক মূল্য। রুসোর বিশ্বাস ছিল মানুষের প্রকৃতির মধ্যে মানবিক মূল্যসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশ লাভ করে। কৃত্রিম সামাজিক জীবনই এই বিকাশলাভের পরিপন্থী। তারপর গত দেড়শো বছর ধরে (এবং তারও আগে থেকে) মানবতাবাদীরা এবং মানবপ্রেমিকরা চীৎকার করে করে গলা ফাটিয়ে ফেলেছেন; কিন্তু পৃথিবীতে আজও মানবীয় মূল্য সমূহের জয়যাত্রা ঘটতে দেখা যায়নি। কাজেই, যা রোমাণ্টিসিজম আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে স্বাভাবিক ছিল, সমাজ ও মানবপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছাড়া বিমূর্ত ভাববাদী কল্পনা হিসাবে মানবীয় গুণ সমূহের চিত্রায়ণের বিশেষ কোনো মূল্য নেই। অবধূত ‘বশীকরণ’, ‘উদ্ধারণপূরের ঘাট’ প্রভৃতি বইতে এবং জরাসন্ধ ‘লৌহকপাট’ বই-তে কিন্তু এই কাজ করেছেন। এইসব বই পড়লে মনে হবে মানবীয় গুণসমূহ চেষ্টা করে, কষ্ট করে অর্জন করার জিনিস নয়, তা বকুল ফুলের মত পথের দু’ধারে অজস্র ছড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে নিলেই হয়। উল্লিখিত বইগুলির লেখকেরা কাহিনীগুলিকে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী বলে প্রচার করলেও আসলে এগুলো কতকগুলো বিস্তৃত কাল্পনিক গল্পের সমষ্টি এবং সেই হিসাবেই এ-গুলোকে আলোচনীয় বলে মনে করছি।

মানবিক মূল্যবোধের জয়গান অবিস্মৃতি এ বইগুলোর ক্ষেত্রে ‘আই ওয়াস’ যাত্রা। অসামাজিক চরিত্র এবং চমকপ্রদ লোমহর্ষক পরিবেশের প্রতি গল্পপ্রিয় সাধারণ পাঠকের একটা স্বাভাবিক লোভ আছে। সঙ্গে যদি নারীঘটিত ব্যাপারের ফোকন দেওয়া হয় তবে আকর্ষণটা আরও বাড়ে। কিন্তু সেখানে আবার মানুষের নৈতিক বিকৃতি লাভের আশঙ্কা ঘটে। কাজেই নিছক কাল্পনিক অবাস্তব কতকগুলি বিকৃতকৃতির গল্প পরিবেশন করার সময় পাঠকের নৈতিক বিকৃতিপতাকে এড়ানোর জন্য এই লেখকেরা গল্পের মধ্যে মাঝে মাঝে কিছু কিছু মানবীয় স্বত্তির সমাবেশ ঘটান।

সাম্প্রতিক সাহিত্য থেকে আমি তিন জাতীয় মূল্যবোধের পরিচয় দিলাম। উদাহরণ বেশি উল্লেখ করিনি, কিন্তু আশা করি উদাহরণ খুঁজে পেতে আধুনিক পাঠকের খুব অসুবিধা হবে না। এই মূল্যবোধগুলি সবই পুরোনো যুগের সাহিত্যের থেকে ধার করা; আধুনিক জিজ্ঞাসার সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই।

৪। দৃষ্টিভঙ্গী। দৃষ্টিভঙ্গী আর মূল্যবোধের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও মাঝে মাঝে তফাৎও দেখা যায়, যেমন আধুনিককালের লেখকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। আধুনিক লেখকদের লেখায় যে সব মূল্যবোধ স্থান লাভ করেছে সেগুলো আধুনিকতার মাপকাঠিতে অচল হলেও সমাজদেহের কোনো কোনো অংশের বিচারবুদ্ধিতে তাদের অস্তিত্ব আছে। সেই হিসাবে এগুলো সাহিত্যে প্রবেশ করার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু এই লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী কি সমাজদেহের কোনো ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীর অঙ্গুয়ানী? বোধ হয় না।

কলোনিয়ালকালীনদের একটা অপরিণত বিদ্রোহাত্মক মনোভাব ছিল। সামন্ততন্ত্রের

বিরুদ্ধে ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সপক্ষে তাঁদের মনোভাব খুব স্পষ্ট ছিল। কল্লোলীয় মূল্যবোধ আধুনিকদের মধ্যে আছে; কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গী কি আছে? খুব সম্ভব নেই।

তাদের লেখায় যে স্ব-বিরোধ এবং আন্তরিকতার অভাব দেখা যায় তা ব্যবসাদারী মনোবৃত্তির লক্ষণ। বস্তুত ব্যবসাদারী দৃষ্টিভঙ্গী আজকের বাংলা সাহিত্যে প্রায় নিবিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে এ-কথা অস্বীকার করা শক্ত। ‘প্রফেশনাল পারফেকশন’ বলে একটা কথা আছে যা সব ব্যবসায়ীরাই আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেন। আধুনিক লেখকেরা টেকনিকগত উৎকর্ষের দিকে যে-পরিমাণ মনোযোগ দেন তা ব্যবসায়ীমূলভ। ভাষার উজ্জ্বলতা এবং সাবলীলতা, উপমাব্যবহারের নৈপুণ্য, চরিত্রচিত্রায়ণে চরিত্রের গভীরে না-চুকে তাকে খাপছাড়া ও চিত্তাকর্ষক করার দক্ষতা, এবং সর্বোপরি গল্পের জন্য একটি অমুকুল আবহাওয়া সৃষ্টির কৌশল—এসব ব্যাপারে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে অন্তত খানিকটা কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। কিন্তু বাস্তবকে বিশ্লেষণ করা বা সূঁচু কোনো বস্তুব্যাকে উপস্থিত করার দিকে তাদের চেষ্টার অভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

মোট কথা, ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গী বাংলা সাহিত্যে অতি দ্রুত অনুপ্রবেশ করেছে একথা যে-কোনো অভিনিবেশশীল পাঠকের নজরে পড়বে। এমন কি বামপন্থী লেখক সমরেশ বসু বা দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় যে ব্যবসাদারী মনোবৃত্তির একেবারে উর্ধ্ব একথা জোর করে বলা যায় না।

কল্লোলকালীন লেখকেরা তাদের সৃষ্ট সাহিত্যকে নিঃসন্দেহে ভালবাসতেন। আধুনিক লেখকদেরও সাহিত্যপ্ৰীতিতে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই, নতুবা পয়সা রোজগারের এত রকম ব্যসসা থাকতে সাহিত্য বিক্রির ব্যবসাটাই তারা বেছে নেবেন কেন? তাছাড়া বাংলা দেশের মত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেও সাহিত্য-চর্চা করে পয়সা রোজগার করতে পারবেন এ আশ্ববিশ্বাস তাদের আছে। এবং জাতীয় জীবনে আশ্ববিশ্বাস একটি প্রয়োজনীয় গুণ।

নৈরাশ্ববাদ, বীভৎসতা-প্ৰীতি, মবিডিটি প্রভৃতি মনোভাবগুলি অধিকাংশ তরুণ লেখকেরই বিভিন্ন লেখার আনাচে কানাচে লক্ষ্য করা যাবে। দীপক চৌধুরীর ‘এই গ্রহের ক্রন্দন’, যাযাবরের ‘জনাস্তিক’ প্রভৃতি বইতে শুধু যে নৈরাশ্ববাদের প্রাধান্য আছে তা-ই নয়, মানুষের বেঁচে থাকার মধ্যে সে একটা স্বাদ আছে যা নৈরাশ্ববাদী লেখকদের লেখাকেও রসান্বিত করে, সে-বোধেরও অভাব আছে। নৈরাশ্বের বোধ বর্তমান সমাজে এত ব্যাপক এবং গভীর-যে কোনো আধুনিক লেখকের মধ্যে তার উপস্থিতি নিস্কার্ষক নয়। কিন্তু আধুনিক তরুণ লেখকদের মধ্যে নৈরাশ্ববাদ কতখানি আন্তরিক আর কতখানি ভঙ্গী-মাত্র, তা বিশেষভাবে অনুধাবন-সাপেক্ষ। সমাজের, জাতির বা বিশ্বমানবের মনে আজ যে নৈরাশ্বের স্ফূর্তি পুঞ্জীত হয়ে উঠেছে তা এই লেখকেরা নিজেরা কতখানি উপলব্ধি করেছেন, সেইটেই আশ্ব বিচার করার সময় এসেছে।

পক্ষান্তরে জীবনের অনেক কদর্যতা আর বিকৃতির মধ্যেও কিছু কিছু মানবীয়

গুণ যারা তাদের লেখায় খুব ফলাও করে উপস্থিত করেন তাদেরকেও তাই বলে আশাবাদী বলা শুরু। প্রত্যেক মানুষই সামাজিক অর্থে ভাল এবং মন্দের সংমিশ্রণ, কারণ ব্যক্তিসত্তা হিসাবে সে ভালও নয় মন্দও নয়। যে মানুষ সমাজের ক্ষেত্রে ব্যাপক হলাহল উদগীরণ করছে তার মধ্যে কোথাও একটুখানি মানবিক গুণ থাকলেই-বা তার মূল্য কতটুকু? যে-মানবিক গুণ বর্তমান সমাজজীবনের ব্যাপক অমানুষিকতার বিরোধিতা করে সমাজ বা এমন কি ব্যক্তির জীবনেও আব্রপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার শক্তি রাখে না, আধুনিক সাহিত্যে তার কোনো মূল্য নেই। যেমন, যে লোক চোরাকারবারী তার দেওয়া দানছত্র থেকে আমরা দান নেই বটে কিন্তু তাকে উপহাস করতেও ছাড়ি না। সেই দানকে যেমন আমরা কোনো মর্যাদা দেই না, তেমনি যে নারী বহু পুরুষকে প্রভারণা করেছে তার মধ্যে কোনো পুরুষের প্রতি অনন্তনিষ্ঠ ভালবাসা আছে এ-কথা ধরে নিলেও সে ভালবাসাকে আমরা তাৎপর্যপূর্ণ বলে গ্রহণ করতে পারি না। যে-মানবিক গুণ তাৎপর্যপূর্ণ নয় তার চিত্র খুব নাটকীয়ভাবে উপস্থিত করলেই তাতে আশাবাদ সূচিত হয় না।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি আধুনিক বাঙালী লেখকদের মধ্যে যাদের নৈরাশ্রবাদী বলে মনে হয় তারাও আসলে নৈরাশ্রবাদী নন; আবার যাদের আশাবাদী বলে মনে হয় তারাও আসলে আশাবাদী কিনা সন্দেহ।

॥ বাস্তবের বিশ্লেষণ ॥

মূল্যবোধ আর দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে আধুনিক লেখকদের এই যে স্বভাব আর অনিশ্চয়তা তার আসল কারণ হল জীবনের সঙ্গে লেখকদের যথেষ্ট প্রত্যক্ষ সংযোগের অভাব। এ-কথা অবিশিষ্ট বলা হয় যে প্রকুর রায় ব্যক্তিগতভাবে নাগাদের জীবন যাত্রা দেখে নাগা কাহিনী লিখেছেন, বা ছোঁতিরিঙ্গ নন্দী 'বারো ঘর এক উঠানে' বর্ণিত একটি বাড়ির মধ্যে নিজে বসবাস করতেন। তাদের এই অভিজ্ঞতা অবিশিষ্ট নিষ্ফল হয়নি। কাহিনী ও চরিত্রের বহিরঙ্গ তারা একটা বাস্তবতার রঙ দিতে পেরেছেন। তবু আমার মনে হয় তাদের এই অভিজ্ঞতা যথেষ্ট নয়। অধিকাংশ সময়েই তারা বাস্তবকে তারাক্ষর বা মানিক বা সমারগেট মন্দের চোখ দিয়ে দেখেন। মুন্সিল এই যে, জীবনের যে অংশটুকু আমাদের চোখে পড়ে তা দিয়ে সাহিত্য হয় না। কতকগুলো মানুষের বাইরের কতকগুলো ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করা রিপোর্টারের কাজ, সাহিত্যের কাজ নয়। সাহিত্যকে মানুষের অন্তরলোকে প্রবেশ করতে হবে; বাইরে যা ঘটে তার কার্যকারণের অনুসন্ধান করতে হয় মানুষের অন্তরে। তা ছাড়া একজন মানুষের প্রতিভা উপস্থিত করাই তো যথেষ্ট নয়, সে লোকটাকে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক মানুষ হওয়া চাই। কাজেই বাস্তবের অভিজ্ঞতা বলতে তিনটি জিনিষ বোঝায়, প্রত্যক্ষ সংযোগ, বাস্তবকে দেখার চোখ যা সেরা সাহিত্যিকদের সাহিত্য-পাঠ থেকে জন্মায়, এবং বর্তমান সমাজ সম্পর্কিত মননশীলতা। অবিশিষ্ট সাহিত্যের ক্ষেত্রে মননশীলতার সামান্যই মূল্য আছে যদি না তা জীবনসত্যকে আবেগবান উপলব্ধিতে পরিণত হতে সাহায্য করে। কিন্তু উল্লিখিত তিনটি জিনিসের যথোচিত সমন্বয় কোনো আধুনিক লেখকের মধ্যে ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

লেখকেরা যতক্ষণ দৃশ্যমান বাস্তবের উপর প্রধানত দৃষ্টিকে সামাবদ্ধ রাখেন ততক্ষণ তারা ভাল লেখেন। রমাপতি চৌধুরী এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কিছু কিছু ভাল গল্প আছে, যেখানে তারা নির্ভার সঙ্গে বাস্তবকে অনুসরণ করেছেন। সমরেশ বসুর তো বেশ কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর ভাল গল্প আছে। কিন্তু যেখানেই তারা দৃশ্যমান বাস্তবের উদ্দেশ্যে উঠে অপ্রত্যক্ষ বাস্তবকে কল্পনার মাধ্যমে ধরতে চেষ্টা করেছেন তখনই সে-কল্পনা উন্মার্গগামী হয়ে গেছে। আধুনিক ছোট গল্পের মধ্যে এক্সেসপসনাল চরিত্র ও ঘটনার ভিড় বেশি। এই এক্সেসপসনাল-এর প্রতি নির্দারুণ মোহ উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটু কম প্রকট হলেও অনুপস্থিত নয়। লেখকেরা অনেক সময় ভুলে যান যে সাধারণকে অসাধারণ করে তোলা এবং বাস্তবে কচিৎ কখনো দেখা মেলে কি মেলে না বলে অসাধারণ এ-ছাড়া জিনিস এক নয়। এ প্রসঙ্গে ওয়ার্ডস ওয়ার্থ এবং কোলরিজ কৃত ফ্যান্সী এবং ইমাজিনেশন-এর পার্থক্য নিরূপণটি স্মরণীয়। বাস্তবের বিভিন্ন টুকরো ঘটনাকে সংযুক্ত করে খুব চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক একটি চিত্র তৈরী হতে পারে কিন্তু তার কাজ শুধু ক্ষণিকের মনোরঞ্জন। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ বা অবজ্ঞাত বাস্তব সত্যকে লেখক যখন কল্পনায় অনুভব করে অভিরঞ্জনের সাহায্যে পাঠকের সামনে যথোচিত চিত্তাকর্ষক করে তুলে ধরেন তখন তা প্রকৃত শিল্পীসুলভ কল্পনা। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-তারাশঙ্কর-মানিকের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশ যে কল্পনা কুশলতাকে আশ্চর্যজনকভাবে আয়ত্ত করেছে, সাম্প্রতিকতার অনূর্বরতায় তা যেন আজ স্তিমিত।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাহিত্যের যে-সব লক্ষণগুলির কথা এতক্ষণ আলোচনা করলাম তাদের মধ্যে আশার লক্ষণ খুব সামান্য। তবে কি বাংলা সাহিত্যে সুলক্ষণ কিছু নেই? আছে।

॥ বিষয়বস্তুর সম্প্রসারণ ॥

প্রধানত মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক বাংলাসাহিত্য আজ দিকে দিকে অভিযান চালিয়েছে। কলোনিয়ালের প্রেমেন্দ্র মিত্র আর শৈলজ্ঞানন্দের মধ্যে যার সূত্রপাত, তারাশঙ্কর মানিক যে প্রয়াসকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, তার ধারাটি আজও অব্যাহত আছে। কৃষক ও শ্রমিক, বিভিন্ন নিম্নবিত্ত শ্রেণী, বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত সমাজ, এ সবই আজকে সাহিত্যিকের কাহিনীর মধ্যে ধরা পড়েছে। অপেক্ষাকৃত প্রবীন লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' ও নরেন্দ্র মিত্রের 'চেনা মহল' সতীনাথ ডাছড়ীর 'চোঁড়াই চরিত' এবং আধুনিকদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর ও এক উঠান', সন্তোষ ঘোষের 'কিছু গোয়ালার গলি' অষ্টমত মল্ল বর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম', সমরেশ বসুর 'উত্তরঙ্গ' অমিয়কুমার মজুমদারের 'নীল ডু ইএল' এবং 'গড় শ্রীধর' প্রভৃতি বইএর গুরুত্ব কখনোই উপেক্ষা করা চলে না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাহিনীর বদলে এই বইগুলিতে সমাজের কোনো অংশের কয়েকজন নায়কের মাধ্যমে সমাজের একটি ব্যাপক চিত্র উপস্থিত করার প্রয়াস দেখা যায়। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার বদলে সমাজকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তি যে সমাজের অংশ এবং সমাজের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া ব্যক্তির অনুশীলন যে অসম্পূর্ণ এই সমাজতান্ত্রিক সূত্র, এই বইগুলিতে স্বীকৃত। অনেক বইতেই হয়তো

উপন্যাসোক্ত বিভিন্ন কাহিনী বিচ্ছিন্ন ঘটনাসমূহের সাধারণ সংযোজকে পরিণত হয়েছে, অর্গানিক হোল হয়ে ওঠেনি ; একটি বলা কাহিনী অনেক না-বলা কাহিনীকে উদ্ঘাটিত করে তুলতে পারেনি । তবু প্রথম প্রয়াস হিসাবে এই বইগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য ।

আধুনিকতার দ্বিভাঙ্গা এই বইগুলিতে আছে, যদিও বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে তার জবাব দিয়েছেন । উৎকর্ষতার মানও বিভিন্ন লেখকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন । এবং এ-কথা হয়তো ঠিক যে পাঠকমানসে আধুনিকতার যে অসুচ্যারিত উপলব্ধি আছে কোনো লেখকের কলমেই এখন পর্যন্ত তা পুরোপুরি ধরা পড়েনি ।

উল্লিখিত বইগুলোর সঙ্গে পাঠকসাধারণ যথেষ্ট পরিচিত ; তাই এ-গুলো সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক, কিন্তু অনিয়মিত নজরদার সাহিত্যে নিতান্ত নবাগত বলে, এবং পঞ্চাশোত্তর লেখকদের মধ্যে তার শ্রেষ্ঠত্ব একরকম সংশয়াতীত বলে তার সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা দরকার । 'গড় শ্রীধর' বইতে তিনি উত্তরবঙ্গের একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চলের ব্যাপক চিত্র উপস্থিত করেছেন । বিভিন্ন সমাজ ও শ্রেণী থেকে তিনি চরিত্র নির্বাচন করেছেন । তিনি শুধু-যে চরিত্রগুলিকে শ্রেণীগত প্রতিনিধি হিসাবে সজীব করে তুলেছেন তাই নয়, তাদের মধ্যে যুক্তি অসুযায়ী 'মোটিভ'-এর কার্যকলাপ দেখিয়েছেন ; এবং তারা তাদের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যে কোনো-না-কোনো রকমের জীবনদর্শনে পৌঁছতে পারে তা-ও দেখিয়েছেন । তার দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা বহর মধ্যে একেবারে বাবীজির দৃষ্টিভঙ্গী, এবং এই জটিল জিনিসটাকে তিনি সার্থকভাবে কাহিনীতে উপস্থিত করেছেন । তার নীতি অনেকটা জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে পঞ্চাশোত্তর নীতি । ভারতবর্ষে বহু শ্রেণী, বহু জাতি, বহু সমাজ ও বহু রকমের চরিত্র আছে, একমাত্র চরম মতালম্বীদের বাদ দিলে এরা সবাই একটি উচ্চ নৈতিক মান এবং কতকগুলি মানবীয় গুণ আয়ত্ত করে নিজের নিজের চৌহদ্দীর মধ্যে জীবনযাপনের অর্থ খুঁজে পেতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করেন । এই সরল বিশ্বাস তার আছে বলে যে নিদারুণ সংগ্রাম আর যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে আধুনিক মানুষ বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে বেড়াচ্ছে, মহামুদ্র-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গার চিত্র দেখেও তিনি তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না । তার চরিত্রেরা খুব সহজে নৈতিক এবং মানবিক গুণের অধিকারী হয়ে উঠছে বলে তিনি যে চিত্র দিয়েছেন, কাহিনীর সীমার মধ্যে তা প্রত্যয়গ্রাহ্য হলেও, আশাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা মেলে না । বুর্জোয়া অর্থনীতি-যে বিভিন্ন শ্রেণী ও সমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ভেঙে দিয়েছে, শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক-যে নৈতিক ও মানবিক গুণসমূহের বিকাশের পরিপন্থী, এসব সত্যকে তিনি অস্বীকার করেন বলে প্রত্যেক মানুষ তার নিজের গভীর মধ্যে একটি স্মৃষ্টি জীবন-দর্শনে পৌঁছতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না । এ কখনো আধুনিকতার উপলব্ধি হতে পারে না । মানুষ তার গভীর অভিজ্ঞতা করে বিশ্ব-মানবিকতার 'সম্মুখীন' হতে না পারলে এ-যুগের মানুষের মুক্তি সম্ভবপর বলে মনে করা যায় না ।

বাস্তব চরিত্র ও বাস্তব পরিবেশের উপর যথেষ্ট দখল আছে বলেই অস্বাভাবিক আধুনিকতার এমন অনাধুনিক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন ।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রভৃতি লেখকেরা সমাজ-জীবনের ডিগইনটিগ্রেশন-এর চিত্র দিয়েছেন : অমিয়কুমার স্বতন্ত্রভাবে সমাজের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন-এর কাজ চলছে এই চিত্র দিয়েছেন ।

সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার যে-কয়টি প্রচেষ্টা হয়েছে তাদের সপক্ষে বলার খুব বেশি কিছু নেই । বিমল মিত্র, রমাপতি চৌধুরী, প্রফুল্ল রায় প্রভৃতি লেখকদের এই পর্যায়ের যে-কথানি বই আজ অবধি প্রকাশিত হয়েছে তার প্রায় সবগুলিই প্রধানত রূপকথা-ধর্মী । যে-ধরনের সুখপাঠ্য রোমাঞ্চকর কাল্পনিক কাহিনী বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা সম্ভব নয়, ইতিহাসের ক্ষেত্রে স্বল্প মালমশলার উপর ভিত্তি করে লেখকেরা সেই কল্পনাকে উপস্থিত করার স্বেযোগ পেয়েছেন । অনেক বইতেই দেখছি তারাকর এবং ক্রয়েডের একটি সরলীকৃত সমন্বয়কে লেখকেরা ফরমুলা হিসাবে ব্যবহার করেছেন । কিন্তু এই-প্রয়াসগুলির মধ্যে নারায়ণবাবুর..... একমাত্র ব্যতিক্রম । বইটির কাল্পনিক অংশ সম্পর্কে যাই সন্দেহের অবকাশ থাকুক না কেন, ঐতিহাসিক অংশে লেখক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন ।

আর এক জাতের কয়েকজন লেখক বাংলাসাহিত্যের সম্প্রসারণের দিকে উল্লেখযোগ্য সংযোজন করেছেন । মননধর্মী উপন্যাসিকদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাট্টা এবং হালের অসীম রায়ের নাম উল্লেখ করতে হয় । প্রথমোক্ত দুজনের মধ্যে মননধর্মী লেখক-মানসে কাহিনীর পশ্চাত্তুনি হিসাবে কাজ করেছে । কিন্তু অসীম রায়ের ‘দ্বিতীয় জন্ম’ কাহিনীর চরিত্র নিজেই মননধর্মী, এবং চরিত্রটি নয়, তার মননপারস্পর্যই বইয়ের প্রধান আকর্ষণ । এই হিসাবে অসীম রায় ধূর্জটি প্রসাদের ‘অন্তঃশীলার’ অনুবর্তা । বলা বাহুল্য এই জাতীয় মননধর্মিতা উপন্যাসের পক্ষে খুব উপযোগী নয় । তবে নানা জাতীয় রচনার মধ্যে এই জাতীয় দু চারখানা বই নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে ।

সুবোধ ঘোষের প্রধান বিশেষত্ব সৌনিসিদ্ধম্, যদিও আনরা জানি এটি আসলে পূর্ব যুগের বিশেষত্ব, এ যুগের নয় । আধুনিক লেখকের পক্ষে ব্যঙ্গ মিশ্রিত উদাসীনের আশ্রয় ত্যাগ করে আরও প্রত্যক্ষভাবে আরও গভীরভাবে জীবনের মুখোমুখী দাঁড়ানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ।

সতীনাথ ভাট্টা এবং অসীম রায় এ দুজনের উপরই একজিস্টেনসিয়ালিজম-এর প্রভাব পড়েছে বলে আমার বিশ্বাস । ‘সংকট’ বইতে সতীনাথ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে জীবনের কোনো কোনো মুহূর্তে যখন মানুষের আন্তরপ্রকৃতির এক বিশেষ অকল্পনীয় উন্মোচন হয় তার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন । আমার মনে হয় এটা এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তির ফল ।

অসীম রায়ের ‘দ্বিতীয় জন্ম’ সাম্প্রতিককালের এক বহু আলোচিত বই । ভঙ্গিপ্রধান এই বইখানিতে ভাষায় এবং কাহিনী-সংস্থাপনে লেখক সত্যিই যথেষ্ট মুন্সীমানার পরিচয় দিয়েছেন । এই বইয়ের নায়কের প্রসঙ্গ হল, কী ভাবে তাৎপর্য পূর্ণভাবে বেঁচে থাকা যায় । এটি আধুনিকযুগের একটি অন্ততম প্রশ্ন । যে-সব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বুদ্ধিজীবী জীবনে অসাধারণত্ব অর্জন করতে চেয়ে বিফল হয়েছেন

এ-প্রশ্ন তাদের। কয়েকরকমের জীবন-যাত্রার উদাহরণ দেখে নায়ক শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, নিছক বাঁচার জন্যই যে বেঁচে থাকা, ছোট খাট স্থূল দৈহিক সুখের জন্য যে-বেঁচে থাকা, তাই যথেষ্ট মূল্যবান। পৃথিবীতে অসাধারণত্ব মাত্র ছ'চারজনের জন্য, তারা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম। এ-সিদ্ধান্ত আসলে প্রশ্নের জবাব নয়, নায়ক তথা লেখক প্রশ্নের কোনো জবাব না পেয়ে এই সিদ্ধান্তের মধ্যে সাহসনা খুঁজতে চাইছেন। জীবনের বিবর্তনে মানুষের যে সক্রিয় ভূমিকা আছে, এ-সিদ্ধান্ত তা অস্বীকার করে। ছোটখাট সুখের জন্য, বা সুখের অভাবের জন্য, সাধারণ মানুষ যে অসাধারণ কাজ করে এ-সিদ্ধান্ত তা-ও অস্বীকার করে।

অসীম রায়ের উদ্ভূত খুবই প্রশংসনীয়, কিন্তু তার মননশীলতা বড়ই স্বল্পপ্রাণ। অথচ এই মননশীলতার জন্য লেখককে একটি কৃত্রিম কাহিনী সৃষ্টি করতে হয়েছে ও কতকগুলি খুব চকচকে, অথচ কৃত্রিম চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছে।

চরিত্র সৃষ্টির প্রসঙ্গে একটি কথা না-বলে পারছি না। শুধু অসীম রায়ের মধ্যেই নয়, আধুনিক প্রায় সমস্ত লেখকের মধ্যে, এমন-কি নরেন্দ্র মিত্রের মধ্যেও, একটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি যে যখনই যে-কোনো স্তরের চরিত্রই কথা বলতে শুরু করে, তখনই স্বয়ং দেবী সরস্বতী তার কণ্ঠে ভর করেন। যে কোনো ধরনের সংলাপেই এমন শানিত ঔজ্জ্বল্য এবং এমন অলঙ্কার ব্যবহারের নৈপুণ্য চোখে পড়বে যে কোনো পাঠক যদি শুধু সংলাপগুলি পড়েন তো তিনি ধারণা করবেন-যে বাংলা সাহিত্যে শুধু একটি চরিত্রই সৃষ্টি করা হয়। সে-চরিত্রটি শরৎচন্দ্রের কমল। হয়তো আধুনিক কালের সংলাপের এই চরিত্রহীনতার জন্য রম্যরচনার প্রভাবই মুখ্যত দায়ী।

॥ বাস্তবতা ॥

তা ছাড়া বঙ্কিম-রবীন্দ্রের ঐতিহ্য অনুসরণ করে বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার ধারাটি খুব শক্তিশালী না-হয়ে উঠলেও আজও অব্যাহত আছে। এই আশাভঙ্গ ও ভঙ্গুরতার যুগে এটুকুও নেহাৎ কম লাভ নয়। যে রম্যপতি চৌধুরী 'লালবাঈ' লিখেছেন তিনিই আবার 'প্রথম প্রহর' লিখেছেন এবং কদলাখনি সংক্রান্ত গল্প লিখেছেন। নরেন্দ্র মিত্রের গার্হস্থ্য-সমস্যা কেন্দ্রিক বাস্তবতায় সংযম ও পরিমিতি বোধ খুব উল্লেখযোগ্য। তার লেখা বিভিন্ন গল্পে এবং উপন্যাসে এই বাস্তবতা ছড়িয়ে রয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তার রচনার মধ্যে কৃষক-বিদ্রোহ, আগষ্ট-বিপ্লব এবং বঙ্গবিভাগকালীন রাজনৈতিক সমস্যা প্রভৃতি বিষয়কে উপজীব্য করেছেন।

বাস্তবতার ক্ষেত্রে বামপন্থী সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টাকেও তুচ্ছ করা উচিত নয়। বামপন্থী সাহিত্যিকদের অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে পথ তৈরি করতে হয়েছে। তাদের সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে পরিষ্কার তিনটি স্তর আবিষ্কার করা যায়। প্রথম পর্যায়ে শোষণের ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা দেখা গিয়েছিল, যেমন মনোরঞ্জন হাজারার 'নোঙর ছেঁড়া নোকা', তারাকঙ্করের 'চৈতালী ঘুণি'। কিন্তু দেখা গেল ঘটনা যদি এগিয়ে যায় আর চরিত্র যদি পিছিয়ে থাকে তবে তাতে সাহিত্যিকর্ম ব্যাহত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে রাজনীতিকের দৃষ্টিতে বাস্তবকে দেখার

চেপ্টা চলেছে ; যেমন সুশীল জানা এবং ননী ভোমিকের কতক কতক গল্প । গোপাল হালদারের ‘একদা’ বইখানা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও এর এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম । পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তৃতীয় পর্যায়ের লেখকেরা ভিন্ন রাস্তা ধরেছেন । সমরেশ বসু, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকেরা প্রধানত মানুষ চেনার কাজে বেরিয়েছেন । বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের লোকদের চরিত্রকে তারা উদ্ঘাটন করছেন । এ কাজ যে খুব প্রয়োজনীয় সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । এবং বাস্তবের মানুষের চরিত্রকে অনুসন্ধান যে সাহিত্যিকের প্রাথমিক কর্তব্য এ-কথাও বলা বাহুল্য । তাছাড়া চরিত্রকেদ্রিক কাহিনী অনায়াসে সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠে ।

দুঃস্থ কৃষিজীবীদের কেন্দ্র করে তরুণ লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মন যে-বইখানা লিখেছেন বাস্তবতার ক্ষেত্রে তা একটি খুব বলিষ্ঠ সংযোজন । এই লেখকের সুস্থ এবং নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গী যে ভরসা সৃষ্টি করেছিল, তার অকালমৃত্যুতে সে ভরসার সমাধিলাভ ঘটেছে ।

কিন্তু আধুনিকতার জিজ্ঞাসা কি বামপন্থী সাহিত্যে আছে ? কিংবা সমাজ জীবনের সামগ্রিক অধ্যয়ন ? এ কথার উত্তর খুঁজতে গেলে নীরব হতে হবে ।

এক কাথায় বলা চলে, আমরা হয়তো কোথাও কোথাও আধুনিকতাকে স্পর্শ করতে চেপ্টা করেছি, কিন্তু আধুনিকতা আজও অনায়ত্ত—পাঠকের মনের একটি অপরিভূপ আকাঙ্ক্ষা মাত্র ।

॥ সামাজিক পরিবেশ ॥

সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যের এই অক্ষমতার জন্য সাহিত্যিকদের উপর অসঙ্গত দোষারোপ করার কিছু নেই । সাহিত্যিককে যদি যুগের বিচারক বলে স্বীকার করতে হয়, তবে তিনি-যে যুগের অসহায় শিকার তা-ও মানতে হয়, কারণ তার সংবেদনশীল মনে যুগের ক্ষয়িষ্ণু চিন্তাধারাও খুব সহজে প্রবেশাধিকার পায় । লেখকদের মধ্যে যে আধা-রোমান্টিক ক্ষয়িষ্ণুতা এবং ক্রয়েডীয় নিউরোসিসের এত প্রাচুর্য দেখা যায় তার কারণ রয়েছে সমাজ-দেহের মধ্যে । সমাজ আজ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে : পুরোনো নৈতিকতার আশ্রয়স্থল ভেঙে গিয়েছে, কিন্তু তার জায়গায় নতুন মূল্যবোধ দানা বেঁধে উঠেনি । মানুষের মনের আশ্রয়স্থল ভেঙে গিয়েছে বলে মানুষ আজ একান্তভাবে পরসাকেই চরম মূল্যবান বলে মনে করছে এবং যে কোনো উপায়ে পরসা রোজগারের নেশায় মেতে উঠেছে । পরসা রোজগারের নেশার মধ্যে যে-ক্রান্তি আছে তা আত্মিক ও মানসিক রিক্ততার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে । সারাদিনের কর্ম-ক্রান্তির পর ঝিমিয়ে-পড়া স্নায়ু নিয়ে মানুষ যখন ঘরে ফিরে আসে তখন তার সেই স্নায়ুকে উত্তেজিত করার জন্য কড়া মদ দরকার । সেই কড়া মদ সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছে আধুনিক সাহিত্য ।

কারণ আধুনিক সাহিত্যিকদের পরসা রোজগারের প্রয়োজন বেশি । এককাল পর্যন্ত বাংলাদেশে যারা সাহিত্য-চর্চা করতেন তারা বেশিরভাগ এসেছিলেন বিত্তবানদের ঘর থেকে । সাহিত্য তাদের নেশা ছিল, পেশা নয় । কিন্তু বাংলাদেশের বিত্তবানেরা

সংস্কৃতিক্ষেত্রে খুব ভাড়াভাড়ি এত নিঃস্ব হয়ে পরেছেন যে সাম্প্রতিককালে তারা একজনও উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের যোগান দিতে পারছেন না। সাহিত্যিকদের যোগান আসছে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। পরিশ্রম করে বই লিখতে হলে তাদের পারিশ্রমিক চাই। সাহিত্য আজ খুব স্থূল অর্থে পণ্য, যেমন পণ্য হলিউডের বা বোম্বাইর ছবি, 'পথে হল দেবী' শাড়ী, সূচিক্রার গলার হারের লকেট, বা সন্ধ্যাবেলায় রাস্তার মোড়ে মুখে খুব বেশি পাউডার ঘষে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে থাকে।

অপেক্ষাকৃত চড়া দামে সাহিত্যিকদের কিনে নেওয়ার জন্যও আজকে বনেন্দী প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে। একদিকে সিনেমা আর একদিকে সরকারী সাহায্যপুষ্ট রবীন্দ্রপুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কার প্রভৃতি। এদের চাহিদার একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে : সস্তা অগভীর অথচ চটকদার রোমান্টিসিজন্স আর ভাববাদী প্যাচপেঁচে 'কাবুলিওয়ালার' মত ছবি এবং 'দাগর থেকে কেয়ার' মত কাব্য-গ্রন্থ।

সাহিত্যকে ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আজ বাংলাদেশে এবং সাহিত্যিকরা ব্যবসায়ী হচ্ছেন।

বুদ্ধিমান ছেলেরা আজকাল সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হয় না। তারা বিজ্ঞান পড়ে,—অবিশিষ্ট বিজ্ঞানচর্চা করার জন্য নয়,—ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য। আজ যে ইঞ্জিনিয়ার রিফিউজীদের জন্য সরকারী টাকায় বাড়ি তৈরী করেছেন এবং যে-বাড়ি সামান্য বাতাসে ভেঙে পড়ে অবাস্তবদের আবার রাস্তায় তাড়িয়ে দিচ্ছে, সেই ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে যে দুর্লভ সাহিত্য-প্রতিভা ছিল না, এ কথা কি জোর করে বলা চলে? প্রতিভা যে কোনো উপায়েই হোক আব্রুপ্রকাশ করেই এ কথা তো নেহাৎ-ই একটা বিশ্বাস। ভাল ধানের বীজকে খুব যত্ন করে আলমারীর মধ্যে রেখে দিলে তা থেকে কি ধানের চাড়া জন্মায়?

মাঝারিগোছের যে-সব মেধাবী ছেলে কলা বিভাগে পড়তে আসে তাদের জন্যও আই, এ, এস্ ও বি, সি, এসের দরজা আজকে প্রসারিত। এ-দেশের শ্রেষ্ঠ মেধা আজকে হারিয়ে যাচ্ছে সুবিধাবাদের ঘর্ষর নিনাদের মধ্যে, কায়মনোমগ্নতার নোহুদী ফুলে সজ্জিত গোলামখানায়। কাজেই এতে বিশ্বাসের কিছু নেই যে আজকে যারা সাহিত্যের আসরে লেগে রয়েছেন তাদের মধ্যে উচ্চ-অ্যাকাডেমিক শিক্ষা-প্রাপ্ত প্রকৃত মেধাবী ছাত্রের সংখ্যা কম। অথচ উচ্চ-অ্যাকাডেমিক শিক্ষা আজকের দিনের সাহিত্য-চর্চার পক্ষে শুধু 'হলে ভাল হয়' নয়, অত্যাৱশ্যক। উচ্চ অ্যাকাডেমিক শিক্ষা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে আমি অবিশিষ্ট সমার্থক বলে গণ্য করছি না।

সাহিত্যিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা কমেতে কমেতে আজ প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে। কোনো-না-কোনো গোপ্পিতে নাম লেখাতে না-পারলে আজকের সাহিত্যের বাজারে পদক্ষেপ করা প্রায় অসম্ভব। এবং গোপ্পি-মাত্রই সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতকগুলো নির্দিষ্ট মানের পরিপোষক। সাহিত্যের বাজারের পনের আনা ঘাদের হাতে তারা স্বাধীনতার খুব সাদৃশ্য-প্রবক্তা বটে; কিন্তু স্বাধীনতাপ্রার্থীকে তাদের ছাঁচের

নিদিষ্ট মাপ অনুযায়ী নিজেকে ছাঁটকাট করে নিতে হয়। একমাত্র ক্ষয়িষ্ণু ধর্মী অথবা পুরোনো মূল্যবাহক সাহিত্যসৃষ্টি করলেই স্বাধীনতার মান বজায় থাকে, স্বাধীনতা প্রার্থীদের এ-কথাটা বুঝতে পারা চাই। যে-সব মানুষের হাতে সাহিত্যের সিংহ দরজায় প্রবেশের চাবিকাঠি তাদের সাহিত্যের জ্ঞান খুবই বেশি, একথা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে ধরে নিতে হবে, কারণ বড় বড় সাহিত্যিকরাও তাদের মোটা পায়ে নিয়মিত তৈল সিঞ্জন করেন।

বামপন্থী পত্র-পত্রিকাগুলিতে আজকাল স্বাধীনতার কদর বেড়েছে; অর্থাৎ যে লেখায় সাহিত্যিকের পিছনে রাজনীতিক বসে নেই সে-লেখাও তারা আজকাল ছাপছেন। কিন্তু প্রত্যেকটি পত্রিকার চারপাশে একটি করে গোপ্তা আছে, এবং পত্রিকাগুলি খুবই স্বল্প-পরিসরের। অতএব ‘ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী’। তাছাড়া যেখানেই যাওয়া যাক সেখানেই একথা ধরে নিয়ে যেতে হবে যে সাহিত্য বিচারের গোপন চাবিকাঠিটি একমাত্র তাদেরই করায়ত্ত।

তবু ভরসার কথা এই যে বাংলাদেশে সচেতনভাবে প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যিক খুব বিরল। কোনো লেখক বুঝে-বুঝে অ্যামেরিকান জীবনযাত্রা প্রণালী শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছেন বলে আমি জানি না। ‘পাতালে এক ঋতুর’ লেখকের রূপান্তর এ-দিক দিয়ে খুবই লক্ষ্যণীয় ঘটনা। মতভেদ এবং সংশয় যেখানে আন্তরিক সেখানে তা স্বাস্থ্যকর। আর অবিশ্টি আছে ঈর্ষা, সেটা খুব স্বাস্থ্যকর নয়। তবে মধ্যবিত্ত ঘরের লেখকদের ক্ষেত্রে সেটা ক্ষতিকর হলেও স্বাভাবিক।

আমার এ আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। তবু এর শেষ পর্যায়টা এখনো বাকি।

II. আধুনিকতার অনুসন্ধান II

আধুনিকতার মাপকাঠিতে আমি আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সেই আধুনিকতা যে কী করে আয়ত্ত করা যায় সে-সম্পর্কে ছ’এক কথা না বললে বোধ করি এ-আলোচনার অসম্পূর্ণতার দোষ ঘোচে না। প্রত্যেক লেখককেই অবিশ্টি নিজের চেষ্টায় আধুনিকতার রহস্য খুঁজে বের করতে হবে। আমি শুধুমাত্র কতকগুলি সাধারণ মন্তব্য করতে পারি।

বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের অগ্রগতিতে তিনটি ধাপ লক্ষ্য করা যায়, এবং এই তিনটি ধাপের উপস্থিতি প্রত্যেক অ-ক্যাম্যুনিষ্ট দেশেই কৃমবেশি এক ধরনের। বিশ্ব যে সত্যিই আজ এক পরিবার হয়ে গেছে সাহিত্যের বাজার দেখলে তা বোঝা যায়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকটা ছিল র্যাশনালিজম বা যুক্তিবাদের যুগ। পুরোনো ভিক্টোরিয়ান আদর্শবাদ ও আত্মতৃপ্তিকে বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারসমূহের সাহায্যে ভেঙে চূড়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে তাঁর বদলে এক বিজ্ঞাননিষ্ঠ, যুক্তিপ্রধান, অধিকতর-মানবীয় গুণ সম্পন্ন সভ্যতা গড়ে তোলার স্বপ্ন ছিল এই র্যাশনালিজম-এর বিশেষত্ব। আমাদের রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভাববাদ এবং আনন্দবাদের সঙ্গে এক করে দেখতেই অভ্যস্ত, তিনি যে একদিক দিয়ে গলসওয়ার্দি এবং বার্নার্ড শ’য়ের সমগোত্রীয় ছিলেন তা আজ বিশ্বস্তপ্রায়। র্যাশনালিস্ট রবীন্দ্রনাথ তার ছোটগল্পে ও উপন্যাসে একদিকে দেশের

প্রতিভা-স্বরূপ গর্বাক্ত ব্যক্তিদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন, এবং অন্তর্দিকে উনবিংশ শতাব্দীর নৈতিক আদর্শকে কঠিনভাবে আঘাত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সংস্কারবাদ উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনের এক নতুন, অধিকতর বিজ্ঞাননিষ্ঠ ও কুসংস্কার বর্জিত পর্যায়। শিশুশিক্ষার, নারী প্রগতিতে, মানব মনের মুক্তি সাধনায় তার লেখনি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ এক অসুস্থ সমন্বয়। তার মধ্যে ইউরোপীয় রেনেসাঁ, রোমান্টিসিজম্ এবং র্যাশনালিজম্—এই তিনটি আন্দোলনেরই কিছু কিছু বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আমি এখানে র্যাশনালিস্ট রবীন্দ্রনাথের উপর গুরুত্ব আরোপ করছি বিশ্বসাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের সংযোগ দেখানোর জন্য।

র্যাশনালিজম্-এর মূলে ছিল তিনটি বিশ্বাস। প্রথম, অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাস, দ্বিতীয়, মানুষ যে র্যাশনাল এনিমেল বা যুক্তি-প্রবণ প্রাণী এই বিশ্বাস এবং তৃতীয়, বিজ্ঞানের শক্তিতে বিশ্বাস।

এই তিনটি ইমারত একদিন ভেঙে পড়ল খান খান হয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের বীভৎস রক্তক্ষানের মধ্যে। দারুণ নৈরাশ্রবাদের সঙ্গে সকলে সন্ডয়ে অত্যাঙ্কল যন্ত্র সন্ডাতার গর্বক্ষীত মূর্তির তলায় যে নিদারুণ অন্ধকার, তা দেখতে পেল। যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি উন্মোচন ছাড়াও বিজ্ঞানও সেদিন বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করতে কম সাহায্য করেনি। ফ্রেড ঘোষণা করেছিলেন মানুষের মন যুক্তিপ্রধানও নয়, স্বাধীনও নয়, মানুষের মন প্রধানত তার যৌন প্রবণতার দ্বারা চালিত হয়। আইনষ্টাইন বললেন-যে অভিব্যক্তিবাদ একটি অসম্ভব কল্পনা, কারণ আমাদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের ধারণা একটি আপেক্ষিক ধারণা মাত্র, আসলে সর্বকালই যুগপৎ বিদ্যমান। কাজেই লরেন্স যুক্তিবাদকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মানবপ্রকৃতির গভীরে অবতরণ করলেন, এবং দেখালেন যে, এই সন্ডাতার অন্তসারশূন্যতার কারণ যুক্তিবাদের অভাব নয়, মানুষের মৌলিক প্রবণতাগুলির গতিরোধ। অলডুস্ হাক্সলী মুখোমুখি আড়াল থেকে জীবদেহী মানুষের পাশবিক জীবনযাত্রাকে উদ্ঘাটন করলেন। আমাদের দেশে এই দারুণ নৈরাশ্রবাদের প্রথম প্রকাশ ঘটে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে ও পরে আরও পরিপূর্ণভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে।

যুক্তিবাদের মত রাণী রাণী মানবতান্ত্রিক সদিচ্ছাও এই আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে গেল।

১৯৩০ থেকে শুরু হল নতুন আশ্রয়ের সন্ধান। জীবনযাপনের মধ্যে যে কোনো অর্থ এবং তাৎপর্য আছে, বেঁচে থাকা যে শুধুই এক অন্ধ জৈবিক দাবী নয়, তার প্রমাণের অনুসন্ধান সাহিত্যিকরা বের হলেন। ফলে একদিকে বামপন্থী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সাহিত্যিকদের অভ্যুদয় হল, আর একদিকে মিটিসিজম্, ক্যাথলিকতন্ত্র বা সাত্ত্বের অস্তিত্ববাদের মধ্যে জীবনের তাৎপর্য খোঁজার চেষ্টা চলল। নৈরাশ্রবাদের একটি ধারা কিন্তু আজও অব্যাহত রয়েছে; নরমান্ মেইলার ও ক্যামুর সাহিত্যই তার প্রমাণ।

পঞ্চাশোত্তর বাংলাসাহিত্যে এই ধর্মের পুনরুত্থানের জোয়ার এসে লেগেছে। আজকাল যে সস্তা মানবিকতার ছড়াছড়ি দেখা যায়, তা-ও এর সর্গোত্তর।

এই পর্যালোচনার পর আধুনিকতার অঙ্গসন্ধান কোন পদ্ধতিতে চলতে পারে তা নির্ধারণে অগ্রসর হতে পারি। কিন্তু যে পদ্ধতিই আমরা গ্রহণ করি তা যেন সাহিত্যের স্বধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সাহিত্যের যা কাজ, সাহিত্যকে দিয়ে শুধু তাই করানো সম্ভব। যেমন, সাহিত্যে ধার্মিক বা দার্শনিকের স্থান থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে ধর্মতত্ত্ব বা দার্শনিক তত্ত্বকে প্রতিপন্ন করা যায় না। আধুনিককালে যে-সব ক্ষেত্রে এই প্রয়াস দেখা দিয়েছে তার প্রত্যেকটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

১৯৩০-এর পরবর্তী সাহিত্য তাহলে একদিকে পলায়নের প্রয়াস, আর একদিকে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস।

তাহলে এর যে কোনো একটা কি আধুনিকতা?

জীবন থেকে পলায়ন কিন্তু কখনোই সাহিত্যের স্বধর্ম নয়। সাহিত্যে ভীষ্মদের কোনো স্থান নেই। কোনো কোনো সাহিত্য পলায়নী মনোবৃত্তি সঙ্গেও ভাল সাহিত্য হয়েছে, কিন্তু পলায়নী মনোবৃত্তির জন্য হয়নি।

এলিয়ট-এর 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' এ-যুগের নর্মবাগীর আশ্চর্য প্রকাশ; কিন্তু তার পরবর্তীরচনা শুধু কথা সাজানোর কারসাজি মাত্র।

আধুনিকতার প্রথম শর্ত তাহলে এই যুগের নৈরাশ্যবাদের সমস্ত সংগত কারণগুলির মুখোমুখি দাঁড়ানো। এড়িয়ে যাওয়া চলবে না, পথ সংক্ষেপ করা চলবে না। জীবনের অর্থ-হীনতাই যদি শেষ উপলব্ধি হয়, তাহলে সাহিত্যিক তা-ই চিত্রিত করবেন।

পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসও কিন্তু সাহিত্যিককে অনেক সময় স্বধর্মচ্যুত করেছে। আপটন সিনক্রেয়ারের সাহিত্য আর গল্‌সওয়ার্দের সাহিত্য পদ্ধতির দিক থেকে এক,—সমাজজীবনের স্থূল বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে একটি গিদ্ধান্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা। এই উপদেশাত্মক বাস্তববাদ চলবে না, কারণ তার আবেদন প্রধানত মানুষের বুদ্ধির কাছে, এবং মানুষ প্রধানত বুদ্ধিমান প্রাণী নয়।

আধুনিকতার কাজ হল বিশ্বমানবের নিয়তি আবিষ্কার করা। কোনো আজগুবি বা ইচ্ছাপূরণমূলক তত্ত্ব চাপিয়ে দিয়ে এ-প্রশ্নের সমাধান করা যায়, কিন্তু সে পথে নয়। বৈজ্ঞানিক বস্তুজগতের বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে বিশ্ববিধানের নিয়তি আবিষ্কার করেন। সাহিত্যিক মানুষের নিয়তি আবিষ্কার করবেন মানবপ্রকৃতির বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে।

এ কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। যে কোনো তত্ত্ব বা মানবিক কি নৈতিক মূল্যকে আমরা সাহিত্যে উপস্থিত করতে চাই, তাকে মানব-প্রকৃতি সঙ্গত হওয়া চাই। অনেক সদিচ্ছা, দয়া, মায়াময়, করুণার বাণী পৃথিবীতে উচ্চারিত হয়েছে; কিন্তু জীবনে আজও এ-সব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কাজেই এ সবার পুনরাবৃত্তি করে কোনো লাভ নেই। মানব-প্রকৃতির মধ্যে এ-সবের স্থান কোথায়; মানব-প্রকৃতি-সঙ্গত উপায়ে এ-গুলিকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব কিনা—আধুনিক সাহিত্যিকদের সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।

এ-যুগের নিদারুণ যন্ত্রণা আর স্বার্থোদ্ধত অবিচারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কোনো সম্ভা সমাধানের ইচ্ছিত দেওয়ার দিন নেই। এই যন্ত্রণা আর অবিচারই মানুষের নিয়তি কিনা লেখককে সাহসের সঙ্গে তার উত্তর দিতে হবে। অসিয় মজুমদারের সাহিত্য সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছিলাম। তার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই যে, এই যন্ত্রণা আর অবিচারের অভিজ্ঞতাকে তিনি খুব সহজে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন।

যিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী তাকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে মানব-প্রকৃতির সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদ সামঞ্জস্যকর কিনা। এবং সমাজতন্ত্রবাদ মানব-প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হবে কিনা; অর্থাৎ মানবপ্রকৃতি পরিবর্তনশীল কিনা, এবং যদি পরিবর্তনশীল হয়, তবে জীবদেহী মানুষের ক্ষেত্রে তার পদ্ধতিই বা কি।

অর্থাৎ সমাজশ্রিত মানব-প্রকৃতির বিশ্লেষণ,—আরও আরও বিশ্লেষণ,—এবং এই বিশ্লেষণের ভিতর দিয়েই আধুনিক জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া সম্ভব বলে ভরসা রাখি।

এতগব আলোচনার পর কেউ হয়তো বলতে পারেন, এতখানি কষ্ট স্বীকার করে আধুনিক হতে চেষ্টা করে লাভ কি? আমার কাজ সাহিত্য সৃষ্টি করা, লোককে আনন্দ দেওয়া। সেইটুকু করতে পারলেই আমি খুশি। এ-কথার জবাবে আমার সত্যিই কিছু বলার নেই। আপাত জনপ্রিয়তার পথ ত্যাগ করে আধুনিকতার সাধনায় মগ্ন হলে তাতে যে শেষ পর্যন্ত কী পরম প্রাপ্তি ঘটবে তা আমি জানি না। এ-যুগের পাঠক যাকে গ্রহণ করল না, তাকে যে ভাবীকালে সম্রানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হবে এ আশা বাতুলের আশা। এটা উনবিংশ শতাব্দী নয় যে ছেঁড়া কাগজের স্তূপ ঘেঁটেও যদি কোনো ইতিপূর্বে অনাবিষ্কৃত লেখা উদ্ধার করা যায় তো তাকে সাড়ম্বরে ছেপে বার করা হবে। আজকের দিনে প্রতিমাসে একশোখানা করে বই প্রকাশিত হয়। যে লেখা আজকের পাঠক চিহ্নিত করে রাখবে না সে লেখা হাজার হাজার বই-এর স্তূপের তলায় খুব সম্ভব চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে। কাজেই কোনোরকম আশা না করে যিনি বেঁচে থাকতে পারেন, আধুনিকতার সাধনা তার জন্য। এমন লেখক যদি কেউ থেকে থাকেন তো আমি আছি তার সান্নিধ্য।*

আগত শিক্ষায় মার্কিনীর প্রভুত্ব

সুরঞ্জন ভাট্টা

ভারতবর্ষেও দেখা গেছে রাজার দলের মতামত নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু যখন রাজা সরে গেল, তখন গণতন্ত্র এল। আর এই গণতন্ত্রে গণতন্ত্রীরা কিভাবে অপর দেশ থেকে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যাকুকাঠি নাড়াচ্ছে সেই কথারই দু-একটি আলোচনা আজ করব।

ব্যাপারটা ঘটল ইংরেজ চলে যাওয়ার পর। ইংরেজ তার দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীদের এখানে রেখে গিয়েছিল শিক্ষায় কর্তৃত্ব করতে। তারা সরে গেলে এই কর্তাদের হল বিপদ। এঁরা দুটি দলের মাঝখানে পড়লেন,—এক বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবক্তাদের, দুই—আমেরিকা প্রত্যাগত শিক্ষাবিদদের। সংস্কারবশত তাঁরা বুনিয়াদীকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। সংস্কার তাদের এই যে, সাগরপার থেকে কিছু না এলে তা প্রামাণ্য হয় না। কাজেই তারা সার্জেন্ট সাহেবের পরিকল্পনা নিয়ে মশগুল রইলেন।

কিন্তু দেশের আবহাওয়ায় তখন আরও পরিকল্পনা রয়েছে। আর সে পরিকল্পনার জন্য চাই টাকা। টাকা দিতে পারে তখন একটি মাত্র দেশ—সে আমেরিকা। আমেরিকার ডিগ্রীধারীরা এবার মাথা তুললেন। আমেরিকা তাদের কোনরকম নোকোর দড়ি বাঁধল।

শিক্ষা কমিসন বসল। কমিসনে আমেরিকার বিদ্বান চুকল। আমেরিকার চালান এল, পরীক্ষাসংস্কারে বিশেষ ক'রে অবজেকটিভ টেস্ট, সোস্যাল স্টাডিজ, অডিও ভিসুয়াল এডস্-এ, গাইডেন্স-এ।

আমেরিকার টাকা আছে কাজেই আমেরিকা উন্নত দেশ। তারা উন্নতি করেছে যে-বিদ্যায় সে-বিদ্যা আমাদের নিতে হবে।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হল নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষৎ। এই পর্ষতে বিদেশী টাকাই খাটে বেশি। রাতারাতি বিভিন্ন প্রদেশের অধ্যাত ব্যক্তিরা মোটা মোটা বেতনে আর জলপানিতে উন্নত হয়ে গেলেন। কেবল তাই নয়, বিভিন্ন রাজ্যে যাকে-তাকে কুলীন ক'রে দেওয়া হল, মোটা মাইনের 'অপসর' হলেন। অনাবশ্যক মোটা মাইনে। 'একসটেনসন সার্ভিস' বিভাগ খোলা হল। দূর-দূরান্তের শিক্ষকদের ভালো এলাউন্স দিয়ে মাঝে মাঝে সেমিনারে আনা হল এবং হচ্ছে। এঁরা সেখানে যান, আমেরিকার শিক্ষাসমস্যা যে নিষ্পেদেরই শিক্ষাসমস্যা এই কথা চা-বিস্কুট আর সিগ্রেট খেতে খেতে শুনে আসেন। এই সেমিনারের পরবর্তী নামকরণ—ওয়ার্কশপ। ভারতের সমগ্র অঞ্চলের শিক্ষকদের এই যে ভ্রমণের সুযোগ তারা দিলেন এজন্য তারা কৃতজ্ঞ। কিন্তু শিক্ষার সমস্যার কতখানি উন্নতি ঘটল সেকথা ভাববার।

বিলেত থেকে এসেছিল ইনটেলিজেন্স টেস্ট, আমেরিকা থেকে এল অবজেকটিভ

টেস্ট ; কিন্তু বছর যেতে না যেতেই ওর নাম হল ইন্ডিয়ান এশন টেকনিক । গণভক্তের সঙ্গে মালটি পারপাস স্কুল গিঁট-বাঁধা । আর সেই গিঁট কায়েমী ক'রে বাঁধতে হলে চাই সোস্যালস্টাডিজ, চাই কেরিয়ার মাস্টার্স কোর্স, চাই ইন্ডিয়ান এশন প্রসিডিঅর ।

মালটি পারপাস স্কুলের উপকারিতা একমুখে বলার নয়, কারণ এ বহুমুখী । কাজেই সেকথা থাক । সোস্যালস্টাডিজ কি তাও শিক্ষাবিদ মাত্রেই জানা । কেরিয়ার মাস্টার্স কোর্স-এর মধ্যে যে সিলেকশন ও এলোকেশন আছে—সেকথাও অজ্ঞাত নয় । অর্থাৎ, কোন্ বিষয়ে কোন্ ছেলের পড়া উচিত, আর অল্প আগনের মধ্যে কেমন ক'রে বেশি ছেলেদের ভাগ দিতে হবে, সেই প্রক্রিয়াই এতে শেখানো হয় । অর্থাৎ ধরুন, বিজ্ঞানে ৩০টি আসন আছে, বিজ্ঞানের উপযুক্ত ছাত্র পেলেন ৭৫টি । এখন এই ৪৫ জনকে কিভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে বাদ দেবেন—তারই মন্ত্র শেখানো হয় এই কোর্স-এ । এসব বিদ্যা শেখাও উপনিষদের আশ্রয় পক্ষে সহজ নয় । কাজেই অনেক কলা কৌশল আছে ।

পারসোনালিটি টেস্ট, এপ্টিচুড টেস্ট, এপ্টিচুড টেস্ট, এটেনশেন্ট টেস্ট, এচিভমেন্ট টেস্ট প্রভৃতি কত কি । এত টেস্ট প্রয়োগ করে এবং কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ড পূরণ করে তবে ইন্ডিয়ান এশন হবে । একটি ছেলের উপর এসব প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেও কিন্তু তার সম্পর্কে গঠিক ইন্ডিয়ান এশন হয় না । সেইজন্য দরকার এক্সপার্ট-দের । আর সে সব এক্সপার্ট নয়াদিল্লীতে বসে আছেন । সুখের বিষয়, তারা সবাই এক্সপার্ট কারণ খাস মার্কিনী । তারা প্রয়োজনমতো দেশ থেকে আরও এক্সপার্টদের আনিতে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন, ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় শহরে অবাধে ঘোরাফেরা করেন । সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে আর কিছু করলেও টের পাওয়ার উপায় নেই, বাধা দেবার কিছু নেই । তাছাড়া এদেশের কাঙাল শিক্ষাবিদদের মার্কিনমূলকে পাঠিয়ে পংক্তিতে উঠিয়ে নিয়ে আসেন, যাকে বলে রি-ওরিয়েন্ট করা । তারা অবশ্য খাঁটি এক্সপার্ট নয়, অনেকটা দর-এক্সপার্ট, 'দর-কচড়া' মতো । ভারতের মধ্যে নতুন মার্কিন সমাজ হয়েছে । যুদ্ধের সময় হলে লোকে বলত পঞ্চমবাহিনী । শান্তির সময় বলা হয় মানবিকতাবাদী বা গণতন্ত্রী । আমাদের আপত্তি সেখানে নয় । আমাদের আপত্তি হচ্ছে, আমাদের দরিদ্র দেশ এই নতুন শিক্ষারীতিতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে । আজ লাখলাখ টাকার দালান চাই, লাখলাখ টাকার শিক্ষা উপকরণ চাই, বহু বেতনের পারদর্শী চাই, শিক্ষাসমস্যা আলোচনায় চা-বিস্কুট-সিগ্রেট চাই । এত টাকা আমরা কি খরচ করতে পারব ? এত টাকার খেলা গান্ধিজী দেখতে পাননি বলেই বুঝি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কথা বলেছিলেন । মার্কিন দেশই কি চিরকাল এত টাকা দিতে পারবে ? পারবে না । তাই আজ কথা উঠেছে এক্সটেনসন সাভিস এবং অন্যান্য শিক্ষা বিভাগ বিভিন্ন রাজ্য নিজের তহবিল থেকে পোষণ করুন । অর্থাৎ কুলীন তৈরী করল একজন, আর কষ্টাদান করতে হবে সমগ্র রাজ্যের তহবিল রক্ষককে । রাজ্য তা পারবে না । তাই বোধহয় অনুরোধের কশাঘাতে সে মুমূর্ষু । আমরা কি পাচ্ছি তার দু-একটা হিসেব দেওয়া যাক । পরীক্ষার কথাই ধরা যাক ।

ইনটেলিজেন্স টেস্ট আর অবজেকটিভ টেস্ট-এর কথাই ধরি। কারণ মালটি পারপাস ইন্সুলের এই দুটিই হবে চাল আর তরবারি।

মানুষের বুদ্ধিকে ভাগ করে দেখেছিলেন সেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিনে সাহেব। তারপর বিলেতের স্পিয়ারম্যান, আমেরিকার থার্মটোন প্রভৃতি। মোটামুটি ভাবে বুদ্ধি বলতে তাঁরা বুঝেছেন, কত দ্রুত একটি ব্যক্তি নতুন পরিবেশের সঙ্গে সত্যাকার পরিচয় সাধন করতে পারে।

ব্যাপারটা ভাবুন। রাস্তার বা রকের ছেলেদের মধ্যে একটি প্রতিভাশালী ছেলেকে ধরুন। তার এমন একটা অভিজ্ঞতা আছে যে, এক লহমায় বুঝতে পারে পথচারী কোন্ পকেটে টাকা নিয়ে চলেছে। কিংবা রাস্তার একটা ঘটনাকে এমন দু-একটা কথায় প্রকাশ করতে পারে যে গৈয়দ মুজতবা আলী বা রূপদর্শীও তার কাছে হার স্বীকার করবেন। কিন্তু ঐসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভালো ছেলেকে নিন, সে তেমন পারবে না। অথচ রকের ছেলেটি বিদ্যাগতিসম্পন্ন বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও জীবনযুদ্ধে হেরে গেল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ছেলেটির বুদ্ধি অত দ্রুত খেলে না। অবিরাম চিন্তা করবার শক্তি আছে তার, সে অধ্যবসায়ী তাই জীবনযুদ্ধে তারই হয় জিত। সমাজ কোন্ ছেলেটির বুদ্ধি নিয়ে উপকৃত হবে? ইনটেলিজেন্স টেস্ট-এ বুদ্ধির এই অধ্যবসায় দিকটি ধরতে পারে না। অধ্যবসায়ীর কি কি গুণ থাকা উচিত তা অন্য প্রকারের টেস্টে হয়ত ধরা যায়, কিন্তু সে অধ্যবসায়ী কিনা সে-কথা ধরা যায় না। কিন্তু এখানে ধরতে হবে বুদ্ধিরই স্থায়িত্বের দিক।

পারসোনালিটি টেস্ট আর এটিটিউড টেস্ট একটিও নির্ভরযোগ্য বলে ওদেশেও স্বীকার করেনি। কোনো ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, সত্য আর মিথ্যার মধ্যে কোনটি বলা উচিত। সে মিথ্যাবাদী হওয়া সত্ত্বেও নির্ধাৎ বলবে সত্য বলা একান্ত কর্তব্য। হিমালয়কে ভালোবাসা আর ভারতের জনসাধারণকে ভালোবাসা বোধহয় এককথা নয়। এমনি ক'রে মানুষের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি মাপতে যাওয়া কেবল ভুলই হচ্ছে না, অন্য়ও হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশের ইন্সুল কলেজে তা আসবেই। অবজেকটিভ টেস্ট-এ শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের পাশে কেবল দাগ দিতে হয়, ভাষা ব্যবহার করতে হয় না। এরই দ্রুত খাগ আমেরিকাতেও ইন্সুল-পাস ছেলেরা যখন কলেজে চোকে তখনও ভাষাব্যবহারে তারা পেছিয়ে পড়ে থাকে, তারা ভালো করে বই পড়তে পারে না। পড়তে না-জানা দু কারণে হচ্ছে—কাজ করতে-করতে-শেখা পদ্ধতিতে আর অবজেকটিভ টেস্ট-এর কল্যাণে। সেখানকার লোক চায় ছেলেরা ডেমোক্রেসী শিখুক, অভিজ্ঞতার স্তূপ সৃষ্টি করুক। তারা সবই করছে—চিন্তা করতে শিখছে না। সেইজন্য আবার উদ্ভাবন করা হ'ল, রেমিডিয়াল টিচিং। আমাদের দেশেও ওটা হয়ত আসবে।

কিন্তু এই অবজেকটিভ টেস্টকে আমরাও মনেপ্রাণে গ্রহণ করিনি। এইখানে আমাদের বিচক্ষণতা। স্কুলের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার দ্রুত অনুমোদন করা হয়েছে, তাও রচনা-গত পরীক্ষার দ্রুত শতকরা ৭৫, আর এই অবজেকটিভ টেস্ট-এর দ্রুত শতকরা ২৫। কর্তৃপক্ষীয়েরা ধরে নিয়েছেন, এই অবজেকটিভ টেস্ট-এর নানা

অসুবিধা। কিন্তু এইটুকুর জন্য তোলপাড় কম হচ্ছে না, ইভ্যানুএশন অফিসার কম নিযুক্ত হবে না। শিক্ষকদের নিয়ে টানা পোড়েন চলছে—তারি এটি শিখে যাক। অর্থাৎ, ধরচ করবার জন্য এবং অন্য দেশের লোকের উপর নির্ভর করবার জন্য যেন আমরা ক্রতগতিতে এগিয়ে চলেছি।

এই যে অন্তর উপর নির্ভরতা—এইটি হচ্ছে সর্বনাশের। সমাজত্বের সেই জটিল রহস্যকেই আমাদের বুঝতে হবে।

সাংস্কৃতিক সমাজমনের উপর দেশের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। দেশের লোক মনের দিক দিয়ে যত স্বাধীন হবে তত উদ্ভাবনীশক্তির প্রকাশ পাবে। জাতির যদি উদ্ভাবনীশক্তির দিক নষ্ট করে দেওয়া যায় তবে স্বাধীনতা খর্ব করা যায়। স্বাধীনতা আর উদ্ভাবনীশক্তির দুটোর মধ্যে অঙ্গাঙ্গী যোগ। পরিসংখ্যান সম্বন্ধে সহগামী এই দুটি, অর্থাৎ এই দুটোর মধ্যে পজিটিভ কো-রিলেশন আছে। অতএব, দেশের মানুষকে যত কঠোরভাবে করা যাবে, যত কঠোরভাবে করে দেওয়া যাবে, যত হুকুমে পরিচালিত করা যাবে তত নতুন চিন্তা আর উদ্ভাবনী শক্তি নষ্ট করে দেওয়া যাবে। পরনির্ভরতায় মানসিক বৈচিত্র্য থাকে না, নতুন নতুন সৃষ্টি করবার ক্ষমতা থাকে না। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত এর প্রমাণ অনেকাংশেই মেলে; তার পূর্বের প্রমাণও আছে। শুধু ভারতবর্ষ কেন, সব দেশের সমাজ-মনেরই এই কথা। পাউলভের সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার মতো তখন ব্যক্তি কঠোর-ব্যক্তির সঙ্কেত মাত্র সাজা দিতে থাকে। আভ্যন্তরীণ প্রতিবর্ত এমনি করে গঠিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান যেখানে জটিল হয়ে পড়ে সেখানে আমরা আরও পারদর্শীর উপর নির্ভর করতে বাধ্য হই। আমরা ডাক্তারের ডুলক্রটির সবই মেনে নেই, কারণ রোগ আর ওষুধের খুঁটিনাটি আমরা অনেকেরই জানি না; ইঞ্জিনিয়ারদের আমরা শরণাপন্ন হই যখনই ইঞ্জিন সম্পর্কে গোলযোগ বাধে; আইন যেখানে জটিল সেখানে উকিলের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। সমাজতাত্ত্বিকদের একটা কথা এই প্রসঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে;

‘The dependence upon authority is correlated with the development of specialised knowledge in particular fields. This is an almost necessary linkage, because the mass of the people must accept the views of specialists on complex matters the details of which are mysteries to them. The more intricate the knowledge, the greater must be the dependence, if there is any appeal to the specialists at all.’

তাই এই শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন যেসব জিনিস আমরা আবাহন করে নিয়ে আসছি তার সবটার জন্যই আমরা আমেরিকার পারদর্শীর কাছে হুকুমে বাধ্য হয়ে পড়ে থাকছি। এই সব বিষয়ে পারদর্শী চিরকালই আমেরিকাতে থাকবে। কারণ এর অধিকাংশ বস্তুই আমেরিকার সমাজজীবন থেকে জাত। এই সমাজ প্রয়োগবাদের উপর বিশ্বাসী, এই সমাজ সত্যের খণ্ড দিক নিয়ে ব্যস্ত, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী তাদের মধ্যে নেই। তাদের

শিক্ষাব্যবস্থায় তাই সমাজীয় হওয়ার গুণ যত প্রকট, সেই বিষয়ে স্কুল কারিকুলামের যত নজর, সত্যকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের আয়ত্তির দিকে অধিকাংশের সে সন্যোগ নেই। তাদেরও ডেমোক্রেসি-তে পাঠ দেওয়া হয়, কিন্তু তারা স্ট্যাটিস্টিকস-এর নরম্যাল কার্ড-কে মেনে চলে বেশি, তারা শতকরা ৭০ জনকে মেনে চলেই ডেমোক্রাট। আর স্পেশালিস্ট হওয়ায় সন্যোগ আছে অত্যন্ত কমসংখ্যক ব্যক্তির। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের চেহারা কিন্তু তা নয়। তার প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। তারা ঈশ্বরকে মেনে চলে বলেই প্রত্যেক শিশুকেই তারা ভগবানের অংশ বলে মনে করে। সমাজের নিয়ন্ত্রণ বংশের ছেলোটিও হয়ত অবতার হয়ে বসতে পারে। এ প্রত্যাশা তারা করে। আচার সংস্কারে বাধা এসেছিল, সেই বাধাকে অপসারণ করেই ঔপনিষদিক গণ-শ্রদ্ধাকে তারা পেতে চেয়েছে।

উপরন্তু ঐ সব বিষয় এখনও পরীক্ষাধীন, তাদের দেশের ইস্কুলেও একান্তভাবে যে ঐ বিষয়গুলি চালু হয়েছে তা নয়। এ বিষয়ে এখনও তারা খনন কার্যে ব্যস্ত। এই অবস্থায় তাদের মধ্যেই পারদর্শী তৈরী হতে বাধ্য। তারা প্রতিমুহুর্তে নতুন জিনিস পাবে আর প্রতিমুহুর্তে আমরা খবরের প্রত্যাশা করব। যারা এ্যাটম বম্বের প্রক্রিয়া আত্মও গোপন রেখেছে, তারা অন্য দেশের যাতে সম্বন্ধি হবে তেমন কিছু জানাতে চাইবে কি না আমার সন্দেহ। যাই হোক অতখানি শুভনাস্তিক আমি হতে চাইনে, তবে এ-বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্টই হয়ে পড়েছে যে, শিক্ষার নানাদিক দিয়েই আমরা ওদেশের বিশেষজ্ঞের হাতে বাধা পড়ে গেছি। এ অবস্থায় সমাজতন্ত্রের সূত্র অনুযায়ী আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় উদ্ভাবনীশক্তির ব্যবহার লুপ্ত হতে বাধ্য। তার ফলেই শিক্ষা আমাদের সমাজের উপযোগী হবে না, হবে অন্য কোনো দেশের উপযোগী।

শিক্ষাত্রতী এবং শিক্ষাবিদদের সতর্ক ক'রে দেওয়ার জন্যই আমার এই বক্তব্য। কারণ মাকিনী প্রভাব দুই কারণে দুটো—

(১) আমরা স্বাধীন চিন্তাকে বিনষ্ট করে তাদের শরণাপন্ন হয়ে যাতে পড়ি, তার চেষ্টা তারা করছে ;

(২) আমরা বহু খরচের মধ্যে ডুবে গিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরিণামে যাতে এগোতে না পারি, তারও চেষ্টা তারা করছে।

ভাইয়ের মুখ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(“মীন মানব ধীবর সে কাল”...গাঙ্গনের গান ॥)

[অন্ধকারে কারুরই মুখ দেখা যায় না। যদিও ধীরে ধীরে একসময় আলোর ছয়ার খুলে যাবে, সকলেই পরস্পরের মুখ দেখবে...]

- সিন্ধু ॥ আর কতদূর যাবো, কতদূর যাওয়া যায় ! আমার ক্রান্তির অন্ত নেই !
হায় অপ্রেমের জ্বলে যেতে হবে ?
- ধীবর ॥ কার অপ্রমে ক্রান্ত তুমি নাগো ! এখনই উঠবে জ্যোতির্ময় নাছ, তোমার
গর্ভের সমস্ত অশান্তি ছিঁড়ে, ভাই আমার । আমি তাকে প্রেম দেবো ।
সে তোমার সমস্ত তিনির রূপবান ক’রে জলে ভেসে উঠবে গানের মতন ।
- সিন্ধু ॥ অনেক দেখেছি আমি শিকারীর প্রেম । তোর মন কী জানবে আমার
প্রতীকার লক্ষকোটি বৎসরের স্বত্ব । আমি নিজের অন্ধকারে জ্বলি, এই
আমার নিয়তি ।
- ধীবর ॥ ভুলে গেছ নিজের মুখখী তুমি, ভুলে গেছ স্মৃতি ? সূর্যের সঙ্গমে আজো
জন্মদাত্রী তুমি, কেন অপ্রেমের গান গাও, আমার ভাইয়ের মুখ যখন উঠবে
জ্বলে নীলাকাশে শুকতারার মত ?
- নাছ ॥ কে আমাকে ডাক দিল ? কার বর্ষা এই বুকে ভালবাসবার ক্ষতচিহ্ন
আঁকবে ? আর আমি প্রেমের যন্ত্রণা নিয়ে মরে যাবো !
- সিন্ধু ॥ পৃথিবীতে প্রেম নেই আর, শুধু স্বত্ব ছাড়া । ক্রান্তি ছাড়া আর কোনো
মন নেই ।
- ধীবর ॥ তবুতো প্রেমের চিহ্ন আছে, কোনোখানে অপরূপ স্মৃতি আছে । ক্রুশবিক্র
ত্রিভুবনে তবু একটিই মুখ জ্বলে থাকে ভোরের মতন ।
- নাছ ॥ কে আমাকে সেই মরণের স্বাদ দিতে পারে, যার স্পর্শে সমস্ত রাত্রির মন
ভোর হয়, সমস্ত গর্ভের কান্না আলো হয় ?
- ধীবর ॥ আমি তোকে সে অনন্ত জয় দেবো ।
- সিন্ধু ॥ আমি বাধা দেবো । আমার ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় নিয়ে মাঝখানে
দাঁড়াবো তোদের আদিম জননী আমি । আমার ক্রান্তির অংশ উত্তরাধিকার
স্বত্রে তোদেরও নিতে হবে । কোনো প্রেম, কোনো হত্যা আমাদের জন্মে
নয় শুধু ক্রান্তি ছাড়া, বিবর্ণ প্রতীক্ষা ছাড়া ।

ধীবর ॥ আর আমি ভাঙবো পাহাড়া । আমি সব ঝড় বার্ষ ক'রে দেখবো ভাইয়ের মুখ, জননী আগার ; কিম্বা ঝড়ে ডুবে যাবো আবার তোমারি গর্ভে ।

মাছ ॥ সব অন্ধকার ছুহাতে সরিয়ে ভেসে উঠবো আমি, ভাই আমার, তোমার অপূর্ব বর্ষা বুকে নিয়ে হব নবজাত ।

ধীবর ॥ আর আমি তোমার মরণ নিয়ে থাকবো শুয়ে নটিনীর মত, ঝড়ের নৌকায় । বৃদ্ধ হবো তোমার স্মৃতিকে বুকে ক'রে । তাঁর অপ্রেমের ক্রান্তি আমাকে ছোঁবে না কোনো দিন ।

সিঁহু ॥ আমার রক্তের ঋণ হৃত্য দিয়ে ধুয়ে নেবে আমার সন্তান, ভাইয়ের শরীর থেকে ? কোনো ক্রান্তি লাগবে না তার ? হত্যা দিয়ে মুছেবে সে জননের হাহাকার ? হায় রে নির্বোধ...

[এরই মধ্যে অন্ধকারের কালে শরীরে আলো এসে তার খেলা শুরু করবে । দেখা যাবে সিঁহু আর ধীবর মুখোমুখি এখন ঠাঁড়িয়ে আছে, দুজনেই নির্বাক, যেন অন্য কোনো প্রতীক্ষায় । ধীরে, একটু দূরে আরো একজনের মুখ অস্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হবে ; তারপর সেই মুখ নতুন করে নীরবতাকে জয় করবে ।]

আকাশ ॥ যে প্রেম হৃদয় থেকে মুছে দিলে, তোমার গর্ভেই নারী, তার কান্না । আজো সেই বোধ পিপাসায় জ্বল চায়, তুমি বুঝলে না—

সিঁহু ॥ দূরে চলে যাও তুমি, আসন্দের অসহ যন্ত্রণা ।

[সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিশোর মাছ জলে ভেসে উঠবে । ধীবরের হাতের মুঠোয় স্পন্দমান মারণাস্ত্র যেন এই আবির্ভাবের রূপ দেখে প্রেমে হেসে উঠবে, এমনই উজ্জ্বল ।]

ধীবর ॥ হে মাছ, তোমার মুখ অপরূপ মনে হয়—

আকাশ ॥ যমজ সন্তান, তোরা শোধ কর অপ্রেমের দেনা ॥

বাংলা কবিতার সাধনা ও সিদ্ধি

শান্তি বসু

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাকালে,
হে ছলনাময়ী ।

—রবীন্দ্রনাথ

বাংলাসাহিত্যের ঐতিহাসিকরা যদিও চর্চাপদ থেকে বাংলা কবিতার শুরু হিসেবে করেন, তবু, আমরা জানি, অধ্যায়সাধনার গূঢ় রীতিপ্রকরণের বাইরে যার সার্থকতা নিতান্তই ইতিহাসপরম্পরার বা নেহাতই ভাষার আদিসূত্র হিসেবে, তার সাহিত্যমূল্য গোণ। কবিতার তাৎপর্যে প্রারম্ভিক প্রয়াসের মূল্য ভাষার প্রসার ও মুক্তি, চরিত্র ও গঠনের সহায়ক হিসেবে যেহেতু পরবর্তী কাব্যরীতি অতীত আলোচনা ও মুক্তির উপরে ভিৎ গড়েই দাঁড়ায়। চর্চাপদে বাংলা ভাষার শুরু যদিচ অসমীয়া সাহিত্যসেবীরাও একই দাবী নিঃসংকোচে উপস্থিত করেন; সন্ধাভাষার সেই গুচ্ছার্ধে তাৎকাল্য সম্ভবত ছিলো কিন্তু কবিতার প্রয়োজনে বা জীবনের প্রকাশের ক্ষেত্রে নৈমিত্তিক রীতির স্বীকৃতি তখনো আসেনি। কাব্যের কারণে তাই চর্চাপদের সাধনা নয়, মুক্তির আত্যন্তিক প্রয়োজনে মরনী সিদ্ধান্ত লৌকিক রীতির বাইরে আড়াল খুঁজছে; মুখের ভাষা কথোপকথনের ধারায় দৈনন্দিন জীবন ও জীবনের আবেগে মূর্ত হতে চায়নি। চর্চাপদ তাই নানাঅর্থে তাৎপর্যপূর্ণ হলেও বাংলা কবিতার আদি সম্ভবত মঙ্গলকাব্য। নিছক ধর্মচর্চা ও অধ্যায়সাধনার বাহন হওয়া ছাড়াও যখন জীবনের সাদামাটা কথা, রোজকার জ্ঞান সুখঃখ ভাষায় প্রকাশ হবার দাবী নিয়ে এলো তখনই ভাষার মুক্তির কথা ওঠে, কাব্যও সৃষ্ট হয়। মঙ্গলকাব্য তাই লৌকিক জীবনের টুকরো টুকরো কাহিনী আছে বলেই নয়, বিভিন্ন দেবদেবীর কাহিনীতে কল্পনার রঙ লেগে চৈতন্যের বিস্তার ও মুক্তির প্রসঙ্গ ওঠে, এই মুক্তি পয়সারের প্রবহমানতায় ছড়ায়। সংস্কৃতির নানাবিধ সংঘর্ষে অলৌকিক দেবদেবী লৌকিক মহিমায় জড়ান, নিত্যকার জীবনের আনন্দ-বেদনার অংশীদার হয়ে হৃদয়ের কাছে আসেন, আমাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলেন, রূপক অলংকারাদি প্রাত্যহিকতার রসে সিদ্ধ হয়। চর্চাপদের নিলিপ্ত আবেগ ভেঙে জীবনের স্রোত উচ্ছল হয়।

*হয়তো ঠিক মঙ্গলকাব্যই নয়। মেয়েলি ছড়া ও পাঁচালীতে ভাষা ও ছন্দের মুক্তি তৈরী হয়েছে। *এই ভাষা ও ছন্দ আমাদের চেতনার স্তরের সঙ্গে মিলে ভবিষ্যত পরীক্ষা ও সিদ্ধির ভিত্তি হিসেবে রক্তে মিশে গেছে, কারণ ছড়ার ছন্দে আমাদের উচ্চারণপদ্ধতির একটি স্বাভাবিক মুক্তি স্বতই জড়িয়ে থাকেছে এবং ছড়ার ছন্দের উচ্ছল ঝোঁকের ফলে কানে ময়ের, ওঠাপড়ার ধ্বনি স্পষ্ট বাজতে পেরেছে। এই ছন্দের টানে আমাদের জীবনের

ওঠাপড়া সহজ, সরল, অনাড়ম্বর মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে ; ঘরোয়া ছবিতে, পরিবেশে ভাষার অনুলীন রূপটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে পেরেছে। অবশ্য এ-বিষয়ে আলোচনা সন্দেহাতীত নয় যে পয়ার অথবা ছড়ার ছন্দের কোনটি বাংলা বাকরীতির মৌলকাঠামো ; আমরা জানি, বর্তমান নজীরের নিশ্চয় ফসলে, যে ছন্দ দুটি বাংলা কবিতার প্রধান দুই স্তম্ভ। পয়ারের ক্রেমে মঙ্গলকাব্য চর্যাপদ থেকে মোটেই তফাৎ নয়, এবং মধুসূদনের পূর্ব পর্যন্ত পয়ারের গান্ধীর্ষ বা সহনশীলতা অনাবিক্ত ছিলো যদিও ছড়ার ছন্দে কাব্যরচনা সাহিত্যের প্রাথমিক রীতির চাপে কোনঠাসা হয়ে সাহিত্যের জাতে উঠতে পারেনি। পয়ারের নিল সবেও জীবনের অর্থেই মঙ্গলকাব্য চর্যাপদের সিদ্ধিকে পেরিয়ে যায়। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের এই মৌল শক্তির বাইরে দুর্বলতা চাপা থাকে না। পৌনঃপুনিক ব্যবহারে মঙ্গলকাব্যের মেছাছ ও পদ্ধতি প্রাথমিক রীতির অভ্যাসিকতায় পরিণত হয় এবং ঘুরেফিরে একই কথা একই রকমে বারবার বলা হতে থাকে। অর্থাৎ প্রেরণার উৎস শুকোলে যেমন অতীত ফিরে আসে নীরক, নিজীব চেহারায়। একটা পর্যায়ের পর মঙ্গলকাব্য চৈতন্যের নতুন বক্তব্য ও প্রেরণা আর সাজা তোলে না, পয়ারের স্বচ্ছন্দশ্রোতে গা-ভাসিয়ে আবিষ্কারের কঠিন পরিশ্রম থেকে রেহাই পাওয়া যায়। জীবনযাত্রার স্থিতাবস্থায়, সমাজকে মোটামুটি নেনে নেবার কারণে অসুসঙ্গিৎসা ও নবীনের প্রেরণা নিঃশেষ হয়েছিলো এবং সে-কারণেই বহু মঙ্গলকাব্য আমরা পেয়েছি যাদের সাহিত্যিক মূল্য নিতান্ত গৌণ।

বাংলা কবিতার ঐশ্বর্যে বৈষ্ণব কবিতার দান অপরিমিত। এই দানের প্রাচুর্য বিষয়ে আমাদের সংস্কার যদিও দুর্মর এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলা কাব্যের মুক্তিতে বৈষ্ণবকবিদের ওই অদ্ভুত, এবং অবাঙালী উচ্চারণ সম্বলিত ভাষার কোনোই প্রভাব নেই। আমাদের কারো কারো কানে এই ভাষার ধ্বনি খুবই স্নিগ্ধ এবং সুর করে আড়ষ্ট উচ্চারণেরও হরতো যথেষ্টই আবেগ প্রকাশ পায় কিন্তু তার সঙ্গে বাঙালীর উচ্চারণরীতির কোনো সংযোগ নেই এবং জীবনের কোনো ঘরোয়াকথাই তাতে বলা চলে না। এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে বৈষ্ণবকবিদের প্রভাব সবেও বলা প্রয়োজন তাঁর ভানুসিংহের পদাবলী বাংলা কবিতার শুবিষ্কৃত সম্পর্কে আশাবিত করে না যদিও একথা ঠিক উনিশশতকী অন্যান্য কবিদের নিষ্ফল প্রয়াসের পাশে ভানুসিংহের কিছুকিছু পুঙ্ক্তি জীবনের স্বাক্ষর রাখে। ত্রজবুলী ভাষা যেহেতু বাঙালীর মৌখিক এমনকি লেখ্য ভাষাও নয়, বাংলা কবিতার ইতিহাসে কাব্যপ্রকরণ ও কলাকৌশলের প্রশ্ন বিষয়ে তার দানের প্রশ্ন অবাস্তব। একমাত্র চৈতন্য প্রসারের ক্ষেত্রে, সচেতনতার নজীরে বৈষ্ণব কবিতার ঐশ্বর্য বাংলাসাহিত্যে আসে। মঙ্গলকাব্যাদিতে পরবর্তীকালে, আমরা বাংলারীতির প্রকাশে আনন্দিত হই কিন্তু বৈষ্ণব কবিতাতেই প্রথম চৈতন্যের টান পাওয়া গেল। একথা আমাদের বুঝতেই হয় যে জীবনযাত্রায় সচেতনতার আরম্ভ সামাজিক রীতীয়েই ব্যক্তির সম্পর্কের ক্ষেত্রে। নিম্নে মিলিয়ে নেবার প্রশ্নে বোঝা যায় চরিত্রের টানাপোড়েন, যন্ত্রণা এবং উপলব্ধির বিভিন্ন স্তর। বিশ্বাসের শিকড় কেমনভাবে জীবনের গভীরে তলায় এবং রস টানে। বৈষ্ণব কবিতায় দুটি সস্তার সম্পর্কে জীবনের স্কন্ধ, মরমী টানটা

প্রকাশ পেলো। এই টান যে হুজুন হুজুনকে চাওয়ার শেষ নেই, পাবার পরেও অকুরন্ত পাবার বাসনা নিঃশেষ হয় না নরং জীবনের পাকপাকে জড়িয়ে থাকে। সম্পর্ক গড়ার আনন্দ যেমন আছে যন্ত্রণাও তেমনি, সম্পর্কের শেষ নেই কারণ শেষ কথা কে বলবে। সমগ্র বৈষ্ণব কবিতায় তাই যতোটুকু সম্পর্কের এই টানে জীবনের রহস্য ব্যক্তির বিশ্বাস ও উপলব্ধির নিরন্তর রঙে, ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে ততোটুকুই আমাদের চৈতন্যের বিস্তার এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনার ভিত্তি।

অবশ্য চণ্ডীদাসের নতো পদকর্তাদের কথা ওঠে। “শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে” বাঙালীর জীবনধারা, আবেগ ও সচেতনতা সহজ, অনাড়ম্বর চেহারায় প্যাস্টোরাল কবিতার ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়। চণ্ডীদাসের ঘরোয়া রূপ, ভাষার সরল চও কবিতার প্রসাদগুণে রঞ্জিত কিন্তু বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিস্তারে জীবনের যে প্রশস্ত গভীর পরিচয় চণ্ডীদাসে তা মেলে না। এমনকি চৈতন্যদীপ্ত, বস্তুগ্রাহ্য যে-রূপে মূর্ত হয়ে কবিতা মহত্ব পেঁছোয় চণ্ডীদাসের সেই রূপ আয়ত্তে আসেনি। সাধারণ ঘরোয়া জীবনের নিস্তরংগ প্রবাহে তিনি কিছুটা কাব্যের আলোড়ন তুলেছিলেন এবং সেই ছোট দাবী, ছোট রূপকে নিজের উপলব্ধির আলোকে কাব্যরূপ দিয়েছিলেন। এই সাধারণ অভিজ্ঞতাকেও যে স্বকীয় আবেগের রঙে মহত্ব আনা যায়, কাব্যের দীপ্ত ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করা যায় এ-কথা বুঝলেও তাঁর ক্ষমতায় কুলোয়নি। কারণ কবিতাবিষয়ে মৌল বোধ সত্ত্বেও তিনি সচেতনতায় সেই বোধকে তুলতে পারেননি। তাই ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’ যে-কবি ঘোষণা করেন সোচ্চারে, তিনি কাব্যের বিশেষ ক্ষেত্রে, নিজস্ব স্বাক্ষর এমন পরিপূর্ণতায় রাখতে পারেননি যেমন পেরেছিলেন একই অবস্থায় রোমের কবি ভার্জিল। লৌকিকজীবনের কাহিনী, বিশ্বাস ভালোলাগা-মন্দলাগা ভার্জিলের হাতে শরীর পেয়েছিলো, যে-শরীর প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে অমুভব করা যায়, যেন প্রায় স্পৃশ্য-পেশল। চণ্ডীদাস ক্ষমতা সত্ত্বেও পারেননি ভার্জিলের স্তরে পেঁছোতে কারণ তিনি বিষয়ের অন্তরে প্রবেশ করেননি, দৃষ্টির বাইরে বস্তুর বা আবেগের রূপকে যাচাই করতে চাননি। তবু শেষ বিচারে একথা নিশ্চয়ই ঠিক যে চণ্ডীদাসেও এমন সব পংক্তি হঠাৎ আসে যা প্রায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ-পংক্তির সঙ্গে তুলনা করা যায়।

বৈষ্ণবকবিতা, মঙ্গলকাব্যাদির পুরে বাংলা কবিতায় প্রথম বাগবৈদগ্ধ্য, নাগরিক মেজাজ ও রসবোধ এলো ভারতচন্দ্রে। রাজসভায় সংস্কৃত প্রথাসিদ্ধরীতির ছাপ পড়লো বাঙালী কবিদের উপর। প্রায় আধুনিকের চোখ, বিক্রপ-ঠাট্টা ও চতুরালি ভারতচন্দ্রের সঙ্গেসঙ্গে কবিতার মেজাজে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সংস্কৃত ও ফার্সি সংমিশ্রণে ছন্দ, ভঙ্গি ও মেজাজের পরিবর্তন ঘটলো এতোকালের অভ্যস্ত কবিতায়। বাংলাকবিতার ঐতিহ্যে ভারতচন্দ্রের দান এই মেজাজ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই মেজাজের জোরেই তিনি কাব্যে প্রথম চরিত্র-চিত্রণ করতে পারলেন নিখুঁত বস্তুনিষ্ঠায়, যে-বস্তুনিষ্ঠায় সত্যের অপলাপ ঘটে না সামাজিক বিধিনিষেধের মুখেও। ভারতচন্দ্র পয়ারের অভ্যাস নিজের গা এলিয়ে দেন না, নানাধরনের পরীক্ষায়, ভাষাব্যবহারের সতর্কতায় নিজের সচেতন মনের পরিচয়কেই স্পষ্ট করেন। সহজ

অভ্যাসের স্রোতে একথা ভোলা সহজ বলেই প্রমথ চৌধুরী মশায় ভারতচন্দ্রের দান বিষয়ে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বারবার।

ভারতচন্দ্রের পর দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় একমাত্র স্থিতিধী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি কবিতাকে জীবনেরই মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন এবং নিজের সাহিত্যিক রুচির প্রমাণ নির্ভুলভাবেই উপস্থিত করেছেন। পরিবর্তনের মুখে ঈশ্বর গুপ্ত খুব বড় ক্ষমতা নন যে বিরাট সৃষ্টিতে তৎকালীন জীবন ও কবিতার সেতুবন্ধ ঘটাবেন, কিন্তু তিনি তাঁর পরিমিত সাধ্যেই রুচিকে সংকীর্ণ হতে দেননি; ইংরেজ শাসনে আমাদের জীবনের অঘটনকে বিক্রপ ও হাসি মিশিয়ে স্পষ্ট করে ধরেছেন।

তারপর আমাদের এতোদিনকার প্রাদেশিক ঐতিহ্যে বিরাট ক্ষমতা নিয়ে আসেন মধুসূদন। অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় জীবন ও কাব্যের যোগাযোগে বিশ্বাস জন্মাতে অসুবিধে নেই, ঐতিহ্যকেও সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব, কিন্তু মধুসূদন এমন এক সময়ে জন্মেছিলেন যখন জীবনের তাৎপর্য ঘুলিয়ে আছে এবং সৌন্দর্যের বোধ বিষয়ে অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিঁড়ে গেছে, নতুন বোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এমন ছুদিনে মধুসূদন বিশ্বের মানদণ্ড আনেন বাংলা কবিতায়। যদিও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মনে করেন বাংলাভাষার মেজাজ মধুসূদনের কানে বাজেনি এবং তিনি বাংলাভাষার চর্চায় সংস্কৃতেরই শরণাপন্ন হন তবু অমিত্রাক্ষরে পয়ারের আশ্চর্য ব্যবহারে বোঝা যায় মধুসূদনের রক্তে বাংলার লৌকিক রূপ কখনো হারিয়ে যায়নি। কারণ মধুসূদনের প্রহসন দুটির উদাহরণ ব্যতিরেকেই বলা চলে ‘মেঘনাদ বধ’কাব্যে সংস্কৃতের গুরুগম্ভীর শকাট্টবর্ষের আড়ালে বাঙালীর কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণপদ্ধতি স্বীকৃত, বাঙালার মৌখিক চালটাই মিশিয়ে আছে। প্রতিভুলনায় বরং রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর মধুসূদনের গম্ভীর উদাত্ত রীতির বাইরে হেমচন্দ্রদের ভুলটাকেই মেনে নেয়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মধুসূদনের দান তাঁর স্বকীয় বিবর্তনের ইতিহাসে মানেননি, বিহারীলালকেই শিরোপা দিয়েছিলেন তবু আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মতো নক্ষত্রবিহারী প্রতিভার ক্ষেত্রেও মধুসূদনের প্রভাব একেবারেই অসম্ভব নয়। কারণ, লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে বাংলা ভাষার মেজাজ বিষয়ে মধুসূদনের জ্ঞান অব্যর্থ না-হলেও অনেকটাই অসন্দ্বিগ্ন এবং মেঘনাদবধে তা যতোটা স্বীকৃত, রবীন্দ্রনাথের আবাল্য পরিচয়ে মেঘনাদবধ নিশ্চয়ই তাঁর কানে সেই মুক্তির পরিচয় রেখেছিল। তাছাড়াও মধুসূদনের জীবনের বোধ ও সাহিত্যিক রুচি, সৌন্দর্যের ধারণা ও শব্দের নিজস্ব রূপ বিষয়ে সতর্ক মনোযোগ সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পক্ষে মহৎ ঐশ্বর্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে এ-কথাই বলতে হয়-যে তিনি বাংলাভাষাকে নতুনভাবে গড়েছেন, সমস্তরকম ভাবপ্রকাশের বাহন করেছেন। কবিতায় জীবনের সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়ে কোনো সিদ্ধিকেই মানেননি, বাস্তবের মিথের নির্দিষ্ট সীমা নিয়েই ভেঙেছেন। আসলে তিনি জীবনকেই সহস্র রূপে প্রকাশ করতে চেয়েছেন তাই সহস্র রূপকে কাব্যের বিভিন্ন পদ্ধতিতে ধরতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর পরিণত সৌন্দর্যবোধ ও প্রশান্ত জীবনসিদ্ধি সবেও মনে হয়েছে জীবনের সমস্ত রূপ

তিনি ধরতে পারেননি, ছলনায় সত্যের রূপ আড়াল দিয়ে লুকিয়ে চলে গেছে। যে-জীবনকে তিনি স্থির লক্ষ্যে ধরেছিলেন তাও মাঝে মাঝে চিড় খেয়েছে এবং তখন পুরোনো অভ্যাস ছেড়েই তিনি সেই নতুনকে খুঁজেছেন। পুরোনো সৌন্দর্যবোধ যখন প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে মেলেনি তিনি সংশয়শ্রুত হয়েছেন। এই সংশয় ও আত্মজিজ্ঞাসার তাড়নায় আজীবনের সব বিশ্বাস ছেড়ে আধুনিক মনের আলায়ঙ্গণের কাছে প্রায় পৌঁছেছিলেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ ইস্যুটদের বিশ্বাসের মতো নয়, সমস্ত সময়েই তিনি জীবনের বড়ো প্রয়োজনের মূল্যেই কাব্যের যথার্থ খুঁজেছেন। তাঁর আত্মবিশ্বাস ও কল্পনার জগতে আধুনিকদের জীবনবিষয়ক বক্তব্য কোনোদিনই আলোড়ন তোলেনি কিন্তু সেই বিশ্বাসের তলায় যে সন্দেহের বীজ পড়েছিলো তার প্রমাণ রয়েছে শেষ বয়সের কবিতায়। চূড়ান্ত সিক্তির শিখরে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিলো ছলনাময়ী জীবন বুঝি তাকে মিথ্যাই এতোকালের বিশ্বাস জুগিয়েছে, মানুষের ভবিষ্যতে মানুষেরই আস্থা নেই। এই বোধে রবীন্দ্রনাথ কবিতার পুরোনো জগৎ, সুন্দরের জগৎ ভেঙে অসুন্দরের, জ্বালায় জগৎ বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন। যদিও কাব্যরীতির দিক থেকে নতুন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি তবু বিশ্বাসের মোড় ফিরছিলো। তিনি বিশ্বাসকে যাচাই করতে শুরু করেছিলেন। ঠিক আধুনিকের যন্ত্রণাশ্রুত সংশয় নয়, রবীন্দ্রনাথ আধুনিকের সপ্রমাণ জিজ্ঞাসার দিকে ঝুঁকেছিলেন। এই প্রশ্নের চরিত্র অবশ্যই উত্তরবলী কারণ প্রশ্নের উত্তর তিনিই মনেমনে তৈরী করছিলেন

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে

সে পায় তোমার হাতে

শান্তির অক্ষয় অধিকার।

এই বিশ্বাস শেষ কবিতায় প্রায় নিজেেকে নিজের শ্রোতাক দেবার মতো, এই বিশ্বাস ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সমস্ত অতীত সিক্তির অর্থ থাকে না।

রবীন্দ্রনাথের এই আত্মজিজ্ঞাসা ও সংশয়ের সচেতন রূপটাই হলো আধুনিকদের পটভূমি। নজরুল বা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাস ও সৌন্দর্যবোধ ছাড়াই রবীন্দ্রপ্রভাবের বাইরে গিয়েছিলেন এবং শুধুমাত্র সোচ্চারভঙ্গী ও জীবন বিষয়ক বড়ো বক্তব্যটা ছাড়া বাংলা-কবিতায় তাদের দানের প্রসঙ্গ ওঠে না। একই কথা সত্য সত্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে। যতীন্দ্রনাথ ও নজরুলে জীবনবিষয়ে যে-মোটা বোধটাও ছিলো সত্যে রবীন্দ্রনাথে তার কোনো পরিচয়ই নেই। একঅর্থে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর উপরেই সবচেয়ে কম।

এদের বাদ দিলে, আধুনিকতার ধ্বজা উড়িয়েছিলেন ত্রিশ সালের কবিরাই প্রধানত। তাঁদের মধ্যে বর্তমানেও যারা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র। গোড়ায় সবার নজরে এসেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর মেহনতী জনসাধারণের সঙ্গে একতার বানী নিয়ে এবং বুদ্ধদেব বসু প্রেমের দৈহিক পরিচয় নিয়ে। বর্তমানে প্রেমেন্দ্র মিত্র, উচ্চকণ্ঠ কবিতাবলী ছেড়ে শান্ত, স্নিগ্ধ কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন। একহিসেবে বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই পরিবর্তন প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে অনেক বড়ো কিন্তু এই

পরিবর্তনের তালে তাঁর কবিতার রূপে মৌল কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অবশ্য মানুষের হৃৎস্পর্শ নিয়ে এখনো তিনি ভাবেন, কিন্তু আনার বিন্যাস, তাঁর মানসে এই ভাবনা তেমন আবেগ তোলে না; জীবনকে মেনে নিয়েছেন তিনি, কবিতার শরীরে এই মানা বিনা পরিশ্রমে যতো সহজে আসে ততোই তৃপ্তি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের হালের পুরস্কার পাওয়া 'সাগর থেকে ফেরা' কবিতাবলীতে এই অযত্নপ্রয়াসের ছাপ সর্বত্র, ভাবনা থেকে কবিতার রূপকর্মেও। এই দিক থেকে বুদ্ধদেব বসু অনেক পরিশ্রমী। নানাভাবে তিনি কবিতার রূপকর্ম বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। 'বন্দীর বন্দনা'র দেহজ সৌন্দর্যবিলাস ছেড়ে তিনি জীবনের ব্যাপ্ত পরিচয়ে আসতে চাচ্ছেন তাঁর বর্তমান কবিতায়, বুঝেছেন :

কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নয় আর।
লেখা, পড়া, প্রকৃপড়া, চিঠি লেখা, কথোপকথন,
যা-কিছু ভুলিয়ে রাখে, আপাতত, প্রত্যাহের ভার—
সব যেন, বৃহদরণ্যের মতো তর্কপরায়ণ
হ'য়ে আছে বিকল্পকুটিল এক চতুর পাহাড়।
সেই যুদ্ধে বারবার হেরে গিয়ে, ম'রে গিয়ে, মন
যখন বলেছে, শুধু দেহ নিয়ে বেঁচে থাকা তার
সবচেয়ে নির্বাচিত, প্রার্থনীয়, কেননা তা ছাড়া আর
কিছু নেই শাস্ত, স্নিগ্ধ, অবিচল প্রীতিপরায়ণ—
আমি তারে তখন বিশ্বস্ত ভেবে কোনো এক দীপ্ত প্রেমিকার
আলিঙ্গনে সত্তার সারাংশের ক'রে সমর্পণ—
দেখেছি দাঁড়িয়ে দূরে, যদিও সে উদার উচ্কার
লুপ্ত ক'রে দিলো ভাবা, লেখা, পড়া, কথোপকথন,
তবু প্রেম, প্রেমিকেরে ইর্ষা ক'রে, নিয়ে এলো ক্রুর বরপণ—
হুকুম, নূতনতর, ক্ষমাহীন দায়িত্বের ভার।
কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নেই আর!

কিন্তু এই অভিজ্ঞতা যদিও বুদ্ধদেব বসুকে কল্পনার বিস্তার দিয়েছে তবু এই বিস্তার অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিগত অথচ উদার আবহ তাঁকে জোগায়নি। এখনো তিনি তাঁর কবিতার গঠনে ও শরীরে এই অভিজ্ঞতায় প্রকাশের কঠিন, দৃঢ় অথচ আবেগময় রূপকর্ম খুঁজে পাননি। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের উচ্ছল, তীব্র কয়েকটি পংক্তির পাশাপাশি বুদ্ধদেব বসুর স্থির, একান্ত প্রয়াস অনেক মূল্যবান।

জীবনানন্দ দাশের কবিতাবিষয়ে মাতামাতির, আগ্রহের পরিমাণ অকুরন্ত। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর অমুরগীন্দ্রমণী কবিতাবলীতে, বিষাদাচ্ছন্ন চিত্রকল্প ও প্রায় ভদ্রুর, দীর্ঘ পয়ারে, এমন একটা আবহ তৈরী করেছেন যার প্রভাব-তরুণ কবিদের উপরে অসীম। রবীন্দ্রনাথ বা বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য ও বিশেষণ নিয়ে মাতামাতির গভীর তাৎপর্য বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেও বলা চলে জীবনানন্দ জীবনের একটা অভিজ্ঞতায় সমাচ্ছন্ন যে ভালোলাগার একটি পৃথিবী সরে যাচ্ছে, যেকোনো কারণেই

হোক, ওই পৃথিবীর গাছপালা বা প্রতীকধর্মী প্রেম বা নারী আর থাকবে না। না-থাকার কথা মনে পড়ায় ওঁর মনে ছায়ার নতো। একটা বিষাদ আশ্রয় নিয়েছে, এই বিষাদ ওঁর মনের কেন্দ্রে স্থিত হয়ে কবিতার ছড়ায়, আশাদের মনেও আসে। কিন্তু এই বিষাদের উৎস সম্পর্কে তিনি উদাসীন বা মাছুষের সভ্যতা ও জীবনের বিভিন্ন স্তর, তার অভিজ্ঞতা বিষয়ে তাঁর মন উৎসুক নয়, বিষাদের বৃত্ত গুটোতে গুটোতে ক্রমশই তাঁর পৃথিবী নিজের চারপাশে ছোটো হয়ে আসে। চিত্রকর, ধ্বনি, শব্দব্যবহার সবকিছুতেই তার প্রমাণ অসন্দ্বিগ্ন। এমনকি পুরোনো অপস্রয়মাণ যে-জগতকে তিনি সুরভূনা ইত্যাদির মধ্যে আশ্রয়ী মনে করেন, তাদের সম্পর্কেও ওঁর বোধ নিতান্তই বিষাদের। বিষাদের বাইরে তাদের পরিচয় নেই, প্রেমের অস্তিত্বাশ্রয়ী যন্ত্রণা তাঁকে দহন করে না।

তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
হৃপ্তির শূন্য সব বন্দরের ব্যাধা,
বিকেলের উপকণ্ঠে গাগরের চিল,
নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব—
শ্রামলী, করেছি অমুভব।

বা,

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে ;
সেইখানে দারুচিনি বনানীর কাঁকে
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য ; তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে ;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

এই কবিতার অমুভবেও সে-কারণে একটা ‘মুভ’ ও একটি ভঙ্গিই বারবার ফিরে আসে। ওঁর কবিতার উপকরণ চিত্রকলাদিতে তাই জীবনের অসরল, চেউয়ের ভঙ্গিটা আসে না ; আবেগের সহজ গড়ানো স্রোতে চিত্রকরও এলোমেলো অসংলগ্ন হয়ে যায়। লেখেন,

‘তোমার মুখের রেখা আজো
মৃত কণ্ঠ পৌত্তলিক স্বপ্নান সিঁদুর
অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন ;’

‘তোমার সৌন্দর্য নারী অতীতের দানের মতন।’

তবে এ-কথা ঠিক-যে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জীবানন্দ দাশে দক্ষতার সীমা নেই,

কবিতার আবেগ তাঁর অফুরন্ত। রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মের প্রভাব জীবনানন্দে কম কিন্তু তেমনি বাংলাদেশের কবিতার ঐতিহ্য তাঁর একেবারেই নেই।

রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট বা রবীন্দ্র অনুসরণে স্বীকৃত কবিদের মধ্যে এককালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তীর নাম উঠতো। প্রসঙ্গত যেমন বুদ্ধদেব বসু এককালে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে স্বাধীন কবিই মনে করতেন না বা বর্তমানেও গোপাল হালদার অমিয় চক্রবর্তীকে মনে করেন না। সত্য ভাষণের দিক থেকে নিশ্চয়ই অমিয় চক্রবর্তীর ঝোঁক রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধির সিদ্ধান্তে কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তো ননই, অমিয় চক্রবর্তীও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা আচ্ছন্ন নন। তবে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যেমন নিজের জীবনজিজ্ঞাসার আলোকে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যে জারিত; অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় সেই স্বকীয় অভিজ্ঞতার ছাপ কম। অমিয় চক্রবর্তী গোড়া থেকেই বিশেষ ভঙ্গিসর্বস্ব কবি; যে-কোনো সাধারণ বোধ বা অভিজ্ঞতাকেই তিনি কৌশলে সাজাতে পারেন এবং বোঝা যায় তাঁর কলাকৌশল শুধু কলাকৌশলই, তার পিছনে কোনো মৌল তাগিদ নেই। ফলে অমিয় চক্রবর্তীর অতীত ও বর্তমানে কোনো প্রভেদ নেই, শুধুমাত্র কবিতার মোটা, স্থূল বক্তব্য ছাড়া। বোঝা যায় যে অমিয় চক্রবর্তীর আরম্ভ ও শেষ বলে কিছু নেই, যেমন নেই জীবনানন্দ দাশেরও। জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এই যে জীবনানন্দের আবেগ অনেক বেশি সত্যনিষ্ঠ এবং স্বকীয়; অমিয় চক্রবর্তী আলতো, অগভীর। জীবনটা তাঁর কাছে ওপর থেকে বর্ণনার, তালিকার। যেমন পুরোনো কবিতা :

গেল

গুরুচরণ কামার, দোকানটা তার মামার,
হাতুড়ি আর হাপর ধারের (জানা ছিলো আমার)
দেহটা নিজস্ব।

এবং বর্তমান

দেখলাম ছ-চক্ষু ভ'রে, হে-প্রভু ঈশ্বরমহাশয়
চৈতন্যে প্রসন্ন সূর্য,
খচিত রাত্রির দেয়া গান
রেডিও নক্ষত্রে বাজলো এইদেহে ঝিমঝিম দূরে
শিরায় জড়ানো নহবৎ।

এঁদের প্রত্যেকের তুলনায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তর কবিস্বভাব অনেক গভীর, জিজ্ঞাসার আলোড়ন তাঁর সমগ্র কবিতার শরীরে। জীবন এঁর কাছে স্থানকালহীন নিরালস্য আবেগমাত্র নয় পাত্রভেদে চৈতন্যের বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতায় রঞ্জিত, দেশকালের প্রেমে, পুরো অস্তিত্বটাই। তিনি জানেন জীবন বা ঐতিহ্যের মূল্য পড়ে-পাওয়া স্থিরবস্তু কিছু নয়, প্রতিমুহূর্তের অভিজ্ঞতায় তার প্রমাণ ও সার্থকতা। কারণ অতীতকে যেমন না-স্বীকার করলে বর্তমানের ভিত পাওয়া যায় না তেমনি বর্তমানকে তৈরী করতে হয় যুগসঞ্চিত সমস্ত মানবজাতির অভিজ্ঞতা ও চৈতন্যের স্রোতে মিলিয়ে। অভিজ্ঞতার প্রতি স্তরে জীবনকে মুখোমুখি প্রশ্নের আলোয়, উপলব্ধির যন্ত্রণায় মিলিয়ে

নিতে হয়। নইলে জীবন তো সবার এবং আকস্মিকের মালায় গাঁথা কার্যকাণ্ডহীন পরম্পরা মাত্র। তাই যে-প্রেম নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর মাতানাতি বা জীবনানন্দ দাশের ধূসর বিষাদ, সুধীন্দ্রনাথ তাকেই প্রেমের, তীক্ষ্ণ বিচারের বিষয়বস্তু করেন এবং অভিজ্ঞতায়, যুগসন্ধির বেদনাতেই, বোঝেন :

চাই, চাই, আজো চাই তোমারে কেবলি।

আজো বলি,

জনশূন্যতার কানে রুদ্ধকণ্ঠে বলি আজো বলি—

অভাবে তোমার

অসহ অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার,

কান্য শুধু স্ববির মরণ।

অথবা, আধুনিকের বিষমর্জিত চেতনাতেই 'শান্তী'র মতো আশ্চর্য সুন্দর কবিতা লেখেন এ-কথা জেনেই যে প্রাক্তন পাশ্চাত্যের দায় নিজের কাঁধেই। তবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তর মৌলসংশয় ঘোচে না, জীবনের স্থির প্রত্যয়ে তাঁর বিশ্বাস গড়ে না, সভ্যতার নানাবিধ ওঠাপড়ায় শুধুই মনে হয় যে,

অস্তহিত আজ অস্তর্যামী :

রুশের রহস্যে লুপ্ত লেনিনের মাসি,

হাতুড়ি নিষ্পিষ্ট টুটকি, হিটলারের সুহৃদ টালিন,

স্বতস্পেন, ত্রিয়মান চীন,

কবন্ধ ফরাসী দেশ। সে এখনও বেঁচে কিনা,

তা স্মৃদ্ধ জানিনা।

নরকধুরেও মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা তাঁর দূর হয় না কারণ নরকে দান্তের আত্মশুদ্ধি না-মেলায় তিনি নিজের দুর্মর অহং ভাগ করবেন না যদিচ ধর্ম এবং সমাজ-বিবর্তনে তাঁর বিশ্বাস লুপ্ত, নিজেতে ছাড়া। কিন্তু এ-অবস্থায় নিজের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখাও সম্ভব হয় না ফলে সবকিছু মিলিয়ে তিনি মহাপ্রলয়ের অংশ হয়ে থাকেন। কবিতায় নতুন সম্ভাবনার চর্চা ছেড়ে দেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শুধুমাত্র অন্তঃপ্রেরণার কবিতা না-লিখে রবীন্দ্রনাথের শুভ কর্মবাদ এবং পাশ্চাত্যের গভীর জীবনধারাকেই যখন গ্রহণ করেন, তখন বোঝা যায় দায়িত্বশীল কর্ম হিসেবে কবিতার কথা সং এবং সচেতন কবিদের উপরেও বর্তাবে। বিষ্ণু দেব কাব্যজীবনে সুধীন্দ্রনাথের প্রভাব তাই থাকে এবং আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দেব মধ্যে তিনি যেন অনেকটাই সেতুর কাজ করেন। সেতুর প্রশ্ন ওঠে কারণ বিষ্ণু দেব তুল্য ঐতিহ্যসচেতন কবি বাংলাসাহিত্যের ভগ্নভেদে বর্তমানে আর নেই এবং আমার জানাশোনায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ নয়। তিনি তাঁর কবিতার প্রথম সূত্রপাতেই বুঝেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের গাধকতা রবীন্দ্রনাথকে তৎকালীন কাব্যধারার সঙ্গে মিলিয়ে আনত করায়। রবীন্দ্রনাথ তখনই ঐতিহ্য যখন জীবনে বোধ ও কাব্যরীতির উভয় ক্ষেত্রে তিনি ভবিষ্যতের প্রেরণা ও প্রধাসিদ্ধ-পদ্ধতির ভাঙনে নতুন সম্ভাবনার প্রতীক। তারপর শুধু রবীন্দ্রনাথই নয়, সমগ্র

বাংলাসাহিত্য রস না-জোগালে, বাংলার জীবন কবিতার আকাশজলমাটি না-হলে কবিতার মুক্তি নেই, যেমন নেই জীবনের গ্রহিমোচন। আমাদের দেশ ও সংস্কৃতির সমন্বয় তিনি তাই দেশ ও মানুষকে খুঁজে ফেরেন সমগ্র ইতিহাস জুড়ে শুধুমাত্র উনিশ শতকের কয়েকজন ভদ্রলোকবাবুদের মধ্যে নয়। তাই যেমন মদলকাব্য তাঁর কবিতায় নতুন চেহারায় ফেরে তেমনি মহাভারতের কাহিনীও আমাদের বর্তমান জীবনের রূপকভাস পায়। আবার আমাদের ইতিহাস ও জীবনকে যেহেতু বিরে রেখেছে সমগ্র পৃথিবী তাই তিনি চৈতন্যের বিস্তারের প্রয়োজনে বিশ্বপরিভ্রমণ করেন। সমগ্র মানবজাতির সভ্যতাসংস্কৃতি তাঁর কবিতার লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

কবিতার প্রথম আরম্ভে বিষ্ণু দে অশুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিরাট ঐতিহ্য এবং সঙ্গেসঙ্গেই বুঝেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যের মূর্তি, শ্রেয় ও প্রেয়স ধারণা বর্তমান সভ্যতা কিছুতেই পূর্ববৎ থাকতে দিচ্ছে না। বাইরের ছলনাময়ী পৃথিবীর সংঘর্ষে এই সৌন্দর্যবোধের ক্রটি তাঁর চোখে ধরা পড়েছিলো, নারীর শরীর ও প্রেমের অস্বাভাবিক মর্যাদা যে পুরোনো স্বীকৃতিতে সত্য নয় সে-বিষয়ে এতোই স্পষ্ট তিনি যে লেখেন

সুঠাম সুশ্রী মেদসুকোমল প্রিয়ারে বক্ষে ধরি'
গলিতেছিলাম অর্থবিহীন সুমধুর কাকলিতে,
নাগরিকা মোর করুণ কোমল—মোদেরে লক্ষ্য করি'
দধীচি-অগ্নি হানিলে কঠোর কঠিন বস্ত্রপাণি।

সুগঠিত প্রেম, বাসনাবিলাস, উপবন পুণিমা
দূর করে দিলে ঘোর ঝঞ্ঝায় চূর্ণ চূর্ণ করি'
যে ভুবনে মোরে নিয়ে এলে—কোথা নারীদেহ রজিমা ?
তোমারে আমার বন্ধু করিয়া কি লাভ বস্ত্রপাণি ?

বা

আনি নহি পুরুষবা, হে উর্বশী,
আমরণ আসক্তলোমুপ,
আনি জানি আকাশ পৃথিবী
আমি জানি ইন্দ্রধনু প্রেম আমাদের।

একই সঙ্গে, তাঁর বক্রহাসির ভাষায়, জীবনের মৌল আনন্দের কথা আসতে চায় ; জীবনের এই ভগ্ন, নির্জীব অস্তিত্বের মধ্যে পদধ্বনি শোতেন। আসলে বিষ্ণু দে হতাশা কখনোই তাঁর সমগ্র চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে নেই ; এই হতাশা ও দ্বিষাদকে তিনি তির্যক ভঙ্গিতে, হাসিতে তফাতে সরিয়ে রাখতে জানেন, যন্ত্রণার মধ্যেও নবজীবনের আলোর সন্ধান করেন তাই। বর্তমান জীবনযাত্রায় তিনি যেমন মহতের সম্ভাবনাকে ঠাট্টা করেন বা হেসে উড়িয়ে দেন তেমনি জানেন যে জীবনযাত্রার ক্ষুদ্রতায় মানুষের পরিমাপ হবে না। এই বোধ থেকেই তাঁর প্রশ্ন ওঠে যে বর্তমান

পছন্দ জীবনযাত্রা ও অক্ষমতার তলায় কী সেই কারণ ? কেমন করেই বা তার নিকড় উপড়ে নবজীবনের জয়গান করা যায় । সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে গোড়া থেকেই তাই বিষ্ণু দেব তফাৎ জিজ্ঞাসার মানসিক ঝোঁকের । বিষ্ণু দে মূলতই গঠনধর্মী, সৃষ্টির পূর্ণতার দিকে ওঁর নজর যেখানে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত হতাশাকে, অবিশ্বাসকেই সম্ভার মূল স্বরূপ বলে নিজেই বোঝান এবং দ্বিরপ্রত্যয় হিসেবে মেনে নিতে দ্বিধা করেন না । মেজাজের এই মৌল ঝোঁক থেকেই বিষ্ণু দে বোঝেন যে অবক্ষয়ের উৎস মনুষ্যচরিত্রে নেই, আছে বর্তমান জীবনযাত্রার তলায় শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থার শোষণ । অর্থাৎ সেই দৌলশাপের দায়ভাগ আমাদের শেষ হবেই ; বিশেষ করে ভারতবর্ষের মৌলআনন্দের নিদানে মানুষের জীবনে শুক উষরতায় ফুল ফুটবে, জ্বলের প্রাচুর্যে জীবন ঐশ্বর্যের সম্ভারে পুষ্পিত হবে । তাই ‘ষোড়শওয়ার’ কবিতার যৌন-প্রতীকের পরপারে এই নবীন প্রাণের কথা, উর্বরতার কথাই আসে ।

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তন মোর
আয়োজন কাঁপে কাননার ঘোর ।
কোথায় পুরুষকার ?
অঙ্গে আমার দেবেনা অঙ্গীকার ?

এই অঙ্গীকার যখন সত্যিই লাভ করেন, তিনি খুঁজে পান তাঁর দেশকে, দেশের সংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথ ও প্রেমসীকে । উর্বশী ও আর্টেনিসে যে হৃদয়, সংশয় ও ‘সৌন্দর্যের’ বিরুদ্ধতা শুরু হয়েছিলো, অভিজ্ঞতার বিশ্বপরিভ্রমার পর তিনি নতুন ঐক্যে তাদের দাঁড় করান, অস্তিত্বের সন্ধান পান সত্তা ও সৌন্দর্যের ইতিহাস ও জীবনব্যাপী মিলনে :

দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে
সে কার হওয়া আনে বনের নীলভাষা ।
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে ।

আলোর ঝিকমিকি তোমার কালো চুলে,
উষার ভিজে মুখে দিনের স্মিত আশা,
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে
পরশ মেলেমেলে তুমি যে ধরো ফুলে,
হৃদয় সে-উষায় খামায় যাওয়া-আসা,
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী কূলে ।

এই পরিণতির পর বুঝি বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথের পর বাংলাকবিতায় বিশ্বের মান এনেছেন এবং ওঁর সিদ্ধিতে বাংলা কবিতার সমগ্র ঐতিহ্য নতুন পরিণতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । ইতিহাস, মানুষ ও জীবন একটা সামগ্রিক কেন্দ্রে স্থিত হয়ে কবিতার শরীরে মূর্তি পাচ্ছে ।

বিষ্ণুদেতে সিদ্ধির একটা চূড়ো মিললেও সমর সেন, অরুণ মিত্রের কবিতায় বা আরো পরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য টুকরো টুকরো

ভাবে নানাধরনের মেজাজ ও বক্তব্য পাওয়া যায়। সমর সেন হতাশার তির্যকভঙ্গি আয়ত্ত করেও কবিতার চর্চা ছাড়েন আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় সোচ্চার বিপ্লবের কবিতাতেও প্রাণের ছন্দ, জীবনের কল্লোল আনতে পারেন না। 'পদাতিক'-এর কবিতায় ঝংকারময় ছন্দের তলায় নিরাশার গভীর অরুকার হালকা একটা ক্ষুণ্ণতার চালে ঢাকবার চেষ্টা করেন এবং তাঁরই অনুসরণে বা অন্যান্য অনেকের বাহবায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য 'প্রফেটিক' হবার বাসনায়, কবিতার বক্তব্য ও প্রকরণে অনেক এলোমেলো উপকরণ আমদানি করেন। এঁদের মধ্যে অরুণ মিত্র ও মণীন্দ্র রায়ে বিবর্তনের আভাস আছে, ওঁরা যেন প্রাথমিক আবেগের উচ্ছ্বাস কাটিয়ে জীবনকে মুঠোয় ধরবার চেষ্টা করছেন। যদিও মণীন্দ্র রায়ের চেতনায় বিষ্ণু দেব প্রভাব কেটেও কাটে না, তিনি জীবনের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগকে কবিতার গঠনে ধরবার চেষ্টায় পরিশ্রমী। অরুণ মিত্র তার প্রাক্তন মেজাজ ও বক্তব্য ছেড়ে বর্তমানে দৈনন্দিনের সুখদুঃখ আলোছায়ায় মগ্নমুগ্ধ। এ-বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর মিল। গণ্ডের সরল ছন্দে তিনি জীবনের শাস্তরস, আপাত চাকল্যের তলার একটানা বৃহৎ প্রবাহকে তুলতে চান যদিও এখনো তিনি হাতের সেই জোর লাভ করেননি যা সমস্ত আবেগকেই কবিতার সুদৃঢ়, স্পষ্ট শরীর দেবে।

আসলে কবিতায়, অন্যান্য শিল্পকর্মেও যেনন, জীবনকে আমরা খুঁজি ব্যাপ্তি ও বিস্তারে, ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে আবার নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করে, কারণ সভ্যতার ইতিহাস তো চৈতন্যের মুক্তির প্রসঙ্গ সরল-বক্র গতিতে, তবে নিশ্চয়ই শিল্পের রূপকর্মে তার নিজস্ব ইতিহাসের ধারায় গ্রহণে-বর্জনে।

সবার সেরা



murphy radio
Delights the home!

এমিশন রেডিও এণ্ড ভ্যারাইটিস

১২০, লোয়ার সারকুলার রোড

কলিকাতা-১৪

ফোন : ২৪-২৫১৩

সংগীত-সংস্কৃতি ও জনপ্রিয়তা

বৈষ্ণনাথ ঘোষ

আদি মানবের আদিমতম ভাব প্রকাশের প্রেরণা ধ্বনিবৈচিত্র্যের প্রকাশ সম্ভব করে তুলেছে, এ-কথা নানা যেতে পারে ; এ-কথাও করা যেতে পারে, ভয়, আনন্দ হৃৎক, ক্রোধ ইত্যাদি প্রকাশের বিভিন্ন শব্দসৃষ্টি, ভাষা সৃষ্টির বহু আগের কথা । এই শব্দ বৈচিত্র্যের মধ্যেই সংগীতের জন্ম । সংগীত মানব সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধাপ । সংগীতকে 'কলা' যদি ধরা যায় হয়তো আপত্তি হবে না । সংস্কৃতি অর্থে সংস্কৃত বা সংস্কারযুক্ত । তা হলে এই বোঝায় যা শুধু আদিমতম ভাব প্রকাশের ধ্বনিবৈচিত্র্য তাকে সংস্কৃতির পর্যায় ফেলা যায় না । কলাবিষ্কার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি আজ আমাদের পুঁজি, অগ্রণী হওয়ার সম্পদ হিসাবে তা একটি সংস্কারযুক্ত নয় শত শত বৎসরের বহু বহু সংস্কারযুক্ত সংস্কৃতি । কলাবিষ্কার সকল ক্ষেত্রেই কুসংস্কার ও সুসংস্কার অনিবার্য কারণে যুক্ত হয়েছে । তাই এতো মতভেদ, এতো মাতামাতি, এতো কুচিবিচিত্র্য । একই সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরভেদ আমাদের বিভ্রান্ত করে তোলে ; নানা সংশয় দোলায় ছলিয়ে দেয় আমাদের বিশ্বাসকে । সংস্কৃতি বা কৃষ্টির ক্ষেত্র বিচারে পণ্ডিতরা ইতিহাসের দরবারে হাজির না হয়ে পারেন না । সংস্কৃতির ধাপ চিনে চিনে যখন দরবারে পৌঁছন তখন কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় দরবারে সব ধাপ একাকার হয়ে আছে ; পণ্ডিতমহাশয় ত্রীক্ষেত্রের মধ্যে আপনজনের সন্মানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন । অপরিচিতের ভিড়ে চেনামুখ পেলেই আগ্রহে ছুঁহাত বাড়িয়ে তাঁকেই জড়িয়ে ধরেন, ধাপ ভাঙার এতো পরিশ্রম বুঝিবা সার্থক হয়ে ওঠে । কলাবিষ্কার বা সংস্কৃতির ললাটে বৃহস্পতি না শনি সেইটেই হয়ে ওঠে তখন বড় প্রশ্ন ।

গত দুই শতকে সংগীতকলার ললাটে বক্রী শনির একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজিত ছিল । তাই ইংরাজী দরবারে সেটা অচেনা মুখই থেকে গেছিলো । ইংরাজী পণ্ডিতমহাশয়রা একে কুসংস্কৃতির নমুনা হিসেবে দরবারের পশ্চাৎ আসনে স্থান নিশ্চিষ্ট করে রাখ দিলেন । এ ললাটলিখন শুধু সংগীতের ক্ষেত্রেই নয়, চিত্রকলার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য । চিত্রকলার ক্ষেত্রে বৃহস্পতির দেখা মিললো, অর্বাচীন কালে জাবেল, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীর একান্ত সাধনায় । সংগীতকলার ক্ষেত্রে বৃহস্পতির দেখা আজও নেলেনি, অবশ্য করেকজন সাধকের আশ্রয় চেঁচায় শনির বক্রীভাব কেটেছে সংস্কৃতির দরবারে সভাসদ আসনে স্থানলাভ হয়েছে এই মাত্র । না-হলে সাহিত্যপত্র অগ্রণীও আজ কাউকে না পেয়ে আমাদের দিয়ে সংগীতের ওকালৎনামায় গই করাচ্ছেন কেন ? দু-দশ বৎসর আগেও ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত সংস্কৃতির আসরে অপাংক্তেয় ছিল, যদিও কবিরা সংগীতের এক অংশ নিয়ে তাঁদের কাব্যপ্রকাশের বাহন করে আত্মতৃপ্তির আনন্দ উপভোগ করেছেন, তাঁদের সংগীতের প্রতি দরদ বাহনের প্রতি বাহিতের দরদ ছাড়া আর কি আখ্যা পেতে পারে ? সংগীতের বিচারে তাঁরা প্রায়ই অন্যান্য কলাবিষ্কার

তুল্যদণ্ড সরিয়ে রেখে এক পালায় ওজন সেরেছেন। এ-কথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে সংস্কৃত কলাক্ষেত্রে, কুসংস্কৃত বা অ-সংস্কৃত কলাবিদ্যার আসনলাভ তাঁরা সম্ভব করে তুলেছেন; সংস্কৃতির স্তরভেদ তাঁরা এড়িয়ে গেছেন ও যাচ্ছেন। তাই সংস্কৃতির মধ্যে যেখানে সংগীতের চরমতম বিকাশ সেই উচ্চাঙ্গ সংগীতকে, ওস্তাদি আখ্যা দিয়ে অনেকেই বিচারকের পদপ্রার্থী।

প্রাচীন কালে ছিল অধিকার ভেদ, বর্তমানে ভেদাভেদ মানা রক্ষণশীলতা। বিচারের ক্ষেত্রে, আনরা, মানে শিক্ষিত নাগ্নুষ পরস্পরবিরোধী বুদ্ধির প্রয়োগে কলাবিদ্যার মুণ্ডপাত করে থাকি। কখনও চরম রোমান্টিক, কখনও বা চরম যুক্তিবাদী বুদ্ধি সর্বশূন্য হয়ে উঠি। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, যেমন, কোনো সাহিত্যস্রষ্টার ক্ষেত্রে বলি—এ-বইয়ে বুদ্ধির ধার নেই, রচনারীতির কায়দা নেই, এক কথায় ভোঁতা ভাবাবেগ। আবার তার পরমুহূর্তেই কোন শুদ্ধ সংগীত শুনে বলবো এ কি সংগীত, এ তো বুদ্ধির ভেলকি, কঠোর জিমনাস্টিক, ভাবপ্রকাশ নেই শুধু কালোয়াতি।

অবশ্য এর ব্যতিক্রম নেই-যে তা নয়, নিশ্চয় আছে। কলাস্রষ্টি সহজাত ছিলো যে-স্তরে সেধাপ সমাজ ফেলে এসেছে স্মরণাতীত অতীতে। তাই শুধু ভাবাবেগ দিয়ে আমাদের মন ভরে না, সংস্কারযুক্ত জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা মার্জিত কলা—‘কলাবিদ্যা’ হয়ে উঠেছে। কলা শুধুমাত্র সহজাত ভাবপ্রকাশ নয় কলা বিদ্যাও বটে, এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। তবু কোনো কোনো পণ্ডিত সাম্প্রতিক ভাবধারার নজির তুলে ভারতীয় সংগীতে শ্রেণী-স্বার্থের ইঙ্গিত দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এই উদাহরণ দিয়ে, যে-হেতু ভারতীয় সংগীত, মানে উচ্চাঙ্গ সংগীত, নৌকার মাঝিরা গায় না, যে-হেতু আদিবাসীদের উচ্চাঙ্গ সংগীতের আশ্রয় অক্ষর পরিচয় ঘটেনি, যে-হেতু ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রসমাজ প্রায়ই সংগীতের মধ্যে কালোয়াতির প্রকাশই দেখেন কলাস্রষ্টির হৃদিশ পান না সেই হেতু এসংগীতকলা সার্বজনীন নয়, অতএব জনপ্রিয় হতে পারে না। ইদানিং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে তাই আমরা বুঝি সকল প্রকারের অসংস্কৃত কলার ছড়াছড়ি। সমাজকে সংস্কৃত করে তোলার চেষ্টা নেই। শুধু ননোরঙনই লক্ষ্য। শুধুমাত্র জনপ্রিয়তাই যদি কলাবিদ্যার মানদণ্ড হয় তবে সংস্কৃতির ভাঙারে কানাকড়িও পুঁজি থাকবে না।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের জনপ্রিয়তা অতীতে ছিল কিনা এবং বর্তমানে কেন জনপ্রিয় হচ্ছে না, এটা বিচারসাপেক্ষ। এ-সম্বন্ধে বহু কথা বলার আছে। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে-এর প্রধান কারণ ইংরাজী শাসন ও শিক্ষা। আগের দিনে যে-সমাজ উচ্চাঙ্গ সংগীতের উৎকর্ষতার প্রধান সহায়ক ছিলেন সেই সমাজই ইংরাজী আমলে, শতশত অনুলা বাস্তব (ভারতীয়) থাকা সত্ত্বেও পিয়ানো বাজানো সভ্যতার নজির মনে করলেন, নৃত্যে শতশত সুন্দর যুগ্ম থাকা সত্ত্বেও যুগ্মহীন উন্মত্ত স্বেচ্ছাচারী নৃত্য শুরু করলেন সমাজপ্রাঙ্গনে; শত সহস্র রাগরূপ থাকা সত্ত্বেও কাঙ্গালের মত সংকর সংস্কৃতির জন্ম দিতে উঠেপড়ে লাগলেন। এ সভ্য শুধু সংগীতের, ক্ষেত্রেই নয় সমাজের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সাহিত্যে, চিত্রকলায়

সংগীতে সেই অন্ধকারদিনের কুসংস্কৃতি আজও আমাদের প্রতিপদে বিচারে বিবাস্তি ঘটছে। তাই জনপ্রিয় সংগীত বলতে আজ আমরা বুঝি হয় শৃঙ্গাররসাত্মক নগ্ন ভাষায়, আদিমতম ভাবব্যঞ্জক বিদেশী সুরের সংমিশ্রণ নয়তো সংগীত সংস্কৃতির নিম্নতম ধাপের সহজাত ভাবাবেগপূর্ণ ভাষাপ্রধান সংগীত; আর নয়তো কবিদের দাগদ্ব দোষে ছুটে কাব্যসংগীত। সংস্কৃতির ভাঙারে যে এঁরা বহুদিন পূর্বেই দেউলীয়া হয়ে আছেন সে নজির ইতিহাস খুঁজলে কিছুকিছু মিলবে।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের বারানাহিক সংস্কার বা উৎকর্ষের মধ্যে ভারতের আদিমতম বাণেশ্বর সংস্কৃত নর্যাদা মিলেছে আদিমতম নৃত্য অর্থপূর্ণ প্রকাণ্ড ভঙ্গির সম্পদে আজও সমৃদ্ধ। এ করনার কথা নয় সংগীতের ইতিহাস-এর স্বাক্ষর দেয়। উচ্চাঙ্গ সংগীত কোন শ্রেণী বিশেষের বা কোন জাতি বিশেষের বা কোন দেশ বিশেষের নিজস্ব সংগীত নয়। ভারতের সকল জাতির সকল দেশের সকল সমাজের প্রচলিত সংগীত কলার সার্থক সংমিশ্রনে অলঙ্কৃত অমূল্য সংগীত-সংস্কৃতি যার তুলনা দুনিয়ার দরবারেও মিলবে না। অর্বাচীন কালে জনতার দরবারে এর জনপ্রিয়তার যাচাই করে এক নিঃশ্বাসে বিরুদ্ধ রায় দিয়ে দিলে আমরা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হবো; সংস্কৃতির হবে নির্ধাসন দণ্ড। সব কলাবিদ্যার অদৃষ্টেই সর্বজনের প্রীতি অর্জন লেখা নেই-খাকা সম্ভবও নয়। আজ সাম্যবাদী যুগে কথাটা সেকেলে হ'লেও 'অধিকার ভেদ' একটা বড় কথা। কৃষ্টি বা সংস্কৃতির নিছক গাণিতিক হিসাবে বিচার চলে না। চিত্রকলাবিদের সৃষ্টি যেহেতু সকলের মনোরঞ্জে অগম্য সেইহেতু কলাসৃষ্টি পক্ষপাত দোষে ছুটে বা মহৎ সাহিত্য রচনা যেহেতু সকলের বোধগম্য হ'ল না, সেই হেতু ওটা জন অপ্রিয় সাহিত্য-এই মত পোষণ করা যেমন হাস্যকর তেমনি হাস্যকর হচ্ছে উচ্চাঙ্গ সংগীত যে হেতু জনপ্রিয় নয় সেই হেতু ওটা শ্রেণী বিশেষের সংগীত এই আখ্যা দেওয়া।

সংগীতের জন-অপ্রিয়তার কারণের মূলে যে সকল প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা গত দু'শতকে ঘটে গেছে সে বিচার না করলে চলছে না। এখানে একটা কথা বলা দরকার সংগীত বলতে আমি উচ্চাঙ্গ সংগীতই বুঝি কারণ অন্যান্য অনিয়ন্ত্রিত প্রচলিত সুরবিদ্যাসকল সংগীতের আসনে বসাতে বাধা আছে। সংগীত কথাটি অর্থপূর্ণ এবং তার নির্ধারিত অর্থ ইতঃপূর্বেই বহু প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতরা ক'রে গেছেন। আমরা অধুনা শিক্ষিত সমাজ ইংরাজী ভাষা করে মিউজিকের মানে সংগীত করলে ভারতীয় সংগীত অবোধাই থেকে যাবে ভারতীয় সংগীত একটি সৃষ্টি ধর্মী কলাবিদ্যা। এখানে সকলেই কলাবিদ বা আর্টিষ্ট হতে পারে না বটে তবু উচ্চাঙ্গ সংগীতের লক্ষ্য হচ্ছে সকল বিদ্যার্থীকেই আর্টিস্টের পর্যায় তোলা, একটি সুনিয়ন্ত্রিত সংস্কৃত শিক্ষা ও চর্চার মাধ্যমে। শুধু কথিত জনপ্রিয় সংগীতের এসব বালাই নেই। তাই তার নেই নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃত চর্চার প্রয়োজন, নেই সৃষ্টিধর্মী কলাবিদ হবার তাগিদ। অবশ্য কয়েকজন সৃষ্টিধর্মী সুরকার সর্বকালেই আছেন যারা কাব্যের দাগদ্ব করেও সুর সৃষ্টির নর্যাদা পেয়ে থাকেন। তাঁদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ এবং তাঁদের অনুকরণে যারা গায়ক নামে খ্যাত সেই জনপ্রিয় প্রায়ক গোপ্তী আর যাই হোন, কলাবিদ হওয়ার দাবী করতে পারেন না, যেমন পারেন না একজন রবীন্দ্রনাথের কবিতা

নিজের হাতে কাগজে লিখে, কিম্বা কবিতার ছব্ব অঙ্কুরণ ক'রে কবি হওয়ায় দাবী করতে ।

প্রাচীনকালে ভারতের সংস্কৃত জাতিগুলির মধ্যে উচ্চাঙ্গসংগীত পদ্ধতি যে জনপ্রিয় ছিল একথা প্রমাণ সাপেক্ষ নয় । এবং সমাজের সাধারণ স্তরেও যে এর গতিবিধি ছিল এবং সাধারণ স্তরের লোকসংগীত মাজিত আকারে উচ্চাঙ্গ সংগীতের পুঁজি বাড়িয়েছে সে প্রমাণ বেশি খুঁজতে হবে না, রাগরাগিনীর নামে তারা আজও অমর । তবু কেন এই অপ্রিয়তার অপবাদ তার ললাটলিখন এটা গবেষণার বস্তু । পণ্ডিত ভাভবওজী এর যে দু একটি কারণ দেখিয়েছেন তা ভেবে দেখার মত । প্রথমতঃ ইংরাজী ফ্যাসানে সকলে সব কিছু ভারতীয় কৃষ্টির ওপর ঝড়গহস্ত হ'য়েছিলেন যার ফলে সংগীতসমাজ তথা কলাবিদরা কলা চর্চা ছেড়ে আশ্রয়লাভ মন দিলেন । মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবান আশ্রয় পেলো দেশীয় রাজ দরবারে । অতি সামান্য সংখ্যা । এবং এরাই কোন রকমে ভরাডুবি থেকে রক্ষা করলেন উচ্চাঙ্গসংগীতকে । এবং আর একটা কারণও দেখিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে অশিক্ষিত ওস্তাদগোষ্ঠির স্বৈচ্ছাচারীতায় এই যুগে উচ্চাঙ্গসংগীতের মর্যাদা খর্ব হয়েছে । তাঁর কালে তাই তিনি লক্ষ্য করেছেন কলাবিদের সংখ্যা অত্যন্ত কম হ'য়ে গিয়েছিল ।

সামাজিক বাইরে কলাবিদদের আশ্রয়লাভ ও পুষ্টি উচ্চাঙ্গ সংগীতকলাকে গত দুশো বৎসরে করে ভুলেছে অপ্রিয় এ কথায় অনেকখানি সত্য আছে এই কারণে যে কলাবিদ্যার প্রচার নির্ভর করে পরিচিতির ও আশ্রয়তার মধ্যে । এই পরিচিতি ঘটাবার বাহনরা যদি তখন দরবারে এবং বেঞ্চালয়ে আশ্রয় নিয়ে আশ্রয়লাভ ক'রে থাকেন সে অপরাধ আর যারই হোক তাঁদের নয় এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের তো নয়ই । পরিচয়ের মধ্যে যে জনতার প্রীতি অর্জন করা যায় তার প্রমাণ বাংলার কোন কোন পল্লীগ্রামে আজও নজির আছে, সেখানে তথাকথিত জনপ্রিয় সংগীত পরিবেশিত হ'লে তারা ক্রপদ ধামারের বরাং করেন । জন অপ্রিয়তার মূলে আর একটি কথা—গত দুই শতকের শিক্ষিত ভদ্রসমাজের কলাবিদদের প্রতি অবহেলা এবং যার ফলে সমাজচ্যুত এই শিল্পীগোষ্ঠির সমাজের নিম্নস্তরে আশ্রয়লাভ, নৈতিক ও মানসিক অধোগতি । মুষ্টিমেয় সংগীত রসিক সমাজ অবশ্যই এঁদের কথা ভোলেননি এবং ভারতীয় সংগীতের ধারা প্রবাহ রক্ষা করায় তারা আমাদের নমস্কার ।

আজ আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই অমূল্য সাংস্কৃতিক সম্পদ কি করে রক্ষা করা যায় ; আগামী দিনের জন্তে এতে আরো কি মুতন সংস্কার যুক্ত করা যেতে পারে যা একে জনপ্রিয় করে তুলবে । গত বিশ বৎসরের সংগীত ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে উচ্চাঙ্গ সংগীত ক্রমেই শিক্ষিত সমাজের প্রীতি অর্জন না করুক কিছুটা পুষ্টি অর্জন করেছে । সমাজচ্যুত অমর্যাদার গ্লানি অবশ্যই আজ লুপ্ত হয়েছে । আজ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কলাবিদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে । সারাভারতে শিক্ষিত কলাবিদ আজ সংখ্যায় অনেক বেশি । সংগীতের চরম দুদিন হয়তো কাটবে আশা হয় । এখন প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে যাবে যদি আমরা জনপ্রিয়তাকে মুখ্য লক্ষ্য রেখে সাংস্কৃতিক মর্যাদা জলাঞ্জলি দিই, কুসংস্কার যুক্ত হওয়া দরকার সু-সংস্কার যুক্ত করাও দরকার কিন্তু, সংস্কারযুক্ত হওয়া

সংগীতকলার ক্ষেত্রে মোটেই নিরাপদ নয়। সংগীত কলায় শিক্ষা ও চর্চার মধ্যেই তার সৃষ্টির মূল। ধারাবাহিক উৎকর্ষতার মধ্যেই তার সম্পদ এবং নিয়ন্ত্রিত অমূল্যলনের মধ্যেই তার বিভিন্ন রসসৃষ্টির উৎস। সংস্কার মুক্ত হয়ে বিকশিত ও ঋণিত কলাসৃষ্টি হয়তো সাময়িকভাবে সম্ভব কিন্তু তাতে সংস্কৃতির ভাণ্ডারে এক কর্দমকণাও পড়বে না। জনপ্রিয়তার খাতিরে যদি নিয়ন্ত্রণ ভুলে শুধু মনোরঞ্জন কায়েম করা হয় তবে কিছুদিনের মধ্যে উচ্চাঙ্গসংগীতের সাংস্কৃতিক মৃত্যু ঘটবে। জনশ্রুতি ও রসসৃষ্টি সবসময় এক কথা নয় এটা মনে রেখে তবেই গণদরবারে হাজির হতে হবে কলাবিদকে। উচ্চাঙ্গসংগীতের যে বিপদ পূর্বে দেখা দেয়নি সেই বিপদ অধুনা দেখা দিয়েছে জনপ্রিয়তার তাগিদে বা জনপুষ্টির তাগিদে।

একথা আজ কলারসিকদের ভাবিয়ে তুলেছে কি উপায়ে সংগীতের গুহুতা রসসৃষ্টি ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায়। জনপ্রিয়তা এমন একটি আকর্ষণী যা বর্তমানে বহু চেতনাহীন কলাবিদকে নিয়গামী ক'রে তুলেছে রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে। যদি এঁরা সংযত না হতে পারেন জনপ্রিয়তার চাপে উচ্চাঙ্গসংগীতের বহু বহু যুগ সঞ্চিত সম্পদ লুপ্ত হবে। তাই সংগীত-সংস্কৃতি ও জনপ্রিয়তার প্রস্নে আমাদের অতি সাবধানী পদক্ষেপ প্রয়োজন। বর্তমান যুগে দেখা যাচ্ছে সংগীতে রাগরূপ সৃষ্টি, কাব্যভাব ও অলঙ্কার যথাযথ ভাবে পরিবেশিত হচ্ছে না। জনপ্রিয়তার খাতিরে কোন কোন কলাবিদ দেহ গঠনের চেয়ে অলঙ্কারের কারিকুরিতে মন দিয়েছেন কারণ অলঙ্কারের মাধ্যমে কলাকৌশল প্রদর্শনী তাঁদের জনপ্রিয় ক'রে তোলায় সাহায্য করেছে বেশি। সংগীতের আসরে নানা স্তরের কলাবিদ একই মর্যাদা প্রাপ্ত হওয়াতে এ-যুগে সংগীত-কলার মানদণ্ড সাধারণের মধ্যে পরিষ্কার হচ্ছে না। সংগীতকলার রস গ্রহণ করতে হলে বিচার করতে হলে যে রসিক শ্রেণী সৃষ্টি হওয়া দরকার তা হয়ে উঠছে না বর্তমানের সংগীত পরিবেশনের পদ্ধতির মধ্যে। এ সমস্কার সমাধান না ক'রে শুধু জনপ্রিয়তার স্বপ্ন দেখা বিপদসঙ্কুল। এ ছাড়া আগেকার মত কৃষ্টিবান রসিক সমাজের একান্ত প্রয়োজন যারা স্বেচ্ছাচারী শিল্পীর সংশোধন করতে পারেন, উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশনে এবং নির্দোষ জনপ্রিয়তা অর্জনে সাহায্য করতে পারেন। এ-সমস্কার যদি আমরা সমাধান না করতে পারি আমাদের সংগীত-সংস্কৃতি লোপ পাবে। জনপ্রিয়তা হয়তো অজিত হতে পারে।

লোকে চা খায় কেন ?

দেহের ক্রান্তি ও অবসন্নতা দূর করতে, মনের তৃপ্তি আনতে।

কিন্তু তার জন্য চাই—ভালো দাঙ্জলিং চা।

স্বাদ, বর্ণ ও সুগন্ধযুক্ত দাঙ্জলিং চা'র উপযুক্ত সমাবেশ

ব স স্তু কে বি ন

স্বাদি দোকান : কলেজ স্ট্রিট মার্কেট

স্থাপিত : ১৯১৫

ফোন : ৩৪-১২০৩

॥ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ ॥

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও বন্ধুগণ,

আমি সাহিত্যিক নই বা খ্যাতনামা ব্যক্তিও নই। অথচ অগ্রণীর দশম বার্ষিকী উৎসবে, যেখানে আপনাদের মত বহু গণ্যমান্য ও বিদগ্ধজনের সমাবেশ, সেই উৎসবে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচন করা হয়েছে আমাকে। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় বিস্ময়। বিস্ময় এ কারণেই যে আপনাদের মত গুণীজনদের যথাযোগ্য সমাদরে অভ্যর্থনা করার মত যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু সম্মেলনের উদ্ভোক্তাদের অনুরোধ এড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তবুই কি উদ্ভোক্তাদের অনুরোধ? আমার মনে হয় ঠিক এভাবে পেশ করলে আমার মনের কথা বলা হয় না। সুতরাং আমি আর একটু স্পষ্ট করে বলতে চাই অগ্রণীর এই উৎসবে নিজেদের ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করা সম্পর্কে।

প্রথমেই বলেছি আমি সাহিত্যিক নই। সাহিত্যিকরা মনের কথা বুঝিয়ে বলতে পারেন। আমার মনের কথা বা ভাব ঠিকমত বলতে পারছি না। তবুও বলবার চেষ্টা করছি।

মাসিক অগ্রণী একটি সুপরিচিত সাহিত্য-পত্রিকা। এই পত্রিকার গ্রাহক হওয়া সত্ত্বেই বছর চারেক পূর্বে এঁদের সংগে আমার পরিচয়। সাহিত্যের প্রতি পূর্বানুরাগবশতঃ যে আমি গ্রাহক হয়েছিলাম তা নয়। সাহিত্য সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো অনুরাগ বা বিরাগ কোনোটাই আমার ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যবসায়িকভাবে অত্যধিক জড়িত থাকার দরুন টাকা-আনা-পাই-এর হিসাব করে করে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই টাকা-আনা-পাই নিয়েই হিসাব করেছি। অর্থাৎ লাভের অঙ্ক দেখতে না পেলে কখনো আমি কোনোদিকে ঝুঁকি না—এমনি যখন আমার দৃষ্টিভঙ্গী বা মানসিক অবস্থা, ঠিক সেই সময় একদিন অগ্রণীর শ্রীদেবকুমার গুপ্ত মহাশয়ের আবির্ভাব। উনি আগাকে অগ্রণীর গ্রাহক হবার অনুরোধ জানালে তখনই আমি মনে মনে লাভের অঙ্ক কষতে থাকি। অগ্রণীর পিছনে বছরে ৬৮ টাকা ব্যয় করবো—তাতে আমার লাভ? অগ্রণী না পড়েও তো জীবনটা আমার বেশ কেটে যাচ্ছে, কেন অযথা ব্যয় স্বাক্ষর দিকে ঝুঁকবো? মনের প্রশ্ন প্রকাশ্যেই বললাম গুপ্ত মহাশয়কে। উনি সাহিত্য-পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলেন। কিছু কিছু ছাড়া-ছাড়া সম্পষ্টে ধারণা থেকে আমার চিন্তা একটি স্পষ্ট রূপ নিল। ব্যবসায় মধ্য এমনই ডুবে ছিলাম যে সাহিত্য সম্পর্কে কারো সংগে আলোচনা করার অবকাশই হোত না। সাহিত্য পাঠ করার জন্য যে ব্যয়, সেটা অপ্রয়োজনীয় নয়—বরং দৈনন্দিন প্রয়োজনের মধ্যে একটি অপরিহার্য জিনিস—লাভের অঙ্ক খতিয়ে দেখতে গিয়ে—শিক্ষার্থীর জীবন ছাড়িয়ে আমার অনেকদিন পর আবার এটা বেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম।^১ সেই মুহূর্তেই অগ্রণীর গ্রাহক হলাম। কিন্তু ব্যবসায়ী মন আমার ব্যয়াদিক্যের জন্য সজাগ রইলো। অবসর সময়ে সচেতন মন নিয়ে

নিয়মিত অগ্রণী পাঠ করতে লাগলাম। গত কয়েক বছর ধরে শুধু যে অগ্রণী সাহিত্যই আমি পাঠ করেছি তা নয়—এই অগ্রণীকে বোঝবার জন্যে সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যপত্রও কমবেশি নিয়মিত পড়েছি এবং এখনো পড়ি।

যে জিনিসটি আমাকে মুগ্ধ করেছে তা হচ্ছে অগ্রণীর পরিচালক এবং অগ্রণীর লেখকদের নিষ্ঠা। আমার বিশ্বাস সাহিত্যসৃষ্টির কাজে নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার অভাবে প্রতিভা এবং বৈদগ্ধ্যও ক্রমশঃ হীন হয়ে পড়ে। অগ্রণীর সঙ্গে সম্পর্কিত সাহিত্যতরুীদের এই নিষ্ঠা আছে বলেই অগ্রণী দীর্ঘ দশ বছর ধরে বাঙালী পাঠকের মন আর মননের খোরাক জুগিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর হতে চলেছে। সে সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র।

আজ অগ্রণীর জন্মবার্ষিকীতে অগ্রণীরই একজন হয়ে আমি আপনাদের কাছে আশীর্বাদ চাইছি অগ্রণীর জন্যে—বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রণী যেন উজ্জ্বল ভূমিকা নিতে পারে। আনন্দে এবং শ্রদ্ধায় আপনাদের সহস্র স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। এ স্বাগত শুধু এই অস্থানগৃহে নয়—বহিরঙ্গনে নয়, অগ্রণীর অন্তরঙ্গনে।

শ্রীজগদ্বন্ধু বোলিক

॥ অস্থান স্মৃতি ॥

শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে

৫ই জুলাই শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়

রামমোহন লাইব্রেরী হলে

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা।

সংগীতাচার্য শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে

৬ই জুলাই রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়

নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটে (শিয়ালদহ)

উচ্চাঙ্গ সংগীত ও নৃত্যস্থান।

দশম বার্ষিকী উৎসবের অভ্যর্থনা সমিতির সভার তালিকা

শ্রীদিলীপকুমার মিত্র
 শ্রী কে, কে, চক্রবর্তী
 শ্রীপরিমল মিত্র
 শ্রীশিশির মুখোপাধ্যায়
 শ্রীমণীন্দ্র দাশ
 শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
 শ্রীবিজলীমোহন গাঙ্গুলী
 শ্রীবীরেন্দ্র মিত্র
 শ্রী পি, কে, মিত্র
 ডাঃ এস, এম, ঘোষ
 শ্রীমোহনলাল বানথিয়া
 শ্রীগোবিন্দলাল বড়ুয়া
 শ্রীঅনিল গোস্বামী
 শ্রীশীতল পোড়েল
 শ্রী এন, মহলানবিশ
 শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী
 শ্রী এস, ব্যানার্জী
 শ্রী রেণুকা দেবী
 শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ
 শ্রীসীতানাথ গোস্বামী
 শ্রী আর, এল, মুখোপাধ্যায়
 শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়চৌধুরী
 শ্রীস্বতীরঞ্জন গুহ
 শ্রীরঞ্জনকুমার বিশ্বাস
 শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ
 শ্রী পি, কে, বসু
 শ্রী এস, দত্ত
 অধ্যক্ষ পি, কে, বসু
 নিসকে। ইনষ্টিটিউট

শ্রীসুশীলকুমার পাকড়াশী
 শ্রীযমুনপ্রসাদ ব্যানার্জী
 শ্রীসনৎকুমার বোস
 শ্রীঅমল রায়
 ডাঃ ভসিষ্ঠ সেন
 শ্রীসুবোধ রায়
 শ্রীকল্যাণী সেন
 শ্রী এ, সি, দাশগুপ্ত
 শ্রীঅলোকা সিংহ
 শ্রী এ, এন, সেন
 শ্রীদেবেন্দ্র গুপ্ত
 শ্রীবিমান ব্যানার্জী
 শ্রী পি, কে, সেন
 শ্রী এস, সি, মৈত্র
 শ্রীতেজোময় রায়
 শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়
 শ্রী পি, সি, মুখোপাধ্যায়
 ডাঃ এস, বি., রায়
 শ্রীসুবিনয় চ্যাটার্জি
 ডাঃ আবুল আহসান
 শ্রীআরতি চক্রবর্তী
 শ্রীঅমলেন্দু বসু
 শ্রীপ্রীতি মিত্র
 শ্রীনির্মল দাশগুপ্ত
 শ্রীকমলা দাশগুপ্ত
 শ্রীজগদ্বন্ধু মৌলিক
 শ্রীদিলীপকুমার সান্তাল
 শ্রীপ্রবীরকুমার বসু
 শ্রীঅরুণা বসু

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি : শ্রী জে, বি, নোলিক

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক : শ্রীমুনাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়

সাংগঠনিক উপসমিতি :

- শ্রীবৈষ্ণবনাথ ঘোষ
- „ সত্যপ্রিয় ঘোষ
- „ রবি ঘোষ
- „ জ্যোতি রায়
- „ মানস রায়চৌধুরী
- „ রামেন্দ্র দেশমুখা
- „ জ্যোতিভূষণ চাকী
- „ অরুণ দাশগুপ্ত
- „ রেণুকা দেবী



দূরদৃষ্টি!

খরচ বাঁচান—জাতীয় পরিকল্পনা সফল
হোক এবং আপনিও লাভবান হ'ন

টাকা অবশ্যই খরচ করবার জ্ঞান।
তবে তা' একথোকেও নয় বা
সবটাকাটাও নয়। জমা অথবা
খরচ—ব্যাংকের মারফৎ করুন।

টাকা চালু রাখা আজকের দিনে
দেশের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক প্রয়োজন।



**ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক
অফ ইণ্ডিয়া লিঃ**



হেড অফিস : ৪নং ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১